শিশু-বিশ্বকোষ : পঞ্চম খণ্ড

য থেকে হ

শিশু-বিশ্বকোষ

খাদ্য, উপযুক্ত আলো এবং উষ্ণতার সন্ধানে প্রাণীরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সর্বত্রই এমন স্থানবদল ঘটে। কোনো কোনো প্রাণী অল্প দূরত্ব অতিক্রম করে, আবার অনেক পাখি হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যায়। কীভাবে এসব প্রাণী স্থানবদলের সময় ঠিক ঠিক পথ চিনে যায়, তা এখনো একটি রহস্যময় ব্যাপার। প্রাণিবিজ্ঞানে এসব প্রাণীকে কী বলা হয়?—যাযাবর প্রাণী।

রক্তভরণের ক্ষেত্রে রক্তগ্রহীতা এবং রক্তদাতাকে একই শ্রেণীর রক্তের অধিকারী হতে হবে। রক্তগ্রহীতাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণীর রক্ত দেওয়া হলে রক্তগ্রহীতার রক্তে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তাতে গ্রহীতার মৃত্যুও ঘটতে পারে। রক্তদাতার রক্তে কোনো সংক্রামক রোগের জীবাণু থাকলে কিংবা রক্তদেওয়ার জন্য ব্যবহৃত সুঁই জীবাণুমুক্ত না হলে রক্তগ্রহীতাও বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

বৃষ্টিকণা বা জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বাতাসের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো যখন যায় তখন আলোর প্রতিসরণের কারণে সূর্যালোকের বর্ণালি সৃষ্টি হয়। এই বর্ণালি দেখতে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে থাকে। এ জন্য এই বর্ণালিকে বলা হয় রঙধনু।

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এলাকার এক বাঙালি সন্তান শৈশবে মাতৃহারা হয়ে দুঃখে কষ্টে ও অভাব অনটনে পড়ে কলিকাতা চলে যান। সেখানে জীবিকার প্রয়োজনে মোট বওয়া থেকে শুরু করে নানা রকমের তুচ্ছ কাজ তাঁকে করতে হয়েছে। পরবর্তী কালে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মির্জাপুরে মায়ের নামে গড়ে তোলেন 'কুমুদিনী ডিস্পেনসারি' –যা এখন 'কুমুদিনী হাসপাতাল' নামে পরিচিত, প্রপিতামহী ভারতেশ্বরী দেবীর নামে নারীশিক্ষার জন্য স্থাপন করেন 'ভারতেশ্বরী বিদ্যাপীঠ' –যা

(বাকি অংশ শেষ প্রচ্ছদের ফ্ল্যাপে)

www.pathagar.com

এখন 'ভারতেশ্বরী হোম্স্' নামে পরিচিত। সেই বাঙালি সন্তানের নাম কী ?
— দানবীর আর. পি. সাহা বা রণদাপ্রসাদ সাহা।

এক বাঙালি ভূপর্যটক সাইকেলে চড়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে বিভিন্ন মহাদেশের সর্বমোট ৫০ হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেন। তিনি কে ?
— রামনাথ বিশ্বাস।

টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী কে?
— ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাঁ-হাতি ব্যাট্স্‌ম্যান ব্রায়ান চার্লস লারা।

ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজ, সভ্যতা, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণিজগৎসহ জ্ঞানের সকল শাখার এমনি সব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়বস্তু নিয়ে শিশু-বিশ্বকোষের পঞ্চম খণ্ড। ভুক্তি-বিষয়গুলোকে মানববিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি —প্রধানত এই তিন বিভাগে ভাগ করে নিয়ে জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যরাজি এখানে তুলে আনা হয়েছে। বাংলা বর্ণক্রম অনুসারে বিন্যস্ত শিশু-বিশ্বকোষের এই খণ্ডে য থেকে হ বর্ণের মোট ৮০৫টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে আরো ১৯টি ভুক্তি। বিভাগ অনুসারে ভুক্তি-বিষয়ের সংখ্যা এরকম:

বিভাগ	মূলভুক্তি	দ্রষ্টব্যভুক্তি	মোট
মানববিদ্যা	২৫৩	৮৭	৩৪০
সমাজবিজ্ঞান	২৪৪	৬৭	৩১১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১৪১	৩২	১৭৩
মোট ভুক্তি	৬৩৮	১৮৬	৮২৪

মূল্য : ৳ ২৫০.০০

ISBN : 984-09-0405-1

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিশু-বিশ্বকোষ : ৫ম খণ্ড

বাশিশুএ ৪০৫

প্রকাশক : গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণ : বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস লিঃ, ৪৬/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৪,ডিসেম্বর ১৯৯৭।

মূল্য : ৳ ২৫০.০০

SHISHU-BISWAKOSH (Children's Encyclopaedia) Vol - 5. Publisher : Golam Kibria, Director, Bangladesh Shishu Academy. Old High Court Compound, Dhaka-1000, Bangladesh. Date of Publication : December1997

Price : Tk. 250.00
US $ 13.00

ISBN : 984-09-0405-1

প্রচ্ছদ শিল্পী : হাশেম খান

ছবি এঁকেছেন : হাশেম খান, সিরাজুল হক, মোহাম্মদ আলী

আলোকচিত্রের জন্য কৃতজ্ঞতা : শিহাব উদ্দিন, আলী হায়দার, শান্তনু খান, নাসির আলী মামুন

---

www.pathagar.com

পঞ্চম খণ্ড

শিশু-বিশ্বকোষ

য থেকে হ

প্রকল্প পরিচালক
গোলাম কিবরিয়া
প্রকল্প সহযোগী
বিপ্রদাশ বড়ুয়া
মো. নাজিমউদ্দিন
ব্যবস্থাপনা সহযোগী
সুজন বড়ুয়া
মুদ্রণ সহায়ক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
টিপু কিবরিয়া

সম্পাদনা পরিষদ

আবদুল্লাহ আল-মুতী—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
আহমদ রফিক—সমাজবিজ্ঞান
মনসুর মুসা—মানববিদ্যা
হায়াৎ মামুদ—শৈলী সম্পাদক ও সমন্বয়ক
হাশেম খান—শিল্প সম্পাদক

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

www.pathagar.com

শিশু-বিশ্বকোষ ব্যবহারের পদ্ধতি

ক. সকল ভুক্তি (entry) অভিধানগ্রন্থের সাদৃশ্যে বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়েছে। সেই অনুক্রম নিম্নরূপ :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ						
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ						
ট	ঠ	ড	ড়	ঢ	ঢ়	ণ				
ত	ৎ	থ	দ	ধ	ন					
প	ফ	ব	ভ	ম						
য	য়	র	´(রেফ্)	ল						
শ	ষ	স	হ							

খ. ইলেক্, ফলা ও কার এবং হসন্ত সংযুক্তির ক্রমিক উদাহরণ :

অ	অং	অঃ	অঁ	অক	অক্‌ত	অক্ক ইত্যাদি		
ক	কই	কউ	কও	কং	কঃ	কঁ		
ক ক	ককা	ককি	ককী	ককু	ককূ	ককৃ	ককে	ককৈ
	ককো	ককৌ	কক্					
কক্ক...	কক্ত...	কক্ব...	কক্য...	কক্র...	কক্ল...	কক্ষ		
কখ...	কঠ...	কড...	কড়...	কঢ...	কঢ়...	কণ...	কত...	কৎ...
	কথ...	কদ...	কধ...	কন...	কপ...	কফ...	কব...	কভ...
	কম...	কয...	কয়...	কর...	করৌ...	কর্‌...	কর্ক...	কর্ক্...
	কর্কট...	কর্হ...						
কল	কশ	কষ	কস	কহ...	কহৌ ইত্যাদি			

গ. দেশী বা বিদেশী যে কোনো নামের ক্ষেত্রে চলতি রেওয়াজ মানা হয়েছে : নামটি আমরা সচরাচর যেমন বলে থাকি, অর্থাৎ নামের যে অংশটি প্রধানত মনে রাখি ভুক্তিতে সেভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে বিদেশী নাম খুঁজবার একটা স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে—পদবি ধরে খোঁজা। আমরা সে নিয়মও মেনেছি; যেমন—উইলিয়াম শেক্সপীয়র, আলবার্ট আইনস্টাইন, জিগমুণ্ড ফ্রয়েড ইত্যাদি নাম পেতে হলে উইলিয়াম, আলবার্ট, জিগমুণ্ড ইত্যাদি না খুঁজে তাঁদের বংশগত পদবি (Surname বা family name) শেক্সপীয়র, আইনস্টাইন, ফ্রয়েড ইত্যাদি খুঁজে দেখতে হবে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কাজী নজরুল ইসলামকে পেতে হলে ঠাকুর বা ইসলাম খুঁজলে পাওয়া যাবে না, 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাজী' খুঁজে বের করতে হবে। অন্য দিকে আতাউল গনি ওসমানী কি সঙ্গীতজ্ঞ আলাউদ্দিন খাঁ-কে পেতে হলে ওসমানী (যেহেতু নামের এই অংশটুকুই সবাই জানেন) এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন (যেহেতু এঁদের নামের পূর্বে সর্বদা আমরা 'ওস্তাদ' বলে থাকি) খুঁজতে হবে।

ঘ. ভুক্তির ভিতরে কোথাও দ্র থাকলে বুঝতে হবে যে এর পূর্ববর্তী শব্দটির জন্য পৃথক ভুক্তি যথাস্থানে রয়েছে। যেমন ধরা যাক—'ওদিসি' ভুক্তির রচনাতে হোমার, মহাকাব্য, ভার্জিল, ঈনীদ ও জয়েস শব্দগুলোর পরে দ্র মুদ্রিত হয়েছে; এর অর্থ, এই বিশ্বকোষের নির্দিষ্ট খণ্ডের ভিতরে উপর্যুক্ত পাঁচটি ভুক্তিতে এসব প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। কখনো-বা একটি ভুক্তির জন্য অন্য ভুক্তির শিরোনামের পাশে দ্র লিখে তা দেখবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ঙ. ভুক্তির ভিতরে ব্যবহৃত শব্দসঙ্কেত নিম্নরূপ :

আ.	=	আলায়হিস্ সালাম
আনু.	=	আনুমানিক
কিমি	=	কিলোমিটার
কেজি	=	কিলোগ্রাম
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
খ্রি. পূ.	=	খ্রিস্টপূর্বাব্দ
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার
দ্র	=	দ্রষ্টব্য
ফা.	=	ফারেনহাইট
ব.	=	বঙ্গাব্দ
মি.	=	মিটার
মিমি	=	মিলিমিটার
মো.	=	মোহাম্মদ
রা.	=	রাদি'য়াল্লাহু আন্হু
শা.	=	শাসনকাল
স.	=	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
সিসি	=	কিউবিক সেন্টিমিটার
সে.	=	সেন্টিগ্রেড / সেলসিয়াস
সেমি	=	সেন্টিমিটার

www.pathagar.com

লেখকদের নাম-সঙ্কেত

অ. ব. = অজয় বড়ুয়া
আ. আ. = ড. আলী আসগর
আ. আ. মু. = ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী
আ. আ. হা. = ডা. আফরোজা আখতার হালিদা
আ. ই. = আমীরুল ইসলাম
আ. ক. = অধ্যাপক আহমদ কবির
আ. কা. = আবু কায়সার
আ. ন. ম. আ. র. = ডা. আ. ন. ম. আমিনুর রহমান
আ. মা. = আহমাদ মাযহার
আ. র. = ডা. আহমদ রফিক
আ. হ. খ. = আবদুল হক খন্দকার
আ. হা. = আবুল হাসানাত
আ. হু. = আখতার হুসেন
আজ. ই. = আজহার ইসলাম
ক. গো. = ড. করুণাময় গোস্বামী
ক. চৌ. = অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
কা. আ. আ. = কাজী আবদুল আলীম
কা. ম. = কাজী মদিনা
খু. জা. = অধ্যাপক খুরশীদ জাহান
টি. কি. = টিপু কিবরিয়া
ত. চ. = তপন চক্রবর্তী
নি. অ. = নিরঞ্জন অধিকারী
ফ. মা. = ফরহাদ মাহমুদ
ফ. র. = ফরিদুর রহমান
ফা. ন. = ফারুক নওয়াজ
ব. চৌ. = ডা. এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী
বি. ব. = বিপ্রদাশ বড়ুয়া
ম. আ. = মতলুব আলী
ম. আ. খা. = মনসুর আহমদ খান
ম. মু. = অধ্যাপক মনসুর মুসা
ম. র. = মনজুরুর রহমান
ম. হ. = মফিদুল হক
মা. র. = ডা. মাসউদুর রহমান
মু. আ. = মুহাম্মদ আলী
মু. ই. = ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
মু. এ. = মুহাম্মদ এলতাসউদ্দিন
মু. মা. = মুস্তাফা মাসুদ
মু. হা. = মুনির হাসান
মে. খা. = মেহ্জাবীন খান
মো. ই. = মোহাম্মদ ইবরাহিম
মো. হো. = মোস্তফা হোসেইন
র. শা. = রহীম শাহ
র. হা. = রশীদ হায়দার
রু. হা. = ডা. এস. কে. রুহুল হাসিন
শ. আ. = শফিউল আলম
শ. আহ. = শফি আহমেদ
শ. খা. = শরীফ খান
শা. চৌ. = শামসুদ্দিন চৌধুরী
শা. ত. = ড. শাহজাহান তপন
শা. হ. = শামসুল হক
শু. চৌ. = ডা. শুভাগত চৌধুরী
স. রা. = ড. সত্যব্রত রায়
সা. এ. = ডা. সাইফুদ্দীন একরাম
সি. আ. = সিরাজউদ্‌দীন আহমেদ
সি. না. হ. = ডা. সিকদার নাজমুল হক
সু. ব. = সুব্রত বড়ুয়া
সুজ. ব. = সুজন বড়ুয়া
সে. এ. = সেতারা এলিন
সে. শা. = সেলিনা শাহজাহান
সে. হো. = সেলিনা হোসেন
সৈ. আ. ই. = সৈয়দ আমীরুল ইসলাম
সৌ. মা. = সৌম্য মামুদ
হা. খা. = অধ্যাপক হাশেম খান
হা. মা. = ড. হায়াৎ মামুদ
হা. র. = হাসানুর রহমান
হো. আ. = হোসনে আরা

www.pathagar.com

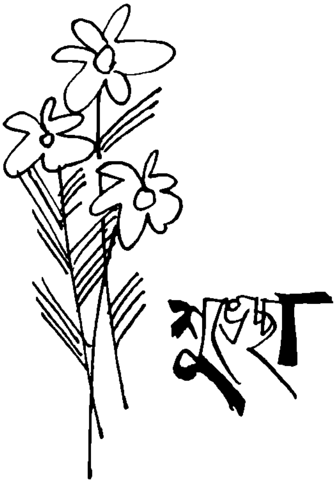

www.pathagar.com

www.pathagar.com

য

যকৃৎ

যকৃৎ বা লিভার (liver) দেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি। ওজন ১২০০-১৫০০গ্রাম। উদর-গহ্বরের উপর দিকে, প্রধানত ডানদিকে পাঁজরের নিচে যকৃতের অবস্থান। যকৃতের গ্রিক নাম 'হেপার'।

যকৃতের বৈশিষ্ট্য এর ব্যাপক রক্তসরবরাহ; ধমনী (দ্র) ও শিরা (দ্র) উভয় উৎস থেকেই হৃৎপিণ্ডের (দ্র) পাম্প করা রক্তের প্রায় এক-চতুর্থাংশ যকৃতে আসে। এর নিজস্ব রক্তপ্রবাহ ব্যবস্থার নাম 'পোর্টাল রক্তসঞ্চালন'।

যকৃৎ দেহের যাবতীয় প্রাণরাসায়নিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। এর প্রধান কাজ আমিষ, শ্বেতসার (দ্র), চর্বি (দ্র) জাতীয় উপাদানের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, প্লাজমা-প্রোটিন, গ্লাইকোজেন (দ্র), পিত্ত (দ্র) ইত্যাদি তৈরি; রক্ত-শর্করা নিয়ন্ত্রণ; অনিকষ্টকর উপাদান বিষমুক্তকরণ ('ডিটক্সিফিকেশন'); ভিটামিন (দ্র), লৌহ সঞ্চয় ইত্যাদি। এ ছাড়াও একাধিক হরমোন (দ্র) ও ঔষধের বিপাকক্রিয়া যকৃতে সম্পন্ন হয়। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের লোহিত কণিকা (দ্র) তৈরি থেকে পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে লোহিতকণিকা ধ্বংস করা,

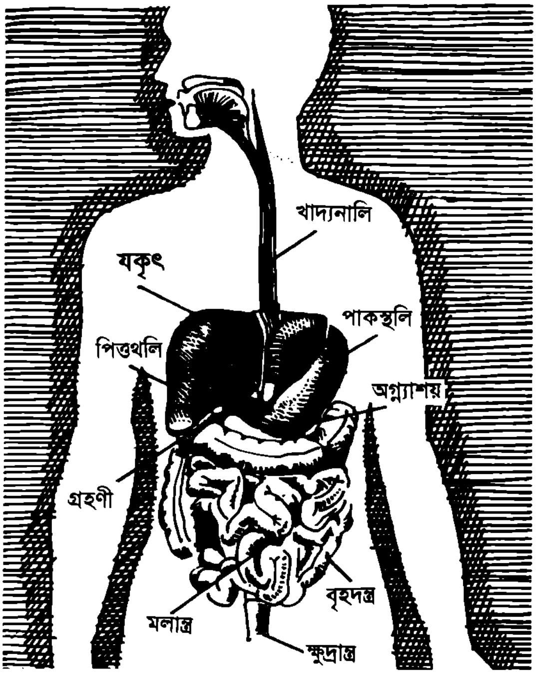

রক্ততঞ্চন অর্থাৎ রক্ত জমাট বাঁধানো এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশ নেওয়াও যকৃতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যকৃৎ জীবনরক্ষার জন্য অপরিহার্য।

যকৃতের প্রধান রোগের মধ্যে ভাইরাস হেপাটাইটিস বা জণ্ডিস (দ্র), অ্যামিবিক যকৃৎপ্রদাহ ও পূঁজসঞ্চয়, সিরোসিস, ক্যান্সার (দ্র) উল্লেখযোগ্য।

রু. হা.

যক্ষ্মা (tuberculosis)

'মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস্' (mycobacterium tuberculosis) নামক জীবাণু (দ্র) দ্বারা সৃষ্ট এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহজনিত রোগের নাম যক্ষ্মা। যক্ষ্মারোগ মূলত মানুষের শ্বসনতন্ত্র (দ্র), বিশেষভাবে ফুসফুসে (দ্র) আক্রমণ করে থাকে। তবে অন্ত্র (দ্র), অস্থি (দ্র), অস্থিসন্ধি, ত্বক (দ্র) ইত্যাদিতেও এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। এ রোগে মাছ (দ্র), উভচর প্রাণী, গরু (দ্র), এমনকি পাখিও (দ্র) আক্রান্ত হতে পারে এবং এদের সংস্পর্শে (যেমন—যক্ষ্মা-আক্রান্ত গরুর দুধপানে) মানবদেহে এ রোগ বিস্তারলাভ করতে পারে।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্ট যক্ষ্মার মধ্যে ফুসফুসীয় যক্ষ্মা বা পালমোনারি টিউবারকিউলোসিস্ (pulmonary tuberculosis) সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যে কোনো বয়সের মানুষ এ জাতীয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হতে পারে। তবে মদ্যাসক্ত, ধূমপায়ী, ডায়াবেটিস (দ্র) রোগগ্রস্ত কিংবা অপুষ্টিগ্রস্ত রোগী এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসকারীদের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ফুসফুসীয় যক্ষ্মার প্রধান লক্ষণ কাশি, কফ, কফের সঙ্গে কখনো রক্তের উপস্থিতি, বুকে ব্যথা, বৈকালিক জ্বর, অত্যধিক ঘাম, দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস ইত্যাদি। যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় এন্টিবায়োটিক (দ্র) ও কেমোথেরাপিউটিক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। বি. সি. জি. টিকা গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সি. না. হ.

যতীন্দ্রনাথ দাস [১৯০৪—১৯২৯]

বাঙালি বিপ্লবী ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তাঁর জন্ম ১৯০৪ সালে। পিতা বঙ্কিমচন্দ্র দাস।

www.pathagar.com

১৯২১ সালে সতেরো বছর বয়সে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। এই কারণে তিনি পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হন। কিছুকাল কংগ্রেসের কর্মী

হিসাবে কাজ করার পর বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯২৩ সালে বিখ্যাত বিপ্লবী শচীন সান্যালের ভবানীপুর ঘাঁটিতে যোগ দেন। এই সূত্রে দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং এই দলের সঙ্গে দেওঘরে গিয়ে বোমা তৈরির কৌশল রপ্ত করেন। ১৯২৫ সালে তিনি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির অপরাধে দেওঘর থেকে সদলবলে গ্রেফতার হন। বিচারে তাঁর তিন বছর কারাদণ্ড হয়।

কারামুক্ত হয়ে যতীন্দ্রনাথ আবার গোপনে বোমা তৈরির কাজ শুরু করেন। কিন্তু এবার পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাঁকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামি শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এদের রাজনৈতিক বন্দির অধিকার না দেওয়ার প্রতিবাদে অন্যান্য বন্দির সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ দাসও অনশন শুরু করেন। ৬৩ দিন অনশনের পর ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কারাগারে তাঁর মৃত্যু হলে যতীন্দ্রনাথ দাস শহীদের মর্যাদা অর্জন করেন।

সুজ. ব.

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [১৮৮৩—১৯১৫]

ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'বাঘা যতীন' নামেই সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ১৮৮৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার কয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ সালে কৃষ্ণনগর এ. বি. স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর আর্থিক অনটনের কারণে লেখাপড়া ছেড়ে চাকুরি নিতে বাধ্য হন। চাকুরিজীবনে তিনি দু' জন ইংরেজ সেক্রেটারি হুইলার ও মালি সাহেবের স্টেনোগ্রাফার হিসাবেও কাজ করেন।

১৯০৩ সালে তিনি বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ (দ্র) ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় তিনি নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী সম্মেলনের

একজন প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে কুষ্টিয়ায় ছোরা দিয়ে একটি বাঘ মারার ফলে তিনি 'বাঘা যতীন' নামে খ্যাত হন।

এদিকে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হয়ে যায়। বিপ্লবী দলগুলো ঠিক করে যে জার্মানদের সহায়তা নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলবে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে জার্মানি একটি জাহাজে করে বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র পাঠায়। বাঘা যতীন সঙ্গীদের নিয়ে উড়িষ্যার বালেশ্বরে যান সেই জাহাজ থেকে অস্ত্র গ্রহণের জন্য। কিন্তু পুলিশ এসব আগেই জেনে যায়। ফলে পুলিশবাহিনী তাদের ধরার জন্য সেখানে ওৎ পেতে থাকে। অবশেষে ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর পুলিশের সঙ্গে বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীদের দীর্ঘ বন্দুকযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাঘা যতীন মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরদিন বালেশ্বর হাসপাতালে মারা যান।

বুড়িবালামের তীরে সংঘটিত এই যুদ্ধ 'কোপাতিপোদার যুদ্ধ' নামে পরিচিত। কলিকাতার (দ্র) তৎকালীন ইংরেজ কমিশনার চার্লস টেগার্টও নতমস্তকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন অসীম সাহসী এই বীর বিপ্লবীকে।

ফ. মা.

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত [১৮৮৫—১৯৩৩]

আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। সংক্ষেপে তিনি জে. এম. সেনগুপ্ত এবং 'দেশপ্রিয়' নামে অধিক পরিচিত। ১৮৮৫ সালে চট্টগ্রাম (দ্র) জেলার বরমা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত।

যতীন্দ্রমোহন কলিকাতা (দ্র) হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা

www.pathagar.com

পরীক্ষা পাশ করে ১৯০৪ সালে বিলেত যান। ১৯০৮ সালে কেম্ব্রিজ থেকে বি. এ. এবং ১৯০৯ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। ১৯১০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন।

১৯২১ সালে তিনি ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র) অংশগ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর সাফল্যের সঙ্গে বার্মা অয়েল কোম্পানি (চট্টগ্রাম) ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্মঘট পরিচালনা করার অপরাধে স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তা (দ্র) -সহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই ঐতিহাসিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের পরিবারের ব্যয়–নির্বাহের জন্য ৪০ হাজার টাকা ঋণ করে 'দেশপ্রিয়' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২২-২৩ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন।

কিন্তু পরে যতীন্দ্রমোহন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (দ্র) স্বরাজ পার্টিতে যোগ দেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর দুই প্রধান সহযোগীর এক জন, অন্য জন সুভাষচন্দ্র বসু (দ্র)। দেশবন্ধু পরিচালিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজেও 'অ্যাডভান্স' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯২৩ সালে যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পাঁচ বার (১৯২৫–৩০) কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়ে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগে (দ্র) বক্তৃতা দিয়ে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলেত গমন করেন। বিলেত থেকে ফেরার সময় ১৯৩২ সালে জাহাজে গ্রেফতার হন। এর পর কয়েক জেল ঘুরিয়ে তাঁকে রাঁচিতে বন্দি রাখা হয়। বন্দি অবস্থায় ১৯৩৩ সালে তিনি মারা যান।

সুজ. ব.

যদুনাথ সরকার, স্যার [১৮৭০—১৯৫৮]

অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ। তিনি ১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাজশাহী জেলার করচমারিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে ইংরেজি ও ইতিহাসে অনার্সসহ বি.এ. এবং ১৮৯২ সালে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ. পাশ করেন।

শিক্ষাজীবন শেষে যদুনাথ সরকার ১৮৯৮ সালে অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ, পাটনা কলেজ ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করার পর ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন।

যদুনাথ সরকার ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। তিনি ঐতিহাসিক গবেষণা-গ্রন্থ রচনার জন্য বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও উর্দু, (দ্র) ফার্সি, মারাঠি ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশ। ১৯০১ সালে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব ঔরঙ্গজেব'। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল : 'দ্য ফল অব দ্য মুঘল এম্পায়ার,' 'শিবাজী' (বাংলা), 'মিলিটারি হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া,' 'দ্য রানী অব ঝান্সী,' 'ক্রোনোলজি অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি।'

ঐতিহাসিক গবেষণা ছাড়াও যদুনাথ সরকার এক জন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক ও রবীন্দ্র-গবেষক। রবীন্দ্রনাথ (দ্র) নোবেল পুরস্কার (দ্র) পাওয়ার আগেই তিনি কবির রচনার ইংরেজি অনুবাদ করে পাশ্চাত্য জগতে তাঁকে পরিচিত করে তোলেন।

ইতিহাসচর্চায় অগ্রপথিকের ভূমিকা পালনের জন্য যুদনাথ সরকারকে দেশবাসী 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করে।

সুজ. ব.

যন্ত্র (machine)

যন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের হাতিয়ার যার সাহায্যে যান্ত্রিক কাজ সম্পাদন সহজতর হয়ে থাকে। যন্ত্রে সাধারণত কোনো

www.pathagar.com

সুবিধাজনক স্থানে অল্প আয়াসে বল প্রয়োগ করে অপর কোনো প্রয়োজনীয় স্থানে ভারজনিত বাধা অতিক্রম করা যায়। এর ফলে কম শক্তি প্রয়োগ করে অধিকতর শক্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। পদার্থবিজ্ঞানে (দ্র) যে ছয়টি সরল যন্ত্রের কথা বলা হয় সেগুলি হচ্ছে লিভার, কীলক, হেলানো তল, স্ক্রু, কপিকল (দ্র), চাকা (দ্র) ও অ্যাক্সেল। তবে যন্ত্র বলতে সাধারণত যান্ত্রিক উপায়ে কাজ সম্পাদন করতে সমর্থ সব ধরনের হাতিয়ার বা সুব্যবস্থা বোঝানো হয়ে থাকে।

সু. ব.

যাকাত

যাকাত ইসলামী বিধানের তৃতীয় স্তম্ভ। এর আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা এবং বৃদ্ধি। সাধারণ অর্থে ধনী ব্যক্তিদের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিঃস্ব দরিদ্রদের দান করাকে 'যাকাত' বলা হয়। সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা সাড়ে সাত তোলা সোনা কিংবা সমপরিমাণ সম্পদ যদি সারা বছর কারো অধিকারে থাকে, তা হলে তাকে সেই সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। জমির ফসল এবং গবাদি পশুর উপরেও নির্ধারিত হারে যাকাতের বিধান আছে।

যাকাত দরিদ্রদের প্রতি করুণা প্রদর্শন নয়, এ তাদের অধিকার। এমনভাবে যাকাত আদায় করা উচিত যাতে যাকাত-গ্রহীতা প্রাপ্ত অর্থে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং পরবর্তী কালে যাকাত প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

মু. মা.

যবুর দাউদ (আ.) দ্র
যমুনা নদী, বাংলাদেশের দ্র

যানবাহন

ইতালির বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো (দ্র) চীন (দ্র), ভারত (দ্র) ও অন্যান্য প্রাচ্য (দ্র) দেশসহ প্রায় অর্ধ-পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন পায়ে হেঁটে। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই আরামপ্রিয়, তাই অত নিষ্ঠা বা ধৈর্য সবার থাকে না। তা ছাড়া বর্তমানে পায়ে হেঁটে পৃথিবী ভ্রমণ করার প্রশ্নই ওঠে না, যদি না তা নেহাৎ শখের হয়। প্রথমে মানুষ জন্তুর পিঠে চড়ে যাওয়া-আসা করত। এই জন্তুকে বাহন বলে, কারণ সে বহন করে। পরে অবশ্য যন্ত্রচালিত বাহনে চড়ে যাওয়া-আসা আরম্ভ হয়, যাকে যান বলে। এই দুটো শব্দ মিলেই যানবাহন।

মানুষ প্রথমে গরু (দ্র), ঘোড়া (দ্র), মহিষ (দ্র), গাধা (দ্র), উট (দ্র), হাতি (দ্র) প্রভৃতিকে পোষ মানিয়ে তার পিঠে চড়ে যাতায়াত করত। ঘোড়া মানুষের বাহন হিসাবে বেশি উল্লেখযোগ্য। হযরত ইমাম হোসেন (রা.) (দ্র)-এর ঘোড়ার নাম ছিল দুলদুল। আলেকজাণ্ডারের (দ্র) ঘোড়ার নাম ছিল বিউসেফ্যালাস আর রানা প্রতাপ সিংহের (দ্র) ঘোড়ার নাম ছিল চৈতক। আগেকার দিনে রাজা-জমিদারেরা হাতির পিঠে চড়ে যাওয়া-আসা করত এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও হাতি ও ঘোড়াকে কাজে লাগানো হত। তুন্দ্রা অঞ্চলে কনকনে ঠাণ্ডায় মানুষ বলগা হরিণের পিঠে চড়ে যাতায়াত করে এবং তারা বলগাহরিণের টানা চাকাবিহীন স্লেজ (দ্র) গাড়িও ব্যবহার করে। তা ছাড়া বাংলাদেশের (দ্র) বহু অঞ্চলে এখনো ডুলি, পালকি, চতুর্দোলা প্রভৃতির প্রচলন আছে।

এর পর অবশ্য চাকা (দ্র) আবিষ্কারের ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে।

চাকা আবিষ্কারের প্রসঙ্গে পথ-ঘাটের কথা এসে যায়। আগেকার দিনে পথ-ঘাট তত উন্নত না থাকায় চাকার আকার বেশ বড় ছিল। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, উটে-টানা গাড়ি, বড় চাকার সাইকেল ইত্যাদি প্রধান বাহন ছিল। পথ-ঘাটের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকা ছোট ও হালকা হতে থাকে। জাপান (দ্র), চীন (দ্র), পাকিস্তান (দ্র), ভারত (দ্র), মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা (দ্র), বাংলাদেশ (দ্র) প্রভৃতি দেশের রাস্তায় রিকশার খুব চলন দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের সাইকেল, রেলগাড়ি (দ্র), মোটরগাড়ি (দ্র), স্কুটার, বাস, ট্রাক, লরি প্রভৃতি যানবাহন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। পানি (দ্র)-তে লঞ্চ, স্টিমার, নৌকা (দ্র), জাহাজ (দ্র) ইত্যাদি যানবাহন পৃথিবীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ করে তুলেছে। তা ছাড়া আকাশপথে বিভিন্ন ধরনের উড়োজাহাজ পৃথিবীকে ছোট করে ফেলেছে। যানবাহন- ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মধ্যে সময়ের দূরত্ব কমে গেছে, ফলে সব দেশই যেন আজ প্রতিবেশী।

মু. এ.

www.pathagar.com

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মানুষের প্রয়োজনে যানবাহনে এসেছে নতুন নতুন পরিবর্তন। যানবাহনের আবিষ্কার হয়েছে দ্রুত থেকে দ্রুততর

www.pathagar.com

যামিনী রায় [১৮৮৭—১৯৭২]

বাঙালির শিল্পকলাচর্চার অর্থাৎ লোকশিল্পকলার পদ্ধতির শিল্পরসিক ও প্রচারক এবং নিজে এই ধারার সম্ভবত শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

যামিনী রায় জন্মেছিলেন বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়গ্রামে, ১৮৮৭ সালের ১১ই এপ্রিলে। পিতার নাম রামতারণ রায়। শৈশব-কৈশোর গ্রামেই কেটেছিল। শিল্পী হওয়ার স্বভাবজাত প্রেরণা ছিল মনের ভিতর, ফলে নিজের গ্রামাঞ্চলের মূর্তিশিল্পীদের মূর্তি তৈরি করা অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে দেখতেন, বুঝতে চেষ্টা করতেন। বাঁকুড়া মাটির মূর্তি গড়ার কাজে চিরকালই বিখ্যাত জায়গা হিসাবে গণ্য হত।

১৯০৩ সালে কলিকাতায় (দ্র) এসে আর্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। সময়টা তখন এমন ছিল যখন ভারতীয় শিল্পীগণ ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ইউরোপের (দ্র) অনুকরণ ছেড়ে স্বদেশের শিল্পকলার ঐতিহ্য বুঝতে চেষ্টা করছেন, প্রাচ্য রীতিতে ছবি আঁকছেন। যামিনী রায় কিন্তু তাঁর শিল্পসাধনার প্রথম পর্যায়ে ইউরোপীয় টেকনিক প্রথমে আয়ত্ত করেছিলেন, তারপর খুঁজতে শুরু করেছিলেন তাঁর নিজস্ব ছবি আঁকার রীতি কী রকম হবে। খুঁজে তিনি পেয়েওছিলেন। তা হল, বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলের লোকশিল্পের পথ ও পদ্ধতি। বাংলার এই শিল্পচর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাচীন পটের গায়ে আঁকা ছবি, পাটাচিত্র, আলপনার ঢং, মাটির তৈরি হরেক রকমের খেলনা পুতুল—ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি সব কিছু থেকেই তিনি তাঁর নিজের স্টাইল তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাঁর আঁকা ছবি দেখামাত্রই চেনা যায়, যেমন চেনা যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) কিংবা নন্দলাল বসুর (দ্র) ছবি দেখলে। প্রত্যেকেরই

যামিনী রায়ের ছবি— ষাঁড় ১৯৪৫

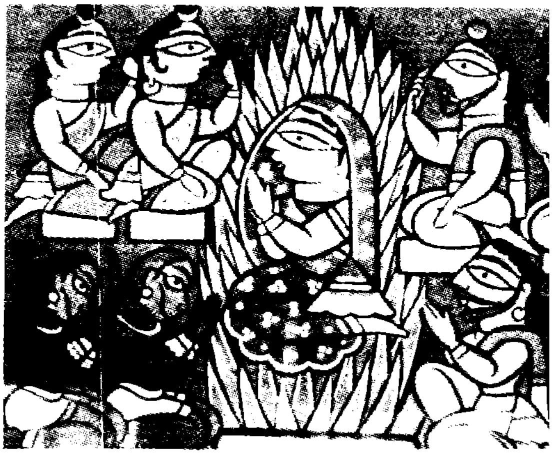

'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'

সম্ভ্রান্ত মহিলা ১৯২৮

www.pathagar.com

শিল্প রচনার বিষয় ভারতীয়, অথচ আঁকবার ধরন একেবারে আলাদা। ফোক আর্ট (folk art) বা লোকশিল্প থেকেই যামিনী রায় তাঁর নিজস্ব অঙ্কনশৈলী আবিষ্কার করেছিলেন। তত দিনে তাঁর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ।

চিত্রকর হিসাবে যামিনী রায় বিত্ত ও যশ দুটোই দেরিতে পেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট বিখ্যাত কিছু কলারসিক ছাড়া তাঁর ছবি প্রথম দিকে কেউ পছন্দ করতেন না। পরে অবশ্য ভারতবিখ্যাত তো বটেই, বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। বহু আমন্ত্রণ সত্ত্বেও কখনো বিদেশে যান নি। নিজের আঁকা ছবি এবং দেশের শিল্পকলা বিষয়ে শিল্পীর অহঙ্কার ছিল তাঁর; বলতেন—'আমরা গরিব দেশের মানুষ, এত পয়সা খরচ করে ওদের দেশে যাব কেন? ওদের অনেক পয়সা, ওরা এসে আমাদেরটা দেখে যাক।'

তাঁর খুব বিখ্যাত ছবি 'প্রসাধন', 'কৃষ্ণ ও বলরাম', 'কৃষ্ণলীলা', 'সাঁওতালী নাচ' ইত্যাদি।

তিনি ১৯৭২ সালের ২৪শে এপ্রিল পরলোকগমন করেন।

হা. মা.

যাযাবর প্রাণী

বছরের বিভিন্ন সময়ে এক স্থান থেকে অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে সরে যায় যে সকল প্রাণী, তাদের যাযাবর প্রাণী বলে। অনেক পাখি (দ্র), মাছ (দ্র) ও স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র) বছরের বিভিন্ন সময়ে এরকম জায়গা বদল করে। সাধারণত পর্যাপ্ত খাদ্য, উপযুক্ত আলো এবং উষ্ণতার সন্ধানে প্রাণীরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সর্বত্রই এমন স্থানবদল ঘটে। কোনো কোনো প্রাণী অল্প দূরত্ব অতিক্রম করে। যেমন—ব্যাঙ (দ্র) প্রজনন ঋতুতে বড় জোর কয়েক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। কিন্তু অনেক পাখি হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যায়। শীতের সময় সাইবেরিয়া থেকে অসংখ্য পাখি কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশে আসে। খাদ্য এবং উষ্ণ আবহাওয়ার (দ্র) সন্ধানেই সাধারণত তারা এত পথ পাড়ি দেয়। তবে অনেক প্রাণী শুধু প্রজনন ঋতুতেই জায়গা বদল করে।

যাযাবর প্রাণীরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় কীভাবে ঠিক ঠিক পথ চিনে যায়, তা এখনো একটি রহস্যময় ব্যাপার।

সা. এ.

যিয়ারত

আরবি শব্দ। এর প্রকৃত উচ্চারণ যিয়ারা কিংবা যিয়ারহ্। সাধারণ অর্থ— দর্শন, সাক্ষাৎ বা দেখা করা। ইসলামী পরিভাষায় কামেল-বুজুর্গ, পীর-আউলিয়া-দরবেশসহ অন্যান্য মু'মিন বা বিশ্বাসীদের কবরস্থান দর্শন করাকে যিয়ারত বলা হয়। এ ছাড়া পবিত্র কাবা (দ্র), মদিনার (দ্র) মসজিদ (দ্র) সমূহ এবং রসুলুল্লাহ্ (স.) (দ্র)-সহ তাঁর সাহাবীদের (দ্র) স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ দর্শনও যিয়ারতের পর্যায়ে পড়ে।

আমাদের দেশে যে কোনো মুসলমানের কবরের নিকটবর্তী হয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে দোয়া-কালাম পড়া ও মৃতের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত (মুক্তির জন্য প্রার্থনা) কামনা করা অর্থেই প্রধানত যিয়ারত শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

মু. মা.

যিশুখ্রিস্ট [খ্রি.পূ. ৬—৩০ খ্রি.]

খ্রিস্টধর্মের (দ্র) প্রবর্তক। তিনি খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রভু ও মুক্তিদাতা রূপে স্বীকৃত। তাঁর জীবনের ঘটনাবলি বাইবেলের (দ্র) 'নিউ টেস্টামেন্ট' বা নববিধান অংশে

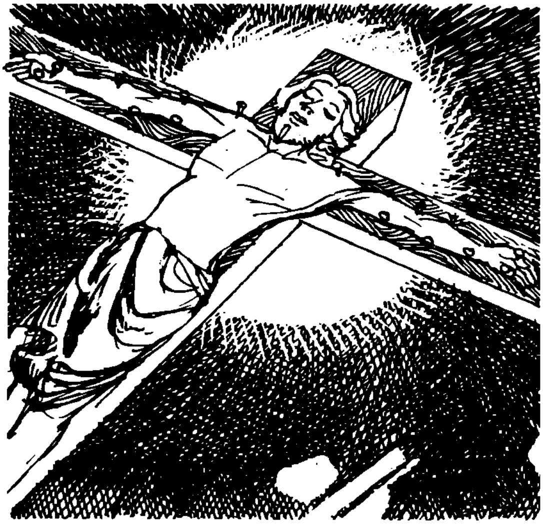

www.pathagar.com

যিশু তাঁর শিশু-বন্ধুদের সাথে গল্প করছেন

সঙ্কলিত আছে। তাঁর জন্ম বেথ্‌লেহেমে। তিনি জাতিতে ইহুদি (দ্র) ছিলেন। হিব্রু ভাষায় তাঁর নাম যিহোশুয়া (অর্থাৎ ত্রাণকর্তা)। যিহোশুয়া শব্দ থেকে গ্রিক ভাষায় জেসাস (Jesus) নামটি গ্রহণ করা হয়। ক্রাইস্ট (Christ) শব্দটি হিব্রু মোসাইয়া (তেল মেখে পবিত্রকৃত) শব্দ থেকে গ্রিক ভাষায় অনূদিত শব্দ।

ইহুদিরা ঈশ্বর-প্রেরিত এক জন মুক্তিদাতার আবির্ভাব বহুকাল ধরে প্রত্যাশা করছিলেন। বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' বা পুরাতন বিধানে এই মহামানবের আবির্ভাবের কথা লেখা আছে। যাঁরা যিশুকে বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে স্বীকার করেন তাঁরাই খ্রিস্টান নামে অভিহিত। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস যিশু ঈশ্বরপুত্র।

যিশুর মা কুমারী মেরি। যোসেফ তাঁর পালক-পিতা। খ্রিস্টপূর্ব ৮ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪ অব্দের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়। খ্রিস্ট-বর্ষ বা খ্রিস্টাব্দ গণনা শুরু হয় তাঁর জন্মের অনেক পরে। যোসেফ গ্রাম্য সূত্রধর ছিলেন। যিশুও কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। বৈষয়িক কাজ ফেলে রেখে যিশু নির্জনে বসে থেকে ঈশ্বর উপাসনায় মগ্ন হন। পরবর্তী তিন বছর ধরে তিনি ধর্ম প্রচারে বের হন। ২৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিক থেকে ৩০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত গালিলেয়া ও যুদেয়ার কোনো কোনো জায়গায় এবং জেরুজালেমে (দ্র) ইহুদিদের কাছে ঘোষণা করেন যে স্বর্গীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আসন্ন। সেই রাজ্যে প্রবেশ করে নবজীবন লাভ করতে তিনি শুধু ইহুদিদেরকে নয় সকল মানুষকেই আহ্বান জানালেন। মুষ্টিমেয় শিষ্য নিয়ে তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে জনগণকে শিক্ষাদান করতে থাকেন। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় লাভের জন্য বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় তাঁর উপদেশমূলক সংক্ষিপ্ত গল্প শোনার জন্য অজস্র মানুষ দলে দলে তাঁর অনুসারী হতে থাকে।

যিশুর বাণী হল—ভগবানই সকল মানুষের পিতা, পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল। ভগবানের সেবা করতে হলে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা বিশ্বাসী ভক্তের কর্তব্য। এ জন্য অহঙ্কার, হিংসা, ভোগের স্পৃহা দমন করে শিশুর মতো সারল্য ও পবিত্রতা অবলম্বনে পরম পিতার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। মানুষকে সকল প্রকার লৌকিক মনোভাব ও স্বার্থপর সংকীর্ণতা ত্যাগ করে পরম আত্মা (হোলি স্পিরিট)-এর প্রেরণায় চলতে হবে। তাঁর এই বাণী শুনে অনেক ইহুদি তাঁকে খ্রিস্ট বলে গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু তখনকার ইহুদি-সমাজের প্রতিপত্তিশালী ধর্ম-যাজক ও অতি রক্ষণশীল নেতৃবর্গ যিশুর বাণী গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ষড়যন্ত্রকারীরা যিশুর শিষ্য জুডাসকে তিরিশটি রৌপ্য মুদ্রা উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে। যিশু তাঁর শিষ্যসহ 'শেষ ভোজন' সমাপ্ত করে উপাসনার জন্য নগরীর বাইরে গেথসেমানীর উদ্যানে গমন করেন। সেখান থেকে তাঁকে ধরে রোমান শাসনকর্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইহুদি জনসাধারণও যিশুর ধর্ম বুঝতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। ফলে শত্রুকে ক্ষমা করে এবং বিশ্ব-মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন। জেরুজালেমের প্রান্তে কাল্‌ভারি নামক স্থানে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে অশেষ যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার মধ্যে তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। সেদিন ছিল শুক্রবার ৭ই এপ্রিল, ৩০ খ্রিস্টাব্দ। পার্শ্ববর্তী এক উদ্যানে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। পরবর্তী রবিবার ঊষার আলোয় মৃত্যুকে জয় করে তিনি

www.pathagar.com

পুনরুত্থান করেন বলে কথিত আছে। এর চল্লিশ দিন পরে তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করেন বলে খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন।

বি. ব.

যুক্তফ্রন্ট

সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) মুসলিম লীগ (দ্র) সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত একটি রাজনৈতিক নির্বাচনী মোর্চা। ১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চে অনুষ্ঠেয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের শেষ দিকে যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে। এই মোর্চার রূপকার ও প্রধান তিন শীর্ষ নেতা ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (দ্র), মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (দ্র) ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (দ্র)। এর প্রধান দু'টি শরিক দল ছিল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ ও শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কে. এস. পি.)।

এই মোর্চা গঠনে কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৩ সালের ১৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই দলের এক সভা থেকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে পরদিন অনুষ্ঠিত এক সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র-যুব সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের সমবায়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী। এই কমিটির উদ্যোগেই অচিরকালের মধ্যে যে রাজনৈতিক মোর্চা গড়ে ওঠে, তারই নাম রাখা হয় 'যুক্তফ্রন্ট'। শুধু তাই নয়, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ২১-দফা (দ্র) কর্মসূচি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারে মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দলগুলোও ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করে যুক্তফ্রন্ট। উল্লেখ্য, মোর্চাটির নির্বাচনী প্রতীক ছিল 'নৌকা'।

যুক্তফ্রন্ট এই নির্বাচনে এক ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফল ছিল নিম্নরূপ : ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীগণ লাভ করেন ২২৩টি আসন (৫টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত)। মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে জয়ী হয়, এমনকি তাদের প্রথম সারির ৫০ জন নেতার জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার 'পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা'র অজুহাত তুলে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা অর্থাৎ গভর্নরের শাসন জারি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

আ. হ.

যুক্তরাজ্য (United Kingdom)

ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্স্ দ্বীপসমূহ এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ড (Northern Ireland) দ্বীপ নিয়েই যুক্তরাজ্য গঠিত। ১৯২১ সালে স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার আগে সমগ্র আয়ারল্যাণ্ড যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুক্তরাজ্যকে প্রথম দিকে সাধারণভাবে ব্রিটেন (Britain) বলা হত। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্স্ দ্বীপসমূহ ১৭০৭ সালের পর থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

১৮০০ সালে ইউনিয়ন অ্যাক্টের মাধ্যমে সৃষ্ট 'গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য' নামের এক রাজনৈতিক

যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যাণ্ড

www.pathagar.com

সংস্থা গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডকে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত করে। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯২৭ সালে পার্লামেণ্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) নাম গৃহীত হয়। এর সংক্ষিপ্ত নাম ইউ কে (U K)।

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে যুক্তরাজ্য অবস্থিত। ইংলিশ চ্যানেল, নর্থ সি ও ডোভার স্ট্রেইট (Strait of Dover) দ্বারা যুক্তরাজ্য ইউরোপের প্রধান অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যুক্তরাজ্যের আয়তন ২,৪৪,১০৩ বর্গ কিমি (৯৪,২৪৯ বর্গ মাইল)। এর রাজধানী ও সবচেয়ে বড় শহর লণ্ডন (দ্র)।

সুজ. ব.

যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্র
যুগ অব্দ দ্র

যুগান্তর দল

অবিভক্ত বাংলার অন্যতম বৃহৎ গুপ্ত বিপ্লববাদী সংস্থা। এর লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র চরমপন্থার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন।

'অনুশীলন সমিতি'র (দ্র) সঙ্গে মতভেদের কারণে 'যুগান্তর'-এর জন্ম। ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার নামানুসারেই এর নাম হয় 'যুগান্তর'। কারো কারো মতে, শিবনাথ শাস্ত্রীর (দ্র) 'যুগান্তর' নামের উপন্যাস থেকেই এই নামের উৎপত্তি। সংগঠনটির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ (দ্র), বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু (প্রজ্ঞানন্দ স্বামী), সখারাম গণেশ দেউস্কর, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ।

প্রথম দিকে 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' একই সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হলেও ১৯০৮ সালে 'আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা'র পর থেকে দল দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কলিকাতার (দ্র) পরেই বাংলায় এই দলটির শক্তিশালী শাখা ছিল পাবনা, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়িতে। পরে সারা বাংলায় এর শাখা গড়ে ওঠে।

অনুশীলন সমিতির মতোই সন্ত্রাসবাদী ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের নির্মূল ও এদেশের মাটি থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করে স্বাধীন সার্বভৌম ভারত প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এর নেতা-কর্মীদের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তিগত বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন এবং আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এ দলের অনেক সদস্য কিংবদন্তির নায়কে পরিণত হন। এঁদের মধ্যে কিশোর ক্ষুদিরাম বসু (দ্র) অন্যতম। কালক্রমে 'যুগান্তর'-এর বহু নেতা-কর্মী সন্ত্রাসবাদের পথ পরিহার করে মার্ক্সবাদে (দ্র) দীক্ষিত হন।

আ. হ.

যুদ্ধ ও শান্তি

লিয়েফ্ তলস্তোয়ের (দ্র) বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস (দ্র) 'ভাইনা ই মির্', ইংরেজি অনুবাদে যা War and Peace নামে পরিচিত। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের (দ্র) রুশ অভিযানের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে।

লিয়েফ্ তলস্তোয়

উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বাংলাতে হয়েছে, তবে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এখনো কেউ করেন নি।

পৃথিবীতে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচটি উপন্যাসও নির্বাচন করতে হয় তা হলে 'যুদ্ধ ও শান্তি'-কে বাদ দেওয়ার উপায় নেই—এতই বিখ্যাত এবং এতই উঁচু মানের এই উপন্যাস। আয়তনে বিশাল—দু'হাজার পৃষ্ঠারও বেশি; কাহিনীর ভিতরে বিভিন্ন চরিত্রের সংখ্যাই আছে পাঁচ শতাধিক।

'যুদ্ধ ও শান্তি'-র মূল বক্তব্য যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং শান্তির জন্য মানুষের আজীবন তৃষ্ণা।

হা. মা.

যুদ্ধাপরাধ

যুদ্ধ চলাকালে শত্রুপক্ষের এক জন সেনাসদস্য অথবা বেসামরিক কোনো নাগরিক-কৃত শাস্তিযোগ্য যে কোনো কাজকেই যুদ্ধাপরাধ বলা হয়ে থাকে। অপরাধী ব্যক্তি ধরা পড়লে তার বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

যুদ্ধের সাধারণ আইনকানুন ও আচরণবিধির লঙ্ঘন এ

www.pathagar.com

জাতীয় অপরাধের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য। ১৯৪৫ সালে গঠিত 'আন্তর্জাতিক ও দূরপ্রাচ্য সামরিক ট্রাইবুনালের সনদ'-এর মূলনীতিতে বলা হয়েছে— শীর্ষস্থানীয় কারো নির্দেশে অধস্তন কারো দ্বারা সঙ্ঘটিত শাস্তিযোগ্য কাজকেও একটি যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় অসংখ্য যুদ্ধাপরাধ সঙ্ঘটিত হয়। এসব অপরাধের বেশির ভাগই সঙ্ঘটিত হয় জার্মানি ও তার মিত্রদের দ্বারা। ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য (দ্র), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) ইউরোপীয় ভূখণ্ডে সঙ্ঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচার করার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির অধীনে বিচারকার্য পরিচালনার লক্ষ্য থেকে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনাল বা আদালত গঠিত হয়। তখন যেসব অপরাধ যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য হয়, তার মধ্যে ছিল— ক. শান্তিবিরোধী অপরাধ; খ. যুদ্ধাপরাধ এবং গ. মানবতাবিরোধী অপরাধ।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালে জার্মানির নুরেমবুর্গ শহরে গঠিত হয় 'নুরেমবুর্গ ট্রাইবুনাল'। এই ট্রাইবুনাল ধৃত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে বিভিন্ন ধরনের ও মেয়াদের শাস্তি দেয়। এমনকি পরে ধৃত পলাতক যুদ্ধাপরাধীদেরও বিচার করে শাস্তি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক সঙ্ঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও যুদ্ধাপরাধীদের অনুরূপ কোনো ট্রাইবুনালে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নি।

আ. হ.

যোগ

যোগ হচ্ছে হিসাব করার একটি প্রক্রিয়া। এর অর্থ একত্র করা বা সংযোজিত করা। গণিতের (দ্র) সংখ্যা ও চিহ্ন ব্যবহার করে একের অধিক বস্তু বা দ্রব্যকে একত্র বা সংযোজিত করে হিসাব করার একটি গাণিতিক প্রক্রিয়া হচ্ছে যোগ। যেমন— পনেরোটি পেন্সিল ও আটটি পেন্সিল একত্র করলে হয় তেইশটি পেন্সিল। একে গণিতের নিয়মে লেখা হয় ১৫+৮ = ২৩। এখানে ১৫, ৮, ২৩ ইত্যাদি বিভিন্ন সংখ্যা আর '+' '=' ইত্যাদি চিহ্ন বা প্রতীক। যোগের চিহ্ন হচ্ছে +। যখন থেকে মানুষ ফসল ফলাতে ও পশু চরাতে শিখল, তখন থেকে তাদের পশু ও অন্যান্য দ্রব্যের হিসাব রাখতে হত। শুরুতে মানুষ তার দরকারি হিসাব-নিকাশ করত গোণার মাধ্যমে। তারা দুই বা ততোধিক বস্তু বা প্রাণীর সেট বা দল একত্র জড়ো করত এবং একটি একটি করে গুণে হিসাব করত। অর্থাৎ এক, দুই, তিন, ... এভাবে এক এক করে গুণে যেত। বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বেশি হলে এরূপ গণনায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। গণনা করার এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও দ্রুততর করার জন্য যোগ-প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়। যোগের ফলে বস্তু বা দ্রব্যের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কতকগুলো ছোট ছোট অংশ মিলে একটি বড় সমগ্র তৈরি হয়। যেমন— অংশ ১৫ ও অংশ ৮ মিলে সমগ্র ২৩ তৈরি হয়। গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যোগ করতে হলে সংখ্যা ও চিহ্ন সম্পর্কে জানতে হয়। এ ছাড়া সংখ্যার স্থানীয় মান সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। যেমন : ২৩-এ ৩ এককের ঘরে রয়েছে; ৩-এর স্থানীয় মান ৩ একক বা ৩ এবং ২ রয়েছে দশকের ঘরে; এর স্থানীয় মান ২ দশক বা ২০।

যে সংখ্যাগুলোকে যোগ করা হয় সেগুলোকে বলে যোগরাশি এবং যোগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে বলে যোগফল। যেমন : ১৫ ও ৮ যোগরাশি; ২৩ যোগফল। যোগপ্রক্রিয়ায় এই ধারণাগুলো কাজে লাগানো হয়। যোগকে বলা হয় দ্বিপদী সংঘটন বা প্রক্রিয়া (binary operation)। এর অর্থ যোগপ্রক্রিয়ায় একই সময়ে দু'টির বেশি রাশি বা সংখ্যা যোগ করা যায় না। যেমন : ৫+৭+৩ = ১২+৩ = ১৫। অর্থাৎ প্রথমে ৫ ও ৭ যোগ করে ১২ এবং পরে ১২ ও ৩ যোগ করে যোগফল হয় ১৫। যোগের কিছু ধর্ম রয়েছে। দু'টি বাস্তব সংখ্যা যোগ করলে একটি বাস্তব সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন : ৫+৩ = ৮। একে আবদ্ধতাসূত্র বলে। দু'টি সংখ্যা যে কোনো বিন্যাসেই যোগ করা হোক না কেন, যোগফল একই থাকবে। যেমন : ৫+৪ = ৯, আবার ৪+৫ = ৯ ; একে যোগের বিনিময়বিধি বলে। দুইয়ের অধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে যে কোনো দলকরণের জন্য যোগফল সমান থাকবে। যেমন : ২, ১ ও ৩-এর ক্ষেত্রে (২+১)+৩ = ২+(১+৩) = ৬ ; একে বলে যোগের সংযোগবিধি। শূন্যকে যোগের অভেদ রাশি বলে। কারণ কোনো সংখ্যার সঙ্গে শূন্য যোগ

www.pathagar.com

করলে সংখ্যাটির কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

হো. আ.

যোগীন্দ্রনাথ সরকার [১৮৬৬—১৯৩৭]

বাংলা শিশুসাহিত্যের অগ্রণী পুরুষ। বাংলা ভাষায় তিনিই সর্বপ্রথম উদ্ভট ছড়া রচনা করেন। ১৮৬৬ সালে (৭ই কার্তিক ১২৭৩ বঙ্গাব্দে) চব্বিশ পরগণার ন্যাতড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে তিনি কলিকাতা (দ্র) সিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষক ছিলেন।

কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়েই যোগীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। 'সখা' (দ্র), 'সখী', 'মুকুল', 'বালকবন্ধু', 'বালক', 'সন্দেশ' (দ্র)-সহ সে সময়ের বিভিন্ন শিশু-পত্রিকায় শিশু-মনস্তত্ত্ব সংলগ্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের রচনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভে সক্ষম হন। ছড়া ও ছবির সাহায্যে সহজ-সরল ভঙ্গিতে একই সঙ্গে শিশুদের বর্ণপরিচয় ও সাহিত্যরস পরিবেশনের আকর্ষণীয় এক রচনাকৌশল উদ্ভাবনে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত এই কৌশল সে সময় বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠদানের উপযুক্ত কৌশল হিসাবে সমাদৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত ছড়া দিয়েই বাংলার শিশু ছাত্রদের অক্ষরজ্ঞান দানের আকর্ষণীয় পদ্ধতির সূচনা হয়। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত তাঁর সচিত্র 'হাসি ও খেলা' বইটিই বাংলার শিশুদের বর্ণপরিচয়ের জন্য রচিত প্রথম বই।

যোগীন্দ্রনাথের অন্যান্য শিশুতোষ পুস্তকগুলো হল : 'খুকুমণির ছড়া' (লোকছড়ার সংগ্রহ—১৮৯৯), 'জ্ঞানমুকুল' (১৮৯০), 'ছবি ও গল্প' (১৮৯২), 'রাঙা ছবি' (১৮৯৬), 'হাসিখুশি' ১ম ভাগ (১৮৯৭), 'হাসিরাশি' (১৮৯৯), 'পশুপক্ষী" (১৯১১) ও 'বনেজঙ্গলে' (১৯২৯)। এ ছাড়া 'চারুপাঠ', 'সাহিত্য', 'শিক্ষাসঞ্চয়' ইত্যাদি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'খুকুমণির ছড়া' সর্বাধিক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে।

বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্পের উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রেও যোগীন্দ্রনাথ সরকার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বাংলা মুদ্রণশিল্পের পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (দ্র) দু' বছর আগেই যোগীন্দ্রনাথ বাংলায় মুদ্রণের কাজ শুরু করেন। সামান্য শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে নিজের যথাসর্বস্ব পণ করে ছোটদের জন্য অল্প দামে উত্তম ও সচিত্র বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি 'সিটি বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রকাশনাসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ছিল বাংলায় ছোটদের বই প্রকাশ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রতিষ্ঠান। এখান থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের লেখা প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশিত হয়।

১৯২৩ সালে যোগীন্দ্রনাথ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৩৭ সালে (১২ই আষাঢ় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

সুজ. ব.

যোগেশচন্দ্র ঘোষ [১৮৮৭—১৯৭১]

শিক্ষাবিদ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র (দ্র) বিশারদ। তিনি সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

১৮৮৭ সালে মাদারীপুর গোঁসাইরহাট গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০২ সালে ঢাকা (দ্র) জুবিলী স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স, ১৯০৪ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ. এ., ১৯০৬ সালে কুচবিহার কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে রসায়নশাস্ত্রে (দ্র) এম. এ. পাশ করেন।

শিক্ষাজীবন শেষে যোগেশচন্দ্র শিক্ষকতাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯০৮ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি ভাগলপুর কলেজে ও ১৯১২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত

www.pathagar.com

জগন্নাথ কলেজে রসায়নশাস্ত্র বিষয়ের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। শেষ দু' বছর তিনি জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

যোগেশচন্দ্র জীবনের ৪০টি বছর শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকলেও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। ১৯১৪ সালে তিনি ঢাকায় আয়ুর্বেদ ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'সাধনা ঔষধালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে তাঁর নিরলস গবেষণা এ দেশে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাপদ্ধতি ও আয়ুর্বেদ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীকে আধুনিক মানে উন্নীত করে। তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে 'অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা', 'আরোগ্যের পথ', 'গ্রহ-চিকিৎসা', 'চর্ম ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি', 'চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ও মুখরোগ চিকিৎসা', 'আমরা কোন পথে', 'আয়ুর্বেদ ইতিহাস' 'Whither Bound Are We' ও 'Home Treatment' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যোগেশচন্দ্র ১৯১১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন।

যোগেশচন্দ্র ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) চলাকালে ৪ঠা এপ্রিল হানাদার পাকসেনাদের গুলিতে ঢাকার গেণ্ডারিয়াস্থ নিজ কার্যালয়ে নিহত হন।

সুজ. ব.

যোজনী

বিভিন্ন মৌলের পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে মৌলের যোজনী বলা হয়। সাধারণত কোনো মৌলের একটি পরমাণুর সঙ্গে যতগুলি হাইড্রোজেন (দ্র) অথবা ক্লোরিন পরমাণু যুক্ত হয় অথবা কোনো যৌগ থেকে যতগুলি হাইড্রোজেন অথবা ক্লোরিন পরমাণু প্রতিস্থাপিত হতে পারে, সেই হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যাকে মৌলটির যোজনী ধরা হয়। যেমন—অক্সিজেনের (দ্র) একটি পরমাণুর (দ্র) সঙ্গে দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে এক অণু (দ্র) পানি (H_2O) উৎপন্ন করে। অতএব অক্সিজেনের যোজনী ২ (দুই)।

ইলেক্ট্রনীয় মতবাদ অনুসারে যোজনী বলতে রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে কোনো মৌলের পরমাণু যতগুলো ইলেক্ট্রন অপর মৌলের পরমাণুর সঙ্গে আদান-প্রদান করতে পারে ইলেক্ট্রনের সে সংখ্যাকে বোঝানো হয়। যেমন–সোডিয়াম (Na) পরমাণু ক্লোরাইড (Cl) পরমাণুকে একটি ইলেক্ট্রন (দ্র) দান করে একযোজী ধনাত্মক সোডিয়াম আয়ন সৃষ্টি করে। আর ক্লোরাইড একটি ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে একযোজী ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়। অর্থাৎ এখানে সোডিয়াম একটি ইলেক্ট্রন প্রদান করে, ক্লোরাইড একটি ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে। অতএব উভয়ের যোজনীই ১ (এক)।

সা. এ.

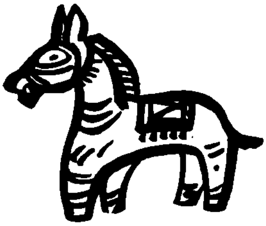

র

রকেট (rocket)

জেট ইঞ্জিনের (দ্র) মতো রকেটও নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় তৃতীয় সূত্রের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। প্রায় তিন শ' বছর পূর্বে বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন (দ্র) বলেছিলেন, প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত। পদার্থবিদ্যার (দ্র) এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রকেট ও জেট বিমান আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে উভয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও আছে। জেট ইঞ্জিন প্রয়োজনীয় অক্সিজেন (দ্র) বায়ু থেকে গ্রহণ করে, কিন্তু রকেটের জন্য জ্বালানি (দ্র) ছাড়াও নিজস্ব অক্সিজেন সরবরাহ প্রয়োজন। রকেটে সাধারণত কেরোসিন (দ্র), তরল হাইড্রোজেন (দ্র) ও তরল অক্সিজেন বা কোনো কঠিন জ্বালানি ব্যবহৃত হয়।

হাউই (দ্র) আকাশে ওড়ে। হাউই একটি কার্ডবোর্ডের খোলসের মধ্যে বন্দুকের বারুদ পুরে তৈরি হয়। এর মধ্যে একটি কাগজের ফিউজ থাকে। যখন ফিউজ জ্বালানো হয়,

www.pathagar.com

তখন বারুদে আগুন ধরে যায় এবং তা বারুদের রাসায়নিক মসলা থেকে নির্গত অক্সিজেনের সাহায্যে পুড়তে থাকে। ফলে উচ্চচাপযুক্ত গ্যাসের (দ্র) একটি প্রবাহ সবেগে বের হতে থাকে। হাউই তখন উপরের দিকে ছুটে যায়। রকেটের কর্মপদ্ধতি ঠিক হাউইয়ের মতোই।

চীন (দ্র) দেশের লোক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রকেটকে আগুনে তীররূপে ব্যবহার করত। এগুলো বাঁশের চোঙের মধ্যে ভরে নির্মিত হত।

১৭৮০ সালে মহীশূরের হায়দার আলী (দ্র) ইংরেজদের বিরুদ্ধে এটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন।

রুশ বিজ্ঞানী কন্‌স্‌তান্তিন্‌ ৎসিওল্‌কফ্‌স্কি-কে (১৮৫৭-১৯৩৫) আধুনিক রকেট-বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। এই স্কুলশিক্ষক রকেট সম্পর্কে নানা পরীক্ষার বর্ণনা দিয়ে ১৯০৩ সালে একটি বই প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে আমেরিকার প্রথম রকেট তৈরি করেন রবার্ট গডার্ড (১৮৮২-১৯৪৫)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) জার্মানদের তৈরি রকেট-অস্ত্র V-2 বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তবে

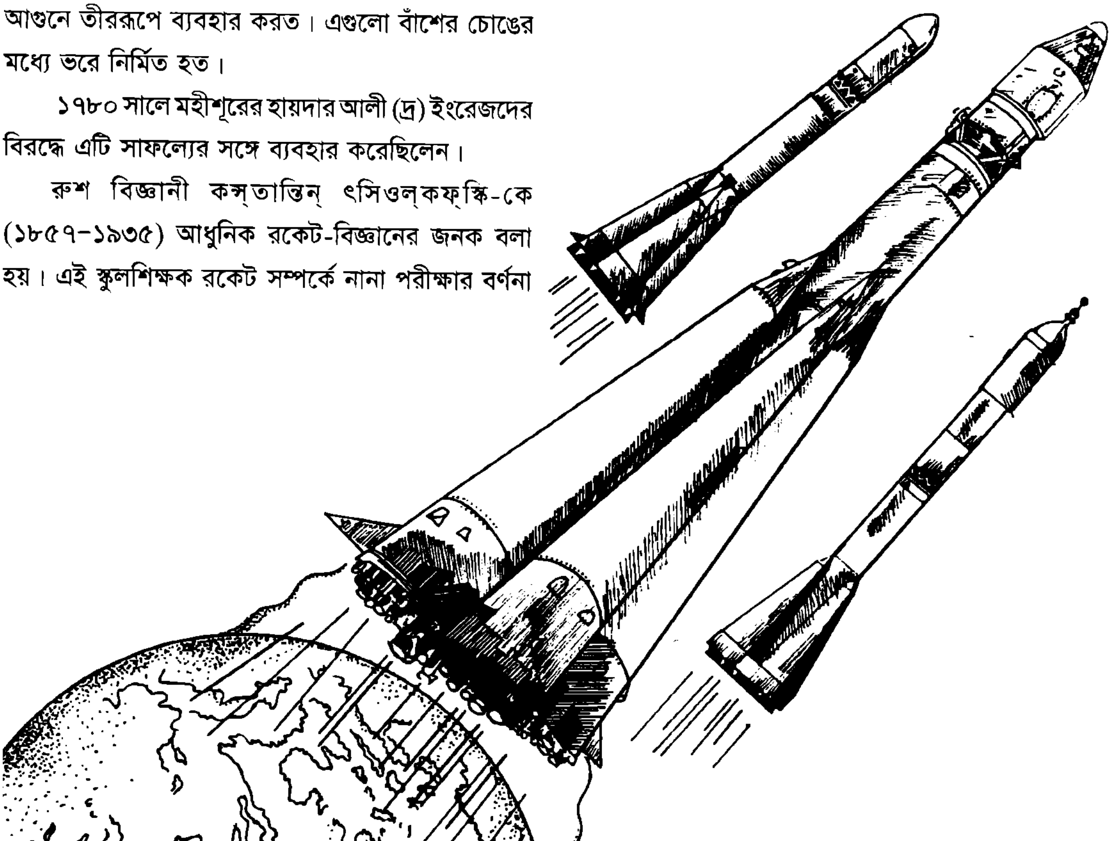

রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহের (দ্র) মহাশূন্যে ভ্রমণ মাত্র ১৯৫৭ সালে সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছিল এবং তার নাম রেখেছিল স্পুৎনিক্‌ (দ্র)।

মু. এ.

রকেট আবিষ্কারক
ড. রবার্ট গডার্ড

www.pathagar.com

রক্ত (blood)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের (দ্র) পরিভাষায় রক্ত বিশেষ ধরনের সংযোজনকলা নামে অভিহিত। এর তরল অংশের নাম প্লাজ্‌মা (plasma)। প্লাজ্‌মায় শতকরা ৯১-৯২ ভাগ পানি (দ্র), অবশিষ্ট অংশে রয়েছে প্রোটিন, চর্বি, শর্করা, হরমোন (দ্র), এনজাইম (দ্র), এন্টিবডি, ভিটামিন (দ্র), বিলিরুবিন ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ, অক্সিজেন (দ্র), কার্বন ডাই–অক্সাইড (দ্র), খনিজ লবণ ইত্যাদি। তাছাড়া রয়েছে ভাসমান রক্তকোষ লোহিত কণিকা (দ্র), শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০৫২–১·০৬৩ এবং পি-এইচ মান ৭·৪। লোহিত কণিকার জন্যই সদ্য ক্ষতস্থান থেকে নিঃসৃত রক্ত লাল দেখায়। পূর্ণবয়স্ক দেহে রক্তের পরিমাণ ৪·৫–৬ লিটার (দৈহিক ওজনের ৬–৮ শতাংশ)।

রক্তকোষের আয়ু সুনির্দিষ্ট বলে নিয়মিত নতুন রক্তকোষ তৈরির প্রয়োজন পড়ে। কেন্দ্রক (নিউক্লিয়াস)–বিহীন দুই দিকে উত্তল (বাইকন্‌ভেক্স) লোহিত কণিকা দেখতে গোলাকার চাকতির মতো। এর প্রধান উপাদান লৌহ (দ্র) ও প্রোটিনসমৃদ্ধ হিমোগ্লোবিন (দ্র) অক্সিজেন ও কার্বন ডাই–অক্সাইড বহন করে থাকে। হিমোগ্লোবিন রক্তের অম্লত্ব–ক্ষারত্বের ভারসাম্যও রক্ষা করে। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৪·৫–৫ মিলিয়ন। প্রতিটির গড় ব্যাস ৭·২ মাইক্রন। অস্থির লোহিত মজ্জা থেকে এদের জন্ম। গড় আয়ু ১২০ দিন।

অণুচক্রিকাও লোহিত কণিকার মতোই কেন্দ্রক–মুক্ত গোলাকার চাকতি; গড় আকার ২·৫ মাইক্রন। জন্ম লোহিত অস্থিমজ্জায়। সংখ্যা প্রতি ঘন মিলিমিটারে ২·৫–৫ লক্ষ। এদের প্রধান কাজ রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে রক্তপাত বন্ধ করা।

শ্বেত কণিকা কোষযুক্ত এবং বিভিন্ন ধরনের; যেমন–নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, ব্যাসোফিল (এগুলো দানাযুক্ত) এবং লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট (দানাবিহীন)। রক্তে গড় সংখ্যা প্রতি ঘন মিলিমিটারে ৪-১০ হাজার। গড় ব্যাস ৭·৫–১২ মাইক্রন পর্যন্ত। দানাযুক্ত শ্বেত কণিকার জন্ম অস্থিমজ্জায়, আর দানাবিহীনগুলো তৈরি হয় প্লীহা (দ্র) ও অন্যান্য লসিকাগ্রন্থিতে। এদের কাজ দেহের প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় অংশ নেওয়া। বিভিন্ন ধরনের শ্বেত কণিকার গড় আয়ু ২–১৫ দিন।

রক্তের কাজ বহুমুখী। দেহকোষে অক্সিজেন ও পুষ্টি–উপাদান সরবরাহ, বর্জ্যপদার্থ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশন, হরমোন–এনজাইম জাতীয় উপাদান বহন, দেহের তাপ ও তরলসমতা সংরক্ষণ, অম্লত্ব–ক্ষারত্বের ভারসাম্য সংরক্ষণ, রক্তচাপ (দ্র) নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় অংশ নেওয়া ইত্যাদি নানা কাজের কাজী রক্ত।

রু. হা.

রক্তগ্রুপ (blood groop)

মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় এগ্লুটিনোজেন (agglutinogen) নামক এক ধরনের প্রোটিন জাতীয় উপাদান (এন্টিজেন) থাকে। এই উপাদানের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসারে মানুষের রক্তকে চারটি প্রধান গ্রুপ বা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন 'এ', 'বি', 'এবি' এবং 'ও'। রক্তে দুটো প্রাথমিক এগ্লুটিনোজেন 'এ' এবং 'বি'। যাদের রক্তে এগ্লুটিনোজেন 'এ' রয়েছে, তাদের রক্ত 'এ' শ্রেণীভুক্ত। যাদের রক্তে এগ্লুটিনোজেন 'বি' রয়েছে, তারা 'বি' শ্রেণীর রক্তে অধিকারী। যাদের রক্তে 'এ' এবং 'বি' দুটো এগ্লুটিনোজেনই রয়েছে তাদের রক্ত 'এবি' শ্রেণীর। যাদের রক্তে 'এ' কিংবা 'বি' কোনো এগ্লুটিনোজেনই নেই, তাদের রক্ত 'ও' শ্রেণীর।

'এ' এবং 'বি' এগ্লুটিনোজেন ছাড়াও অধিকাংশ মানুষের রক্তে 'রেসাস' (rhesus, সংক্ষেপে Rh) নামক আরেক ধরনের এগ্লুটিনোজেন পাওয়া যায়। যাদের রক্তে রেসাস এগ্লুটিনোজেন আছে, তাদের রক্ত 'রেসাস পজিটিভ' শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু যাদের রক্তে রেসাস এগ্লুটিনোজেন নেই, তারা 'রেসাস নেগেটিভ' শ্রেণীর রক্তের অধিকারী। সাধারণত শতকরা ৮৫ জন মানুষের রক্তই আর–এইচ পজিটিভ শ্রেণীর।

১৯০১ সালে বিজ্ঞানী কার্ল লাণ্ডস্টাইনার (Karl Landsteiner : ১৮৬৮–১৯৪৩) রক্তের 'এ', 'বি' এবং 'এবি' শ্রেণী চিহ্নিত করেন। তাঁর সহযোগী স্টার্লিং রক্তের 'ও' শ্রেণীকে শনাক্ত করেন। লাণ্ডস্টাইনার এবং উইনার ১৯৪০ সালে রেসাস জাতের বানরের (rhesus monkey) রক্ত নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে রক্তের আরেকটি শ্রেণী চিহ্নিত করেন। রেসাস জাতের বানরের নামানুসারে রক্তের সেই

www.pathagar.com

শ্রেণীটির নাম রেসাস বা আর এইচ (Rh) রাখা হয়।

সি. না. হ.

রক্তচাপ (blood pressure)

শরীরে রক্ত (দ্র) প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তনালির ওপর লম্ব ভাবে রক্তের যে চাপ পড়ে, তাকে রক্তচাপ বলে। হৃৎপিণ্ড (দ্র) প্রতিনিয়ত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে শরীরে রক্ত সরবরাহ করে। হৃৎপিণ্ড যখন সঙ্কুচিত হয় তখন রক্তনালিতে রক্তের যে চাপ পড়ে, তাকে সিস্টোলিক (systolic) রক্তচাপ বলা হয়। হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হওয়ার সময় রক্তনালিতে রক্তের যে চাপ পড়ে, তাকে বলা হয় ডায়াস্টোলিক (diastolic) রক্তচাপ। এক জন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক সিস্টোলিক রক্তচাপ ১১০–১২০ মিমি পারদ এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৭০–৮০ মিমি পারদ।

সিস্টোলিক রক্তচাপ ১৫০ মিমি পারদের বেশি হলে এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১০০ মিমি পারদের চেয়ে বেড়ে গেলে তা উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশান) বলে ধরে নেওয়া হয়। আর সিস্টোলিক রক্তচাপ ১০০ মিমি পারদের চেয়ে কমে গেলে এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৫০ মিমি পারদের চেয়ে কম হলে তা নিম্ন রক্তচাপ (হাইপোটেনশান) বলে গণ্য হয়। রক্তচাপ মাপার জন্য 'স্ফিগমোম্যানোমিটার' (Sphygmomanometer) নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন কারণে মানুষের রক্তচাপ কম–বেশি হতে পারে। দৈহিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম, উত্তেজনা, কিংবা আহারের পর সিস্টোলিক রক্তচাপ বেড়ে যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় সিস্টোলিক রক্তচাপ কমে যায় কিন্তু দাঁড়ানো অবস্থায় ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ঈষৎ বৃদ্ধি পায়। বয়স, শারীরিক অবস্থা এবং স্ত্রী–পুরুষ–ভেদেও রক্তচাপের তারতম্য ঘটে। মহিলাদের সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পুরুষদের চেয়ে কম হয়। স্থূলকায় মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপ স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে সাধারণত বেশি হয়। বয়স বৃদ্ধির ফলেও মানুষের রক্তচাপ কিছুটা বেড়ে যায়।

সি. না. হ.

রক্তভরণ (blood transfusion)

শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ক্ষতিপূরণের জন্য শরীরে রক্ত (দ্র) পরিভরণ করাকে বলা হয় রক্তভরণ।

বিভিন্ন কারণে রক্তভরণ জরুরি হয়ে ওঠে। স্বল্পকালীন সময়ে অধিক মাত্রায় রক্তপাত কিংবা দীর্ঘকাল ধরে রক্তক্ষরণের ফলে শরীরে হিমোগ্লোবিনের (দ্র) পরিমাণ যদি ৪০ শতাংশের চেয়ে কমে যায়, তা হলে শরীরে রক্তভরণ প্রয়োজন হতে পারে। সব রকমের গুরুতর রক্তাল্পতা, হিমোফিলিয়া রোগ, ব্লাডক্যান্সার বা লিউকেমিয়া (দ্র) ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রেও শরীরের রক্তভরণ দরকার। কোনো কোনো গ্যাসের (দ্র) বিষক্রিয়ার ফলে (যেমন : কার্বন মনোক্সাইড, কাঠকয়লা, গ্যাস ইত্যাদি) শরীরে রক্তের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হলে রক্তভরণ দরকার হয়।

আধুনিক রক্তভরণপদ্ধতিতে আলাদাভাবে রক্তকণিকা কিংবা রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজ্‌মাকে (দ্র) রক্ত থেকে পৃথক করে শরীরে রক্ত পরিভরণ করা হয়।

রক্তভরণের ক্ষেত্রে রক্তগ্রহীতা এবং রক্তদাতাকে একই শ্রেণীর রক্তের অধিকারী হতে হবে। রক্তগ্রহীতাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণীর রক্ত দেওয়া হলে গ্রহীতার রক্তে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তাতে গ্রহীতার মৃত্যুও ঘটতে পারে।

রক্তদাতার রক্তে কোনো সংক্রামক রোগের জীবাণু (দ্র) থাকলে কিংবা রক্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত সুঁই জীবাণুমুক্ত না হলে রক্তগ্রহীতাও বিভিন্ন ধরনের রোগে— যেমন : ম্যালেরিয়া (দ্র), জণ্ডিস (দ্র), এইড্‌স্ (দ্র) ইত্যাদিতে— আক্রান্ত হতে পারেন। তবে নীরোগ রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করে জীবাণুমুক্ত সুঁইয়ের মাধ্যমে রক্তের শ্রেণীর সামঞ্জস্য অনুসারে রক্তভরণ করা গ্রহীতার জন্য নিরাপদ।

সি. না. হ.

রক্তসংবহন-তন্ত্র (cardiovascular system)

সংবহন মানে কোনো কিছুর এক স্থান থেকে অন্যত্র চলাচল। অসংখ্য নল, নলিকা ও সূক্ষ্ম জালিকার মাধ্যমে রক্ত (দ্র) দেহের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পৌঁছে দেয় কোষে কোষে, সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে বর্জ্য পদার্থ।

রক্তসংবহন-তন্ত্রের অন্তর্গত হল হৃৎপিণ্ড, ধমনী (দ্র), ধমনিকা, শিরা, উপশিরা ও কৈশিক নালিকা। এই সূক্ষ্ম

www.pathagar.com

নালিপথকে সোজা করলে দৈর্ঘ্য হবে ৬০ হাজার মাইল। চক্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতি মিনিটে বয়ে চলেছে প্রায় ৫ লিটার। এই চক্রের মধ্যমণি হল হৃৎপিণ্ড।

হৃৎপিণ্ড পেশিনির্মিত একটি পাম্প, যার কাজ দেহে রক্তসঞ্চালন নিশ্চিত করা। পূর্ণবয়স্কের হৃৎপিণ্ডের ওজন এক পাউণ্ডের কিছু বেশি। পুরু আবরণীর মধ্যে সুরক্ষিত হৃৎপিণ্ডের অবস্থান দুই ফুসফুসের (দ্র) মধ্যবর্তী স্থানে।

হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হিসাবে এর দক্ষিণাংশে অবিস্থত 'পেস মেকার'-এর সাহায্যে যে স্পন্দনের জন্ম দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন-প্রসারণজাত স্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে গড়ে বাহাত্তর।

হৃৎপিণ্ডে রয়েছে চারটি কক্ষ—ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়, বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়। অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে আছে কপাটিকা। এটি রক্তকে কেবল একদিকে যেতে দেয়। দূষিত রক্ত উর্ধ্ব ও নিম্ন-মহাশিরাপথে ডান অলিন্দে আসে, অলিন্দ রক্তে পরিপূর্ণ হলে কপাটিকা খোলে, রক্ত ঢোকে ডান নিলয়ে। ডান নিলয় থেকে রক্ত ফুসফুসে উপস্থিত হয়। সেখানে রক্ত অক্সিজেন (দ্র) গ্রহণ করে শুদ্ধ হয়। রক্তের ভেতরে আছে যে লোহিত কণিকা (দ্র), সেখানে আছে হিমোগ্লোবিন (দ্র)। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন বহন করে। ফুসফুস থেকে রক্ত ফিরে আসে বাম অলিন্দে, সেখান থেকে বাম নিলয়ে। বাম নিলয় রক্তকে জোরে পাম্প করে পাঠিয়ে

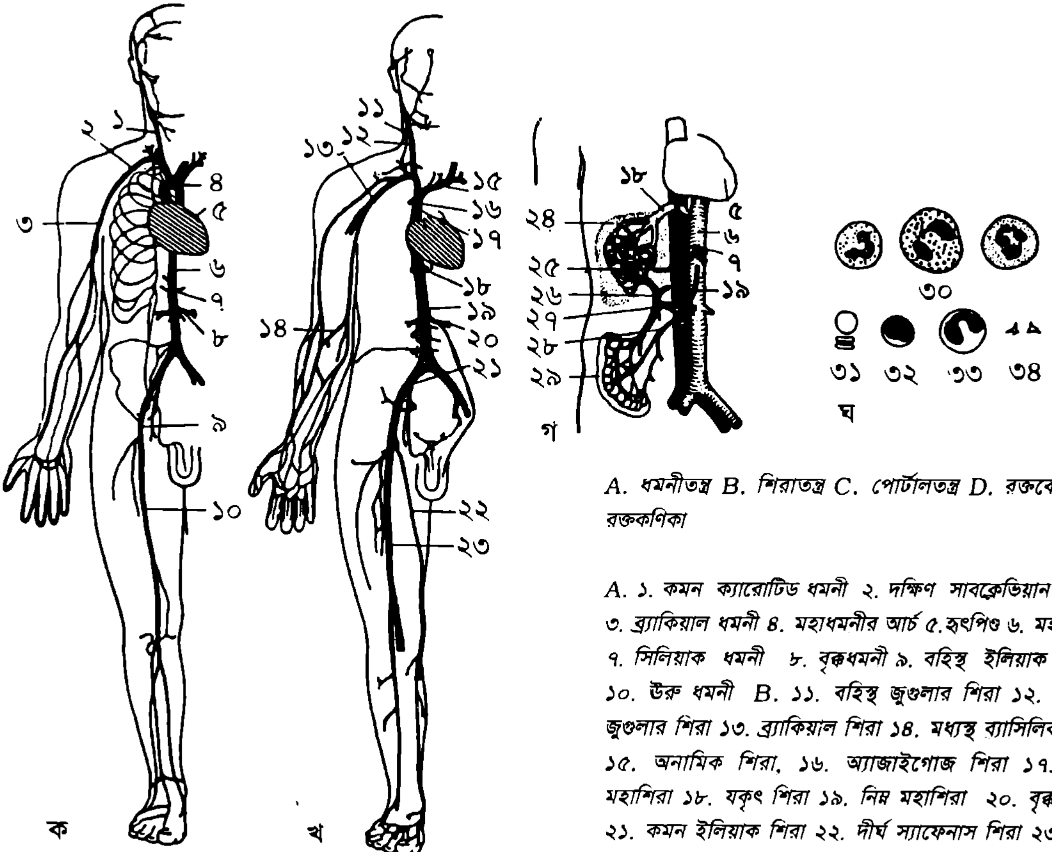

A. ধমনীতন্ত্র B. শিরাতন্ত্র C. পোর্টালতন্ত্র D. রক্তকোষ বা রক্তকণিকা

A. ১. কমন ক্যারোটিড ধমনী ২. দক্ষিণ সাবক্লেভিয়ান ধমনী ৩. ব্র্যাকিয়াল ধমনী ৪. মহাধমনীর আর্চ ৫.হৃৎপিণ্ড ৬. মহাধমনী ৭. সিলিয়াক ধমনী ৮. বৃক্কধমনী ৯. বহিস্থ ইলিয়াক ধমনী ১০. উরু ধমনী B. ১১. বহিস্থ জুগুলার শিরা ১২. অন্তস্থ জুগুলার শিরা ১৩. ব্র্যাকিয়াল শিরা ১৪. মধ্যস্থ ব্যাসিলিক শিরা ১৫. অনামিক শিরা, ১৬. অ্যাজাইগোজ শিরা ১৭. উর্ধ্ব মহাশিরা ১৮. যকৃৎ শিরা ১৯. নিম্ন মহাশিরা ২০. বৃক্ক শিরা ২১. কমন ইলিয়াক শিরা ২২. দীর্ঘ স্যাফেনাস শিরা ২৩. উরু শিরা C. ২৪. যকৃৎ ২৫. যকৃৎ ধমনী ২৬. পোর্টাল শিরা ২৭. প্লীহা শিরা ২৮. মেসেন্টেরিক শিরা ২৯. অন্ত্র D. ৩০. শ্বেত কণিকা ৩১. লোহিত কণিকা ৩২. লিম্ফোসাইট ৩৩. মনোসাইট ৩৪. অণুচক্রিকা

www.pathagar.com

দেয় মহাধমনীতে। এরপর ধমনী, ধমনিকা ও কৈশিকাজালক বেয়ে রক্ত পৌঁছায় দেহকোষে। ধমনিকা শেষ হয় সূক্ষ্ম রক্তনালি কৈশিকায়। কৈশিকায় রক্তের বিভিন্ন উপাদানের বিনিময় ঘটে। রক্ত কৈশিকায় এসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় দেহকোষে। কোষের দহনে তৈরি হয় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) সেটি প্রবেশ করে রক্তে। দূষিত রক্ত শিরাপথে আবার ফিরে আসে হৃৎপিণ্ডে। রক্তের এই পুরো চক্র ঘুরে আসতে সময় লাগে এক মিনিট। ধমনী যেমন পুষ্টি-উপাদান ও অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত বহন করে দেহকোষে নিয়ে যায়, তেমনি শিরার কাজ কার্বন ডাই-অক্সাইডপূর্ণ দূষিত রক্ত দেহকোষ থেকে ডান অলিন্দে পৌঁছে দেওয়া। ধমনীর তুলনায় শিরার প্রাচীর পাতলা, রক্তচাপও (দ্র) কম।

রক্ত পরিবহণের দায়িত্ব দুটো : ধমনীর রক্ত নানা উপাদানসহ কোষে পৌঁছানো— কোষকলা মেরামতির জন্য অ্যামাইনো অ্যাসিড, শক্তির জন্য শর্করা, খনিজ দ্রব্য, ভিটামিন (দ্র), হরমোন (দ্র) ও অক্সিজেন। শিরাপথে রক্তকোষের বর্জ্য কার্বন ডাই-অক্সাইড ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এনে ছেড়ে দেয় ফুসফুসে, যেখান থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাইরে বায়ুমণ্ডলে (দ্র)। হৃৎপিণ্ড দেহের প্রতিটি কোষেই নয়, নিজেকেও রক্ত সরবরাহ করে এবং তা করে দুই করোনারি ধমনীর মাধ্যমে।

জন্মগত কয়েকটি রোগ বাদে রক্তসঞ্চালনতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান রোগের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশান), করোনারি হৃদ্‌রোগ (দ্র), রিউমেটিক হৃদ্‌রোগ, এনজাইনা পেক্টোরিস, সংক্রমণজনিত একিউট এণ্ডোকার্ডাইটিস বা মায়োকার্ডাইটিস, হৃদ্‌নিষ্ক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। জরাজীর্ণ, প্রায় অচল, হৃৎপিণ্ড বদলে নেবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও ফলাফল এখানে- খুব আশাপ্রদ নয়। প্রথম হৃৎপিণ্ড সংযোজন করা হয় ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে। প্রধান শল্যবিদ ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড (Christiaan Barnard : ১৯২২-   )।

শু. চৌ

রক্তাল্পতা (anaemia)

রক্তে (দ্র) লোহিত কণিকার (দ্র) সংখ্যা কিংবা লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের (দ্র) ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় কমে গেলে শরীরে 'রক্তাল্পতা' দেখা দেয়।

একাধিক কারণে শরীরে রক্তাল্পতা সৃষ্টি হয়। যেমন : অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, —রক্তে কম সংখ্যক রক্তকণিকা তৈরি হওয়া, কিংবা রক্তকণিকাগুলোর অধিক হারে ভাঙন, হুক্‌-ওয়ার্ম নামক কৃমির আক্রমণ, অন্ত্র ও পাকস্থলী (দ্র)-তে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতজনিত রক্তক্ষরণের ফলে রক্তাল্পতা ঘটতে পারে। শরীরের যে সকল উৎস থেকে রক্ত তৈরি হয় অস্থিমজ্জা তার মধ্যে প্রধান। কোনো কারণে অস্থিমজ্জার কার্যক্ষমতা কমে গেলে বা নষ্ট হলে শরীরে রক্ত তৈরি বিঘ্নিত হয়। দেখা দেয় রক্তাল্পতা। শরীরে লৌহের ঘাটতি, বি-১২ ও ফলিক অ্যাসিড নামক ভিটামিনের (দ্র) অভাব ইত্যাদি কারণেও রক্তাল্পতা ঘটতে পারে।

রক্তাল্পতাগ্রস্ত রোগীর জন্য দরকার বিশ্রাম, উপযুক্ত খাবার, রক্তাল্পতা নিরাময়কারী ঔষধ এবং রোগীর রক্তাল্পতার কারণ অপসারণ।

সি. না. হ.

রঙধনু শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

রঙধনু (rainbow)

বৃষ্টিকণা বা জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বাতাসের ভেতর দিয়ে সূর্যের (দ্র) আলো (দ্র) যখন যায় তখন আলোর প্রতিসরণের কারণে সূর্যালোকের বর্ণালি সৃষ্টি হয়। এই বর্ণালি দেখতে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে থাকে। এ জন্য এই বর্ণালিকে রঙধনু বলা হয়। আলোর এই প্রতিসরণ ঘটে থাকে বিভিন্ন রং-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ভিন্নতার কারণে। রঙধনুতে তাই সূর্যের আলো সাতটি রঙে ভাগ হয়ে যায়। এই সাতটি রঙ হচ্ছে বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এই রঙগুলির নামের প্রথম অক্ষর একত্র করে 'বেনীআসহকলা' শব্দটি তৈরি হয়।

সু. ব.

রচনা

এক অর্থে সব লেখাই রচনা। কবিতা (দ্র), গল্প (দ্র), উপন্যাস (দ্র), নাটক (দ্র) বা প্রবন্ধ (দ্র) সবই রচনা। তবে বিশেষভাবে রচনা বা কম্পোজিশন বলতে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত গদ্যরচনা তথা প্রবন্ধকেই বুঝি। সাধারণত পাঠ্য পুস্তকসমূহে চার ধরনের রচনার উল্লেখ দেখা যায় : ব্যাখ্যামূলক, যুক্তিতর্কমূলক, বর্ণনামূলক এবং

www.pathagar.com

কাহিনীমূলক।

ক. চৌ.

রজনীগন্ধা

বহুবর্ষজীবী কোমল উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম *পলিয়ান্থিস টুবেরোসা (Polianthes tuberosa)*। গোত্র আমারিল্লিদাসি (Amaryllidaceae)। কন্দমূল থেকে উঠে চিরসবুজ দণ্ডের ওপর ফুলগুলো ফোটে। নিচের দিক থেকে ফোটা, তার ওপরে আধফোটা এবং তারও ওপরেরগুলো ক্রমশ ছোট কলির স্তবকে মাথা পর্যন্ত থাকে। গোড়া থেকে একটির পর একটি ফুল ফুটতে থাকে। ফুল কলকের মতো ও ভেতরে ফাঁপা এবং অত্যন্ত সুগন্ধি। রঙ মোমের মতো সাদা ও কোমল। গাছ মাটি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত দু'-তিন ফুট লম্বা হয়। একটি গাছে একটি পুষ্পদণ্ড ও চারদিকে ধানের পাতার মতো কয়েকটি পাতা থাকে। পাতাগুলো একটু মাংসল, মসৃণ ও কোমল। সবক্ষেত্রে ফুল ফোটার পর গাছটি না মরলেও এটি ওষধি গাছ হিসাবেই বিবেচিত হয়।

জন্মস্থান মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র) থেকে অনেক আগে এ দেশে এসেছে রজনীগন্ধা। তাও কয়েক শ' বছর হবে। সারা বছর বিভিন্ন সময়ে ফুল ফুটলেও গরম কাল থেকে ফোটা শুরু হয়ে বর্ষাকাল এই ফুলের ভরা মরশুম। শীতে অপেক্ষাকৃত কম ফোটে। ফুল হয় সজোড় ও একক। সজোড়গুলো কম সুগন্ধি কিন্তু ঘনসন্নিবদ্ধ এবং বড়। একক

ফুল সংখ্যায় কম, আকারে ছোট, পাপড়ি কম, কিন্তু গন্ধ বেশি। ফুলের ডাঁটা লম্বা বলে তোড়া বাঁধতে সুবিধা।

বি. ব.

রঞ্জনরশ্মি (Roentgen Ray)

রঞ্জনরশ্মির আরেক নাম এক্সরে (X-ray)। এটা আসলে এক ধরনের বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাধারণ আলোর চেয়ে অনেক কম। এ জন্য এদের খালি চোখে দেখা যায় না। রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবুজ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পনেরো হাজার ভাগের এক ভাগ থেকে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত ছোট হয় রঞ্জনরশ্মির কোনো পদার্থ ভেদ করার ক্ষমতা তত বেশি হয়। ১৮৯৫ সালে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ কনরাড রোয়েন্ট্‌গেন্‌ এই অদ্ভুত রশ্মি আবিষ্কার করেন।

এক্সরে নল (X-ray tube)–এ রঞ্জনরশ্মি উৎপন্ন হয়। এক্সরে নল আসলে একটি বায়ুশূন্য কাচনল, যার দু'প্রান্তে দু'টি ইলেক্ট্রোড লাগানো থাকে। এদের একটির নাম ক্যাথোড (দ্র)। এটি ঋণাত্মক চার্জযুক্ত। এতে টাংস্টেন (দ্র) ধাতুর একটি কুণ্ডলী থাকে, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ (দ্র) প্রবাহিত হলে ইলেক্ট্রন (দ্র) বের হতে থাকে। অপর ইলেক্ট্রোডের নাম অ্যানোড (দ্র)।

ক্যাথোড থেকে ইলেক্ট্রন খুব দ্রুত গতিতে ছুটে যায়। কারণ ক্যাথোড এবং অ্যানোডের মধ্যে খুব উচ্চ বিভব–পার্থক্য থাকে। ইলেক্ট্রনসমূহ প্রতি সেকেণ্ডে ৬০,০০০ থেকে ১,৭৫,০০০ মাইল বেগে টাংস্টেন পাতে আঘাত করে। এর ফলে ইলেক্ট্রনের গতি হঠাৎ থেমে যায়। এ সময়ে ইলেক্ট্রনের বেশির ভাগ শক্তি তাপে পরিণত হয় এবং কিছু রঞ্জনরশ্মি উৎপন্ন হয়। ইলেক্ট্রনের গতি কমানোর জন্য টাংস্টেন ব্যবহার করা হয়। কারণ এটা সহজে গলে যায় না। রঞ্জনরশ্মি উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

রঞ্জনরশ্মি নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে এর ব্যবহার রোগনির্ণয়ে এবং চিকিৎসায় বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দাঁতের গোড়ায় ঘা, হাড় ভাঙা, বুকের ভেতর যক্ষ্মা (দ্র) কিংবা ক্যান্সার (দ্র), কিডনির (দ্র) পাথর কিংবা শরীরে অন্য কোনো অংশের রোগ, যা আগে বাইরে থেকে

www.pathagar.com

কিছু বোঝা যেত না, রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে তা খুব সহজেই এখন শনাক্ত করা যায়। শুধু তাই নয়, এটা ক্যান্সারকোষকেও মেরে ফেলতে পারে। এ জন্য অনেক ক্যান্সারের চিকিৎসায় রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ করা হয়। অবশ্য এটা তখন খুব উঁচু মাত্রায় ব্যবহার করতে হয়।

ধাতব ঢালাই, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি নিখুঁত হয়েছে কিনা তা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে বোঝা যায়। রসায়নশাস্ত্র (দ্র) এবং পদার্থবিজ্ঞানের (দ্র) বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে আরো অনেক কাজে লাগানো হয়।

সা. এ.

রণদাপ্রসাদ সাহা [১৮৯৬—১৯৭১]

'দানবীর' আর. পি. সাহা নামে বাংলাদেশে অধিক পরিচিত।

১৮৯৬ সালের ১৫ই নভেম্বর ঢাকা জেলার সাভারের উপকণ্ঠে কাছুর গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। কিন্তু তাঁর পৈতৃক আবাস ছিল মির্জাপুরে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ সাহা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। মায়ের নাম কুমুদিনী। রণদাপ্রসাদ ৭ বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। পরে বিমাতার আশ্রয়ে দুঃখকষ্টের সংসারে অভাব-অনটন ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত করেন। প্রায় ১৬ বৎসর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলিকাতা (দ্র) চলে যান। সেখানে জীবিকার প্রয়োজনে মোট বওয়া থেকে শুরু করে নানা রকমের তুচ্ছ কাজ তাঁকে করতে হয়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে কলিকাতায় স্বদেশী আন্দোলনের (দ্র) লোকজনদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তাঁদের সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় গ্রেফতার হন ও পুলিশী নির্যাতন ভোগ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। ১৯১৪ সালে তিনি বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরে চাকুরি পান। এই কোরে (corps) যোগ দিয়ে মেসোপটেমিয়ার রণাঙ্গনে তাঁকে যেতে হয়। তাঁর কাজ ছিল আহতদের সেবাশুশ্রূষা করা। সেখানে হাসপাতালে হঠাৎ এক অগ্নিকাণ্ডে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে রোগীদের জীবন তিনি বাঁচিয়েছিলেন। এই সাহস ও বীরত্বের স্বীকৃতিতে নবপ্রতিষ্ঠিত (১৯১৬) বেঙ্গল রেজিমেন্টে তাঁকে কমিশন র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয়। এবং মহাযুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণে প্রথম ইংল্যাণ্ড সফর করেন। যুদ্ধশেষে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে রেলওয়ে বিভাগে টিকিট কালেক্টরের চাকুরি নেন, কিন্তু পরে এই চাকুরি চলে যায়।

এরপর তিনি ব্যবসা (১৯১২) শুরু করেন। প্রথমে কয়লার ব্যবসা, পরে নৌ-পরিবহণ। ১৯৩২ সালে বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানি স্থাপন করেন, লঞ্চ কেনেন, ডক-ইয়ার্ড তৈরি করেন। ১৯৪২-৪৩ সালে সরকারের খাদ্যশস্য ক্রয়ের অন্যতম এজেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সাল নাগাদ তাঁর মূলধন দাঁড়ায় কয়েক লক্ষ টাকা। এ বৎসরেই নারায়ণগঞ্জে পাটের ব্যবসায় নামেন এবং জর্জ অ্যাণ্ডার্সন কোম্পানি কিনে নেন। সেইসঙ্গে নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় সাহেবদের মালিকানাধীন তিনটি পাওয়ার হাউস ক্রয় করেন। চামড়ার ব্যবসাও শুরু করেন এই সময়েই। এভাবে তিনি কপর্দকহীন অবস্থা থেকে মেধা, উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে বিশিষ্ট বাঙালি ধনকুবেরে পরিণত হন।

কিন্তু রণদাপ্রসাদ সাহার খ্যাতি ও সম্মানের কারণ বিত্ত নয়, দেশসেবায় বিত্তের ব্যবহার। শৈশবে তাঁর জননী অর্থাভাবে প্রায় বিনাচিকিৎসায় মারা গিয়েছিলেন। সে কথা তিনি ভোলেন নি। ১৯৩৮ সালে কুমুদিনী ডিস্পেনসারি প্রতিষ্ঠা করেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মির্জাপুরে, ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালও তার সঙ্গে থাকে। পরে ১৯৪৪ সালে সেটিই কুমুদিনী হাসপাতাল নামে পূর্ণতা লাভ করে। বর্তমানে তার শয্যাসংখ্য ৮ শ'। ১৯৪২ সালে তিনি তাঁর প্রপিতামহী ভারতেশ্বরী দেবীর নামে 'ভারতেশ্বরী বিদ্যাপীঠ' স্থাপন করে ঐ অঞ্চলে নারীশিক্ষার সুযোগ করে দেন। ১৯৪৫ সালে সেটিই এখনকার 'ভারতেশ্বরী হোম্‌স্' (দ্র)-এ রূপলাভ করে। মধ্যবর্তী সময়ে, ১৯৪৩-এ, টাঙ্গাইলে কুমুদিনী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মানিকগঞ্জে দেবেন্দ্র কলেজও তাঁর দ্বারা স্থাপিত হয়। ষাটের দশকে টাঙ্গাইলের সদয়কৃষ্ণ পোদ্দারের নামে এস. কে. হাইস্কুলের ভবন তাঁর অর্থে নির্মিত হয়। ঢাকার কম্বাইণ্ড মিলিটারি হসপিটালের প্রসূতি বিভাগ তাঁর আর্থিক সহযোগিতায় খোলা হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে রণদাপ্রসাদ সাহা তাঁর বিষয়সম্পত্তি 'কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল' গঠন করে সেখানে

www.pathagar.com

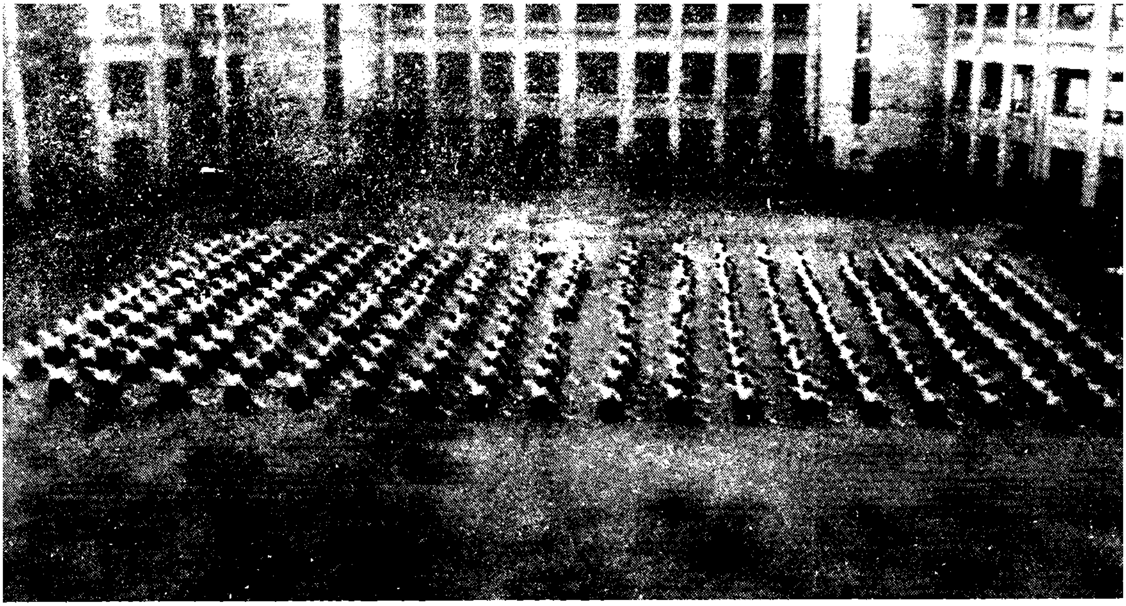

'ভারতেশ্বরী হোম্‌স্‌' মেয়েদের জন্য স্বাবলম্বী, শৃঙ্খলা বোধে উন্নত আবাসিক স্কুল

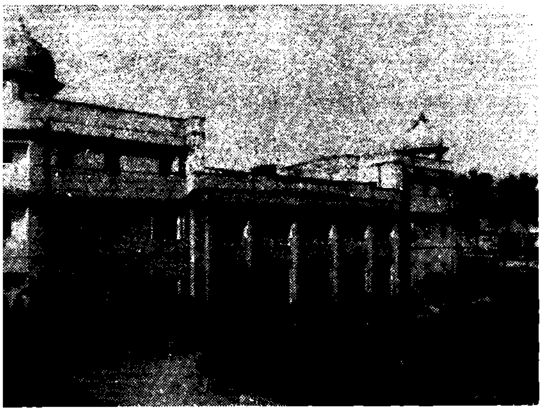

'রণদা প্রসাদ সাহা প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল যা মীর্জাপুর হাসপাতাল নামেও পরিচিত

দান করে যান। তাঁর জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত সমুদয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এখনো ট্রাস্ট কর্তৃক দক্ষভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

তাঁর মতো দেশব্রতী মানুষকে কুখ্যাত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) চলাকালে ১৯৭১-এর ৭ই মে নারায়ণগঞ্জে সপুত্র হত্যা করে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে।

হা. মা.

রত্নপাথর

এক ধরনের অত্যন্ত সুন্দর ও অধিক স্থায়ী খনিজ। এদেরকে কেটে পালিশ করলে অত্যন্ত মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়। এর ইংরেজি নাম gem বা jewel। Gem শব্দটি লাতিন gemma শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ কুঁড়ি (ফুলকুঁড়ি)। সোনা (দ্র), রূপা (দ্র) বা অন্য কোনো ধাতুতে রত্নপাথর সেট করে গহনা বা অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও এর অন্যান্য ব্যবহার রয়েছে। অনেকে একে ভাগ্যপাথর হিসাবেও ব্যবহার করেন। তাঁরা মনে করেন যে এসব পাথরে জাদুকরী শক্তি আছে এবং এদের ব্যবহারে সৌভাগ্য আসবে, বিপদ কেটে যাবে। প্রাচীন মিশরের লোকেরা জাদুশব্দ (magic word) খোদাই করা সৌভাগ্যপাথর ব্যবহার করত। একে বলা হয় অ্যামুলেট্‌স্‌ (amulates) বা ট্যালিসম্যান (talisman)। এই শব্দ তারা সৌভাগ্যের জন্য ব্যবহার করত। পশ্চিম আফ্রিকার সমাজপতি বা প্রধানগণ (chief) সোনালি রঙের বিশেষ হার ব্যবহার করে থাকে এই বিশ্বাসে যে এই পাথরের গুণে স্ত্রীর অধিক সন্তান হবে। মধ্যযুগে (দ্র) ইংল্যাণ্ডের

www.pathagar.com

লোকজন এই বিশ্বাসে স্যাফায়ার (sapphire) বা নীলকান্তমণি পরত যে এই পাথর ব্যবহারে চোখের রোগ সারবে, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হবে না, এ ছাড়া ব্যবহারকারী অনেক দুর্ভাগ্য—যেমন দারিদ্র্য ও অবিচার থেকে মুক্তি পাবে।

প্রাচীন কালে রত্নপাথরের কদর ছিল অনেক বেশি। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ধনবান মিশরীয়রা রত্নের মুকুট পরত। বুকে পরত রত্নের ক্যাসকেট। এদের বলা হত পেক্টোর্যাল। এরা অতিথিদের রত্নপাথরে গড়া আংটি উপহার দিত।

হো. আ.

রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি দ্র

রথ

প্রাচীন কালে গাড়ির নাম ছিল রথ (chariot)। প্রাচীন কালে প্রথম যখন রথ তৈরি হয়, তখন তার চাকা ছিল দু'টি। সে সময় রাজা ও সেনাপতিগণ যুদ্ধে রথ ব্যবহার করতেন। তখন রথের চাকায় কাস্তের ন্যায় অস্ত্র লাগানো থাকত। গ্রিস ও রোমে রথ যাত্রী বহন করত। এ ছাড়া ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা, শোভাযাত্রা, সংবাদপ্রেরণ, শিকার ইত্যাদি নানা কাজে রথ ব্যবহৃত হত। অশ্ব ছাড়া হাতি-টানা রথের উল্লেখও পাওয়া যায়। প্রাচীন মহাকাব্য (দ্র)-সমূহে নানা রকম রথের বর্ণনা আছে। রামায়ণ (দ্র) ও মহাভারত (দ্র) মহাকাব্যের যুদ্ধের সময় রথ ছিল অন্যতম বাহন। রামায়ণে রাবণের ছিল পুষ্পক রথ। ঐ রথে করে রাবণ সীতাকে হরণ করে। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ (দ্র)। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে রচিত বৌদ্ধ জাতকে (দ্র) রথ বা বিমানের উল্লেখ আছে। রথের চালককে বলা হত সারথি।

বি. ব.

রথযাত্রা ও উল্টোরথ

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় দিন জগন্নাথদেবের রথে চড়ে যে উৎসব হয় তার নাম রথযাত্রা। জগন্নাথদেব তাঁর ভাই বলরাম এবং ভাগিনী সুভদ্রা ঐ দিন রথে চড়ে বের হন। এই সুভদ্রা অর্জুনের দ্বিতীয় স্ত্রী। বলরাম ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা। উড়িষ্যার পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির থেকে গুণ্ডিচাবাড়ি যাত্রা ও সেখান থেকে ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে সেখানে সাড়ম্বরে রথযাত্রার উৎসব ও মেলা হয়। পুরীর রথযাত্রাকে কেন্দ্রীয় উৎসব ধরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় এই ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। গুণ্ডিচাবাড়ি থেকে সাত দিন পর পুনরায় জগন্নাথদেব যাত্রা করেন ও মন্দিরে ফিরে আসেন, তার নাম উল্টোরথ। ঢাকা মহানগরীর অদূরে ধামরাইয়ের রথযাত্রা উৎসব ও মেলা বিখ্যাত।

বি. ব.

রদ্যাঁ, ওগুস্ত্ [১৮৪০—১৯১৭]

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর। ভাস্কর্যশিল্পকে তিনি এর অতীতের যাবতীয় ছকে-বাঁধা রীতিপদ্ধতি থেকে মুক্তি দিতে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট ভাস্কর্যকর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেগুলোর দেহাবয়বের সমস্ত অংশ জুড়ে তাদের অন্তর্জাত আবেগ-অনুভূতি বা অভিব্যক্তিসমূহকে বাঙ্ময় করে তোলা। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকর্মে এর সুস্পষ্ট ছাপ অঙ্কিত।

তাঁর পুরো নাম ফ্রাঁসোয়া ওগুস্ত্ রনে রদ্যাঁ (Francois Auguste René Rodin)। ১৮৪০ সালের ১২ই নভেম্বর তিনি প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক জন সাধারণ পুলিশ কর্মচারী। মাতার উৎসাহে তিনি শিল্পী হবার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি শিল্পকলা বিদ্যালয় একোল্ নাৎসিওনাল্ দ্য দ্যস্যাঁ-তে ড্রয়িং ও ভাস্কর্যশিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এক বছরের ভেতরে রদ্যাঁ মোট তিন তিন বার শিল্পকলা শিক্ষার বিশিষ্ট শিক্ষাপীঠ একোল্ দে বোজার্ৎ-এ (Ecole des Beaux-Arts) ভর্তি হতে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব তাঁকে ভাস্কর হিসাবে নিজস্ব রীতিপদ্ধতি উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ করে।

১৮৬৩ সালের পর থেকে দুই দশক কাল পর্যন্ত তিনি নানা ধরনের কাজ করার পাশাপাশি লুভ্র্ মিউজিয়ামে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় তিনি

www.pathagar.com

মিকেলাঞ্জেলোর (দ্র) ভাস্কর্যকর্ম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৭৫ সালে তিনি ইতালিতে যান এবং আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর ভাস্কর্যগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর কাছ থেকেই তিনি মানবদেহের নাটকীয়তার বিষয়টি শেখেন। তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে রদ্যাঁকে বিপ্লবী হতে সাহায্য করে নিজের জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং প্রথাবদ্ধ রীতিতে কাজ না করার গভীর সঙ্কল্প। ১৮৭৭ সালে তাঁর প্রথম ভাস্কর্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

রদ্যাঁর বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ্য ম্যান উইথ দ্য ব্রোকেন নোজ', 'দ্য এইজ অব ব্রোঞ্জ', 'দ্য ডিফেন্স', 'দ্য বাবার্গার্স অব কালে', 'দ্য থিঙ্কার', 'দ্য গেট্‌স্ অব হেল', 'দ্য কিস', 'দ্য শেড্‌স্', 'দ্য প্রোডিগাল সন', 'দ্য ক্রোচিং উওম্যান', 'দ্য হেড অব সোরো', 'দ্য মেডিটেশন' ইত্যাদি। রদ্যাঁর শিল্পকর্ম তাঁর জীবৎকালেই প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় তোলে। তিক্ত সমালোচনা দিনের পর দিন তাঁকে সহ্য করতে হয়। তবু তিনি তাঁর সৃজনকর্মে আত্মনিবেদিত থাকেন।

শিল্পী রঁদ্যার ভাস্কর্য দা থিঙ্কার

শিল্পী রঁদ্যার ভাস্কর্য দা সিক্রেট

রদ্যাঁ ১৯১৭ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর এক বছর আগে তিনি তাঁর যাবতীয় শিল্পকর্ম তুলে দিয়ে যান ফরাসি সরকারের হাতে। তাঁর সম্মানে প্যারিস শহরে গড়ে উঠেছে 'ম্যুজি রদ্যাঁ' বা 'রদ্যাঁর মিউজিয়াম' নামের একটি জাদুঘর, যেখানে রক্ষিত আছে তাঁর প্রধান শিল্পকর্মের অনেক কিছুই।

আ. হ.

রফিকুদ্দিন আহমদ [১৯২৬—১৯৫২]

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) অন্যতম শহীদ,

www.pathagar.com

সম্ভবত প্রথম শহীদ। সেই বছর একুশে ফেব্রুয়ারি (দ্র) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনুষ্ঠিত ছাত্রবিক্ষোভের সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে মাথায় বুলেটবিদ্ধ হয়ে

রফিকুদ্দিন ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। বিচূর্ণমস্তক রফিকুদ্দিনের রক্তাক্ত লাশ স্ট্রেচারে করে প্রথমে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, পরে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ দিনই গভীর রাতে পুলিশ পাহারায় তাঁকে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর সমাধি সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করায় এখন আর তা চিহ্নিত করার উপায় নেই।

রফিকুদ্দিনের জন্ম বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সিঙ্গাইর থানার পারিলগ্রামে, ১৯২৬ সালের ৩০শে অক্টোবর। পিতা আবদুল লতিফ, মাতা রাফিজা খাতুন। ১৯৫২ সালে রফিকুদ্দিন ছিলেন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে, আই. কম. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বাবুবাজার এলাকায় আকমল খাঁ রোডে পারিল প্রিন্টিং প্রেস নামে তাঁদের একটি ছাপাখানা ছিল। পরে নাম পাল্টে হয় 'কর্মাশিয়াল প্রেস'। পড়াশোনার ফাঁকে ঢাকায় এসে রফিকুদ্দিন প্রেসের কাজকর্মও দেখাশোনা করতেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় থাকার কারণে আন্দোলন ও মিছিলের টানে মেডিক্যাল হোস্টেলপ্রাঙ্গণে ছাত্রদের সঙ্গে জড়ো হয়েছিলেন।

১৯৫২ সালের ২৭শে মার্চ (মতান্তরে ২৮শে মার্চ) রফিকের মামাতো ভাই মশাররফ হোসেন খান ঢাকা সদর মহকুমা হাকিম এন. আহমদের এজলাসে রফিকুদ্দিনকে গুলি করে মারার অপরাধে ঢাকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশী, সিটি এস. পি. মাসুদ মাহমুদ, পুলিশের ডি. আই. জি. এ. জেড. ওবায়দুল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু হাকিম মামলা গ্রহণ করতে রাজি হন নি।

আ. র

রবিন্ হুড্ (Robin Hood)

রবিন্ হুড্ চরিত্র ইংল্যাণ্ডের লোককাহিনীর এক নায়ক। এই নামে সত্যি সত্যিই কেউ ছিলেন কিনা বলা মুশকিল। পণ্ডিতেরা বলেন দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রবিন্ হুডের গল্প ধীরে ধীরে প্রচারলাভ করে এবং বীর, দয়ালু, গরিবের বন্ধু আর বড়লোকদের দুশমন হিসাবে এই চরিত্র লোকজনের মনে গেঁথে যায়। উত্তর ইংল্যাণ্ডে 'রবিন্ হুড্ বে' নামের জায়গাটি তাঁর স্মৃতি ধারণ করে আছে বলে লোকে বিশ্বাস করে।

বাংলা লোককাহিনীতেও এ জাতীয় চরিত্র রয়েছে, যেমন রঘু ডাকাত। তবে আধুনিক কালে রোমাঞ্চকর কাহিনীর লেখক শশধর দত্ত একটি চরিত্র রবিন্ হুডের আদলে তৈরি করেছেন, তার নাম দস্যু মোহন।

হা. মা.

রবিন্‌সন্ ক্রুসো (Robinson Crusoe)

ইংরেজ ঔপন্যাসিক ড্যানিয়েল ডিফো (দ্র) রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ এবং ঐ গ্রন্থের প্রধান চরিত্র। রচনাকাল ১৭১৯ সাল। স্কটল্যাণ্ডবাসী নাবিক আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের (১৬৭৬–১৭২১) দুঃসাহসিক অভিযান রবিন্‌সন্ ক্রুসোর গল্পের উপাদান। রবিন্‌সন্ ক্রুসো সমুদ্রযাত্রা করে জাহাজ ডুবিতে একটি নির্জন দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা অবলম্বন করে ডিফো তিন খণ্ডে রবিনসন্ ক্রুসো রচনা সমাপ্ত করেন। এই তিন খণ্ডের নাম–'The Life and Strange

www.pathagar.com

Surprising Adventures of Robinson Crusoe' (১৭১৯)', 'Further Adventures' (১৭১৯)', 'Serious Reflections of Robinson Crusoe' (১৭২০)।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের শক্তির জয় এই গ্রন্থের মূল বিষয়। এই বই রচিত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় তিন শ' বছর ধরে জনপ্রিয় হয়ে আছে। এই বইয়ের অনুকরণে সুইজারল্যাণ্ডের লেখক ইওহান্ রুডোল্ফ্ ভিস্ (Johann Rudolf Wyss) লেখেন তাঁর বিখ্যাত বই 'ডের শ্ভাইট্সেরিশে রোবিন্সন্' মোট ৪ খণ্ডে যেটি 'সুইস ফ্যামিলি রবিন্সন্' নামে ইংরেজি অনুবাদে পৃথিবীব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে।

এ দু'টি বই-ই বাংলা ভাষায় অনূদিত ও বহুল পরিচিত।

বি. ব.

রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র ট্রাস্ট

বাংলা সাহিত্যের (দ্র) সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র)-এর জীবন, সৃষ্টি ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সর্বাঙ্গীণ চর্চার উদ্দেশ্যে গঠিত বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এটি ট্রাস্ট হিসাবে নিবন্ধীকৃত। ট্রাস্টি পর্ষদ ছাড়াও এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে দেশের অন্যতম রবীন্দ্রগবেষকদের নিয়ে গঠিত পরিচালনা পরিষদ।

রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি এবং চিন্তা ও অন্যান্য কর্মের উপর সেমিনার ও বক্তৃতামালার অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রগবেষণার সহায়তাদান ও গবেষণামূলক গ্রন্থাদি প্রকাশ, রবীন্দ্রগ্রন্থাগারে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থা, নিয়মিত মুখপত্র 'রবীন্দ্র-চর্চা' প্রকাশ, রবীন্দ্রসাহিত্য শিক্ষা কার্যক্রম। শিলাইদহ (দ্র), সাজাদপুর (দ্র) ও পতিসর (দ্র) নিয়ে রবীন্দ্র-স্মৃতিভত্তিক প্রামাণ্যচিত্র (শর্ট ফিল্ম) তৈরির কাজ সম্প্রতি শেষ করা হয়েছে।

আ. র.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১—১৯৪১]

ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভা। আধুনিক বাংলা ভাষার তিনি স্থপতি, বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, বাংলা ছোটগল্পের জনক, আধুনিক নাটক ও নাট্যকলার জন্মদাতা এবং বাঙালি জাতির সর্বোত্তম সঙ্গীতপ্রতিভা। বর্তমান বাঙালি সংস্কৃতি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মসাধনায় পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীতে 'বিশ্বকবি', 'গুরুদেব' এবং 'কবিগুরু' নামে তিনি সার্বজনীনভাবে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কলিকাতা (দ্র) শহরে জোড়াসাঁকো অঞ্চলের ঠাকুরপরিবারে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে) তারিখে। তাঁর পিতামহ ছিলেন ধনাঢ্য জমিদার 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর (দ্র), এবং পিতা 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও মা সারদাসুন্দরী দেবী। এই ঠাকুরপরিবারটি ছিল 'পিরালি' ব্রাহ্মণ বংশ। এর অর্থ, তাঁরা ব্রাহ্মণ বা উচ্চবংশীয় হলেও পতিত হয়েছিলেন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁদের নিচু চোখে দেখতেন ও বিবাহাদি কোনো সামাজিক সম্পর্ক করতেন না। কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধে দেখা দেয় নি, কারণ পরিবারটি প্রথমত বিত্তবান ছিল, দ্বিতীয়ত ছিল শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান ও রুচিশীল। এই পরিবারে মোগলাই ঐতিহ্যের সূত্রে মুসলিম সংস্কৃতি, দেশীয় ঐতিহ্যের সূত্রে হিন্দু সংস্কৃতি এবং দেশের শাসকগোষ্ঠী ইংরেজদের ঐতিহ্যসূত্রে ইউরোপীয় সংস্কৃতি এসে সম্মিলিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ তো প্রচলিত হিন্দুধর্মের (দ্র) সংস্কার পরিত্যাগ করে 'রাজা' রামমোহন রায় (দ্র) প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম (দ্র)-মত গ্রহণ করেছিলেন। তখন থেকে দেবেন্দ্রনাথের বংশ ব্রাহ্ম পরিবার হয়ে যায়। ব্রাহ্মেরা প্রতিমাপূজা করেন না, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং তাঁরা প্রার্থনার সময়ে সমস্ত ধর্মেরই (যেমন— ইসলাম, খ্রিস্টীয়, বৌদ্ধ, হিন্দু) শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে পাঠ করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ এরকম একটি সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদী, আধুনিক, মননশীল, সংস্কৃতিমনা, ধার্মিক পরিবারে জন্মেছিলেন— এই তথ্য সর্বদা স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

তিনি স্ব-শিক্ষিত ছিলেন। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখিয়ে 'শিক্ষিত' করার অনেক চেষ্টা তাঁর গুরুজনেরা করেছিলেন, কিন্তু ধরাবাঁধা লেখাপড়ার দিকে কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না। মাত্র ৩ বছর ১০ মাস বয়সে তাঁকে একটা স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল, নাম—ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমী। এর পরে ভর্তি হয়েছিলেন যেখানে তার নাম ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট পাঠশালা, লোকে বলত নর্মাল স্কুল। তার পরে ক্রমান্বয়ে বেঙ্গল একাডেমী, মেট্রোপলিটান স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল—এত ক'টা বিদ্যালয়ে গেলেও পড়াশোনা কিছু এগোয় নি, পরীক্ষা পাশও হয় নি। বাড়ির লোক ভয় পেয়ে শেষে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিলেন। সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দর শহর ব্রাইটনের একটা পাবলিক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু লেখাপড়া এখানেও হয় নি। শেষে ব্রাইটন থেকে লণ্ডনে (দ্র) নিয়ে গিয়ে ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি করানো হল। তবু শেষ পর্যন্ত তাও ব্যর্থ হয়েছিল। আসলে তিনি ভয় পেতেন পড়াশোনাকে নয়, মাস্টারকে। নইলে, নিজের ইচ্ছায় বই তিনি ছেলেবেলা থেকেই সারা জীবন ধরে পড়েছেন। তাঁর মতো বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত লোক খুব কমই দেখা যেত। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি তিনটি ভাষাই উত্তমরূপে জানতেন। জার্মান ভাষাও জানতেন যৎসামান্য।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয় বাল্যকালে, মাত্র আট বৎসর বয়সে। তেরো বছর বয়স থেকে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর প্রথম রচনা ছিল 'বনফুল' (১৮৮০), একটি কাব্য-উপন্যাস; প্রকাশিত হয়েছিল 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামে একটি পত্রিকায়। প্রথম যখন ইংল্যাণ্ড গেলেন সতেরো বৎসর বয়সে, তার পূর্বেই শুধু কবিতাই নয়, কাব্যনাট্য, গান, গল্প (দ্র) ও প্রবন্ধ (দ্র)

(১) কৈশোরে র২) তারুণ্যে (৩) যৌবনে রএবং (৪) প্রৌঢ়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইত্যাদি তিনি লিখছেন এবং সেসব প্রকাশিত হচ্ছে নানান পত্রপত্রিকায়। এমনকি বিলেতে বসবাসের সময়ে চমৎকার চিঠি লিখতেন বাড়িতে। সেগুলো ছাপা হত ঠাকুরবাড়ি থেকেই প্রকাশিত পত্রিকা 'ভারতী'-তে, পরে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে বই হয়ে (১৮৮১) বেরিয়েছিল। এটি তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ।

প্রায় কিশোর বয়সে দেশের বাইরে থাকায় প্রকৃতপক্ষে যে লাভ হয়েছিল তা পরীক্ষা পাশের চেয়ে ঢের বেশি। তিনি বাঙালি ঘরের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে চোখ মেলে তাকাতে শিখেছিলেন, তাঁর কৌতূহল উদ্দীপিত হয়েছিল, বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে তুলনা করে ভাল মন্দ যাচাইয়ের বুদ্ধি ও

www.pathagar.com

সাহস তৈরি হয়েছিল, তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও নৃত্যে তালিম নিয়েছিলেন। এই কিশোরটি পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ নামে যে মহাশিল্পীতে রূপান্তরিত হবেন সেখানে এই সমস্ত কিছুই সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল। উপরন্তু পরবর্তী ষাট বৎসর (অর্থাৎ আশি বৎসর তিন মাস বয়সে তার মৃত্যু পর্যন্ত) তিনি যে ক্লান্তিহীনভাবে অজস্র রকমের কর্মসাধনায় পরিশ্রম করে যেতে পেরেছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণা পশ্চিমী সংস্কৃতি ও জনজীবন থেকে লাভ করেছিলেন। বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ আলস্য, অস্থিরতা, লক্ষ্যহীনতা রবীন্দ্রনাথে সম্পূর্ণত অনুপস্থিত।

বিলেত প্রত্যাগত কিশোর বাড়িতে ফিরেই লেখালেখি, গান আর নাটকের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। ঠাকুরবাড়ির চালচলন এমনিতেই ছিল একটু ভিন্নরকম। তার ওপর এই পরিবারে একই সময়ে এক সঙ্গে এত সৃষ্টিশীল প্রতিভা জন্মেছিলেন যে তা সত্যিই বিস্ময়কর। সবচেয়ে বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ছিলেন দার্শনিক, অঙ্কবিদ ও কবি। ন' দাদা (অর্থাৎ ঠিক আগের বড় ভাই, যদিও এগারো বছরের বড়) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) গান লিখতেন ও গাইতেন, নাটক লিখতেন, অভিনয় করতেন, ফরাসি খুব ভাল জানতেন ও অনেক অনুবাদ করেছিলেন। ভাইদের মধ্যে এর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই রকম নানা গুণের গুণী একেক জন। বাড়ির ভিতরে গানের মজলিশ, অভিনয়ের মহড়া, নাটক মঞ্চায়ন প্রায় লেগেই আছে। বাড়ির মধ্যেই আছে বিশাল গ্রন্থাগার, আছে আর্ট গ্যালারি। রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসে এই সাংস্কৃতিক প্রাণচাঞ্চল্যের একেবারে মাঝখানে পড়ে গেলেন; শুধু তাই নয়, তিনিই ক্রমে ক্রমে এসবের মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। শিল্পক্ষেত্রে এই যে বিচরণ, জীবনব্যাপী আর তা ব্যাহত হয় নি। তাঁর সৃজনশীলতার প্রাথমিক সাক্ষ্য হল তাঁর সৃষ্টির বিপুলতা : গান ও কাব্যনাট্য বাদ দিয়ে ৬৫টি কাব্যগ্রন্থ, গান ২৫০০, ছোটগল্প ১১৯টি; নানা ধরনের নাটক ৫০টি; ভ্রমণকাহিনী ৯টি; শিশুসাহিত্য ৯টি; চিঠিপত্র কয়েক হাজার, প্রবন্ধ-আলোচনা-ভাষণের বই অন্ততপক্ষে ২০টি, ছবি এঁকেছিলেন ২ হাজারের মতো। এই ব্যাপ্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গভীরতা। ফলে তাঁর যে কোনো সৃষ্টি শিল্পমানের বিচারে চিরকালীন ও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। বস্তুতপক্ষে ভাস্কর্য ব্যতীত শিল্পের সমস্ত মাধ্যম নিয়ে তিনি

বিলেতে ছাত্রাবস্থায় ১৭ বছরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চর্চা করেছিলেন এবং সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

তাঁর বয়স যখন বাইশ বৎসর তখন যশোর জেলার মেয়ে ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঠাকুর-পরিবারে এসে কনের এই সেকেলে নাম পাল্টে গিয়ে হয়ে দাঁড়ায় মৃণালিনী দেবী। তাঁদের পাঁচ ছেলেমেয়ে হয়েছিল। মৃণালিনী দেবী বেশিদিন বাঁচেন নি। দশ বছরের মেয়ে ঠাকুরবাড়ির বৌ হয়ে এসেছিলেন, উনত্রিশ বছর বয়সে চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ। তিনি আর দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ পত্নীপ্রেমিক স্বামী ও সন্তানবৎসল পিতা ছিলেন। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের কোনো বংশধর জীবিত নেই।

বিবাহ করার সমকালে তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। জমিদারি দেখার দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে

www.pathagar.com

পড়েছিল। ঠাকুর-পরিবারে জমিদারি ছড়ানো ছিল উড়িষ্যায় এবং মধ্যবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে। বঙ্গদেশে এই জমিদারির সবটুকুই আজ এখনকার বাংলাদেশের (দ্র) ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে— সিরাজগঞ্জ জেলার (তখন ছিল পাবনা জেলায়) সাজাদপুর (দ্র), নওগাঁ জেলার (তখন ছিল রাজশাহী জেলায়) আত্রাই থানায় পতিসর (দ্র)। এগুলো সব ঘুরে-ঘুরে তাঁকে দেখতে হয়েছিল—নদীমাতৃক বাংলার প্রকৃতি ও গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তাঁকে চিরকালীন বাঙালি, তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, তার লৌকিক জীবনধারা ও অদৃশ্য মনোজগৎ ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিল। তাঁর ছোটগল্পে ও চিঠিপত্রে এর স্বাক্ষর আছে। এ ছাড়া দেশসেবামূলক তাঁর সব ধরনের কর্মকাণ্ডের— যেমন শান্তিনিকেতন (দ্র) ও শ্রীনিকেতন স্থাপন— পিছনে চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল এই অভিজ্ঞতা। কারণ গ্রামবাংলায় দারিদ্র্য, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, বুদ্ধির জড়ত্ব ইত্যাদির পাশাপাশি হৃদয়ের সারল্য, স্বাভাবিক নীতিজ্ঞান ও সংবেদনশীল হৃদয় তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়েই, বাঙালি জাতির সুপ্ত শক্তিকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। এর ফলে তাঁর নিজস্ব জীবনচর্চায় ও শিল্পরচনায় ক্রমান্বয়ে যা কিছু তিনি করে গেলেন সেসবেরই যোগফল আজ বাঙালি সংস্কৃতির একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ ও কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে।

তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন এবং ১৯০৫ সলের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (দ্র) কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর আগেই বীরভূম জেলার বোলপুর গ্রামে একটি নির্জন প্রান্তরে তিনি জনশিক্ষার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। জায়গাটি ছিল পৈতৃক সম্পত্তি। মহর্ষি একটি পাকা বাড়ি সেখানে তৈরি করেছিলেন, নাম 'শান্তিনিকেতন'। 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে স্কুলটি রবীন্দ্রনাথ এই বাড়িতেই চালু করেছিলেন। ছাত্রছাত্রী বলতে নিজের ছেলেমেয়ে আর এদিক-ওদিক থেকে আরো দু'চার জন। শান্তিনিকেতন নামটি আজ বিশ্ববিখ্যাত আর ঐ পাঠশালা আজ 'বিশ্বভারতী' (দ্র) বিশ্ববিদ্যালয়। এই রূপান্তর পরবর্তী কালের ঘটনা নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকালেই এভাবে এসব বিকশিত করে যেতে পেরেছিলেন।

সাহিত্যে তিনি নোবেল পুরস্কার (দ্র) পান ১৯১৩ সালে। যে বইকে উপলক্ষ করে এই পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করা হয় তার নাম 'গীতাঞ্জলি' (দ্র)। এই বই বাংলা 'গীতাঞ্জলি' নয়। 'গীতাঞ্জলি', 'খেয়া', 'নৈবেদ্য', 'শিশু' প্রভৃতি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা বেছে নিয়ে তিনি নিজে সেগুলো অনুবাদ করেন ইংরেজিতে, অনুবাদগুলো এক সঙ্গে গেঁথে বই হিসাবে ছাপা হয়ে বেরয় লণ্ডন থেকে ১৯১২ সালে, নাম Gitanjali (The Song Offerings)। ভূমিকা লিখে দেন সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েট্স্ (দ্র)। এই অনুবাদ মৌলিক ইংরেজি কবিতা হিসাবেই কাব্যমূল্য পেয়েছিল সেদিন।

পুরস্কার লাভের পর থেকে তাঁর কর্মব্যস্ততা এবং কবি ও চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁর দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছিল বিপুলভাবে। তাঁর জীবৎকালে পৃথিবীতে এমন কোনো মহৎ শিল্পী বা মানবতাবাদী ভাবুক ছিলেন না যাঁদের সঙ্গে তাঁর সখ্য বা আলাপ-পরিচয় বা ভাববিনিময় ঘটে নি। দেশে দেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁকে সম্মানসূচক উপাধি দিয়েছে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। সেই যুগে যখন বিদেশযাত্রা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ছিল, তখন তিনি সর্বমোট ১২ বার বিদেশ গিয়েছিলেন : প্রথমে ১৭ বৎসর বয়সে (১৮৭৮) ইংল্যাণ্ডে, আর সর্বশেষ ৭১ বৎসর বয়সে (১৯৩২) মধ্যপ্রাচ্যে (দ্র)। অস্ট্রেলিয়া (দ্র) ও অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) ব্যতীত সব ক'টি মহাদেশেরই বিভিন্ন দেশ তাঁকে পরিক্রমণ করতে হয়েছিল। সব জায়গায় তাঁর এই চাহিদার পিছনে তাঁর কবিখ্যাতি মুখ্যত কাজ করলেও তা প্রধান কারণ ছিল না; প্রধান কারণ ছিল মানবতাবাদী দার্শনিক ও বিশ্বশান্তি-প্রচারক হিসাবে তাঁর পৃথিবীজোড়া স্বীকৃতি।

রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনীষা তো বটেই, পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিত্বদেরও এক জন। কিন্তু বাঙালির জীবনে তাঁর অবদানের বিশালতা, গভীরতা ও বৈচিত্র্য কোনো অ-বাঙালির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তিনি একাই তাঁর শিল্পসাধনা, কর্মোদ্যোগ ও চিন্তাধারা দ্বারা পশ্চাৎপদ তাঁর জাতিটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের সমকক্ষ করে দিয়ে গেছেন। বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনন্যতা ও বৈভব বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশবাসীর জন্য এই স্বীকৃতি আদায় তাঁর অন্যতম কীর্তি, তবুও এ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান নয়। তাঁর

www.pathagar.com

সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান এখানেই যে তিনি বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য, শিল্পকলা ও শিল্পচেতনা, বাঙালির মননশীলতা ও বোধশক্তি ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে নতুনভাবে নির্মাণ করে দিয়েছেন।

তিনি বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি নতুন ধারারই সৃষ্টি করেছেন, যেমন : ছোটগল্প (দ্র), কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপকনাট্য, পত্রসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, গদ্যকবিতা ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাস (দ্র) (যেমন 'চোখের বালি' 'যোগাযোগ' 'ঘরে বাইরে' 'চতুরঙ্গ' 'চার অধ্যায়' 'গোরা') বাংলা উপন্যাসের ধারায় মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক-রাজনৈতিক, মননপ্রধান উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে। ছোটগল্প-রচয়িতা হিসাবে তিনি বিশ্বের প্রথম সারির কয়েক জন সাহিত্যিকের অন্যতম। তাঁর গল্পের সমগ্র ভাণ্ডার ৪ খণ্ড 'গল্পগুচ্ছ', 'সে', 'গল্পসল্প', 'তিনসঙ্গী' ও 'লিপিকা'—বইগুলোতে পাওয়া যাবে। তাঁর গল্পাবলির মধ্যে কাবুলিওয়ালা, নষ্টনীড়, শাস্তি, পোস্টমাস্টার, স্ত্রীর পত্র, মধ্যবর্তিনী প্রভৃতি কাহিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পসমূহের অন্তর্গত। তাঁর রচিত নাট্যমালায় 'বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'তাসের দেশ', 'রক্তকরবী', 'রাজা' প্রভৃতি বিশ্বনাট্যের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তিনি সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইয়ের বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে। বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ সম্বন্ধেও তাঁর ব্যাপক অন্বেষা ও উপলব্ধি লিপিবদ্ধ রয়েছে 'শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' নামক গ্রন্থে।

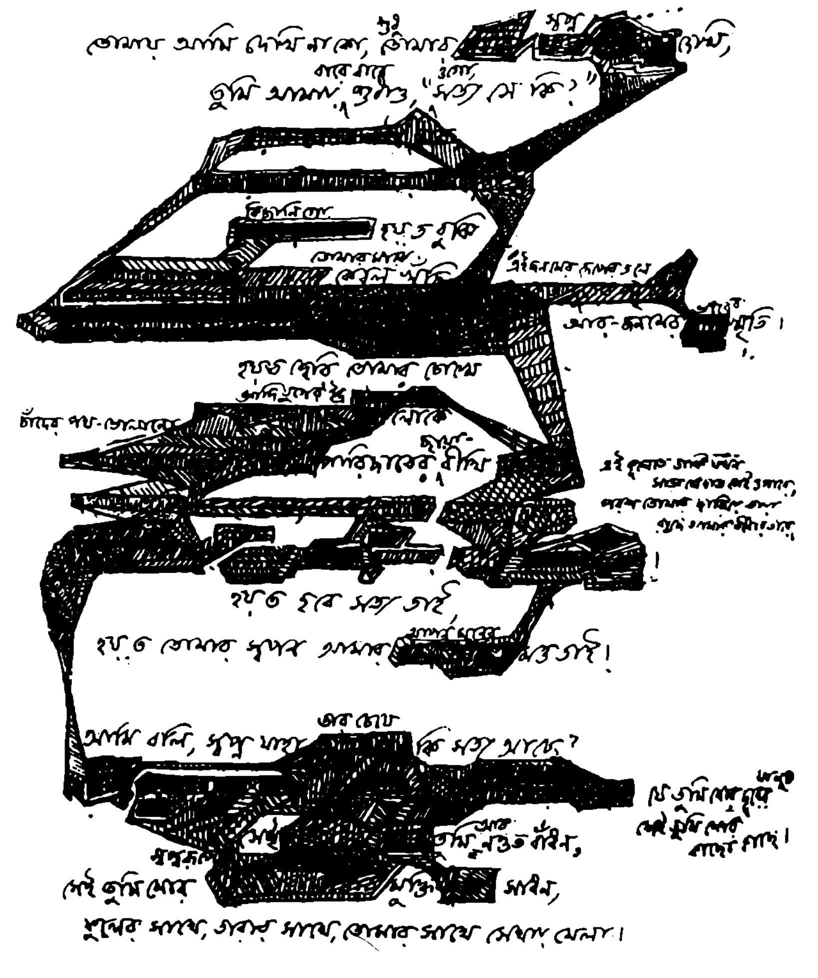

কবিতা লিখতে গিয়ে কাটাকুটি করে এঁকে ফেলেছেন ছবি

পল্লীসমাজ, আমাদের সামাজিক ইতিহাসের বিকাশধারা, গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষাপ্রসার, শিক্ষাদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা ছিল, এবং সেসব তিনি যেমন তাঁর অজস্র রচনায় লিখে গেছেন তেমনি হাতেকলমে করেও দেখিয়েছেন জমিদারি

www.pathagar.com

চিত্রী রবীন্দ্রনাথের আঁকা তিনটি ছবি

ছবি আঁকছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হৈ রৈ রৈ মারহাট্টা

হুকুম শুনেই গা বমি বমি....

মালাবারের কন্যা

www.pathagar.com

চালানোর সময়ে ও শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে।

অকল্পনীয় ঘটনাবহুল, কর্মময় ও বর্ণাঢ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন। সেই জীবনের কিছু তিনি লিখে রেখে গেছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' বইতে এবং কয়েক হাজার চিঠিপত্রের ভিতরে নানান প্রসঙ্গে। তা ছাড়া যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তাঁদের অসংখ্য স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত আলেখ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ নামক যে মানুষটির সামগ্রিক চেহারা ফুটে ওঠে তিনি শুধু মহত্তম মানের এক জন শিল্পী নন, তিনি এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ড সমস্ত কিছুকে শিল্পকর্ম হিসাবে গণ্য করতেন। তিনি মনে করতেন, মানুষ বিশ্ববিধানের অন্তর্গত এক মহাজীবনের অংশ, মনুষ্যত্ব ও ভালবাসার তাই কোনো ক্ষয় নেই, মনুষ্যধর্ম ঠিক মতো বিকশিত হলে ধূলিময় পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য আনা সম্ভব।

এই মহাদ্রষ্টার জীবনাবসান ঘটে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট) দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে—যেখানে তিনি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলেন ৮০ বছর ৩ মাস পূর্বে।

হা. মা.

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা শহরে অবস্থিত। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) পৈতৃক নিবাস জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটি সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্য একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েই রাজ্যসরকার কবির নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি রাজ্যসরকারের অধীনে আনা হয় এবং ১৯৬২ সালে কবির ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই ও সাময়িকীর আনুমানিক সংখ্যা ৮৩,০৭১টি। গবেষণার সুবিধার জন্য এ ছাড়াও রয়েছে একটি অসাধারণ জাদুঘর। জাদুঘরটি তিনটি ভাগে বিন্যস্ত। একটি অংশ শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত। এখানে কবি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি সহ বইপত্র রয়েছে। অন্য একটি অংশে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি—যা এখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ঠাকুর ছাড়া ঠাকুরপরিবারেরর অন্যান্য সদস্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি। এবং তৃতীয় অংশে রয়েছে উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের ধারা। এ ছাড়াও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সম্পদ এর চিত্রশালা। এই চিত্রশালায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ ঠাকুর-পরিবারের চিত্রশিল্পী সদস্যদের আঁকা ছবির একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে। ঠাকুরবাড়ি ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি ক্যাম্পাস রয়েছে, তা অবস্থিত ব্যারাকপুরে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবর্ষ জুন মাসে আরম্ভ হয়। বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং সম্মানসহ স্নাতক, এম. এ., এম. ফিল., পিএইচ. ডি, ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে। ডিপ্লোমা পর্যায়ে ভারতের ৬৬টি প্রতিষ্ঠান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। কলা, চারুকলা এবং দৃশ্যকলা এই তিনটি অনুষদে যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হচ্ছে: (১) কলা অনুষদ—বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান; (২) চারুকলা অনুষদ—নৃত্য, নাটক, যন্ত্রসঙ্গীত, কণ্ঠসঙ্গীত; এবং (৩) দৃশ্যকলা (Visual Arts) অনুষদ—গ্রাফিক্স, শিল্পকলার ইতিহাস/প্রায়োগিক শিল্পকলার (Applied Art) ইতিহাস, চিত্রকলা, ভাস্কর্য। এ ছাড়া রয়েছে Centre for Study

www.pathagar.com

and Research on Tagore নামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর গবেষণাকেন্দ্র।

মে. খা.

রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) গান। গানের বাণী ও সঙ্গীত উভয়ই রবীন্দ্ররচিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত সংখ্যায় ২৫০০-এর মতো। ১৮৭৫ সালের দিকে ১৪ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম গান রচনা করেন। 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ' ও 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গান দু'টি রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত গান। তবে ১৮৮১ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত আরম্ভ করেন বলে ধরে নেওয়া হয়, কেননা তখন থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে জানা যায়। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনাকাল ৬১ বছর বিস্তৃত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয় : ১৮৮১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রথম যুগ; ১৯০১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ এবং ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তৃতীয় যুগ বিস্তৃত।

প্রথম যুগকে বলা হয় প্রস্তুতি যুগ। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত প্রচলিত বিখ্যাত হিন্দি ধ্রুপদ (দ্র) ও খেয়াল (দ্র) গানের অনুসরণে বাংলায় গান রচনা করেন। এই ধরনের গানকে বলা হয় 'ভাঙা গান'। ভাঙা গানে রবীন্দ্রনাথ মূলত সুর অনুসরণ করেছেন, বাণী রচনা করেছেন স্বাধীনভাবে। হিন্দি রাগসঙ্গীতের সংগ্রহটি ঠাকুরবাড়িতেই ছিল। সে বাড়িতে নিয়োজিত ওস্তাদদের সংগ্রহে ছিল, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সংগ্রহে ছিল। ভাঙা গান রচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিপুলভাবে লাভবান হয়েছিলেন। এর ফলে এক দিকে যেমন তিনি রাগসঙ্গীতরীতি ও বিখ্যাত সব রাগসঙ্গীত রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান, অন্য দিকে নিজের সঙ্গীত রচনার ভিত্তিটিও গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় যুগকে বলা হয়েছে পরীক্ষার যুগ। এই যুগে এসে রবীন্দ্রনাথ ভাঙা গান রচনার ধারা প্রায় ত্যাগ করে রাগ-সঙ্গীতের ভিত্তিতে মৌলিক সঙ্গীত রচনায় ব্রতী হন। এই যুগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। বাংলা লোকসঙ্গীত (দ্র), বিশেষত বাউল সম্পর্কেও এই যুগে তাঁর মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয়।

ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চ প্রভৃতি তালও রবীন্দ্রনাথ এই যুগে রচনা করেন।

তৃতীয় যুগকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার পরিণতির যুগরূপে চিহ্নিত করা হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে যে একটি বৈশিষ্ট্যময় সঙ্গীতরীতি বোঝায়, তা এই যুগে বিকাশ লাভ করে। রাগসুর ও লোকসুর, বিশেষত বাউল মিলনে এই বৈশিষ্ট্যময় সঙ্গীতরীতি গঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর সঙ্গীতরচনাকে পূজা, স্বদেশ, প্রেম ও প্রকৃতি এই চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক নামেও দু'টি বিভাগ রয়েছে। পূজা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রায় ৬৫০টি গান রচনা করেন। এগুলো ব্রহ্মসঙ্গীত—এক, অদ্বিতীয় ও নিরাকার ঈশ্বরের স্তবগান। রাজা রামমোহন রায় (দ্র) ব্রাহ্মসমাজ (দ্র) স্থাপন করে এই গানের ধারাটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূজাশ্রেণীর গানে ব্রাহ্মসঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এই গানের কেন্দ্রীয় রূপটি ধ্রুপদ। তিনি নিজেও ভাল ধ্রুপদ গাইতেন। পূজা পর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ সংখ্যক ভাঙা গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান অন্যান্য শ্রেণীর গানের চেয়ে সংখ্যা অনেক কম। দেশাত্মবোধক গান দিয়ে তাঁর সঙ্গীতরচনার হাতে খড়ি হলেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (দ্র) শেষ হয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ অতি সামান্যই দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়টি গড়ে ওঠে। অল্প সময়ের ব্যবধানে সে সময় তিনি প্রায় ২৫টি বিখ্যাত স্বদেশী গান রচনা করেন। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি রবীন্দ্রনাথ সে সময়েই রচনা করেছিলেন। দেশাত্মবোধক গানে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে লোকসঙ্গীতের সুর ব্যবহার করেন।

বাংলা গানের ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গান। একে ঋতুসঙ্গীতও বলা হয়। ছয় ঋতুতে বাংলাদেশের প্রকৃতির যে বৈচিত্র্য তা রবীন্দ্রনাথের ঋতুসঙ্গীতে যেমন পাওয়া যায় তেমন আর কারো রচনায় পাওয়া যায় না। এ শুধু নানা ঋতুতে বাইরের প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন তারই গান নয়, মানুষের মনের প্রতিক্রিয়াকেও

www.pathagar.com

অত্যন্ত গভীরভাবে এই গানে অনুভব করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঋতুউৎসবের প্রবর্তন করে তিনি প্রকৃতির ডাকে মানুষকে মিলিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ঋতুসঙ্গীত সংখ্যায় ৩০০-র ওপর। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের সংখ্যা ৪০০-র কাছাকাছি। ব্রহ্মসঙ্গীতের মতো রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম দিক থেকে একেবারে শেষ অবধি এই শ্রেণীর গান রচনা করেছেন। বাংলা প্রেমের গানের অতি গভীর একটি রূপ তাঁর রচনায়ই প্রতিফলিত হয়েছে। নানা ধরনের অনুষ্ঠানের উপযোগী কিছু গান রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেসব গান, 'আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত' হিসাবে খ্যাত। সামাজিক এবং প্রাকৃতিক অনুষ্ঠানসমূহের যে গান আছে, সে যেন রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জানালেন এসব রচনায়। নববর্ষ, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, গৃহপ্রবেশ, শিল্পোৎসব, বিবাহ, জন্মোৎসব, মৃত্যুশোকপালন প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের উপযোগী গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন।

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল ধ্রুপদ। সে কথা তিনি নানা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন। ধ্রুপদ সঙ্গীতের গভীরতা, সংযম ও সঙ্গীত তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আধুনিক কালে অপর কোনো বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতা ধ্রুপদ সঙ্গীতকে এত নিবিড়ভাবে অবলম্বন করে সুর রচনা করেন নি। রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল কারণটি এখানেই নিহিত। ধ্রুপদের বাণী রচনার আদর্শ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথও চার স্তবকে গান রচনার আদর্শ প্রবর্তন করেন। স্থায়ী-সঞ্চারী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ–এই ক্রম অনুযায়ী গান রচনার রীতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়।

ক. গো.

রমযান রোজা দ্র

রমেশ শীল [১৮৭৭—১৯৬৭]

রমেশ শীল ১৮৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর গোমদণ্ডী গ্রাম। তাঁর পিতার নাম চণ্ডীচরণ শীল, মাতার নাম রাজকুমারী দেবী। শৈশবে তিনি বাউলের গান, পুঁথিপাঠ, মহররমের (দ্র) জারী প্রভৃতির মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন। ছাত্রজীবনে গানবাজনার প্রতি তাঁর ঝোঁক লক্ষ করা যায়। তিনি মাইজভাণ্ডারের (দ্র) পীরের শিষ্য ছিলেন। মাইজভাণ্ডারী গানকে তিনি জনপ্রিয় করে তোলেন। ১৯২২ সালে যে বিখ্যাত রেল ধর্মঘট হয় তাঁর পক্ষে তিনি ছড়া ও গান রচনা করে বিখ্যাত হন। শুধু

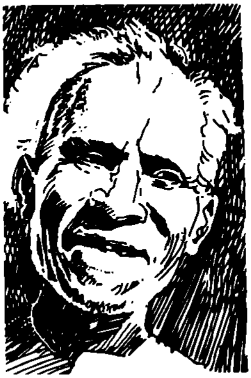

তাই নয়, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, সূর্য সেনের (দ্র) মহান আত্মত্যাগ ও প্রীতিলতার (দ্র) বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু তাঁকে গান রচনায় অনুপ্রাণিত করে এবং এসব নিয়ে তিনি বহু গান রচনা করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনেও (দ্র) তাঁর গৌরবময় ভূমিকা ছিল। ১৯৫৪ সালে তিনি জেলে বন্দিজীবন যাপন করতে বাধ্য হন। ১৯৫৪ সালের পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) যে নির্বাচন হয়, সে নির্বাচনী প্রচার-সভায় তিনি পৃথক নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে জ্বালাময়ী গান রচনা করেন। তাঁর চোখে হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। এই বিজয়ের পর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'। তিনি এ সম্মেলনে তাঁর দলসহ যোগদান করেন। তিনি ঢাকা স্টেডিয়ামে 'যুদ্ধ ও শান্তি' বিষয়ে কবিগান পরিবেশন করেন। এতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৫৭ সালে মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (দ্র) নেতৃত্বে কাগমারিতে এক সম্মেলন হয়। সেই কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে (দ্র) তিনি ফণী বড়ুয়া ও রাই গোপাল দাসের সঙ্গে কবিগান ও ছড়াগান পরিবেশন করেন। কবিগানের বিষয় ছিল কৃষক ও জমিদার। ১৯৫৯ সালে তিনি সরকারের সাহিত্যিক ভাতা পান। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বুদ্ধিজীবীরা জনগণের সহযোগিতায় তা সফল করার চেষ্টা করেন। ক্রমে ক্রমে তা তদানীন্তন সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক আন্দোলনে রূপ নেয়। রমেশ শীল এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬১–৬২ সালে বুলবুল একাডেমীর সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে এ সময় বুলবুল

www.pathagar.com

একাডেমী সংবর্ধনা দেয়। ১৯৬৪ সালে এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। তাতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি তো নষ্ট হয়ই, বিহারি মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানেরও সংঘর্ষ বেধে যায়। সবই ছিল তদানীন্তন কুখ্যাত সরকারের কারসাজি। রমেশ শীল এই কুকর্মের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন এবং জ্বালাময়ী গান রচনা করেন।

তিনি যথার্থই জনগণের বন্ধু ছিলেন এবং বহু উল্লেখযোগ্য গান রচনা করে শ্রেষ্ঠ কবিয়াল হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

রমেশ শীল ১৩৭৩ সনের ২৩শে চৈত্র মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হা.

রমেশচন্দ্র দত্ত

ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক ও রাজকর্মচারী। কলিকাতায় জন্ম, পিতার নাম ঈশানচন্দ্র দত্ত। ছাত্রজীবনে তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে বৃত্তি পেয়ে এফ. এ. (অর্থাৎ ফার্স্ট আর্টস) পাশ করেন। ঐ কলেজেই বি. এ. পড়াশোনার প্রায় শেষ পর্যায়ে ইংল্যাণ্ড চলে গিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষায় (১৮৬৯ খ্রি.) উত্তীর্ণ হন। এর পরে ব্যারিস্টার হন। চাকুরির ক্ষেত্রে সারা জীবন বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তবে, আই. সি. এস. হলেও সরকারি চাকুরি বেশি দিন করেন নি। একবার চাকুরি ছেড়ে বিলেত চলে গিয়ে সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেছেন, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণাতেও মনোনিবেশ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন প্রধানত তাঁর সৃজনশীল রচনা এবং অনুবাদ ও গবেষণাকর্মের জন্য। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস: 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'সংসার' প্রভৃতি। 'ইকনমিক হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' তাঁর কালজয়ী গবেষণাগ্রন্থের অন্যতম।

বরোদা রাজ্যে তিনি মন্ত্রী ছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হা. মা.

রম্যাঁ রলাঁ [১৮৬৬—১৯৪৪]

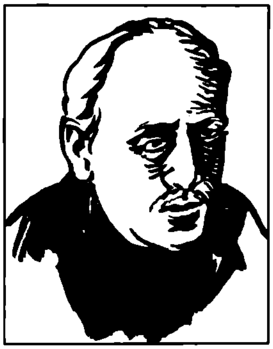

মানবতাবাদী ফরাসি সাহিত্যিক, উদার মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাবিদ, মনীষী। রম্যাঁ রলাঁর (Romain Rolland) জন্ম ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারি ফ্রান্সের বার্গাণ্ডি প্রদেশের ক্লামেসির এক সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও সঙ্গীতপিপাসু পরিবারে। তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জন্মেছিলেন।

প্যারিসের (দ্র) বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভশেষে ভর্তি হন একটি নর্মাল স্কুলে। এখানে তিনি গ্রিক ও লাতিন ভাষা আয়ত্ত করা ছাড়াও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভূগোলসহ নানা বিষয়। মেধাবী ছাত্র রলাঁ শেষোক্ত বিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়ে গবেষণাকাজে রোমে যান। এখানে অবস্থানকালে ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে আরো গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তাঁর আসে।

১৯০৩ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে বিশ্বখ্যাত সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় ইউরোপের সঙ্গীতকারদের সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরে কয়েক জন বন্ধুর সহযোগিতায় তিনি প্রকাশ করেন একটি পত্রিকা। এটি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) পর্যন্ত চলেছিল। ইউরোপের বহু মনীষী ও শিল্পী-সাহিত্যিকসহ রলাঁর নিজেরও বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনা এতে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৫ থেকে ১৯০০ এই পাঁচ বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর পাঁচটি নাটক। তাঁর মোট পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা ১৬। 'সংগ্রামেই মানুষের মহত্ত্ব'—প্রধানত এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই এইসব নাটক রচিত। তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী দুটো বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের শুভ বিবেকের জাগরণে এবং তাঁদের একতাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে একক আপসহীন প্রয়াস চালান তিনি, তা এক ঐতিহাসিক অভিযানতুল্য

www.pathagar.com

ঘটনা। তিনিই রবীন্দ্রনাথ (দ্র)-কে সজাগ ও সতর্ক করে দিয়েছিলেন ফ্যাসিবাদের (দ্র) ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিও ছিল তাঁর আত্মিক ও নৈতিক সমর্থন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম 'জঁ ক্রিস্তফ্', 'বিমুগ্ধ আত্মা', 'শিল্পীর নবজন্ম', 'বেটোফেন্', 'তল্‌স্তোয়', 'রব্‌স্পিয়ের', 'জনগণের থিয়েটার', 'বিপ্লবের থিয়েটার', '১৪ জুলাই', 'দিনপঞ্জি', 'গান্ধী', 'রামকৃষ্ণ', 'বিবেকানন্দ' প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের অনুবাদ লভ্য। রম্যাঁ রলাঁ ৭৮ বছর বয়সে ১৯৪৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর মারা যান।

আ. হু.

রশীদ চৌধুরী [১৯৩২—১৯৮৬]

বাংলাদেশের প্রথম সারির চিত্রশিল্পীদের অন্যতম রশীদ চৌধুরী। তিনি ছবি এঁকেছেন তেলরঙে, গোয়াশে ও মিশ্রমাধ্যমে। তবে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করলেন তাঁর ট্যাপেস্ট্রি শিল্পকলার জন্য।

ট্যাপেস্ট্রি শিল্পকলা তৈরি করা হয় বিভিন্নভাবে বুননের মাধ্যমে ও প্রয়োজনীয় তাঁত ব্যবহার করে। অনেকটা শতরঞ্জি তৈরি করার মতো। রঙিন সুতা ও আঁশ দিয়ে বুনে এই শিল্পকর্ম করা হয়। তবে শতরঞ্জি আর ট্যাপেস্ট্রি অবশ্যই এক রকম শিল্পকলা নয়। বাংলাদেশে (দ্র) এই ট্যাপেস্ট্রি চিত্রের তিনিই প্রবর্তক এবং অত্যন্ত সফল শিল্পী। তাঁর তৈরি বেশি কিছু ট্যাপেস্ট্রি চিত্র বাংলাদেশের শিল্পকলা জগতের অমূল্য সম্পদ।

রশীদ চৌধুরীর জন্ম ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল ফরিদপুর জেলার গাঁ-রতনদিয়ায়, এক জমিদার পরিবারে। বাবা ছিলেন সেকালের এক জাঁদরেল আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ইউসুফ হোসেন চৌধুরী। এ. কে. ফজলুল হক (দ্র), শহীদ সোহরাওয়ার্দি (দ্র) প্রমুখ রাজনীতিবিদদের যাতায়াত ছিল তাঁদের বাড়িতে।

শিল্পী রশীদ চৌধুরীর চিত্রকর্ম : চিরন্তনী

১৯৫৪ সালে ঢাকা গভর্নমেণ্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের পাঠ শেষ করে কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিংগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে ভাস্কর্য বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে স্পেনের মাদ্রিদে গমন করেন। সেখানে এক বছর শিল্পকলায় শিক্ষালাভ করেন প্যারিস (দ্র) ও লণ্ডনের (দ্র) বিভিন্ন গ্যালারি ঘুরে দেখে দেশে ফিরে আসেন। যোগ দেন আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষকতায়। দু' বছর পর ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে চিত্রশিল্পের স্বপ্নপুরী প্যারিসে চলে যান। ১৯৬৫ পর্যন্ত ভাস্কর্য, ফ্রেস্কো (দ্র) ও ট্যাপেস্ট্রিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্টুডিও গ্যালারি ও মিউজিয়াম ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। আবার যোগ দেন শিক্ষকতায়, ঢাকা আর্ট কলেজে। কিন্তু স্থির হতে পারেন নি। অস্থিরতা শিল্পী রশীদ চৌধুরীকে সব সময়ই তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। প্যারিসেরই এক মহিলা আনিকে বিয়ে

www.pathagar.com

রশীদ চৌধুরীর একটি তৈলচিত্র

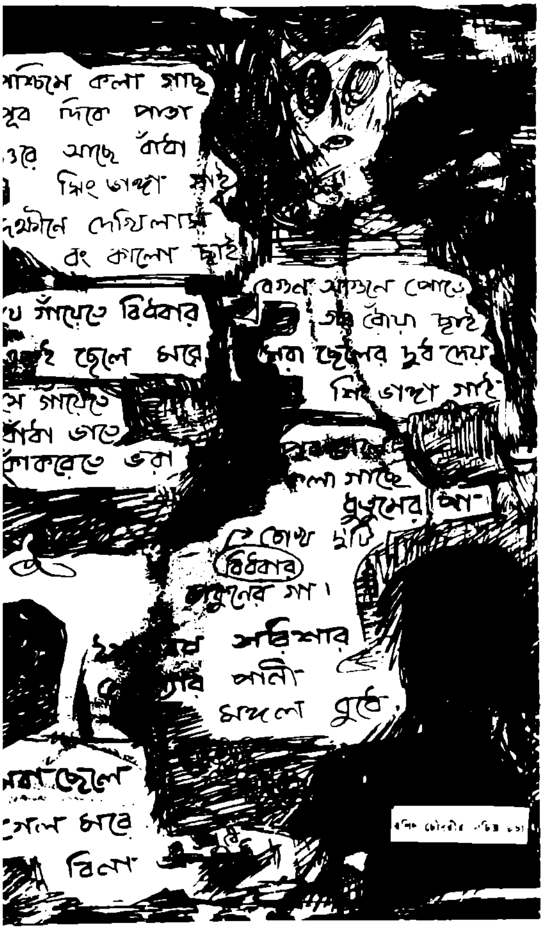

রশীদ চৌধুরীর কবিতার খসড়া ও নকশা

করেছিলেন। তাই দু'বছর পরই আবার সেখানে ফিরে গেলেন। এ সময় তাঁর ডায়েরির এক পাতায় লিখেছিলেন–'দেহ যায় মন পড়ে থাকে দেশের অমিয় সবুজে, যার থেকে আমার নেই মুক্তি, যে কারণে পৃথিবীর কোথাও চিরতরে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব-মাতৃভূমির পলিমাটিতেই আমার জীবন।'

দেশ হতে দেশান্তর ঘুরে বেড়িয়েছেন রশীদ চৌধুরী। এর ফলে তার শিল্পকর্ম চর্চা হয়তো কিছুটা ব্যাহত হলেও থেমে থাকে নি। কখনো দেশে কখনো প্যারিসে চিত্রপ্রদর্শনী করেছেন। ফ্রেস্কো তৈরি করেছেন ও ট্যাপেস্ট্রি নির্মাণ করেছেন।

সংগ্রামী জীবন ছিল রশীদ চৌধুরীর। ঝড়ের বেগে চলতেন। জীবন যাপনে ও শিল্পকলা নির্মাণে গতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

শিল্পকলা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংগঠকের ভূমিকায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। শুধু নিজে শিল্পকলা চর্চা করে যেন তিনি তৃপ্ত হন নি। তখন বাংলাদেশে শিল্পকলা চর্চা ছিল ঢাকা কেন্দ্রিক। শিল্পকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে এই অভিলাষকে পূর্ণ করার প্রয়াসে ১৯৬৯ সালে প্যারিস থেকে দেশে ফিরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) প্রতিষ্ঠা করেন চারুকলা বিভাগ। এক দল তরুণকে উদ্বুদ্ধ করেন নতুন ও আধুনিক চিন্তাধারায়। গড়ে তোলেন আর্ট গ্যালারি। তার পরেও ক্ষান্ত হন নি। একটি পরিপূর্ণ চারু ও কারু–কলা মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলেন চট্টগ্রামেই। আর এভাবেই ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেন একটি বলিষ্ঠ শিল্প-আন্দোলন।

১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের চেয়ারম্যান পদে শিক্ষকতা করে ঢাকায় চলে আসেন। তাঁর অনেক দিনের লালিত স্বপ্নের ট্যাপেস্ট্রি ষ্টুডিও ও কারখানা গড়ে তোলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ট্যাপেস্ট্রি শিল্পকে পরিপূর্ণভাবে রূপ দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান। কিন্তু শিল্পীর চিন্তা ও স্বাভাবিক কাজকর্মে তিনি নানাভাবেই বাধাগ্রস্ত হন। ট্যাপেস্ট্রির জন্য অধিক অর্থব্যয় ছিল বিরাট এক সমস্যা। সব সমস্যাকেই তিনি হাসিমুখে তাঁর সাহস ও মনের বলিষ্ঠতা দিয়ে অতিক্রম করে অনেক অমূল্য শিল্পকর্ম উপহার দিয়েছেন।

শিল্পী রশীদ চৌধুরী ছিলেন সজীব, প্রাণবন্ত ও গতি-

www.pathagar.com

সম্পন্ন জীবনের প্রতীক। তাঁর তৈরি শিল্পকর্মেও উপরের গুণাবলি ও প্রভাব দেখা যায়। শিল্পকলা নির্মাণে আধুনিক করণ-কৌশল ব্যবহার করলেও শিল্পকলার অনেক কিছু তিনি গ্রহণ করেছেন বাংলার নিসর্গ—পলিমাটির সবুজ—থেকে, লোকজ শিল্পের অভিজ্ঞতা থেকে। তার রঙ, রেখা আঁকার আকৃতি ও মাল-মসলা মিলিয়ে প্রতিটি শিল্পকর্মেই বিরাজ করে বাংলার রূপ, বাংলার আবহ।

শিল্পীর মুখে সব সময়ই থাকত লালনের কবিতা ও গান। নিজেও অনেক কবিতা লিখেছেন—শিল্পবোধ ও শিল্পদর্শন বিষয়ে কিছু নিবন্ধও রচনা করেছেন। আর সঙ্গীতের প্রতিও ছিল আকর্ষণ। নিজে সেতার বাজাতেন।

শিল্পীর শিল্পকলা সংগ্রহ দেশে ও বিদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে দেওয়া হল : বঙ্গভবন, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর (দ্র), গণভবন, সংসদ ভবন, ওসমানী মিলনায়তন, চট্টগ্রাম যাদুঘর, বাংলাদেশ ব্যাংক (দ্র), দিল্লি (দ্র)-তে ভারতের জাতীয় জাদুঘর, সেক্রেটারি জেনারেল জাতিসংঘ নিউইর্য়ক, মিশরের প্রেসিডেন্ট ভবন, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট ভবন, ভারতের প্রেসিডেন্ট ভবন। অস্ট্রেলিয়ায় ও ব্রহ্মদেশে প্রধানমন্ত্রী ভবন, ফিলিপাইনে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জেদ্দার ইসলামী ব্যাংক ও বাংলাদেশের অনেকগুলো ব্যাংক ভবন।

দেশে ও বিদেশে শিল্পী রশীদ চৌধুরী তাঁর শিল্পকর্মের জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৭৭ সালে তাঁকে জাতীয় পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

দুরারোগ্য ব্যাধি মাত্র ৫৪ বছর বয়সে এই প্রতিভাবান শিল্পীকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হা. খা.

রস, রোনাল্ড [১৮৫৭—১৯৩২]

স্যার রোনাল্ড রস (Sir Ronald Ross) এক জন ব্রিটিশ চিকিৎসক ও জীবাণুবিদ। ম্যালেরিয়া (দ্র) সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১৯০২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। তিনি অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী-মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবীর (দ্র) অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

রোনাল্ড রসের জন্ম ১৮৫৭ সালের ১৩ই মে ভারতের আলমোড়া নামক স্থানে। তিনি ১৮৭৯ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে (দ্র) স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ভারতীয় স্বাস্থ্যবিভাগে যোগ দেন। তিনি লণ্ডনে (দ্র) জীবাণু (দ্র) বিষয়ে গবেষণা-শেষে ভারতে (দ্র) ফিরে আসেন এবং ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। রোনাল্ড রস ১৮৯৯ সালে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান এবং প্রথমে 'লিভারপুল স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন' নামক প্রতিষ্ঠানে এবং পরে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯১১ সালে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৯১২ সালে লণ্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালের 'ট্রপিক্যাল ডিজিজ' বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ বিষয়ক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর সম্মানে নির্মিত রস ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর রোনাল্ড রসের মৃত্যু হয়।

সি. না. হ.

রসতত্ত্ব অভিনবগুপ্ত দ্র

রসায়নশাস্ত্র

বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের গঠন, ধর্ম ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে রসায়নশাস্ত্র বা রসায়নবিজ্ঞান বলা হয়। যেহেতু পৃথিবী পদার্থময় এবং পদার্থই রসায়নের মুখ্য বিষয়, তাই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হলেও রসায়ন সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার।

শত শত বছরের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে রসায়নের কতকগুলি মৌলিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ তত্ত্বানুসারে পদার্থসমূহ আসলে পরমাণু (দ্র) নামে অতি ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত। এরকম শতাধিক পরমাণুর অস্তিত্ব জানা গেছে, যা রাসায়নিক মৌল (দ্র) নামে পরিচিত। একই মৌলের পরমাণু কিংবা বিভিন্ন মৌলের পরমাণু পরস্পর

www.pathagar.com

মিলিত হয়ে অণু (দ্র) এবং যৌগ তৈরি করে। পরমাণুসমূহ রাসায়নিক বন্ধনের সাহায্যে একত্রে অবস্থান করে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে দুই বা ততোধিক অণু নানারকম পরিবর্তনে অন্য যৌগ কিংবা অণুতে পরিণত হতে পারে।

রসায়ন মূলত পাঁচটি শাখায় বিভক্ত : ১. জৈব রসায়ন—আগে জীবন্ত পদার্থ সম্পর্কে এ শাখায় আলোচনা করা হত। তবে এখন শুধু হাইড্রোকার্বন এবং তার উপজাত সম্পর্কেই জৈব রসায়নে আলোচনা করা হয়। ২. অজৈব রসায়ন—হাইড্রোকার্বন ছাড়া আর সকল পদার্থ সম্পর্কে এ শাখায় আলোচনা করা হয়। ৩. প্রাণরসায়ন—জীবিত প্রাণীর মধ্যে ঘটমান বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়। ৪. ভৌত রসায়ন—পদার্থের গঠন এবং বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে শক্তির যে পরিবর্তন ঘটে, সে সম্পর্কে ভৌত রসায়নে আলোচনা করা হয়। ৫. বিশ্লেষণমূলক রসায়ন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ শনাক্ত করা, মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ শনাক্ত করা, মিশ্রণে বিভিন্ন পদার্থের উপস্থিতির পরিমাণ নির্ণয় এবং পৃথক্করণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

এ ছাড়া রসায়নের আরো অনেক বিশেষ শাখা রয়েছে। যেমন–অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি, জিওকেমিস্ট্রি, নিউক্লিয়ার কেমিষ্ট্রি, রেডিও কেমিস্ট্রি ইত্যাদি।

রসায়নবিজ্ঞান মানুষের চারটি মৌলিক চাহিদার (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রসায়নের প্রয়োগের কথা মনে হলেই প্রথমে ভেসে ওঠে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় অসংখ্য রসায়নদ্রব্যের উৎপাদনের ছবি। প্লাস্টিক (দ্র), রেজিন (দ্র), রাবার (দ্র), কৃত্রিম তন্তু ইত্যাদি পলিমার (দ্র) রসায়নের অবদান। নতুন শক্তির উৎস সন্ধান এবং প্রচলিত শক্তির উৎসের উন্নয়নও রসায়ন-বিজ্ঞানের কাজ। রসায়ন-গবেষণার ফলে ঔষধ কারখানা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে শুধু চিকিৎসা নয়, রোগনির্ণয় এবং প্রতিরোধও করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার (দ্র) এবং কীটনাশক (দ্র) ঔষধের প্রচলনের ফলে বিরাট কৃষিবিপ্লব সাধিত হয়েছে।

সা. এ.

রসুন

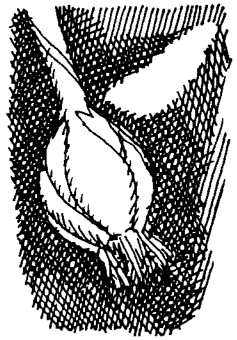

লিলিয়েসি (Liliaceae) গোত্রভুক্ত বর্ষজীবী অতি পরিচিত মসলা জাতীয় উদ্ভিদ। ইংরেজিতে একে গার্লিক (garlic) বলা হয়। এর সংস্কৃত নাম রসোন এবং হিন্দি ও অন্য বাংলা নাম লশুন। এর বৈজ্ঞানিক নাম *অ্যালিয়াম্ স্যাটাইভাম্*, লিন্ (*Allium Sativum*, Linn)। বাংলাদেশের সব জেলাতেই রসুনের চাষ হয়। তবে বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলায় রসুনের চাষ বেশি। এ দেশে শীতকালে রসুন চাষ করা হয়।

রসুনের ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড ক্ষুদ্রাকৃতির চাকতির মতো। এ ধরনের ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষায় কন্দ নামে পরিচিত। কন্দকে ঘিরে সাদা রসালো ও স্থূল শল্কপত্র থাকে। রসুনের বায়বীয় কাণ্ড (পত্রকাণ্ড) ৩০-৬০ সেমি উঁচু হয়ে থাকে। এর পাতা সবুজ, সরু ও লম্বা। শীতকালে পাতার কেন্দ্রস্থল থেকে পুষ্পদণ্ড বের হয়। পুষ্প ত্রি-অংশক। কন্দের গোড়া থেকে সরু গুচ্ছমূল বের হয়ে থাকে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র (দ্র) ও ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যা (দ্র) মতে দ্রব্যে যে ছয়টি রস থাকে তার পাঁচটিই রসুনে বিদ্যমান। রসগুলো হচ্ছে : মধু বা মিষ্টরস, লবণ বা নোনতা রস, তিক্তরস, কষায় বা কষ্টিরস এবং কটুরস।

রসুন বলকারক, অরুচিনাশক ও যৌবন স্থিতিকারক। এ ছাড়া রসুন বক্ষঃশূল, মূত্র-অবরোধনাশক, বাতজনিত রোগ ও হৃদরোগে হিতকারক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। রসুন পরিপাকতন্ত্রের (দ্র) পীড়া নিবারক ও রক্তচাপ (দ্র) হ্রাসকারক প্রভৃতি গুণের অধিকারী। কৃমিরোগ নাশক হিসাবেও রসুনের পরিচিতি আছে।

রসুনের রসালো শল্কপত্র বা কোয়া ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো রসুনে ২-৩টি, আবার কোনটিতে ১০-১৫টি কোয়া থাকে। বর্তমানে ১ কোয়া বিশিষ্ট রসুনও বেশ দেখা যায়।

হোমিওপ্যাথি (দ্র) চিকিৎসাতেও রসুন ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

রসুনে ভিটামিন (দ্র) 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি' এবং পটাসিয়াম (দ্র), ক্যালসিয়াম (দ্র), আয়োডিন (দ্র), লৌহ (দ্র) ও ফস্‌ফরাস্ (দ্র) আছে। এ ছাড়া এতে অ্যালাইল্ সাল্‌ফাইড্ (জীবাণুনাশক), অ্যাক্রোলিন্ ও ক্রোটোনিক্ অ্যালডিহাইড্ রয়েছে।

মু. আ.

রসূল / রসূলুল্লাহ

আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ : প্রেরিত বার্তাবাহক, দূত, ভবিষ্যদ্বক্তা। ইসলামী বিধানমতে আল্লাহ্‌র মনোনীত বাণীবাহক, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে হেদায়েত বা সৎপথ প্রদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

মানুষ যখন এক আল্লাহ্‌কে ভুলে বিপথগামী হয়েছে, তখন সেই পথভ্রষ্ট, বিপথগামী মানুষকে সত্যপথে আনয়নের জন্য যুগে যুগে তাঁর মনোনীত বাণীবাহক পাঠিয়েছেন, তাঁরাই নবী বা রসূল। তবে নবী ও রসূলের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। তা হল, আল্লাহ্‌র সকল বাণীবাহকই নবী অর্থাৎ পয়গম্বর; কিন্তু সকলেই রসূল নন। যাঁদেরকে সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় সংবিধানসহ মানুষকে হেদায়েতের নির্দেশ দেওয়া হয়, কেবল তাঁরাই রসূল, অন্যরা নবী।

কুরআন শরীফের (দ্র) বর্ণনা অনুযায়ী নবী-রসূলের সংখ্যা এক লাখ বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার। এঁদের মধ্যে হযরত আদম (আ.) (দ্র) প্রথম নবী এবং হযরত মুহম্মদ (সা.) (দ্র) সর্বশেষ নবী ও রসূল। ধর্মীয় সংবিধানপ্রাপ্ত রসূলের সংখ্যা ৩১৫ জন বলে জানা যায়।

মু. মা.

রহস্যগল্প গোয়েন্দাগল্প দ্র

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়

বায়ুপোত নির্মাণ ও চালনার অগ্রদূত রাইট পরিবারের দু' ভাই : ওর্ভিল্ রাইট (Orville Wright) ও উইল্‌বার্ রাইট (Wilbur Wright)। এঁরা উভয়েই মার্কিন নাগরিক। ওর্ভিলের জন্ম ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ডেয়টন্-এ ১৮৭১ সালের ১৯শে আগস্ট এবং মৃত্যু ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে। উইল্‌বার্ জন্মেছিলেন ইণ্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের মিল্‌ভিল্-এ ১৮৬৭ সালের ১৬ই এপ্রিল এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯১২ সালের ৩০শে মে তারিখে। দুই ভাই-ই খুব উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন, প্রথম জীবনে নানা ধরনের ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন।

বাতাসে কী করে ওড়া যায় সে ব্যাপারে তাঁরা প্রথম কৌতূহলী হয়ে ওঠেন ১৮৯৬ সাল নাগাদ। কোনো ধরনের বায়ুপোত বা উড়োজাহাজ তৈরি করার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লাগেন। শেষ পর্যন্ত ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তাঁরা তাঁদের তৈরি কিটি হক (Kitty Hawk) নামের উড়োজাহাজে চেপে ৮৫২ ফুট উঁচু দিয়ে উড়তে সক্ষম হন। ক্রমশ আরো পরীক্ষানিরীক্ষার পর উন্নততর বিমান তৈরি করে ১৯০৯ সালে তাঁরা আমেরিকান রাইট কোম্পানি নামে একটি ব্যবসায়িক বিমান প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন।

হা. মা.

রাওয়ালপিণ্ডি ষড়্‌যন্ত্র মামলা

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান সরকার আকস্মিকভাবে এক সরকার-উৎখাতের চক্রান্ত উদ্‌ঘাটনের কথা ঘোষণা করেন এবং সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক অঙ্গনের বেশ কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল আকবর খানসহ ঊর্ধ্বতন কয়েক জন সামরিক কর্মকর্তা এবং সাজ্জাদ জহীর, মোহাম্মদ আতা, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ (দ্র)-সহ পাকিস্তানের বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান' দ্বারা ক্ষমতা দখলের তথাকথিত 'রাওয়ালপিণ্ডি ষড়্‌যন্ত্র মামলা'। এ মামলার অজুহাতে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরও পাইকারিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই মামলার বিচার হয়েছিল গোপনে, এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কোনো গভীর ষড়্‌যন্ত্রের প্রামাণাদি হাজির করতে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে ইস্কান্দার মীর্জা-আইয়ুব খান চক্রের বিরুদ্ধে একটি অসন্তোষ শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল। সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল আকবর খান স্পষ্টভাষী উদারনৈতিক অফিসার হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন মতাবলম্বী বিক্ষুব্ধ অফিসারদের একটি গোষ্ঠীও ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের তিন বছরের মাথাতেই রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলিম লীগের (দ্র) বিশেষ কোটারির ষড়্‌যন্ত্রের খেলা স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং সেনাবাহিনীর বিক্ষুব্ধ অফিসারদের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতিকদের

www.pathagar.com

বিভিন্নভাবে যোগাযোগ ঘটছিল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা পিছিয়ে দেওয়া হলেও এই ধরনের প্রচেষ্টার কথা আঁচ করতে পেরে সরকার ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাটি যে একেবারেই অপরিপক্ক স্তরে ছিল তা বোঝা যায় অভিযুক্তদের প্রদত্ত সাজার মাত্রায়। বিচারে উর্দু ভাষার (দ্র) এক জন খ্যাতিমান সাহিত্যিক সাজ্জাদ জহীর, বিখ্যাত কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও আতা মোহাম্মদকে চার বছর এবং জেনারেল আকবর খানের বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। চার বছর পর মুক্তি পেয়ে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহীর তাঁর জন্মস্থান ভারতের উত্তর প্রদেশে ফিরে যান।

ম. হ.

রাকসু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দ্র

রাখাইন

পটুয়াখালী ও কক্সবাজার (দ্র) অঞ্চলে রাখাইন বা রাক্ষাইন জনগোষ্ঠীর বাস। তারা মঙ্গোলীয় জাতির একটি ছোট জনসমাজ। বাংলাদেশের (দ্র) চাকমা, মার্মা, মুরং, খুমি, সেন্দুজ, বনযোগী, পাঙ্খো, টিপ্রা, কুকী ও গারোরা এই

একটি রাখাইন পরিবার ধান ভানছে

মঙ্গোলীয় জাতির শাখাভুক্ত উপজাতি।

রাখাইনেরা বৌদ্ধ। তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। রাখাইনদের বর্ণমালা ও মার্মাদের বর্ণমালা এক। কিন্তু রাখাইন ও মারমা জনগোষ্ঠী নিজেদের আলাদা জাতি বলে দাবি করে। রাখাইনদের পোশাক লুঙ্গি ও ফতুয়া। মেয়েরা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১৫ অব্দ থেকে রাখাইন জাতির উদ্ভব বলে জানা যায়। সে সময় আরাকানে ধান্যবতী রাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে রাখাইন জাতির ইতিহাস শুরু হয়। ১৭৮৪ সালে দ্বিতীয় ম্রাউকের ২৭তম রাজা বর্মিদের হাতে পরাজিত হয়ে রাজ্য হারায় এবং রাখাইন জাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় রাখাইনেরা কক্সবাজার, বান্দরবন, মানিকছড়ি ও কিছু পরে পটুয়াখালীতে বসবাস শুরু করে। রাজ্য হারানোর পর থেকে রাখাইনেরা বর্মিদের বিরুদ্ধে বহুবার যুদ্ধ করেছে, কিন্তু নিজেদের দেশ তারা আর পুনরুদ্ধার করতে পারে নি।

১৯৪৫ সালে পটুয়াখালীতে রাখাইনদের জনসংখ্যা ছিল ২৫,০০০ জন।

বুদ্ধপূর্ণিমা (দ্র) ও অন্যান্য প্রধান পূর্ণিমা ছাড়া চৈত্রসংক্রান্তির শেষ দু'দিন ও নববর্ষের প্রথম দিন রাখাইনদের প্রধান উৎসব।

বি. ব.

www.pathagar.com

রাখিবন্ধন

শ্রাবণী-পূর্ণিমায় প্রিয়জনের ডান হাতের মণিবন্ধে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেওয়ার উৎসব। বিপদ থেকে রক্ষা কামনায় প্রিয়জনের মণিবন্ধে রক্ষা বা রাখি (রঙিন সুতো) বেঁধে দেওয়া হয়। রাখি আসলে প্রীতিবন্ধনের স্মারক- সূত্র। রাখি বাঁধার মন্ত্রে বলা হয়—যা দ্বারা মহাবলশালী দানবরাজ বলিকে বন্ধ করা হয়েছিল তা দিয়ে আমি তোমাকে বন্ধন করছি।

রাখিবন্ধন আদিতে উত্তরভারতের উৎসব ছিল। ক্রমে হিন্দু সমাজ ও জৈনদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। বঙ্গদেশে এর তেমন প্রচলন ছিল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ (দ্র) আইনের দ্বারা বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হলে এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের (দ্র) আহ্বানে ঐ বছর অক্টোবর অর্থাৎ ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন (শুক্লা-অষ্টমী) রাখিবন্ধন উৎসবের প্রবর্তন করা হয়। আইন বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেছে, ঈশ্বর নয়—এই সত্য স্মরণ ও প্রচারের জন্য সেদিন বাঙালিরা পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বেঁধে দেয়। এর মূলমন্ত্র ছিল 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'।

সেই থেকে রাখিবন্ধন বাঙালি সমাজে প্রীতিবন্ধনের স্মারক-উৎসবে রূপ নেয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে রাখিবন্ধন হতে পারে, যেমন রাখিবন্ধন-ভাই। রাখিবন্ধনের রঙিন সুতো প্রতীক মাত্র, কিন্তু সভ্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট তা পবিত্র আবেগ ও দায়িত্বের বন্ধন হিসাবে দেখা দেয়।

সুজ.ব.

রাগ

রাগ কথাটির মূলে রয়েছে রঙ বা আনন্দ। অর্থাৎ যে-ধ্বনিসমাবেশ শ্রোতার মনকে রাঙিয়ে দেয় বা আনন্দ দেয় তার নাম 'রাগ'। তবে এই ধ্বনিসমাবেশ অবশ্যই সঙ্গীতশাস্ত্রের নিয়মাধীন। সেজন্য বলা হয় যে আনন্দদায়ক নিয়মবদ্ধ ধ্বনি বা স্বরসমাবেশের নাম রাগ। এই রাগনিয়মকে বলা হয় 'রাগলক্ষণ'। গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ হচ্ছে : রাগে ষড়জ স্বর অবশ্যই ব্যবহৃত হবে; কোনো রাগে মধ্যম ও পঞ্চম স্বর দু'টি এক সঙ্গে বর্জিত হবে না; কোনো রাগে মধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো স্বর শুদ্ধ ও বিকৃতভাবে পর পর ব্যবহৃত হবে না, কোনো স্বরসমাবেশ রাগ পদবাচ্য হতে হলে তাতে কম-পক্ষে পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত হবে; রাগে বাদী স্বরের ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে; সংবাদী, গ্রহ, ন্যস প্রভৃতি স্বরের যথাযথ ব্যবহার ঘটবে ইত্যাদি।

এক নিয়মে রাগ তিন প্রকার : সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব। অন্য নিয়মেও রাগ তিন প্রকার : শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সঙ্কীর্ণ। গেয় কালের বিবেচনায়ও রাগ তিন প্রকার : দিবাভাগে গেয় রাগ, রাত্রি বেলায় গেয় রাগ ও ঊষাকালে গেয় রাগ। 'রাগ' শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভিত্তি। রাগরূপকে যথাযথভাবে প্রকাশ করাই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের লক্ষ্য।

ক. গো

রাগবি (rugby)

রাগ্‌বি খেলাটি মূলত ব্রিটিশদের। এই খেলাটি ইংরেজদের সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে বাংলাদেশে আজও এটা একটি অপরিচিত খেলা। ১৮২৩ সালে উইলিয়াম এলিস নামক এক জন ইংরেজ ছাত্র এই খেলা আবিষ্কার করেন। পরে এটা ১৮৭৩ সালে স্কটল্যাণ্ড, ১৮৭৪ সালে আয়ারল্যাণ্ড ১৮৭৫ সালে আমেরিকা (দ্র) এবং ওয়েল্‌সে চালু হয়। রাগবি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে। বিলাতে রাগবি নামক জায়গাতে এই খেলার নিয়ম প্রথম প্রচলিত হওয়াতে এর নাম হয়েছে রাগবি ফুটবল। এক পক্ষে ১৫ জন করে খেলোয়াড় থাকে, তাদের মধ্যে ৮ জন ধাক্কাধাক্কি করবে, আর দুই জন হাফব্যাক, চার জন থ্রি কোয়ার্টার ব্যাক, এক জন ফুল ব্যাক হিসাবে খেলবে। গোলপোস্টের উপর দিয়ে বল পাঠাতে পারলে ৫ পয়েন্ট এবং বিপক্ষের ব্যাক লাইনে বল নিতে পারলে পয়েন্ট (অর্থাৎ ট্রাই) পাওয়া যায়। বল হয় লম্বাটে কুমড়োর আকারের। হাতে নিয়ে দৌড়াবার নিয়ম ১৯২৩ সাল থেকে চলে আসছে। এই খেলায় ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলির ভাগই বেশি।

কা. আ. আ.

রাগিণী

সঙ্গীতশাস্ত্রে 'রাগিণী' ও 'রাগ' বলে দু'টি কথার প্রচলন আছে। রাগিণী কথাটি স্ত্রীবাচক এবং রাগ কথাটি পুরুষবাচক। এই পুরুষ রাগ, স্ত্রী রাগিণী ও তাদের সন্তানাদিসহ এক বিরাট রাগ-পরিবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে পূর্বেকার সঙ্গীতগ্রন্থে। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর ধারণাটি সুবিদিত।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে কতিপয় মত প্রচলিত। সবচেয়ে প্রচলিত মতের নাম হনুমন্ত মত। এই মত অনুসারে ছয় রাগ হচ্ছে দীপক, মেঘ, ভৈরব, মালকৌশ, শ্রী ও হিন্দোল। এই রাগসমূহের আবার পত্নীতুল্য ছয়টি করে রাগিণী আছে। এই প্রাচীন ধারণাটি পরবর্তী কালে ব্যাপক সমর্থন পায় নি। পরবর্তী পণ্ডিতগণ বলেন যে রাগ ও রাগিণী কথা দু'টি দ্বারা স্বরসমাবেশের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়। যে স্বরসমাবেশ গম্ভীর, বিস্তৃত, উদাত্ত ও দৃঢ় তার স্বভাব পুরুষোচিত, সুতরাং রাগ। যে স্বরসমাবেশ মিষ্টি, মিহি, কোমল ও অধিক বিস্তৃত নয় তার স্বভাব নারীসুলভ, সুতরাং রাগিণী। যেমন ভৈরব রাগ, ভৈরবী রাগিণী। বর্তমান কালে এই ব্যবধানটুকুও স্বীকার করা হয় না। এখন সমস্তকেই 'রাগ' বলে উল্লেখ করা হয়।

ক. গো.

রাজতন্ত্র

এটি সম্ভবত প্রাচীনতম একটি শাসনপদ্ধতি। সাধারণত অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার শাসনব্যবস্থাকেই রাজতন্ত্র বলা হয়। আবার কোনো ব্যক্তি, যিনি নির্বাচিত হয়ে কিংবা বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর তাঁর ইচ্ছামত শাসনপদ্ধতি অনুসরণ বা প্রবর্তন করেন, তাকেও রাজতন্ত্র বলা যেতে পারে। কোনো-না-কোনো কালে এই শাসনপদ্ধতির অস্তিত্ব সব দেশেই ছিল। রাজা বিধিদত্ত ক্ষমতাবলে শাসন করেন, এমন বিশ্বাসও ছিল প্রচলিত।

বর্তমানের অধিকাংশ আধুনিক রাষ্ট্র প্রথমে শক্তিশালী রাজতন্ত্র হিসাবেই গড়ে ওঠে। রোম সাম্রাজ্যে, মধ্যযুগে (দ্র) সর্বত্র, বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সে এবং ১৯শ শতক পর্যন্ত রাশিয়া (দ্র), তুরস্ক (দ্র), প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে সব সময় ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল।

সাধারণ বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র সকল আইনের উর্ধ্বে এবং রাজা রাজ্যের সর্বময় অধিপতি। অন্য দিকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র একটি সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও বিধানসভার কার্যবিধির এখতিয়ারে থাকে।

বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র ইউরোপে (দ্র) নতুন গুরুত্ব লাভ করে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই সময়েই গঠিত হয় বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্র। অবশ্য শাসনব্যবস্থা হিসাবে রাজতন্ত্র এর মধ্যে ধসে পড়তে শুরু করে। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে মহিমান্বিত বিপ্লবের (Glorious Revolution) মাধ্যমে ইংরেজ জাতি প্রতিষ্ঠা করে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব। মার্কিন (১৭৭৬) ও ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে প্রতিষ্ঠা করে প্রজাতন্ত্র। দু'-দুটো বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) ভেতর দিয়েও রাজতন্ত্রের ক্ষমতা অনেকখানি সীমিত হয়ে পড়ে। ১৯৭৯ সালে বিশুদ্ধ রাজতন্ত্রের সর্বশেষ ধারক-বাহক ইরানের শাহেরও পতন ঘটে। ব্রিটেন ও স্ক্যাণ্ডেনেভীয় দেশগুলোয় এই ব্যবস্থা টিকে আছে কেবল জাতীয় প্রতীক হিসাবে। আর যেসব দেশে রাজতন্ত্র এখনো টিকে আছে, সেগুলো হচ্ছে জর্দান, মরক্কো, নেপাল (দ্র) ও সৌদি আরব।

আ. হু.

রাজবংশী

মূলত মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত উপজাতি। কানিংহামের মতে বর্মি বংশোদ্ভূত। পরে ভারতীয়দের সঙ্গে সংমিশ্রণে স্বাতন্ত্র্য অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। গায়ের রঙ হলুদাভ, চোখ ছোট ও টানা, উচ্চতায় খাটো, নাক চ্যাপ্টা, চোয়ালের হাড় উঁচু, গোঁফ-দাড়ি কম। দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় অল্প সংখ্যক রাজবংশী বাস করে। ভারতের কোচবিহার, বিহার ও আসামে এদের সংখ্যা বেশি।

প্রথমে এরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, পরে সেন ব্রাহ্মণদের সময় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। অনুরূপ একটি উপজাতির নাম কোচ। এদের কিছু সংখ্যক এক সময় রাজবংশীদের সঙ্গে মিশে যায়। দিনাজপুরের পালিয়া উপজাতিও রাজবংশীর একটি শাখা বলে মনে করা হয়। বর্তমানে কোচেরা শিবভক্ত, রাজবংশীরা বৈষ্ণব ও পৈতাধারী। পরে কিছু সংখ্যক কোচ রাজবংশীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম (দ্র) গ্রহণ করে।

প্রাচীন কালে বাংলা দেশে (তখন এই অঞ্চলের নাম বাংলা দেশ ছিল না) আর্য আক্রমণের সময়ে রাজবংশীরা গঙ্গা নদীর (দ্র) অববাহিকা দখল করে। রাজবংশীরা বরাবরই কৃষিজীবী। মেয়েরা কুটিরশিল্পে দক্ষ। বাঙালিদের

www.pathagar.com

সঙ্গে মেলামেশার ফলে এরা ধীরে ধীরে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলছে।

বি. ব.

রাজশাহী

জেলা, শহর ও বিভাগের নাম রাজশাহী। এই বিভাগ দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর ও পাবনা প্রভৃতি পুরানো বৃহত্তর জেলাগুলো নিয়ে গঠিত। এই বিভাগের নবগঠিত জেলার সংখ্যা ১৬ ও থানা ১২৭টি। জেলাগুলো—পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা। রাজশাহী শহর ৩০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত, জনসংখ্যা ৩,২৫,০০০ (১৯৯১)।

রাজশাহীর ইতিহাস বেশ প্রাচীন। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্রভূমি এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম। ১২ শতক পর্যন্ত এই অঞ্চল পাল ও সেন রাজাদের অধীনে ছিল। ১৩ শতকে দিল্লির সম্রাটের অধীনে যায়। ১৩৩৯—১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন সুলতানদের শাসনাধীন ছিল। তারপর ব্রিটিশ আমলের পূর্ব পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের এলাকা ছিল। বর্তমানে রাজশাহী জেলা থেকে নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, নাটোর আলাদা হয়ে নবগঠিত জেলা হয়েছে। ১৫ শতকে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের জমিদার রাজা কংস বা গণেশ এই অঞ্চলের অধিপতি হন। তিনি রাজা শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত এ জন্যই এই অঞ্চলের নাম হয় রাজশাহী।

রাজশাহী পদ্মা (দ্র), মহানন্দা, আত্রাই, বরানল, বড়াল প্রভৃতি নদী দ্বারা বিধৌত উর্বর সমতলভূমি। প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য—ধান (দ্র), পাট (দ্র), তৈলবীজ, আখ (দ্র), তামাক (দ্র), গম (দ্র) ও লিচু। জেলার অধিবাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাঁওতাল (দ্র), ওরাঁও (দ্র) ও মুণ্ডা (দ্র) উপজাতীয় লোক আছে। জেলার শিক্ষার হার ২৩.৪৩%। ১৯৯০-৯১ সালে বৃহত্তর জেলায় প্রাইমারি স্কুল ছিল ২৮২৭, মাধ্যমিক স্কুল ৬৫৭। এই বিভাগে কলেজ ২৭৮। রাজশাহীর শহরতলীর মতিহারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) অবস্থিত। ১৯৫৩ সালের ১লা জুলাই এই বিশ্ববিদ্যালয়

মোষের গাড়ি — রাজশাহী

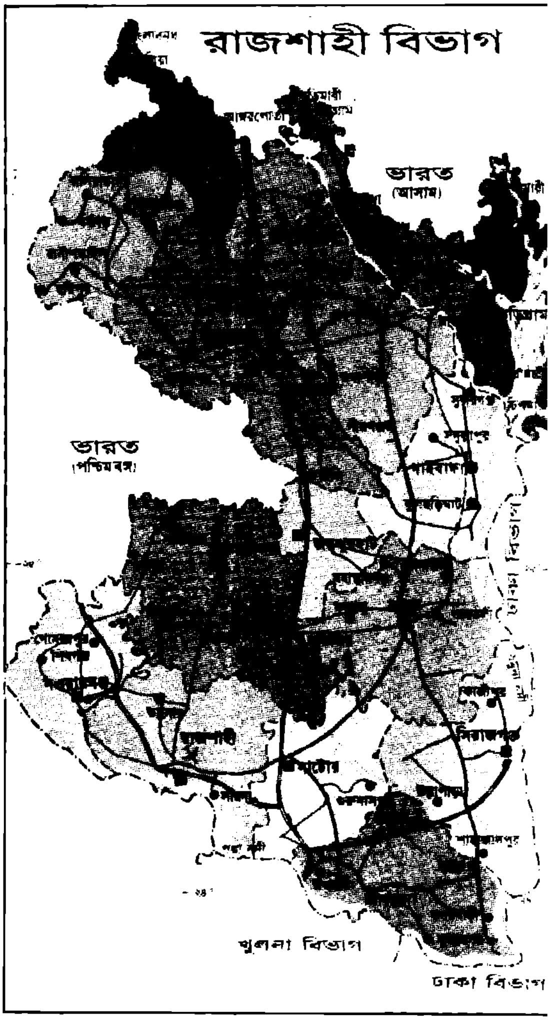

রাজশাহীর মানচিত্র (পুরনো জেলা)

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী সরকারি কলেজ

অধ্যাদেশ জারি হয়। প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার হন ড. ইতরাৎ হুসাইন জুবেরি। এ ছাড়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ সালে এবং মহিলা কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৬২ সালে। এখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ আছে। সাহেব বাজার ও রানী বাজার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। লাক্ষা (দ্র) ও রেশম (দ্র) শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। নবাবগঞ্জে বিখ্যাত ও সুস্বাদু আম ল্যাংড়া ও ফজলি জন্মে। রাজশাহী শহরের রামপুর (দ্র) বোয়ালিয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) নানা সময় এসেছিলেন এবং অবস্থানকালে কবিতা ও গল্প রচনা করে গেছেন। এখান থেকে তিনি নাটোর, চলনবিল, পতিসর (দ্র) ও দীঘাপতিয়ার জমিদারি দেখতে যেতেন।

বি. ব.

রাজশাহীতে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

রাজশাহী জেল-হত্যাকাণ্ড

১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ড নামক এক ছোট্ট কক্ষে কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক অবস্থায় নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডই রাজশাহী জেলহত্যা তথা 'খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

১৯৪০ সালে যে 'সিকিউরিটি প্রিজনার্স রুল্‌স্' ছিল, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) রাষ্ট্রের জন্মের পর তা বাতিল করা হয়। ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের জেলে আটক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা তাদের কেড়ে নেওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলো পুনরায় আদায়ের লক্ষ্যে একযোগে আন্দোলন শুরু করেন। প্রথমে এই আন্দোলনের সূচনা করা হয় ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ অনশন ধর্মঘট পালনের মধ্য দিয়ে। রাজশাহী জেলেও অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হতে থাকে। ১৪ই এপ্রিল রাজশাহী কারাকর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয় যে রাজবন্দি ও সাধারণ কয়েদিদের উত্থাপিত দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হয়েছে। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাজবন্দিরা তাঁদের অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন।

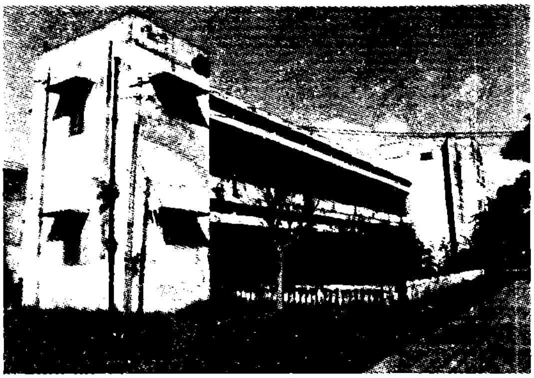

রাজশাহী রেশম কারখানা

২৪শে এপ্রিল (১৯৫০) রাজশাহী জেলের তৎকালীন সুপার মি. বিল সপারিষদ জেল পরিদর্শনে এলে জেলকর্তৃপক্ষের সরবরাহ করা নিম্নমানের খাদ্য নিয়ে রাজবন্দিদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। এই বচসা এক পর্যায়ে

www.pathagar.com

চরমে উঠলে মি. বিল তার হাতের ছড়ি দিয়ে রাজবন্দিদের প্রহারে উদ্যত হলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এই অবস্থা নিরসনে জেলার পাগলা ঘন্টি বাজাবার সঙ্কেত দিলে পুলিশ নির্বিচার গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে খাপড়া ওয়ার্ডে আটক অবস্থায় হানিফ শেখ, আনোয়ার হোসেন, সুখেন ভট্টাচার্য, দেলোয়ার হোসেন, সুধীর ধর, কম্পরাম সিং ও বিজন সেন শহীদ হন। গুরুতর আহত হন আরো ৩১ জন। এ সময় ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্ ছিলেন জনৈক আমির হোসেন।

খাপড়া ওয়ার্ডে যাঁরা হতাহত হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী।

আ. হ.

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৪ সালে রাজশাহী শহরের পূর্বদিকে মোতিহারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদ, ৩০টি বিভাগ এবং ২টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। আবাসিক হল ১২টি এবং আবাসিক শিক্ষার্থী ৬,৫২৩ জন। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট শিক্ষার্থী ১১,১১০ জন, শিক্ষক ৫১৯ জন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ১,৮১২ জন। একই বছরের হিসাব অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই ও সাময়িকীর সংখ্যা ২,৫১,৮৬৪টি। ঐ বছর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী ১৫,৫৭৭ জন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ 'রাকসু' (RUCSU : Rajshahi University Central Students' Union) নামে পরিচিত।

মে. খা.

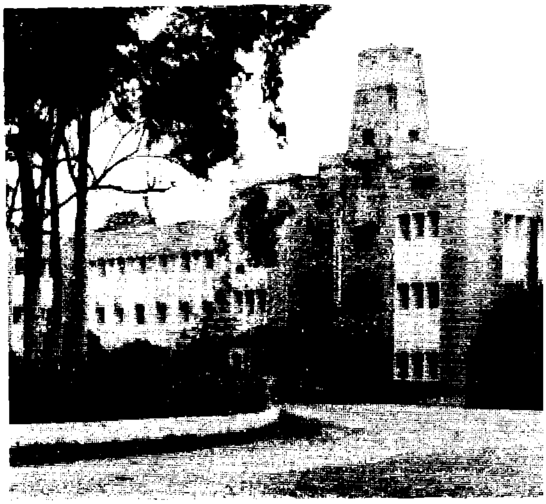

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবন

রাজশাহী শহরের ব্যস্ত এলাকা সাহেব বাজার

রাজশেখর বসু [১৮৮০—১৯৬০]

বাংলা সাহিত্যে (দ্র) বিখ্যাত ব্যঙ্গগল্প-রচয়িতা 'পরশুরাম', অভিধানপ্রণেতা, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং রসায়নবিদ্ ও ব্যবসায়ী সংস্থা-প্রশাসক।

রাজশেখর বসুর জন্ম তাঁর মাতুলালয়ে, বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে, ১৮৮০ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে। পিতা চন্দ্রশেখর ছিলেন পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু চাকুরি করতেন বিহারে দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার হিসাবে। এর ফলে রাজশেখর বসুর শৈশব-বাল্য-কৈশোর কাটে বাংলার

www.pathagar.com

বাইরে। দ্বারভাঙা রাজস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাস করেন ১৮৯৫ সালে, ১৮৯৭-এ পাটনা কলেজ থেকে এফ. এ. বা ফার্স্ট আর্টস্ (First Arts)। এরপর কলিকাতায় (দ্র) গিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) ভর্তি হয়ে রসায়নশাস্ত্র (দ্র) ও পদার্থবিজ্ঞানে (দ্র) অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় (১৯০০) প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি আইনশাস্ত্র পড়ার জন্য রিপন কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯০২ সালে বি. এল. পাশ করেন। উকিল হয়ে ওকালতি ব্যবসাও করেছিলেন কিছুদিন, ভাল না লাগায় পরে ছেড়ে দেন। যোগ দেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (দ্র) প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল নামে প্রতিষ্ঠানে। চাকুরি নিয়েছিলেন রসায়নবিদ হিসাবে, কিন্তু অচিরেই পরিচালকের দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয়। একটানা ত্রিশ বৎসর সেখানে কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করেন ১৯৩২ সালের শেষ দিকে। কিন্তু তার পরেও আমৃত্যু বেঙ্গল কেমিক্যালে উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত থেকেছেন।

বিচিত্রকর্মা প্রতিভা হলেও রাজশেখর বসুর খ্যাতি ও কালজয়ী স্বীকৃতি সাহিত্যিক হিসাবেই। অথচ সাহিত্য তাঁর নেশা বা পেশা কোনোটাই ছিল না; বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম রচনা লেখেন, একটি ব্যঙ্গগল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' (১৯২২)। প্রথম গল্পেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ফলে সাহিত্যিক ও পত্রিকা-সম্পাদক বন্ধুদের অনুরোধ-উপরোধে লেখা চালিয়ে যেতে হল। একটির পর একটি গল্পের বই বেরিয়েছে তাঁর : 'গড্ডালিকা' (১৩৩২ সন), 'কজ্জলী' (১৩৩৫), 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৩৪৪), 'ধুস্তরী-মায়া' (১৩৫৯), 'আনন্দীবাঈ' (১৩৬৪) ইত্যাদি। এ সবই তিনি লিখেছেন 'পরশুরাম' ছদ্মনামে। প্রথম দিকে লজ্জা ও সঙ্কোচে আসল নাম ব্যবহার করেন নি; লোহালক্কড়ের এক পরিচিত ব্যবসাদার ছিলেন পরশুরাম, তাঁর নামটাই কাজে লাগিয়েছিলেন। নামটি পাকাপোক্তভাবেই শেষ পর্যন্ত টিকে গেল। পাল্টাবার সময় বা ইচ্ছা আর হয় নি।

কিন্তু রাজশেখর বসু নাম দিয়েও তিনি কম বই লেখেন নি। তবে, সেগুলো গল্পগ্রন্থ নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের বই। যেমন, তাঁর লেখা বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা' (১৩৪৫/ ১৯৩৭ খ্রি.) তাঁর পাণ্ডিত্যের অক্ষয় প্রমাণ হিসাবে চিরকাল থাকবে। সংস্কৃত থেকে বিশাল গ্রন্থ 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' অনিন্দ্যসুন্দর গদ্যে অনুবাদ করে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছিলেন। অনুবাদ আরো রয়েছে : কালিদাসের 'মেঘদূত' (১৩৫০), ভগবৎগীতা, হিতোপদেশের গল্প (১৩৫৭)। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের খুঁটিনাটি নিয়েও একাধিক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন : 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'ভারতের খনিজ', 'কুটিরশিল্প'।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র একুশটি, কিন্তু রচনার মান, গুরুত্ব ও প্রভাবের ক্ষেত্রে তাদের অবদান অপরিসীম।

সাহিত্যে তাঁর অবদান ও পাণ্ডিত্যের জন্য বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'সরোজিনী পদক' ও 'জগত্তারিণী পদক' দিয়ে দু' বার সম্মানিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেন 'রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার'। ভারত সরকার দেন 'পদ্মভূষণ' খেতাব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

১৯৬০ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হন।

হা. মা.

রাজা রামমোহন রায় রামমোহন রায়, রাজা দ্র

রাজাকার

রাজাকার শব্দের অর্থ স্বেচ্ছাসেবক। 'রাজা' আরবি শব্দ। 'কার' ফারসি শব্দ। 'রাজা' শব্দের অর্থ ইচ্ছা। 'কার' শব্দের অর্থ কাজ।

আঠারো শতকে ভারতের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের শাসনকর্তা নিজামের তৈরি আধা-সামরিক বাহিনীকে 'রাজাকার' বলা হত। এরা ছিল নিজামের পক্ষে এক ধরনের লাঠিয়াল বাহিনী। নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচারে এদের জুড়ি ছিল না। তেলেঙ্গানার কৃষকবিদ্রোহ দমনেও এদের নৃশংস ভূমিকা মনে রাখার মতো।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময়

www.pathagar.com

পাকিস্তানি সামরিক সরকার তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে 'রাজাকার' নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। প্রধানত 'বিহারি' নামে পরিচিত স্থানীয় অবাঙালি এবং ধর্মান্ধ ও পাকিস্তানভক্ত বাঙালিদের সক্রিয় অংশ ছিল এই বাহিনীর সদস্য। পাকিস্তানি বাহিনী আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে।

রাজাকার বাহিনীর সদস্য অস্ত্র হাতে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াত, দেশবাসীর ধনসম্পদ লুঠপাট করত, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিত, মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে নিরীহ মানুষকে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তুলে দিত। অকারণে কাউকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করত না।

সৈ. আ. ই.

রাজীব গান্ধী [১৯৪৪—১৯৯১]

ভারতের (দ্র) প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী। বিখ্যাত নেহরু পরিবারে তাঁর জন্ম, ১৯৪৪ সালের ২০শে আগস্ট। তাঁর পিতা ফিরোজ গান্ধী এবং মাতা ভারতের লোকান্তরিত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী (দ্র)। রাজীব কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত রাজীব ছিলেন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স্-এর এক জন পাইলট। কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে ইতালীয় ছাত্রী সোনিয়াকে রাজীব বিবাহ করেন। তাঁদের দু'টি সন্তান—জ্যেষ্ঠপুত্র রাহুল ও কন্যা প্রিয়াঙ্কা। ছোট ভাই সঞ্জয় বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালে মায়ের তাগিদে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজীব রাজনীতিতে আসেন। তিনি ১৯৮১ সালে উত্তর প্রদেশের আমেথী থেকে ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৮৪ সালের অক্টোবরে শিখ আততায়ী কর্তৃক মা ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পর রাজীব ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি ঐতিহাসিক পাঞ্জাব ও আসাম চুক্তি এবং ১৯৮৭ সালে ভারত-শ্রীলঙ্কা শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি মালদ্বীপের (দ্র) স্বাধীনতা রক্ষায় জরুরি সাহায্য পাঠান। তিনি চীন (দ্র) ও পাকিস্তানের (দ্র) সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৮৮ সালে বেইজিং (দ্র) সফরের মাধ্যমে তিনি ভারত-চীন সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন।

১৯৯১ সালের ২১শে মে রাতে দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য তামিলনাড়ুতে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এক আত্মঘাতী তামিল গেরিলার বোমার আঘাতে রাজীব গান্ধী প্রাণ হারান।

মো. ই.

রাতকানা রোগ ভিটামিন দ্র

রাধা

ভারতীয় পুরাণে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী এক উপাখ্যান। সুপ্রাচীন কালে সত্যসত্যই শ্রীকৃষ্ণ (দ্র) নামে কোনো ব্যক্তি এবং রাধা নামে কোনো মহিলা ছিলেন কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু লোকের মনে গভীর বিশ্বাসে তাঁরা সত্য হয়ে আছেন। রাধা বা শ্রীরাধা বা শ্রীরাধিকা ইত্যাদি নামের একটি মেয়ের সঙ্গে কৃষ্ণ নামের একটি ছেলের প্রেমের কাহিনী যুগ যুগ ধরে এই উপমহাদেশের মাটিতে চালু আছে। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণবধর্মের (দ্র) মূল ভিত্তিই রাধা-কৃষ্ণের প্রেম; সেখানে রাধা মানবাত্মা এবং কৃষ্ণ সৃষ্টিকর্তার প্রতীক।

রাধা ছিলেন বৃষভানু ও কলাবতীর কন্যা। জাতিতে তাঁরা গোয়ালা ছিলেন এবং যমুনা (দ্র) নদীর তীরে বৃন্দাবন নামে একটি স্থানে তাঁরা থাকতেন। রাধার সঙ্গে আয়ান ঘোষের বিবাহ হয়, কিন্তু রাধা ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন।

পৃথিবীতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের লোক-কাহিনী ও পুরাণে অলৌকিক প্রেমের কাহিনী প্রচলিত আছে, সেসব নিয়ে কত সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু ভারত উপমহাদেশে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীকে কেবল কোনো পুরনো আমলের গল্প হিসাবে লোকে বিশ্বাস করে না, এখনো মানুষের বিশ্বাসে, অনুভূতিতে, কল্পনায় রাধা-কৃষ্ণ জীবন্ত

www.pathagar.com

হয়ে আছেন।

হা. মা.

রাফায়েল [১৪৮৩—১৫২০]

ইতালীয় রেনেসাঁস (দ্র)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তিনি তাঁর কালোত্তীর্ণ শিল্পকর্মের জন্য বিশ্বের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। মানব-প্রতিকৃতির বহু নতুন ধরন এবং মডেলের জন্য নতুন নতুন মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির আবিষ্কারকও তিনি। রাফায়েল ভাস্কর হিসাবেও বিশেষ খ্যাতিমান।

তাঁর প্রকৃত নাম রাফায়েল্লো সান্তি (Raffaello Santi). ইংরেজি ভাষায় সাধারণত রাফায়েল (Raphael) লেখা হয়। ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দের সম্ভবত ৬ই এপ্রিল তিনি ইতালির উর্বিনোতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ২১ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি উচ্চ টাইবার উপত্যকার উম্ব্রিয়া নামক এলাকায় অতিবাহিত করেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি ফ্লোরেন্সে যান। এখানে মোট চার বছর অতিবাহিত করেন। তাঁর এখানে অবস্থানকালকে 'ফ্লোরেন্টাইন অধ্যায়' বলে অভিহিত করা হয়। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে তিনি রোমে যান এবং ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের জন্য কাজ করতে শুরু করেন। এর পর থেকে রোম তাঁর স্থায়ী নিবাস হয়ে ওঠে।

চিত্রকলার পাশাপাশি রাফায়েলের অপরিসীম আগ্রহ ছিল প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে। অচিরেই তিনি রোমের বুদ্ধিজীবী মহলে সম্মানিত সদস্যরূপে গৃহীত হন। জীবনের শেষ দিকে তিনি বলতে গেলে রাজকীয় সম্মানের অধিকারীই হন। প্রাসাদোপম ভবনে তিনি বসবাস করতেন। তাঁর অপরূপ মুখাকৃতি এবং আন্তরিক ব্যবহারের জন্য খুবই সমাদৃত ছিলেন। তাঁর চিত্রকর্ম বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের সংমিশ্রণ এবং শিল্পী হিসাবে এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

ইতালি জুড়ে সংঘটিত রেনেসাঁসের দৃশ্যপটে রাফায়েলের আবির্ভাব তাঁর ১৬ থেকে ১৭ বছর বয়সে। মাত্র ৩৭ বছরের জীবনে তাঁর কাজের পরিমাণ মোটেই নগণ্য নয়। রোমের বহু বিখ্যাত ভবনের দেয়ালচিত্র এঁকে তিনি প্রভূত সম্মান অর্জন করেন। এসব ভবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পোপের পাঠাগার ও দপ্তর ভাটিকানের স্তান্‌জা দেল্লা সেইঞাতুরা, স্তান্‌জা দেলিওদোরো, পাশাপাশি সিস্তিন চ্যাপেলের সাজসজ্জার কাজের পূর্ণতা সাধনের জন্য দশটি বৃহৎ পর্দার নকশাঙ্কন ইত্যাদি। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত দেয়ালচিত্রের নাম 'বোর্গো-তে অগ্নিকাণ্ড'।

রাফায়েল চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন ইতিহাসের ঘটনাধারাভিত্তিক চিত্রাঙ্কনের ভিত্তি স্থাপনকারী হিসাবেও।

তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের প্রতিকৃতি', 'সন্ত মিখাইল', 'ট্রান্সফিগারেশান', 'কুমারীর বিবাহ', 'দ্য করোনেশন অব দ্য ভার্জিন', 'মাদোন্না দেল্ গ্রান্দুচা', 'লা বেল্ জার্দিনিয়্যার্', 'মাদোন্না দ্য কাসা তেম্পি', 'দ্য এণ্টুম্বমেণ্ট', 'লাওকুন' (ভাস্কর্য), 'দ্য রিপাল্‌স্ অব আত্তিলা' ইত্যাদি।

চিত্রী রাফায়েলের ম্যাডোনা ছবি আঁকার প্রস্তুতিপর্বে মা ও শিশুর ড্রইং

www.pathagar.com

রাফায়েলের আঁকা বিশাল 'ম্যুরাল' চিত্র —এথেন্সের স্কুল

রাফায়েল আকস্মিকভাবে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল রোমে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

রাবার (rubber)

এক ধরনের সম্প্রসারণশীল জৈব পদার্থ (elastic organic material), যা বিশেষ কিছু গাছের আঠার সঙ্গে পাতলা অ্যাসেটিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ (দ্র) মিশিয়ে তৈরি করা হয়। রাবারকে তার নিজের স্বাভাবিক আকার থেকে টেনে ৮ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য ব্যবহার্য অনেক জিনিসই এখন রাবার দিয়ে তৈরি হয়। গাড়ির টায়ার, টিউব, পাইপ, জুতার সোল, বেলুন, বল, ওয়াটারপ্রুফ কাপড়, অস্ত্রোপচারের দস্তানা ইত্যাদি দ্রব্য তৈরি ছাড়াও পেন্সিলের দাগ মোছার জন্য রাবার তো ব্যবহৃত হয়েই থাকে। বৈদ্যুতিক তারকে অপরিবাহী করার জন্যও তারের ওপর রাবারের আবরণ দেওয়া হয়।

রাবারের আঠার বৈজ্ঞানিক নাম *ল্যাটেক্স (Latex)*। এর রঙ দুধের মতো সাদা। বিশেষ এক ধরনের ধারালো ছুরি দিয়ে গাছের বাকলে খাঁজ কেটে খেজুরের রসের মতো পাত্র বসিয়ে আঠা সংগ্রহ করে রাবার তৈরি করা হয়।

এখন মোটামুটি চার শ'র বেশি ধরনের গাছ থেকে আলাদা-আলাদা রকমের রাবার উৎপাদিত হয়। সবচেয়ে বেশি রাবার পাওয়া যায় *হেভিয়া ব্রাজিলিয়েন্সিস (hevea brasiliensis)* নামক গাছ থেকে। আমাজন নদীর (দ্র) উপত্যকায় এই গাছ জন্মে। পশ্চিম আফ্রিকায়ও এর বন আছে। কিন্তু পৃথিবীর শতকরা নব্বই ভাগ প্রাকৃতিক রাবার আসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড (দ্র), সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া (দ্র) ও শ্রীলঙ্কা (দ্র) থেকে। এসব দেশে রাবার গাছের চাষ হয়। বাংলাদেশের (দ্র) চট্টগ্রাম (দ্র) জেলার রাউজান, হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি, কক্সবাজার (দ্র) জেলার রামু এবং সিলেট (দ্র) জেলার বিভিন্ন স্থানে রাবার চাষ হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

রাবার গাছ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এর পাতার রঙ গাঢ় সবুজ। পাতা সাত/আট ইঞ্চি লম্বা হয়। পাঁচ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রাবার গাছের আঠা পাওয়া যায়।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা প্রাচীন কালে রাবারের আঠা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করত বলে জানা গেছে। জোসেফ প্রিস্টলে (Joseph Priestley) নামে এক জন ব্রিটিশ রসায়নবিজ্ঞানী প্রথম এই আঠার সাহায্যে পেন্সিলের দাগ তুলবার (to rub out অথবা to erase) গুণ আবিষ্কার করেন। আর সেই থেকে এই জিনিসটির নাম হয়ে যায় রাবার বা ইরেজার। ১৮১১ সালে ভিয়েনায় সর্বপ্রথম রাবার কারখানা স্থাপিত হয়। ১৮২০ সালে হ্যানকক্ নামে এক ইংরেজ রাবারকে নমনীয় করার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৩৮ সালে চার্লস গুডইয়ার নামে এক আমেরিকান রাবারের আঠার সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে 'ভালকানাইজেশন' (দ্র) পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। 'ভালকানাইজ' করা রাবার খুব ঠাণ্ডায় শক্তও হয় না, আবার খুব গরমেও গলে না।

প্রাকৃতিক রাবার ছাড়াও বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়েও রাবার তৈরি করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাকৃতিক রাবারের সরবরাহ হ্রাস পেলে পশ্চিমী দেশগুলোতে কৃত্রিম বা সিন্থেটিক রাবার উৎপাদন শুরু হয়। এসব রাবার বৃক্ষজাত রাবারের চেয়ে অনেকাংশে উন্নত। এর বিশেষ গুণ হল, এটা কোনো তেল, অ্যাসিড (দ্র) বা তরল পদার্থে বিকৃত হয় না এবং জলবায়ু (দ্র) আর সূর্যতাপের তারতম্য ঘটলেও এর গুণ-মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। এর উৎপাদনব্যয়ও কম। তাই দেশে দেশে এখন কৃত্রিম রাবারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুজ. ব.

রাবেয়া, তাপসী [৭১৭—৮০১]

হযরত রাবেয়া বসরী (রা.) ইরাকের বসরার অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁর নামের শেষে 'বসরী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মহিলা দরবেশ। তাঁর নামের আগে 'তাপসী' শব্দটিও বাংলায় দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

রাবেয়া বসরীর জন্ম ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বসরার কায়েস গোত্রভুক্ত আতীক সম্প্রদায়ের একজন ক্রীতদাসী। পরে মুক্তি পেয়ে সুফি সাধনায় নিবেদিত হন। ধর্মপরায়ণ ও সৎচরিত্রবতী এই নারী বিবাহ করেন নি। মালিক ইবনে দীনার, রাবাহ্ আল্ কায়েস, সুফিয়ান আস-সাওরি, শাকীক প্রমুখ বিখ্যাত সুফি-দরবেশ ও পণ্ডিত ব্যক্তি উপদেশ লাভের আশায় তাঁর নিকট আসতেন। তাঁর বহুসংখ্যক শিষ্য ও ভক্ত ছিল।

রাবেয়া প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ না পেলেও আপন প্রতিভা, মেধা এবং সাধনাবলে ধর্মের বিভিন্ন বিষয় এবং স্রষ্টা সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। সুগভীর ভাবসমৃদ্ধ কবিতা রচনায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন বলে জানা যায়।

এই মহীয়সী, পূত-চরিত্রের দরবেশ-মহিলা ৮০১ খ্রিস্টাব্দে বসরায় ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

রামকৃষ্ণ পরমহংস [১৮৩৬—১৮৮৬]

সাধক, ধর্মপ্রচারক। হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্ম, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ সাল। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রমণি দেবী। তাঁর প্রকৃত নাম গদাধর। শৈশবেই ধর্মচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ি মন্দিরে পুরোহিত হিসাবে তাঁর কর্মময় জীবনের সূচনা।

এর পর তিনি ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ও ধর্মসাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ইসলাম, খ্রিস্ট, শিখ, বৌদ্ধ— সব ধর্মের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটার পর তিনি উপলব্ধি

www.pathagar.com

করেন যে সকল ধর্মই সত্য। তাঁর ভাষায় 'যত মত তত পথ'। মানুষ হয়ে মানুষের সেবা করার মাধ্যমেই ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি আজীবন সৎ, শুভ ও কল্যাণের বাণী প্রচার করে গেছেন। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সাধাসিধা, নিরহঙ্কার এবং অত্যন্ত সজ্জন। তিনি উপমা, রূপক, কাহিনী ও প্রবাদবাক্যের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজ ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করতেন।

'মানুষ দয়া করতে পারে না, সে কেবল জীবসেবা করতে পারে'—এই ছিল রামকৃষ্ণের মূল আদর্শ। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (দ্র)। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করে দেশে-বিদেশে রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেন।

কলিকাতার দক্ষিণেশ্বরে বেলুড় মঠেই রামকৃষ্ণ তাঁর সমগ্র জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর বাণী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত' নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর বাণীর মধ্যেই পাওয়া যায় মানুষ ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অপরিসীম প্রেম।

বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে মাক্সম্যুলার (দ্র) ও রম্যাঁ রলাঁ (দ্র) রামকৃষ্ণের জীবনী রচনা করেছেন। বাংলা ভাষাতেও তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে একাধিক গ্রন্থ।

হিন্দু সমাজে এই ধর্মসাধকের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এখনো তাঁর অনুসারীরা ছড়িয়ে আছেন দেশে-বিদেশে। তাঁরা মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস মারা যান ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট। বহু ভাষায় প্রকাশিত তাঁর অমর বাণী এখনো মানুষকে সৎ ও সুন্দর পথের সন্ধান দেয়।

আ. ই.

রামচন্দ্র

হিন্দুধর্ম (দ্র) অনুযায়ী ভগবানের দশ অবতারের অন্যতম অবতার। পার্থিবরূপে তিনি ছিলেন অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র। তার মাতার নাম কৌশল্যা। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনবাসে কাটান। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জনক রাজার কন্যা তাঁর পত্নী সীতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। বনবাসকালের দ্বিতীয়ার্ধে রামচন্দ্র যখন গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটী বনে বাস করছিলেন তখন লঙ্কার রাক্ষস-রাজ রাবণ ছলনার আশ্রয় নিয়ে সীতাকে তাঁর কুটির থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ও লঙ্কায় অশোককাননে বন্দি করে রাখে। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাবণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কপিরাজ সুগ্রীব বিশাল বানর সেনাদল নিয়ে রামচন্দ্রকে সাহায্য করেন। হনুমানও রামের সেবায় এগিয়ে আসেন। সেই ঘোরতর যুদ্ধে রাবণ সবংশে নিহত হন। রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করেন।

রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করা ছিল রাম অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। রামচন্দ্র ছিলেন ন্যায়, মঙ্গল ও আদর্শের প্রতীক। মহর্ষি বাল্মীকি (দ্র) শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকাহিনী অবলম্বনে সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য 'রামায়ণ' (দ্র) রচনা করেন।

ক. গো.

রামচরিতমানস তুলসীদাস দ্র

রামনাথ বিশ্বাস [১৮৯৪—১৯৫৫]

বাঙালি ভূপর্যটক। জন্ম ১৮৯৪ সালের ২২শে মার্চ বৃহত্তর শ্রীহট্ট জেলায় বানিয়াচঙ গ্রামে।

তরুণ বয়সে তিনি যোগ দেন বিপ্লবী 'অনুশীলন' (দ্র) দলে। বিদ্যালয়জীবনে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সূচনায় গঠিত বাঙালি পল্টন এবং লেবার কোর-এ তিনি যোগ দেন। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার কারণে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান। ১৯১৭ সালে আবার তিনি ফিরে যান সামরিক জীবনে। এই কর্মসূত্রেই তাঁকে যেতে হয় বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও পারস্যে। ১৯২৪ সালে তিনি যান মালয়দেশে। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে সাইকেলে চড়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেরিয়ে পড়েন বিশ্বভ্রমণে।

রামনাথ বিশ্বাস সফর করেছেন সমগ্র ভারতবর্ষ, সিঙ্গাপুর, মালয়, থাইল্যাণ্ড (দ্র), ইন্দোচীন (দ্র), চীন (দ্র), কোরিয়া, জাপান (দ্র), বার্মা (দ্র), আফগানিস্তান, ইরান,

www.pathagar.com

ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক (দ্র), বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, মিশর, কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা, নাগাল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল, ডারবান, ইস্টল্যাণ্ড, পোর্ট এলিজাবেথ, কেপটাউন ও সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ও কানাডা। তিনি উল্লিখিত দেশ-মহাদেশ সফর করেন হয় সাইকেলে চেপে, নয়তো পায়ে হেঁটে। তাঁর অতিক্রান্ত পথের দূরত্ব ৫০ হাজার মাইলেরও বেশি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্য ছিল। চীনদেশ সফরকালে তাঁর সঙ্গে চীনা নেতা মাও সে-তুং (দ্র)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে জানা যায়।

১৯৪০ সালে তিনি কলিকাতায় (দ্র) ফিরে আসেন, গড়ে তোলেন 'সারা ভারত পর্যটক সমিতি', বের করেন সংগঠনের মুখপত্র 'পর্যটক'। এর সম্পাদক ছিলেন তিনি।

রামনাথ বিশ্বাস কলিকাতাতেই মৃত্যুবরণ করেন ১৯৫৫ সালের ১লা নভেম্বর।

তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'মরণবিজয়ী চীন', 'লাল চীন', 'তরুণ তুর্কি', 'আজকের আমেরিকা', 'দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা', 'নাবিক', 'দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ' ইত্যাদি।

আ. হ.

রামপিথেকাস রামাপিথেকাস দ্র

রামপ্রসাদ সেন [আনু. ১৭২০—১৭৮১]

কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা। শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনী গান রচনার জন্য বিখ্যাত। আনুমানিক ১৭২০ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার কুমারহট্ট গ্রামে জন্ম। পিতা রামরাম সেন। অল্প বয়সেই রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হন। সে সময় থেকেই কবিতা রচনা ও সুর সৃষ্টি করতে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ গ্রাম ছেড়ে কলিকাতা (দ্র) যান এবং এক জমিদারের সেরেস্তায় মুহুরির চাকুরি নেন। কিন্তু কাজে তাঁর মন বসে না, মন পড়ে থাকে শক্তিদেবী শ্যামার ধ্যানে ও তাঁর স্তবগান রচনায়। সেরেস্তার খাতাতেও হিসাবের পরিবর্তে লিখে রাখেন শ্যামাসঙ্গীত। এক দিন জমিদার নিজে রামপ্রসাদের কাজকর্ম দেখতে গিয়ে খাতায় 'আমায় দেও মা তবিলদারি' গানটি লেখা দেখতে পান। জমিদার রামপ্রসাদকে শ্যামাসঙ্গীত রচনায় উৎসাহ দেন এবং চাকুরি থেকে রেহাই দিয়ে জীবন যাপনের জন্য মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন। রামপ্রসাদ তখন নিজ গ্রাম কুমারহট্টে ফিরে এসে গভীরভাবে শ্যামাসঙ্গীত রচনায় নিমগ্ন হন। বিদ্যোৎসাহী কৃষ্ণচন্দ্র রায় তখন নবদ্বীপের রাজা। রামপ্রসাদের কবিত্ব ও সঙ্গীতখ্যাতির কথা শুনে তিনি তাঁকে তাঁর সভায় যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানান। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তখন তাঁর সভাকবি। তবে রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যোগ দেন নি। তথাপি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে শত বিঘা নিষ্কর ভূমি ও 'কবিরঞ্জন' উপাধি দান করেছিলেন। রামপ্রসাদের জীবন শ্যামাসাধনা ও শ্যামাসঙ্গীত রচনাতেই অতিবাহিত হয়। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে কালীমূর্তি বিসর্জনের সময় তিনি নিজেও গঙ্গার জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করেন, ১৭৮১ সালে।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় শ্যামাসঙ্গীত রচনার যে উজ্জ্বল যুগের প্রবর্তন ঘটে রামপ্রসাদ সেন তার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। সহজ ও চিত্তাকর্ষক কথায় তিনি গান রচনা করতেন। তাঁর রচিত সুরও নম্র ও লাবণ্যপূর্ণ। তিনি 'প্রসাদী সুর' নামে পরিচিত এক সুরঢঙ প্রবর্তন করেন। বাউলের সঙ্গে রাগসুর ঝিঁঝিট মিশিয়ে এই সুরঢংটি রচিত। তিনি নিজে যেমন এই সুরে বহু গান রচনা করেন, তেমনি পরবর্তী বহু সঙ্গীতরচয়িতাও এই ঢংটি তাঁদের গানে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) দেশাত্মবোধক গানেও প্রসাদী সুর ব্যবহার করেছিলেন।

রামপ্রসাদ সেন আগমনী গানের ধারাটিরও প্রবর্তক। এই গান উমা বা দুর্গা বিষয়ে রচিত। দুর্গা-পূজার সময় দুর্গা বা উমা পূজিত হবার জন্য কৈলাস থেকে মর্ত্যে আগমন করছেন—এই বিষয় নিয়ে 'আগমনী গান' রচিত। আগমন থেকে আগমনী। তবে গানে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে এমনভাবে যেন গৃহস্থ কন্যা স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসছেন। উমাকে নিয়ে তাঁর মা মেনকার ভাবনা সেভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দরের (দ্র) কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন।

ক. গো.

www.pathagar.com

রামমোহন রায়, রাজা [১৭৭২—১৮৩২]

বাঙালিদের মধ্যে প্রথম আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তানায়ক, সমাজ-সংস্কারক ও কর্মবীর। ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে রামমোহন রায়ের জন্ম। রামমোহন এক দিকে সংস্কৃত পড়েন, অন্য দিকে ফার্সি শেখেন। আরবি-ফার্সি পড়তে গিয়েই প্রচলিত হিন্দুধর্মের (দ্র) সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় জাগে।

পনেরো–ষোলো বছর বয়সে তিনি ঘর ছেড়ে চলে যান কাশীতে। তার পর কিছুকাল থাকেন পাটনায়। এই সময় তিনি মনোযোগ দিয়ে বেদ ও উপনিষদ পাঠ করেন।

রামমোহন ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত রংপুরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানরূপে কাজ করেন। পরে ১৮১৫ সালে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় (দ্র) বসবাস শুরু করেন। তখন থেকেই তিনি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বেদ ও উপনিষদ বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার শুরু করেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং ব্রাহ্মধর্মের (দ্র) প্রবর্তক। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও অজ্ঞানতা দূর করার জন্য তিনি ১৮১৫ সালে 'আত্মীয় সভা' (দ্র) প্রতিষ্ঠা করেন। এই আত্মীয় সভাই পরে ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসমাজ'-এ রূপলাভ করে।

১৮১৮ সালে তিনি 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' নামে একটি পুস্তিকা লিখে প্রমাণ করেন যে সতীদাহ প্রথা (দ্র) অন্যায় এবং এ বিষয়ে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে কোনো বিধান নেই। রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে বেশ কয়েকটি সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেছিলেন।

রামমোহন রায় ছিলেন বহুভাষাবিদ। বাংলা ছাড়াও তিনি সংস্কৃত (দ্র), আরবি (দ্র), ফার্সি, হিব্রু, গ্রিক, লাতিন ও ইংরেজি ভাষা জানতেন। তিনি ছিলেন আধুনিক মন ও মননের অধিকারী। তাঁর কথা ছিল ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিখতে হবে, জানতে হবে আধুনিক বিশ্বকে।

দিল্লির বাদশাহ্ তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। ১৮৩০ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করেন। ইংল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বানসমাজ তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় গ্রহণ করে। ১৮৩২ সালে তিনি ফ্রান্সে যান। ফেরার পথে ব্রিস্টলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ব্রিস্টলেই রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি রয়েছে। তিনি ফরাসি বিপ্লবের (দ্র) সমর্থক ছিলেন বলে জানা যায়।

আ. ই.

রামমোহন লাইব্রেরি (ঢাকা)

১৮৬৯ সালে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে তাদের প্রার্থনাগৃহের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে এর চত্বরেই একটি পাঠাগার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকার তৎকালীন কমিশনারের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট অভয়চন্দ্র দাশ। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে 'পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ' গৃহের চত্বরেই পৃথক একটি ভবনে ১৮১৭ সালে গড়ে ওঠে ঢাকার বিখ্যাত এবং ভারত উপমহাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ গণপাঠাগার 'রামমোহন লাইব্রেরি'। এর উদ্বোধন করেছিলেন ভারতীয় প্রথম প্রিভি কাউন্সিলর স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত আই. সি. এস.। এর আগের বছর (১৮৬৮) গ্রন্থাগারভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (দ্র)। প্রতিষ্ঠিত হবার পর অল্প কালের মধ্যেই বিভিন্ন জনের দানে এটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর সংগ্রহে ছিল বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ে কয়েক সহস্র গ্রন্থ। দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসম্ভারের দিক থেকেও এটি ছিল প্রায় অতুলনীয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও কবি জীবনানন্দ দাশ (দ্র)-সহ পূর্ববঙ্গ ও ভারতীয় উপমহাদেশের বহু মনীষী, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, সাহিত্যিক ও শিল্পীর পদধূলিধন্য এই পাঠাগারটিকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর

www.pathagar.com

ঢাকার পাটুয়াটুলির পূর্ব প্রান্তের মোড়ে অবস্থিত ব্রাহ্মসমাজ ভবন। এখানেই রয়েছে রাজা রামমোহন লাইব্রেরি

হানাদার পাক বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার (দ্র)- আল-বদর (দ্র) প্রমুখেরা পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে। পরবর্তী কালে জনসাধারণের চেষ্টায় ধীরে ধীরে পাঠাগারটি আবার গড়ে তোলা হচ্ছে।

আ. হু.

রামরাম বসু [১৭৫৭—১৮১৩]

আনুমানিক ১৭৫৭ সালে রামরাম বসু হুগলি শহরের চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় চব্বিশ পরগণা জেলার নিমতা গ্রামে। সুপ্রিম কোর্টের ফার্সি দোভাষী উইলিয়াম চেম্বার্সের সুপারিশে তিনি জন টমাসের মুন্সী নিযুক্ত হন (৮ই মার্চ ১৭৮৭)। ঐ বছরই রামরাম বসু টমাসের সঙ্গে মালদহ যান। তিনি টমাসকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সাহায্য করেন। ক্রমে তিনি নিজেও খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি ১৭৮৮ সালের জুন মাসে 'বাংলা ভাষায় দেখা বা শোনা প্রথম খৃষ্টস্তব' রচনা করেন। জন টমাস প্রথম বার যতদিন বঙ্গদেশে ছিলেন ততদিন রামরাম বসু তাঁর মুন্সী বা শিক্ষক ছিলেন। ফার্সি ভাষায় তাঁর ভাল জ্ঞান ছিল।

রামরাম বসু ১৭৯৩ সালের ১১ই নভেম্বর উইলিয়াম কেরির (দ্র) মুন্সী নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৭৯৬ সালে কেরি তাঁর মুন্সীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে অবশ্য আবার তিনি উইলিয়াম কেরির মুন্সী হয়েছিলেন।

রামরাম বসু খ্রিস্টান মিশনারিদের জন্য একাধিক পুস্তিকা ও গান রচনা করেছিলেন। 'খৃষ্টস্তব' ছাড়াও তিনি কেরির অনুরোধে ১৮০০ সালে 'হরকরা' ('গসপেল', 'মেসেঞ্জার') নামে ১০০ পঙ্‌ক্তির একখানি কবিতার বই লেখেন। ঐ বছরের শেষের দিকে তিনি 'জ্ঞানোদয়' নামে আর একখানি বই মিশনারিদের জন্য রচনা করেছিলেন। ঐ বইয়ে হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ ছিল।

১৮০১ সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (দ্র) সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালি রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ (১৮০১)। বইখানি প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর মিশন থেকে। বইখানি লিখে রামরাম বসু কলেজ কাউন্সিলের নিকট থেকে তিন শ' টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি পাদ্রি ওয়ার্ডের অনুরোধে কবিতায় 'খৃষ্ট বিবরণামৃতং' (১৮০৫) নামে একখানি খ্রিস্টচরিত রচনা করেন। ১৮০২ সালে তিনি দু'টি ইংরেজি খ্রিস্টসঙ্গীত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ঐ বছরই 'লিপিমালা' নামে তাঁর আরো একখানি বই প্রকাশিত হয়।

১৮১৩ সালের ৭ই আগস্ট মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের পণ্ডিত হিসাবেই নিযুক্ত ছিলেন।

শা. হ.

রামাপিথেকাস

রামাপিথেকাস (Ramapithecus) এক ধরনের 'এপ' (দ্র) জাতীয় জীব। ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ বছর আগে এরা জীবিত ছিল। ১৯৩২ সালে আমেরিকার নৃবিজ্ঞানী জর্জ ই. লুইস এদের ফসিল প্রথম আবিষ্কার করেন ভারতের শিবালিক পর্বতমালায়। এদের চোয়ালের অংশবিশেষ এবং কয়েকটি দাঁত তিনি উদ্ধার করেন। তিনি এদের নাম দেন রামাপিথেকাস অর্থাৎ রাম-এপ। সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য (দ্র) 'রামায়ণের' (দ্র) নায়ক ও প্রধান পুরুষ রামচন্দ্রের (দ্র) নাম থেকেই এই নাম প্রদান করা হয়েছে।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, রামাপিথেকাস হল আদি

www.pathagar.com

হোমিনিড (দ্র), আবার কারো মতে, এপ -মানব। ১৯৭০ সালের পর এদের প্রচুর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। সেসব নিয়ে গবেষণা করে বর্তমানে ধারণা করা হয় যে এরা ওরাং ওটাং জাতীয় জীবের পূর্বপুরুষ। এরা এশিয়ায় বসবাস করত। তবে অন্য স্থানেও এদের ফসিল পাওয়া গেছে। ভারত ছাড়া পাকিস্তান, তুরস্ক, চীন, হাঙ্গেরি, কেনিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে এদের অস্তিত্ব মেলে। এদের খাদ্য ছিল বিভিন্ন ধরনের বিচি, গাছগাছড়ার মূল, কন্দ এবং নানা জাতীয় বীজ।

সৈ. আ. ই.

রামায়ণ

রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের (দ্র) কাহিনী নিয়ে রচিত প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য (দ্র)। রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকি (দ্র)। এই গ্রন্থ রচনা করে তিনি ভারতবর্ষে আদি কবি বলে সম্মান লাভ করেন। রামায়ণ ৭ কাণ্ডে (অর্থাৎ খণ্ডে) বিভক্ত, যথা–আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ড। আদি কাণ্ডে রামের জন্ম ও বাল্যজীবন, অযোধ্যা কাণ্ডে অযোধ্যা থেকে রামের বন-নির্বাসন, অরণ্য কাণ্ডে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনবাস ও রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে রামের বন্ধুত্ব, সুন্দর কাণ্ডে রামের সসৈন্যে লঙ্কা উপস্থিতি, লঙ্কা কাণ্ডে রাম-রাবণের যুদ্ধ, যুদ্ধে রাবণের সবংশে মৃত্যু ও রাম-কর্তৃক সীতা উদ্ধার ও বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করে সকলে মিলে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, এবং উত্তর কাণ্ডে রাজা রাম-কর্তৃক সীতাকে বনবাসে পাঠানো, সেখানে লব-কুশের জন্ম, রাম-সীতার পুনর্মিলন এবং মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষায় এর শ্লোকসংখ্যা বিভিন্ন ভাষ্য অনুসারে ২৪ থেকে ৪৩ হাজার। এর প্রতিটি চরণ ১৪ মাত্রায় রচিত। কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন। কেউ কেউ বলেন, কৃত্তিবাস (দ্র) রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল।

রামায়ণের কাহিনী থেকে বহু কবি ও শিল্পী দীর্ঘকাল ধরে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। এর থেকে কাব্য (দ্র), নাটক (দ্র), চিত্রকলা (দ্র), কাহিনী ইত্যাদি নানাভাবে ভারতের সব ক'টি ভাষায় ছড়িয়ে পড়েছে। 'রামায়ণ' মহাকাব্য হলেও হিন্দুদের কাছে এর মর্যাদা ধর্মগ্রন্থের মতো। 'রামায়ণ' ভারতবর্ষের সব অঞ্চলে এবং ভারতের বাইরেও নানা দেশে প্রচলিত আছে অথবা একদা প্রচলিত ছিল। শ্রীলঙ্কা (দ্র), মায়ানমার (দ্র), থাইল্যাণ্ড (দ্র) ও ইন্দোনেশিয়ায় (দ্র) এখনো রামায়ণ জনপ্রিয়।

বি. ব.

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী [১৮৬৪—১৯১৯]

বাংলা ভাষায় (দ্র) বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধকারদের অন্যতম রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দিতে। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর জীবনে প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে এম. এসসি. পরীক্ষায় প্রথম স্থানের অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর বিশেষ সম্মানসূচক প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি (দ্র) লাভ করেন। ১৮৯২ সালে রিপন কলেজে অধ্যাপনায় যোগ

www.pathagar.com

দেন এবং ১৯০৩ সালে রিপন কলেজেরই অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি' বিজ্ঞান বিষয়ের রচনাসঙ্কলন। তাঁর দার্শনিক ভাবনার পরিচয় 'মর্মকথা'। 'শব্দকথা' বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও পরিভাষা বিষয়ে আলোচনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-(দ্র)-এর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', 'বিচিত্রজগৎ', 'জগৎকথা' ইত্যাদি। মৃত্যুবরণ করেন ১৯১৯ সালে।

মে. খা.

রাশিচক্র কোষ্ঠী দ্র

রাশিয়া (Russia)

পৃথিবীর (দ্র) সবচেয়ে বড় দেশ। এর আয়তন ১, ৭০, ৭৫, ২৮৬ বর্গ-কিলোমিটার বা ৬৫,৯২,৮০০ বর্গমাইল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭৬ শতাংশ এলাকা বর্তমান রাশিয়ার আওতাধীন। পূর্ব-ইউরোপ থেকে উত্তর এশিয়া হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর (দ্র) পর্যন্ত এই দেশের সীমানা বিস্তৃত। এর পশ্চিমে ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, এস্তোনিয়া, বেলোরুস, ইউক্রেন; দক্ষিণে জর্জিয়া, আজারবাইজান, কাজাখস্তান, চীন (দ্র), মঙ্গোলিয়া এবং উত্তর কোরিয়া অবস্থিত। এর উত্তর ভাগ ছুঁয়ে আছে আর্কটিক মহাসাগর। সব সময়ই রাশিয়ার কিছুটা পড়েছে ইউরোপে (দ্র), আর কিছুটা এশিয়ায় (দ্র)। উরাল পবর্তমালাই সেই বিভাজনরেখা যার পশ্চিমাংশ ইউরোপ আর পূর্বাংশ হল এশিয়া।

আগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাধারণভাবে বলা হত রাশিয়া (রুশীতে 'রস্সিয়া')। অতি প্রাচীন কালে দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপভূমি ও ভোল্গা নদীর অববাহিকায় বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি বসবাস করতে শুরু করে। খ্রিস্টীয় ৯ম শতকে 'রুরিক্' নামের স্ক্যাণ্ডিনেভীয় একটি বণিক দলের নেতা রুশীয় রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলে প্রবাদ প্রচলিত আছে। তার পর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করে রুরিক্ রাজবংশের উত্তরাধিকারীগণ শাসন করতে থাকে। ১২৩৭ থেকে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে মঙ্গোলেরা (এদের সাধারণত 'তাতার' নামে অভিহিত করা হয়) রাশিয়া অধিকার করে এবং রাশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতিদের কর প্রদানে বাধ্য করে। তারা মস্কো গ্র্যাণ্ড ডাচি নামে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এর শাসক ৩য় ইভান ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে তাতারদের অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করেন। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে ৪র্থ ইভান (Ivan the Terrible বা ভয়ঙ্কর ইভান নামে অধিক পরিচিত) রাশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে 'মস্কোর ডিউক' উপাধির পরিবর্তে রাশিয়ার 'ৎসার' (বাংলায় বলা হয় জার) অর্থাৎ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। তার পর থেকে উনিশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত একের পর এক রাজবংশীয়রা 'রাশিয়ার জার' পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৪-৫ সালে জাপানের (দ্র) সঙ্গে যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) ফলে রুশরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অবশেষে দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪—১৯১৭) ও আলেকসিস (১৯১৮)-এর রাজত্বকালে রুশ বিপ্লব (দ্র) সংঘটিত হয়। ১৯১৮ সালের ১০ই জুলাই লেনিনের (দ্র) নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নতুন সংবিধান গৃহীত হয় এবং পৃথিবীর বুকে রাশিয়া প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯২২ সালে ১৫টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে রাশিয়া ক্রমান্বয়ে 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিক্স্'-এ পরিণত হয়। এই ১৫টি প্রজাতন্ত্রের একটির নাম হয় 'রাশিয়া'। উল্লেখ্য যে রাশিয়া ছিল সবচেয়ে বড় প্রজাতন্ত্র।

লেনিনের মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে ইওসেফ্ স্তালিন্ (দ্র) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আধুনিকায়নসহ অভ্যন্তরীণ আর্থিক উন্নয়নের সূচনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন উৎপাদন, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। প্রকৃত পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাসে মৌলিক রূপান্তর ঘটতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে ও অনুপ্রেরণায় পূর্ব-ইউরোপের আরো কয়েকটি রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের (দ্র) আদর্শে সরকার গঠন করলে বিশ্ব প্রধানত দুই ভাগে (সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ও ধনতান্ত্রিক বিশ্ব) বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সব সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে চলতে থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্বের আসন দখল করে বসে। তখন এই দুই দেশকে দুই 'পরাশক্তি' নামে

www.pathagar.com

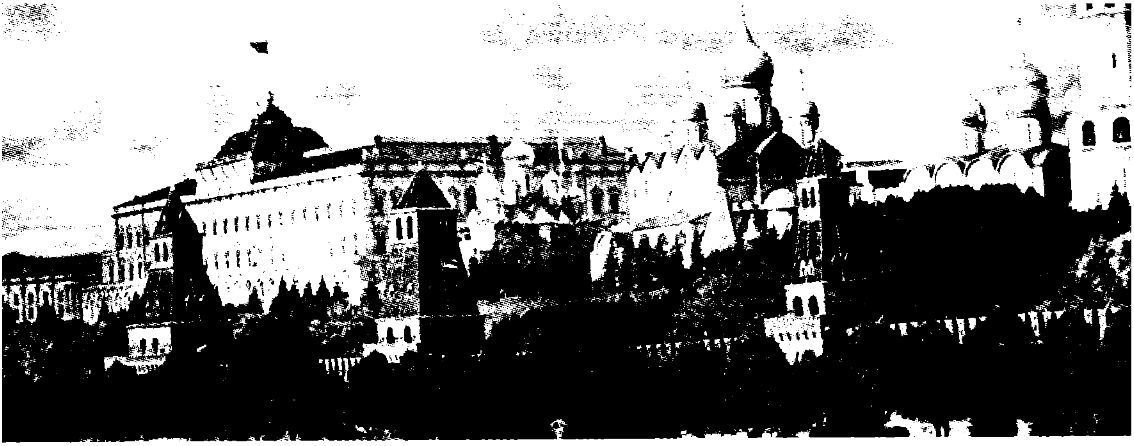

অভিহিত করা হতে থাকে।

কিন্তু ১৯৮৭ সালে সোভিয়েত নেতা মিখাইল্ গর্বাচোফ্ দেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্র (দ্র) ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যে মুক্তমত (গ্লস্‌নস্ত্) এবং পুনর্গঠন (পেরেস্ত্রোইকা) নামের এক সংস্কার-কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তাঁর এই কর্মসূচি প্রাচীনপন্থী সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা সমালোচিত হতে থাকে। কিন্তু তীব্র সমালোচনার মুখেই তিনি ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত পার্লামেণ্ট স্থগিত করে দেন। এতে প্রজাতন্ত্রসমূহে জাতিগত দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায় এবং চরম অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। ১৯৯১ সালের ২৪শে আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ জানিয়ে গর্বাচোফ্ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের পদে ইস্তফা দিলে রাশিয়া, ইউক্রেন ও কাজাখ্স্তানসহ বেশ কয়েকটি প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৯১ সালে ২৬শে ডিসেম্বর সরকারিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘটে। অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের মতো রাশিয়া প্রজাতন্ত্রও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করে।

রাশিয়ার সর্বত্র ভূ-সংস্থান এক রকম নয়। এর ইউরোপীয় অংশের ভূমি নিম্ন-সমতল। দক্ষিণভাগ তৃণ- আর উত্তরভাগ বৃক্ষ-সম্পদে সমৃদ্ধ। পূর্বে উরাল পর্বতমালা এবং দক্ষিণে ককেশাস্ পর্বতমালা অবস্থিত। উরাল পর্বতমালা উত্তর থেকে দক্ষিণে ২৫০০ মাইল লম্বা। অপর দিকে এশীয়

মস্কো. পুরনো ও আধুনিক প্রযুক্তি মিলেমিশে এক বিশাল শহর

www.pathagar.com

অংশে রয়েছে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পার্বত্য অঞ্চল এবং উত্তরে তুন্দ্রাঞ্চল। এখানকার ভূ-ভাগ সারা বছর তুষারে ঢাকা থাকে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মরুঅঞ্চল বিস্তৃত। বহু নদ-নদী ও হ্রদের মধ্যে ভোল্‌গার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভোল্‌গাই দেশের প্রধান অভ্যন্তরীণ জলপথ।

রাশিয়ায় নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ জলবায়ু পরিলক্ষিত হলেও পুরোপুরি উষ্ণ আবহাওয়া কোথাও লক্ষ করা যায় না। শীতকালে তাপমাত্রা বেশ কম থাকে। প্রায় সর্বত্রই তুষারপাত হয়। বসন্তকালে দেশের দক্ষিণভাগের বরফ গলতে থাকে। বরফগলা জলে কৃষিকাজ শুরু হয়। আর এ সময় ফুল ও ফলে চারদিক ভরে ওঠে।

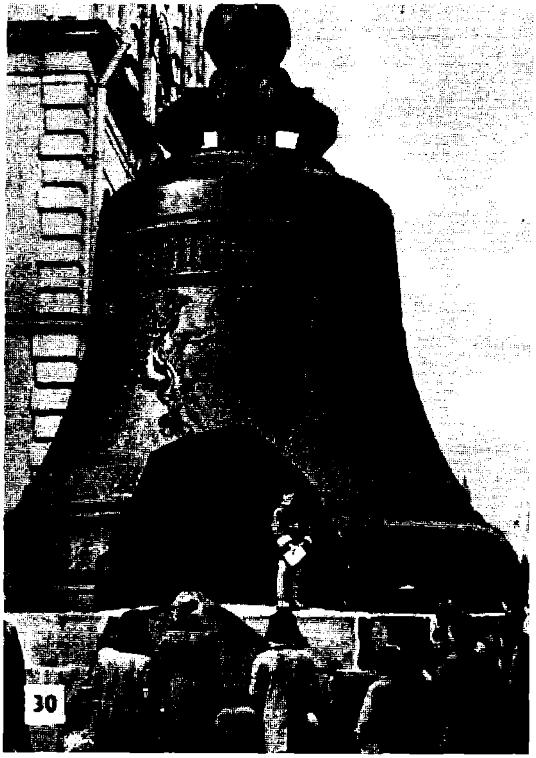

মস্কোর ঘণ্টা

দেশের প্রধান শিল্পকারখানার মধ্যে ইস্পাত (দ্র), যন্ত্রপাতি, যানবাহন (দ্র), রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট (দ্র), বস্ত্র, কাগজ (দ্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রধান প্রধান শস্যগুলো হল তুলা (দ্র), আখ (দ্র), বীট (গাজর জাতীয় কন্দ-বিশেষ), আলু (দ্র), শাকসবজি, সূর্যমুখী (দ্র) বীজ, ধান (দ্র), তামাক (দ্র), গম (দ্র) ইত্যাদি। খনিজ দ্রব্যগুলোর মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ, পারদ (দ্র), পটাস, তামা (দ্র), কয়লা (দ্র), স্বর্ণ (দ্র), রৌপ্য (দ্র), সীসা (দ্র), টাংস্টেন (দ্র), নিকেল (দ্র), খনিজ তৈল ইত্যাদির নাম করা যায়। বন, পশু ও মৎস্য-সম্পদও রাশিয়ার অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। দেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলো হল যন্ত্রপাতি, যানবাহনসামগ্রী, অপরিশোধিত তৈল, রাসায়নিক দ্রব্য এবং কাঠ ও কাগজ।

রাশিয়ার গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে নৃত্য

রাশিয়ার রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। রাশিয়ার বিভিন্ন যুগের অমর কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে কাউন্ট লিয়েফ্ তল্‌স্তোয় (দ্র), আলেক্সান্দ্‌র্ পুশ্‌কিন্ (দ্র), মাক্সিম্ গোর্কি (দ্র), ফিওদর্ দস্তইয়েফ্‌স্কি (দ্র), আন্তোন্ চেখফ্ (দ্র), ইভান্ তুর্গিয়েনেফ্ (দ্র), নিকলাই গোগল্ (দ্র) প্রমুখের নাম করা যায়। মহাশূন্য গবেষণার ক্ষেত্রেও রুশরা অগ্রণী। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল রাশিয়ার সাতাশ বছরের তরুণ ইউরি গাগারিন্ (দ্র) প্রথম মহাকাশে ঘুরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। রাশিয়ার ঐতিহ্যবাহী নৃত্য 'ব্যালে' (ballet) পৃথিবীবিখ্যাত।

রাশিয়ার রাজধানীর নাম মস্কো (দ্র)। দেশের প্রধান প্রধান শহর ও বন্দরগুলোর মধ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গ, সামারা,

www.pathagar.com

নিঝ্নি নভ্গোরদ্, মুর্মন্স্ক্, ৎভের (Tver), আর্খাঙ্গেল্স্ক্ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ দেশে ৫৮টি বিমানবন্দর আছে। মুদ্রার নাম রুব্ল্।

১৯৯২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাশিয়ার লোকসংখ্যা ১৪,৯৫,২৭,০০০। প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতির ঘনত্ব ২২। শতকরা ৭৪ ভাগ লোক শহরে বাস করে। মোট জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮২ ভাগ লোক রুশ বংশোদ্ভূত এবং ৩ ভাগ তাতার। ধর্মীয় দিক থেকে শতকরা ২৫ ভাগ লোক গোঁড়া রুশ (Russian Orthodox Church) এবং ৬০ ভাগ লোক কোনো ধর্মীয় মতে বিশ্বাস করে না। শতকরা ৯৯ ভাগ লোক শিক্ষিত। দেশের সরকারি ভাষা রুশ।

রাশিয়ায় ফেডারেশন পদ্ধতিতে সরকার গঠিত হয়। রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট এবং সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম বরিস্ ইয়েল্‌ৎসিন্, তিনি ১৯৯১ সালের ১০শে জুলাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সুজ. ব.

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ভাষা-আন্দোলন দ্র

রাসবিহারী বসু [১৮৮০—১৯৪৫]

ভারতের (দ্র) পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বিনোদবিহারী বসু। তিনি বর্ধমান থেকে চন্দননগরে গিয়ে বসবাস করেন। চাকুরি করতেন সিমলায়।

রাসবিহারী শৈশবে পাঠশালার পাঠ শেষ করে চন্দননগরের দ্যুপ্লে (Dupleix) কলেজের প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশুনোর প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল না। তাই তাঁর পিতা তাঁকে সিমলায় নিয়ে যান এবং দেরাদুনে বনবিভাগের গবেষণাগারে কেরানির চাকুরিতে ঢুকিয়ে দেন। তবে ছুটি পেলেই তিনি চন্দননগরে চলে আসতেন। এখানেই বিপ্লববাদে তাঁর হাতেখড়ি (দ্র)।

১৯১১ সালের ১০ই অক্টোবর দিল্লি দরবারের দিন ধার্য হয় এবং দরবারের শোভাযাত্রা শুরু হয়। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge : ১৯১০-১৯১৬) সুসজ্জিত হাতির পিঠে আসীন। তাঁকে লক্ষ করে বোমা-নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি সামান্য আহত হন। রাসবিহারী বসু বোমা নিক্ষেপ করেন মহিলার ছদ্মবেশে। পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেন। ভারতে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে শেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) প্রাক্কালে তিনি জাপানে (দ্র) উপস্থিত হন। ১৯২০ সালে তাঁকে জাপানের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়। জাপানের ব্যারন নাকামুরার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

১৯৪২ সালের ১৫ই জুন ১২০ জন ভারতবাসীর উপস্থিতিতে এক সম্মেলন হয় এবং সম্মেলনের সর্বসম্মত সভাপতি হন রাসবিহারী বসু। এই সম্মেলনে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বস্তুত, 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনে রাসবিহারী বসুর অবদান অপরিসীম। পরে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর (দ্র) সঙ্গে মিলিত হন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হলে সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন রাসবিহারী বসু।

১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারি রাসবিহারী বসু মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শা. হ.

রাসূল/রাসূলুল্লাহ রসূল/রসূলুল্লাহ দ্র

রাসেল্, বার্ট্রান্ড্ [১৮৭২—১৯৭০]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও গণিতবিদ। বার্ট্রান্ড্ রাসেল্ (Bertrand Russel) ইংল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক যুগের যুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। প্রাঞ্জলতা, বুদ্ধিমত্তা, আবেগময়তা ও সাহিত্যগুণে তাঁর ভাষা অনন্য। সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৫০

www.pathagar.com

সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার (দ্র) দেওয়া হয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসেল্ ছিলেন সচল ও কর্মক্ষম। সমাজ, রাজনীতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর মতামত ছিল প্রভাববিস্তারী ও বিতর্কিত। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিন খণ্ডে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। গণিতের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত মেধাবী রাসেল্ উচ্চশিক্ষা লাভ করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষাজীবনশেষে শিক্ষকতা আর গবেষণা ছিল তাঁর কর্মের মাধ্যম। ১৯১০ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ ইংরেজ গণিতবিদ আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট্‌হেড্-এর সঙ্গে যৌথভাবে তিন খণ্ডে 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা' (Principia Mathematica) নামে একটি বই লেখেন।

১৯১৮ সালে একটা লেখার জন্য তাঁকে ছয় মাস কারাভোগ করতে হয়েছিল। 'গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা' (Introduction to Mathematical Philosophy) গণিত বিষয়ে তাঁর আর এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এর প্রকাশকাল ১৯৭১। 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' (A History of Western Philosophy : ১৯৪৫), 'সুখের জয়যাত্রা' (Conquest of Happiness : ১৯৩০), 'জার্মানের সামাজিক গণতন্ত্র' (German Social Democracy : ১৯৮৫), 'বিবাহ ও নৈতিকতা' (Marriage and Morals: ১৯২৯) 'আমি কেন খ্রিস্টান নই' (Why I am not a Christian : ১৯২৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। তিনি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী শান্তি-আন্দোলনের নেতা। নব্বই বছর বয়সে ১৯৬১ সালে যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের বিরুদ্ধে তিনি বিশ্বব্যাপী প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন।

দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নতুন। দর্শনকে তিনি কোনো কাল্পনিক সমস্যার কাল্পনিক সমাধানের আকর বলে মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন, দর্শনের কাজ হওয়া উচিত বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করা। মানুষের ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তাকে ভাব প্রকাশের সঠিক বাহনে পরিণত করার চেষ্টা করাও দর্শনেরই কাজ। বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ ছিলেন মানবতাবাদী দার্শনিক।

১৯৭০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. মা.

রিউমেটিক ফিভার বাতজ্বর দ্র

রিকেট্‌স্ ভিটামিন দ্র

রিপ ভ্যান উইঙ্কল (Rip Van Winkle)

মার্কিন ঔপন্যাসিক ওয়াশিংটন আর্ভিং (দ্র) রচিত অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ একটি গল্প। ১৮১৯ সালে আর্ভিং একটি বই প্রকাশ করেন 'The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent.' নামে। জেফ্রি ক্রেঅন্ ছিল তাঁর নিজেরই ছদ্মনাম। যাই হোক, ঐ বইয়ের মধ্যেই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল নামে একটা লোক আমেরিকার একটা পাড়াগাঁয় বাস করত। নিউইয়র্কের পাশের একটা গ্রাম, এক দিকে তার হাড্‌সন্ নদী বইছে। সময়টা তখন আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের (১৭৭৫-৮৩) পূর্বের কাল। আমেরিকা তখন ছিল গ্রেট ব্রিটেনের উপনিবেশ, আর যারা থাকত এ দেশে প্রায় সকলেই এসেছিল ইউরোপের কোনো-না-কোনো দেশ থেকে। রিপের পূর্ব-পুরুষেরা এসেছিল হল্যাণ্ড থেকে। যা হোক, রিপ ভ্যান উইঙ্কল খুব দুঃখী আর অভাগা মানুষ ছিল। সে নিজে চূড়ান্ত ভালমানুষ ছিল অন্য লোকের প্রয়োজনে বুক দিয়ে পড়ত, কিন্তু সে নিজের বা পরিবারের সুখশান্তির দিকে তাকাত না। এই একটা ব্যাপারে রিপ ছিল ভয়ঙ্কর রকম অলস, যেন কুঁড়ের বাদশা। ওদিকে তার স্ত্রী ছিল প্রচণ্ড রকমের ঝগড়াটে মেয়ে। উঠতে-বসতে স্বামীকে বকাঝকা, গালমন্দ— এসব লেগেই থাকত। বৌকে তাই বাঘের চেয়েও বেশি ভয় পেত রিপ। এর ফল হয়েছিল এই যে, সে পারতপক্ষে বাড়িতেই থাকত না, এদিক-সেদিক ঘুরে ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়াত। তার একমাত্র প্রিয় সঙ্গী ছিল প্রভুভক্ত একটা কুকুর।

এক দিন বৌয়ের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে মনের দুঃখে রিপ তার কুকুরটাকে নিয়ে বেরিয়ে পাহাড় আর বনের দিকে চলে গেল। ইচ্ছে—পাহাড়ের নির্জনে গাছপালার ছায়ায় সারাটা দিন কাটিয়ে ঘরে ফিরবে। হয়তো তেমনই ঘটত, কিন্তু পাহাড়েই তার দেখা হয়ে গেল খুব বেঁটে বুড়ো অদ্ভুত পোশাক-পরা এক লোকের সঙ্গে। লোকটার কাঁধে-পিঠে বোঝা, তাই সাহায্য করতে হল রিপকে। একটু পরেই লোকটার সঙ্গে গিয়ে পৌঁছুল এমন একটা জায়গায়, ঐ পাহাড়েরই মধ্যে, যেখানে ঐ লোকটির সাঙ্গপাঙ্গরা খুব আমোদ-ফুর্তি করছে। তারা এক বিচিত্র ধরনের বল

www.pathagar.com

খেলছে, মদে-ভরা ছোট পিপে থেকে ভাঁড়ে করে মদ নিয়ে পান করছে। বিদেশে অতিথিকে মদ্যপান করানো ভব্যতা, তাই রিপকেও তারা মদ খাওয়াল। হয়তো-বা একটু বেশি খেয়েছিল রিপ, নইলে তার অত ঘুম পাবে কেন ? সে কখন ঘুমিয়ে পড়ল নিজেই জানে না।

ঘুম ভাঙল সকাল বেলায়। দেখে, কেউ কোথাও নেই। কুকুরটাকে ডেকে সাড়া পেল না। ঘুমোবার সময়ে পাশে বন্দুকটা পড়ে ছিল, দেখে যে তার নলে মরচে পড়েছে, বাঁট পচে গেছে। আরো অবাক হল যখন বুঝল যে তার একবুক দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে; পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে বুঝল যে গায়ে শক্তি নেই। ব্যাপারটা কী ? এক রাত্রের মধ্যেই এসব কী ঘটল ? ওদিকে হঠাৎ স্ত্রীর কথা মনে পড়ায় বেচারা আরো ভয় পেয়ে গেল।

গ্রামে তো ফিরল, কিন্তু যে সব অচেনা ! নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখে—কেউ নেই, পোড়োবাড়ি, ভেঙে গেছে। অবশেষে সে আবিষ্কার করল যে, এক রাত্রি নয়, সে ঘুমিয়ে ছিল একটানা বিশ বছর। এর মধ্যে বন্ধুরা বেশির ভাগই মৃত, দজ্জাল বৌটাও বেঁচে নেই। নিজের মেয়েটাকে খুঁজে পেল সে—ভারি লক্ষ্মী হয়েছে। বিয়ে থা হয়েছে। এবং এর মধ্যে দেশটাও স্বাধীন হয়ে গেছে, তার ঘুমের মধ্যেই। কী অদ্ভুত কাণ্ড!

আর্ভিংয়ের এই গল্প এখন মার্কিন লোককাহিনীর সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। আর, পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়েরাই মনে হয় এ গল্প শুনেছে বা পড়েছে।

হা. মা.

রিপাব্লিকান পার্টি (Republican Party)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের অন্যতম। ১৭৯২ সালে টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson : ১৭৪৩–১৮২৬) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এর নাম ছিল 'রিপাব্লিকান ডেমোক্রেটিক পার্টি'। তবে উচ্চ শুল্ককর ধার্যের পক্ষাবলম্বী একটি গ্রুপ জন কুয়িন্স অ্যাডাম্‌স্‌ ও হেনরি ক্লে-র নেতৃত্বে এই পার্টির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নতুন যে দল গঠন করেন, তার নাম রাখা হয় 'ন্যাশনাল রিপাব্লিকা' বা 'হুইগ্‌স্‌'।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান 'রিপাব্লিকান পার্টির' অভ্যুদয় ঘটে ১৮৫৪ সালে। ন্যাশনাল রিপাব্লিকা ও উত্তরাঞ্চলীয় ডেমোক্রেটদের মধ্যকার মৈত্রীজোট থেকে বেরিয়ে এসেই গঠন করা হয় এই দল। শেষোক্ত দু'টি দলই ছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে।

রিপাব্লিকান পার্টি জোরদার হয় ১৮৬১ সালে, এর মনোনয়ন পেয়ে আব্রাহাম্‌ লিঙ্কনের (দ্র) ক্ষমতাসীন হওয়ার মধ্য দিয়ে। দলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী রক্ষণশীল দল হিসাবেও পরিচিত। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থনির্ভর সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণ ও তা বাস্তবায়নই দলটির অন্যতম প্রধান নীতি ও লক্ষ্য। বিভিন্ন সময়ে এর উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে রয়েছেন ব্যারি গোল্ড ওয়ার্টার, রিচার্ড এম. নিক্সন, হুবার্ট এইচ. হামফ্রে, ডোয়াইট ডি. আইসেনহাওয়ার, রোনাল্ড রিগান, জর্জ বুশ প্রমুখ।

এই পার্টির প্রতীক হচ্ছে 'হাতি'।

আ. হ.

রিফ্রিজারেটর / হিমায়ক

যে যন্ত্রের প্রকোষ্ঠে নিম্নতাপমাত্রায় (০° সে.-এর নিচে) মাছ, মাংস, শাকসবজি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি পচনশীল বস্তু দীর্ঘদিন ভাল থাকে তাকে রিফ্রিজারেটর (refrigerator) বা হিমায়ক বলে। সংক্ষেপে একে আমরা ফ্রিজ (fridge) বলি।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের রিফ্রিজারেটর ব্যবহৃত হয়।

গৃহস্থালিতে রিফ্রিজারেটরের শীতলীকরণ-কক্ষটির চারদিক সরু নল দ্বারা বেষ্টিত থাকে। নলটির এক প্রান্ত একটি পাম্পযুক্ত কম্প্রেসারযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অন্য প্রান্তটিকে পেছনে বা তলায় রক্ষিত একটি তামার পাখনার (fins) কুণ্ডলী পেঁচিয়ে কম্প্রেসারের অন্য প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। নলের মধ্যে থাকে এমন এক ধরনের তরল পদার্থ, যা অতি সামান্য চাপ প্রয়োগে বাষ্প থেকে তরলে এবং চাপ বিয়োগে তরল থেকে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়।

শীতলীকরণ-প্রকোষ্ঠে রক্ষিত খাদ্যবস্তু থেকে সুপ্ত তাপ গ্রহণ করে বেষ্টিত নলের মধ্যের তরল বাষ্প হয়। ফলে প্রকোষ্ঠটির তাপমাত্রা হ্রাস পায়। বৈদ্যুতিক পাম্প ঐ বাষ্পকে টেনে এনে উচ্চ চাপে পরবর্তী কুণ্ডলীর মধ্যে পাঠায়। এই গ্যাস বাইরের পরিবেশে তাপ বর্জন করে পুনরায় তরলে পরিণত হয় এবং প্রথম কুণ্ডলীতে প্রবেশ করে। এভাবে ক্রমাগত বাষ্পীভবন ও তরলীভবন ঘটতে থাকে। রিফ্রিজারেটরের মধ্যে একটি থার্মোস্ট্যাট সুইচ থাকে, যার কাজ হল নির্দিষ্ট সময় পরপর মোটর বন্ধ এবং চালু করা। বিভিন্ন প্রকার রিফ্রিজারেটরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তরলকে বাষ্প করা হয়। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে মূলনীতি একই, তা হল—শীতলীকরণ-প্রকোষ্ঠের তাপ গ্রহণ করে তরলকে বাষ্প করা হয় এবং উচ্চ চাপে বাষ্পকে তরল করে পুনশ্চালন করা হয়।

স. রা.

রিম্, জুল জুল্ রিম্ দ্র

রিল্‌কে, রাইনের্ মারিয়া [১৮৭৫—১৯২৬]

জার্মান ভাষার অসামান্য গীতিকবি রিল্‌কে (Rainer Maria Rilke) জন্মেছিলেন প্রাগ শহরে। তাঁর জীবনের সাধনাই ছিল একমাত্র শিল্পচর্চা। নিজে কবিতা লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, অজস্র চিঠিপত্রও। ইউরোপের (দ্র) সমস্ত বড় বড় শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁর বন্ধু ছিলেন। রাশিয়ায় গেছেন তল্‌স্তোয়ের (দ্র) সঙ্গে দেখা করতে, সেখানে বন্ধুত্ব হল বরিস পাস্তের্নাকের (দ্র) পিতা চিত্রশিল্পী লেওনিদের সঙ্গে। ফ্রান্সের প্যারিস (দ্র) শহরে সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করলেন বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর ওগুস্ত্ রদ্যাঁর(দ্র) সঙ্গে। অশান্তভাবে ঘুরে বেরিয়েছেন ইউরোপের নানান দেশ এবং ঘুরতে-ঘুরতে কমবেশি গোটা সাতেক ভাষাও তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল।

কবি হিসাবে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, অনেকটাই যেন রবীন্দ্রনাথের (দ্র) ন্যায় মরমী। তাঁর রচনাবলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 'Die Sonette an Orpheus' (ডি সোনেট্টে আন্ ওর্ফিউস্ : অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট) ও 'Duineser Elegien' (ডুইনেসের্ এলেগিয়েন্: ডুইনো ইলেজি) কাব্যগ্রন্থ এবং 'Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge' (আউফ্‌ট্‌সাইখ্‌নুঙ্গেন্ ডেস্ মাল্টে লাউরিড্‌স্ ব্রিগ্‌গে : মাল্টে লাউরিড্‌স্ ব্রিগ্‌গের নোটবুক) নামে গদ্যরচনা।

মাত্র একান্ন বৎসর বয়সে লিউকেমিয়া (দ্র) রোগে ভুগে অকালে মৃত্যুবরণ করেন ফ্রান্সের ভাল্‌মঁ নামক স্থানে।

হা. মা.

রুজভেল্ট, ফ্র্যাঙ্কলিন্ ডিল্যানো [১৮৮২—১৯৪৫]

বিশ্বখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের(দ্র) ইতিহাসে তিনিই প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি উপর্যুপরি চার বার ঐ পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রুজভেল্ট (Franklin Delano Roosevelt) ১৮৮২ সালের ৩০শে জানুয়ারি নিউইয়র্কের হাইড পার্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জেম্‌স্ রুজভেল্ট এবং মাতা সারা ডিল্যানো। পিতা ছিলেন ভূস্বামী। রুজভেল্ট ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। হার্ভাড কলেজ থেকে ১৯০৪ সালে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯০৭ সালে আইন ব্যবসায় যোগ দিয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯১০ সালে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে সেনেটের সদস্য এবং ১৯২৯ সালে এই দলের প্রার্থী হিসাবেই নিউইয়র্কের গভর্নর নির্বাচিত হন।

১৯৩২ সালে দেশব্যাপী চরম অর্থনৈতিক মন্দার সময়

www.pathagar.com

আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলার ক্ষেত্রে নতুন সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রুজভেল্ট প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরপর তিনি যথাক্রমে ১৯৩৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে পরপর আরো তিন বার প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন।

রুজভেল্টের শাসনের প্রথম দশকটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁর নিউ ডীল (New Deal) নামক নীতি গ্রহণ। আর্থিক সঙ্কট মোচনের লক্ষ্যে গৃহীত এই নীতির জন্য দেশের ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণীর দ্বারা তিনি কিছুটা চাপের সম্মুখীন হলেও এতে সত্যিকার অর্থে দরিদ্র দেশবাসী উপকৃত হয়। তিনি স্বদেশে সুপ্রিম কোর্টে রক্ষণশীল বিচারকদের সরিয়ে উদারনীতির বিচারকদের নিযুক্ত করেন। বৈদেশিক ক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকার (দ্র) দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি, সোভিয়েত ইউনিয়নকে (দ্র) স্বীকৃতিদান, ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটেনের সঙ্গে আটলান্টিক চার্টার সম্পাদন প্রভৃতি রুজভেল্টের উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে মিত্রশক্তির (দ্র) প্রতি তাঁর সরকারের সমর্থন ও সহানুভূতি সত্ত্বেও তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। যুদ্ধ নিবারণের জন্য জার্মানির হিটলার (দ্র), ইতালির মুসোলিনি (দ্র) ও জাপানের (দ্র) হিরোহিতোর প্রতি ব্যক্তিগত আবেদন জানিয়ে শান্তির পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেন। কিন্তু ১৯৪১ সালে জাপানি বোমায় পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হলে রুজভেল্ট বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। তবে যুদ্ধপরবর্তী কালে তিনি বিশ্বে স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনার জন্য কাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই প্রস্তাবে জাতিসংঘ (দ্র) গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৯৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল রুজভেল্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সুজ. ব.

রুবেন্স্, পিটার্ পল্ [১৫৭৭—১৬৪০]

পিটার্ পল্ রুবেন্স্ (Peter Paul Rubens) ফ্লেমিশ চিত্রকর এবং কূটনীতিক। তিনি তাঁর সৃষ্ট চিত্রকলায় পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলীয় এবং ইতালীয় ঐতিহ্যের সর্বোত্তম সমন্বয়কারী।

আইনজীবী ও ম্যাজিস্ট্রেট পিতার সন্তান পিটার্ পল্ রুবেন্স্ ১৫৭৭ সালের ২৮শে জুন ওয়েস্ট্‌ফালিয়ার সিগেনে জন্মগ্রহণ করেন।

১৫৯২ সালে রুবেন্স্ চিত্রকর হিসাবে শিক্ষানবিশি শুরু করেন এবং এন্টওয়ের্প্-এর তিন জন শিক্ষকের কাছে পাঠগ্রহণ শেষে ১৫৯৮ সালে গিল্ডে ভর্তি হন। এর দু' বছর পর তিনি ইতালিতে যান এবং সেখানে ৮ বৎসর কাল অবস্থান করে মানতুয়ার ডিউক ভিন্‌সেঞ্জো গোন্‌জাগা-র রাজকীয় চিত্রকর হিসাবে কাজ করেন।

মাতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রুবেন্স্ ১৬০৮ সালে এন্ট্ওয়েৰ্পে ফিরে আসেন। বংশগত মর্যাদা এবং পারিবারিক ও বৈবাহিক সূত্রে রুবেন্স্ এই সময় প্রভূত বিত্তের অধিকারী হন এবং ১৬১০ সালে এন্ট্ওয়েৰ্পে জমি কেনেন এবং তাতে গড়ে তোলেন একটি প্রাসাদোপম ভবন ও স্টুডিও। বর্তমানে জনসাধারণের জন্য তাঁর এই ভবন ও স্টুডিওর দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

১৬২০-এর দশকের গোড়ার দিকে যুধ্যমান স্পেনীয় ও

শিল্পী রুবেন্সের একটি ড্রইং

www.pathagar.com

শিল্পী রুবেন্সের আঁকা ক্রুশবিদ্ধ যিশু

ওলন্দাজদের মধ্যে নতুন মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে রুবেন্স্ কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। এরই অংশ হিসাবে ১৬২৮–১৬২৯ সালে তাঁকে মাদ্রিদ ও লণ্ডনে (দ্র) যেতে হয়। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টাতেই ১৬৩০ সালে স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ভিত্তি রচিত হয়। তবে বাদবাকি জীবন চিত্রকর হিসাবে আত্মনিয়োগ করার লক্ষ্যে রুবেন্স্ ১৬৩৩ সালে কূটনীতিকের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

রুবেন্সের বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'লাওকুন ও তার সন্ততি', 'দ্য অ্যাডোরেশান অব দ্য শেফার্ড্স্', 'প্রেমকুঞ্জ', 'ক্রুশ উত্তোলন' 'ক্রুশ থেকে অবতরণ, 'ব্যাটল অব দ্য আমাজন্স্, 'লেউসিপুস্-নন্দিনীদের অবমাননা' সিংহ শিকার, 'সন্ত ইনেফোন্সোর বেদি' ইত্যাদি।

১৬৪০ সালের ৩০শে মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

রুমি, জালালুদ্দিন মুহম্মদ [১২০৭—১২৭২]

চিন্তাশীল ফার্সি কবি। তাঁকে 'সুরতানুস সুফি' বা সুফিকুল-সম্রাট বলেও অভিহিত করা হয়। তিনি স্থায়ীভাবে রুম্ (বর্তমান এশীয় তুরস্কের কুমিয়া) শহরে বাস করতেন বলে তাঁর নামের শেষে 'রুমি' যুক্ত হয়। জন্ম ১২০৭ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত বল্খে।

পরবর্তী কালে রুমি ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্য এবং মওলানা সাইয়িদ বুরহানউদ্দিন হুসাইন মুহাজাকিক আল্ তিরমিজির কাছে ১২৩২ থেকে ১২৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুফিতত্ত্বে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। তিনি আলেপ্পো ও দামেস্ক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনাও করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে তাঁকে 'শেখ' বা জ্ঞানবৃদ্ধ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন শামস-ই-তাব্রিজি।

রুমির সাহিত্যসাধনার শ্রেষ্ঠ ফসল ফার্সিতে রচিত ২৬,৬৬০টি শ্লোকযুক্ত 'মসনবী শরীফ', বাংলা ভাষায় যা 'রুমির মসনবি' নামে পরিচিত। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম হচ্ছে 'দেওয়ান' (গীতিকবিতা) এবং 'ফিহি মা ফিহি' নামে একখানি গদ্যগ্রন্থ। বাংলা ভাষাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর সাহিত্যকর্ম অনূদিত ও সমাদৃত।

তাঁর মৃত্যু হয় ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

আ. হ.

রুশ বিপ্লব

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাশিয়ার (দ্র) পেত্রোগ্রাৎ শহরে শ্রমিক-সৈনিক-নাবিকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ইতিহাসে রুশ বিপ্লব বা অক্টোবর বিপ্লব নামে পরিচিত হয়ে আছে। তৎকালে রাশিয়ায় অনুসৃত ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী দিনটি ছিল ২৫শে অক্টোবর। তাই একে অক্টোবর বিপ্লবও বলা হয়ে থাকে। বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল লেনিনের (দ্র) নেতৃত্বাধীন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যাগুরু 'বলশেভিক্' অংশ। এই বিপ্লব বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণী ও

www.pathagar.com

সামন্ত জমিদারদের শাসন উৎখাত করে প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক-কৃষকের রাজ। সাম্যবাদ (দ্র)-এর মতাদর্শে অনুপ্রাণিত এই বিপ্লব সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ৭ই ও ৮ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয় শান্তির ডিক্রি ও জমির ডিক্রি। এতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) রাশিয়ার অংশগ্রহণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং খোদ কৃষকদের হাতে জমি তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত ও ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের মনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। জারশাসিত রাশিয়ার নিপীড়িত জাতিদের স্বশাসনের অধিকার প্রদান, গোটা জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলার অভিযান, সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি মহৎ আদর্শের বাস্তবায়নে সোভিয়েত রাষ্ট্র সচেষ্ট হয়। বিশ্বব্যাপী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরাও এই নবীন রাষ্ট্রের সমর্থনে এগিয়ে আসেন দৃঢ়ভাবে।

বিপ্লবপরবর্তী সময়কাল ছিল নানা দিক দিয়ে জটিল। যে ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা দেশের ভিতর ও বাহির থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। গৃহযুদ্ধ ও বহিঃরাক্রমণ—এই দুই দিকে লড়াই করে নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯২০ সাল নাগাদ সশস্ত্র প্রতিরোধ ও আক্রমণের মাত্রা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯২১ সালে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য লেনিন নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচি বা নেপ (NEP = New Economic Policy) প্রবর্তন করেন। ১৯২৯ সাল থেকে প্রবর্তিত হয় পঞ্চবার্ষিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার রীতি।

কিন্তু সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এইসব পরিবর্তনের মধ্যে নানা অসঙ্গতিও ছিল। সোভিয়েত সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তা একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্বে পরিণত হয়। অর্থনীতি হয়ে পড়ে স্থবির, চিন্তার স্বাধীন বিকাশ হয় রুদ্ধ। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে মহৎ প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল নানা পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি ও জটিলতার কারণে নব্বইয়ের দশকে এসে তা একেবারেই ভেঙে পড়ে।

ম. হ.

রুশ ভাষা

পৃথিবীতে রুশ ভাষাভাষী জনসংখ্যা ১৫ কোটিরও বেশি এবং জাতিসংঘে (দ্র) স্বীকৃত ছ'টি ভাষার অন্যতম।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম একটি হল স্লাভনিক শাখা। এই শাখায় মোট এগারোটি ভাষা আছে। এগারোটি ভাষার এই পরিবার মোট ৩টি শাখায় বিভক্ত: পূর্বী, প্রতীচী ও দক্ষিণী। পূর্বী শাখায় রয়েছে ইউক্রেনী ও রুশ ভাষা; প্রতীচী শাখার অন্তর্ভুক্ত চেক্, স্লোভাক্, পোলিশ, সোর্ব্; আর দক্ষিণী শাখায় আছে স্লোভেন্, সার্বো-ক্রোট, মাকেদোনীয় ও বুলগেরীয় ভাষা। এই ১১টি ভাষাই আদিতে এক সময়ে গ্রিক ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। রুশ ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে বিকশিত হতে শুরু করে ৯ম-১০ম শতাব্দী থেকে এবং এ ভাষার আদি লিখিত রূপ ১১শ শতকের পূর্বে পাওয়া যায় নি। এদিক থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

রুশ ভাষার যে প্রাচীনতম নমুনা বইপত্রে পাওয়া যায় তা একাদশ শতাব্দীর এবং আধুনিক রুশ ভাষার এই প্রাচীন রূপকে 'চার্চ স্লাভোনিক্' বলা হয়। বইপত্রের এই চার্চ স্লাভোনিক্ আর লোকমুখের কথ্য রুশ ধীরে ধীরে সমন্বিত হয়ে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বর্তমান লেখ্য রুশ ভাষার জন্ম দিয়েছে।

রুশ ভাষার বর্ণমালার নাম কিরিলিক্ এবং অক্ষরগুলোর সঙ্গে গ্রিক বর্ণমালার সাদৃশ্য অত্যধিক; রোমান বর্ণমালাও (অর্থাৎ ইংরেজি অক্ষরের মতো) আছে কয়েকটি, তবে তাদের উচ্চারণ আলাদা। বর্ণমালা সংখ্যায় সর্বমোট ৩৩টি, তার মধ্যে ৯টি স্বরবর্ণ ও ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ।

www.pathagar.com

রুশ ভাষায় বাংলার ন্যায় কারক-বিভক্তি ও উপসর্গ রয়েছে। বাংলার মতোই মধ্যম পুরুষ সর্বনামে তুই তুমি আপনি আছে। কিন্তু লিঙ্গ আছে ৩টি : পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ; এবং বচন আছে চার রকমের : এক বচন, দ্বি-ত্রি-চতুর্থী বচন, পঞ্চমাধিক বচন ও বহুবচন। প্রাণীবাচক-অপ্রাণীবাচক নির্বিশেষে শব্দমাত্রেরই লিঙ্গ আছে (জার্মান ও ফরাসি ভাষাতেও একই রকম) এবং তা জানা একান্তই জরুরি; কারণ কারক-বিভক্তি ঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্যই শুধু নয়, ক্রিয়াপদের রূপ নির্ধারণ করতে গেলেও তা না জানলে চলে না। রুশ ভাষার অন্যতম বিশেষত্ব হল, বাংলা-ইংরেজি-ফরাসি-জার্মান ইত্যাদি ভাষায় যেমন সেভাবে সেখানে ক্রিয়ার কাল (tense) নেই; এবং ক্রিয়ামাত্রই রুশ ভাষাতে একজোড়া ক্রিয়া। ঐ জোড়াক্রিয়ার নানান রূপভেদ দিয়ে ক্রিয়ার কাল ব্যক্ত করা হয়।

রুশ ভাষা সাহিত্যসম্পদ ও শব্দসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

হা. মা.

রুশ সাহিত্য

দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়ায় খ্রিস্টধর্মের আগমনের ভিতর দিয়ে রুশ সাহিত্যের সূচনা হয়। এই সময় কিয়েভ্ ছিল রাশিয়ার রাজধানী, এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর। তাই সূচনাকালের রুশ সাহিত্য 'কিয়েভীয় পর্ব' বা 'কিয়েভীয় কাল' বলে অভিহিত। এই সময়কার অধিকাংশ সাহিত্যকর্মই ধর্মকেন্দ্রিক। লিখিত হয় 'ওল্ড চার্চ স্লাভোনিক' ভাষায়।

মূল কিয়েভীয় সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল হিলারিওনের ধর্মোপদেশ ও কিছু ঐতিহাসিক রচনাকর্ম। এইসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যটির নাম হচ্ছে 'ইগরের যুদ্ধগাথা' (১১৮৭ খ্রি.) নামের একটি নাতিদীর্ঘ মহাকাব্য।

মস্কো-পর্ব : আনুমানিক ১২৪০ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার নৃপতিরা তাতারদের বেতনভোগী হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এই সময়কালে মস্কোর প্রভাব বৃদ্ধি পেলেও, সাহিত্য কিন্তু আগের মতোই থেকে যায় ধর্ম ও নীতিকথা-কেন্দ্রিক এবং ইতিহাসের ঘটনাধারা-ভিত্তিক। সাধুসন্তদের জীবনকথা রচনার ওপরও অব্যাহত গুরুত্বারোপ করা হতে থাকে এই সময়। এই সময়কার বিশিষ্ট এক সাহিত্যকর্মের নাম 'জাদোন্‌শ্‌শিনা'। এটি ১৩৮০ সালে কুলিকোভায় তাতারদের ওপর রুশদের প্রথম বড় ধরনের বিজয়ের বিবরণ সংবলিত বীরগাথা।

সপ্তদশ শতাব্দীতে চার্চের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষের মতো ব্যাপক ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার জের হিসাবেই লিখিত হয় 'আর্চপ্রিস্ট্ আভ্‌ভাকুমের জীবনকাহিনী'; এটি আভ্‌ভাকুম্ (আনু. ১৬২০-৮১) নামের এক পাদ্রির আত্মজীবনী। সপ্তদশ শতাব্দীতেই রুশ নাটকের প্রথম উদ্ভব ঘটে। জার্মান ধর্মগুরু ইওহান গড্‌ফ্রিড গ্রেগোরি জার সম্রাটের জন্য এই সময় বিভিন্ন নাটক অনুবাদ ও সেগুলো মঞ্চস্থ করেন। পাশাপাশি নাট্যমঞ্চের জন্য মৌলিক নাটক রচনা করেন 'পোলৎস্ক-এর সিমেওন্ (১৬২৯-৮০)।

অষ্টাদশ শতক : অষ্টাদশ শতাব্দী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার সম্রাট পিটার দ্য গ্রেটের (শা. ১৬৮২-১৭২৫) নেতৃত্বে রাশিয়া সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতার প্রবল প্রভাবের আওতায় আসে। রুশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তখন এল নব জাগরণ। পিটার দ্য গ্রেট চার্চ স্লাভোনিক ভাষার নিয়মরীতি থেকে রুশ ভাষাকে মুক্ত করলেন। লিপিমালায় আনলেন আমূল সংস্কার। এবং এই সময় সূচিত নবজাগরণের কাণ্ডারী হলেন আন্তিওখ্ কান্তেমির্ (১৭০৮-৪৪)। তিনিই প্রথম কবি, যিনি রুশী কথ্য ভাষায় লিখলেন কবিতা।

নিকলাই কারাম্‌জিন্ (১৭৬৬-১৮২৬) আধুনিক ও মার্জিত ভাষাশৈলী প্রবর্তন করেন তাঁর আবেগময় রচনাকর্মে। মহত্তম নীতিগল্পলেখক ইভান্ ক্রিলোফ্ (১৭৬৯-১৮৪৪) এ সময়ই তাঁর গল্পগুলো রচনা করেন। ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা লোপ ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কারের পক্ষে চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটে নিকলাই চের্নিশেফ্‌স্কি (১৮৪০-৬৮), দ্‌মিত্রি পিসারেফ্ (১৮৪০-৬৮) ও পিওত্‌র্ লাভ্রফ্ (১৮২৩-১৯০০)-এর মননশীল প্রবন্ধাদির ভেতর দিয়ে।

পুশ্‌কিন্ এবং তাঁর অব্যবহিত উত্তরসূরি : উনিশ শতকের রুশ সাহিত্যের মহত্তম প্রতিভা আলেক্সান্দ্‌র্ পুশ্‌কিন্ (দ্র)। তিনিই রুশ ভাষাকে সাহিত্যের একটি হাতিয়ার হিসাবে উপযোগী করার প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করেন।

পুশ্‌কিনের সময়কালের আরেক জন তাৎপর্যপূর্ণ লেখক নাট্যকার আলেক্সান্দ্‌র্ গ্রিবইয়েদফ্ (১৭৯৮-১৮৯২)। তাঁর খ্যাতির মূলে রয়েছে তাঁর রচিত কমেডি নাটক 'অতি

www.pathagar.com

চালাকের গলায় দড়ি' (১৮২৩)। পুশ্‌কিনের অন্য দুই উত্তরসূরির এক জন স্বভাবকবি ফিওদর্ তিউৎচেফ্ (১৮০৩-৭৩) এবং রোম্যান্টিক কবি মিখাইল্ লিয়ের্মন্তফ্ (১৮১৪-৪১)। রাশিয়ার প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'আমাদের কালের নায়ক' তাঁরই রচনা।

পুশ্‌কিনের মৃত্যুর পর রুশ সাহিত্যে গুরুত্ব বাড়ে গদ্যের। রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ (দ্র)থেকে বাস্তববাদে উপনীত নিকলাই গোগলের (দ্র) মতো প্রতিভাবান লেখকের হাত দিয়ে এই সময়কালে রচিত হয় কসাকদের জীবনভিত্তিক ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন 'তারাস্ বুল্‌বা' (১৮৩৫), ব্যঙ্গধর্মী নাটক 'ইন্সপেক্টর জেনারেল' ও স্মরণীয় উপন্যাস 'মৃত আত্মা'। বলা হয়ে থাকে, রুশ সাহিত্যে বাস্তববাদের সুস্পষ্ট সূচনা গোগলের বিখ্যাত ছোটগল্প 'ওভারকোট'-এর (১৮৪২) প্রভাবেই।

বাস্তববাদ : প্রভাবশালী সাহিত্য-সমালোচক ভিসারিওন্ বেলিন্‌স্কির(১৮১১-৪৮) নেতৃত্বেই ১৮৪০-এর দশক থেকে সূচিত হয় বাস্তব ভাবধারাসম্পৃক্ত আন্দোলন। এই আন্দোলনকে প্রথমে অভিহিত করা হয় 'স্বভাববাদী ধারা' হিসাবে। তাঁর মৃত্যুর পর একে অভিহিত করা হতে থাকে 'বাস্তববাদী ধারা' হিসাবে। এই আন্দোলনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাবে যেসব লেখকের জন্ম, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইভান্ তুর্গিয়েনেফ্ (দ্র), ফিওদর্ দস্তইয়েফ্‌স্কি (দ্র), লিয়েফ্ তল্‌স্তোয় (দ্র), নাট্যকার আলেক্সান্দ্‌র্ অস্ত্রোফ্‌স্কি (১৮২৩-৮৬), কবি নিকলাই নেক্রাসফ্ (১৮২১-৭৭) এবং ঔপন্যাসিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ আলেক্সান্দ্‌র্ গিয়ের্ৎসেন্ (১৮১২-৭০)।

চেখফ্ এবং গোর্কি : রুশ থিয়েটারের সংস্কারক, ছোটগল্পলেখক এবং নাট্যকার আন্তোন্ চেখফ্ (দ্র) রুশ বাস্তববাদী সাহিত্য-আন্দোলনের শেষপাদের লেখক। তাঁকে বলা হয় রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। ছোটগল্পকার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি বিশ্ববিদিত। চেখফের সমকালীন অপর রুশ সাহিত্যিক হচ্ছেন মাক্সিম্ গোর্কি (দ্র)। তাঁর সাহিত্যজীবন বলশেভিক বিপ্লবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়সীমা পর্যন্ত প্রসারিত।

গৃহযুদ্ধকে অবলম্বন করে ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হন ইজাক্ বাবেল্ (১৮৯৪-১৯৪১) ও বরিস্ পিল্‌নিয়াক্ (১৮৯৪-১৯৫৮) এবং হাস্যরসাত্মক রচনা লিখে রুশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন মিখাইল্ জোশ্‌শেঙ্কো (১৮৯৫-১৯৫৮)।

প্রতীকবাদ ও অন্যান্য আন্দোলন : মধ্য-১৮৯০-এর দশক থেকেই প্রতীকবাদ বাস্তববাদকে ছাপিয়ে একটা প্রধান সাহিত্য-আন্দোলনে পরিণত হয়। কাব্যিক ভাষা সহযোগে সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই ছিল প্রতীকবাদীদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন সাহিত্যশৈলী ও সাহিত্যক্ষেত্রে রহস্যময়তার পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করে। রুশ প্রতীকবাদী শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম হচ্ছেন আলেক্সান্দ্‌র্ ব্লোক্ (১৮৮০-১৯২১)। নেতৃস্থানীয় অপর তিন প্রতীকবাদী কবি হচ্ছেন ভালেরি ব্রিউসোফ্ (১৮৭৩-১৯২৪), কন্‌স্তান্তিন্ বাল্‌মোন্ত্ (১৮৬৭-১৯৪২) এবং আন্দ্রেই বিয়েলি (১৮৮০-১৯৩৪)।

ইতিমধ্যে প্রতীকবাদের বিপরীতে আরো কিছু সাহিত্য-আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এসবের মধ্যে প্রধানতম হল 'ফুতুরিস্ত্' বা ভবিষ্যবাদ (দ্র) নিয়ে আন্দোলন। এর প্রবক্তাদের মধ্যে বিশিষ্টতম ভ্লাদিমির্ মায়াকোফ্‌স্কি (দ্র) এবং ভেলিমির্ খ্লিয়েব্‌নিকফ্ (১৮৮৫-১৯২২)।

সোভিয়েত কাল ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ : ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সূচনা হয় সাহিত্যে সোভিয়েত কাল বা পর্বের। এই সময় সাহিত্য হয়ে ওঠে রাজনীতির অনুগত। প্রায় এক দশককাল পর্যন্ত কোনো লেখক, সাহিত্যিক বা কবি বিপ্লবের সমালোচনা কিংবা তার ভুলত্রুটি বিশ্লেষণ করে কোনো ধরনের রচনা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। তবে ইওসেফ্ স্তালিন্ (দ্র) ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে।

১৯৩০ সালের দিক থেকে নতুন সোভিয়েত শিল্পায়ন কর্মসূচি এবং কৃষির যৌথায়নের ব্যাপারটির আদর্শ প্রচার করার প্রয়োজন তুলে ধরা হয়। ফলে সাহিত্যের মেরুকরণের লক্ষ্য ত্বরান্বিত করতে ১৯২০-এর দশকের বহু পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য গোষ্ঠীকে একটি একক সংগঠন— ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সোভিয়েত লেখক ইউনিয়নে'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং এ কাজটি সম্পাদিত হয় প্রাক্-বিপ্লব যুগের প্রখ্যাত লেখক মাক্সিম্ গোর্কির উদ্যোগে। পাশাপাশি, নতুন সূত্রায়িত নন্দনতাত্ত্বিক মতবাদ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য সাহিত্যিক শৈলী ও আদর্শ হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। পরিণামে সোভিয়েত সাহিত্য একঘেয়ে হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

তবে ১৯৩৪ সালের দমনপীড়ন শুরু হওয়ার আগেভাগে এবং তার পরেও কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ লেখকের কিছু স্মরণীয় রচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে, সেগুলো লিখিত হয় রুশ সাহিত্যের সমৃদ্ধ ধারা বহন করেই। এসব সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভালেন্তিন্ কাতায়েফ্-এর (১৮৯৭-১৯৮৬) 'সমুখের দিন'(১৯৩২), নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯৬৫) মিখাইল্ শলোকফ্ (দ্র)-এর তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'শান্ত' দোন্' (১৯২৮-৩৩), 'সাগরপিয়াসী দোন্' (১৯৪০), লিওনিদ্ লিওনভের (১৮৯৯- ?) শিল্পায়ন সংক্রান্ত ছ'টি উপন্যাসসহ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত 'সোৎ' (১৯৩০) ও 'রুশ বনানী' (১৯৫৩)। বিংশ শতাব্দীর এ ধরনের অন্য দু'জন লেখক হচ্ছেন কন্স্তান্তিন্ ফেদিন্ (১৮৯২-১৯৭৭) এবং আলেক্সি তল্‌স্তোয় (১৮৮৩-১৯৪৫)। এঁরা দু'জন দীর্ঘ উপন্যাস লিখে রুশ সাহিত্যের মূল ধারাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সাহায্য করেন।

দেশত্যাগী লেখক এবং স্তালিন্-উত্তর সাহিত্য : সোভিয়েত আমলে সর্বাগ্রগণ্য নির্বাসিত লেখক হচ্ছেন ভ্লাদিমির্ নবোকফ্ (১৮৯৯-১৯৭৭) এবং ইভান্ বুনিন্ (১৮৭০-১৯৫৩)। ১৯১৯ সালে দেশত্যাগী ইভান্ বুনিন্ প্রথম রুশ লেখক যিনি ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পরপরই সাহিত্যের ওপর থেকে সরকারি বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করা হয়। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক হচ্ছেন ইলিয়া এরেন্‌বুর্গ্ (১৮৯১-১৯৬৭) এবং আলেক্সান্দ্র্ সোল্‌ঝেনিৎসিন্ (জ. ১৯১৮)। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম মূলত উপন্যাস : 'ইভান্ দেনিসোভিচের জীবনের একটি দিন'। 'ক্যান্সার ওয়ার্ড' (১৯৬৮), ও 'প্রথম বৃত্ত' (১৯৬৮) ও 'আগস্ট ১৯১৪' (১৯৭১); তাঁর অপর উপন্যাস 'গুলাগ্ আর্কিপেলাগো' প্রকাশিত হয় বিদেশের মাটিতে। ১৯৭০ সালে সোল্‌ঝেনিৎসিন্ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) পান।

বরিস্ পাস্তের্নাক্ (১৮৯০-১৯৬০) ১৯৫৮ সালে তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু সরকারি বিধি-নিষেধ তাঁকে সে পুরস্কার প্রত্যাখান করতে বাধ্য করে।

কবিতা, নাটক ও সমালোচনা : আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্যে কবিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বলশেভিক বিপ্লবের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মায়াকোফ্‌স্কি, আন্না আখমাতভা, পাস্তের্নাক ও মারিয়া ৎস্‌ভেতায়েভা। ষাটের দশকে সবচেয়ে খ্যাতি লাভ করেন আন্দ্রেই ভজনেসিয়েন্‌স্কি (জ. ১৯৩৩), ইভ্‌গিয়েনি উভতুশেভেকা (জ.১৯৩৩) এবং ইওসেফ ব্রোদ্‌স্কি। ব্রোদ্‌স্কি আমেরিকায় চলে যান এবং সেখানকার নাগরিক হিসাবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৮৭ সালে।

তবে ১৯৮৫ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে 'পেরেস্ত্রোইকা' ও 'গ্লাস্‌নস্ত্'-এর সূচনা হলে তার প্রভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে যুগপ্রাচীন ও বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ রুশীয় ধারা-অভিমুখী সাহিত্যযাত্রার পথ প্রশস্ত হয়। পরিশেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় রীতিনীতিসহ রাশিয়ার নবজন্ম হলে এই ধারা বেগবান হওয়ার পথ আরো সুগম হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনের ইতি ঘটিয়ে ১৯৯৪ সালে আলেক্সান্দ্র্ সোল্‌ঝেনিৎসিনের স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন তারই সাক্ষ্য বহন করছে। শুধু তাই নয়, স্তালিন, খ্রুশ্‌শোফ্ ও ব্রেজ্‌নেফ্-এর কমিউনিস্ট শাসনামলে যেসব গুরুত্বপূর্ণ গদ্য-পদ্য সাহিত্যকর্ম আলোর মুখ দেখে নি এতদিন, সেগুলো একের পর এক এখন প্রকাশিত হচ্ছে।

আ. হ.

রুসো, জঁ-জাক্ [১৭১২—১৭৭৮]

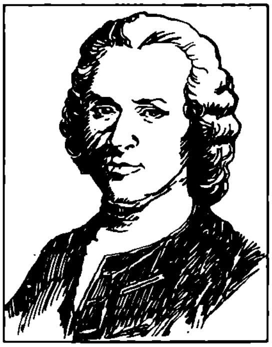

ফরাসি দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক ও সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ। আঠারো শতকে ফরাসি দেশের এক দল চিন্তাবিদ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নতুন নতুন ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়ে মানবসমাজের উন্নতিতে মনোনিবেশ করেন। জঁ-জাক্ রুসো (Jean-Jacques Rousseau) সেই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ।

জঁ-জাক্ রুসোর জন্ম ১৭১২ সালে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায়। পিতা ছিলেন গরিব ঘড়িমিস্ত্রি। রুসোর জন্মের সময় তাঁর মা মারা যান। অল্প বয়স থেকেই তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল বিচিত্র। ১৭২৮ সালে প্রায় পনেরো বছর বয়সে তিনি জেনেভা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গীতের প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ।

www.pathagar.com

১৭৪১ সাল থেকে ১৭৪২ পর্যন্ত সঙ্গীতকে জীবিকানির্বাহের উপায় হিসাবে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৭৪২ সালে প্যারিসে (দ্র) আসেন। এখানে কয়েক জন বিখ্যাত লেখক, দার্শনিক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৭৪৩ থেকে ১৭৪৪ সাল পর্যন্ত তাঁদের সূত্রে ভেনিসে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সচিব হিসাবে চাকুরি করেন। ১৭৪৯ সালে প্যারিসের দিজন একাডেমী এক রচনা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য কি মানুষকে উন্নত করেছে, না আরো কলুষিত করেছে? প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে রুসো খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, প্রচলিত সমাজ আর মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। বাকি জীবন তিনি এ বিষয়ে দিঙ্‌নির্দেশনা দেওয়ার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত বই 'সামাজিক চুক্তি'। তিনি মনে করতেন, রাষ্ট্র গঠনের আগে মানুষের স্বার্থপরতা এতটা প্রকট ছিল না। তখন অন্যের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করাই ছিল মানুষের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এক পর্যায়ে মানুষ বুঝতে পারে, ব্যক্তির একার পক্ষে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে নিরাপদ থাকা সম্ভব নয়। তাই মানুষ কিছু নিয়ম রক্ষার চুক্তি করে। এই চুক্তি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির। এর মূলকথা হচ্ছে একে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। এটাই হচ্ছে রাষ্ট্র। প্রত্যেকের ইচ্ছা দিয়ে এর সৃষ্টি বলে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই এই সাধারণ ইচ্ছাকে জবরদস্তি বলে মনে করা চলে না। আবার এই সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্তির যথার্থ স্বার্থের বিরোধী কোনো নিয়ম বা নিষেধ আকারেও প্রকাশিত হতে পারে না।

তিনি ছিলেন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। তিনি মনে করতেন, সমাজের অসাম্য ও অবিচারের মূল হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া। তবে ব্যক্তির সীমিত সম্পদ রক্ষার তিনি বিরোধী ছিলেন না। তাঁর মতে শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে সকল নাগরিক শ্রমের মর্যাদাকে অনুভব করতে পারে। রুসোর এ ধরনের নতুন বক্তব্য ফরাসি শাসকেরা পছন্দ করেন নি। তাই তাঁকে ইংরেজ দার্শনিক হিউমের (দ্র) আশ্রয়ে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে হিউমের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে আবার তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসেন। আত্মজীবনীমূলক রচনা 'কনফেশান্‌স', 'ডিসকোর্স অন পলিটিক্যাল ইকনমি' তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। নাটক, অপেরা, কবিতা ও সঙ্গীতের অভিধানও রচনা করেছিলেন তিনি। 'এমিল্' নামে একটি বিখ্যাত উপন্যাসও আছে তাঁর। যে ক'জন দার্শনিকের চিন্তা ফরাসি বিপ্লবের (দ্র) পথ খুলে দিয়েছিল রুসো তাঁদের অন্যতম। ১৭৭৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. মা.

রূপকথা

ছেলেভুলানো অসম্ভব গল্প বা কল্পকাহিনীই রূপকথা। উৎপত্তি অনুসারে রূপকথার দু'টি ধরন দেখা যায় : (১) লৌকিক রূপকথা, (২) সাহিত্যিক রূপকথা।

(১) লৌকিক রূপকথা : মানবসমাজে প্রচলিত বংশপরম্পরায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যেসব কল্পকাহিনী প্রচলিত রয়েছে সেগুলোই লৌকিক রূপকথা। জার্মানির বাসিন্দা গ্রিম পরিবারের দুই ভাই (Grimm Brothers নামে পরিচিত) সর্বপ্রথম ইউরোপে প্রচলিত রূপকথাগুলো সংগ্রহ ও সঙ্কলন করেন। বাংলাদেশে রূপকথাগুলোর প্রথম সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (দ্র)। বাংলার আনাচেকানাচে ছড়ানো রূপকথাগুলো সংগ্রহ করে তিনি 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' ও 'ঠাকুরমার ঝুলি' নামে দু'টি খণ্ডে সঙ্কলন করে প্রকাশ করেন। রূপকথাগুলোতে যেমন স্বাধীন কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় মেলে তেমনি সত্য ও ন্যায়ের জয়ও দেখানো হয়েছে।

(২) সাহিত্যিক রূপকথা : এই ধরনের রূপকথাগুলোও দেশ-কাল-সমাজ পেরিয়ে কল্পলোককে পাঠকের সামনে উপস্থিত করে। তবে লৌকিক রূপকথার রচয়িতার নাম জানা যায় না, সাহিত্যিক রূপকথার স্রষ্টাদের নাম জানা যায়। ইউরোপে এই ধরনের গল্পকার হচ্ছেন লিউইস্ ক্যারোল (দ্র), হান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেন্ (দ্র) এবং অস্কার ওয়াইল্ড (দ্র); আর বঙ্গদেশে আছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (দ্র)। এসব গল্পের শেষেও সত্যের জয় দেখানো হয়।

মে. খা.

রূপজালাল ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, নওয়াব দ্র
রূপা রৌপ্য/রূপা দ্র

www.pathagar.com

রেকর্ড প্লেয়ার গ্রামোফোন দ্র

রেক্টিফাইড স্পিরিট অ্যালকোহল দ্র

রেক্টিফায়ার (rectifier)

রেডিও (দ্র) টেলিভিশনে (দ্র) এবং অন্যান্য অনেক কাজে ক্রমাগত দিকপরিবর্তী এ.সি. তড়িৎকে একই দিকাভিমুখী ডি. সি. তড়িতে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হয়। যে কৌশল বা ব্যবস্থা এ. সি.-কে শুধু এক দিকে প্রবহমাণ ডি. সি.-তে রূপান্তরিত করে তাকে রেক্টিফায়ার বলে।

সাধারণত ডায়োড (দ্র) ভাল্‌ভ্‌ রেক্টিফায়ারের কাজ করে থাকে। দু'টি তড়িৎদ্বারবিশিষ্ট বায়ুশূন্য ভাল্‌ভ্‌কে ডায়োড বলা হয়। এর একটি তড়িৎদ্বারকে বলা হয় প্লেট বা অ্যানোড (+) এবং অপরটিকে বলা হয় ফিলামেন্ট বা ক্যাথোড (−)। প্লেটটিকে ব্যাটারির উচ্চ বিভবযুক্ত ধনাত্মক টার্মিনালের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাপ প্রয়োগে ফিলামেন্ট থেকে ইলেক্ট্রন (দ্র) নিঃসৃত হয় এবং ধনাত্মক বিভবযুক্ত প্লেট দ্বারা তা আকৃষ্ট হয়। ফলে ফিলামেন্ট থেকে প্লেটের দিকে তড়িৎপ্রবাহ চলতে থাকে। প্লেট ঋণাত্মক বিভবযুক্ত হলে কিন্তু কোনো তড়িৎপ্রবাহ চলত না। প্লেট ও ফিলামেন্টের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ একমুখী হওয়ায় একে ভাল্‌ভ্‌ বলে। ডায়োডে একমুখী তড়িৎ প্রবাহ চলে বলে একে রেক্টিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

রেক্টিফায়ার এ.সি.-কে ডি.সি.-তে রূপান্তরিত করা ছাড়াও রেডিও ও টেলিভিশনে যে বিশেষ ধরনের রেক্টিফায়ার থাকে তাকে 'ডিটেক্টার' বলা হয়। রেডিও ও টেলিভিশনে প্রাপ্ত সঙ্কেত সব সময় দিকপরিবর্তন করে, কিন্তু রেডিও ও টেলিভিশনে কোনো কিছু শুনতে হলে এই সঙ্কেতের দিক অবশ্যই একমুখী হতে হবে। কাজেই এই ডিটেক্টার সঙ্কেতকে একই দিকাভিমুখী করে দেয় এবং সঙ্কেত-বহনকারী তরঙ্গকে পৃথক করে ফেলে।

মু. এ.

রেচনতন্ত্র (excretory system)

দেহে অনবরত চলছে খাদ্যের দহন। দেহকোষে সংঘটিত বিপাকক্রিয়া শরীরে শক্তি যোগান দেয়, তৈরি করে বর্জ্যবস্তু। বর্জ্যবস্তু দেহে বেশিক্ষণ থাকলে শরীরের ক্ষতি হয়। যে প্রক্রিয়ায় এই বর্জ্যবস্তুগুলো শরীর থেকে দ্রুত ও নিয়মিত বের হয়ে যায়, তারই নাম 'রেচন'। যে যন্ত্রগুলো এই রেচনকাজে দরকারে লাগে তাদের নিয়েই গঠিত রেচনতন্ত্র। কিড়নি (বৃক্ক), ইউরেটার, মূত্রথলি ও মূত্রনালি নিয়ে এ তন্ত্র গঠিত। শরীরের প্রধান রেচনতন্ত্র কিড্‌নি হলেও ত্বক ও ফুসফুসের ভূমিকাও কম নয়।

কিড্‌নি তৈরি করে মূত্র। শিমের বীচির মতো দেখতে চার ইঞ্চি লম্বা দুটো কিড্‌নি উদর-গহ্বরের পেছন দিকে রয়েছে। প্রতিটির ওজন ১৩০-১৫০ গ্রাম। কিড্‌নিতে আছে অসংখ্য ফিল্টার বা ছাঁকনি। এই ছাঁকনির পর রয়েছে পেঁচানো দীর্ঘ নলিকা। হৃৎপিণ্ড (দ্র) থেকে ধমনীপথে যে রক্ত কিড্‌নিতে আসে, সেই রক্তকে কিড্‌নির ছাঁকনি পরিস্রুত করে। কিড্‌নির ছাঁকনি ছেঁকে রেখে দেয় শরীরের জন্য দরকারী প্রোটিন। এরপর বাকি তরল পদার্থ প্রবাহিত হয় কিড্‌নির পেঁচানো নলিকার মধ্য দিয়ে। নলিকাপথে যাওয়ার সময় দেহের জন্য প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ (দ্র), ফসফেট ও বেশির ভাগ পানি পুনরায় শোষিত হয় রক্তে। শরীরের জন্য অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে কিড্‌নি থেকে বেরিয়ে দুটো ইউরেটরের মধ্য দিয়ে মূত্রথলিতে এসে জমা হয়। মূত্রথলি ভরাট হলে স্নায়ু সঙ্কেত যায় মস্তিকে। মস্তিষ্ক ফিরতি-সঙ্কেত পাঠায় মূত্রথলির পেশিগুলোকে। মূত্রথলি সঙ্কুচিত হলে মূত্রনালিপথে মূত্র বেরিয়ে আসে। মূত্রের সঙ্গে আসে দেহের জন্য অপ্রয়োজনীয় ইউরিয়া, ক্রিয়াটিনিন, ইউরিক অ্যাসিড ও হাইড্রোজেন আয়ন। মূত্রথলি খুবই স্থিতিস্থাপক, আয়তনে ৫০০ মিলিলিটার।

সংক্ষেপে একজোড়া কিড্‌নির কাজ হল— শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর পদার্থ নিষ্কাশন, প্রয়োজনীয় উপাদান সংরক্ষণ এবং শরীরে লবণ ও পানির সমতা রক্ষণ। এ ছাড়া কিড্‌নি দেহের রক্তচাপও (দ্র) নিয়ন্ত্রণ করে। কিড্‌নি ও সংশ্লিষ্ট রেচনতন্ত্রের রোগের মধ্যে নেফ্রাইটিস, নেফ্রোসিস, পায়েলোনেফ্রাইটিস, বৃক্কপাথুরি ও ক্যান্সার (দ্র) উল্লেখযোগ্য।

শু. চৌ.

রেজিন (resin)

রেজিন এক রকম আঠালো জৈব পলিমার (দ্র)। এটা আগুনে পোড়ে না, পানিতে গলে না; কিন্তু অ্যালকোহল (দ্র) জাতীয় জৈব দ্রাবকে গলে যায়। উদ্ভিদ কিংবা কীটপতঙ্গ (দ্র) থেকে

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক রেজিন পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়েও রেজিন তৈরি করা যায়। কতকগুলি রেজিন (এপক্সি, ইউরিয়া ফর্ম্যাল্ডিহাইড, কিছু পলি ইউরেথেন ইত্যাদি) তাপ দিলে শক্ত হয়। আর কতকগুলি রেজিন (যেমন–পলিথিন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড, পলিপ্রোপিলিন, সেলুলোজ অ্যাসিটেট ইত্যাদি) তাপ দিলে গলে যায়।

সা. এ.

রেজিস্টর/রোধ

কোনো বৈদ্যুতিক বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহে রেজিস্ট্যান্স বা বাধা সৃষ্টির জন্য যে জিনিসটি ব্যবহার করা হয় তাকেই রেজিস্টর (resistor) বা রোধ বলে। বিদ্যুৎবর্তনীতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কার্বনের রোধ ব্যবহার করা হয় এবং এই রোধের উপর অঙ্কিত বৃত্তের রঙ ও বিন্যাস দেখে বোঝা যায় কোনটি কত রেজিস্ট্যান্সের রোধ। সাধারণত ম্যাঙ্গানিন তারের কুণ্ডলী রোধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ১৩-১৮ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ এবং ১–৪ শতাংশ নিকেলের মিশ্রণে এই ম্যাঙ্গানিজ তার তৈরি হয়। এই তারের বৈদ্যুতিক রেজিস্ট্যান্স বা রোধশক্তি খুব বেশি এবং তাপের তারতম্যের জন্য রেজিস্ট্যান্সের খুব একটা পার্থক্য হয় না। এ জন্যই এই তারকে রোধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক বাধা বা রেজিষ্ট্যান্স মাপার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে ওহ্‌ম্ (ohm) বলে। যদি কোনো বিদ্যুৎপরিবাহী বস্তুর দু'প্রান্তে বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্য এক ভোল্ট (দ্র) হয় এবং তার ভিতর দিয়ে এক অ্যাম্পেয়ার (দ্র) বিদ্যুৎ চলতে থাকে, তবে তার রেজিস্ট্যান্স হবে এক ওহ্‌ম্। জার্মান বিজ্ঞানী গেওর্গ্ ওহ্‌ম্ (Georg Simon Ohm : ১৭৮৯-১৮৫৪)-এর নামানুসারে এই এককের নাম হয়েছে। যে কোনো বৈদ্যুতিক বর্তনীতে সাধারণত দু'ভাবে এই রোধের সংযোগ করা হয়। যথা : অনুক্রম সংযোগ ও সমান্তরাল সংযোগ।

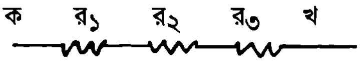

অনুক্রম সংযোগ

দুই বা ততোধিক রোধ আনুক্রমিকভাবে সংযুক্ত হলে বর্তনীতে এদের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স তাদের যোগফলের সমান হবে—

$$র = র_{১} + র_{২} + র_{৩}$$

অনুক্রম সংযোগের ক্ষেত্রে সকল রেজিস্টরে একই বিদ্যুৎপ্রবাহ হবে।

দুই বা ততোধিক রোধ বিদ্যুৎবর্তনীতে সমান্তরালভাবে যুক্ত থাকলে তাদের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্সের উল্টো মান প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক রেজিস্ট্যান্সের উল্টো মানের যোগফলের সমান।

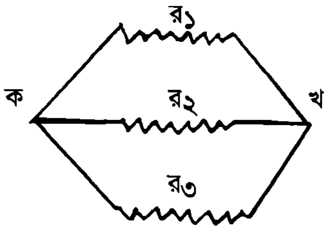

সমান্তরাল সংযোগ

যেমন : $\frac{১}{র} = \frac{১}{র_{১}} + \frac{১}{র_{২}} + \frac{১}{র_{৩}}$

সমান্তরাল সংযোগের ক্ষেত্রে বিভবপার্থক্য (ক-খ বিন্দুতে) একই থাকে।

কিন্তু অনুক্রম সংযোগের বেলায় ক-খ বিন্দুর বিভব-অন্তর প্রত্যেকটি রোধপ্রান্তের বিভব-অন্তরের যোগফলের সমান।

মু. এ.

রেটিনা চক্ষু দ্র

রেড ইণ্ডিয়ান (Red Indian)

উত্তর আমেরিকা (দ্র) মহাদেশের (দ্র) আদিবাসীরা সাধারণত রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত। ইদানীং এদের আমেরিকান ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজিতে রেড বললেও এদের গায়ের রঙ প্রকৃতপক্ষে লাল নয়, এদের রঙ বাদামি। তবে এদের কেউ কেউ দেহে লাল রঙ মাখত। সেই থেকে রেড ইণ্ডিয়ান, রেড ম্যান কিংবা রেড স্কিন, অর্থাৎ লাল চামড়ার লোক বলে এরা পরিচিত হয়ে ওঠে। এদের বেলায় প্রযোজ্য ইণ্ডিয়ান শব্দটিও ভুল। কলম্বাস (দ্র) ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ইণ্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষে আসার পথ খুঁজে বের করতে গিয়ে আমেরিকার বর্তমান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (দ্র) নামক

www.pathagar.com

স্থানে উপস্থিত হয়ে মনে করেছিলেন, তিনি ইণ্ডিয়ায় এসেছেন এবং তাই তিনি সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের ইণ্ডিয়ান হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। সেই থেকে এই ভুল চলে আসছে।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা চল্লিশ থেকে বিশ হাজার বছর আগে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল ও বসবাস গড়ে তুলেছিল বলে মনে করা হয়। এরাই সেখানকার আদি বাসিন্দা। এরা বিভিন্ন ভাষাভাষী। এরা স্থানে স্থানে নানা ধরনের রাজ্য গড়ে তুলেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেও এরা নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। মায়া (দ্র), আজ্‌টেক (দ্র), ইন্‌কা (দ্র) ইত্যাদি সভ্যতা এদের অবদান।

সৈ. আ. ই.

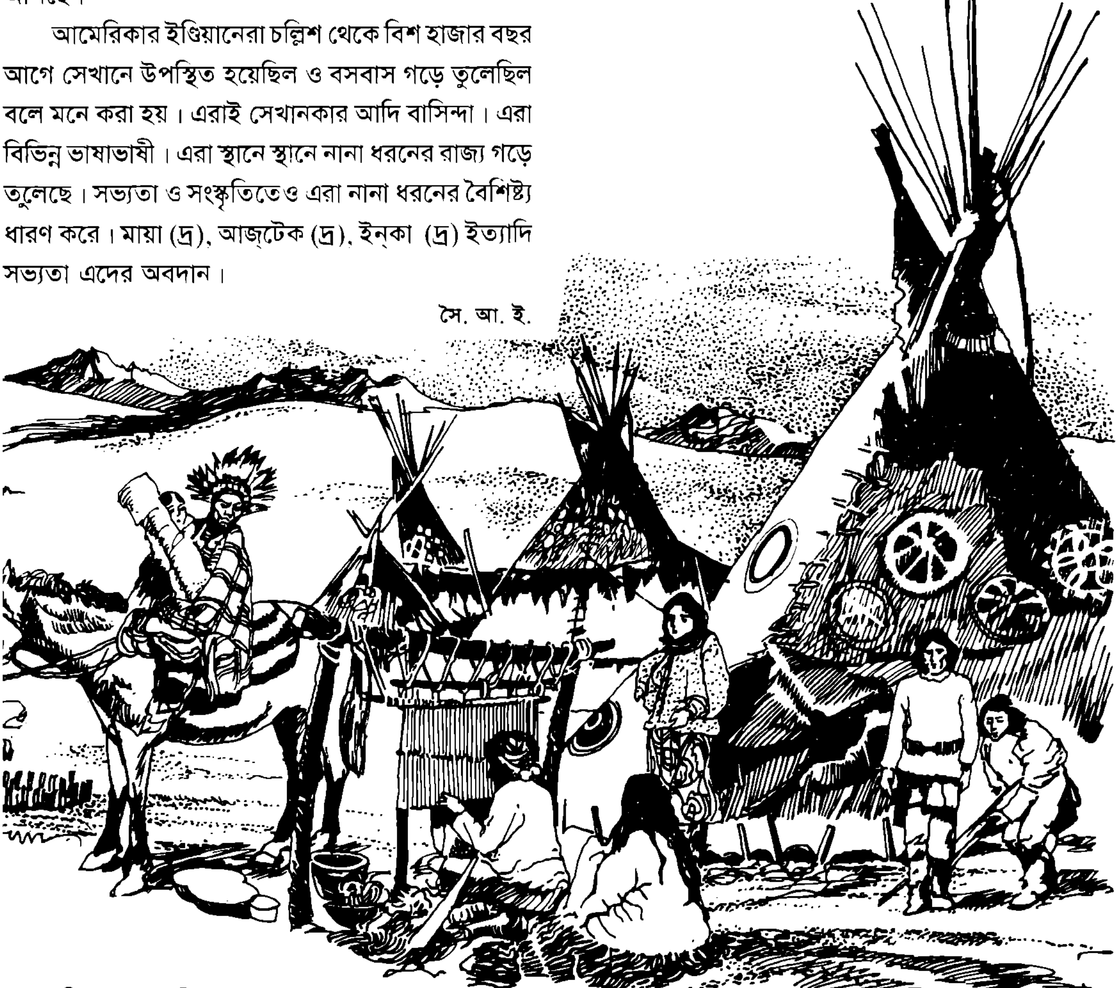

রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি গ্রাম

রেড ক্রস (Red Cross)

সারা বিশ্বের দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। যুদ্ধবন্দি, যুদ্ধাহত, বাস্তুহারা, রুগ্‌ণ ও যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা ও উদ্ধার করাই এই সংস্থার কাজ। এ ছাড়া ব্লাড ব্যাংকের রক্ষণাবেক্ষণসহ পানির বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দানও এর কার্যক্রমের অংশ।

সুইজারল্যাণ্ডের মানবতাবাদী নাগরিক জঁ অঁরি দ্যুনঁ (Jean Henri Dunant : ১৮২৮-১৯১০)-র উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় রেড ক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে স্বেচ্ছাসেবামূলক ত্রাণকাজের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু, এবং ১৮৬৩ সালে এটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। এর প্রতীকচিহ্ন হল সাদা পটভূমির ওপর লাল ক্রস (+) চিহ্ন।

রেড ক্রসের প্রধান কার্যালয় জেনেভায়। সুইজারল্যাণ্ডের ২৫ জন নাগরিক নিয়ে এর আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত। ৭৪টি স্বাধীন দেশ এই সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

তবে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এর আঞ্চলিক শাখা রয়েছে। ইসলামী দেশগুলোতে এই প্রতিষ্ঠান রেড ক্রিসেন্ট নামে পরিচিত। এর প্রতীকচিহ্ন হল চাঁদ। বাংলাদেশেও বহু পূর্ব থেকেই রেড ক্রসের শাখা আছে। বেশ কয়েক বৎসর হল এর নাম পাল্টে রেড ক্রিসেন্ট রাখা হয়েছে। ইসরায়েলে এর শাখার নাম রেড স্টার।

১৯৬৩ সালে রেড ক্রস আন্তর্জাতিক কমিটি ও রেড ক্রস সোসাইটিসমূহের লীগ যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে।

সুজ. ব.

রেডার

Radio **D**etection **a**nd **R**anging-কে সংক্ষেপে radar (রেডার; 'রাডার' উচ্চারণ ভুল) বলা হয়।

কোনো নিম্নচাপের অবস্থান ও দূরত্ব, শত্রুবিমানের অবস্থান ও দূরত্ব ইত্যাদি জানার জন্য রেডার ব্যবহৃত হয়।

রেডার থেকে রেডিওতরঙ্গ কোনো বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয়ে তা আবার রেডারের গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়লেই বস্তুটির উপস্থিতি ও অবস্থান রেডার বলে দিতে পারে। রেডারে থাকে একটি প্রেরক, একটি গ্রাহক ও একটি সূচক। প্রেরক থেকে অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের (দ্র) রেডিওতরঙ্গ প্রেরণ করা হয়। এই তরঙ্গ কোনো বস্তুর গায়ে প্রতিফলিত হয়েগ্রাহকযন্ত্রে ফিরে আসে এবং বিবর্ধিত হয়। এই বিবর্ধিত শক্তি 'সূচকযন্ত্র' বা অসিলোস্কোপ্-এর পর্দায় প্রতিবিম্ব গঠন করে। এই প্রতিবিম্ব দেখে দূরাগত বিমান, জাহাজ, নিম্নচাপ ইত্যাদির অবস্থান ও গতির দিক সম্পর্কে সুস্পস্ট ধারণা পাওয়া যায়।

মু. এ.

রেডিও (radio)

আধুনিক কালে যোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হল রেডিও বা বেতার। শব্দ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন, তা না হলে শব্দ বেশি দূর যেতে পারে না। রেডিও সম্প্রচারে তাই নাটক, গান বা কোনো অনুষ্ঠানের শব্দকে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হয়। আমাদের ঘর-বাড়িতে যে রেডিও সেট থাকে তা আসলে রেডিওগ্রাহকযন্ত্র। এই গ্রাহকযন্ত্র তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গকে গ্রহণ করে একে মূল শব্দসঙ্কেতে রূপান্তরিত করে। ফলে আমরা রেডিও অনুষ্ঠান শুনতে পাই। কোনো ব্যক্তি যখন মাইক্রোফোনে কথা বলে, মাইক্রোফোন (দ্র) তখন কথা থেকে সৃষ্ট কম্পনকে অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক প্রবাহে রূপান্তরিত করে। একে বলা হয় ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যাল বা বৈদ্যুতিক সঙ্কেত। ট্রান্সমিটার এরিয়েলে এই তড়িৎপ্রবাহকে দ্রুত অগ্র-পশ্চাৎ চালনা করে একে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বা বেতার তরঙ্গে পরিণত করা হয়। এই বেতার তরঙ্গকে নিরবচ্ছিন্ন স্রোত হিসাবে পাঠানো হয়। একে ক্যারিয়ার ওয়েভ বা বাহক-তরঙ্গ বলে। আমাদের গৃহে রক্ষিত রেডিও সেট তার সঙ্গে সংযুক্ত এরিয়েলের সাহায্যে এই তরঙ্গকে গ্রহণ করে। রেডিও সেট বেতার তরঙ্গকে তড়িৎসঙ্কেতে পরিণত করে লাউড স্পীকারে প্রেরণ করে। লাউড স্পীকার এই তড়িৎসঙ্কেতকে শব্দে রূপান্তরিত করে। এভাবেই রেডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। গুহ্লিয়েল্মো মার্কোনি (দ্র) ১৮৯৫ সালে রেডিও আবিষ্কার করেন। প্রথম রেডিও মোর্স কোডের (দ্র) দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করে। বর্তমানে সারা বিশ্বে রেডিওটেলিগ্রাফির মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। ১৯২০ সালে রেডিও স্টেশন থেকে প্রথম বিনোদনমূলক রেডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। এখন পৃথিবীর প্রতিটি দেশে একাধিক রেডিও স্টেশন রয়েছে।

শা. ত.

রেডিও-থেরাপি (radio-therapy)

তেজস্ক্রিয়তা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ নিরাময় বা রোগের প্রকোপ কমিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত চিকিৎসাপদ্ধতির নাম রেডিও-থেরাপি।

রেডিও-থেরাপিতে প্রধানত আধান (দ্র)-যুক্ত তেজস্ক্রিয়তা (ionising radiation) ব্যবহৃত হয়। তেজস্ক্রিয়তার উৎস হিসাবে রেডিয়াম (দ্র), রেডন (redon) তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (radioactive isotope) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (যেমন,

www.pathagar.com

কোবাল্ট-৬০) থেকে গামা রশ্মি (দ্র) নির্গত হয়। এ রশ্মি সহজেই কোষের গভীরে প্রবেশ করে রোগাক্রান্ত কোষ ধ্বংস করতে পারে। রেডিও-থেরাপিতে ইনফ্রারেড রশ্মি (infrared ray) এবং অতি বেগুনি রশ্মিও (আলট্রাভায়োলেট রে) ব্যবহার করা হয়, যা তাপ উৎপাদনকারী রশ্মি হিসাবে স্নায়ুপ্রদাহ এবং অস্থিসন্ধি-প্রদাহের উপশম ঘটায়।

ক্যান্সার (দ্র), টিউমার এবং রক্তের কোনো কোনো অস্বাভাবিকতা, যেমন লিউকেমিয়া (দ্র) রোগের চিকিৎসায় রেডিও-থেরাপির ব্যবহার রয়েছে। রেডিও-থেরাপির মাধ্যমে দ্রুত বর্ধনশীল ক্যান্সার কোষকে ধীর বর্ধনশীল কোষের চেয়ে সহজে বিনষ্ট করা যায়। রেডিও-থেরাপি প্রয়োগে টিউমার সারানোর জন্য টিউমারের মধ্যে তেজস্ক্রিয় উপাদান সংস্থাপন করা হয়, অথবা অতিক্ষমতাসম্পন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মির উৎসের সামনে টিউমার উন্মুক্ত করা হয়। এরপর টিউমার কোষে তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করা হয়।

রেডিও-থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসার সময় রোগাক্রান্ত কোষগুলোর সঙ্গে কিছু কিছু স্বাভাবিক কোষও নষ্ট হতে পারে। সুতরাং তেজস্ক্রিয়তাজনিত স্বাভাবিক কোষের ক্ষতিপূরণ করার জন্য এ চিকিৎসাপদ্ধতি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হয়। রেডিও-থেরাপি গ্রহণে রোগীর শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ (যেমন— বমি, বমি-বমি ভাব, চুল পড়া, ওজন হ্রাস, দুর্বলতা, শরীরে রক্তকোষের সংখ্যা হ্রাস, ত্বকের জটিলতা ইত্যাদি) দেখা দিতে পারে।

সি. না. হ.

রেডিওলজি (radiology)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের (দ্র) যে শাখায় রঞ্জনরশ্মি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগনির্ণয় করা হয় তাকে রেডিওলজি বলা হয়।

রঞ্জনরশ্মি বা এক্স-রে (X-ray) আবিষ্কার রেডিওলজির ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করেছে। রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগে শরীরে অস্থির অবস্থান ও রোগনির্ণয়, শরীরে বহিরাগত বস্তুর উপস্থিতি (যেমন— বন্দুকের গুলি) চিহ্নিতকরণ এবং আলসার জাতীয় রোগ শনাক্তকরণ সহজ হয়েছে। রেডিওলজির উন্নতি সাধনের ফলে বর্তমানে দেহের কোনো অঙ্গ 'স্ক্যানিং' (scanning) করে এবং অতিশব্দতরঙ্গ (ultrasound wave) ব্যবহারের মাধ্যমে রোগনির্ণয় সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও রঞ্জনরশ্মির বিভিন্নমুখী ব্যবহারিক উন্নতির ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে রোগনির্ণয়কারী 'ক্যাট স্ক্যানিং' (CAT scanning) যন্ত্রসহ আরো বিভিন্ন রকম স্ক্যানিং যন্ত্র, যা রেডিওলজিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

সি.না.হ.

রেডিয়াম (radium)

একটি তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক মৌল। এর পারমাণবিক সংখ্যা ৮৮, ওজন ২২৬ ও প্রতীক Ra।

১৮৯৮ সালে পিয়ের কুরি (দ্র) ও মারি কুরি (দ্র) লক্ষ করলেন পিচব্লেণ্ডে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম আছে, তার তুলনায় এর তেজস্ক্রিয়তা চার-পাঁচ গুণ বেশি। মারি কুরির সদ্য আবিষ্কৃত পোলোনিয়ামের উপস্থিতিও এই বাড়তি তেজস্ক্রিয়তার কারণ নয়। তখন বোঝা গেল, পিচব্লেণ্ডে আরো একটি তেজস্ক্রিয় মৌল রয়েছে। নতুন মৌলটির নাম দেওয়া হয় রেডিয়াম।

১৯০২ সালে $\frac{১}{১০}$ গ্রাম ওজনের রেডিয়াম ক্লোরাইড পৃথক করা হয়। ১৯১০ সালে মাদাম কুরি খুবই অল্প মাত্রার বিশুদ্ধ ধাতব রেডিয়াম পৃথক করতে সক্ষম হন। এই অবদানের জন্য মাদাম কুরি ১৯১১ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

উজ্জ্বল রূপালি বর্ণের রেডিয়াম মুক্তভাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। সব ক'টি আইসোটোপের (দ্র) অর্ধজীবন জিওলজিক্যাল স্কেলে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এ কারণে আদি রেডিয়ামের কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে নেই।

তিনটি তেজস্ক্রিয় ক্ষয়সিরিজের (থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম ও অ্যাক্টিনিয়াম) উপাদান হিসাবে রেডিয়াম পাওয়া যায়।

ক্যান্সার (দ্র) চিকিৎসায় রেডিয়ামের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

মু. হা.

রেনেসাঁস (Renaissance)

এটি ফরাসি শব্দ, উচ্চারণ রন্যাসঁস্। অর্থ 'পুনর্জন্ম' বা 'নবজাগরণ'। জাতীয় জীবনের আমূল সংস্কার আন্দোলনের ধারণা থেকে শব্দটির ব্যবহার। এই আন্দোলন জাতীয় জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যে কোনো

www.pathagar.com

ধারায় প্রকাশ পেতে পারে। সাধারণত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নতুনের প্রকাশ রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য।

রেনেসাঁস-এর সূচনা ইতালির মাটিতে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের (দ্র) বিভিন্ন দেশে। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ প্রসারিত সময়সীমার ভিতরে সংঘটিত এই সংস্কার-আন্দোলনের ধারণার প্রভাবেই ঐসব দেশের শিল্প-সাহিত্য- দর্শন- বিজ্ঞান, এমনকি ভাষা, ধর্ম এবং প্রচলিত গতানুগতিক চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। দা ভিঞ্চি (দ্র), মিকেলাঞ্জেলো (দ্র), রাফায়েল (দ্র), জিওভান্নি বোকাচ্চিও, মাকিয়াভেল্লি (দ্র), কোপার্নিকাস (দ্র), ব্রুনো, গালিলেও (দ্র), হার্ভে, নিউটন (দ্র), টমাস মোর (দ্র), দেকার্তে, মলিয়্যার (দ্র), শেক্সপীয়র (দ্র), সের্ভান্তেস প্রমুখ মনীষীর আবির্ভাব এই সময়কালেই। এঁদের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই রেনেসাঁসের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন রূপায়িত হয়ে ওঠে।

ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে রেনেসাঁসের ঢেউ লাগে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। যেসব মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার ফলে এতদঞ্চলে এর প্রকাশ এবং সংস্কারমূলক কর্মযজ্ঞের সূচনা, তাঁদের মধ্যে প্রধানতম হলেন রামমোহন রায় (দ্র), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (দ্র), ডেভিড হেয়ার (দ্র), ডিরোজিও (দ্র), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) প্রমুখ।

পরবর্তী কালে পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমান সমাজের ভাবনার জগতে রেনেসাঁসের ঢেউ লাগে 'শিখা গোষ্ঠী' সূচিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে (দ্র)। এর নেতৃত্ব দেন চিন্তাবিদ কাজী আবদুল ওদুদ (দ্র), আবুল হুসেন, আবুল ফজল (দ্র), কাজী মোতাহার হোসেন (দ্র) প্রমুখ। কিন্তু নানা বিপরীত টানে এ ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে নি।

আ. হু.

রেনোয়ার তৈলচিত্র—ঝাঁঝরি হাতে বালিকা

রেনোয়া, পিয়ের্ ওগুস্ত্ [১৮৪১—১৯১৩]

ঊনবিংশ শতকের ইম্প্রেশনিস্ট (দ্র) চিত্রাঙ্কন-রীতির অন্যতম পুরোধা। ভাস্কর হিসাবেও তিনি খ্যাত ছিলেন। অন্য আর সব ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকরের মতোই রেনোয়া (Pierre Auguste Renoir) তাঁর ক্যানভাসে আলো ও পরিবেশের ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করার ব্যাপারে একান্তভাবে আত্মনিবেদিত ছিলেন। তবে তাঁর ধরন ছিল বিশেষভাবে কোমল ও কাব্যময়। তাঁর অঙ্কিত চিত্রকলার প্রধান উপাদান মানবমূর্তি ছিল বিশেষ অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

এক জন পোশাক সেলাইকারীর সন্তান রেনোয়া ১৮৪১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের লিমজ্ নামে এক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের অল্পকাল পরে তাঁদের

www.pathagar.com

পরিবার ভাগ্যান্বেষণে প্যারিসে (দ্র) চলে আসেন। তাঁর বয়স যখন ১৩, তখন তিনি এক জন শিক্ষানবিশ হিসাবে চীনা মাটির বাসনপত্রে নকশা আঁকার কাজ শুরু করেন। ঐ সময় তাঁর অঙ্কনরীতি দেখে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে 'রেম্ব্রাণ্ট' (দ্র) বলে অভিহিত করতেন।

১৮৬২ সালে রেনোয়া চিত্রকলা শিক্ষাদানের প্রথাবদ্ধ ও রক্ষণশীল শিক্ষায়তন 'ইকোল্ দে বোকাৎ'-এ ভর্তি হন। তবে এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর নীরস মনে হওয়ায় তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন চিত্রশিল্পী বন্ধুর সঙ্গে মিলে বিদ্রোহ করে বসেন এবং 'বারিজোন' নামের একটি প্রগতিশীল শিল্পীগোষ্ঠী গঠন করেন। এই গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পীরা প্রকৃতি থেকে সরাসরি ছবি আঁকতেন এবং আলো ও মেজাজের ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করতেন। তাঁদের অঙ্কনরীতিই পরবর্তী কালে 'ইম্প্রেশনিস্ট' শিল্পীরীতির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। এই আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন রেনোয়া।

১৮৮৮ সালে রেনোয়া আর্থারাইটিসে আক্রান্ত হয়ে চলাফেরার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। এই অবস্থাতেও তাঁর সৃষ্টিশীল হাত থেমে থাকে নি। ছবি আঁকার পাশাপাশি ১৯১৩ সালে এক জন তরুণ ইতালীয় ভাস্করের সহযোগিতায় কাদামাটির সাহায্যে তিনি বেশ কিছু ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। ১৯১৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফ্রান্সের লুভ্‌র্ (দ্র)-সহ বিশ্বের বিখ্যাত সব সংগ্রহশালায় তাঁর চিত্রকর্ম সংরক্ষিত হয়েছে।

আ. হু.

রেম্ব্রাণ্ট্ হার্মেন্‌জুন্ ভান্ রিইন্ [১৬০৬—১৬৬৯]

ওলন্দাজ চিত্রকর। বিশ্বের এক জন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রেম্ব্রাণ্ট্ (Rembrandt Harmenszoon van Rijn) ১৬০৬ সালের ১৫ই জুলাই হল্যাণ্ডের লেইডেন্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশোনায় মন না বসায় ছবি আঁকায় আত্মনিয়োগ করেন।

আম্‌স্টারডামের খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী পিটার লাস্ট্‌মানের কাছে স্বল্পকাল শিক্ষানবিশির পর স্বাধীনভাবে ছবি আঁকতে শুরু করেন। ১৬২৫ সালে তিনি লেইডেন শহরে নিজস্ব

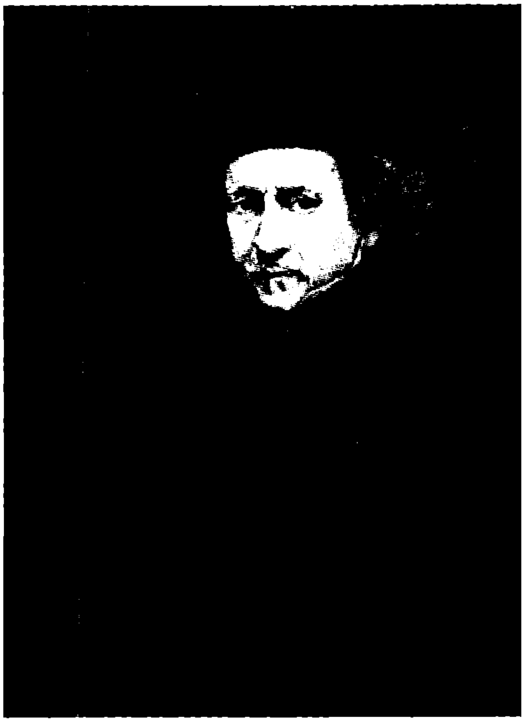

রেম্ব্রাণ্ট্ এঁকেছেন নিজের প্রতিকৃতি

রেম্ব্রাণ্টের শিল্পকর্ম—রাত্রির পাহারা

www.pathagar.com

স্টুডিও গড়ে তোলেন। ২৫ বছর বয়সের আগেই তিনি নিজেকে হল্যাণ্ডের অগ্রগণ্য চিত্রকর হিসাবে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হন।

রেম্ব্রান্টের চিত্রকর্ম কমবেশি বারোক, ধ্রুপদ ও রোম্যান্টিক অঙ্কনরীতি দ্বারা প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ। এ কারণেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সপ্তদশ শতকে ধর্মীয় লক্ষ্য সাধনে হল্যাণ্ডে ছবি আঁকা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। এই সময় তাই দেশটির কোনো শিল্পীই ধর্মকে বিষয়বস্তু করে ছবি আঁকেন নি বললেই চলে। কেবল রেম্ব্রান্টই ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি বাইবেলের বিভিন্ন কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে প্রায় আট শতাধিক ছবি আঁকেন।

প্রথম জীবনে রেম্ব্রান্ট্ ছবি এঁকে বিত্তশালী হলেও শেষ জীবনে নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েছিলেন।

তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের অধিকাংশই আমস্টারডামের 'রাইখ্ মিউজিয়াম'-এ সংরক্ষিত আছে। রেম্ব্রান্ট্ ১৬৬৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

রেলগাড়ি

সাধারণ তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করার যন্ত্রকে ইঞ্জিন বলে। রেল বা স্টিমারের ইঞ্জিনে কয়লা পুড়িয়ে পানিকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। বাষ্পে পরিণত হলে পানির আয়তন যথেষ্ট বেড়ে যায়; আবার বাষ্পে তাপ প্রয়োগ করলে ঐ বাষ্পের আয়তন আরো বেড়ে যায়। বাষ্পের এই প্রসারণ–ক্ষমতা দ্বারা পিস্টনকে অগ্র–পশ্চাৎ চালিয়ে গাড়ির চাকাকে ঘোরানো হয়। বাষ্পকে আবদ্ধ করলে তা যে দারুণ জোরে উল্টোঠেলা লাগাতে পারে তা প্রথম আবিষ্কার করলেন জেম্‌স্ ওয়াট্ (দ্র)। তিনি ১৭৬৮ সালে তাঁর বন্ধু ম্যাথু বোল্টনের সহযোগিতায় বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। এই ইঞ্জিন পানি তোলা ও খনি থেকে কয়লা তোলার কাজে ব্যবহৃত হত। শেষে বাষ্পের জোরে গাড়ি চালাবার ইঞ্জিন বের করলেন জর্জ স্টিফেন্সন (১৭৮১-১৮৪৮) প্রথমে এই রেলগাড়িতে করে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া হত; পরে যাত্রী বহনের ব্যবস্থা হয়।

১০ই অক্টোবর ১৮২৫, বাষ্পচালিত প্রথম রেলগাড়ি—যা উত্তর ইংল্যাণ্ডের স্টকটন শহর থেকে ডারলিংটন শহরে পৌঁছে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করে এবং সময় লাগে ৩ ঘণ্টা

www.pathagar.com

জর্জ স্টিফেন্সনের বিখ্যাত রকেট রেল ইঞ্জিন ১৮৩৫-১৮৪৮

আজকাল নানা ধরনের ইঞ্জিন বের হয়েছে, যার গতি ঘণ্টায় কয়েক শ' কিমি। বাষ্পের বদলে আজকাল বিদ্যুৎ দিয়েও ইঞ্জিন চালানো হচ্ছে। নামে রেলগাড়ি হলেও আসলে এগুলো ট্রামগাড়ি। উপরে বিদ্যুতের তার, ছাদে ট্রলি, নিচে পাতা লাইন। বর্তমানে পৃথিবীর অর্ধ শতের বেশি শহরে মাটির তলায় রেলপথ পাতা হয়েছে। লণ্ডন (দ্র) শহরে এই রেলপথকে 'টিউব' বলে, রাশিয়া (দ্র) ও ফ্রান্সে বলে 'মেত্রো', আমেরিকায় বলে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড'। প্যারিস (দ্র), টোকিও (দ্র), বোস্টন, নিউইয়র্ক (দ্র), স্যানফ্রান্সিসকো, মস্কো (দ্র), লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ্, কলিকাতা (দ্র) প্রভৃতি বড় বড় শহরে এই পাতাল-রেল আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে (দ্র) বেশির ভাগ রেলগাড়ি, স্টিমার, সাবমেরিন, বাস (দ্র), কলকারখানা ইত্যাদিতে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। জার্মান প্রকৌশলী রুডোল্ফ্ ডিজেল্ (১৮৫৮-১৯১৩)-এর নামানুসারে এই ইঞ্জিনের নামকরণ হয়েছে। এতে পেট্রোলের পরিবর্তে ভারি (ডিজেল) তেলকে সঙ্কোচিত বাতাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্কোচনের ফলে বাতাসের তাপমাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে জ্বালানি তেল জ্বলে উঠতে পারে। এ জন্য ডিজেল ইঞ্জিনে স্পার্কের বা বিদ্যুৎঝলকের দরকার হয় না। এতে কার্বুরেটর (দ্র) নেই, তবে সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট ইঞ্জেকটার আছে।

মু. এ.

রেশম / সিল্ক

গুটিপোকার গুটি থেকে উৎপাদিত সূক্ষ্ম, শক্ত ও হলুদ বর্ণের তন্তু, যা দিয়ে সুতা এবং কাপড় তৈরি করা হয়। এই গুটিপোকা সাধারণভাবে রেশমগুটি বা রেশমকীট (silk-worm) নামে পরিচিত। রেশমকীটের চাষাবাদের মাধ্যমে রেশম উৎপাদিত হয়। এর চাষকে সেরিকালচার (sericulture) বলা হয়। *বম্বিক্স্ মরি (Bombyx mori)* প্রজাতির রেশমকীট উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদন করে বলে এর চাষই বেশি হয়। এরা ওক (oak), চেরি ও তুঁত (দ্র) গাছের পাতায় বাসা বাঁধে।

স্ত্রী রেশমকীট পাতার ওপর এক নাগাড়ে প্রায় পাঁচ শ' ডিম পাড়ে। দিন দশেক পর ডিম ফুটে পলু (কীট) বের হয়। তখন থেকেই এরা তুঁত গাছের পাতা খেতে থাকে এবং ৩২ থেকে ৩৮ দিনে পরিণত রূপ লাভ করে। তখন এদের দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৩ ইঞ্চি। সঞ্চালনশীল নরম ত্বকে আংটির মতো ১২টি এককেন্দ্রী বস্তু নিয়ে এদের দেহ গঠিত। এদের মাথার দিকে চোয়াল ও দাঁতের মতো শক্ত দু'টি নিম্নহনু থাকে। পরিণত কীট পাতার ওপর শুয়ে মাথার অদ্ভুত কাঁপন আর দেহের ধীর চক্রাকার গতিতে গুটি বুনতে শুরু করে। কীটের দেহের ভিতর থেকে ফাইব্রয়েন (fibroin) নামের একটি সিক্ত বস্তু সামান্য মোমজাত এক বস্তুর সঙ্গে মিশে এর ঠোঁটের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে নিঃসৃত হতে থাকে। ফাইব্রয়েন বাতাসে খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং শক্ত হয়ে তন্তুতে পরিণত হয়। ক্রমে এর ওপর আঠালো স্তরযুক্ত একটি খোলস তৈরি হয়ে গুটিটি পূর্ণতা লাভ করে।

গুটির ভিতর থেকে তন্তু আহরণ করতে হলে গুটিকে প্রথমে পানিতে সিদ্ধ করতে হয়। তারপর তন্তুসমূহ খুলে কয়েকটি তন্তু একত্রে পাকিয়ে প্রথমে সুতো ও পরে কাপড় তৈরি করা যায়। একটি গুটিতে ২০০০ থেকে ৩০০০ ফুট পর্যন্ত তন্তু হতে পারে।

রেশমকীট পালন ও রেশমশিল্প বহু প্রাচীন কালে চীন (দ্র) দেশে প্রবর্তিত হয়। চীন থেকে রেশম প্রথমে ভারতবর্ষে (দ্র), তারপর ইউরোপে (দ্র) ছড়িয়ে পড়ে। এখন জাপান (দ্র), ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া (দ্র) প্রভৃতি দেশে রেশমের চাষ হয়। রাজশাহী (দ্র) ও মুর্শিদাবাদে তুঁত গাছের গুটিপোকা থেকে রেশম উৎপাদিত হয়। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু রেশমকীট চাষের বিশেষ উপযোগী।

www.pathagar.com

রেশমকীটের মধ্যে আবার বিভিন্ন জাতিভেদ আছে। এক এক রকম রেশমকীট থেকে এক এক রকম রেশম পাওয়া যায়। যেমন— গরদ, মটকা, তসর, এণ্ডি, মুগা ইত্যাদি।

সুজ. ব.

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন [১৮৮০—১৯৩২]

বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রাম। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাহেব। রোকেয়ারা ছিলেন পাঁচ ভাই-বোন : দুই ভাই ও তিন বোন। রোকেয়ার দুই ভাই আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের ইংরেজি জানতেন। তাঁরা কলিকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশুনো করেন। অরবিন্দ ঘোষের (দ্র) পিতা ডা. কে. ডি. ঘোষের সঙ্গে সৌভাগ্যবশত তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল। এই দুই ভাই রোকেয়ার জীবনে আশার আলো দেখিয়েছিলেন।

বাবা বাংলা বা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন তবু রোকেয়া নিজের আগ্রহে ও বড় ভাই ইব্রাহিমের সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহে বাংলা শিখে ফেলেন।

রোকেয়ার স্বামীর নাম খান বাহাদুর সাখাওয়াৎ হোসায়ন। তিনি বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী। সাখাওয়াৎ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। রোকেয়াকে শ্বশুরবাড়িতে পিতার পরিবারের মতো বাধা-নিষেধের মুখোমুখি হতে হয় নি। ভাগলপুরে তাঁর জীবন লেখাপড়ায় অতিবাহিত হয়। বড় ভাইয়ের সঙ্গে তিনি চিঠি আদানপ্রদান করতেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য ইংরেজিতে চিঠিপত্র লেখালেখি চলত ভাইবোনের মধ্যে।

১৯০৯ সালে কলিকাতায় সাখাওয়াৎ মৃত্যুবরণ করেন। রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল আঠারো বছর বয়সে। স্বামী হারালেন আটাশ বছর বয়সে। বৈধব্যযন্ত্রণা ভোলার জন্য তিনি কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। ভাগলপুরে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে প্রথমে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল' স্থাপন করেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে ভাগলপুরে টিকতে পারলেন না, চলে এলেন কলিকাতায়। ১৯১১ সালে মাত্র আটটি ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের কাজ শুরু করলেন। স্কুল পরিচালনায় তাঁর ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু ভাষাজ্ঞান তাঁকে সাহায্য করেছিল। এই স্কুলটি রোকেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অন্যান্য গুণী ব্যক্তির সাহায্য-সহযোগিতার ফলে ইংরেজি স্কুলে রূপ নিয়েছিল। বিদ্যালয়টি বাংলার শ্রেষ্ঠবালিকা-বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হয়েছিল।

রোকেয়া সারা জীবন কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। তাঁর রচনায় তার স্বাক্ষর আছে। তিনি ১৯০৬ সালে 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন' নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রোকেয়া যেসব গ্রন্থ রচনা করেন সেসবের নাম : 'মতিচুর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' ও 'সুলতানার স্বপ্ন'। 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ, নাম 'Sultana's Dream'। এটি একটি ক্ষুদ্র ইংরেজি পুস্তক।

১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হা.

রোগ

আক্ষরিক অর্থে রোগ বা ব্যাধি বলতে সুস্থতার অভাব বা অসুস্থতা বোঝায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, কোনো ধরনের উপদ্রবকারী উপাদানের প্রভাবে সৃষ্ট দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম রোগ বা ব্যাধি। এ ছাড়াও দেহের ভিতরে আঘাত, বিপাকীয় গোলযোগ বা দেহের কোনো অঙ্গে অবক্ষয় কিংবা দৈহিক অপুষ্টিও রোগ সৃষ্টি করতে পারে। দেহে অনুপ্রবেশকারী কারণের মধ্যে রয়েছে জীবাণু (দ্র), ছত্রাক (দ্র), পরজীবী (দ্র), ভাইরাস (দ্র) ইত্যাদি অণুজীব।

দেহে বহিঃশত্রুর অনুপ্রবেশের কারণে আক্রান্ত দেহকলায় যেসব রোগতাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা দেয়, তারই প্রতিফলন ঘটে রোগের লক্ষণ ও নিদর্শনের (symptoms & signs) মধ্যে। এইসব কলাতাত্ত্বিক পরিবর্তন রোগনির্ধারণে (diagnosis) সাহায্য করে।

www.pathagar.com

রোগকে নানা ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন সংক্রামক রোগ, ছোঁয়াচে রোগ, অপুষ্টি ও অবক্ষয়জনিত রোগ, পরজীবী বা ছত্রাকঘটিত রোগ, জীবাণু বা ভাইরাসজনিত রোগ, পানি (দ্র) ও বায়ুবাহিত রোগ, বংশগত বা জীন (দ্র)-ত্রুটিজনিত রোগ ইত্যাদি। আবার দেহতন্ত্রের উপর প্রভাব বিচার করেও রোগের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, যেমন পাকান্ত্রিক পথের রোগ, শ্বসনতন্ত্র (দ্র) বা স্নায়ুতন্ত্রের (দ্র) রোগ, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি (দ্র) বা বিপাকক্রিয়ার গোলযোগঘটিত রোগ, যকৃৎ (দ্র) ও পিত্তাশয়ের (দ্র) রোগ ইত্যাদি।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু ভেষজ-চিকিৎসায় রোগ নিরাময় নয়, রোগের মূল কারণ চিহ্নিত করে সঠিক চিকিৎসা এবং পরিবেশ-প্রভাব বিচার ও প্রতিষেধক (টিকা) চিকিৎসার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা।

আ. র.

রোগবিদ্যা (pathology)

প্যাথোলজি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ রোগবিদ্যা বা রোগবিজ্ঞান। আর ব্যাপক অর্থে রোগবিদ্যা বলতে বোঝায় রোগের কারণ এবং রোগের প্রভাবে দেহকলার অবয়ব ও ক্রিয়াকর্মে সংঘটিত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট লক্ষণাদিতে রোগের প্রকাশ এবং এই পরিবর্তনকে কেন্দ্র করেই রোগবিদ্যার বিভিন্ন শাখার বিকাশ। অবশ্য রোগবিদ্যার সূচনা রোগপ্রক্রিয়ার নিয়ামক সাধারণ সূত্রগুলো সম্পর্কে জ্ঞান, যা 'সাধারণ রোগবিদ্যা' ('জেনারেল প্যাথোলজি') নামে পরিচিত। কারো কারো মতে এই শাখার নাম হওয়া উচিত 'রোগবিদ্যার মূলতত্ত্ব' ('প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব প্যাথোলজি')।

রোগাক্রান্ত অঙ্গসমূহের খালি চোখে-দেখা পরিবর্তনাদি অবয়বগত রোগবিদ্যার ('মর্ফোলজিক্যাল প্যাথোলজি') অর্ন্তগত। আবার অণুবীক্ষণের (দ্র) সাহায্যে এইসব অঙ্গে দৃষ্ট কৌষিক পরিবর্তনাদিকে বলা হয় কৌষিক রোগবিদ্যা ('সেলুলার প্যাথোলজি')। গবেষণাগারে পরীক্ষাদির সাহায্যে রোগনির্ণয়ে রোগতাত্ত্বিক জ্ঞানের ব্যবহার 'ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি' নামে পরিচিত। তেমনি প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তনাদির নাম 'কেমিক্যাল প্যাথোলজি'। এই সব কিছু মিলেই 'স্পেশাল প্যাথোলজি' বা 'রিজিওনাল প্যাথোলজি' গড়ে উঠেছে।

এক কথায় দেহে রোগের প্রভাবজনিত পরিবর্তনাদি অনুসন্ধান ও শনাক্ত করা এবং সেই সূত্রে রোগের চিকিৎসা সহজ করে তোলাই রোগবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য।

ক. হা.

রোজা

রোজা ইসলামী বিধানের চতুর্থ স্তম্ভ, যা মুসলমানদের জন্য একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। আরবিতে একে সাওম বা সিয়াম বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ : আরাম করা, বিশ্রাম নেওয়া। সাধারণভাবে রমযান মাসে দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে উপবাস পালন করাকে রোজা বলা হয়।

প্রাচীন কাল থেকে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যেই কোনো-না-কোনোভাবে উপবাসের সংযম পালিত হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি এবং খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও এর প্রচলন আছে।

রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আত্মসংযমের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে অনাচার থেকে বিরত রাখা, সৎকাজে অনুপ্রাণিত করা এবং দুঃখী ও অনাহারীদের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের মনে সহানুভূতি জাগ্রত করা।

মু. মা.

রোজেনবার্গ মামলা

১৯৫০-এর দশকের শুরুতে 'রোজেনবার্গ মামলা' দুনিয়া জুড়ে প্রবল আলোড়ন জাগিয়েছিল। লস্ অ্যালামোস-এর মার্কিন পারমাণবিক বোমা তৈরি প্রকল্প থেকে বোমা বানাবার কলাকৌশল সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য রুশদের কাছে পাচার করা হয়েছে এই অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত গুপ্তচরদলের মধ্যে ছিলেন জুলিয়াস রোজেনবার্গ (Julius Rosenberg :১৯১৮–৫৩) ও ইথেল রোজেনবার্গ (Ethel Rosenberg: ১৯১৫–৫৩)। অভিযোগের সঙ্গে রোজেনবার্গ দম্পতির যুক্ত থাকার সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল বেশ দুর্বল এবং কথিত গোপন তথ্য পাচারে তাঁদের ভূমিকা তেমন মুখ্য ছিল না। তা সত্ত্বেও মামলার প্রধান আসামী ডেভিড গ্রিনগ্লাস, মর্টন, সোবেল ও হ্যারি গোল্ড-এর বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাসের সাজা হলেও রোজেনবার্গ দম্পতিকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ডাদেশ। এর পেছনে বড় কারণ ছিল রাজনৈতিক।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর দুই বৃহৎ শক্তি আমেরিকা (দ্র) ও সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) মধ্যে যে 'ঠাণ্ডা লড়াই' (দ্র) শুরু হয়, সেই উত্তেজক পরিস্থিতির অসহায় শিকার হয়েছিলেন রোজেনবার্গ দম্পতি, কেননা তাঁরা ছিলেন সাম্যবাদ (দ্র)-এর মতবাদে বিশ্বাসী এবং প্রথম যৌবনে আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী।

জুলিয়াস ও ইথেল রোজেনবার্গ উভয়ে ছিলেন নিউ-ইর্য়ক (দ্র) শহরে এক স্বল্পবিত্ত ইহুদি পরিবারের সন্তান। ১৯৩৯ সালে তাঁদের যখন বিয়ে হয় জুলিয়াস তখনো কলেজের ছাত্র। ইথেল একটি ছোটখাট চাকুরির পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছিলেন সঙ্গীতসাধনা। ইথেলের ভাই ডেভিড গ্রিনগ্লাস লস্ অ্যালামোসের গোপন পারমাণবিক বোমা তৈরি প্রকল্পে নিম্নপদে কাজ করতেন এবং অনেকেই মনে করেন তিনি নিজের অপরাধ লঘু করে তোলার জন্য রোজেনবার্গ দম্পতিকে মামলার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন এবং সরকার পক্ষ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পিছপা হয় নি।

১৯৫০ সালে রোজেনবার্গ দম্পতিকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে পত্র-পত্রিকায় কমিউনিস্ট চক্রান্তের প্রবল শোরগোল তোলা হয়। আদালতকক্ষে জুলিয়াস ও ইথেলের নির্ভীক ও মার্জিত আচরণ, নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণে তাঁদের আন্তরিক ও মর্যাদাবান বক্তব্য সকল বিবেকবান মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। মামলার বিচারে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলে তা রোধের জন্য বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠে অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলন। মৃত্যুকুঠুরিতে অপেক্ষমাণ জুলিয়াস ও ইথেলের লেখা চিঠিপত্র 'রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত হয় এবং এইসব চিঠি শান্তিপ্রিয় নির্বিবাদী মানবসত্তার নিবিড় পরিচয় মেলে ধরে। বিশ্বের অনেক জ্ঞানী-গুণীজন রোজেনবার্গ দম্পতির জীবন রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে। এঁদের মধ্যে ছিলেন নোবেল পুরস্কারজয়ী দুই বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (দ্র) ও হ্যারল্ড সি. উরে, আরো ছিলেন বিশ্বের নামজাদা বহু আইনজ্ঞ, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী। ১৯৫৩ সালে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

রোজেনবার্গ মামলা নিয়ে এখনো বিস্তর লেখালেখি ও পর্যালোচনা অব্যাহত রয়েছে। প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক অটো প্রেমিঙ্গার এই কাহিনী নিয়ে তৈরি করেছেন ছায়াছবি। খ্যাতিমান আইনবিদ লুই নিজার লিখেছেন জনপ্রিয় বই 'দ্য ইম্প্লোশন কন্সপিরেসি' (আন্তর্বিস্ফোরক চক্রান্ত)। রোজেনবার্গের দুই পুত্র এখন যুবক, আশির দশকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের গ্রন্থ 'উই আর ইওর সন্স : দ্য লিগ্যাসি অব ইথেল অ্যাণ্ড জুলিয়াস রোজেনবার্গ'। বাংলায় 'রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ' অনুবাদ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

ম. হ.

রোটারি ইন্টারন্যাশনাল

মানবকল্যাণমুখী সমাজ-উন্নয়মূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা। আদিতে এর নাম ছিল রোটারি ক্লাব। পল্ পার্সিভলি হ্যারিস (Paul Percival Harris : ১৮৬৮-১৯৪৭) নামে জনৈক মার্কিন আইনজীবী তাঁর তিন বন্ধুকে নিয়ে সমাজসেবার উদ্দেশ্য ১৯০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি এই ক্লাবের পত্তন করেন। প্রথম দিকে পর্যায়ক্রমে ঘুরে ঘুরে এককে জনের বাড়িতে সভা বসত বলে এই নামকরণ হয়েছিল। বৃত্তিজীবী অর্থাৎ কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ এর সদস্য হতে পারেন না। বর্তমানে পৃথিবীর ১৮৯টি দেশে রোটারি ক্লাব রয়েছে, ক্লাবের সংখ্যা প্রায় ২৭ হাজার।

রোটারি ক্লাবের নাম পরিবর্তিত হয়ে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল হয়েছে। এর সভ্যদের 'রোটারিয়ান' বলা হয়। বাংলাদেশেও এই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানটি শাখাপ্রশাখা নিয়ে নানাবিধ সমাজ-উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে।

হা. মা.

রোধ রেজিস্টর/রোধ দ্র

রোবট (robot)

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবিশেষ, যা মানুষের বিভিন্ন কাজ করতে পারে। অবশ্য যন্ত্রগুলো মানুষের মতো দেখতে নাও হতে পারে। এমনকি এদের কাজের ধরনও মানুষের মতো নয়।

চেক ভাষায় রোবাতা (robota) শব্দের মূল অর্থ 'শ্রমিক'। চেক নাট্যকার কারেল্ চাপেক্ (Karel Capek) তাঁর একটি নাটকে একটি সভ্যতার বর্ণনা দেন, যেখানে মানসিক ও শারীরিক সকল কাজ সম্পন্ন করছে রোবট নামের এক বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি। সমগ্র সভ্যতা ঐ রোবটদের ওপর নির্ভরশীল।

খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দে উদ্ভাবিত জলঘড়ি (Water-Clock) হল রোবটের আদিমতম সংস্করণ। সাইফন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে পানিঘড়িকে স্বয়ংক্রিয় করা হয়। শিল্পবিপ্লবের

www.pathagar.com

(দ্র) পর যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয়করণ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে রোবটের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। প্রথম দিককার মেকানিক্যাল রোবটের আধুনিক সংস্করণ হল স্বয়ংক্রিয় ধোলাইযন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় এলিভেটর, স্বয়ংক্রিয় কাপড় রাঙানোর যন্ত্র ইত্যাদি।

ষাটের দশকে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির বিপুল বিকাশ ও আশির দশকে মাইক্রোপ্রসেসরের উদ্ভব বিভিন্ন ক্ষেত্রে রোবট ব্যবহারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

কম্পিউটার (দ্র) নিয়ন্ত্রিত রোবট বর্তমানে জাপানে গাড়ি তৈরির কারখানাসমূহের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করছে। এ ছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের (দ্র) কাজেও রোবটের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মু. হা.

রোব্‌সন্, পল্ পল্ রোব্‌সন্ দ্র

রোমক সভ্যতা

বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সভ্যতার একটি। রোম, গ্রিস, কার্থেজ ও প্যালেস্টাইনসহ ভূমধ্যসাগর (দ্র)-অঞ্চল জুড়ে বিদ্যমান সকল রাষ্ট্রকে তা যেমন অধিকার করে, তেমনিই অধিকৃত রাষ্ট্রসমূহের শিল্প-সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণা আত্মস্থ করে নিজস্ব অবদানে তা সমৃদ্ধও করে। বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে রোমক সভ্যতার প্রধানতম অবদান রাজনৈতিক ও সরকার পরিচালন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত রীতিপদ্ধতি।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রোম শহরের পত্তন হয়। কালক্রমে টাইবার নদীর মোহনায় সাতটি পার্বত্য টিলাকে কেন্দ্র করে এই নগরীর বিস্তৃতি ঘটে। এই সাতটি নগরীকে নিয়ে পরে গড়ে তোলা হয় একটি একক 'নগররাষ্ট্র'। রোমের অধিবাসী সকল রোমানই কথা বলত লাতিন ভাষায়।

খ্রিস্টপূর্ব ২৮০ অব্দ নাগাদ রোমানেরা বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে স্বাধীন 'মিত্রদের' একটি শক্তিশালী সংঘ গঠন করে। পরবর্তী কালে রোমানদের উপর বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করতে, রোম সাম্রাজ্যকে সংহত করতে ও এর বিস্তৃতি সাধনে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হলেন পম্পে দ্য গ্রেট, জুলিয়াস সিজার (দ্র), আউগুস্তুস ও

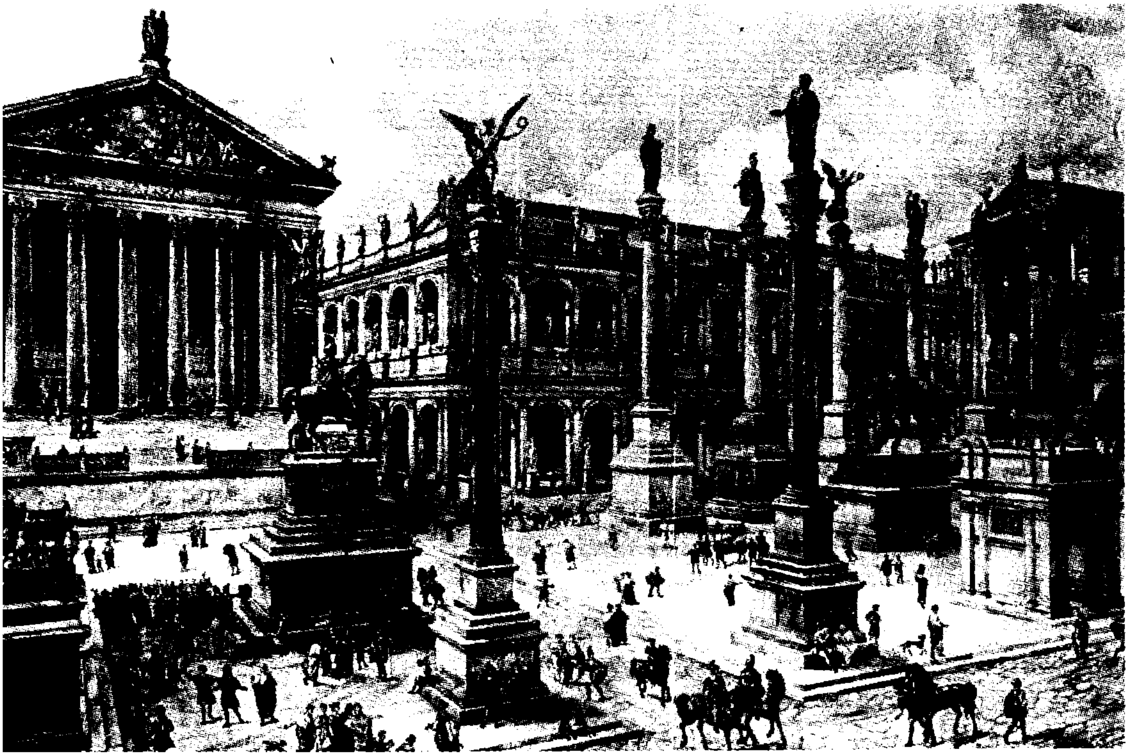

প্রাচীন রোম—স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্পে সমৃদ্ধ ও আড়ম্বরপূর্ণ এক শহর ছিল

www.pathagar.com

তাইবেরুস।

রোমবাসীরা পরে গ্রিক দেশ অধিকার করলে রোমে হেলেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব জোরদার হয়। গ্রিক নাট্যমঞ্চের অনুকরণে এর বিভিন্ন নগরীতে গড়ে ওঠে অ্যাম্ফিথিয়েটার।

প্রাচীন রোমের জনগণ বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা করতেন। এসবের মধ্যে অলিম্পীয় দেব-দেবী অন্যতম।

প্রাচীন রোমের সাহিত্যভাণ্ডারে সব থেকে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে 'দে রেরুম নাতুরা' বা 'বস্তু-প্রকৃতি সম্বন্ধে' শীর্ষক একটি কাব্যগ্রন্থ। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের বিজ্ঞানী ও কবি তিতুস লুক্রেৎসিউস কারুস (৯৯-৫৫ খিস্ট্রপূর্বাব্দ) এটির রচয়িতা। এর মাধ্যমে তিতুস আত্মার অমরতা ও পরলোককে অস্বীকার করেন।

রোমক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভার্জিলের (দ্র) মহাকাব্য (দ্র) 'ঈনীদ' (দ্র), বাগ্মী ও সমন্বয়বাদী দার্শনিক সিসেরোর (খ্রিস্টপূর্ব ১০৬-৪৩ অব্দ) রচনাকর্ম ও দান্তের (দ্র) 'ডিভাইন কমেডি' (দ্র) ইত্যাদি। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধ থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতককে বলা হয় রোমক সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

রোমেই প্রথম আবিষ্কৃত হয় কংক্রিট (দ্র)। ফলে বিশাল ও আড়ম্বরপূর্ণ দালান-কোঠা, খিলান ও গম্বুজ নির্মাণ করা সম্ভব হয়। রোমে সেই প্রাচীন কালে পানিসরবরাহ ব্যবস্থাসহ যেসব গণ-স্নানাগার, খিলানাকার সেতু ও উন্নত পয়ঃপ্রণালীব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রোমক ভাস্কর্যশিল্পও এই সমৃদ্ধ সভ্যতার অন্যতম পরিচায়ক।

চিকিৎসকগণ এখনো লাতিন ভাষায় ঔষধপত্রের যেসব নাম লিখে থাকেন, তার মূলেও রয়েছে এই সভ্যতার অবদান। শুধু তাই নয়, বছরের ১২ মাসের নাম এখনো রয়ে গেছে লাতিন ভাষাতেই। জুলাই মাসের নামকরণ হয়েছিল রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে এবং আগস্ট মাসের নামকরণ হয়েছিল সম্রাট আউগুস্তুসের সম্মানে। পরে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে এই ক্যালেণ্ডার সংশোধন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত জর্জিয়ান ক্যালেণ্ডারের জন্মও ইতালিতে।

ইউরোপ (দ্র) মহাদেশের প্রধান ভূখণ্ডের দেশগুলোতে আইনী ব্যবস্থার বিকাশে রোমক আইনের অবদান অপরিসীম। বর্তমান কালেও প্রচলিত 'ভেটো' (দ্র), 'ব্লক ভোট', 'সিনেট'

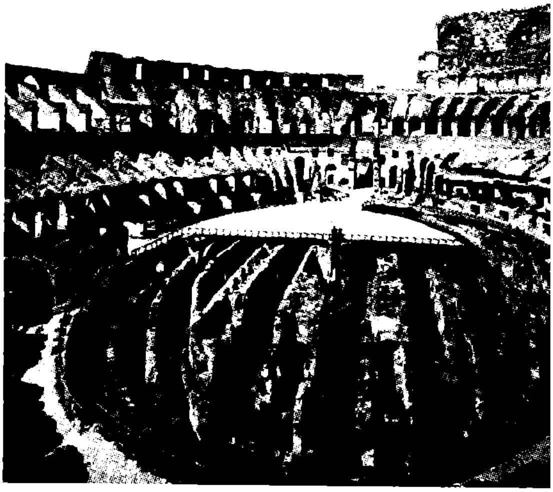

গ্রেট কোলাসিয়ামের অভ্যন্তর

ইত্যাদি আইনী প্রকৃতি ও পদ্ধতি রোমক আইন থেকে আহৃত। এখনো বিশ্বের দেশে দেশে 'রোমক আইন' স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

গোথ, হুন (দ্র) ও ভাণ্ডালদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

আ. হ.

রোমক হরফ অক্ষর দ্র

রোমান্স ভাষাগোষ্ঠী

লাতিন ভাষা থেকে যেসব ভাষা উদ্ভূত হয়েছে সেগুলোকে সাধারণভাবে রোমান্স (Romance) ভাষা বলে। রোমান্স ভাষা বলতে বোঝায় অন্তত ৮টি ভাষা : পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ইতালীয়, প্রভেঁসাল, ফরাসি, রোমান্‌শ্ (Romansch), কাতালান্ ও সার্দিনীয়। প্রসঙ্গত, রোমান্‌শ্ বলে ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ডের কিছু অংশে; প্রভেঁসাল চালু রয়েছে দক্ষিণ ফ্রান্সে; কাতালান্ বলে কাতালোনিয়া ও বালেরিক দ্বীপে; আর সার্দিনীয় ভাষা বলে সার্দিনিয়ায়।

রোমান্স ভাষার ঠিক বিপরীত দিকের ভাষা পরিবার হল 'জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠী (দ্র)।

হা. মা.

রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট্ (Romeo and Juliet)

কালজয়ী নাট্যপ্রতিভা উইলিয়াম শেক্সপীয়রের (দ্র) লেখা ট্র্যাজেডি (দ্র)। ১৫৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কাহিনীটি প্রেমের এবং তার নায়ক রোমিও ও নায়িকা জুলিয়েট্।

www.pathagar.com

কাহিনীটি সংক্ষেপে এ রকম : মন্টেগু ও কাপুলেট পরিবার দু'টির মধ্যে চরম বিরোধ ও ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মন্টেগু পরিবারের ছেলে রোমিও আর কাপুলেট পরিবারের মেয়ে জুলিয়েট পরস্পরের প্রেমে পড়ল। এ রকম অবস্থায় বাড়ির লোকজনকে না জানিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হন তাঁরা। পাদ্রি লরেন্স অবশ্য এ বিবাহে সাহায্য করেছিলেন। এর মধ্যে নিজে ভাল মতো বুঝতে পারার আগেই এই পারিবারিক কোন্দলের মধ্যে রোমিও জড়িয়ে পড়ল এবং শাস্তি হিসাবে শহর থেকে তাকে বের করে দেওয়া হল। আর ওদিকে জুলিয়েটের অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলল অন্যত্র বিয়ের তোড়জোড়। উপায় না দেখে পাদ্রি জুলিয়েট্‌কে এমন একটা ঔষধ খেতে দিলেন যা খেলে সত্যি সত্যি মরে না গেলেও দেহে মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠবে। উদ্দেশ্য—জুলিয়েট্‌কে মৃত ভেবে বরপক্ষ চলে যাবে, বিয়েও হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনই যে রোমিও ঐ ভুল মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দৌড়ে এসেছে এবং পাদ্রির কাছ থেকে সবটুকু ঘটনা শোনার আগেই বিষপানে আত্মহত্যা করে বসল। যথাসময়ে জুলিয়েট্ জেগে উঠে দেখে তার প্রেমিক ও স্বামী তারই শোকে মারা গেছে, তখন সে নিজেও বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করল।

হা. মা.

রোম্যান্টিসিজ্‌ম (romanticism)

এই শব্দটির জন্য সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় দুঃসাধ্য। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের শিল্প-সংস্কৃতিতে এমন কিছু বিশিষ্ট প্রবণতা দেখা যায়, যার সম্মিলিত রূপকে সাধারণভাবে রোম্যান্টিসিজ্‌ম বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা সেই বিশেষ সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক মানসকে বোঝানো হয়ে থাকে যা পুরোনো দিনের শৃঙ্খলা, ধারাবাহিকতা, আদর্শবাদ ও প্রাচীন কালের নৈতিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে অভিনব সৌন্দর্যবোধ, কল্পনার মুক্তি, উচ্ছ্বাস, অনুভবের তীব্রতা, আবেগ প্রভৃতিকে প্রধান করে তুলতে চায়। বস্তুবাদের (দ্র) বিপরীতে ব্যক্তির কল্পজগৎ নির্মাণের প্রবণতা এই ধারাকে বলিষ্ঠতা প্রদান করে। রোম্যান্টিসিজ্‌মের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ হল : প্রকৃতিজগৎ সম্পর্কে গভীরতর অনুভব, যুক্তির চেয়ে অনুভূতিকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া, মননশীলতা অপেক্ষা স্বাধীন ইচ্ছার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান, মানুষের ব্যক্তিত্বের ও তার নিজস্ব আবেগ ও শক্তির প্রকাশ, কোনো নির্দিষ্ট রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য না-দেখিয়ে লেখক বা শিল্পীর ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকেই শিল্পের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা, লোকজ শিল্প-সাংস্কৃতিক ধারার প্রতি গভীর মনোযোগ, মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে যে বীরোচিত বাস্তবনিরপেক্ষ কল্পনার বিস্তার ও বর্ণনা আছে তার প্রতি নতুন করে মনোনিবেশ ও এই সব বিষয়ে অনুশীলন, অতিলৌকিক ও রহস্যময় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি। রোম্যান্টিক শব্দটির আবির্ভাব ঘটে সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষায়, কিন্তু এর উৎপত্তি লাতিন শব্দ 'রোমান্স' থেকে।

রোমান্সের প্রধান তিনটি লক্ষণ হল : রহস্যময়তার এক ছায়াচ্ছন্ন বোধ, অভিনবত্ব ও ভাবনার মুক্তি সম্বন্ধে অদম্য আকর্ষণ এবং জীবনের মৌলিক সরলতা অনুধাবন করার সহজাত বোধ।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জার্মানি থেকে যে রোম্যান্টিসিজ্‌মের প্রভাব এসে পড়ে ইংরেজি সাহিত্যে তা থেকে বোঝা যায় এই আন্দোলন বা মনোভাব ইউরোপের একটা সর্বব্যাপ্ত বিষয়। ফরাসিদের যে ক্ল্যাসিকাল প্রভাব ইংরেজি শিল্প-সাহিত্যের চর্চাকে প্রভাবিত করেছিল, জার্মানিও তার বাইরে ছিল না। হাইনরিশ্ মাইলারের নিবেলুঙ্গেন্‌লাইড্ (Nibelungeleid)-এর অনুবাদ, ভিলাণ্ড (Wieland) এবং টিক (Tieck) ও শ্লেগেল্ (Schlegel)-এর বিভিন্ন অনুবাদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে এক অভিনব আগ্রহের সৃষ্টি হল। ১৮২০ সাল নাগাদ রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ সমগ্র ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমে তা প্রতিটি জাতির অতীত খুঁজে পাওয়ার এক বাসনার জন্ম দেয়। ইংল্যাণ্ডে হোরেস ওয়ালপোল থেকে আরম্ভ করে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ (দ্র), কোল্‌রিজ (দ্র), শেলী (দ্র), বায়রন (দ্র), কীট্‌স্ (দ্র), ব্রণ্টি ভগিনীবৃন্দ; ফ্রান্সে ভিক্তর্ উগো (দ্র), আল্‌ফ্রে দ্য ভিইনি, আল্‌ফঁস্ দ্য লামার্তিন্, আল্‌ফ্রে দ্য ম্যুসে, স্তাঁদাল্, আলেক্সান্দ্র্ দ্যুমা (দ্র); ইতালির আলেসান্দ্রো মান্‌ৎসোনি এবং গিয়াকোমো লিওপার্দি; রাশিয়ায় আলেক্সান্দ্র্ পুশ্‌কিন্ (দ্র) এবং মিখাইল্ লিয়েৰ্মন্তফ; স্পেনে হোসে দে এস্প্রোন্‌সেদা এবং আন্‌জেল্ দে সাভেদ্রা; পোল্যাণ্ডে আদাম্ মিকিভিচ্ এবং গৃহযুদ্ধ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সকল লেখকের রচনাতেই রোম্যান্টিসিজ্‌মের

www.pathagar.com

অভিঘাত লক্ষ করা যায়। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছিল। ইংরেজ শিল্পী জেমস্ ব্যারী, হেন্‌রি ফুসেলি, জোসেফ্ টার্নার্ ও জন্ কন্‌স্টেব্‌ল্ এক দিকে অতিলৌকিক ও অন্য দিকে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ বিষয় অঙ্কন করতে লাগলেন। ফ্রান্সের আঁতোয়ান্ গ্রো, তেওদোর্ জেরিকো এই ধারার শিল্পী। স্থাপত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও রোম্যান্টিক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্রান্‌ৎস্ শুবার্ট (দ্র) ধ্রুপদী ও রোম্যান্টিক সঙ্গীতের ধারাকে একত্রে যুক্ত করলেন। অপেরার পরিবেশনাতেও এই ধারার লক্ষণসমূহ ফুটে উঠল। ইংরেজ শাসনের সূত্রে আমাদের দেশের সাহিত্যেও রোম্যান্টিসিজ্‌মের প্রভাব পড়ে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (দ্র) পৌরাণিক কাহিনীকে যে নতুন বিন্যাস দিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে', বঙ্কিমচন্দ্রের (দ্র) উপন্যাসে নর-নারীর প্রেমসম্পর্ক এবং সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে ভাবনায়, চেতনায়, প্রকরণে রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ এক বিরাট স্থান দখল করে আছে।

শ. আহ.

রোয়িং নৌকা বাইচ দ্র

রৌপ্য / রূপা (Silver)

মৌলিক ধাতু। এর লাতিন নাম আর্জেন্টাস। রাসায়নিক চিহ্ন Ag। পারমাণবিক ওজন ১০৭·৮৬, পারমাণবিক সংখ্যা ৪৭। গলনাঙ্ক ৯৬১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্ফুটনাঙ্ক ২১৯৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি সাদা রঙের নরম ধাতু। রৌপ্য বা রূপা কোথাও কোথাও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় সালফার (দ্র) ও ক্লোরিন-এর সঙ্গে মিশে থাকা সিলভার সালফাইড (Ag_2S) ও সিলভার ক্লোরাইড হিসাবে খনিজ আকরিকের মধ্যে। খনিজ সিলভার সালফাইড সাধারণত আর্জেন্টাইট বা সিলভার গ্ল্যান্স নামে পরিচিত। খনিজ সিলভার ক্লোরাইডকে বলা হয় হর্ন-সিলভার।

সুদূর অতীতকাল থেকেই রৌপ্যের ব্যবহার চলে আসছে। এর প্রধান ব্যবহার ছিল ধাতব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা এবং অলঙ্কার তৈরির কাজে। এ ছাড়া পানির পাত্র এবং আরো কিছু ব্যবহার্য পাত্র তৈরির কাজে রূপা ব্যবহৃত হত। রূপার দু'টি আইসোটোপ (দ্র) আছে যেগুলি বেশ সুস্থিত। এ দু'টি আইসোটোপ হচ্ছে ^{107}Ag এবং ^{109}Ag। এ ছাড়া রূপার আরো ২৫টি আইসোটোপ আছে। এগুলির অর্ধজীবন-কাল হচ্ছে ৫ সেকেণ্ড থেকে ২৫৩ দিন। রৌপ্যের বিভিন্ন যৌগিক, যেমন সিলভার ব্রোমাইড আলোকচিত্র গ্রহণের ফিল্ম (দ্র) ও আলোকচিত্রের প্লেট তৈরির কাজে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তা ছাড়া দাঁতের অ্যামালগাম বা পারদ-সঙ্কর হিসাবেও এটি ব্যবহৃত হয়।

সু. ব.

র‍্যাঁবো, জঁ আর্তুর্ [১৮৫৪—১৮৯১]

ফরাসি কিশোর কবি র‍্যাঁবো (Jean Arthur Rimbaud) জন্মেছিলেন ফ্রান্সের এক ছোট্ট শহরে, শার্লভিল তার নাম; ১৮৫৪ সালের ২০শে অক্টোবরে। বাবা ছিলেন সামরিক অফিসার, কিন্তু স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করে চলে যান। ছোটবেলা তাই খুবই কষ্টে কেটেছিল র‍্যাঁবোর। কিন্তু পড়াশোনার আগ্রহ ছিল অদম্য এবং অধ্যবসায়ও সীমাহীন। পড়াশোনা করে আর জগৎসংসারের চালচলন দেখে ১৫ বৎসর বয়সেই নাস্তিক হয়ে ওঠেন। স্কুলের লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে, জন্মস্থান ত্যাগ করে প্যারিসে চলে যান। কবিতা লিখতে তখনই শুরু করেছেন। প্যারিসে যাওয়ার পর অনেক সমবয়সী ও প্রবীণ কবিবন্ধুও জুটল।

র‍্যাঁবো বই লিখেছিলেন মাত্র দু'টি। প্রথম বই বেরোয় বিশ বছর বয়সে 'য়্যুন্ সেজঁ অঁনফে' (Une saison en enfer : নরকে এক ঋতু), ১৮৭৩ সালে। এর পরে কবিতা লেখায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং ইউরোপের দেশে দেশে ও আফ্রিকায় ভবঘুরে জীবন যাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর বছর পাঁচেক আগে তাঁর বন্ধুরা মিলে তাঁর রচনা জড়ো করে আরেকটি বই প্রকাশ করেন, নাম 'ইলুমিনাসিওঁ' (Illuminations : দীপাবলি), ১৮৮৬ সালে।

মাত্র সাঁইত্রিশ বছরে মারা গেছেন র‍্যাঁবো, এবং কবিতা সম্পর্কে তাঁর কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষার লোভ ছিল না, অথচ শুধু ফরাসি কাব্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যে তাঁর আসন প্রধান এক কবি হিসাবে।

হা. মা.

www.pathagar.com

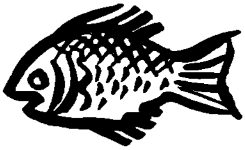

ল

লং মার্চ চীনা বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দ্র

লংফেলো, হেন্‌রি ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ [১৮০৭—১৮৮২]

উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। জন্ম মেইনের পোর্টল্যাণ্ডে ১৮০৭ সালে।

ইউরোপ সফর শেষে আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য লংফেলো (Henry Wadsworth Longfellow) নিজে যে কলেজে অধ্যয়ন করেন, সেই বাউডোয়িন কলেজে, পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন।

'হিয়াওয়াথা', 'এভানজেলিন', 'দ্য কোর্টশিপ অব মাইল্‌স্ স্ট্যাণ্ডিশ', 'দ্য ভিলেজ ব্ল্যাকস্মিথ' এবং 'দ্য সাম অব লাইফ' ইত্যাদি দীর্ঘ ও ক্ষুদ্রায়তনের কবিতার জন্য বিশেষ তিনি বিখ্যাত। লংফেলো ১৮৮২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী। তাঁর বর্ণ গৌর, তাঁর বাহন পেঁচা। পুরাণ অনুসারে লক্ষ্মীর পিতার নাম ভৃগু, মাতার নাম খ্যাতি। তিনি বিষ্ণু বা নারায়ণের স্ত্রী। বিষ্ণু যেমন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতার-রূপে পৃথিবীতে এসেছেন, তেমনি তাঁর স্ত্রী হিসাবে লক্ষ্মীও অবতীর্ণ হয়েছেন। যেমন, সীতারূপে তিনি রামের স্ত্রী, রুক্মিণীরূপে তিনি কৃষ্ণের স্ত্রী।

হিন্দুদের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আসন রয়েছে। প্রতিদিনই লক্ষ্মীপূজা করা হয়। আবার প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর প্রশংসাসূচক পাঁচালি পড়ে পূজা করা হয়। এ ছাড়া শরৎকালে (আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে) বার্ষিক লক্ষ্মীপূজা করা হয়। এই লক্ষ্মীপূজাকে 'কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা' বলা হয়। পট বা চিত্রে অথবা প্রতিমা বানিয়ে এই পূজা করার নিয়ম। দুর্গাপ্রতিমায় দেবী দুর্গার এক পাশে লক্ষ্মীর অবস্থান।

পুরাণে আরো একজন লক্ষ্মী আছেন। তিনি দক্ষের কন্যা।

নি. অ.

লক্ষ্মীপূজা

হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব। লক্ষ্মীর অনেক নাম—কমলা, ইন্দিরা, নারায়ণী, বিষ্ণুপ্রিয়া, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মাসনা, পদ্মালয়া, কমলালয়া ইত্যাদি। লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে গণ্য।

দুর্গাপূজার পর পূর্ণিমায় সর্ববৃহৎ লক্ষ্মীপূজা হয়। এই পূজায় ধান, কড়ি, সিঁদুরের কৌটা, গাছ কৌটা, স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা, শঙ্খ ইত্যাদি অপরিহার্য। এই পূর্ণিমাকে কোজাগরী পূর্ণিমা বলে এবং এ জন্য একে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাও বলে। এ ছাড়া ভাদুই লক্ষ্মীপূজা, পৌষ লক্ষ্মীপূজা, অলক্ষ্মী বিদায় পূজাও উল্লেখযোগ্য।

বি. ব.

লক্ষ্মীবাঈ (ঝাঁসির রানী) [১৮৩৫—১৮৫৮]

ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী আন্দোলনের বীরাঙ্গনা এবং ভারতের বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ঝান্সি বা ঝাঁসি নামের ক্ষুদ্র রাজ্যের শেষ শাসনকর্ত্রী। তিনি ১৮৩৫ সালের ২১শে নভেম্বর কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল মণিকর্ণিকা বাঈ, ডাক নাম মণুবাঈ। তিনি বুন্দেলখণ্ডের শেষ শাসনকর্তা গঙ্গাধর রাওয়ের স্ত্রী। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর নাম দেওয়া হয় লক্ষ্মীবাঈ।

১৮৫১ সালে লক্ষ্মীবাঈ একটি পুত্রসন্তানের জননী হন। কিন্তু দুই মাস বয়সে সন্তানটি মারা যায়। ১৮৫৩ সালে গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাল্‌হৌসী তাঁর সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির অধীনে ঝাঁসি রাজ্য অধিকার করতে প্রয়াসী হন। ফলে ২৩ বছর বয়স্কা রানী লক্ষ্মীবাঈ তাঁর রাজ্যের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজস্ব বাহিনী সংগঠিত করে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। শুধু তাই নয়, সিপাহি বিদ্রোহের (দ্র) সময় তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেন। ১৮৫৮ সালের ১৮ই জুন তিনি

www.pathagar.com

সেই লড়াইয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন।

আ. হ.

লঙ্কাকাণ্ড

বাল্মীকি (দ্র) রচিত রামায়ণ (দ্র) মহাকাব্যের ষষ্ঠ কাণ্ডের শিরোনাম। এই অধ্যায়ে লঙ্কায় অনুষ্ঠিত রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে।

বোনের প্ররোচনায় লঙ্কার রাক্ষসদের রাজা রাবণ অযোধ্যার রাজপুত্র রামের পত্নী সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। রাম কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বানররাজ সুগ্রীবের সাহায্যে সীতার সন্ধান পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হন। ছোট ভাই লক্ষ্মণও রামের সঙ্গী হন। লঙ্কা তো একটা দ্বীপ। সৈন্য নিয়ে সেখানে যেতে হলে সেতু চাই। তখন বানরসেনারা সেতুবন্ধন রচনা করে তাঁদের লঙ্কায় পৌঁছে দেয়। বিপদ বুঝে রাবণ রাক্ষসদের পরামর্শ চান। তখন তাঁর ছোট ভাই বিভীষণ সীতাকে মুক্তি দিয়ে সসম্মানে ফিরিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু রাবণ এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে বিভীষণকে অপমানিত করেন। বিভীষণ তখন রামের পক্ষে যোগ দেন।

এর পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়। ইন্দ্রজিৎ প্রথমে রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করেন, কিন্তু গরুড়ের সহায়তায় তাঁরা মুক্তি পান। তাঁদের মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই রাক্ষসদের পতনের সূচনা হয়। ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন ও প্রহস্ত প্রমুখ রাক্ষস একে একে রামের হাতে প্রাণ হারায়। এর পর কুম্ভকর্ণকে অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হলে তিনিও নিহত হন। এদিকে লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে পূজারত ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। অবশেষে রাম রাবণকে হত্যা করলে তাঁদের জয় নিশ্চিত হয়। বিভীষণ তখন লঙ্কার রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। রাম সকলকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে যান।

যে কোনো ব্যাপারে হৈ-চৈ হলুস্থুল বাধিয়ে দেওয়াকে আমরা 'লঙ্কাকাণ্ড' বাধানো বা ঘটানো বলে থাকি।

সুজ. ব.

লণ্ডন

টেম্‌স্ নদীর তীরে অবস্থিত লণ্ডন যুক্তরাজ্যের রাজধানী। প্রথম দিকে (৪৩ খ্রিস্টাব্দ) এখানে রোমানেরা বাস করত। তখন এর নাম ছিল লোণ্ডিনিয়াম (Londinium)। পরে এর নাম হয় লণ্ডন। মধ্যযুগের (দ্র) প্রথম দিকে শহরটি

লণ্ডনের বিখ্যাত রাস্তা 'কিংসওয়ে'

www.pathagar.com

ইংরেজদের রাজধানীতে পরিণত হয়। সে সময়ে লণ্ডন ছিল ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় শহর। খ্রিস্টীয় ১৬ শতকে শহরটির লোকসংখ্যা ছিল দু' লাখেরও ওপর। ১৬৬৬ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে লণ্ডনের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায়। এর পর পুনর্গঠনের মাধ্যমে শহরটি দিনে দিনে বড় ও সমৃদ্ধতর হতে থাকে। বিখ্যাত লেখক চার্লস ডিকেন্সের (দ্র) লেখা থেকে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর লণ্ডন সম্পর্কে জানতে পারি। সে সময়ে শহরটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নোংরা। ধনীরা বড় বড় বাড়িতে বাস করত। গরিবেরা খুব সামান্যই খেতে পেত। বেশির ভাগ শিশুরা স্কুলে যেত না। প্রায় প্রতিদিনই লণ্ডনের রাস্তায় গরিব শিশুদের মৃত অবস্থায় দেখা যেত। উনিশ শতকে ব্যাংক ব্যবসা, ইনসিওরেন্স ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে লণ্ডনের আধিপত্য বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়। বিরাট সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে লণ্ডনকে তখন বিশ্বের রাজধানী বলেই বোধ হত।

মধ্যলণ্ডন তিনটি প্রধান এলাকায় বিভক্ত। (১) শহর এলাকা (The City)—এটি সবচেয়ে পুরনো এলাকা এবং প্রধানত ব্যবসাকেন্দ্র; (২) পশ্চিম সীমান্ত এলাকা (West End)—এখানে নানারকম প্রয়োজনীয় দোকান, থিয়েটার, রেস্তোরাঁ, আনন্দভোজ ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা রয়েছে; (৩) ওয়েস্টমিনস্টার (Westminster)—এটি প্রধানত সরকার ও প্রশাসনিক কেন্দ্র; এখানে রয়েছে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ভবন। এই পার্লামেন্ট দু'টি হাউসে বিভক্ত : 'হাউস অব লর্ড্স্' এবং 'হাউস অব কমন্স্'। ব্রিটেনের অভিজাত শ্রেণীর লোকজন (যেমন— ডিউক, আর্ল্, ব্যারন ইত্যাদি), ইংল্যাণ্ডের চার্চের দু' জন আর্চবিশপ এবং ২৪ জন সিনিয়র বিশপ হাউস অব লর্ড্স্-এর সদস্য। হাউস অব কমন্স্-এ বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত ৬৩৫ জন সদস্য রয়েছেন।

আঠারো শতক ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকের স্থাপত্যসমূহ লণ্ডনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ। বৃহত্তর লণ্ডনের বাকি অংশে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন বহুসংখ্যক গ্রাম। গ্রামগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা রয়েছে। লণ্ডন ইংল্যাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং ব্রিটিশ আমদানির অধিকাংশই এখানে গ্রহণ করা হয়।

হো. আ.

লণ্ডন, জ্যাক [১৮৭৬—১৯১৬]

বিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। ১৮৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সানফ্রান্সিসকো শহরে এক দরিদ্র পরিবারে জ্যাক লণ্ডন (Jack London) জন্মগ্রহণ করেন।

কৈশোরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিশেষ সুযোগ না পেলেও সন্ধান পান নানাবিধ গ্রন্থের। বই পড়ায় ছিল তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। তিনি জীবন নির্বাহের জন্য গ্রহণ করেন বিচিত্র সব পেশা।

১৮৯৮ সালে ক্লনডাইক-এ স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হলে ভাগ্যান্বেষণে জ্যাক লণ্ডন সেখানে ছুটে যান। এক টুকরো স্বর্ণের মালিক হতে না পারলেও স্বর্ণ-অনুসন্ধানী হিসাবে তিনি লাভ করেন প্রচুর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতারই ফসল তাঁর জীবনের প্রথম উপন্যাস 'কল্ অব্ দ্য ওয়াইল্ড' (১৯০৩)। পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীগুলো তাঁর রচিত উপন্যাস এবং ছোটগল্প সাদরে গ্রহণ করতে শুরু করে। তখন একমাত্র লেখাকেই পেশা হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন। তিনি ক্রমে পরিণত হন জনপ্রিয় লেখকে। তাঁর শেষ জীবন কাটে প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। জ্যাক লণ্ডনের বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'সন অব দ্য উল্‌ফ্' (১৯০০), 'দ্য সি-উল্‌ফ্' (১৯০৪) এবং 'হোয়াইট ফ্যাং'। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত একটি গল্পের নাম 'টু বিল্ড এ ফায়ার'।

তিনি ১৯১৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

লন টেনিস টেনিস / লন টেনিস দ্র

লবণ

সাধারণভাবে অ্যাসিড ও ক্ষার-এর মিলনে রাসায়নিক ক্রিয়ায় লবণ (salt) উৎপন্ন হয়। অসংখ্য লবণজাতীয় পদার্থের মধ্যে খাবার লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) আমাদের সুপরিচিত। খাবারকে সুস্বাদু করার জন্য খাবার লবণ একটি অপরিহার্য উপাদান। এক পরমাণু পরিমাণ সোডিয়াম (sodium) এক পরমাণু পরিমাণ ক্লোরিন (chlorine)-এর সঙ্গে মিলে এক মলিকিউল (molecule) অর্থাৎ এক অণু পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইড সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

খাবার লবণের মূল উৎস সমুদ্র। বিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্রের পানিতে শতকরা প্রায় সাড়ে তিন ভাগ লবণ রয়েছে। স্থলভাগ থেকেই এসব লবণ সমুদ্রে গিয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তাঁরা বলেন, পৃথিবীর ওপরের নানা রকম শিলা বা পাথর-মাটি-কাঁকর বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে গিয়ে লবণ তৈরি করে। সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে সমুদ্রের পানি উপরে উঠলেও লবণ কিন্তু থেকে যায়। সমুদ্র থেকে এই লবণ সংগ্রহ করার বিশেষ পদ্ধতি আছে।

লবণ সংগ্রহ করতে হলে প্রথমে সমুদ্রের পানিকে ধাপে ধাপে প্রায় ৩ ফুট গভীর স্থলভূমিতে তুলে আনতে হয়। এতে প্রাথমিক অবস্থায় কাদামাটি জাতীয় শক্ত অবিশুদ্ধ বস্তু এবং অতি ক্ষুদ্র প্রাণীসমূহ জমা হয়। তার পর এক সময় ক্যালসিয়াম সালফেট (calcium sulphate) পানি থেকে আলাদা হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে যেতে যেতে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এভাবে শেষ ধাপে সোডিয়াম ক্লোরাইড জমা হয়। এটি সংগ্রহ করে শুকিয়ে পরিশোধনের পর লবণ পাওয়া যায়।

শীতের দেশে আবার অন্য পদ্ধতিতে সমুদ্র থেকে লবণ সংগ্রহ করা হয়। সমুদ্রের পানিকে সেখানে জমাট বাঁধতে দেওয়া হয়। তার পর বরফে পরিণত হলে বরফ সরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ লবণের মলিকিউল অর্থাৎ অণুসমূহ জমাট বাঁধা বরফের নিচে থেকে যায়। এভাবে বার বার বরফ সরিয়ে নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত সামান্য পরিমাণ অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি অবশিষ্ট থাকে। এই পানি সংগ্রহ করে কৃত্রিম উত্তাপের সাহায্যে বাষ্পায়িত করলে লবণ পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে অনেক লবণভাণ্ডার আছে। তার মধ্যে মেক্সিকোর লবণভাণ্ডার পৃথিবীবিখ্যাত। এর আয়তন এক লক্ষ বর্গমাইল।

সুজ. ব.

লয়

তালের গতির নাম লয়। গীত, বাদ্য বা নৃত্য ধীরে, মধ্য গতিতে বা দ্রুত গতিতে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা লয়ের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। লয় প্রধানত তিন প্রকার : বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত। বর্তমানে অতিবিলম্বিত, বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত ও অনুদ্রুত এই পাঁচ প্রকার লয়বিভাগ প্রচলিত। দ্রুত লয় দ্বিগুণ ঢিমে হলে মধ্যলয় হয় এবং মধ্যলয় দ্বিগুণ ঢিমে হলে বিলম্বিত লয় হয়। বা তার বিপরীত : ঢিমেলয় দ্বিগুণ দ্রুত হলে মধ্যলয় এবং মধ্যলয় দ্বিগুণ দ্রুত হলে দ্রুতলয় উৎপন্ন হয়। সেকেণ্ডের হিসাবে লয়বিভাজন এরূপ: বিলম্বিত লয়ে প্রতি মাত্রার স্থিতি দুই সেকেণ্ড হলে মধ্যলয়ে প্রতি মাত্রার স্থিতি হবে এক সেকেণ্ড এবং দ্রুতলয়ে প্রতি মাত্রার স্থিতি হবে আধ সেকেণ্ড। অতি বিলম্বিত লয়ে প্রতিমাত্রার স্থিতি হবে চার সেকেণ্ড এবং অনুদ্রুত লয়ে প্রতি মাত্রায় স্থিতি হবে সিকি সেকেণ্ড। বৈচিত্র্য সহকারে গীতে, বাদ্যে বা নৃত্যে নানা ছন্দে লয় প্রদর্শনকে 'লয়কারী' বলা হয়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে লয়কে বলা হয় টেম্পো। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন ভাগে লয়কে বিভক্ত করা হলেও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে লয়ের অনুবিভাগ আছে। সে অনুসারে পাশ্চাত্য লয়-এর নাম হচ্ছে : গ্রাবে—সর্বাধিক বিলম্বিত ও গম্ভীর। লেট—বেশ বিলম্বিত। লার্গো—বেশ বিলম্বিত ও প্রশস্ত। লার্গেট্টো—ঈষৎ বিলম্বিত, লার্গো থেকে কম বিলম্বিত। আদাজিও—অনায়াস বিলম্বিত। আন্দান্তে—মধ্য বিলম্বিত, সম্প্রতিভ, চলমান। আন্দান্তিনো—আন্দান্তের চেয়ে ঈষৎ দ্রুত। মোদেরাতো—মধ্যলয়। আল্লেগ্রেট্টো—ঈষৎ দ্রুত মধ্যলয়, উচ্ছ্বাসপূর্ণ দ্রুতমধ্য। আল্লেগ্রো—দ্রুতলয়, উচ্ছ্বাসপূর্ণ দ্রুত। প্রেস্তো—অতি দ্রুতলয়। প্রেস্তিস্‌সিমো—যথাসাধ্য দ্রুত। ভিভাচি—সপ্রাণ।

ক. গো.

লরেন্স, ডি. এইচ. [১৮৮৫—১৯৩০]

বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক। পুরো নাম ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স (David Herbert Lawrence)। ১৮৮৫ সালে ইংল্যাণ্ডের নটিংহাম্‌শায়ারে এক খনিশ্রমিক-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম উপন্যাস 'লেটিশিয়া'। পরে এটিই 'দ্য হোয়াইট পিকক্' নামে প্রকাশিত হয়। প্রচলিত সামাজিক প্রথা, বিশ্বাস ও নীতিবাদের বিরুদ্ধে লরেন্স চিরকালই বিদ্রোহী ছিলেন।

সাহিত্যিক-জীবনে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস নিষিদ্ধ হয়েছিল। এসবের জন্য মামলায়ও জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম— উপন্যাস : 'সন্স্ অ্যাণ্ড লাভার্স্', 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার', 'রেইনবো' ও 'ক্যাঙ্গারু'; ছোটগল্প : 'ইংল্যাণ্ড, মাই ইংল্যাণ্ড', 'দ্য উওম্যান হু রোড অ্যাওয়ে অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ'। কবি হিসাবেও তিনি সবিশেষ খ্যাত।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মারা যান।

আ. হু.

লসিকাতন্ত্র (Lymphatic System)

লসিকাতন্ত্র হচ্ছে লসিকানালি ও লসিকাগ্রন্থি দ্বারা গঠিত পরিবহনতন্ত্র। লসিকাতন্ত্র লসিকারসের মাধ্যমে দেহকোষে পুষ্টি উপাদান, অক্সিজেন (দ্র), হরমোন (দ্র) এবং প্রতিরক্ষণকোষ সরবরাহ করে এবং কোষের দূষিত পদার্থ রক্তস্রোতে ফিরিয়ে আনে।

কোষের ফাঁকে ফাঁকে কৈশিকনালি ভেদ করে যে তরল পদার্থ অবিরাম নির্গত হয় এবং লসিকানালিতে প্রবেশ করে, তাকেই বলা হয় লসিকারস। লসিকারসে রক্ত জমাট বাঁধার উপাদান, আমিষ, চর্বি (দ্র), বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি থাকে। প্রতিদিন ২-৪ লিটার লসিকারস দেহে প্রবাহিত হয়। লসিকারস প্রোটিন, চর্বি, শর্করা ও অন্যান্য জৈব ও অজৈব উপাদানে তৈরি, যার পরিমাণ মাত্র ৬ শতাংশ, বাকি ৯৪ শতাংশ পানি।

লসিকানালির প্রাচীর পাতলা। 'এপিথেলিয়াল' কোষ দিয়ে তৈরি। লসিকানালি জালিকা তৈরি করে। এর মাঝে মাঝে অনেক লসিকাগ্রন্থি থাকে। লসিকানালিতে কপাটিকা থাকার কারণে লসিকারস শুধু হৃৎপিণ্ডের (দ্র) দিকেই প্রবাহিত হয়।

মাঝে মাঝে রোগজীবাণু, ক্যান্সারকোষ লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। লসিকাগ্রন্থিতে লিম্ফোসাইট শ্বেত কণিকা (দ্র) এবং অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা দেহে রোগজীবাণু ধ্বংস করে। রোগজীবাণু ধ্বংস করতে গিয়ে লসিকাগ্রন্থিতে মাঝে মাঝে প্রদাহ (দ্র) দেখা দেয় এবং গ্রন্থিগুলো ফুলে যায়। লসিকাতন্ত্র দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারও অন্যতম প্রধান অংশ।

আ. আ. হা.

লাইকা স্পুৎনিক্ দ্র

লাইন প্রথা

১৯৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত আসামে বহিরাগতদের বসবাস একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সরকার কর্তৃক টেনে দেওয়া ভৌগোলিক সীমারেখাই ইতিহাসে 'লাইন প্রথা' নামে পরিচিত।

আসামের বিস্তীর্ণ এলাকা এক সময় জঙ্গলাকীর্ণ ও হিংস্র শ্বাপদের বিচরণক্ষেত্র ছিল। পূর্ববঙ্গের ভূমিহীন অনেক মানুষ ও জমিদার-মহাজনদের দ্বারা লাঞ্ছিত নিপীড়িত বহু কৃষক আসামের এই দুর্গম অরণ্যভূমি পরিষ্কার করে আবাদ শুরু করলে সরকার প্রথম দিকে তাদের স্বাগত জানায় এবং দুর্গম এলাকায় তাদের জমি বরাদ্দ দিয়ে উৎসাহিত করে। এভাবে আসামের গোয়ালাপাড়া, নওগাঁ ও কাছাড় জেলায় হাজার হাজার বাঙালি উদ্বাস্তু এসে আবাস গড়ে তোলে। অল্পদিনের মধ্যে তারা কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। কিন্তু স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো উদ্বাস্তুদের ব্যাপক বসতি স্থাপনে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা ক্রমে উদ্বাস্তু কৃষকদের কাজে বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে এবং এই নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এর জের হিসাবে স্থানীয় জনগণের দাবিতে সরকার লাইন প্রথা প্রবর্তন করে বহিরাগতদের অধিকারযোগ্য জমির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেয়। ১৯৩৫ সালে অহমিয়ারা বহিরাগত বাঙালিদের বিরুদ্ধে 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলন শুরু করে।

মওলানা ভাসানী

মওলানা ভাসানী (দ্র) আসামে পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি 'লাইন প্রথা' ও 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করে নতুনভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। এই আন্দোলনের চাপে ১৯৪০ সালের শেষ ভাগে আসামের এডভোকেট জেনারেল লাইন প্রথার কার্যকারিতা স্থগিত করতে বাধ্য

www.pathagar.com

হন। এর পর পর্যায়ক্রমে কামরূপ, দারং ও নওগাঁরও বিভিন্ন এলাকা থেকে লাইন প্রথা প্রত্যাহার করা হয় এবং যে সব জায়গায় বহিরাগতরা নতুনভাবে আবাস গড়ে তুলছিল সে সব জায়গায় লাইন প্রথা শিথিল করা হয়। লাইন প্রথা-বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য আসামে পাকিস্তান আন্দোলনের (দ্র) ভিত্তি রচনা করে।

সুজ. ব.

লাইনোটাইপ মুদ্রণ দ্র

লাইব্রেরি গ্রন্থাগার দ্র

লাইব্রেরি অব কংগ্রেস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) জাতীয় গ্রন্থাগার। মার্কিন কংগ্রেসের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে, এমন সব গ্রন্থ সংগ্রহ করার লক্ষ্য থেকেই ১৮০০ সালে এই গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিস কংগ্রেস-সদস্যদের অনুরোধক্রমে যে কোনো বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ ছাড়া এর কাজের পরিধি বর্তমানে এতটাই সম্প্রসারিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল সরকারি দফতর বা শাখা এবং ব্যাপক সাধারণ মানুষের চাহিদা মোতাবেক নানাবিধ তথ্য-সহায়তা প্রদানেও লাইব্রেরি অব কংগ্রেস বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৮৭০ সাল থেকে মার্কিন কপিরাইট ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি এই সংস্থা মার্কিন লোকগীতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার দায়িত্বভার পেয়েছে। এ ছাড়া এটি ২ হাজার ৫ শত গবেষণাসংশ্লিষ্ট পাঠাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থসমুদয়ের বহু খণ্ডবিশিষ্ট 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন ক্যাটালগ'ও প্রকাশ করে থাকে। শুধু তাই নয়, উল্লিখিত গ্রন্থাগারসমূহের পাঠকদের ব্যবহারের জন্য ক্যাটালগ, কার্ড ছাপানো ও তার কাজের আওতাভুক্ত। তা ছাড়া এটি বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ-করণ বিষয়ক একটি বহুমুখী ক্যাটালগপদ্ধতি উদ্ভাবন করেও তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। লাইব্রেরি অব কংগ্রেসকে আর্থিক সমর্থন যুগিয়ে থাকে প্রাথমিকভাবে কংগ্রেসীয় অর্থ তহবিল। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের উপহারসামগ্রীসহ অন্যান্য আর্থিক সাহায্য এসে থাকে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে।

গ্রন্থাগারটির সংগ্রহে রয়েছে ৯০ লক্ষ বই এবং ৩০ লক্ষ পাণ্ডুলিপি (দ্র)। এর সংগ্রহভাণ্ডারে আরো রয়েছে মানচিত্র (দ্র), সঙ্গীতের টেপ, ডিস্ক, চিত্রকলা (দ্র), আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র (দ্র)। সবকিছু মিলিয়ে মোট প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ আইটেম এখানে সংরক্ষিত।

কপিরাইট (দ্র) সংক্রান্ত বিষয়টি তার কাজের আওতাভুক্ত বলে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কপিরাইটভুক্ত প্রতিটি গ্রন্থের কপি লাভ করে থাকে। এর কাজের অন্যতম মূল লক্ষ্য হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসবিষয়ক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা। এসবের মধ্যে ক্যালভিন কুলিজ পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত কাগজ বা দলিলদস্তাবেজ সংগ্রহ করে এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারটি প্রথমে গড়ে তোলা হয় ক্যাপিটলের একটি ভবনে। ১৮১২ সালে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বাহিনী বোমাবর্ষণ করলে এর অধিকাংশ বই ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮১৫ সাল থেকে এর গ্রন্থের পুনঃসংগ্রহের কাজ শুরু হয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস কর্তৃক মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস্ জেফার্সনের (দ্র) ৬ হাজার গ্রন্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি ক্রয় করা হয়। ১৯৩০ সাল নাগাদ এ রকম আরো বেশ কিছু ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ক্রয় করার ফলে এর গ্রন্থ-সংগ্রহের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি হয়।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের মূল ভবন গড়ে তোলা হয় ১৮৯৭ সালে। গ্রন্থাগারটির আওতাভুক্ত হয়েছে টমাস্ জেফার্সন্ এবং জেম্‌স্ ম্যাডিসনের ভবনও।

সাম্প্রতিককালে এর ক্যাটালগ কম্পিউটারাইজ্‌ড্ করা হয়েছে এবং প্রাচীন ও নষ্ট-হতে-বসা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়ে থাকেন মার্কিন সিনেটের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দেশটির প্রেসিডেন্ট কর্তৃক।

আ. হু.

লাইব্রেরি সায়েন্স গ্রন্থাগারবিদ্যা/গ্রন্থাগার বিজ্ঞান দ্র

লাইসিয়াম আরিস্টোটল দ্র

লাওকুন্ (Laocoön)

একটি বিখ্যাত গ্রিক ভাস্কর্য সিরিজের নাম। বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক গোট্‌হোল্ড এফ্রাইম লেসিং (Gotthold

www.pathagar.com

Ephraim Lessing: ১৭২৯-১৭৮১) তাঁর একটি নন্দনতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থে এই ভাস্কর্যকে সর্বপরিচিত করে তোলেন; তাঁর বইয়ের নামটিই ছিল 'লাওকুন্, কিংবা চিত্রকলা ও কাব্যের সীমানা সম্পর্কে' (১৭৬৬)।

গ্রিক ভাস্কর্যটি হল তিনটি মানুষকে একটি সাপ সর্বাঙ্গে পেঁচিয়ে পিষে ফেলতে চাইছে, সে ছাড়িয়ে নিতে পারছে না। এর পিছনে গ্রিক পুরাণের একটি গল্প আছে। লাওকুন্ নামে এক পুরোহিত ট্রয় নগরীতে বাস করতেন। ট্রয়ের যুদ্ধ (দ্র) চলাকালে তিনি নগরবাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তারা যেন গ্রিকদের দেওয়া কাঠের ঘোড়া গ্রহণ না করে। যাই হোক, লাওকুন্ তাঁর দু' ছেলেকে নিয়ে সমুদ্রদেব পোসেইদোন্-এর উদ্দেশে বেলাভূমিতে যখন প্রার্থনারত ছিলেন তখন সমুদ্র থেকে দুই মহানাগ উঠে এসে তাঁদের জড়িয়ে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলে। এই শোকাবহ ঘটনাটি কবি ভার্জিলের (দ্র) ঈনীদ (দ্র) মহাকাব্যে (দ্র) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

ভাস্কর্যশিল্প: লাওকুন্

লাওকুনের ভাস্কর্যমূর্তি একাধিক প্রাচীন গ্রিক ভাস্কর তৈরি করে গেছেন। ক্রমে ক্রমে লাওকুন্ শব্দটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা পেয়ে গেছে; এর মানে এখন—অপ্রতিরোধ্য নিয়তির গ্রাসে মনুষ্যজীবন।

হা. মা.

লাও-ৎসু

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর চীনে লাও-ৎসু (Lao-tzu)-র জন্ম। তিনি পৃথিবীর প্রাচীনতম এক দার্শনিক। লাও-ৎসু 'তাও'-ধর্মের মতবাদ প্রচার করেন। 'তাও-তে কিঙ্' নামের এক গ্রন্থে তিনি নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ সঙ্কলিত করেন।

'তাও' মানে পথ। আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে সেই পথে সকল কিছুকে পরিচালিত করা হয়। এই পথ অনাদি, অনন্ত, অপরিবর্তনীয়।

লাও-ৎসু প্রবর্তিত দার্শনিক মত খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক পর্যন্ত চীনে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল। প্রাচীন চীনের উন্নতির মূলে ছিল তাওধর্মের মূল আদর্শের চর্চা। পরে চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম (দ্র) তাও-দর্শনের সংস্পর্শে নতুন রূপ লাভ করে।

লাও-ৎসুর জীবনকাল সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। চীনা রাজদরবারে তিনি ছিলেন গ্রন্থাগারিক। দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ 'তাও' মতবাদ এক সময় চীনাবাসীদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আ. ই.

www.pathagar.com

লাক্ষা (lac)

লাক্ষাকীটের (ল্যাকসিয়ার ল্যাক্কা) দেহ থেকে নির্গত রজন জাতীয় এক প্রকার উপাদান, যা থেকে চাঁচ বা গালা উৎপন্ন হয়। লাক্ষাকীট কুল, ডুমুর, অশ্বত্থ, পলাশ ও কুসুমগাছের ডালে থাকে। বৃক্ষের রস পান করলে এই কীটের গা থেকে রজন জাতীয় উপাদানটি বের হয়। এই উপাদান লাল ও হলুদ রঙের সংমিশ্রণে গঠিত। পরিশোধন করলে লাল রঙ পানিতে গলে যায় এবং হলুদ অংশটি অবশিষ্ট থাকে। হলুদ অংশই লাক্ষা নামে পরিচিত। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সিমেন্ট, পালিশ, কালি, জুতার কালি ও প্রসাধন দ্রব্য তৈরিতে, দন্ত চিকিৎসায়, রাবার, বস্ত্র, ঘড়ি ও চর্মশিল্পে লাক্ষা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। লাক্ষার লাল রঙ দিয়ে আলতা তৈরি হয় এবং অনেক জিনিসে রঙ করা হয়।

ভারত (দ্র), মায়ানমার (দ্র), থাইল্যাণ্ড (দ্র), শ্রীলঙ্কা(দ্র), ইন্দোনেশিয়া (দ্র), মালয় ও ইন্দোচীনে (দ্র) লাক্ষাকীটের চাষ হয়। লাক্ষার চাষ খুব সহজ। যে গাছে লাক্ষাপোকা থাকে সেখান থেকে ঐ পোকাসহ ডাল কেটে এনে অন্য কুল বা পলাশ গাছে বেঁধে দিলেই ওরা বাসা বাঁধতে শুরু করে।

সুজ. ব.

লাঙ্গলবন্দ

বাংলাদেশে (দ্র) ঢাকার (দ্র) পূর্ব দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের (দ্র) তীরে অবস্থিত হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানকার ব্রহ্মপুত্র নদে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ভক্তরা স্নান করে পবিত্র হন। পুরাণমতে, ব্রহ্মপুত্র নদের অপর নাম লৌহিত্য। পরশুরাম লাঙ্গল দিয়ে পথ কেটে কেটে নদীটিকে দক্ষিণ দিকে বইয়ে নিয়ে আসেন। প্রবাদ আছে যেখানে তাঁর লাঙ্গল টানা 'বন্দ' (শেষ) হয়, সেখানকার নাম হয় লাঙ্গলবন্দ।

নি. অ.

লাঠিখেলা

লাঠিখেলা গ্রাম-বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন খেলা। আগ্নেয়াস্ত্রের কিংবা ঢাল-তলোয়ারের যুগের বহু পূর্ব থেকে লাঠিই ছিল মানুষের বিপদের বন্ধু। লাঠিকে ঘিরে বাংলাদেশের অনেক খেলাধুলা জন্মলাভ করেছে। তবে বর্তমানে শুধু খেলা হিসাবে লাঠিখেলা পূর্বের স্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

কচি-কাঁচাদের লাঠিখেলা

লাঠিখেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। চিত্ত-বিনোদনমূলক লাঠিখেলা ও প্রতিযোগিতামূলক লাঠিখেলা। বর্তমানে প্রত্যেকটি খেলা তিন মিনিট করে পাঁচ ধরনের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে— এগুলি হল : ১. বড় লাঠির 'ফ্রি ফাইট' (আড়খেলা), ২. ছোট লাঠির 'ফ্রি ফাইট' (লড়ি খেলা), ৩. ছোট লাটির নকশা খেলা বা রঙপশারী খেলা, ৪. ছোট লাঠির কাউন্সিল খেলা, ৫। ছোট লাঠির পয়েন্টের খেলা।

বড় লাঠির মাপ হল নিজ হাতের চার হাত আর ছোট লাঠির মাপ হল নিজ হাতের আড়াই হাত বা তিন হাত, তবে প্রয়োজনে দেড় হাত হতে দু' হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। লাঠিখেলার আখড়া হল ২০X১৫ হাত, তবে প্রদর্শনী খেলা প্রতিযোগিতায় ১২X১২ হাত। বাংলাদেশে প্রায় দেড় লক্ষ লাঠিয়াল রয়েছে। জাতীয় চিত্তবিনোদন সমিতির উদ্যোগে প্রায়ই পাঁচ দিনব্যাপী লাঠিখেলার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

কা. আ. আ.

লাতিন আমেরিকা (Latin America)

লাতিন আমেরিকা পরিচয়টি মূলত ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক ভূ-ভাগের পরিচয়। লাতিন আমেরিকা বলতে যে দেশগুলো বোঝায় তা উত্তর আমেরিকা (দ্র) মহাদেশের (দ্র) মেক্সিকো

www.pathagar.com

(বা মেহিকো), মধ্য-আমেরিকার ক্ষুদ্র দেশগুলো এবং দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র) মহাদেশের অন্তর্গত দেশসমূহ। এসব দেশে স্প্যানিশ ভাষা (দ্র) ও পর্তুগিজ ভাষা (একমাত্র ব্রাজিলে) চালু আছে। এ দু'টি ভাষাই লাতিন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। অ-ইংরেজিভাষী এই দেশগুলোকে লাতিন আমেরিকা বলার এই এক কারণ।

হা. মা.

লাতিন কোয়ার্টার

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস (ফরাসিরা বলে 'পারী') শহরের একটি ছোট্ট এলাকা। ছোট্ট হলেও শিল্প-সাহিত্যের জগতে অত্যন্ত বিখ্যাত। কারণ, প্রতিভাবান, তরুণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উৎকেন্দ্রিক কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা এখানে আড্ডা জমায়, বসবাস করে। বলা দরকার, লাতিন কোয়ার্টার (Latin Quarter) বিত্তবানদের এলাকা নয়। সে জন্য গরিব-দুঃস্থ শিল্পসাধকদের জন্য স্বস্তিদায়ক জায়গাও বটে।

হা. মা.

লাফিং গ্যাস (laughing gas)

লাফিং গ্যাস কোনো গ্যাসের বৈজ্ঞানিক নাম নয়। নাইট্রাস অক্সাইড (Nitrous Oxide : N_2O) হল এক ধরনের বর্ণহীন ও প্রায়-গন্ধহীন গ্যাস, –৮৮.৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তরলীকৃত হয় এবং পুরু ও মজবুত ইস্পাতের সিলিণ্ডারে ভরে তরল আকারে সংরক্ষণ ও বিক্রয় করা যায়। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটকে ঈষৎ গরম করলে নাইট্রাস অক্সাইড পাওয়া যায় ($NH_4NO_3 = N_2O + 2H_2O$)।

নাইট্রাস অক্সাইডের প্রধান কাজ হল অবেদন (দ্র) ঘটানো। যখন স্থানিক অবেদন আবিষ্কৃত হয় নি তখন দন্তচিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তারেরা ব্যাপকভাবে এই গ্যাস ব্যবহার করতেন। রোগী জ্ঞান হারাবার পূর্বে এই গ্যাসের প্রভাবে কিছুক্ষণের জন্য খুব ফুর্তিতে থাকত এবং বাহ্যিক লক্ষণ ও হাবভাবে তা ফুটে উঠত; সে কারণেই লোকমুখে এ গ্যাসের নাম দাঁড়িয়ে যায় লাফিং গ্যাস।

হা. মা.

লাভা

আগ্নেয়গিরি(দ্র) থেকে নিঃসৃত গলিত ধাতব পদার্থবিশেষ।

তবে সাধারণ অর্থে লাভা বলতে গলন্ত পাথরকে বোঝায়। নানা ধরনের বালি, কাদা, ছাই, জমাট পাথর ও জ্বলন্ত গ্যাসসহ বহুবিদ ধাতব অম্লজের সংমিশ্রণে লাভা উৎপন্ন হয় এবং আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে। তখন এর উত্তাপ থাকে ২২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটেরও বেশি।

ভূপৃষ্টের বায়ুর সংস্পর্শে আসার পূর্ব পর্যন্ত লাভাকে বলা হয় ম্যাগ্‌মা (magma)। মাটি ও পাললিক শিলা দ্বারা তৈরি পৃথিবীর ভূত্বকের নিচেই রয়েছে গ্র্যানাইট বা ব্যাসাল্ট স্তর। এই স্তর তিন থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু। এর ঠিক নিচে রয়েছে ফুটন্ত ম্যাগ্‌মা। মাটির নিচের প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাপের ফলে যে প্রচুর পরিমাণ গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তা-ই ম্যাগ্‌মাকে উপরে উঠতে সাহায্য করে। উপরে উঠবার সময় তার প্রচণ্ড তাপে আশেপাশের পাথরগুলোও গলে গিয়ে ম্যাগ্‌মার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। উপরে উঠে এলেই ভিতরের গ্যাসগুলো বেরিয়ে যায়। তখন শুধু থাকে তরল পাথর, যাকে বলা হয় লাভা।

লাভা সাধারণত দু' রকমের হয়ে থাকে। ব্যাসাল্ট পাথর গলে যে লাভা তৈরি হয়, তা খুব তরল এবং তার স্রোতও খুব প্রবল হয়। কিন্তু গ্র্যানাইট জাতের পাথর গলে গিয়ে যে লাভা তৈরি হয়, তা তেমন তরল হয় না আর তার স্রোতও জোরালো নয়। জ্বালামুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময়ে

www.pathagar.com

এই জাতীয় লাভা অনেক সময় জমে যেতে থাকে।

সুজ. ব.

লাভোয়াজিয়ে, আঁতোয়ান্ লোরঁ [১৭৪৩—১৭৯৪]

ফরাসি রসায়নবিদ। 'আধুনিক রসায়নবিদ্যার জনক' হিসাবে খ্যাত আঁতোয়ান লোরঁ লাভোয়াজিয়ে (Antoine Laurent Lavoisier) ১৭৪৩ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। লাভোয়াজিয়ের সময় রসায়নবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। তাপ দিলে বা একটির সঙ্গে আরেকটির মিশ্রণ ঘটালে রাসায়নিক পদার্থগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হয় এ সম্পর্কে তৎকালীন রসায়নবিদেরা বেশ কিছু ধারণা লাভ করেছিলেন। তবে এ পরিবর্তনের সময় প্রকৃতপক্ষে কী ঘটে সে বিষয়ে তাঁদের ধারণা সঠিক ও সুস্পষ্ট ছিল না। সে সময়ে সকল দাহ্য পদার্থে ফ্লোজিস্টন (phlogiston) নামে একটি পদার্থ আছে বলে কল্পনা করা হত। পদার্থের এই ফ্লোজিস্টন বাতাস শোষণ করে বা টেনে নেয় বলেই বস্তু জ্বলে। বিজ্ঞানী লাভোয়াজিয়ে ফ্লোজিস্টন তত্ত্বকে বাতিল করে দেন। ১৭৭০ সালে তিনি একাধিক শক্তিশালী পরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করেন ও প্রথম ঘোষণা দেন যে ফ্লোজিস্টন বলে কিছু নেই। তিনি প্রমাণ করেন, বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বস্তুর সংমিশ্রণের জন্যই বস্তু জ্বলে ওঠে। বস্তুর (পদার্থের) দহনের সময় প্রকৃতপক্ষে কী ঘটে সে সম্পর্কে এটিই ছিল প্রথম যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা। তাঁর এই আবিষ্কার রসায়নবিজ্ঞানে আধুনিক ধারণার সংযোজন ঘটায়।

তেল পুড়ে কীভাবে বাতি জ্বলে সে বিষয়ে তরুণ লাভোয়াজিয়ের ছিল বেশ উৎসাহ। সেই থেকে বস্তুর 'দহন' তাঁর একটি আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়। বাতাসে বস্তুর দহন নিয়ে সতর্ক পরীক্ষণের পর তিনি দেখান যে বাতাসে প্রধানত দু' ধরনের গ্যাস রয়েছে। একটিকে তিনি বলেন অক্সিজেন (দ্র), অপরটির নাম দেন অ্যাজোট (azote)। অ্যাজোটের বর্তমান নাম নাইট্রোজেন (দ্র)। লাভোয়াজিয়ে ছিলেন ধনী পরিবারের সন্তান। তাই তাঁর গবেষণার কাজে কখনো আর্থিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নি। তিনি রসায়নবিজ্ঞানকে সুসজ্জিত ও পদ্ধতিগত করেছিলেন। তিনি বহু রাসায়নিক পদার্থের নামকরণ করেন। ১৭৮০ সালে প্রথম রাসায়নিক যৌগের (chemical compound) নামকরণের যৌক্তিক প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা (logical system) আবিষ্কার করে তিনি আধুনিক রসায়নবিদ্যার ভাষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ট্যাক্স-ফার্মিং (tax-farming)-এর ব্যবসা ছিল।

১৭৯৪ সালে ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করে বিরোধী দল। এদের বিচারে ট্যাক্স-ফার্মার (tax-farmer) হিসাবে লাভোয়াজিয়ে দোষী সাব্যস্ত হন। শাস্তি হিসাবে ১৭৯৪ সালের মে মাসে গিলোটিনে এই মহান বিজ্ঞানীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

হো. আ.

লামাবাদ পদ্মসম্ভব দ্র

লায়লা আর্জুমান্দ বানু [১৯২৯—১৯৯৫]

সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ। শুরুতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেও পরবর্তী কালে নজরুল সঙ্গীতসহ লঘু রাগসঙ্গীত (দ্র) অঙ্গের গান গাওয়ার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ঢাকায় জন্ম। পিতা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর, মাতা সারা তৈফুর। ওস্তাদ গুল মুহাম্মদ খাঁর তালিমে লায়লা আর্জুমান্দ বানুর সঙ্গীতজীবন গঠিত হয়।

এ দেশের মুসলমান সমাজে সঙ্গীতচর্চার বিস্তারে তিনি স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিশোরী লায়লা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আজীবন তিনি রেডিও, টেলিভিশন ও গণসঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে লায়লা আর্জুমান্দ বানু নানা দেশ ভ্রমণ করেন ও নানা সম্মানে ভূষিত হন। তিনি ১৯৯৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি মারা যান।

ক. গো.

লায়লা সামাদ [১৯২৮—১৯৮৯]

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি ১৯২৮ সালের ৩রা এপ্রিল

www.pathagar.com

দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান বাহাদুর আমিনুল হক।

লায়লা সামাদ কলিকাতার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল, স্যার আশুতোষ কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ছাত্রী হিসাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি 'বংশীধর জালাল স্বর্ণপদক' লাভ করেছিলেন।

লায়লা সামাদ ১৯৫০ সালে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। প্রথমে তিনি 'সাপ্তাহিক বেগম' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করেন। এর পর তিনি 'দৈনিক সংবাদ'-এর স্টাফ রিপোর্টার পদে যোগ দেন। এ দেশের শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি দীর্ঘদিন সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'র মহিলা বিভাগ, 'দৈনিক পূর্বদেশ'-এর শিশু বিভাগ 'চাঁদের হাট' এবং 'দৈনিক বাংলা'র মহিলা বিভাগ পরিচালনা করেন। পঞ্চাশের দশকে 'অনন্যা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা ও 'চিত্রিতা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'অনন্যা' পত্রিকাটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে সুধী সমাজের প্রশংসা লাভ করে।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি লায়লা সামাদ সাহিত্যচর্চাও চালিয়ে যান। ছোটগল্প, উপন্যাস, নিবন্ধ, নাটক ও শিশুসাহিত্য রচনায় তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সাহিত্যচিন্তায় নানাবিদ সামাজিক সমস্যা, সমাজে নারীর স্থান ও ভূমিকা, নারীপ্রগতি, শিশুপরিচর্যা ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়। তাঁর প্রকাশিত বইগুলো হল—গল্প : 'দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে' (১৯৬৩), 'কুয়াশার নদী' (১৯৬৫), 'অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা' (১৯৭৮)। স্মৃতিকথা ও অন্যান্য রচনা : 'একাত্তুরের কড়চা', 'বেগম সাহেবা' (১৯৭৯), 'ষোল দেশের ষোল কাহিনী' (১৯৭৯)। শিশুসাহিত্য : 'শ্রীশ্রী বিড়ালোত্তম দাস' (১৯৬২)। 'আপনার শিশুকে জানুন' শিরোনামে শিশুপালন বিষয়েও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

লায়লা সামাদ বিভিন্ন মহিলা ও সমাজসেবামূলক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি আজীবন এ দেশের অবহেলিত নারীসমাজ ও শিশুদের কল্যাণে কাজ করেছেন। তিনি নারী-অধিকার আন্দোলনের এক জন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ লায়লা সামাদ ১৯৮১ সালে ছোটগল্পের জন্য 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (দ্র) লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি নূরুন্নেসা বিদ্যাবিনোদিনী স্বর্ণপদক, হাসান হাফিজুর রহমান স্বর্ণপদক ও সূফী মোতাহার হোসেন পুরস্কারও লাভ করেন।

লায়লা সামাদ ১৩৯৬ সনের ২৬শে শ্রাবণ (আগস্ট ১৯৮৯ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

লায়লী-মজনু

দৌলত-উজীর বাহরাম খাঁ (দ্র) প্রণীত (আনু. ১৫৭৫) বিয়োগান্ত প্রণয়োপাখ্যান। দশম শতকের ফারসি কবি রুদাগীর কবিতায় লায়লী-মজনুর উল্লেখ মেলে। দৌলত-উজীরের রচনায় এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রী আরবি বলে কথিত হলেও আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপাখ্যানের উল্লেখ নেই। মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবিরা ধর্মনিরপেক্ষ মানবীয় প্রণয়োপাখ্যানের যে বৈপ্লবিক ধারা প্রবর্তন করেন লায়লী-মজনু তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লায়লী-মজনুর প্রেমই কাব্যের উপজীব্য। ভাষা সংস্কৃতানুসারী, মার্জিত। হৃদয়াবেগ প্রকাশে কবিত্বশক্তির সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে এবং নিসর্গবর্ণনায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ছায়া ফেলেছে।

মে. খা.

লারা, ব্রায়ান চার্লস [১৯৬৯—]

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কৃতী বাঁ-হাতি ব্যাট্‌সম্যান। বর্তমান ক্রিকেটবিশ্বে সবচেয়ে সাড়া জাগানো ব্যাট্‌সম্যান ব্রায়ান লারা (Brian Charles Lara) ১৯৬৯ সালে ত্রিনিদাদের সান্তাক্রুজে জন্মগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের লাহোরে ১৯৯০–'৯১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্ট

www.pathagar.com

ম্যাচ খেলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেন ১৯৯০–'৯১ সালে, করাচিতে।

ব্রায়ান লারা শুধু মারমুখী ব্যাট্‌স্‌ম্যানই নন, দলের প্রয়োজনে লেগ ব্রেক গুগলি বলও করে থাকেন।

টেস্ট ক্রিকেটে তিনি ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। ১৯৯৩–'৯৪ সালে তিনি সেন্ট জোন্স-এ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৩৭৭ রানের এক অবিস্মরণীয় ইনিংস খেলে এই রেকর্ড করেন।

ব্যাটিং–এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বর্তমান সময়ের সাফল্যের সিংহভাগ কৃতিত্ব লারার প্রাপ্য। ১৯৮৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে লারার অসামান্য ব্যাটিং প্রতিভা দেখে ক্রিকেটের মহানায়ক গ্যারি সোবার্স (দ্র) মন্তব্য করেছিলেন, 'ওর উঠে আসার আর বেশি দেরি নেই। এই ব্যাট্‌স্‌ম্যানটি অচিরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাঙ্গনে বোলারদের ইচ্ছেমতো শাসন করবে।'

সোবার্সের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। ওয়ান ডে ম্যাচ, টেস্ট ম্যাচ—সবখানেই তাঁর মনোমুগ্ধকর স্কোয়ার ড্রাইভ, লেট কাট, গ্লান্স, পুল শর্ট দর্শকদের শিহরিত করছে।

জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমেই তিনি উদ্বোধনী ব্যাট্‌স্‌ম্যান হিসাবে মূল্যবান ৪৪ রান করে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছিলেন।

টেস্টজীবনের প্রথম শতরান করতে গিয়েই ব্রায়ান লারা বিশ্বরেকর্ড করেন। ২৭৭ রানের সেই অসাধারণ ইনিংস খেলতে গিয়ে তিনি বাউণ্ডারি মেরেছিলেন ৩৮টি।

ব্রায়না লারার ব্যাটিং ক্রিকেট পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

	ইনিংস	অপরাজিত	রান	সর্বোচ্চ	গড় রান	শত রান	অর্ধশত	ক্যাচ
টেস্টম্যাচ	২৬	০	১৬২৮	৩৭৭	৬২.৬১	৩	৮	২৭
ওয়ান-ডে	৬৮	৫	২৫২৯	১৫৩	৪০.১৪	৪	১৮	৩৮

টি. কি.

লালন একাডেমী

বাউল কবি লালন সাঁইয়ের (দ্র) বা লালন শাহের জীবন বিষয়ে সার্বিক গবেষণা, তাঁর রচিত গান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালে কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় অবস্থিত তাঁর আখড়াকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত 'লালন লোক সাহিত্য কেন্দ্র'কেই ১৯৭৬ সালে নতুন নামকরণ করা হয় 'লালন একাডেমী'। লালনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সভা-সেমিনারের আয়োজন এবং স্মরণিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা এই একাডেমীর অন্যতম লক্ষ্য ও কার্যক্রম। এই প্রতিষ্ঠানটি ছাড়াও দেশের অন্য যেসব সংগঠন ও সংস্থা লালনের জীবনকর্মের আলোচনা, তাঁর সঙ্গীতসম্পদ সংগ্রহ, প্রচার ও সংরক্ষণে বিশেষভাবে নিয়োজিত, সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে 'লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা' (প্রতিষ্ঠিত ১৯৭৫ সালে)। এই সংগঠনটির উদ্যোগে লালন বিষয়ে একটি অনিয়মিত সাময়িকী ছাড়াও ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'লালনসঙ্গীতের স্বরলিপি' এবং লালনের মৃত্যু-শতবার্ষিকীতে 'লালন মৃত্যু শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ' (১৯৯২)। 'লালন শাহ একাডেমী, হরিশপুর' ও 'পাঞ্জু শাহ সেবা সংস্কৃতি সংঘ'ও লালন বিষয়ে কতক ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালনে তৎপর। কুষ্টিয়ার 'ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর (প্রতিষ্ঠিত ১৯৭০ সালে) নামও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি লালন বিষয়ে সংস্থাটির কয়েকটি প্রকাশনাও রয়েছে।

আ. হু.

লালন সাঁই [১৭৭৪?—১৮৯০]

বিখ্যাত মরমী কবি। কারো মতে সুফিতত্ত্ববাদী কবি, কারো মতে বাউলপন্থী সাধক। তাঁর জন্মতারিখ জন্মসাল বিষয়ে বিস্তর মতভেদ বর্তমান। লালন সাঁইকে অনেকে লালন শাহও বলে থাকেন।

একদল গবেষক মনে করেন, লালন সাঁইয়ের জন্ম ১৭৭৪ সালে। অন্য দলের অভিমত, ১৭৭২ সালের ১৪ই অক্টোবর তাঁর জন্ম।

পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত আছে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত

www.pathagar.com

ইত্যাদি নিয়ে। কেউ বলেন, তিনি হিন্দুর (কায়স্থ) ঘরে জন্মেছিলেন। বাবা-মা উভয়েই মারা যান তাঁর বাল্য বয়সেই। একবার তীর্থযাত্রায় যাওয়ার সময় পথিমধ্যে লালন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর সঙ্গীসাথীরা তাঁকে ফেলে রেখে চলে যায়। একটি মুসলমান পরিবার রাস্তা থেকে তুলে তাঁকে ছেঁউড়িয়া গ্রামে নিজেদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলেন, কিন্তু তাঁর একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর জন্ম কুষ্টিয়া জেলার ভাঁড়ারা গ্রামে—অনেকে চাপড়া-ভাঁড়ারা বলে। কারণ, পার্শ্ববর্তী চাপড়া গ্রাম একেবারে গায়ের সঙ্গে লাগানো। কিন্তু জন্ম ভাঁড়ারায় হলেও পরবর্তী জীবন কেটেছিল তাঁর ছেঁউড়িয়াতেই। তিনি ইসলাম (দ্র) ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করেছিলেন বাধ্য হয়ে, কারণ তিনি মুসলমানের বাড়িতে ছিলেন বলে তাঁর স্বজাতি হিন্দু সম্প্রদায় তাঁকে আর গ্রহণ করে নি। এই ঘটনা তাঁর চোখ খুলে দেয়। তিনি দেখেন যে সমাজে মানুষের চেয়ে ধর্মের স্থান বড়, অথচ তা তো হওয়া উচিত নয়; কারণ মানুষকে বাঁচাবার জন্যই তো ধর্ম। এর পর থেকে তাঁর কাছে মানুষ ও মনুষ্যত্ববোধ মুখ্য হয়ে ওঠে। ফলে ধর্ম পাল্টে মুসলমান হলেন যদিও, তবু গোঁড়া মুসলমান হলেন না। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ ছিলেন, গান বাঁধতে পারতেন, গান গাইতে পারতেন। তা ছাড়া মনের মধ্যে ছিল ধর্মভাব। ফলে আউলবাউলদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। এক সময় তিনি বাউল সিরাজ সাঁইয়ের শিষ্য হয়ে গেলেন।

সিরাজ সাঁইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর লালনের জীবন অন্য রকম হয়ে গেল। তিনি ঘুরে বেড়ান আর গান গাইতে থাকেন। ১৭৯৮ সালে তাঁর মন্ত্রগুরু সিরাজ সাঁই ইহলোক ত্যাগ করলে ছেঁউড়িয়াগ্রামের মলম কারিগর তাঁকে ভক্তিবশত সতেরো বিঘে জমি দান করেন। মলম কারিগর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঐ জমির ওপরেই গড়ে ওঠে এই সাধকের আখড়া। পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি অত্যল্পকালের ভেতরেই 'ছেঁউড়িয়ার সাঁইজি' নামে।

লালন সাঁইয়ের শিষ্যের অভাব ছিল না। তবে তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন মলম কারিগর, ভোলাই শাহ্‌, শীতল শাহ্‌, মনিরুদ্দিন শাহ্‌, মানিক শাহ্‌ দুদ্দু শাহ্‌ প্রমুখ। মনিরুদ্দিন শাহ্‌ ও মানিক শাহ্‌ তাঁর গানের লিপিকর ছিলেন বলে জানা যায়।

লালন সাঁই ছেঁউড়িয়ায় তাঁর বাদবাকি জীবন কাটান এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

জীবদ্দশাতেই তিনি তাঁর রচিত গানের ভাবসম্পদ ও প্রাণকাড়া সুরের জন্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) বড় ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েক বার সাক্ষাৎ ঘটে। বিশ্বকবিকে গান শোনাতে তিনি পারেন নি, কিন্তু বিশ্বকবি অন্যের মুখে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

কুষ্টিয়ায় লালন সাঁইয়ের মাজার ও এক জন বাউল

লালন সাঁই জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর শিষ্য হতে পারতেন। এ জন্য উভয় সমাজের অসহিষ্ণু লোক তাঁকে এবং তাঁর শিষ্যদের একঘরে করেছিল বলে জানা যায়। ভিক্ষাই ছিল তাঁদের উপজীবিকা।

লালনকে নিয়ে উভয় বাংলায় শুরু হয়েছে নতুন করে গবেষণা ও তাঁর গান বা কাব্যের নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা। বিশ্বের দরবারে তাঁর রচনার ভাবসম্পদকে তুলে ধরার স্বার্থে অনুবাদ করা হয়েছে তাঁর কিছু গান। রবীন্দ্রনাথই প্রথম

www.pathagar.com

লালনকে বাইরের জগতে পরিচিত করান তাঁর নিজের লেখার ভিতর দিয়ে।

লালন সাঁইয়ের মৃত্যু হয় কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর। অনেকের মতে তখন তাঁর বয়স ১১৬ বছর হয়েছিল। তাঁর আখড়াপ্রাঙ্গণেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাধির উপরে একটি ছোট পাকা মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন সম্ভবত ১৩১১ সনে।

আ. হ.

লালবাগ কেল্লা

সম্রাট আওরঙ্গজেব (দ্র)-এর পুত্র শাহজাদা আজম বাংলার সুবাদার থাকাকালে ১৬৭৮ সালে ঢাকা নগরীতে এই দুর্গ তৈরি শুরু করেন। নবাব শায়েস্তা খানের (দ্র) আমলে এই দুর্গের কাজ শেষ হয়। শায়েস্তা খান এই দুর্গে বসবাস করতেন।

স্থাপত্য নিদর্শনের দিক থেকে লালবাগ কেল্লা বাংলাদেশে দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর আয়তন ২০০০×৮০০ ফুট। ইটের তৈরি চারদিকের দেওয়াল ৩′-৯″ পুরু। এই দেওয়ালের উচ্চতা কোথাও কোথাও ২০ ফুট পর্যন্ত। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রধান তোরণ অবস্থিত। দক্ষিণ দেওয়ালে এক সময় ৫টি বুরুজ ছিল, সেগুলো প্রায় আট-কোণা। এগুলো তৈরি হয়েছিল দুর্গের নিরাপত্তা-কামান রাখার জন্য।

দক্ষিণ দিকের পুরু দেওয়ালের বুরুজের নিচে বেশ কয়েকটি কক্ষ ছিল। কক্ষগুলো এখন নষ্ট হয়ে গেছে। দক্ষিণের দেয়ালে পশ্চিম দিক থেকে দ্বিতীয় বুরুজের নিচে একটি কক্ষ ছিল যার ভিতর দিয়ে প্রয়োজনে দুর্গের বাইরে যাওয়া যেত। এটি গুপ্তপথ হিসাবে ব্যবহার করা হত। এই গুপ্তপথ সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি চালু আছে।

দক্ষিণ দিকের তোরণটি ছিল স্থাপত্যনিদর্শনের দিক থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিন তলাবিশিষ্ট এই তোরণের সামনের দু' দিক তিন ধাপ উপরে উঠেছে। প্রথম ধাপ একটি অর্ধগম্বুজ ছাদবিশিষ্ট আস্তরে তৈরি প্যানেল অলঙ্কৃত কুলুঙ্গির মতো। পরবর্তী দু'টি ধাপ বাইরের দিকে প্রসারিত ত্রিকোণ জানালার মতো। নিচের অর্ধগম্বুজ থেকে উদ্‌গত অংশের ওপর ভিত্তি করে তিনটি সরু পাথরের থাম সোজা ওপরে

লালবাগ দুর্গ— শিল্পীর স্কেচ

পরীবিবির মাজার

প্রথমে দ্বিতল ও পরবর্তী পর্যায়ে ত্রিতল পর্যন্ত উঠেছে। থামের ওপর পাথরের ব্রাকেট সংস্থাপন করে দোতলার সমতল ছাদ করা হয়েছে। কিন্তু তিন তলার অর্ধগম্বুজাকার এবং এর প্রান্তগুলো বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত। ফটকের সম্মুখে প্রবেশকক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে আসল তোরণটি পাথরের খিলানের ওপর তৈরি। ছাদ চারদিক থেকে গম্বুজের মতো উন্নীত হলেও এর কেন্দ্রস্থল আয়তাকার। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ প্রবেশকক্ষের দু' দিকে দু'টি অর্ধগম্বুজকে ভিত্তি করে

www.pathagar.com

প্রবেশকক্ষের গম্বুজাকৃতি ছাদ তৈরি করা হয়েছে। গালিবকারী গম্বুজ নামে পরিচিত এই ছাদও সুন্দরভাবে প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রবেশকক্ষের দুই পার্শ্বও তোরণের সম্মুখভাগের অনুরূপ সুউচ্চ।

দক্ষিণ ও উত্তর দেওয়ালের মাঝামাঝি অংশে দুর্গের পূর্ব দিক ঘেঁষে একটি পুকুর আছে। বর্গাকারে নির্মিত এই পুকুরের প্রত্যেক বাহু ২৩৫ ফুট। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ (দ্র) চলাকালে নিহত এ দেশীয় সৈনিকের লাশ এই পুকুরে ফেলা হয়েছিল বলে জানা যায়। এর ফলে দীর্ঘকাল পুকুরটি পরিত্যক্ত ছিল। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে যে ঘাটটি আছে তা তৈরি হয়েছে অনেক পরে।

পুকুরের পশ্চিমের আয়তাকার দোতলা ইমারতটির আয়তন ১০৭×২৭ ফুট। নিচের তলার পূর্ব-দেওয়ালে ৭টি দরজা আছে। এই গৃহের নিচের তলার কেন্দ্রস্থলে হাম্মামখানা অবস্থিত।

দরবারগৃহ থেকে ২৭৫ ফুট পশ্চিমে অবস্থিত পরী বিবির মাজার বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য একটি পুরাকীর্তি। এই মাজারে অনেক দুষ্প্রাপ্য পাথর সংযোজিত আছে। কালো পাথর, শ্বেত বর্ণের মর্মর পাথর, ধূসর বর্ণের বেলে পাথর এখানে লাগানো আছে। হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটেছে এই মাজারে। ৬০ ফুট বাহুবিশিষ্ট, বর্গাকারে নির্মিত ও পাথরে বাঁধানো একটি অনুচ্চ বেদির ওপর এই ইমারত নির্মিত। এর চার কোণে প্রায় অষ্টকোণাকৃতি মিনার আছে। মিনারগুলো প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। মাজারের চারদিকে মোট ১২টি দরজা রয়েছে। কেন্দ্রীয় দরজা অপেক্ষাকৃত বড় ও আকর্ষণীয়। একটি অর্ধগম্বুজের নিচে চার শ' কেন্দ্রীয় খিলানের আকারে নির্মিত মধ্যবর্তী দরজা পাশের দরজাগুলো থেকে আকারে বড়। এবং দুই পার্শ্বে খাঁজ-কাটা, ঈষৎ উঁচু সরু মিনার দ্বারা বেষ্টিত। দরজার চৌকাঠগুলো কালো প্যাথরের তৈরি।

পরী বিবির মাজারের ১৩০ ফুট পশ্চিমে লালবাগ দুর্গের মসজিদ অবস্থিত। এর আয়তন ৬৫×৩২.৫ ফুট। মসজিদের চার কোণায় চারটি মিনার আছে। মসজিদের উপরে তিনটি গম্বুজ আছে। জানা যায়, এই মসজিদটি তৈরি হয়েছিল ১৬৭৮—'৭৯ সালে।

মো. হো.

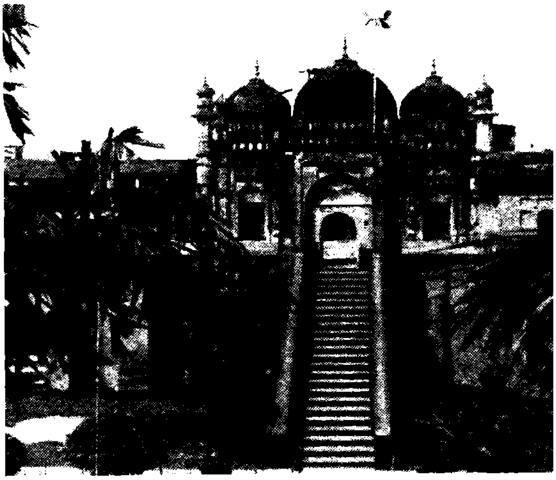

লালবাগ শাহী মসজিদ বা মোগল আমলের মসজিদ

লালবাগ শাহী মসজিদ

লালবাগ শাহী মসজিদ ঢাকা শহরের লালবাগ থানার পোস্তা এলাকায় অবস্থিত। মোঘল আমলের প্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শনের অন্যতম এই মসজিদটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের (দ্র) প্রপৌত্র ফররুখশিয়রের পৃষ্ঠপোষকতা, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সহায়তায় তৈরি। ফররুখশিয়র এ সময় ঢাকার 'নায়েবে নাজিম' বা উপ-শাসক ছিলেন।

মসজিদটির নির্মাণকাল ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ। ঐতিহাসিক লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে সুউচ্চ, সুদৃশ্য ফটক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে, তারই দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে লালবাগ শাহী মসজিদ।

মূল মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৫৫ ফুট, প্রস্থ ৫৫ ফুট। জানা যায়, প্রাথমিক অবস্থায় মসজিদটির নির্মাণ-কাজ সম্পূর্ণ হয় নি, বহু কাজ বাকি ছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব আবদুল গনি বহু টাকা খরচ করে মসজিদের নষ্ট কাঠের ছাদ পরিবর্তন করে পাকা ছাদ নির্মাণ করান। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আবারও সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়।

বর্তমানে লালবাগ শাহী মসজিদ পূর্বের তুলনায় বেশ সম্প্রসারিত। মূল দেওয়াল ঠিক রেখে এর অন্যান্য পরিবর্তনও সাধন করা হয়েছে।

মু. মা.

লাস্কো প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলা দ্র

www.pathagar.com

লাহোর প্রস্তাব

ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রবল হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের (দ্র) রাজনৈতিক দাবি জোরদার হয়ে ওঠে : 'ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি চাই'। হিন্দু-মুসলমান পৃথক জাতি—এই তত্ত্বের মাধ্যমেই পৃথক রাষ্ট্রের দাবি তুলে ধরা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (দ্র) এ সম্পর্কে যে প্রস্তাব দাবি আকারে উত্থাপন করেন ইতিহাসে তা-ই 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। একে 'পাকিস্তান প্রস্তাব'ও বলা হয়ে থাকে। প্রস্তাবের মূল ভাষ্য নিম্নরূপ :

'সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের বিবেচিত অভিমত এই যে, নিম্নোক্ত মূলনীতির বাইরে কোনো সাংবিধানিক পরিকল্পনা এ দেশে কার্যকর করা অথবা মুসলমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, যথা—ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত ইউনিটগুলোকে একেকটি অঞ্জল হিসাবে প্রয়োজন মতো রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব অঞ্চলগুলোকে সংঘবদ্ধ করে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র ('ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট স্টেট্স্') গঠন করা যায়, যে ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক ইউনিটগুলো হবে স্বয়ংশাসিত ('অটোনোমাস') ও সার্বভৌম।'

স্পষ্টতই বোঝা যায়, লাহোর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একাধিক (কার্যত দুটো) স্বতন্ত্র, স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি ফেডারশন গঠন। পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রটি গঠিত হবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে। আর পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্র গঠিত হবে বাংলা ও আসাম নিয়ে। স্বভাবতই আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পশ্চাদপদ বাঙালি মুসলমান এতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখতে পায় এবং এ কারণে সকলে একযোগে এই প্রস্তাব ও পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন জানায়।

১৯৪০ সালে গৃহীত 'লাহোর প্রস্তাব' ১৯৪১ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। কিন্তু ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর মুসলিম লীগ পার্টির আইনসভা সম্মেলনের বিষয়নির্বাচনী কমিটিতে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ (দ্র) 'লাহোর প্রস্তাব'টিকে বিকৃত করে এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি হিসাবে পাশ করিয়ে নেন। এভাবেই মূল 'লাহোর প্রস্তাব' অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাতিল করা হয়।

আ. র.

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

১৯২০-এর দশকের শেষাশেষি ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এই আন্দোলনে পাঞ্জাব পালন করেছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। পাঞ্জাবে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন তরুণ বিপ্লবী ভগৎ সিং (দ্র)। ১৯২৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'নওজোয়ান ভারতসভা' নামে যুব সংগঠন। ১৯২৮ সালে অজয় ঘোষ, ফণী ঘোষ প্রমুখ আরো কয়েক জন বিপ্লবীর সঙ্গে মিলে তিনি হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি গঠন করেন। চমক-লাগানো চরম কোনো কর্মকাণ্ড দ্বারা সমাজে, বিশেষভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে জোরদার গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। এই লক্ষ্যে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত (দ্র) ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় আইনসভাগৃহে বোমা হামলা চালান ও পরে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত যখন লাহোর কারাগারে বন্দি ছিলেন, তখন তাঁদের বিরুদ্ধে লাহোরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্যাণ্ডার্সকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। এই মামলা 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে ইতঃপূর্বে সাইমন কমিশন-বিরোধী মিছিলে পুলিশের হামলায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু ঘটলে বিপ্লবীরা এই ঘটনার জন্য পুলিশ সুপার স্যাণ্ডার্সকে দায়ী করেছিল এবং ১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করা হয়।

কারাগারে উন্নততর ব্যবস্থার দাবিতে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দিগণ এবং যতীন দাস (দ্র) সহ আরো অনেক রাজবন্দি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ৬৪ দিন অনশনের পর যতীন দাস মৃত্যুবরণ করলে ভারতব্যাপী তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। বন্দি ভগৎ সিং ও অন্যান্য নেতা জেলের ভিতর গভীর অধ্যয়ন ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন। ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করে ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে অমর হয়ে আছেন।

ম. হ.

লিউকেমিয়া (leukaemia)

লিউকেমিয়া রক্তকলার এক প্রকার মারাত্মক রোগ। লিউকেমিয়ায় রক্তে, অস্থিমজ্জায় এবং দেহের অন্যত্র শ্বেত কণিকার (দ্র) সংখ্যা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। যে কোনো প্রকার শ্বেত কণিকা এতে আক্রান্ত হতে পারে। পুরুষের মধ্যে রোগের হার অপেক্ষাকৃত বেশি। লিউকেমিয়ার কারণ এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। তবে বেশ কয়েকটি অবস্থা লিউকেমিয়া সৃষ্টি করে থাকে। যেমন পারমাণবিক রশ্মি, কোষবিনাশী (cytotoxic) ঔষধ, ভাইরাস (দ্র)।

লিউকেমিয়া নিদানিক বিচারে দুই প্রকার : একিউট ও ক্রনিক। একিউট লিউকেমিয়া যে কোনো বয়সে হতে পারে। তবে শিশুদের মধ্যে এর প্রকোপ বেশি। ক্রনিক লিউকেমিয়া প্রধানত মধ্য ও বেশি বয়সে হয়ে থাকে।

লিউকেমিয়ার সাধারণ লক্ষণের মধ্যে রয়েছে আপাতকারণহীন দুর্বলতা, জ্বর, নাক ও দাঁতের মাঢ়ী থেকে রক্তপাত। এতে প্লীহা (দ্র) ও যকৃতের (দ্র) আয়তন বেড়ে যায়। এ ছাড়া ওজনহ্রাস, শ্বাসকষ্ট, পেটে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণও দেখা দিতে পারে। রক্ত পরীক্ষায় রক্তাল্পতা (দ্র), শ্বেত কণিকার আধিক্য লক্ষ করা যায়।

লিউকেমিয়ায় প্রায়ই আনুষঙ্গিক জীবাণুসংক্রমণ, রক্তশূন্যতা, রক্তপাত, পুষ্টিহীনতা দেখা দেয় এবং পরিণামে রোগী মারা যায়। লিউকেমিয়ার চিকিৎসা জটিল। এবং ব্যবহৃত ঔষধেরও মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। চিকিৎসা শুরু করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগী বাঁচে না। তবে কোনো কোনো লিউকেমিয়ায়, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে, ঔষধ ব্যবহারে মৃত্যু বিলম্বিত হয়ে থাকে।

আ. আ. হা.

লিউয়েন্‌হুক্‌ লেভেন্‌হুক, আন্টোন্‌ ভান্‌ দ্র

লিঙ্কন, আব্রাহাম [১৮০৯—১৮৬৫]

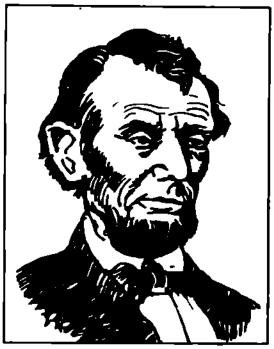

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ষোড়শ প্রেসিডেন্ট। পর পর দু' বার প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমেরিকার ঐক্য রক্ষা এবং দাসপ্রথা তুলে দেওয়ার কারণে আব্রাহাম (Abraham lincoln) মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জন্ম ১৮০৯ সালে কেন্টাকি অঞ্চলে। পিতা টমাস্‌ লিঙ্কন ছিলেন পেশায় কাঠমিস্ত্রী এবং চাষী। লিঙ্কন লেখাপড়া শেখেন সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহ ও চেষ্টায়। তিনি জীবিকার জন্য গ্রহণ করেছেন নানা ধরনের পেশা। ১৮৩৬ সালে আইন ব্যবসায় শুরুর পূর্ব পর্যন্ত কোনো পেশাতেই তিনি সফল হন নি। ১৮৩৭ সালের পর থেকে আইনজীবী হিসাবে তাঁর খ্যাতি বাড়তে থাকে।

লিঙ্কন ১৮৫৮ সালে সিনেট নির্বাচনে সদস্যপদে প্রার্থী হন রিপাব্‌লিকান দলের পক্ষে। নির্বাচনী প্রচারণার সময় স্টিভেন এ. ডগলাসের সঙ্গে বিতর্কে নামেন। এই বিতর্ক ইতিহাসের বিখ্যাত ঘটনা।

লিঙ্কন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ১৮৬০ সালে। দাসমুক্তির ঘোষণা জারি করেন ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারি। এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ক্রমে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। সে সময়ে তাঁর গৃহীত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগুলো ছিল খুবই বিচক্ষণ।

লিঙ্কন ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। গেটিস্‌বার্গ্‌ (Gettysburg) নামক স্থানে গৃহযুদ্ধে শহীদদের সমাধিতে দেওয়া তাঁর ভাষণ বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণ হিসাবে পরিচিত।

আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতীক। গৃহযুদ্ধের সময় শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বলতেন, 'কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের জন্যই আমার সদিচ্ছা থাকবে।'

দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার অল্প কাল পর ১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল জন উইলকিস বুথ (John

www.pathagar.com

আব্রাহাম লিঙ্কনের বিখ্যাত 'গেটিস্‌বার্গ বক্তৃতা'

Wilkes Booth) নামে এক ব্যক্তির গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরদিন সকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. মা.

লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (lingua franca)

শব্দটি ইতালীয়। এর অর্থ হল ফ্রাঙ্কদের ভাষা। এখন শব্দটির মানে পাল্টে গেছে।

জার্মান জাতি–ভাষা–সংস্কৃতির এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে মধ্যযুগে ফ্রাঙ্ক (franks) বলা হত। ৮ম–৯ম শতাব্দীতে ফ্রান্স ও জার্মানি জুড়ে এরা এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এদের ভাষা ছিল একাধিক। ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যোগাযোগসঙ্কট দেখা দেয়। যোগাযোগের স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সবাই বুঝতে পারে এমন একটি বোধগম্য ভাষার উদ্ভব হয়ে যায়। কারোরই মাতৃভাষা নয়, অথচ সবাই বুঝতে পারে—এমন ভাষাকেই 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' বলা হয়ে থাকে। যেমন— ভারতে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হল ইংরেজি ভাষা।

হা. মা.

লিটমাস (litmus)

লিটমাস একটি রাসায়নিক নির্দেশক বা ইণ্ডিকেটর (indicator)। রসায়নবিদ্যার ব্যবহারিক চর্চায়, অ্যাসিড (দ্র) বা অম্ল এবং ক্ষার শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়। অ্যাসিড নীল লিটমাসকে লাল করে। ক্ষার লাল লিটমাসকে নীল অথবা গাঢ় বেগুনি করে। অ্যাসিড বা ক্ষার কোনোটিই নয় এইরূপ তরল পদার্থ বা পানির সঙ্গে লিটমাসের বর্ণ পরিবর্তন হয় না।

লিটমাস এক ধরনের লাইকেন (lichen) বা ছত্র-শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ থেকে তৈরি হয়। লাইকেনের সঙ্গে অ্যামোনিয়া(দ্র) এবং পটাসের মিশ্রণকে চোলাই করে লিটমাস তৈরি করা হয়। লিটমাসকে দ্রবণ (দ্র) হিসাবে ব্যবহার করা হয়, আবার পরীক্ষণ কাগজ হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষণ কাগজকে বলে লিটমাস পেপার। লিটমাস দ্রবণে ব্লটিং পেপার ভিজিয়ে, শুকিয়ে এ ধরনের লিটমাস পেপার তৈরি করা হয়।

যখন কোনো রসায়নবিদ অ্যাসিড দ্রবণকে নিরপেক্ষ করতে চান, তখন তিনি দ্রবণে লিটমাস দ্রবণ মেশান। কয়েক ফোঁটা লিটমাস দ্রবণে অ্যাসিড দ্রবণটি লাল হয়। এর পর এই লাল দ্রবণে ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করে ক্ষার মেশাতে থাকেন। এক পর্যায়ে দ্রবণের বর্ণ বেগুনি হয়। এটি নিরপেক্ষ দ্রবণ। এতে মাত্র এক ফোঁটা ক্ষার ফেললে বর্ণ নীল অথবা এক ফোঁটা মাত্র অ্যাসিড ফেললে দ্রবণের বর্ণ লাল হয়।

স. রা.

লিটল প্রিন্স্‌ (The Little Prince)

'লিট্‌ল্‌ প্রিন্স্‌' আসলে একটি অনুবাদগ্রন্থের নাম। মূল ফরাসি বইয়ের নাম হল 'ল্য প্যতি প্র্যাঁস্‌' (Le Petit Prince); লেখক স্যাঁৎজুপেরি (দ্র)।

এটি রূপকথার বই এবং সমগ্র ইউরোপে অনুবাদের

www.pathagar.com

মাধ্যমে শিশুদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বাংলা ভাষায় উভয় বঙ্গেই একাধিক অনুবাদ প্রচলিত আছে। জহুরুল হক 'ছোট রাজকুমার' নামে এবং আসাদ চৌধুরী 'ছোট্ট রাজপুত্তুর' নামে এই বই ইংরেজি থেকে রূপান্তর করেছেন।

হা. মা.

লিটার (litre)

মেট্রিক পদ্ধতিতে ঘন আয়তনের মাপবিশেষ। এক ডেসিমিটার (১০ সে. মি.) পাশবিশিষ্ট ঘনকের আয়তন (বা ১০০০ ঘন সেন্টিমিটারে) এক লিটার। তরল পদার্থ মাপার ক্ষেত্রে লিটার ব্যবহৃত হয়। এক লিটার বিশুদ্ধ পানির ভর এক কিলোগ্রাম; কিন্তু এক লিটার তেলের ভর তার চেয়ে কম; আবার এক লিটার দুধের ভর এক কিলোগ্রামের চেয়ে সামান্য বেশি। অর্থাৎ ঘন আয়তন সমান থাকলেও বিভিন্ন তরল পদার্থের ঘনত্বের তারতম্যের কারণে তাদের ভর বা ওজনে পার্থক্য হয়।

সুজ. ব.

লিডেনজার (Leyden jar)

স্থিরবিদ্যুৎ ধরে রাখার জন্য প্রথমদিকে ব্যবহৃত এক ধরনের ধারক যন্ত্র। ১৭৪৬ সালে নেদারল্যাণ্ডের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এ ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এ জন্য এর নাম দেওয়া হয় লিডেনজার। প্রাথমিক লিডেনজার ছিল একটি কাচপাত্র। এর কিছু অংশ পানিপূর্ণ। এটি একটি ছিপির দ্বারা বন্ধ। ছিপির মধ্য দিয়ে একটি ধাতব তার বা তারকাঁটা এমনভাবে ঢোকানো, যার কিছু অংশ পানির মধ্যে ডোবানো আর কিছু অংশ বাইরে। এই ধাতব তার বা তারকাঁটার সাহায্যে পাত্রের মধ্যে স্থিরতড়িৎ সঞ্চয় করা হয়। পাত্রে বিদ্যুৎ মজুদ থাকা অবস্থায় কেউ তারটি স্পর্শ করলে বৈদ্যুতিক আঘাত বা শক পাবে।

আধুনিক লিডেনজার—যা গবেষণাগারে প্রদর্শিত হয়, তার গঠন একটু ভিন্ন ধরনের। এর ভিতরের এবং বাইরের কিছু অংশ ধাতব পাত দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। বাইরের আচ্ছাদনটির সঙ্গে ভূমি সংযোগ করা হয়। একটি পিতলের রডের প্রান্তে ঝোলানো ধাতব শিকল ভিতরের আচ্ছাদনকে স্পর্শ করে। রডটির বাইরের প্রান্তে একটি ধাতব গোলক বা পাত যুক্ত থাকে। লিডেনজার আধুনিক ক্যাপাসিটর (দ্র) বা ধারকের পূর্বসূরি হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স. রা.

লিথিয়াম (lithium)

লিথিয়াম সবচেয়ে হালকা ধাতু। এর আপেক্ষিক ঘনত্ব ০·৫৩৪। আর্ফভেডসোন (Arfwedson : ১৭৯২-১৮৪১) ১৮১৭ সালে এটি আবিষ্কার করেন। লিথিয়াম একটি ক্ষারীয় ধাতু (alkali metal) এবং আগুনে পোড়ালে উজ্জ্বল লাল রঙ ধারণ করে। প্রকৃতিতে এটি লেপিডোলাইট, স্পোডুমিন এবং অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মেশানো থাকে। লিথিয়াম দাহ্য, ক্ষয়কারক এবং পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে।

নিউট্রনকণাকে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা থাকায় হাইড্রোজেন বোমা তৈরির জন্য লিথিয়ামকে মোড়ক পদার্থ (blanketing material) রূপে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য ক্ষারীয় ধাতুর মতো লিথিয়ামও লবণ গঠন করে। অনেক সময় বিষণ্ণতাজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য লিথিয়ামের লবণ ব্যবহার করা হয়।

লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ৩; পারমাণবিক ওজন ৬·৯৪১।

সা. এ.

লিথোগ্রাফি

লিথোগ্রাফি কথাটি এসেছে দু'টি গ্রিক শব্দ লিথোস (lithos) এবং গ্রাফিন (graphein) থেকে। 'লিথো' শব্দের অর্থ পাথর আর 'গ্রাফিন' শব্দটির অর্থ লেখা বা ছবি আঁকা। পাথর, দস্তা (দ্র) বা অ্যালুমিনিয়ামের (দ্র) পাত ব্যবহার করে ছাপানোর পদ্ধতিকে বলা হয় লিথোগ্রাফি। লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছাপার কাজে অক্ষর ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। ছাপবার বিষয়কে প্রথমে এক প্রকার কালি দিয়ে কাগজের ওপর লিখতে বা আঁকতে হয়। তারপর ঐ কাগজকে এক ধরনের চুনা পাথর (lime stone)-এর ওপর চাপ দিলে লেখা বা আঁকা জিনিসের ছাপ ঐ পাথরের ওপর পড়ে। পরে ঐ লেখা কিছুটা ফুলে ওঠে এবং তখন কালি দিয়ে ছাপলে ঐ লেখার ছাপ কাগজে উঠে আসে। সে জন্য লিথোগ্রাফিক মুদ্রণকে

www.pathagar.com

'সার্ফেস প্রিন্টিং' (surface printing) বলা হয়।

আলয়জ সেনেফেল্ডার (Aloys Senefelder : ১৭৭২–১৮৩৪) ছাপার কাজে লিথোগ্রাফির প্রবর্তন করেন ১৭৯৮ সালে। তাঁর বাড়ি ছিল বাভেরিয়ায় (অস্ট্রিয়া)। তিনি এই পদ্ধতিতে মুদ্রণ চালু করার জন্য ১৮০১ সালে ইংল্যাণ্ডে পেটেন্ট গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নাট্যকার। তাঁর খুব ইচ্ছে হত নিজের রচনাগুলো ছাপিয়ে বের করতে। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। অগত্যা অনেক চেষ্টার পর পাথরের ওপর লেখা ছাপিয়ে তিনি তাঁর সাধ পূরণ করেন। তাই তাঁকে লিথোগ্রাফির জনক বলা হয়। তিনি নিজেই এই মুদ্রণপদ্ধতির অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং ইউরোপের (দ্র) বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে লিথোগ্রাফির ব্যাপক প্রসার দেখে গিয়েছিলেন। বিখ্যাত জার্মান সুরকার মারিয়া ফন্ ভেবার লিথোগ্রাফি মুদ্রণপদ্ধতির উন্নতি সাধন করে গিয়েছেন। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী তুলুজ্-লোত্রেক্ (১৮৬৪-১৯০১) লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে নতুন নতুন পোস্টার (দ্রা) ছাপিয়েছিলেন। আরো অনেকের অবদানে লিথোগ্রাফি মুদ্রণের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে লুই রেমেকার, জোসেফ পেনেল, হেনরি বেন প্রমুখ শিল্পী ও লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে বহু অবদান রেখে গেছেন।

লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে মুদ্রণের জন্য আলয়জ সেনেফেল্ডার যে যন্ত্র তৈরি করেছিলেন তা ১৮৫১ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ১৮৫১ সালে জর্জ সিঙ্গল লিথো মুদ্রণের জন্য একটি সিলিণ্ডার যন্ত্র তৈরি করেন। পাথরের বদলে পাতলা ধাতুর পাত মুদ্রণকাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। লিথোগ্রাফির পরবর্তী উন্নত সংস্করণ হচ্ছে অফসেট প্রিন্টিং। লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে মুদ্রণকাজ দু' রকমের হতে পারে—সাদা-কালো এবং রঙিন। সাদা-কালো লিথোগ্রাফকে বলা হয় 'মনো-লিথো', আর রঙিন লিথোগ্রাফের নাম 'ক্রোমো-লিথোগ্রাফ'।

কলিকাতায় লিথোগ্রাফি মুদ্রণ চালু হয়েছিল ১৮২২ সালে। এর প্রচলন করেছিলেন দুইজন ফরাসি শিল্পী—বেল্‌ন (Belnos) এবং দ্য সাবিঞাক্ (de Savignac)। প্রথম প্রথম নানা ধরনের ছবি, নকশা, মানচিত্র ইত্যাদি ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল। লিথোগ্রাফ মুদ্রণপদ্ধতিতে ১৮২৫ সালে ভারতবর্ষের এবং কলিকাতার নকশা বাংলায় প্রথম ছাপা হয়েছিল। ঐ বছরই গঙ্গানদীর নকশাও ছাপিয়ে বের করা হয়। এর তিন বছর পর (১৮২৮) মুদ্রিত হয় ভারতবর্ষের রাস্তাগুলোর বিবরণ। এতে সংযোজিত হয়েছিল ১২১টি ছবি। পাকিস্তানি আমলে বাংলাদেশে উর্দু পত্রিকাগুলি লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে ছাপা হত বলে জানা যায়।

শা. হ.

লিথোপোন দস্তা দ্র

লিনিয়াস্, কারোলাস্ [১৭০৭—১৭৭৮]

বিখ্যাত বিজ্ঞানী কারোলাস্ লিনিয়াস্ (Carolus Linnaeus) ১৭০৭ সালে সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর সহকর্মী অন্যান্য জীববিজ্ঞানী এবং তাঁর অসংখ্য ছাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে বহু রকমের প্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রকৃতি ও দেহগঠনের উপর ভিত্তি করে তিনি উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীকে যাতে সবাই সহজে শনাক্ত করতে পারেন তার জন্য তিনি এদের নামকরণের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এ নামকরণকে 'দ্বিপদ' নামকরণ বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় বাইনোমিয়েল নোমেনক্লেচার। 'দ্বিপদ'-এর প্রথম পদটি হল জেনারিক বা 'গণ'নাম এবং দ্বিতীয়টি 'প্রজাতি, গুণবাচক' নাম। যেমন মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *'হোমো সেপিয়ান্স'* (দ্র), জবা ফুলের গাছের নাম *'হিবিস্কাস রোজানেন্সিস'*। হোমো হিবিস্কাস হচ্ছে জেনারিক বা গণনাম। সেপিয়ান্স, রোজানেন্সিস হচ্ছে প্রজাতি-গুণবাচক নাম। প্রাণী ও উদ্ভিদের

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে আজও পৃথিবীর সকল জীববিজ্ঞানী ক্যারোলাস্ লিনিয়াসের প্রবর্তিত নিয়ম অনুসরণ করছেন। প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম পৃথিবীর সর্বত্র একভাবেই ইটালিক্স হরফে (অর্থাৎ বাঁকা অক্ষরে) লেখা হয় এবং ইংরেজি ইটালিক্সই (italics) ব্যবহৃত হয়। ক্যারোলাস্ লিনিয়াসের বহুল আলোচিত গ্রন্থ *'স্পেসিস প্ল্যাণ্টোরিয়াম'* ১৭৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই তিনি দ্বিপদ নামকরণপদ্ধতির সূত্র উপস্থাপন করেন। পরবর্তী কালে তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নাম *'সিস্টেম নেচুরা'*। সে সময় এ গ্রন্থের বারোটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

ত. চ.

লিপি অক্ষর দ্র
লিপ্ ইয়ার পঞ্জিকা দ্র

লিফ্ট্ (lift)

লিফ্ট্ বলতে আমরা বুঝি এক ধরনের যান্ত্রিক গাড়ি যার মধ্যে করে বড় বড় অট্টালিকার এক তলা থেকে অন্য তলায় মানুষ ও মালামাল ওঠানো-নামানো হয়। কোনো কোনো দেশে একে এলিভেটরও (elevator) বলে। মূলত খনিগর্ভ থেকে খনিজ উত্তোলনের জন্য লিফ্ট্ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কারখানার মালামাল ওঠানো-নামানো, এবং আকরিক উত্তোলনের জন্য স্টিম ইঞ্জিন চালিত লিফ্ট্ ব্যবহৃত হত। এগুলো থামানো ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তা ছাড়া দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। এলিশা গ্রেভ্স্ ওটিস (Elisha Graves Otis) ১৮৫২ সালে এলিভেটরের নিরাপদ ব্যবস্থার ডিজাইন করেন। স্প্রিং-চালিত ক্যাম (cam) পদ্ধতিতে এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে দড়ি ছিঁড়ে গেলে গাড়িটি শ্যাফ্টে আটকে যায়। ১৮৫৭ সালে ওটিস নিউইয়র্কের (দ্র) একটি স্টোরে প্রথম মানুষবাহী লিফ্ট্ চালু করেন। বৈদ্যুতিক মোটর আবিষ্কারের পর ১৮৮৯ সালে নিউইয়র্কে প্রথম বৈদ্যুতিক মোটরচালিত লিফ্ট্ চালু হয়।

সম্প্রতি লিফ্টের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খোলা, বন্ধ হওয়া; নির্দিষ্ট তলায় থামা, গতিবৃদ্ধি, মসৃণগতিতে ওঠানামা এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসহ লিফ্ট্ প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক লিফ্টে বেশ কতকগুলো স্টিল-কেব্ল্ মিলিয়ে মোটা কেব্ল্ ব্যবহৃত হয়। কেব্ল্টি একটি সিলিণ্ডার আকৃতির ড্রামের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। এর এক প্রান্তে লিফ্টের গাড়ি অন্য প্রান্তে ভারসাম্য রক্ষার উপযোগী ঢালাই লোহার ব্লক দিয়ে ওজন ঝোলানো হয়। লিফ্টের গাড়িটি একটি রেলের উপর দিয়ে ওঠানামা করে।

স. রা.

লিভার যকৃৎ দ্র

লিভিংস্টোন, ডেভিড [১৮১৩—১৮৭৩]

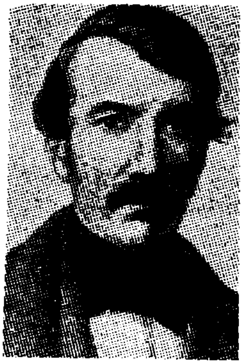

চিকিৎসক, ধর্মপ্রচারক, অভিযাত্রী ও আফ্রিকা (দ্র) সম্বন্ধে ভৌগোলিক আবিষ্কারক। ১৮১৩ সালের ১৯শে মার্চ স্কটল্যাণ্ডের ব্লান্টিয়ারে ডেভিড লিভিংস্টোন (David Livingstone)-এর জন্ম। পিতা নেল লিভিংস্টোন ছিলেন এক দরিদ্র মুদি।

মাত্র দশ বছর বয়সে কাপড় বোনার কারখানায় লিভিংস্টোনের কর্মজীবন শুরু হয়। তবে অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি নিয়ে ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। আফ্রিকার কুরুমান মিশনারির ধর্মযাজক রবার্ট মোফ্যাট ছিলেন তাঁর আদর্শ। মোফ্যাটের অনুরোধেই তিনি ১৮৪০ সালে ধর্মযাজক হিসাবে আফ্রিকার কুরুমান মিশনে যোগ দেন। তখন আফ্রিকা ছিল অরণ্যঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ। সেখানে পৌঁছেই তাঁকে এর অনাবিষ্কৃত নদী, হ্রদ ইত্যাদি আবিষ্কারের নেশায় পেয়ে বসে।

১৮৪৯ সালে লিভিংস্টোন মোফ্যাটের বাড়ি যাওয়ার পথে ন্‌গামি (Ngami) হ্রদ আবিষ্কার করেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার জাম্বেসি নদীর উৎসের দিকে অগ্রসর হন। ১৮৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর তিনি এই নদীর গতিপথে এক মাইল দীর্ঘ ও চার শ' ফুট গভীর এক আশ্চর্য জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন। পরে ইংল্যাণ্ডের মহারাণীর নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয় 'ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত'। আমেরিকার নায়গ্রা প্রপাত আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এটিই ছিল পৃথিবীর

www.pathagar.com

সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত।

জলপ্রপাত অভিযানের পর বিশ্রামের জন্য লিভিংস্টোন ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান। এ সময় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য মিশনারি ট্রাভেলার্স' প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গে তিনি স্বদেশের মাটিতে সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আফ্রিকা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে থাকেন। এর পাশাপাশি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে দাস-ব্যবসার বিরুদ্ধেও প্রগতিবাদী শ্বেতাঙ্গ যুবকদের সচেতন করে তোলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই চেষ্টায় মধ্য-আফ্রিকায় দাস-ব্যবসার অবসান ঘটে।

১৮৬২ সালে স্ত্রী মারা যাবার পর লিভিংস্টোন আবার আফ্রিকায় পাড়ি জমান। ১৮৬৪ সালে তিনি নিয়াসা ও শিরওয়া হ্রদ আবিষ্কার করেন। এ সময় জাম্বেসি নদীর তীর ধরে ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি জাহাজে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বোম্বাই শহরে আসেন। কিছুদিন এখানে অবস্থান করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান।

১৮৬৫ সালে লিভিংস্টোন আবার আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮৬৬ সালের প্রথম ভাগে তিনি পূর্ব-আফ্রিকার জাঞ্জিবার পেরিয়ে 'মেউরু' ও 'ব্যাঙ্গেউরু' নামে দু'টি হ্রদ আবিষ্কার করেন। তখন আফ্রিকার এ অঞ্চলগুলোর উল্লেখ পর্যন্ত মানচিত্রে ছিল না। তিনিই কঙ্গো নদীর অববাহিকা আবিষ্কার করেন। এভাবে দুর্গম পথে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং কয়েক বছরের জন্য তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। ১৮৭১ সালে আমেরিকার 'দ্য নিউইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকার সাংবাদিক হেনরি মোর্টন স্ট্যানলি অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে উজিজিতে খুঁজে পান। স্ট্যানলির সেবা-যত্নে তিনি সেরে ওঠেন। পরে স্ট্যানলির সঙ্গেই তিনি ট্যাঙ্গানিকা (বা টাঙ্গানিকা) হ্রদের উত্তর প্রান্ত আবিষ্কার করেন। ১৮৭৩ সালে মধ্যআফ্রিকার ইলালায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সুজ. ব.

লিমেরিক (limerick)

শব্দটি ইংরেজি। ইংরেজি ভাষা থেকেই বাংলায় গৃহীত হয়েছে। লিমেরিকের কোনো বাংলা হয় না, কারণ গঠনশৈলীর দিক থেকে এর একটি বিশেষ গড়ন ও ধাঁচ আছে। পদ্যের এই বিশেষ ফর্ম বাংলা ভাষায় নেই বলে বাংলাতেও একে 'লিমেরিক'ই বলা হয়।

লিমেরিক হয় ৫টি চরণে, তাতে মিলের বিন্যাস এ রকম : ক ক খ খ ক। মাঝখানে দু'টি চরণ (খ খ, অর্থাৎ ৩য় ও ৪র্থ পঙ্‌ক্তি) অন্যগুলোর চেয়ে মাপে ছোট হয়। ইংরেজি ছেলেভুলানো ছড়া বা নার্সারি রাইম (nursery rhyme) থেকে এর উৎপত্তি হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে এবং উনবিংশ শতাব্দী থেকে এর জনপ্রিয়তা চলে আসছে।

বক্তব্যের দিক থেকে লিমেরিক বড্ডো আবোলতাবোল বকে, এমন কথা বলে যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। এড্‌ওয়ার্ড্ লিয়র্ (দ্র) প্রথম এ ধরনের কবিতাকে জনপ্রিয় করেন। অনেক বাঙালি কবিই শখ করে লিমেরিক লিখে থাকেন।

হা. মা.

লিয়র্, এড্‌ওয়ার্ড্ [১৮১২—১৮৮৮]

লিমেরিক (দ্র) -এর স্রষ্টা এবং চিত্রকর। এড্‌ওয়ার্ড্ লিয়র্ (Edward Lear) ইংল্যাণ্ডে ১৮১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর জীবনের প্রধানতম পেশা ছিল নানা ধরনের ছবি আঁকা। ছবি আঁকার সূত্রে তিনি ইতালিতে দীর্ঘ সময় কাটান। কলিকাতাতেও তিনি ছবি আঁকার কাজে এসেছিলেন।

এড্‌ওয়ার্ড্ লিয়র্ অমর হয়ে আছেন 'লিমেরিক'-এর জন্য। তাঁর আগে আর কেউ এ জাতীয় কবিতা রচনা করেন নি।

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৮৮৮ সালে।

আ. হ.

লিয়াকত আলী খান [১৮৯৬—১৯৫১]

রাজনৈতিক নেতা ও পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। জন্ম অবিভক্ত ভারতের পূর্বপাঞ্জাবের কর্নালে ১৮৯৬ সালে। তিনি 'কায়েদে মিল্লাত' নামেও পরিচিত।

১৯১৯ সালে আলীগড় কলেজ থেকে

www.pathagar.com

আই. এ., ১৯২১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. এবং ১৯২২ সালে লণ্ডনের 'ইনার টেম্পল্' থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। ১৯২৪ সালে মুসলিম লীগে (দ্রা) যোগ দেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রস্তুত করার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়। তিনি তৎকালীন পূর্ব-বাংলা প্রদেশ থেকে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন (আগস্ট, ১৯৪৭)।

লিয়াকত আলী খানের অন্যতম রাজনৈতিক কৃতিত্ব ভারত (দ্রা) ও পাকিস্তানের (দ্রা) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টায় ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল ভারতের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন, যা 'লিয়াকত-নেহরু চুক্তি' নামে অভিহিত।

১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর রাওয়ালপিণ্ডিতে এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

আ. হ.

লিয়েবেদেফ্, গেরাসিম্ স্তেপানভিচ্ [১৭৪৯—১৮১৭]

বাংলা নাট্যমঞ্চের জনক হিসাবে স্বীকৃত। সঙ্গীতজ্ঞ, পর্যটক এবং রাশিয়ার (দ্র) প্রথম প্রাচ্যবিদ্। লিয়েবেদেফের জীবন বড় বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক। প্রসঙ্গত, এই রুশী নামটি বাংলায় ভুল উচ্চারণে ও বানানে বিভিন্নভাবে (যেমন লেবেডেফ, লেবেদেফ, লেবেডফ, লেবেদভ্ ইত্যাদি) লিখিত হতে দেখা যায়।

রাশিয়ার ইয়ারস্লাভ্ল্ শহরে ১৭৪৯ সালে গেরাসিম্ স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ্ (অর্থাৎ লিয়েবেদেফ্ বংশের সন্তান স্তেপান্-এর পুত্র গেরাসিম্) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্তেপান্ লিয়েবেদেফ্, মা পারাস্কোভিয়া লিয়েবেদেভা। পিতা স্তেপান্ গির্জার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। রাশিয়ার তৎকালীন রাজধানী সাংক্‌ৎ পিতের্বুর্গ্ (ইংরেজিতে বলা হয় সেন্ট পিটার্সবার্গ) শহরে চলে আসেন রাজবাড়ির চ্যাপেলে গায়কদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কাউকেই সঙ্গে আনতে পারেন নি। গেরাসিম্ পনেরো বৎসর বয়সে বাবার কাছে চলে আসে। সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় লেখাপড়া তেমন শিখতে পারেন নি। এবার রাজধানীতে অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ পাওয়ায় সঙ্গীতবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠলেন এবং রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ এক রাজনীতিজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রেমিক কাউন্ট রাজুমোফ্স্কির নজরে পড়ে গেলেন।

লিয়েবেদেফের বয়স তখন আটাশ; ১৭৭৭ সালে ঐ কাউন্ট ইতালির নেপ্‌ল্‌স্ শহরে দূত হিসাবে চাকুরি নিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গীতে পারদর্শী এই তরুণটিকে সঙ্গে নিলেন। গেরাসিম্ এই যে দেশের বাইরে পা রাখলেন, দেশে ফিরেছিলেন একটানা চব্বিশ বৎসর (১৭৭৭–১৮০১) বিদেশে কাটিয়ে। এই বিদেশ ছিল রাশিয়ার বাইরে ইউরোপের (দ্র) বিভিন্ন দেশ, ছিল ভারতবর্ষ (১৭৮৫–৯৭), ছিল আফ্রিকা। পেশায় সঙ্গীতজ্ঞ হলেও স্বভাবে ছিলেন ভবঘুরে। ভারতবর্ষে বারো বৎসর এবং স্বদেশে ফেরার পরে তাঁর অতিবাহিত ষোলো বছরের জীবন (১৮০১– ১৭) এত তাৎপর্যময় যে সে কারণেই বাংলা নাটকের ইতিহাসে ও ভারততত্ত্ব-চর্চার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় প্রতিভা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

লিয়েবেদেফ্ ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান ১৭৮৫ সালে। প্রথমে মাদ্রাজে ছিলেন দু'বৎসর, পরে কলিকাতায় গিয়ে দশ বৎসর। ভারতবর্ষে কাটানো বারো বছরের মধ্যে প্রথম দশ বৎসর ও তার পূর্ববর্তী কালে ইউরোপে ভ্রাম্যমাণ জীবনযাত্রায় তাঁর পেশা ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে কন্সার্ট শোনানো। কিন্তু কলিকাতায় আসার পর তিনি হিন্দুস্থানি-বাংলা ইত্যাদি ভাষা শেখার দিকে মনযোগী হলেন। বাংলা ভাষা শেখার সূত্রে তিনি ইংরেজি থেকে দু'টি নাটক অনুবাদ করেছিলেন : 'The Disguise' এবং 'Love is the Best Doctor' : অনুবাদ শেষ হলে তখন ভাবলেন লোকজনকে তা দেখানো দরকার। অতএব থিয়েটার হল, অভিনেতা-অভিনেত্রী খুঁজে আনা, অভিনয় শেখানো, নাটক পরিচালনা ইত্যাদি চিন্তার দিকে তাঁর মন গেল। সঙ্গীতজ্ঞ মানুষটি এভাবে ক্রমে ক্রমে নাট্যকলা ও নাটমঞ্চের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

সে আমলে কলিকাতায় ইংরেজদের থিয়েটারে এদেশী লোকজনের ঢোকার অনুমতি ছিল না। ফলে লিয়েবেদেফ্

www.pathagar.com

২৫ নং ডোমটোলায় (এখনকার নাম এজরা স্ট্রীট) তাঁর ভাড়াবাড়ির পাশে পড়ে থাকা খালি জমিতে তিন মাসের মধ্যে নাট্যশালা তৈরি করে ফেললেন, নাম দিলেন Bengallie Theatre (বেঙ্গলি থিয়েটার)। 'দ্য ডিস্‌গাইজ' নাটক অভিনীত হল ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর এবং ১৭৯৬ সালের ২১শে মার্চ তারিখে। তৃতীয় বার অভিনয় হতে পারে নি, কারণ তার আগেই তাঁর মঞ্চে চক্রান্ত করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আবার কন্সার্টের জগতে ফিরে আসেন লিয়েবেদেফ্। কিন্তু চিরকালের মতো কলিকাতা ত্যাগের (৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৯৮) পূর্বে ইংরেজিতে একটি ব্যাকরণ ও রুশী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে বইয়ের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে যান। লণ্ডন থেকে ব্যাকরণ বইটি 'A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects' নামে ১৮০১ সালে বেরোয়। রুশী বইটি বেরোয় দেশে ফিরে যাওয়ার পরে সাংক্‌ৎ পিতের্বুর্গ্ থেকে ১৮০৫ সালে।

রাশিয়ায় প্রত্যাগমনের পরে লিয়েবেদেফ্ আর সঙ্গীতজগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন নি। তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের চাকুরি পেয়েছিলেন এবং নিজের বাড়িতে একটি ছাপাখানা বসান। তাঁর ছাপাখানায় (এর কোনো নাম ছিল না) ভারতীয় হরফ ছিল এবং তাঁর রুশ গ্রন্থটি এখানেই ছাপানো হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক পাণ্ডুলিপি ছিল যা ছেপে বের করার ইচ্ছা তিনি পোষণ করতেন। কিন্তু তার সময় তিনি পান নি।

১৮১৭ সালের ১৫ই জুলাই আটষট্টি বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হা. মা.

লিস্টার্, জোসেফ [১৮২৭—১৯২২]

খ্যাতনামা ইংরেজ শল্যবিদ জোসেফ লিস্টারের (Joseph Lister) জন্ম ১৮২৭ সালের ৫ই এপ্রিল। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন লণ্ডনে (দ্র)। কিন্তু তিনি গ্লাসগো, এডিনবরা ও লণ্ডনে শল্যবিদ ও শিক্ষক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন।

যদিও পেশিকলার উপর কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তবু তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি শল্যবিদ্যায় প্রথম জীবাণুনাশক ব্যবহার। লুই পাস্তুরের (দ্র)

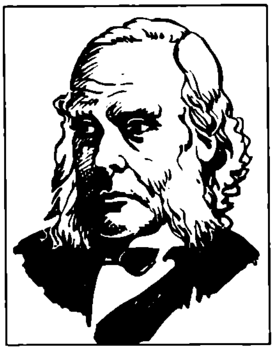

জীবাণুতত্ত্ব তাঁকে অস্ত্রোপচারের ক্ষতস্থান জীবাণুমুক্ত রাখার চেষ্টায় অনুপ্রাণিত করে। এই কাজে তিনি রাসায়নিক জীবাণুনাশক হিসাবে কার্বোলিক অ্যাসিড ব্যবহার শুরু করেন। শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি নির্বীজনের (দ্র) যে পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করেন তার ফলে সংক্রমণে মৃত্যুর হার অনেক পরিমাণে কমে আসে। সেকালে অস্ত্রোপচারজনিত সংক্রমণে মৃত্যুর হার ছিল খুবই বেশি।

১৮৬৭ সালে দুই বছরের ফলাফল নিয়ে শল্যচিকিৎসায় জীবাণুনাশকের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে তিনি এই নির্বীজনপদ্ধতির উন্নতির লক্ষ্যে তার সম্পূর্ণ মনোযোগ, শ্রম ও মেধা প্রয়োগ করে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। এদিক থেকে আধুনিক শল্যচিকিৎসা তাঁর কাছে ঋণী। যুগের হাওয়ায় শুরুতে তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হলেও পরে শ্রদ্ধা, সম্মান দুইই পেয়েছেন লিস্টার। ইতিহাসবিদগণের মতে লর্ড লিস্টার হিপোক্রেটিস (দ্র)-এর ঐতিহ্যানুসারী প্রতিভাবান শল্যবিদ।

রু. হা.

লীগ অব নেশন্স্ (League of Nations)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর গঠিত এক আন্তর্জাতিক সংস্থা। বেশি দিন জীবিত থাকে নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হয়ে গেলেই এর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল। এই সংস্থাটিকে বাংলায় বলা হয় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ'।

সংস্থাটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ভবিষ্যতে যুদ্ধ প্রতিহত করা এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমঝোতা ও সম্প্রীতি বাড়ানো। কিন্তু সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হলে অনুরূপ আরেকটি সংস্থা গঠিত হয় যা এখনো চালু আছে। তার নাম জাতিসংঘ (দ্র)।

হা. মা.

www.pathagar.com

লীনতাপ (latent heat)

কোনো কঠিন পদার্থকে তরল পদার্থে অথবা কোনো কঠিন বা তরল পদার্থকে গ্যাসীয় পদার্থে রূপান্তরিত করতে তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। এই রূপান্তরের সময় তাপমাত্রার পরিবর্তন ছাড়াই তাপশক্তি ব্যবহৃত হয় পদার্থের অণুসমূহের নিজেদের মধ্যেকার আকর্ষণশক্তির বিরুদ্ধে এবং আবহমণ্ডলের চাপের বিরুদ্ধে। অথচ তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে না বলে আমরা বাইরে থেকে তাপশক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারি না। পদার্থের অবস্থান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় এই তাপশক্তিকেই বলা হয় লীনতাপ। অর্থাৎ ১ গ্রাম কঠিন পদার্থকে তরল পদার্থে কিংবা ১ গ্রাম কঠিন বা তরল পদার্থকে গ্যাসীয় পদার্থে রূপান্তরিত করতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন তাকেই বলা হয় লীনতাপ। লীনতাপ-এর একক হচ্ছে জুল/ কিলোগ্রাম।

সু. ব.

লুডো (ludo)

লুডো একটি ঘরোয়া খেলা। সাধারণ মানুষের জন্য নামমাত্র খরচে অবসর বিনোদনের জন্য যেসব খেলা রয়েছে লুডোখেলা তার মধ্যে অন্যতম। ষোলো গুটির খেলা, বাঘবন্দি, ছক্কা পচিশী, পাশা খেলা—এমনি ধরনের বহু খেলা বাংলাদেশে থাকলেও লুডো যে কোনো বয়সে যে কোনো সময়ে খেলা যেতে পারে। এই খেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে এই খেলাটি মধ্যযুগে মোগল দরবারে পাশা, শতরঞ্জ বা দাবা খেলার সহজ বিকল্প হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল বলেই ক্রীড়া-ইতিহাসবিদেরা মনে করেন।

লুডো দুই প্রকারের হয়ে থাকে। সাধারণ লুডো চার জনে একত্রে প্রত্যেকের জন্য চারটি করে গুটি নিয়ে খেলে থাকে। এতে যার চারটি গুটি সবার আগে তার নিজ ঘরে এসে পাকা হবে সে-ই খেলায় জয়লাভ করবে। অন্য ধরনের লুডো হল 'সাপ ও মই' লুডো। এই লুডো খেলায় প্রত্যেকের একটি করে গুটি থাকে। এই গুটিকে ছক্কা চেলে লুডোতে লেখা ১০০ ঘরে যে আগে পৌঁছাতে পারবে সে-ই জয়লাভ করবে। তবে লুডোতে সাজানো ১০০টি ঘর পেরিয়ে যাওয়া সহজ নয়। কারণ এই ঘরগুলোতে অসংখ্য সাপ ও মই দেওয়া আছে। সাপের মুখে পড়লে সোজা সাপের লেজে এসে পড়তে হবে। আবার মইয়ের সাহায্যে ঝটপট ওপরে ওঠা যায়। বাংলাদেশে ঘরে ঘরে মেয়েদের ও বালক-বালিকাদের সহজ নির্ভেজাল অবসর বিনোদনের জন্য লুডো খেলাই একটি উৎকৃষ্ট খেলা।

কা. আ. আ.

লুত (আ.), হযরত

প্রসিদ্ধ নবী। বাইবেলে (দ্র) তাঁকে লোট্ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন শরীফে (দ্র) তাঁর প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে এসেছে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পয়গম্বর হযরত ইবরাহিম (আ.) (দ্র) -এর সমসাময়িক। তিনি ইবরাহিম (আ.)-এর শিষ্য ছিলেন বলেও জানা যায়। তাঁর সম্প্রদায়ের নাম সদম্।

হযরত লুত (আ.) ধর্মপ্রচার তথা সত্য, ন্যায় ও মানুষের সার্বিক কল্যাণের কথা, স্রষ্টার প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের কথা প্রচার করতে গিয়ে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল ব্যভিচারী এবং সীমা লঙ্ঘনকারী। তা সত্ত্বেও হযরত লুত (আ.) তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি।

মু. মা.

লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ [১৮৮৯—১৯৩৬]

মননশীল প্রাবন্ধিক। জন্ম বর্তমান মাগুরা জেলার পাবনান্দুয়ালী গ্রামে ১৮৮৯ সালে। পৈতৃক নিবাস এই জেলারই হাজীপুরে।

লুৎফর রহমানের শিক্ষাজীবন বেশি দূর অগ্রসর হবার সুযোগ পায় নি। মাত্র এফ. এ. (অর্থাৎ ফার্স্ট আর্ট্‌স্) শ্রেণী পর্যন্ত তিনি পড়াশোনা করেন।

প্রাথমিকভাবে তিনি শিক্ষকতা এবং পরে হোমিওপ্যাথি (দ্র) চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করে জীবন নির্বাহ করেন। এই কারণে তাঁর নামের আগে অনেক ক্ষেত্রে 'ডাক্তার' যুক্ত করতে দেখা যায়। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি তাঁর সাহিত্যচর্চা অক্ষুণ্ন রাখেন।

মানুষের নৈতিক চরিত্র জাগ্রত ও গঠন করাই তাঁর সাহিত্যিক দর্শনের মূল লক্ষ্য। তাঁর রচিত 'উন্নত জীবন', 'মানবজীবন', 'মহৎ জীবন', 'প্রীতি উপহার' ইত্যাদি গ্রন্থ এখনো বেশ জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত।

লুৎফর রহমান প্রবন্ধের পাশাপাশি রচনা করেছেন বেশ কিছু কবিতা, উপন্যাস ও ছোট গল্প।

www.pathagar.com

তিনি ১৯৩৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

লুথার্ , মার্টিন্ [১৪৮৩—১৫৬৪]

জার্মান ধর্মসংস্কারক ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের প্রবর্তক। মার্টিন্ লুথার্ (Martin Luther) -এর জন্ম লোয়ার স্যাক্সনির অন্তর্গত আইস্লেবেনের (Eisleben) এক রোমান ক্যাথলিক পরিবারে, ১৪৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর।

১৮ বছর বয়সে লুথার্ জার্মানির এর্ফুর্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসেন। ২৩ বছর বয়সে তিনি এখান থেকেই এই দুই বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৫০৯ সালে লুথার্ যাজকবৃত্তি গ্রহণ করার পর সহজ-সরল ভাষায় খ্রিস্টের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন।

১৫১১ সালে তিনি রোমে যান। কিন্তু এখানে এসে বিভিন্ন স্তরের যাজকদের মধ্যে ভোগলিপ্সা, নানা অনাচার, এবং খ্রিস্টধর্মের বিকৃত রূপ লক্ষ করেন। এমনকি স্বয়ং পোপ কর্তৃক প্রচুর অর্থের বিনিময়ে জনসাধারণের কাছে পাপ থেকে মুক্তির ফতোয়া বিক্রির ঘটনায় তাঁর মন বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই দেশে ফিরে এসে তিনি শুরু করেন ধর্মসংস্কার আন্দোলন।

১৫১৭ সালের ১লা নভেম্বর লুথার তাঁর সংস্কারধর্মী ধর্মমতের এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। লুথারের এই বিদ্রোহের কথা রোমের তৎকালীন পোপ দশম লিওর কাছে পৌঁছালে তিনি তাঁকে ক্ষমা চাইতে এবং তাঁদের মতে ধর্মবিরোধী ঐ ঘোষণাপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন, অন্যথায় তাঁকে খ্রিস্টীয় ক্যাথলিক ধর্ম থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে হুমকি দেন। মার্টিন্ লুথার্ পোপের এই হুকুমনামা প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে বলেন, 'পোপের এমন কোনো স্বর্গীয় অধিকার নেই যাতে করে তিনি কাউকে ধর্ম থেকে বহিষ্কার করতে পারেন।'

১৫২৩ থেকে ১৫৪০ এই সতেরো বছর অবিরাম প্রচারতৎপরতার মাধ্যমে মার্টিন্ লুথার্ ইউরোপের একাংশে তাঁর প্রতিবাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। প্রতিবাদী চরিত্রের বলে তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের নাম হয় 'প্রোটেস্টান্ট'।

১৫২৪ সালে তিনি বিবাহ করেন একজন নান (Nun) অর্থাৎ সন্ন্যাসিনীকে। ক্যাথলিক রীতি অনুসারে যাজকদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

লুথার্ তাঁর নতুন প্রতিবাদী ধর্মমত প্রচারের অংশ হিসাবে ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর এই সময়কার বিভিন্ন রচনাকর্মসহ 'টেব্ল্ টক্স্' বা বৈঠকী গল্প নামক গ্রন্থ জার্মান সাহিত্যের এক চিরায়ত সম্পদ। তাঁকে জার্মান সাহিত্যের গদ্যের অন্যতম জনকও বলা হয়।

মার্টিন্ লুথার্ মৃত্যুবরণ করেন ১৫৬৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি।

আ. হু.

লুভ্র্ (Louvre)

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে (দ্র) অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত ও সমৃদ্ধ শিল্পকলা জাদুঘর বা মিউজিয়াম। ১২০০ সালে নির্মিত যে ভবনকে ঘিরে এটি প্রথমে গড়ে ওঠে, তা ছিল ফরাসি সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের রাজকীয় দুর্গ ও প্রাসাদ। শিল্প-সংগ্রহশালা হিসাবে লুভ্রের সার্বিক নির্মাণকাজ সম্পন্ন হতে সময় লাগে মোট দু' শ' বছর।

লুভ্র্ হচ্ছে নানা ভবনের এক বিশাল সমাহার (কমপ্লেক্স)। ১৫৪৬ সালে এর পশ্চিম দিকের ভবনের কাজ শুরু হয় সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসের নির্দেশে। শুরুতে এতে কেবল বিভিন্ন রাজকীয় দ্রব্যসামগ্রীই প্রদর্শনের জন্য রাখা হত। এর গ্রাঁদ্ গালেরির (Grande Galerie) কাজ সম্পন্ন হয় সম্রাট চতুর্থ হেনরির সময়ে (শা. ১৫৮৯-১৬১০) এবং সম্প্রসারিত ভবনসমূহের কাজ শুরু হয় ১৬২৪ সালে সম্রাট ত্রয়োদশ লুইয়ের আমলে। সম্প্রসারিত ভবনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'পাভিইঅঁ দ্য লোর্লজ্ (Pavillon de

www.pathagar.com

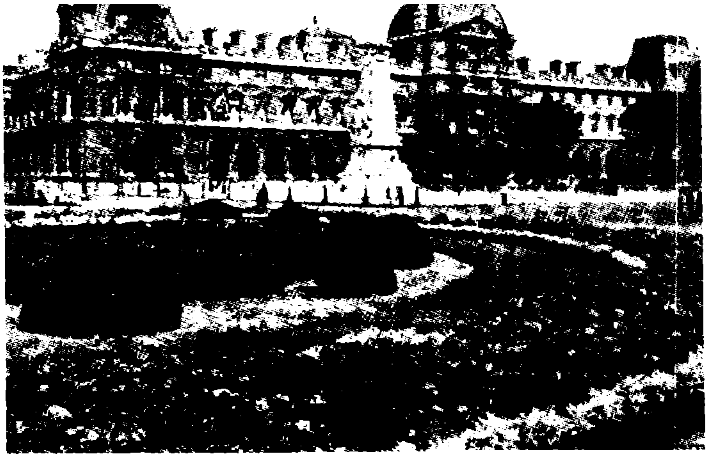

লুভ্‌র—প্যারিসে অবস্থিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিল্পকলার জাদুঘর

l' Horloge)। তবে মিউজিয়াম বা শিল্প-সংগ্রহশালা হিসাবে লুভ্‌রের ভবনসমূহের সামগ্রিক নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে (শা. ১৮৫২-১৮৭০)।

লুভ্‌রের স্বর্ণযুগ সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের শাসনামল। তাঁর নেতৃত্বে সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে সমগ্র ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য বিস্তৃত হলে লুভ্‌রের সংগ্রহসম্ভার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। তিনিই বিজিত দেশসমূহ থেকে লুট করা অমূল্য দ্রব্যসামগ্রী বা শিল্পসম্ভার এখানে এনে সংরক্ষণ করেন। কিন্তু তাঁর পতনের পর এসবের অনেক কিছুই বিজিত দেশসমূহকে পুনরায় ফেরত দেওয়া হয়। পরে ফরাসি দেশপ্রেমিক ও বিশ্বের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিবর্গের দানে লুভ্‌র্ ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৮৪৮ সালে লুভ্‌র্ রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

বর্তমানে এতে ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগসহ পৃথক পৃথক গ্যালারিতে গ্রিক, রোমান, মিশরীয় ও প্রাচ্য দেশীয় অসংখ্য শিল্পনিদর্শন রয়েছে। এর পাশাপাশি সংরক্ষিত আছে মধ্যযুগ, রেনেসাঁস ও আধুনিক কালেরও বহু বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্করের শিল্প ও ভাস্কর্যকর্মও। এইসব বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রেম্ব্রান্ট (দ্র), রুবেন্স্ (দ্র), লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (দ্র) ও টিশিয়ানের নাম। দা ভিঞ্চির বিশ্ববিখ্যাত শিল্পকর্ম 'মোনা লিসা' (দ্র) লুভ্‌রেই সংরক্ষিত আছে।

এই মিউজিয়াম সম্পর্কে এরকম একটি প্রবাদ প্রচলিত: যিনি লুভ্‌র্ পরিদর্শন করেছেন, ধরে নিতে হবে, তিনি মাত্র অল্প ক'দিনের মধ্যে সারা বিশ্ব পরিদর্শন করেছেন।

আ. হ.

লুমুম্বা, প্যাট্রিস এমার্জি [১৯২৫—১৯৬০]

প্যাট্রিস এমার্জি লুমুম্বা (Patrice Emergy Lumumba) আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী নেতা এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। জন্ম ১৯২৫ সালের ২রা জুলাই, সাবেক বেলজিয়ান কঙ্গোর কাসাই প্রদেশে। স্বাধীন কঙ্গো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে 'কঙ্গোলিজ ন্যাশনাল মুভমেণ্ট' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের নেতৃত্বেই বেলজিয়ামের কাছ থেকে কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬০ সালে প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু তাঁকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরই কঙ্গোর কাতান্‌গা প্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৬০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর কাসাভুবুর ষড়যন্ত্রেই লুমুম্বা ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬০ সালের ২রা ডিসেম্বর লুমুম্বা সামরিক স্বৈরতন্ত্রীদের হাতে আটক এবং নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। পরে ঘোষণা করা হয় যে তিনি গ্রামবাসীদের হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর এই ষড়যন্ত্রমূলক মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় ওঠে। তিনি পরিণত হন পরাধীন আফ্রিকার দেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বলতম প্রতীকে।

আ. হ.

লু শুন্ [১৮৮১—১৯৩৬]

আধুনিক চীনা সাহিত্যের স্থপতি হিসাবে অভিহিত। লু শুন (Lu Hsün)-এর প্রকৃত নাম চৌ শু-জেন্। জন্ম ১৮৮১ সালে।

১৯১৮ সালের মে মাসে 'নতুন যৌবন' নামের একটি সাময়িকীতে লু শুন্-এর বিখ্যাত গল্প 'এক জন পাগলের ডায়েরি' প্রকাশিত হয়। আধুনিক চীনা সাহিত্যের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম ছোটগল্প। চীনের সামন্তবাদী সমাজের

www.pathagar.com

বাস্তবচিত্র এতে বিধৃত।

প্রথম জীবনে লু শুন্ ছিলেন বিপ্লবী গণতন্ত্রী। পরবর্তী কালে তিনি কমিউনিস্ট হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'হে যুদ্ধ স্বাগত', 'পুরনো গল্প নতুন করে বলা' এবং 'পরিভ্রমণ'। সবগুলোই ছোটগল্পের সঙ্কলন। বাংলা সাহিত্যে লু শুন্-এর সাহিত্যকর্ম ব্যাপকভাবে অনূদিত ও বহুলপঠিত।

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩৬ সালে।

আ. হু.

লে মিজেরাব্‌ল্ (Les Misérables)

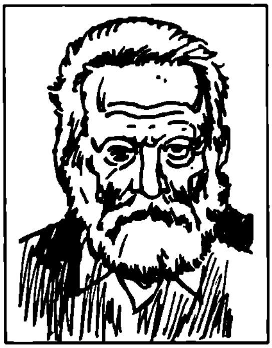

ভিক্তর্ মারি উগো

ফরাসি ঔপন্যাসিক ভিক্তর্ উগো (দ্র) (Victor Marie Hugo: ১৮০২-১৮৮৫) 'লে মিজেরাব্‌ল্' উপন্যাসের রচয়িতা। ১৮৬২ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র জঁ ভাল্‌জঁ নামে এক আসামি। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন ও ইংরেজি সৈন্যাধ্যক্ষ ডিউক অব ওয়েলিংটনের মধ্যে যে ওয়াটার্লু যুদ্ধ (দ্র) সংঘটিত হয় তাতে ফরাসি বাহিনীর পতন ঘটে। কাহিনীটি ওয়াটার্লু-র পটভূমিকায় লেখা। ইংরেজি বা বাংলা উভয় অনুবাদেই এ বইয়ের শিরোনাম 'লে মিজেরাব্‌ল্'। সামান্য একটি রুটি চুরি করার অপরাধে যে গুরুদণ্ড উপন্যাসের নায়ক জঁ ভাল্‌জঁ ভোগ করেছে, তা-ই অত্যন্ত সহমর্মিতার সঙ্গে এ উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে।

হা. মা.

লেখচিত্র

ইংরেজি গ্রাফ (graph)-এর বাংলা প্রতিশব্দ লেখচিত্র। একে চিত্রলেখ, নকশা ইত্যাদি শব্দ দিয়েও বোঝানো হয়। লেখচিত্র আসলে চিত্রের মাধ্যমে কোনো তথ্য উপস্থাপন করার উপায়। অর্থাৎ কোনো কিছুর পরিমাপ বা কোনো উপাত্তকে সহজে এবং সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্য লেখচিত্র ব্যবহার করা হয়। লেখচিত্র দিয়ে কোনো তথ্য বা উপাত্তকে প্রকাশ করতে হলে এদের সংখ্যায় প্রকাশ করে নিতে হয়। কোনো কিছুর লেখচিত্র আঁকার জন্য বিশেষ ধরনের কাগজ ব্যবহার করতে হয়। একে ছক কাগজ বা গ্রাফ পেপার বলে। ছক কাগজে ছোট ছোট বর্গাকার ঘর কাটা থাকে। লেখচিত্র আঁকার সময় অনুভূমিক ও উল্লম্বভাবে দু'টি রেখা টানা হয়। রেখা দু'টি যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে মূলবিন্দু বলে। একে সাধারণত O দিয়ে নির্দেশ করা হয়। অনুভূমিক রেখাটিকে X অক্ষ বলে; একে $X'OX$ দ্বারা সূচিত করা হয়। উল্লম্ব রেখাটি Y অক্ষ। একে $Y'OY$ দ্বারা দেখানো হয়। ছক কাগজে ছোট ছোট বিন্দু প্রতিস্থাপন করে X অক্ষ এবং Y অক্ষের সাপেক্ষের তথ্যের সংখ্যামানগুলোর অবস্থান দেখানো হয়। সরলরেখা বা বক্ররেখা দিয়ে প্রতিস্থাপিত বিন্দুগুলো যোগ করে তথ্যসমূহের লেখচিত্র পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যকে তাড়াতাড়ি ও সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য লেখচিত্র ব্যবহার করা হয়। ব্যবসা, বিজ্ঞাপন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, প্রকৌশলবিদ্যা, শিক্ষা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই কোনো তথ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য লেখচিত্র ব্যবহৃত হয়। লেখচিত্রের মাধ্যমে যেমন কোনো তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি একাধিক তথ্যগুচ্ছের একটির সাথে অপরটির তুলনাও করা যায়। গণিতে লেখচিত্র দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হয়। গবেষণার কাজে লেখচিত্র ব্যবহৃত হয়। লেখচিত্র দিয়ে কোনো বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীও করা যায়। বিভিন্ন ধরনের তথ্যকে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন রকম লেখচিত্র আঁকতে হয়। বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্রের মধ্যে রয়েছে স্তম্ভলেখ, আয়তলেখ (histogram), ঘটনসংখ্যা বহুভুজ (frequeucy polygon), পাইচিত্র (pie diagram), ওজাইভ্ রেখা (ogive curve) ইত্যাদি।

হো. আ.

লেগুন / উপহ্রদ

গঠন অনুসারে প্রবালদ্বীপকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা

www.pathagar.com

যায় : প্রবাল-বেলা, প্রবাল-প্রাচীর ও প্রবাল-বলয় বা অ্যাটল। কোনো মহাদেশের সন্নিকটে যে প্রবাল-স্তর গঠিত হয়ে সমুদ্রের উপর জেগে ওঠে তাকে প্রবাল-বেলা ও সমুদ্রোপকূলের মধ্যে অনেক সময় জলরাশি সঞ্চিত হয়ে উপহ্রদ বা লেগুনের (lagoon) সৃষ্টি করে।

উপকূল থেকে বহুদূরে গোল বা চক্রাকার যেসকল প্রবাল-দ্বীপ গঠিত হয়। তাকে প্রবাল-বলয় (atoll) বলে। সাধারণত প্রবাল-বলয় খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রবাল-বলয়ের মধ্যস্থলে একটি অগভীর হ্রদকে উপহ্রদ বলে। লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ আরব সাগরের প্রবাল-বলয়। অন্যান্য

অঞ্চল অপেক্ষা প্রশান্ত মহাসাগরে (দ্র) অধিক প্রবাল-বলয় দেখতে পাওয়া যায়।

প্রবাল-বলয়ের মধ্যভাগের অগভীর অংশে পানি থাকায় যে হ্রদের সৃষ্টি হয়, তাকেও উপহ্রদ বা লেগুন বলে। লেগুন অনেক স্থানে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত আছে। অধিকাংশ উপহ্রদের তলদেশ প্রায় সমতল থাকে।

মু. এ.

লেজাররশ্মি

ইংরেজি Laser শব্দটি Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

সাধারণত 'লেজাররশ্মি' বলতে শক্তিশালী আলোকতরঙ্গগুচ্ছ বোঝায়, যার প্রতিটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও দশা (phase) এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ লেজার হল সুসমন্বিত (coherent) আলোকরশ্মি। অবশ্য, দৃশ্যমান আলো ছাড়াও অবলোহিত ও অতিবেগুনি কম্পাঙ্কের (দ্র) লেজারও সম্ভব। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের অনুরূপ বিবর্ধিত বিকিরণ(দ্র)-কে মেজার (Maser) বলা হয়।

পরমাণুতে ইলেক্ট্রনসমূহ বিভিন্ন শক্তিস্তরে সজ্জিত থাকে। শক্তি প্রয়োগ (pump) করে কোনো এক স্তরের ইলেক্ট্রনকে উচ্চ শক্তিস্তরে পাঠানো সম্ভব। উত্তেজিত থাকার কারণে ইলেক্ট্রন (দ্র) অবশ্য ঐ স্তরে থাকতে পারে না, বরং পুনরায় নিচের স্তরে নেমে আসে। উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্নতর শক্তিস্তরে নেমে আসার সময় ইলেক্ট্রনের বাড়তি শক্তি বিকিরণ হিসাবে নির্গত হয়। এই বিকিরণ হয় স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু যদি পাম্প করে উচ্চ শক্তিস্তরে আদিতে যত ইলেক্ট্রন ছিল তার চেয়ে বেশি ইলেক্ট্রন পাঠানো যায়, তা হলে স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের পাশাপাশি উত্তেজিত (stimulated) বিকিরণও ঘটে। অর্থাৎ, একটি সুসমন্বিত ও বিবর্ধিত আলোকরশ্মিগুচ্ছ বা লেজার পাওয়া যায়।

লেজার হতে পারে বিভিন্ন রকম—গ্যাসীয়, রাসায়নিক, নিউক্লিয়ার, সেমিকণ্ডাক্টর ইত্যাদি। লেজারমাধ্যম হিসাবে রুবি, হিলিয়াম-নিওন, ডায়োড (দ্র), আর্গন আয়ন, কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

স্বয়ংক্রিয় কাটিং, লেজার প্রিন্টিং, শল্যচিকিৎসা প্রভৃতিতে লেজারের ব্যবহার বাড়ছে। এ ছাড়া লেজার ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তিতে। আলোকযোগাযোগ-ব্যবস্থা তথা অপটিক্যাল কমিউনিকেশন গড়ে উঠেছে লেজারকে কেন্দ্র করে।

মু. হা.

লেনিন্, ভ্লাদিমির্ ইলিচ্ [১৮৭০—১৯২৪]

রুশদেশে ১৯১৭ সালে সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান নেতা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ১৮৭০ সালে সিম্বির্স্ক অঞ্চলে। আসল নাম ভ্লাদিমির্ ইলিচ্ উলিয়ানভ্। লেনিন্

www.pathagar.com

(Lenin) তাঁর ছদ্মনাম।

কিশোর বয়স থেকেই লেনিন্ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করেন। রুশ সম্রাট বা জারকে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল তাঁর বড় ভাইয়ের। এই ঘটনাই তাঁকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি অনুভব করেন যে গণসংগঠন ছাড়া বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

তিনি আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে ১৭ বছর বয়সে প্রথম গ্রেপ্তার হন। ১৮৯১ সালে তিনি আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। সেই সময় থেকেই মার্ক্সবাদ তাঁকে প্রভাবিত করতে থাকে। রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগ করতে হয় তাঁকে।

১৯০০ সালে দেশের বাইরে থাকার সময় তিনি 'ইস্ক্রা' (অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গ) নামে একটি বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। পত্রিকাটি রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করতে সাহায্য করে। ১৯০৩ সালে তৎকালীন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভিতরে তাঁর নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির (দ্র) প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০৫ সালে জার-বিরোধী অভ্যুত্থান সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে জারের পতন ঘটে নি। পরে ১৯১৭ সালের অভুত্থানে জারের পতন ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই অভ্যুত্থানেরই নেতৃত্ব দিয়েছেন লেনিন্।

তিনি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান। ১৯২১ সাল থেকে তাঁর প্রবর্তিত নতুন অর্থনৈতিক নীতি (নেপ্) দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

কার্ল্ মার্ক্স (দ্র) এবং ফ্রিড্রিশ্ এঙ্গেল্স্ (দ্র)-এর চিন্তার সম্প্রসারণ ও ব্যাখ্যার জন্য তিনি বিখ্যাত। তাঁর এই চিন্তাই লেনিন্বাদ নামে পরিচিত।

১৯২৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. মা.

লেন্স্ (lens)

স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে আলোকরশ্মি চলে যেতে পারে। তবে স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করার সময় আলোকরশ্মি যেদিকে যায়, পদার্থটি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তার দিক বদলে যেতে পারে। এটি বিশেষভাবে নির্ভর করে স্বচ্ছ পদার্থটির আকৃতির উপর। বিশেষ আকৃতির স্বচ্ছ পদার্থখণ্ডের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পর আলোকরশ্মির প্রতিসরণ (দ্র) অর্থাৎ দিকপরিবর্তন ঘটে। এই রশ্মিগুলো প্রতিসরিত হয়ে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় অথবা তা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়। এ ধরনের বিশেষ আকৃতির স্বচ্ছ পদার্থখণ্ডকে বলা হয় লেন্স। লেন্স্ সাধারণত কাচের তৈরি হয়ে থাকে। এখন প্লাস্টিকের (দ্র) লেন্সও তৈরি হচ্ছে।

লেন্স্ দু' ধরনের হয়ে থাকে—কন্‌ভেক্স বা উত্তল লেন্স এবং কন্‌কেভ্ বা অবতল লেন্স। কন্‌ভেক্স বা উত্তল লেন্স-এর মাঝখানটা চার ধারের চেয়ে মোটা হয়। এর অর্থ উপরিভাগ উত্তল। আর যে লেন্সের মাঝখানটা পাতলা এবং চারধার মোটা তাকে বলে অবতল লেন্স।

আলো যখন উত্তল লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়, তখন লেন্স্ থেকে বেরিয়ে তা একটি বিন্দুতে সংহত বা মিলিত হয়। আবার অবতল লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ে।

লেন্স্ অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। চোখের চশমা ছাড়াও ক্যামেরা (দ্র), দূরবীন (দ্র), অণুবীক্ষণ যন্ত্র (দ্র) প্রভৃতি যন্ত্রে লেন্স্ অবশ্যই ব্যবহার করতে হয়। নানা ধরনের কাজের জন্য নানা ধরনের লেন্স্ তৈরি করা হয়।

সু. ব.

লেবার পার্টি (Labour Party)

ব্রিটেনের একটি রাজনৈতিক দল। ১৮৯২ সালে প্রথম শ্রমিক দলীয় সদস্য জন বার্ন্স্ ও কীর্ হার্ডি (Keir Hardie) ১৩ জন লিবারেল শ্রমিক সদস্যসহ হাউস অব কমন্স্ সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০০ সালে ট্রেড্স্ ইউনিয়ন কংগ্রেস, দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি, দ্য ফেবিয়ান সোসাইটি ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন মিলে গঠন করে 'লেবার রিপ্রেজেনটেটিভ কমিটি'। এতে অন্তর্ভুক্ত হন ৭ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টির ২ জন সদস্য, ফেবিয়ান সোসাইটির ১ জন সদস্য এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের ২ জন সদস্য। লক্ষ্য : এঁদের নিয়ে পার্লামেন্টে একটি লেবার গ্রুপ বা শ্রমিক দলীয় গোষ্ঠী

www.pathagar.com

গঠন করা। ১৯০৬ সালে এই লেবার রিপ্রেজেনটেটিভ কমিটিই লেবার পার্টিতে পরিণত হয় এবং ১৯২২ সালের মধ্যে ব্রিটেনের দু'টি প্রধান বড় দলের একটিতে পরিণত হয়। ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে লেবার পার্টি সরকার গঠন করে।

এই পার্টির কর্মকাণ্ড পরিচালনার স্বার্থে ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ যুগিয়ে থাকে ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়নগুলো।

লেবার পার্টিকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে গ্ল্যাড্‌স্টোন্, ক্লিমেন্ট্ রিচার্ড্ অ্যাট্‌লি, বেভিন, ক্রিপ্‌স্, হ্যারল্ড্ ইউল্‌সন, হগ্ গেইট্‌স্‌কেল্, জর্জ ব্রাউন্, জেম্‌স্ ক্যালাহান্, রিচার্ড ক্রসম্যান, প্যাট্রিক্ গর্ডন্ ওয়াকার্ এবং জেম্‌স্ গ্রিফিথ্‌স্ উল্লেখযোগ্য।

আ. হু.

লেবেডেফ/লেবেডেভ্ লিয়েবেদেফ্ দ্র

লেবু

রুটেসি (Rutaceae) গোত্রভুক্ত প্রজাতিভেদে ছোট ও বড় বৃক্ষ বা ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ। এর বিভিন্ন প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নামগুলো নিম্নরূপ :

ক. *সাইট্রাস্ মেডিকা*, লিন্ (*Citrus medica*, Lin): কাগজী লেবু

খ. *সাইট্রাস্ লিমন্*, বার্ম (*Citrus limon*, Burm) : গোঁড়া লেবু

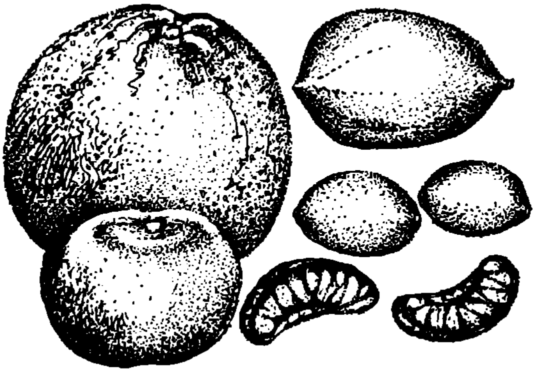

গ. *সাইট্রাস্ রেটিকুলেটা*, ব্লাঙ্কো (*Citrus reticulata*, Blanco) : কমলা লেবু

ঘ. *সাইট্রাস্ ম্যাক্সিমা*, মের্ (*Citrus*. *maxima*, Merr) : বাতাবি লেবু।

লেবু গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশ অনুকূল। এর ফুল ধারণের সময় উষ্ণ ও শুষ্ক পরিবেশ দরকার। আংশিকভাবে ছায়াযুক্ত পরিবেশে লেবু গাছে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

প্রকারভেদে কোনো কোনো লেবু গাছের পাতা বড়, কোনোটির ছোট। কোনো পাতার অগ্রভাগ লম্বাটে ও সরু, আবার কোনোটির গোলাকার। কোনো কোনো লেবু গাছে সারা বছরব্যাপী ফুল হয়। লেবুর রস রক্ত পরিষ্কার করে। লেবুর আদি নিবাস ভারতবর্ষ ও মায়ানমার (দ্র)।

বীজ ও কলমের সাহায্যে লেবুর বংশবৃদ্ধি ঘটে। তবে শাখা কলম ও গুটি কলমের সাহায্যে এর বেশির ভাগ চারা তৈরি করা হয়। তা ছাড়া কুঁড়ি সংযোজন করেও লেবুর চারা তৈরি করা সম্ভব।

লেবু গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই পাহাড়ি এলাকার কিঞ্চিৎ ঢালু জমিতে লেবু চাষ ভাল হয়। কিছুটা অম্লীয় মাটি লেবু চাষের জন্য অনুকূল।

মু. আ.

লেভুন্‌হুক্, আন্টোন্ ভান্ [১৬৩২—১৭২৩]

আন্টোন্ ভান্ লেভুন্‌হুক্ (Anton van Leeuwenhoek) সপ্তদশ শতাব্দীর এক জন প্রতিভাবান অণুবীক্ষণবিদ। তিনিই প্রথম তাঁর নিজের হাতে তৈরি অণুবীক্ষণের সাহায্যে জীবাণু (দ্র) ও পরজীবী (দ্র)-জগতের সন্ধান মানুষের কাছে তুলে ধরেন।

লেভুন্‌হুকের জন্ম ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর, হল্যাণ্ডে। জীবিকায় তিনি ছিলেন এক জন সফল পোশাক ব্যবসায়ী। কাচ ঘষে ঘষে লেন্স তৈরির শখ ক্রমে তাঁর নেশায় পরিণত হয়। এমনকি অর্জিত অর্থ ও জীবনের প্রধান অংশ তিনি ব্যয় করতে থাকেন এই নেশার পেছনে, তৈরি করেন উন্নত মানের অণুবীক্ষণ যন্ত্র (দ্র)।

অণুবীক্ষণে বিভিন্ন জিনিস দেখার কৌতূহল মেটাতে গিয়ে তিনি এক সময় আবিষ্কার করে ফেলেন অদৃশ্য, অতি

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র এক জীবজগৎ, যা খালি চোখে দেখা যায় না। তাঁর ভাষায় এগুলো ছিল কীটাণু (animalcules)। তিনিই প্রথম শনাক্ত করেন প্রোটোজোয়া (দ্র) জাতের পরজীবী (১৬৭৫), যার বৈজ্ঞানিক পরিচয় তাঁর জানা ছিল না। তিনি আবিষ্কার করেন বিভিন্ন আকৃতির জীবাণু (১৬৮৩)। লেভুন্‌হুক্‌ই প্রথম রক্তের লোহিত কণিকার (দ্র) নির্ভুল বর্ণনা (১৬৮৪) পণ্ডিত সমাজে হাজির করেন। তিনি আবিষ্কার করেন পেশির গঠনবিন্যাস। জীবদেহে ধমনী ও শিরার রক্তপ্রবাহের কৈশিক সংযোগ তিনি তাঁর অণুবীক্ষণের নিচে সুকৌশলে প্রদর্শন করেন, যা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন রুশ সম্রাট পিটার দ্য গ্রেট তাঁর হল্যাণ্ড সফরকালে।

জীবাণু ও কীটাণুর জগৎ লেভুন্‌হুক্‌ আবিষ্কার করেন প্রধানত পুকুর-ডোবার পানি, বৃষ্টির পানি, মানুষের দাঁতের ময়লা ইত্যাদি উৎস থেকে। বিচিত্র এই সব জীবাণু-কীটাণুর সচিত্র বিবরণ তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেন। উদ্দেশ্য, বিষয়টি বিদ্বান ব্যক্তিদের গোচরে আনা।

তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। রয়্যাল সোসাইটির ডাকসাইটে পণ্ডিতেরা অদ্ভুত সব অণুজীবের সন্ধান পেয়ে অভিভূত হন। লেভুন্‌হুক্‌কে ১৬৮০ সালে রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত করা হয়। লেভুন্‌হুক্‌ ফরাসি একাডেমীতেও তাঁর আঁকা কীটাণুর কিছু ছবি পাঠিয়েছিলেন।

সারা জীবনের শ্রমে ২৪৭টি অণুবীক্ষণ এবং চার শ'রও বেশি লেন্স তৈরি করেন লেভুন্‌হুক্‌। মৃত্যুর পূর্বে এই সঞ্চয় থেকে বাছাই করা ছাব্বিশটি সেরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (দ্র) লেন্স সমেত রয়্যাল সোসাইটিকে দান করে যান। সঙ্গে চিঠিতে ছিল এগুলো ব্যবহারের বিস্তারিত নির্দেশ।

লেভুন্‌হুকের মৃত্যু হয় ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে, ২৬শে আগস্ট।

সি. না. হ.

লোকসঙ্গীত

লোকসমাজে প্রচলিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত ও গীত সঙ্গীতকে লোকসঙ্গীত বলা হয়। সঙ্গীত প্রধানত দুই প্রকার : শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত। শাস্ত্র বলতে বোঝায় ব্যাকরণ। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত রচিত হয় শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী। লোকসঙ্গীত রচনায় শাস্ত্রীয় নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। মানুষ মনের

আবেগে আপনাআপনি লোকসঙ্গীত রচনা করে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ লোকসঙ্গীত রচনা করছে। এর সুর সহজ, তাল সহজ, ভাষাও অত্যন্ত সহজ। লোকসঙ্গীতের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। পণ্ডিতব্যক্তিগণ সঙ্গীতের ব্যাকরণ প্রবর্তন করেছেন এবং লোকসঙ্গীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। লোকসঙ্গীত রচয়িতারা এই শাস্ত্রকে অনুসরণ করেন নি। তাঁরা প্রাচীন কাল থেকে যেমন চলে আসছিল তেমনিভাবেই সঙ্গীতকে অবলম্বন করেছেন। রাজসভা ও উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতকেন্দ্রকে ঘিরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা হয়। নগরজীবনের প্রতিষ্ঠা ঘটলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নাগরিক চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। লোকসঙ্গীতের অনুশীলন হয় গ্রামে। সে জন্য লোকসঙ্গীত গ্রামের গান। এই গান পুরুষানুক্রমে চলে এবং চলতে চলতে তাতে পরিবর্তন ঘটে যায়। পূর্বে এই গানের লিখিত রূপ ছিল না। মুখে মুখেই তা ফিরতে থাকত। সঙ্গীত-রচয়িতারাও তেমন লেখাপড়া জানতেন না। কালক্রমে সেসব রচনা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। লোকসঙ্গীতের অনেক রচয়িতা অবশ্য তাঁদের রচনা লিখিত আকারেও রেখে গেছেন। তবে সুর রয়ে গেছে মুখে মুখেই।

www.pathagar.com

লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের সঙ্গীতের উদ্ভব ঘটেছে। একই সঙ্গীতরীতিতেও নানা ধরনের আঞ্চলিক পার্থক্য আছে। বাংলা লোকসঙ্গীতের প্রধান ধারাসমূহ হচ্ছে বাউল (দ্র), ভাটিয়ালি(দ্র), ভাওয়াইয়া (দ্র), গম্ভীরা(দ্র) ও ঝুমুর (দ্র)।

ক. গো.

লোকসাহিত্য

যুগ যুগ ধরে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। আধুনিক সাহিত্য নির্দিষ্ট সাহিত্যিকের রচনা, কিন্তু লোকসাহিত্যের জন্মদাতাকে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। লোকসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে লোককথা, লোকগীতি, গীতিকা বা গাথা, ধাঁধা বা হেঁয়ালি, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, মন্ত্র ইত্যাদি।

লোককথার মধ্যে রয়েছে পুরাকাহিনী, ইতিকথা। তবে এসব কথা-কাহিনী এলাকাভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ঘুমপাড়ানি ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, কন্যা বিদায়ের ছড়া ইত্যাদি বাংলার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। ছড়ার পরেই গীতির কথা উল্লেখ করা যায়। আঞ্চলিক সঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ভাদু, টুসু, ঝুমুর প্রভৃতি।

লোকসাহিত্যের আর একটি শাখা ধাঁধা। ধাঁধায় একই সঙ্গে বুদ্ধির পরীক্ষা ও কৌতুক প্রকাশিত হয়। প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে অল্প কথায় গূঢ় তত্ত্ব এবং সংসার-অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে বিয়ের গান প্রচলিত রয়েছে। সাধারণভাবে বরবরণ ও কন্যাবিদায়ের সময় এই গানগুলো গাওয়া হয়। তবে লোকসাহিত্যের প্রতিটি শাখায়ই আঞ্চলিক শব্দ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

মে. খা.

লোকায়ত দর্শন চার্বাক দর্শন/লোকায়ত দর্শন দ্র
লোকেশ্বর অবলোকিতেশ্বর দ্র
লোহা আয়রন দ্র
লোহিত কণিকা রক্ত দ্র
লৌহ আয়রন দ্র
লৌহ-যুগ প্রস্তর-যুগ দ্র

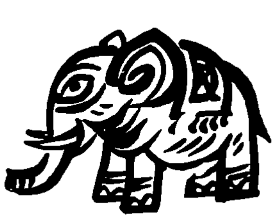

শ

শ, জর্জ বার্নার্ড [১৮৫৬—১৯৫০]

ইংরেজি সাহিত্যের (দ্র) সুবিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw) আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে। পিতার নাম জর্জ কার শ এবং মায়ের নাম লুসিণ্ডা এলিজাবেথ। সরকারি কর্মচারি বাবা চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর সব টাকাপয়সা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হন। পুত্র বার্নার্ড মায়ের যত্নে বড় হয়ে ওঠেন। শিল্প-সংস্কৃতি, বিশেষত সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তিনি মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। বার্নার্ডের প্রথাগত শিক্ষা তেমন কিছু ছিল না। এক মামার কাছ থেকে লাতিন ব্যাকরণ শিখেছিলেন এবং পরে ডাবলিনের এক স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি কখনই মনোযোগী হতে পারেন নি। স্কুল ছেড়ে তিনি এক জমির এজেন্টের কাছে চাকুরি নেন। বিশ বছর বয়সে যুবক বার্নার্ড চাকুরি ছেড়ে লণ্ডনের (দ্র) উদ্দেশে ডাবলিন ত্যাগ করেন। লণ্ডনে এসেও কাজকর্মের বিষয়ে তিনি মোটেও মনোযোগী হলেন না, বরং তিনি উপন্যাস লেখায় হাত দিলেন। পর পর কয়েকটি উপন্যাস রচনা করলেন—'Immaturity' 'Cashel Byron's Profession', 'The Irrational

www.pathagar.com

Knot', 'Love Among the Artists' এবং 'An Unsocial Socialist'। কিন্তু এই সব উপন্যাসের জন্য কোনো প্রকাশক পাওয়া গেল না। তাঁর আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। সঙ্গীত পরিবেশন সূত্রে যে আয় হত তা দিয়ে কোনো রকমে দিন কাটাতেন। সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হলেন। One and All পত্রিকায় লেখা আরম্ভ করলেন। ১৮৮৪ সালে শ ফেবিয়ান সোসাইটিতে (Fabian Society) যোগদান করেন। সমাজতন্ত্রের পক্ষে তিনি এক নিরলস কর্মী হয়ে ওঠেন। বারো বছর ধরে শ রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পার্কে, হলঘরে এবং গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করে বেড়ান। ১৮৮৫ সালে তিনি The World পত্রিকার শিল্পসমালোচক হিসাবে নিয়োগ পান। The Pall Mall Gazette-এ তিনি গ্রন্থসমালোচনা করতেন এবং The Star পত্রিকায় লিখতেন সঙ্গীত বিষয়ে। পরবর্তী কালে তিনি The World পত্রিকায় সঙ্গীত সমালোচনা লিখতেন এবং The Saturday Review পত্রিকায় নাট্যসমালোচনা করতেন। একই সময়ে তিনি ফেবিয়ান সোসাইটির কাজকর্ম করতেন। এই সোসাইটির এক সভায় তিনি নরওয়েজীয় নাট্যকার হেন্‌রিক ইবসেন্ (দ্র) বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন: পরবর্তী কালে এই বক্তৃতা 'The Quintessence of Ibsenism' নামে প্রকাশিত হয়। নাট্যসমালোচনার সূত্রেই নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ-র আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রথম নাটক 'Widowers' Houses' (১৮৯২); বস্তিজীবন ও বস্তির মালিকদের আচরণ এই নাটকের উপজীব্য। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় 'The Philanderer'। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয় 'Mrs. Warren's Profession'. কিন্তু সেন্সর বিধিনিষেধের কারণে এই নাটকটির মঞ্চায়ন হয় নি। ১৮৯৪ সালে 'Arms and the Man' মঞ্চস্থ হয় নিউ ইয়র্কে। ১৮৯৫ সালে রচিত হয় 'Candida' এবং শ'র বিখ্যাত নাটক 'Man and Superman' প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। লণ্ডনে এই নাটকের মঞ্চায়ন হয় ১৯০৫ সালে। এই নাটককে অভিহিত করা হয়েছিল 'কমেডি ও দর্শন' হিসাবে। শ জীবনশক্তি (life force) নামে একটি ধারণায় বিশ্বাস করতেন, যা মানবজীবনকে উচ্চতর ও উন্নততর অস্তিত্বে নিয়ে যাবে। এই ধারণার প্রকাশ ঘটেছে অন্য দু'টি নাটকেও—'Heartbreak House' (১৯১৭) এবং 'Back to Methuselah' (১৯২১)। জর্জ বার্নার্ড শ-র অন্যান্য বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রয়েছে 'You Never Can Tell' (১৮৯৫), 'The Man of Destiny' (১৮৯৬), 'The Doctor's Dilemma' (১৯০৬), 'Major Barbara' (১৯০৭), 'Pygmalion' (১৯১২), 'The Apple Cart' (১৯২৯)।

১৯২৫ সালে জর্জ বার্নার্ড শ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারলাভ করেন এবং এই পুরস্কারের টাকা অ্যাংলো-সুইডিশ লিটারারি অ্যালায়েন্সকে দান করেন। বার্নার্ড শ তাঁর নাটক ও অন্যান্য রচনায় সর্বদাই সমাজের অমানবিকতা ও যুক্তিহীনতা বিষয়ে সমালোচনা করেছেন এবং পাঠকদের তিনি উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছেন। ৯৪ বছর বয়সে ১৯৫০ সালের ২রা নভেম্বর জর্জ বার্নার্ড শ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ. আহ.

শওকত আলী, মওলানা [১৮৭৩—১৯৩৮]

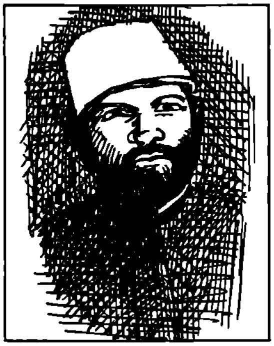

ছোট ভাই মওলানা মুহম্মদ আলীর মতো মওলানা শওকত আলী ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়কদের অন্যতম ছিলেন।

তিনি বেরিলি ও আলীগড়ে শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কিন্তু সরকারি চাকুরি করা শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ, তাঁর মন-প্রাণ ছিল ভারতীয় জনগণের, বিশেষ করে মুসলমানদের, স্বার্থের চিন্তায় ব্যাকুল। ইংরেজ সরকারের এ দেশের স্বার্থবিরোধী আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ১৯১২ সালে সরকারি উচ্চপদের চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি খিলাফত আন্দোলন (দ্র) ও অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র) যোগদান করে কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মু. মা.

শক (shock)

দেহে অক্সিজেন (দ্র) সমৃদ্ধ রক্তের চাহিদা ও সরবরাহের

www.pathagar.com

মধ্যে অসামঞ্জস্য তৈরি হলে শক বা অভিঘাত দেখা দেয়।

সাধারণত দ্রুত, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে রক্তের আয়তন হ্রাস পেয়ে শক সৃষ্টি হতে পারে। অবিরাম বমি, তীব্র উদরাময়, শরীরের বৃহৎ অংশ পুড়ে যাওয়া, আন্ত্রিক বাধা, পেরিটোনিয়ামপ্রদাহ ইত্যাদি কারণে শক দেখা দিতে পারে। আবার হৃদ্‌রোগের (দ্র) তীব্র আক্রমণের ব্যথা কিংবা অনুরূপ যন্ত্রণাদায়ক অন্যান্য কারণেও শক দেখা দেয়। এ ছাড়া রয়েছে জীবাণুর (দ্র) অধিবিষের প্রভাব, একিউট, ব্যাপক এলার্জির (দ্র) প্রতিক্রিয়া, স্নায়বিক কিংবা মানসিক কারণ।

শকের লক্ষণ এর কারণের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণত রক্তচাপ (দ্র) হ্রাস, নাড়ীর (দ্র) গতি হ্রাস, সংজ্ঞাহীনতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। এর চিকিৎসাও কারণভিত্তিক। তবে শকের চিকিৎসায় রোগীর পা উপরে তুলে দেওয়া কিংবা মাথা নিচুতলে রাখা, অক্সিজেন দেওয়া, শ্বাসপথ বাধামুক্ত করা, দেহে তরলভরণ বা রক্তভরণ ইত্যাদি সাধারণ ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত। শকের চিকিৎসায় তাৎক্ষণিকভাবে মর্ফিন বা স্টেরয়েড ইনজেকশন দেওয়া হয়ে থাকে।

আ. র.

শব্দাব্দ অব্দ দ্র

শকুন

শকুন বড় পাখি। মূলত শিকারি পাখির গোত্রভুক্ত (Accipirridae); মৃতভোজী ঈগল ও বাজগোষ্ঠীর পাখি এরা। ২১৭ প্রজাতির ভেতরে আছে বেশ কয়েক প্রজাতির শকুন। শকুনকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে– পূর্ব গোলার্ধের এবং পশ্চিম গোলার্ধের শকুন। প্রথম ভাগে ৭টি প্রজাতি। নতুন পৃথিবীর আছে ১৫টি প্রজাতি। যথাক্রমে California Condor এবং Cinercous। প্রথম গোত্রের পাখিরা বড়। লম্বায় ১৩৯ সেন্টিমিটার। ডানার বিস্তার ২৯ সেন্টিমিটার।

বাদামি, কালো, হলুদ ইত্যাদি রঙ হয়। গলাছিলা শকুনও আছে। এদের ঠোঁট শক্ত ও ধারালো; অনেকের পা দুর্বল। শকুনকে বলা হয় প্রকৃতির ঝাড়ুদার। এরা দল বেঁধে থাকে।

বিশ্বের সর্বত্রই আছে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মিশরীয় শকুন, রাজশকুন (King Vulture), গ্রিফন, তুর্কি, কনডর

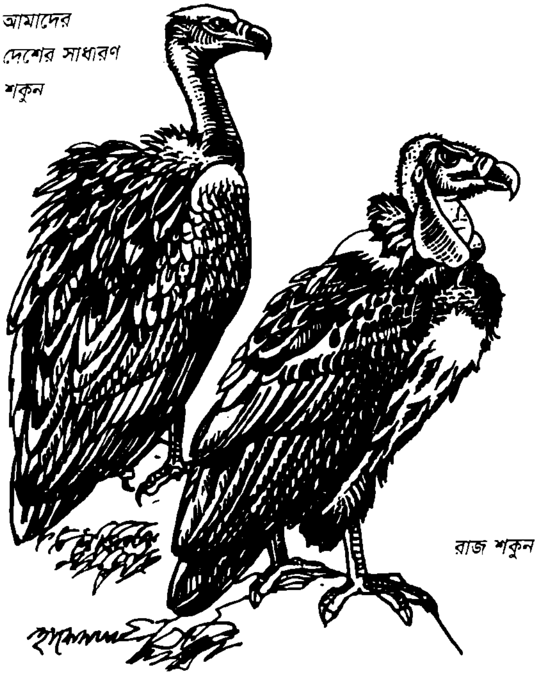

ও পামনাট শকুন। রাজশকুনের মাথার রঙ চমৎকার। গলায় যেন কমলা রঙের ফুল ঝুলে থাকে।

কেউ কেউ উটপাখির ডিম, ছোট অ্যান্টিলোপ, ফ্রেমিঙ্গো ইত্যাদি শিকার করে। পামনাট শুধু পাম ফল ও তেল খায়। শকুন উচ্চৈঃস্বরে ডাকে। রাগলে হিস হিস শব্দ করে। উঁচু গাছে, পাহাড়চুড়োয়, পর্বতের কিনারে ডালপালা দিয়ে বড়সড় বাসা করে। ডিম পাড়ে ১ থেকে ৩ টি, রঙ সাদা।

অনেক উঁচুতে উড়তে পারে। দৃষ্টিশক্তি প্রখর। মড়া দেখলে ডানা গুটিয়ে ঝড়ের বেগে নামতে থাকে। কেউ কেউ শীতে পরিযায়ী হয়। ২৫–৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

বাংলাদেশের (দ্র) উল্লেখযোগ্য শকুন হচ্ছে রাজশকুন, সাদা পিঠ, গিন্নি শকুন ইত্যাদি।

শ. খা.

শক্তি

কোনো ব্যবস্থার কাজ করার ক্ষমতা। অর্থাৎ যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা রয়েছে তাকেই বলা হয় শক্তি। শক্তি দু' ধরনের –

(১) কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি;

(২) পটেনশিয়াল এনার্জি বা স্থিতিশক্তি।

www.pathagar.com

শক্তির একক হচ্ছে জুল্ (দ্র)।

গতিশক্তি বলতে বোঝায় গতির প্রভাবে চলমান বস্তুতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয় তাকে। পানির স্রোত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির সাহায্যে টার্বাইন (দ্র), উইণ্ডমিল প্রভৃতি চালানো যায়। এখানে পানি (দ্র) এবং বায়ুর (দ্র) গতিজনিত বেগশক্তির সাহায্যে কাজ সম্পাদিত হয়। গতিশক্তির পরিমাণ সাধারণত 'আর্গ' এককে পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

স্থিতিশক্তি হচ্ছে বিশেষ অবস্থান বা সংস্থার ফলে বস্তুর লব্ধ শক্তি। উচ্চস্থানে সঞ্চিত পানি এর উদাহরণ। এ পানি নিচে নামার সময় স্থিতিশক্তি পরিণত হয় গতিশক্তিতে।

সু. ব.

শক্তি চট্টোপাধ্যায় [১৯৩৩—১৯৯৫]

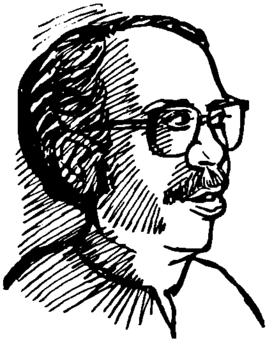

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহড়ু গ্রামে, ১৯৩৩ সালের ২৫শে নভেম্বর তারিখে। শৈশবে মাত্র চার বছর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় মাতামহের কাছে মানুষ হন।

প্রথমে লেখাপড়া করেন গ্রামের স্কুলে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত। তারপর কলিকাতা গিয়ে কাশিমবাজার স্কুলে ভর্তি হন। কলেজি শিক্ষার আরম্ভ প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র), বাংলায় অনার্স নিয়ে। কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। কারণ তত দিনে তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন ১৯৫৮ সালে। এর পরে ভর্তি হন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবগঠিত তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। কিন্তু এ-পড়াও তিনি শেষ করেন নি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবদ্দশায় 'মিথ্' বা 'কিংবদন্তি'তে পরিণত হয়েছিলেন তাঁর বেপরোয়া, উদ্দাম, ভবঘুরে জীবনযাপনের কারণে। জীবনের প্রথমাবস্থায় নানান ধরনের চাকুরি করেছেন। সবই ভাল প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকুরি। কিন্তু জীবনকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভবত তাঁর নেশা ছিল। তাই চাকুরির সুস্থিরতায় অস্থির হয়ে চাকুরি ছাড়তেন। তবে, ১৯৭০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যে যুক্ত হয়েছিলেন তা অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ছিন্ন করেন নি। বিবাহ করেছিলেন ১৯৬৭-এর ১৫ই আগস্টে।

সাহিত্যজগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ কবিতা দিয়ে নয়, গদ্যরচনা দিয়ে : 'নিরুপমের দুঃখ' নামে একটি গল্প। পরে উপন্যাস লিখেছেন 'কুয়োতলা' (১৯৫৬), 'দাঁড়াবার জায়গা' এবং 'অবনী, বাড়ি আছো ?'। কাব্যগ্রন্থ আছে প্রায় ৬০টি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'যম' এবং তাঁর প্রথম কাব্য 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে। কবিতার জন্য অজস্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কবিতা পড়বার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সুইডেন, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে গেছেন। ১৯৮৩ সালে 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থের জন্য সর্বভারতীয় সম্মান সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। মৃত্যুর মাস তিনেক পূর্বে (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫) শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী (দ্র) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'অতিথি-অধ্যাপক' হিসাবে যোগ দেন এবং অসামান্য সাফল্য ও প্রশংসা অর্জন করেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব পাঁচের দশকে। তার পর থেকে সুদীর্ঘ চার দশক ধরে বাঙালি কবিতা-পাঠকদের কাছে তিনি ধীরে ধীরে 'প্রিয়তম' কবি হয়ে ওঠেন। তাঁর কবিতার অজস্র পঙ্ক্তি লোকের মুখে মুখে ফেরে এবং বহু চরণ প্রবাদের মহিমা অর্জন করেছে।

১৯৯৫-এর ২৩শে মার্চ ভোরবেলায় শান্তিনিকেতনে আকস্মিকভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেন, চিকিৎসার সুযোগও পাওয়া যায় নি। কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

হা. মা.

শঙ্করাচার্য [আ. ৭৮৮–আ. ৮২০]

প্রখ্যাত দার্শনিক ও বৈদান্তিক পণ্ডিত। অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক না হলেও তিনিই অদ্বৈতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেন। আনুমানিক ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের কেরল রাজ্যে কানাডি নামক গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম শিবগুরু ও মাতা আর্যামা। অল্প বয়সে বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন

www.pathagar.com

করেন এবং গোবিন্দপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হন। অল্প বয়সে বিভিন্ন স্তোত্র রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। বিশেষত বৌদ্ধ এবং পূর্ব-মীমাংসা মত খণ্ডন করে স্বীয় অদ্বৈতবেদান্ত মত প্রতিষ্ঠা করেন। শাস্ত্র বিচারে তিনি অদ্বৈতবিরোধী বিভিন্ন দার্শনিক-পণ্ডিতদের পরাজিত করেন। বৌদ্ধধর্মের (দ্র) প্লাবনের যুগে হিন্দুধর্মকে (দ্র) রক্ষার জন্য তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই চার মঠের অধ্যক্ষদের এখনো শঙ্করাচার্য বলা হয়।

তিনি স্বাধীনভাবে বেদান্ত বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া উপনিষদ ও ভগবদ্‌গীতা (দ্র) প্রভৃতির উপর বহু ভাষ্য লেখেন। তাঁর প্রচারিত অদ্বৈতবাদের মূল কথা—এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একমাত্র সত্য। জগৎ মিথ্যা ও মায়াময় এবং জীবই ব্রহ্ম। অজ্ঞানতাবশত জীব তার আসল পরিচয় (অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব) বিস্মৃত হয়। জ্ঞানের উদয় হলে জীব বুঝতে পারে তার ব্রহ্মত্ব—এর নাম মুক্তি। এই মুক্তি একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। প্রবাদ অনুসারে মাত্র ৩২ বছর বয়সে (খ্রিঃ ৮২০) শঙ্করাচার্য দেহরক্ষা করেন।

বি. ব.

শঙ্খ (conch)

শঙ্খ বা শাঁখ এক প্যাঁচবিশিষ্ট শক্ত খোলসযুক্ত বৃহদাকৃতির সামুদ্রিক শামুক। এরা অমেরুদণ্ডী প্রাণী। উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে সমুদ্রের তলায় বাস করে। শঙ্খ মূল্যবান। এর খোলস থেকে শাঁখের চুড়ি বা শাঁখা তৈরি হয়। এটি হিন্দু বিবাহিত রমণীদের সধবার প্রতীক। শাঁখা তৈরি বাংলাদেশের (দ্র) অন্যতম কুটিরশিল্প। ঢাকার শাঁখারীবাজার এ জন্য বিখ্যাত। শাঁখের করাত বা মেশিনের সাহায্যে একটি শঙ্খ কেটে ৩-৪ জোড়া শাঁখা তৈরি হয়। এরপর এতে নানা নকশা করা হয়। এ ছাড়াও শঙ্খ থেকে অন্যান্য অলঙ্কার, পোর্সেলিন, চুন (দ্র) প্রভৃতি তৈরি হয়। এই শামুকের নরম মাংস সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে বিবেচিত।

শঙ্খের নানা প্রজাতি রয়েছে। আকৃতি-বর্ণে একেকটি একেক রকম। অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) ট্রাম্পেট বৃহত্তম প্রজাতি। প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার লম্বা। ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা রানী শঙ্খ থেকে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার তৈরি হয়। এর দেহ নরম। মাংসল পা বড় ও চ্যাপ্টা। কর্ষিকা ও চোখ আছে। খোলস

আকৃতি ও বর্ণে নানা রকম শঙ্খ রয়েছে

সাদা, গোলাপি, হলুদ বা কমলা। সমুদ্রের তলার আগাছা, পচা গাছ-পাতা খায়।

শঙ্খ একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ। রানী শঙ্খ প্রায় পাঁচ লাখ ডিম পাড়ে। অল্প ক'দিনে বাচ্চা ফোটে। সমুদ্রের তলায় স্থির হওয়ার পূর্বে ক্ষুদ্র বাচ্চাগুলো ক' সপ্তাহ সাগরের জলে ভাসতে থাকে।

আ. ন. ম. আ. র.

শচীন দেববর্মণ [১৯০৬—১৯৭৫]

সুবিখ্যাত গায়ক, সুরকার ও সঙ্গীত-পরিচালক। ত্রিপুরার রাজবংশে জন্ম। পিতা নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর। প্রকৃত সঙ্গীতজীবন গঠিত হয় কলিকাতায় (দ্র) কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, বাদল খাঁ প্রমুখের তালিমে। শচীন দেবের কণ্ঠস্বর ছিল একটু সানুনাসিক, কিন্তু অত্যন্ত সুরেলা। অসাধারণ মেজাজে তিনি গাইতেন। সুরবিস্তারের এমন আশ্চর্য ক্ষমতা খুব কম গায়কই অর্জন করতে পারেন। ১৯৩২ সালে প্রথম শচীন দেববর্মণের গানের রেকর্ড বেরোয়। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে গানের রেকর্ড করেন। রাগসঙ্গীত তাঁর প্রধান ক্ষেত্র হলেও

www.pathagar.com

লোকসঙ্গীতেও তাঁর গভীর দক্ষতা ছিল। বাংলা রাগপ্রধান গানে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষায়ই তিনি রেকর্ডে গান করেন। ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু হয় চলচ্চিত্রে (দ্র) তাঁর সঙ্গীতপরিচালনার পালা। ১৯৪৪ সাল থেকে শচীন দেব বোম্বাই শহরে বসবাস শুরু করেন। সুরকার ও সঙ্গীতপরিচালক রূপে হিন্দি চলচ্চিত্রের সঙ্গে তখন থেকেই তিনি যুক্ত হন। সঙ্গীতে অবদানের জন্য তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ ছাড়াও তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কার লাভ করেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন। সুরকার, সঙ্গীতপরিচালক ও গায়ক রাহুল দেববর্মন তাঁর পুত্র।

ক. গো.

শতক কাব্য কাব্য দ্র

শনি

সৌরজগতের (দ্র) দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। শনি গ্রহ গ্যাসের তৈরি বিশাল এক বল বা গোলক। এর ব্যাস ১,২০,০০০ কিলোমিটার। শনির আয়তন এত বিশাল যে ৭৮৩টি পৃথিবী এর ভিতর পুরে রাখা যাবে—কিন্তু এর ভর পৃথিবীর মাত্র ৯৫ গুণ। কারণ, এটি গ্যাসের বল বলে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ০.৭, পানির চেয়েও হালকা। শনির ভূত্বক বরফে ঢাকা। শনির চেয়ে বড় এক থালা পানিতে শনিকে রেখে দিলে বলের ন্যায় ভেসে থাকবে। শনির কুয়াশাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলে রয়েছে হাইড্রোজেন (দ্র) ও হিলিয়ামের (দ্র) মিশ্রণ। এ ছাড়া আছে মিথেন (দ্র) ও অ্যামোনিয়া (দ্র) গ্যাস। সূর্যকে (দ্র) একবার ঘুরে আসতে শনির সময় লাগে সাড়ে উনত্রিশ বছর। কিন্তু নিজ অক্ষে ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে একবার পাক খায়। সুতরাং শনিতে একদিন (দিনরাত মিলে) হয় দশ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে: প্রায় ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট দিন এবং ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাত। শনিকে ঘিরে রয়েছে সুন্দর সুন্দর বলয়। প্রত্যেকটি বলয়ে রয়েছে বিভিন্ন রঙের সমাবেশ। তাই শনি এত সুন্দর। 'ভয়েজার' মহাশূন্যযান শনির যে ছবি পাঠায় তা থেকে এর বলয় ও উপগ্রহ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে। 'ভয়েজার' অভিযানের পূর্বে জানা ছিল যে শনির রয়েছে মাত্র ছয়-সাতটি বলয়। কিন্তু ভয়েজারের পাঠানো ছবি থেকে জানা গেছে, শনির বলয় রয়েছে হাজার হাজার। প্রধান বলয়টি ২,৭০,০০০ কিলোমিটার দূরত্বে থেকে শনিকে ঘিরে আছে। এর রয়েছে আঠার'টি চাঁদ বা উপগ্রহ। সবগুলোই শনির বলয়ের বাইরে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম টাইটান। এর ব্যাস ৫,১৫০ কিলোমিটার। এটা ছোটখাটো একটা গ্রহের মতো। শনির চারটি চাঁদ আবিষ্কার

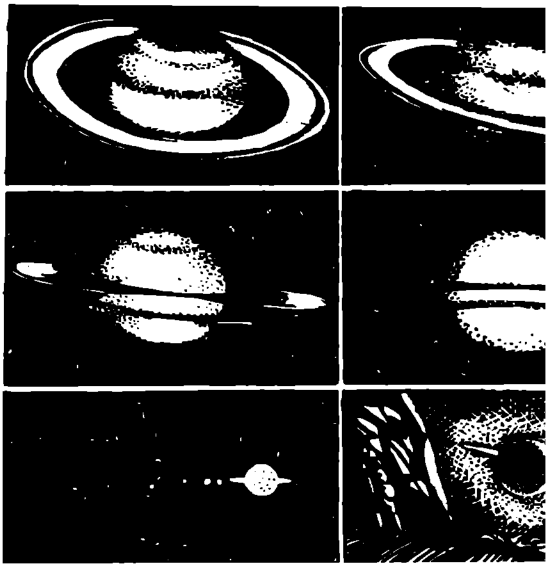

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থান থেকে শনিগ্রহের রূপ, নিচে বাঁদিকে: শনি ও ছয়টি উপগ্রহ

করেছিলেন জঁ দমিনিক কাসিনি (Jean Dominique Cassini)। ১৬৫৫ সালে টাইটান্ আবিষ্কার করেন ক্রিস্টিয়ান হেগেন্স। ১৬৫৯ সালে তিনি শনির বলয়রহস্যের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

সে. শা.

শপ্যাঁ, ফ্রেদেরিক্ ফ্রাঁসোয়া [১৮১০—১৮৪৯]

সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতরচয়িতা। ১৮১০ সালে শপ্যাঁ (Fréderic Francois Chopin) পোল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই শপ্যাঁ পিয়ানোর তালিম নিতে থাকেন এবং মাত্র ন' বছর বয়সে পিয়ানোবাদক হিসাবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। শপ্যাঁর যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন রাশিয়ার সম্রাট পোল্যাণ্ড সফরে গেলে সম্রাটকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাবার জন্য তাঁর ডাক পড়ে। উনিশ বছর বয়সে শপ্যাঁ বিদেশ ভ্রমণে যান। সে সময় বার্লিনে তাঁর বাদন প্রভূত প্রশংসা পায়। একুশ বছর বয়সে প্যারিস ভ্রমণে গিয়ে

www.pathagar.com

সেখানেও বিপুলভাবে প্রশংসিত হন। ম্যাজরকা নামক দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে শপ্যাঁ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ে। এই রোগ সম্পর্কে মানুষের আতঙ্ক ছিল সে সময়। ভাড়াটে বাড়ি থেকে শপ্যাঁ বিতাড়িত হন ও একটি পরিত্যক্ত গির্জায় আশ্রয় নেন। এই অবস্থায়ও তিনি কতিপয় মধুর পিয়ানো-সঙ্গীত রচনা করেন। অসুস্থ শরীরেও শপ্যাঁ ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন ১৮৪৮ সালে। সেখানে গেলে তাঁর অসুখ আরো বেড়ে যায়। ফিরে আসেন প্যারিসে। সেখানেই ১৮৪৯ সালে ৩৯ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শপ্যাঁ 'পিয়ানোর কবি' হিসাবে খ্যাত। সঙ্গীতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের রূপায়ণে তিনি অদ্বিতীয়।

ক. গো.

শফিউর্ রহমান (শহীদ) [১৯১৮–১৮৫২]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। বাইশে ফেব্রুয়ারি বেলা এগারোটা নাগাদ নবাবপুর রোড দিয়ে সাইকেল চড়ে যাবার সময় রথখোলার কাছে পিঠে গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে তখুনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে অস্ত্রোপচারের পর তিনি মারা যান।

শফিউর রহমানের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোন্নগরে, ১৯১৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি। পিতা মৌলভী মাহবুবুর রহমান। কলিকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ থেকে আই. কম. পাশ করে দেশবিভাগের পর শফিউর রহমান পরিবারের অন্যদের সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন। চাকুরি নেন হাইকোর্টে। তিনি তখন বিবাহিত। স্ত্রীর নাম আকিলা বেগম। তাঁদের ছিল শাহনাজ নামের এক শিশুকন্যা। তাঁর মৃত্যুর পর আকিলা বেগম এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয় শফিকুর রহমান।

শহীদ শফিউর রহমানকে পুলিশ গভীর রাতে আজিমপুর গোরস্তানে দাফনের ব্যবস্থা করে। তাঁর কবর সংরক্ষিত হয়েছে। সমাধিলিপিটি নিম্নরূপ :

শহীদ
শফিউর রহমান
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

আ. র.

শবে কদর– এই রাতে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়

শবে কদর

শবে কদর বা লাইলাতুল কদর অর্থ মহিমান্বিত রাত। রমজান মাসের শেষ দশ দিনের যে কোনো বেজোড় রাত শবে কদরের মর্যাদায় অভিষিক্ত বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে একটি হাদিস (দ্র) থেকে জানা যায় যে ২৬শে রমযান (দ্র) দিবাগত রাতই শবে কদর বা মহিমান্বিত রজনী। আমাদের দেশেও এই রাতটি শবে কদর হিসাবে বিশেষ মর্যাদায় পালিত হয়।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফের (দ্র) বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই রাতে সর্বপ্রথম কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তা ছাড়াও এই রাতে ফিরিশতাগণ (দ্র) এবং মানুষের আত্মাসমূহের পৃথিবীতে আগমন ঘটে বলে উল্লেখ রয়েছে। এসব কারণেই রাতটি মুসলমানদের নিকট 'মহিমান্বিত রজনী' হিসাবে সম্মানিত।

মু. মা.

শবে বরাত

শবে বরাত অর্থ সৌভাগ্য বা মুক্তিলাভের রজনী।

আরবি শাবান মাসের পঞ্চদশ রাত 'শবে বরাত' হিসাবে চিহ্নিত। এই রাতটি মুসলমানদের নিকট অতি পবিত্র। এই রাতে তাঁরা অত্যধিক গুরুত্বসহকারে ইবাদত-বন্দেগি করেন ও আত্মীয়-স্বজনের কবর জিয়ারত করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, এই রাতে জেগে ইবাদত-বন্দেগি এবং স্রষ্টার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তাঁদের জীবনের সমস্ত পাপ মোচন হবে। তাঁদের আরো বিশ্বাস, এই রাতে সকল মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব অর্থাৎ 'আমলনামা' লিপিবদ্ধ হয়। আগামী বছরের ভাগ্যলিপি, জন্মমৃত্যুর হিসাবও এই রাতেই লেখা হয় বলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন।

মু. মা.

শবে মিরাজ

শবে মিরাজ অর্থ ঊর্ধ্বগমনের রজনী। মিরাজ শব্দটি আরবি রুজ ক্রিয়াপদ থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ আরোহণ বা উপরে ওঠা।

কথিত আছে, হযরত মুহম্মদ (স.) আরবি রজব মাসের ২৬ তারিখ রাতে (অর্থাৎ ২৭শে রজব) ঐশী বাহন বুরাকে চড়ে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করেন এবং আল্লাহ্‌র (দ্র) নিকট থেকে দৈনিক পাঁচ বার নামাযের (দ্র) নির্দেশ লাভ করেন। রসূলুল্লাহ্(স.)-র এই ঊর্ধ্বলোক ভ্রমণের রাতকেই ইসলামী পরিভাষায় 'শবে মিরাজ' বা 'লাইলাতুল মিরাজ' বলা হয়।

মু. মা.

শব্দ

আমরা প্রতিনিয়ত নানা রকমের শব্দ শুনতে পাই। মোরগের ডাক, পাখির কাকলি, গাড়ির শব্দ, কারখানার বাঁশি, মেঘের গর্জন, লঞ্চের হুইসেল, রেডিও বা গ্রামোফোনের সুমিষ্ট সুর, স্কুল-কলেজের ঘণ্টার ধ্বনি প্রভৃতি বহু রকমের শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য শব্দ একান্ত প্রয়োজন। যে শক্তি আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগায় তাই হচ্ছে শব্দ। শব্দের মূলে রয়েছে কোনো বস্তুর কম্পন বা কাঁপুনি। স্কুলের ঘণ্টায় আঘাত করলে শব্দ হয়। এই শব্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। কিন্তু শব্দায়মান ঘণ্টার উপর হাত দিলে শব্দ সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়। ঘণ্টার কাঁপুনি থেমে যায় বলেই শব্দ বন্ধ হয়। যখনই শব্দ হয় তখনই বুঝতে হবে, কোনো বস্তুতে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে।

কম্পন ব্যতীত কোনো শব্দের সৃষ্টি হতে পারে না। আমরা মুখ দিয়ে যে শব্দ করি তাও গলার ভিতর অবস্থিত স্বরযন্ত্রের এক জোড়া পাতলা পর্দার কাঁপুনি থেকে উদ্ভূত। স্বরযন্ত্রের এই পাতলা পর্দাজোড়াকে স্বররজ্জু বলা হয়। কথা বলার সময় ফুসফুস (দ্র) থেকে আগত বায়ু স্বররজ্জু দু'টিতে কাঁপুনির সৃষ্টি করে। ফলে শব্দের উৎপত্তি হয়। গলা, মুখগহ্বর এবং জিহ্বা, দাঁত ও ঠোঁটকে কাজে লাগিয়ে বায়ুপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা মুখ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শব্দ করতে পারি। শিশুদের স্বররজ্জু দু'টি ছোট ও পাতলা থাকে বলে তাদের গলার স্বর মিহি বা চিকন হয়।

শব্দায়মান বস্তুর কম্পনসংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে মোটামুটিভাবে ২০ বারের কম এবং ২০ হাজার বারের বেশি হলে সে শব্দ আমরা শুনতে পাই না। ২০ কম্পাঙ্কের নিচের শব্দতরঙ্গকে শ্রুতিপূর্ব (subsonic) শব্দতরঙ্গ এবং ২০ হাজার কম্পাঙ্কের বেশি শব্দতরঙ্গকে শ্রবণাতীত (ultra-sonic) শব্দতরঙ্গ বলে। শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা, নিমজ্জিত বস্তুর অবস্থান, মাছের ঝাঁকের অবস্থান ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়। কম্পন-সংখ্যা যত বেশি হবে শব্দের স্বর তত বেশি মিহি বা চিকন হবে। তা ছাড়া শুনতে হলে শব্দায়মান বস্তু ও শ্রোতার মধ্যবর্তী স্থানে কোনো জড় মাধ্যম থাকতে হবে। সে মাধ্যম হতে পারে বায়ু (দ্র), গ্যাস (দ্র), তরল বা কঠিন পদার্থ। মাধ্যম যত বেশি ঘন হবে শব্দের বেগ তার মধ্যে তত বেশি হবে। বায়ুতে শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩৩১ মিটার (০° সেলসিয়াস

www.pathagar.com

তাপমাত্রায়)। পানির মধ্যে শব্দের বেগ বায়ুতে শব্দের বেগ অপেক্ষা প্রায় ৪ গুণ বেশি, কাঠের মধ্যে ১২ গুণ এবং ইস্পাতের (দ্র) ভিতরে প্রায় ১৫ গুণ বেশি।

মু. এ.

শব্দকল্পদ্রুম

এটি একটি অভিধানের নাম। শব্দটির অর্থ শব্দকল্পতরু অর্থাৎ যে কল্পবৃক্ষের কাছে যে কোনো শব্দ প্রার্থনা করলে তা লাভ করা যায়। যথার্থই এই কল্পবৃক্ষ বাংলা হরফে মুদ্রিত সর্ববৃহৎ সংস্কৃত অভিধান। এতে সংস্কৃত যে কোনো শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি, ব্যবহার সংস্কৃত ভাষায়, কিন্তু বাংলা হরফে দেওয়া আছে। গদ্যে রচিত এই সংস্কৃত-সংস্কৃত অভিধানটি উনিশ শতকে রচিত।

রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) দীর্ঘ চার দশকের পরিশ্রমে আট খণ্ডে সম্পূর্ণ এই কোষধর্মী অভিধান সঙ্কলন করেন। এর রচনাকাল ১৮০৩ থেকে শুরু হয়েছিল। ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ সালে এবং ১৮৫৮ সালে সর্বশেষ অষ্টম খণ্ড পরিশিষ্ট খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত হয়।

উনিশ শতকে ক্রমবর্ধমান বিদ্যায়তন, আদালত ও প্রকাশনার ব্যবহারিক প্রয়োজনে রাধাকান্ত দেব এই অভিধান রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সংস্কৃত স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আদালতের বাদী-বিচারক এবং মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশক-পাঠক কর্তৃক এ অভিধানটি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল। আজ অবধি এই অভিধান অতিক্রম করেছে এমন কোনো সংস্কৃত কোষগ্রন্থ রচিত হয় নি।

এই শব্দকোষ রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত জ্ঞান, অধ্যবসায় ও শ্রমশক্তির কীর্তি স্বরূপ। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইউরোপের অন্যান্য ভারতবিদ্যানুরাগী রাজন্যবর্গ তাঁকে এই কীর্তির জন্য সম্মানিত করেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে কে সি এস আই (K C S I= Knight Commander of the Star of India) ও 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত করেন।

'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান সংস্কৃত পণ্ডিত করুণাসিন্ধু বিদ্যানিধি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সম্পাদিত হয়েছিল।

বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের (দ্র) অতুলনীয় ধ্বনিমাধুর্যে ভরা একটি হাসির কবিতা আছে, সেটিরও নাম 'শব্দকল্পদ্রুম'।

শা. চৌ.

শব্দতরঙ্গ তরঙ্গ দ্র

শম্ভু মিত্র [১৯১৫-১৯৯৭]

বিশ্বনন্দিত বাংলা নাট্যব্যক্তিত্ব। ১৯১৫ সালের ২২শে আগস্ট কলিকাতায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শরৎ মিত্র। কালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়াশোনা করেন।

শম্ভু মিত্র ১৯৪৪ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটকের একটি চরিত্র রূপায়নের মধ্য দিয়ে নাট্য জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে 'বহুরূপী' নামে একটি নাট্য সংস্থা গড়ে তোলেন। তিনি দীর্ঘদিন এই সংস্থার কর্ণধার ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে সৃজনশীল বাংলা নাট্যচর্চা সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) নাটক প্রযোজনা ও অভিনয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় কুশলী পুরুষ। হিন্দি চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছায়াছবি হল খাজা আহম্মদ আব্বাসের 'ধরতি কে লাল'। তিনি রাজ- কাপুর প্রযোজিত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত 'একদিন রাত্রে' নামক ছবির সহপরিচালক ছিলেন।

শম্ভু মিত্র নাট্যকলা বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন। রবীন্দ্র ভারতীতে নাটক বিভাগের প্রধান এবং বিশ্বভারতীতে (দ্র) অতিথি অধ্যাপক ছিলেন।

নাট্যশিল্পে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ শম্ভু মিত্র শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজকের সম্মান পেয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী (দ্র) থেকে পেয়েছেন সম্মানসূচক ডি লিট উপাধি, সঙ্গীত নাটক একাডেমীর ফেলো। ১৯৭৬ সালে তিনি ম্যাগ্‌সেসে (দ্র) পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে পদ্মভূষণ খেতাব লাভ করেন।

শম্ভু মিত্র ১৯৯৭ সালের ১৮ই মে কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু সে অবস্থাতেও তাঁর শক্তিশালী অভিনয়ের সম্মোহন দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখত। প্রখ্যাত অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র (দ্র)ও শাঁওলী মিত্র যথাক্রমে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা।

সুজ.ব.

শয়তান

আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ অধঃপতিত, অবাধ্য। ইসলামী

www.pathagar.com

পরিভাষায় আল্লাহ্‌র (দ্র) আদেশ অমান্যকারী বিদ্রোহী জিন।

কুরআন শরীফের (দ্র) বর্ণনা মোতাবেক শয়তান আগুনের তৈরি। ইসলামী বিশ্বাসমতে, আগুনের তৈরি আজাজিল আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম (আ.)-কে সিজ্‌দা (অবনত মস্তকে কুর্নিশ) করতে অস্বীকার করায় অভিশপ্ত হয়ে বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়। তার কাজই হল মানুষকে অসৎপথে পরিচালিত করা। এই কাজে তার বহুসংখ্যক সহচর নিরন্তর ব্যাপৃত রয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে পাপকাজে লিপ্ত হয় শয়তানের প্ররোচনায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সৎ জীবনযাপন করার মাধ্যমে শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে নিজেদের বাঁচানো সম্ভব।

মু. মা.

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৭৬—১৯৩৮]

জনপ্রিয় বাংলা ঔপন্যাসিক। ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা ভুবনমোহিনী দেবী।

শরৎচন্দ্রের পিতা ছিলেন কিছুটা সংসারবিমুখ ও ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ। এ কারণে শরৎচন্দ্রকে ভাগলপুর মামাবাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতে হয়। ভাগলপুরের নারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯৪ সালে এন্ট্রান্স পাশ করে নারায়ণ জুবিলি কলেজে এফ. এ. (ফার্স্ট আর্টস্‌ বা এখনকার উচ্চ মাধ্যমিক) শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু এ সময় তাঁর মাতৃবিয়োগ হলে অর্থাভাবসহ নানা কারণে শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। তবে এর আগেই তাঁর সহপাঠী-বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টের প্রভাবে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন।

পিতার ভবঘুরে স্বভাবটা শরৎচন্দ্রও পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। ছাত্রজীবনশেষে শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসী- বেশে কিছুকাল বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি ব্রহ্মদেশে (দ্র) পাড়ি জমান। সেখানে রেঙ্গুনের একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে করণিকের চাকুরি নিয়ে ১২/১৩ বছর অবস্থান করেন। আত্মীয়-স্বজনদের অনুপ্রেরণায় আবার এক সময় সাহিত্যচর্চার প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠেন। রেঙ্গুনে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে ১৯১৬ সালে তিনি কলিকাতায় ফিরে আসেন। পরে, ১৯১৯ সালে হাওড়া জেলার পানিত্রাস গ্রামে বাড়ি করে তিনি দীর্ঘদিন বসবাস করেন। শেষ জীবনে তিনি কলিকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডে বাড়ি বানিয়ে বসবাস করেছিলেন।

১৩০৯ বঙ্গাব্দে 'কুন্তলীন-পুরস্কার' প্রতিযোগিতার জন্য তিনি তাঁর আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে 'মন্দির' শীর্ষক একটি গল্প লেখেন। গল্পটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং সে বছরই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দে মাসিক পত্রিকা 'ভারতী'তে দ্বিতীয় গল্প 'বড়দিদি' প্রকাশিত হলে তাঁর প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রতিটি রচনাই চারদিকে তুমুল সাড়া জাগায় এবং একটির পর একটি বই বের হতে থাকে। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিত মশাই' (১৯১৪), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব ১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), 'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব ১৯১৮), 'ছবি' (১৯২০), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনা-পাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬), 'শ্রীকান্ত' (৩য় পর্ব ১৯২৭), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১), 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব ১৯৩৩), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'মেজদিদি' (১৯১৫), 'রামের সুমতি' ইত্যাদি ছোটদের জন্য লেখা তাঁর চমৎকার বই। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রে ও নাটকে রূপায়িত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক রচনাকর্মে বাঙালির নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের ঘরোয়া ও সামাজিক চিত্র এবং গ্রাম-বাংলার জীবনের সুখ-দুঃখের ছবি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মানবচরিত্রের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতির অসঙ্কোচ প্রকাশই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে নারীহৃদয়ের জটিল রহস্যের আলেখ্য রচনায় এবং স্নেহকাঙাল শিশু-কিশোর চরিত্র অঙ্কনে তিনি অনন্য। তাঁর ভাষা যেমন সহজ-সরল তেমনি

www.pathagar.com

গতিময়। সর্বোপরি তাঁর প্রতিটি রচনা মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। এই অসামান্য গুণের জন্য তিনি প্রবলভাবে পাঠকনন্দিত হন। তাঁকে অপরাজেয় কথাশিল্পীও বলা হয়ে থাকে।

শরৎচন্দ্র লেখালেখির পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধও তিনি লেখেন। তাঁর 'পথের দাবী' গ্রন্থটি বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনে লেখা বলে ব্রিটিশ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে।

১৯৩২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র)শরৎচন্দ্রকে জগত্তারিণী সুবর্ণপদক, ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (দ্র) বিশিষ্ট সদস্যপদ এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) ডি. লিট. উপাধি প্রদান করে। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় পুরস্কার পাঠকের ভালোবাসা। জীবৎকালে যেমন ছিলেন, এখনো তিনি তেমনি জনপ্রিয়।

১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি তিনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

সুজ. ব.

শরৎচন্দ্র বসু [১৮৮৯—১৯৫০]

অবিভক্ত বঙ্গের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও সাংসদ। জন্ম কলিকাতায় ১৮৮৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর।

১৯১৪ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে স্বদেশে ফিরে আইনজীবীর পেশা বেছে নেন। উল্লেখ্য, শরৎচন্দ্র বসু অবিভক্ত ভারতের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর (দ্র) অগ্রজ।

১৯১৮ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে (দ্র) যোগ দেন। মধ্য-বিশের দশকে গান্ধীসূচিত ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩২ সালে তিনি গোপনে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নানাভাবে সহায়তা করার অভিযোগে গ্রেফতার হন। ১৯৩৫ সালে মুক্তি পেয়ে নিযুক্ত হন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

আজীবন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রবক্তা শরৎচন্দ্র বসু ১৯৩৬-'৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের (দ্র) নেতৃত্বাধীন কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের চেষ্টা চালান। কিন্তু কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের নির্দেশে সেই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ফলে ফজলুল হক মুসলিম লীগের (দ্র) সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার গঠন করেন।

১৯৪১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদ থেকে মুসলিম লীগ পদত্যাগ করলে ফজলুল হক ও শরৎচন্দ্র বসু নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু শপথ নেওয়ার মাত্র তিন দিন আগে শরৎচন্দ্র বসু গ্রেফতার হওয়ায় সেই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালে তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারে মাত্র দু' মাসের জন্য তিনি মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

১৯৪৬ সালে শরৎচন্দ্র বসু বার্মায় (দ্র) আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের অসামরিক বন্দিদের জন্য মিত্রবাহিনীর কাছ থেকে সুবিচার আদায়ে বন্দিদের মুক্তি ও তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ আইনী ভূমিকা পালন করেন।

ভারতবিভাগ নিয়ে মতবিরোধের কারণে ১৯৪৭ সালের ৩রা জানুয়ারি তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল– ভারতবিভাগ নয়, দেশ হোক একটি ইউনিয়ন অব সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিক্স্। শেষ পর্যায়ে তিনি আবুল হাশিম (দ্র) ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির (দ্র) সঙ্গে মিলে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের আন্দোলনে ব্রতী হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও ফলপ্রসূ হয় নি।

১৯৪৭ সালে ভারত (দ্র) ও পাকিস্তান (দ্র) রাষ্ট্রের জন্ম হলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়, শরৎচন্দ্র বসু তা নিরসনে আন্তরিক ভূমিকা রাখেন।

শরৎচন্দ্র বসু রচিত গ্রন্থের নাম 'আই ওয়ার্ন্ মাই কান্ট্রিমেন'।

১৯৫০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তিনি কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

www.pathagar.com

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৯৯-১৯৭০]

কথাসাহিত্যিক। তিনি ১৮৯৯ সালের ৩০শে মার্চ পিতার কর্মস্থল বিহারের পূর্ণিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস উত্তর কলিকাতায় বরাহনগরে। তাঁর পিতার নাম তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৫ সালে মুঙ্গের জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। তিনি ১৯১৯ সালে বি.এ. এবং ১৯২৬ সালে পাটনা থেকে আইন পাশ করেন। এর পর ওকালতি শুরু করলেও আইন ব্যবসা তাঁর ভাল লাগে নি। ১৯২৯ সালে তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এর পাশাপাশি চিত্রনাট্য রচনার কাজও শুরু করেন। ১৯৪১ সালে কিছুদিন বোম্বাইয়ের আচারিয়া আর্ট প্রোডাকশনেও কাজ করেন।

১৯৫২ সাল থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ীভাবে পুনায় (এখন 'পুনে' বলে) বসবাস করতে থাকেন এবং সার্বক্ষণিক সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ছোটদের ও বড়দের উভয় ধরনের রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। তাঁর ছোটগল্প, বড়গল্প ও উপন্যাস ছাড়াও গোয়েন্দাগল্প ও রহস্যগল্প সুধী সমাজে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ডিটেকটিভ 'ব্যোমকেশ' ও 'বরদা' চরিত্র দু'টি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। ইতিহাসাশ্রিত সাহিত্য রচনায়ও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বড়দের জন্য রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'জাতিস্মর', 'বিষের ধোঁয়া', 'গৌড়মল্লার' 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' ইত্যাদি। বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে রচিত বইগুলোর মধ্যে 'ঝিন্দের বন্দী' (দ্র) উল্লেখযোগ্য।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুসাহিত্যও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ইতিহাস ও পুরাণের বিষয় নিয়ে রূপকথাধর্মী গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম অগ্রণী লেখক। তাঁর 'সদাশিব' চরিত্রটি বাংলা শিশুসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুজ. ব.

শরিফা আতা দ্র

শরীর গঠন (body-building)

সুন্দর সুঠাম দেহ সকলেরই কাম্য। বিশ্বে দেহ গঠনের উপর বহু ধরনের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এসব প্রতিযোগিতা দেশ, মহাদেশ ও বিশ্বভিত্তিক অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে এসব প্রতিযোগিতা দেহের উচ্চতা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে এগুলি দেহের ওজন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মহিলাদেরও দেহ গঠনের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। তাঁদের বেলায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হলে বিশ্বসুন্দরী বা কোনো দেশের মধ্যে হলে সেই দেশের সেরা সুন্দরী বলে খেতাব দেওয়া হয়। পুরুষদের বেলায় মিস্টার বাংলাদেশ, মিস্টার এশিয়া, মিস্টার ইউনিভার্স ইত্যাদি প্রতিযোগিতার প্রচলন রয়েছে। দেহ গঠনের প্রতিযোগিতায় বিচার্য হয় প্রতিযোগীর সমস্ত দেহের সমতা রক্ষা করে পেশির বর্ধন, নিম্নাঙ্গের সমতা বা পেশির বর্ধন, তারপর বুক, পিঠ, বাহুদ্বয় ও ঘাড়ের মাংসপেশির সমতা ও উন্নতি। ত্বকের মসৃণতা ও রং, পোজিং বা পেশিসমূহের বিশেষ প্রদর্শনীতে পারদর্শিতা আর সদা হাস্যমুখ—এই সব বিষয় বিচার করে এক জনকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুদেহী বলে নির্দিষ্ট করা হয়। সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে ১৯৫৩ সাল থেকে এবং স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে ১৯৭৩ সাল থেকে সিনিয়র ও জুনিয়র গ্রুপে দেহ গঠন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দেহ গঠনে খুব নিয়মনিষ্ঠ, কঠিন সাধনার দ্বারাই সফলতা লাভ করা সম্ভব। তা ছাড়া এতে পেশি গঠনকারী প্রচুর আধুনিক ব্যায়াম রয়েছে। এর জন্য সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয়ে থাকে। বর্তমানে দেশে 'মালটিজিম' নামক দেহ গঠনের সরঞ্জাম অনেকগুলি ব্যায়ামাগারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায় যে এই সব 'মালটিজিমের' সাহায্যে দেশে সুদেহীদের দেহ গঠনের পথ সুগম হবে।

কা. আ. আ.

শল্যচিকিৎসা / সার্জারি

চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় দেহে আঘাতজনিত অবস্থা ও

www.pathagar.com

অন্যান্য রোগের চিকিৎসা প্রধানত অস্ত্রোপচার এবং নানাবিধ ব্যবহারিক কলাকৌশলের (ম্যানিপুলেশন) সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাকে সার্জারি (surgery) বা শল্যবিদ্যা বলা হয়। ঔষধ এখানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শল্যচিকিৎসার ইতিহাস সম্ভবত ভেষজচিকিৎসার চেয়েও প্রাচীন। ধারালো পাথুরে ফলার ছুরি ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে ফোড়া কাটা, পূঁজাশয় (অ্যাব্‌সেস) পরিষ্কার করা, কাঁটা তোলা ও করোটি ছিদ্রণের মধ্য দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক শল্যচিকিৎসার সূচনা। এরপর মিশরের প্যাপিরাস গ্রন্থে এবং ব্যাবিলনের কাদামাটির তক্তির ওপরে লিখিত বিবরণে প্রাচীন শল্যচিকিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতের 'সুশ্রুত সংহিতা' গ্রন্থে এবং প্রাচীন চৈনিক রচনায়। গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিসের (দ্র) রচনায়ও গ্রিক শল্যচিকিৎসার পরিচয় মেলে।

ষোড়শ শতকে আন্দ্রেয়াস ভেসালিউসের (Andreas Vesalius) অ্যানাটমি শল্যচিকিৎসার নতুন সম্ভাবনার পথ তৈরি করে দেয়। সে সময় এবং এরপর থেকে প্রধানত ফরাসি ও ইংরেজ শল্যবিদগণের চেষ্টায় নতুন পথে শল্যচিকিৎসার যাত্রা শুরু। অস্ত্রোপচারে জীবাণুনাশক এবং সংজ্ঞাহীন করার জন্য ইথার ও ক্লোরোফর্মের (দ্র) ব্যবহার শল্যচিকিৎসায় আধুনিক যুগের সূচনা ঘটায়। এর ফলে সম্ভব হয় বেদনাহীন অস্ত্রোপচার। হ্রাস পায় ক্ষতসংক্রমণে মৃত্যুর হার। দেহের অভ্যন্তরে অস্ত্রচিকিৎসা, অঙ্গচ্ছেদ, টিউমার বা পাথুরি অপসারণ সহজ হয়ে ওঠে। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার প্রয়োজনও শল্যবিদ্যার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করেছে।

বিশ শতকের এক্স-রে চিত্রগ্রহণ, আলট্রাসনোগ্রাফি এবং অন্যান্য আধুনিক কৌশলাদি শল্যচিকিৎসার যথেষ্ট সহায়ক হয়ে উঠেছে। এমনকি দেহের স্বাভাবিক তাপ হ্রাস (হাইপোথার্মিয়া) মস্তিষ্কে (দ্র) ও হৃদ্‌যন্ত্রে অস্ত্রোপচার সম্ভব করে তুলেছে, যেমন যান্ত্রিক পাম্প ও অক্সিজেন যন্ত্র সাহায্য করেছে জটিলতর অস্ত্রোপচারে। এন্টিবায়োটিক (দ্র) এবং স্টেরয়েড গ্রুপের ঔষধের ভূমিকাও নিতান্ত কম নয়। এসবই আধুনিক প্রযুক্তির দান।

শল্যবিদ্যার এমনি নানামুখী উন্নতি মানবদেহের জীর্ণ ও অকেজো অঙ্গ বাতিল করে নতুন অঙ্গ সংযোজনের পথ দেখিয়েছে। যেমন কিডনি (দ্র), ফুসফুস (দ্র), হৃৎপিণ্ড (দ্র), যকৃৎ (দ্র) ইত্যাদি। একবিংশ শতাব্দীতে শল্যবিদ্যার অন্যতম লক্ষ্য সফল কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন।

আধুনিক শল্যবিদ্যা একাধিক ভাগে বিন্যস্ত; যেমন—ওপেন হার্ট সার্জারি, অর্থোপেডিক্স, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, প্লাস্টিক বা কসমেটিক সার্জারি ইত্যাদি। ফলে শল্যচিকিৎসা বিভিন্ন পথে মানবদেহকে সুস্থ ও সুগঠিত রাখার কাজে সাহায্য করে চলেছে।

আ. র.

শশাঙ্ক

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে রাজা শশাঙ্ক বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের নাম গৌড় (দ্র)। রাজা শশাঙ্কের বংশপরিচয় তেমন জানা যায় না। সম্ভবত তিনি গুপ্তবংশীয় কোনো রাজার মহাসামন্ত ছিলেন।

শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্ত এক মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে কনৌজ আক্রমণ করেন। কনৌজের রাজা যুদ্ধে মারা যান এবং রানী রাজ্যশ্রী বন্দি হন। রাজ্যশ্রী ছিলেন থানেশ্বররাজ প্রভাকর বর্ধনের কন্যা এবং হর্ষবর্ধনের ভগ্নী। ভগ্নীর বন্দি হওয়ার খবর পেয়ে হর্ষবর্ধন গৌড় আক্রমণ করেন। ভগ্নীকে তিনি উদ্ধার করেন, কিন্তু শশাঙ্ককে পরাজিত করতে পারেন নি। শশাঙ্ক ৬৩৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনভাবে গৌড়রাজ্য শাসন করেন। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটির নিকটবর্তী কর্ণসুবর্ণ। বাংলা ছাড়াও শশাঙ্কের রাজ্যের সীমানা ছিল উড়িষ্যা পর্যন্ত।

রাজা শশাঙ্ক এক জন সফল প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলার বাইরে গৌড় রাজ্যের সীমানা বিহার-উড়িষ্যা পর্যন্ত প্রসারিত করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আ. ই.

শসা

কিউকার্বিটেসি (Cucurbitaceae) গোত্রভুক্ত বর্ষজীবী লতানে গাছ। বাংলাদেশের (দ্র) প্রায় সর্বত্রই এর চাষ হয়। এর ইংরেজি নাম কিউকাম্বার (cucumber) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *কিউকিউমিস্ স্যাটাইভা*, লিন্ (*Cucumis sativa*, Linn)। আকর্ষীর সাহায্যে অবলম্বন বেয়ে এই গাছ এগিয়ে যায়। শসা গাছের ফিকে সবুজ পাতা পাঁচ কোণবিশিষ্ট এবং অনেকটা হৃৎপিণ্ডাকার। শসা গাছে পুরুষ ও স্ত্রীফুল আলাদা হয়। ফুল পীত বর্ণের হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে প্রধানত লম্বা ও খাটো ফলবিশিষ্ট দুই প্রধান জাতের শসা দেখা যায়। লম্বাটি শসা এবং খাটোটি খিরা নামে পরিচিত। খিরা দেখতে প্রায় গোলাকার।

গ্রীষ্ম ও শীত উভয় ঋতুতেই শসা উৎপাদিত হয়। কৃষি-পঞ্জিকা অনুযায়ী শসার বীজ লাগাবার সময় ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস। খাটো জাতের শসা পৌষ-মাঘ মাসে লাগিয়ে ফাল্গুন-চৈত্রে ফল তোলা যায়। আলো-বাতাস- পূর্ণ খোলামেলা জমিতে শসা ভাল জন্মে।

শসাতে ভিটামিন (দ্র) 'বি' ও 'সি' আছে। এ ছাড়া শসাতে প্রোটিন এবং বিভিন্ন প্রকার এনজাইম (দ্র) পাওয়া যায়। শসা সহজে হজম হয় এবং পেট ঠাণ্ডা রাখে। শসা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। কাঁচা শসা সালাদে এবং পাকা শসা তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শসা বেশ পুষ্টিকর।

মু. আ.

শহীদ

আরবি শব্দ, আভিধানিক অর্থ সাক্ষী, উপস্থিত, ধর্মের জন্য জীবনদাতা। ইসলামী পরিভাষায় শব্দটি যথেষ্ট গুরুত্ববহ। আল্লাহ্‌র (দ্র) পথে অর্থাৎ সত্য, ন্যায়, কল্যাণ তথা ইসলামী আদর্শ রক্ষার সংগ্রামে নিহত ব্যক্তিকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। ধর্মযুদ্ধে শহীদ ব্যক্তিরা পরজীবনে অশেষ সুখভোগ করবেন বলে কুরআন শরীফ (দ্র) ও হাদিসের (দ্র) সূত্রে জানা যায়।

অধুনা শব্দটির অর্থের বিস্তৃতি ঘটেছে। যে কোনো অন্যায়-অবিচার এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, বিশেষ করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবিসর্জনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বর্তমানে 'শহীদ' উপাধি প্রযুক্ত হয়। বাংলাদেশে এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'শহীদ' শব্দটির প্রচলন বেশ ব্যাপক।

মু. মা.

শহীদ দিবস ভাষা-আন্দোলন দ্র

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১ সালের এই তারিখেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় স্বাধীনতাবিরোধী দোসর রাজাকার (দ্র), আল-বদর (দ্র), আল্‌-শাম্‌স্‌ (দ্র)-এর সদস্যরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে ঢাকার মীরপুর ও রায়ের বাজারে হত্যা করে।

শুধু ঢাকা নয়, দেশের সর্বত্রই বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড চলে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হওয়ার দিন থেকেই। স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর থেকে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও বাঙালি স্বাধীনতাবিরোধীরা যখন বুঝতে পারে তারা নিশ্চিত হেরে যাচ্ছে, তখনই তারা পরিকল্পিতভাবে তালিকা তৈরি করে তাদের সহযোগীদের সাহায্যে বুদ্ধিজীবী হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবেই ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সর্বাধিক সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয় বলে দিনটি সরকারিভাবে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসাবে স্বীকৃত।

এ পর্যন্ত কত জন বুদ্ধিজীবী শহীদ হয়েছেন তার সঠিক হিসাব জানা সম্ভব হয় নি।

১৪ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে অন্যতম একটি শোকাবহ দিন।

র. হা.

রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের লাশ

www.pathagar.com

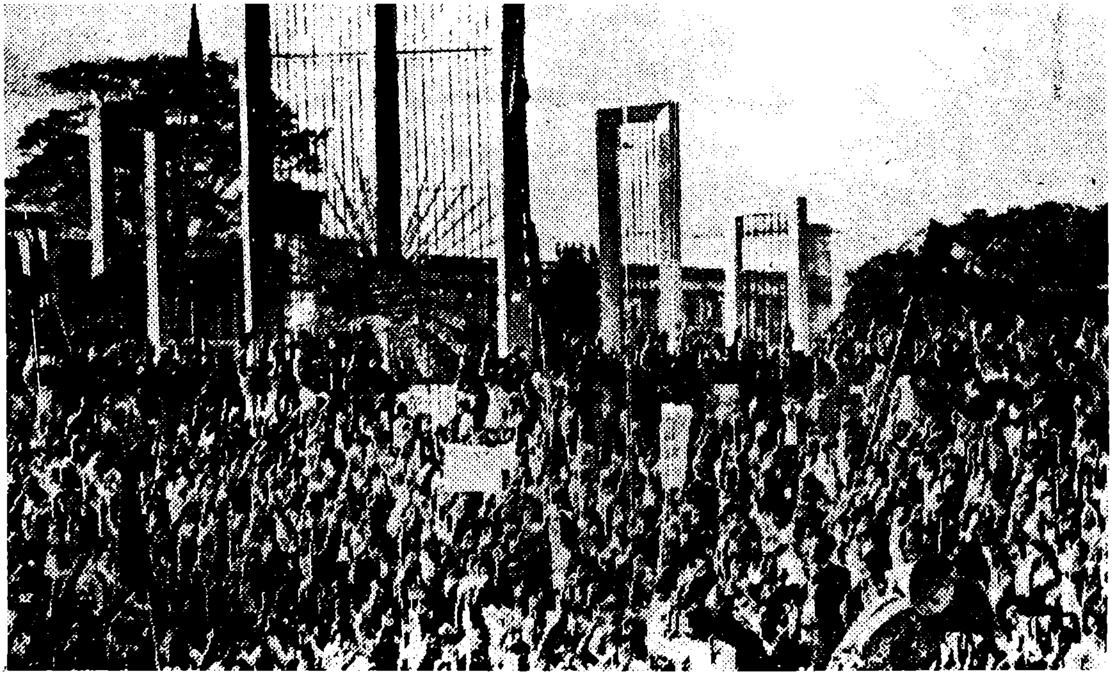

শহীদ মিনার

পাকিস্তানি আমলে পূর্ববাংলায় সংঘটিত ভাষা-আন্দোলনে (দ্র) নিহত শহীদদের স্মৃতি অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ।

শহীদ মিনার প্রথম তৈরি হয় ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল হোস্টেলের ছাত্রদের এক রাত্রির শ্রমে। পরিকল্পনা, স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ সবই সম্পন্ন হয় মেডিক্যাল ছাত্রদের উদ্যোগে ও চেষ্টায়। ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে ছাত্র-জনতার মৃত্যু এবং সেই উপলক্ষে মিছিলে-সমাবেশে উচ্চারিত স্লোগান 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক' সম্ভবত শহীদ মিনার তৈরির প্রেরণা যুগিয়েছিল।

মেডিক্যাল হোস্টেলে বারো ও তেরো নম্বর ব্যারাকের মাঝামাঝি শহীদের রক্তমাখা স্থানে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এর উচ্চতা ছিল সাড়ে দশ ফুট, চওড়া ছয় ফুট। এর গায়ে সাঁটা ফলকে লেখা ছিল 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ', যা পরে মুখে মুখে 'শহীদ মিনার'-এ পরিণত হয়।

www.pathagar.com

১৯৫২ সালে তৈরি এই মিনারের স্থায়িত্ব ছিল আড়াই দিন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি সকালে আজাদ-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন (দ্র) আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। সেদিনই শেষ বিকালে পুলিশ হোস্টেল ঘেরাও করে শহীদ মিনার ভেঙে ফেলে এবং সব ভাঙা খণ্ডগুলো ট্রাকে তুলে নিয়ে চলে যায়। তা সত্ত্বেও তখন সারা দেশে, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে, ছোট ছোট শহীদ মিনার গড়ে ওঠে এবং ১৯৫৩ সাল থেকে ছাত্র-যুব সমাজ ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনটিকে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করতে থাকে।

১৯৫৪ সালে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার দেড় মাস আয়ু নিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেও তা কার্যকর করে যেতে পারে নি। শহীদ মিনার তো নয়ই। প্রতিশ্রুত শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপিত হয় পূর্ববঙ্গে কৃষক-শ্রমিক পার্টির শাসনামলে। ১৯৫৬ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল ন'টায় মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার (দ্র), মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (দ্র) এবং শহীদ আবুল বরকতের (দ্র) মা হাসিনা বেগম যুক্তভাবে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ ছাড়া আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভাই একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারিভাবে 'শহীদ দিবস' হিসাবে এবং সরকারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেন।

এরপর আতাউর রহমান খানের (দ্র) আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু হয়। শিল্পী হামিদুর রহমানের পরিকল্পনা মাফিক ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কাজ চলে। শিল্পী নোভেরা আহমদের ভাস্কর্যসহ শহীদ মিনারের নির্মাণকাজ আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে সামরিক শাসন শুরু হলে মিনারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ এই চার বছর মানুষ এই অসম্পূর্ণ শহীদ মিনারেই ফুল দিয়েছে, সভা করেছে, শপথ নিয়েছে। ১৯৬২ থেকে '৬৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল আজম খানের উদ্যোগে শহীদ মিনারের একটি ছোটখাটো সংক্ষিপ্ত রূপ সম্পূর্ণ করা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি এই মিনার উদ্বোধন করেন শহীদ আবুল বরকতের ৭২ বছর বয়স্ক মা হাসিনা বেগম।

শহীদ বরকতের বৃদ্ধা মা ১৯৫৩ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে আসতেন (তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৭৮ খ্রি.). তাঁর পুত্র ও অন্যান্য শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতেন

১৯৬৩ থেকে ১৯৭১ এই শহীদ মিনারই ছিল এ দেশের সংগ্রামী মানুষের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস, আন্দোলনের বলিষ্ঠ প্রেরণা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গণহত্যা শুরু করার পর পাক সেনাবাহিনী শহীদ মিনার ভেঙে সেখানে 'মসজিদ'-এর পরিচয় বিজ্ঞপ্তি লিখে রাখে। কিন্তু বাংলাদেশ অর্জিত হবার পর এই ধর্মপ্রাণ দেশেও সেই 'মসজিদ' টেকে নি। এই ভাঙা মিনার চত্বরেই বাহাত্তর সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে শহীদ মিনারের পুরানো নকশা ও পরিকল্পনা নতুন করে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও তিয়াত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারির আগে খুব তাড়াহুড়া করে শহীদ মিনার তৈরি করা হয়, যা এখনো পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে গড়ে ওঠে নি। আশির দশকে এরশাদ-আমলে এর প্রাঙ্গণের বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু মূল শহীদ মিনার তেমনই রয়ে গেছে।

আ. র.

www.pathagar.com

শহীদ সাবের [১৯৩০—১৯৭১]

জন্ম ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০, চট্টগ্রামের ঈদগাঁ গ্রামে। তাঁর পূর্ণ নাম এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ, পিতার নাম সালামত উল্লাহ্। মাতার নাম শরিফা খাতুন। মৃত্যু ১৯৭১, ২৫শে মার্চ।

ঈদগাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু। সেখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে তিনি কলিকাতায় তাঁর পিতার কাছে চলে যান। সেখানে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্য- সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পার্ক সার্কাসের কালাহক্কাক লেনের ছোটদের আসর ও 'কিশোর সংঘ' নামে দু'টি কিশোর সংগঠনের তিনি সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন।

তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সময় তিনি 'মুকুল ফৌজ'-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৯-এ তিনি সরকারি কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তিনি ছাত্র ফেডারেশন-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতির ফলে তিনি কারাগারে আটক থাকেন। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল থেকে পরীক্ষা দিয়ে তিনি ১৯৫১ সালে আই. এ. পাশ করেন। ঐ সময় তাঁর রাজবন্দিজীবন সম্পর্কে লেখা 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৫৪ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জগন্নাথ কলেজের নৈশ বিভাগে বি. এ. ক্লাশে ভর্তি হন। তিনি ১৯৫৫ সালে বি. এ. পাশ করেন।

শহীদ সাবেরের কর্মজীবনের পরিধি খুব সংক্ষিপ্ত— ১৯৫৪/৫৫ থেকে ১৯৫৮/৫৯ পর্যন্ত। সাংবাদিকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম 'এক টুকরো মেঘ' ও 'ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান'।

তিনি 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় কর্মরত অবস্থায় সি. এস. এস. পরীক্ষা দেন। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষায় চোখের জন্য বাদ পড়েন। পরে তিনি ফেডারেল ইনফর্মেশন সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেও নানাবিধ কারণে নিয়োগপত্র পান নি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন চালু হলে তিনি চাকুরির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েন। এ বছরের শেষের দিকে তাঁর অসুস্থতা দেখা দেয়। তারপর জীবনের দীর্ঘ পথ টেনে-হিঁচড়ে 'সংবাদ' পত্রিকায় কর্মরত অবস্থায় ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চে পাকিস্তানি সৈন্যের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

'শহীদ সাবের গ্রন্থাবলী' বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আ. হা.

শহীদ সোহরাওয়ার্দি সোহরাওয়ার্দি, হোসেন শহীদ দ্র

শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের উপর একমাত্র জাদুঘর, 'শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা'। এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) শহীদ মিনারের চত্বরে অবস্থিত। এর শুরু ১৯৭৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। এর সংগ্রহের ব্যাপ্তি ধারাবাহিকভাবে ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত। এখানে সংগৃহীত নিদর্শনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা-আন্দোলন, পাঁচের ও ছয়ের দশকের বিভিন্ন গণ-আন্দোলন ও তার নথি, পুস্তক, মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ আলোকচিত্র, চিঠিপত্র, ডায়েরি, দলিল-দস্তাবেজ, পোস্টার, গণকবর থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন জিনিসপত্র, যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের অংশবিশেষ, শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন, তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস ইত্যাদি।

গণ-আন্দোলনে শহীদ নির্ভীক ও অকুতোভয় শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহার (দ্র) কর্মময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র, স্মৃতিচিহ্ন, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিবার-পরিজনের কাছে পাঠানো দেশ-বিদেশের শত শত শোকবার্তা, চিঠিপত্র ও অন্যান্য জিনিসের এক দুর্লভ সংগ্রহ রয়েছে এই সংগ্রহশালায়। এ ছাড়াও অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে শেখ মুজিবর রহমানের (দ্র) রাজনৈতিক জীবন ও কর্মজীবনের অনেক মূল্যবান ছবি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও সেক্টর কমাণ্ডারদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে রাখা হয়েছে। এই জাদুঘরে প্রবেশ করলে এক নজরে মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

এ সংগ্রহশালার জন্য আরো সংগ্রহ করা হয়েছে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের তৈলচিত্র, ছাপচিত্র, জলছাপ ও ভাস্কর্যের নির্দশন, যেগুলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। যেসব শিল্পীর শিল্পকর্ম রয়েছে তাঁরা হলেন আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী (দ্র), দেবদাস চক্রবর্তী, মোস্তফা মনোয়ার, হাশেম খান, রফিকুন নবী, মাহমুদুল হক, আবু তাহের, মোস্তাফা আজিজ প্রমুখ। তা ছাড়া ১৯৯১ সালে এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা পাঠাগার'। সেখানে রয়েছে এ পর্যন্ত প্রকাশিত ভাষা-আন্দোলন (দ্র), গণ-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কয়েক হাজার বই, পত্র-পত্রিকা। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক গবেষণাধর্মী কাজে এ পাঠাগার ও জাদুঘরকে ব্যবহার করতে পারেন।

এই সংগ্রহশালার সম্মুখভাগেই একটি মনোরম পরিবেশে রাখা আছে শহীদ মিনারের শিল্পী মুর্তজা বশীরের বিখ্যাত ম্যুরাল। শিল্পী ফণীন্দ্রনাথ রায়ের আরেকটি ম্যুরাল সংগ্রহশালার দেয়ালে আছে।

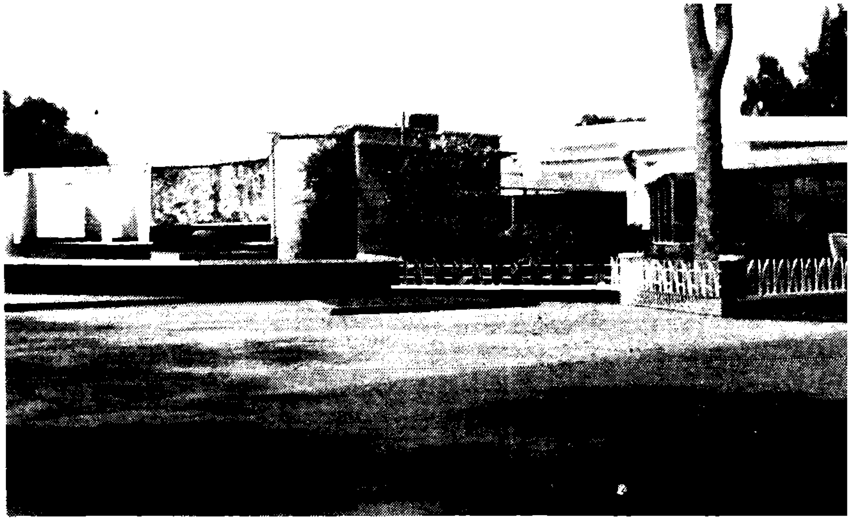

শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা – রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে শিল্পী মূর্তজা বশীরের ম্যুরাল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত এই শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা একটি দর্শনীয় নিদর্শন ও সংগ্রহশালা।

ম. আ. খা.

শহীদুল্লা কায়সার [১৯২৭—১৯৭১]

শহীদুল্লা কায়সার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) এক জন মহান শহীদ। তিনি বাংলাদেশের প্রথম সারির লেখকদের এক জন। স্বাধীনতা লাভের দু' দিন আগে অর্থাৎ ১৯৭১-এর ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধীরা

www.pathagar.com

তাঁকে তাঁর বাসা থেকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং মেরে ফেলে। তখন বাংলাদেশের বড় বড় লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, তাঁদের সবাইকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে স্বাধীনতাবিরোধীরা। শহীদুল্লা কায়সার এ জঘন্য লোকদের হাতে শহীদ হন। তাঁকে খুঁজতে গিয়ে তাঁর ছোট ভাই প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও লেখক জহির রায়হানও (দ্র) নিখোঁজ হয়ে যান।

শহীদুল্লা কায়সার ১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) পড়তে যান। এখান থেকে ১৯৪৬ সালে অর্থনীতি বিষয়ে বি. এ. অনার্স ডিগ্রি নিয়ে তিনি এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু বেশি দিন এম. এ. ক্লাসের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন নি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৭-এ দেশ ভাগ হয়ে যায়। তখন বাংলাদেশ পড়ে পাকিস্তানের মধ্যে এবং এর নাম হয় প্রথমে পূর্ববঙ্গ, পরে পূর্ব-পাকিস্তান। শহীদুল্লা কায়সার কলিকাতা (দ্র) থেকে ঢাকায় এসে জীবন গড়ার প্রস্তুতি নেন। সাংবাদিকের কাজ নেন তিনি। তখন মওলানা ভাসানীর (দ্র) উদ্যোগে 'ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রকাশ চলছে। শহীদুল্লা কায়সার প্রথমে এই পত্রিকায় কাজ পান। এর পরে ১৯৫৮ সনে তিনি দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত 'সংবাদে' কর্মরত ছিলেন। 'সংবাদ' পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের এক জন ছিলেন তিনি। 'সংবাদ'-এ চাকুরি করার সঙ্গে তিনি লেখার কাজও চালিয়ে গেছেন।

পাকিস্তানি আমলে এ দেশের জনগণকে নানাভাবে অত্যাচার ও পীড়ন করা হয়েছিল। যে জন্য পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কোনো সুফল জনগণ ভোগ করতে পারে নি। সে জন্য ঐ সময়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল। শহীদুল্লা কায়সার সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা ভাবতেন। সে কারণে তিনি ঐসব গণ-আন্দোলনের এক জন সমর্থক ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি সাম্যবাদী আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হন। সে জন্য তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন এবং ছাত্র থাকা অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে কর্মজীবনের বিভিন্ন সময়ে শহীদুল্লা কায়সার পাকিস্তানি আমলের শাসকদের কুনজরে পড়েন। তখন তাঁর উপর দমন-পীড়ন ও অত্যাচার নেমে আসে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় ভাষা-আন্দোলন হয়েছিল। ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে

সাংবাদিকদের আন্দোলন-মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শহীদুল্লা কায়সার (বামদিক থেকে তৃতীয়)

তাঁকে বন্দি করে জেলে নেওয়া হয়। এরপর তিনি আরো কয়েক বার জেল খাটেন।

বামপন্থী রাজনীতির প্রতি তাঁর পক্ষপাত তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি খুব সুন্দর উপন্যাস লিখেছেন। 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত বই। এ উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মানুষের জীবনসংগ্রাম কখনো থেমে যায় না।

'সারেং বৌ' (১৯৬২) তাঁর আরেকটি উপন্যাস। এই উপন্যাসের ভিত্তিতে একটি সুন্দর সিনেমাও হয়েছে। শহীদুল্লা

www.pathagar.com

কায়সারের আর দু'টি বইয়ের নাম 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ' ও 'রাজবন্দীর রোজনামচা'। শহীদুল্লা কায়সার এক জন প্রগতিশীল লেখক ছিলেন। সে জন্যই বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীরা তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

আ. ক.

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ [১৮৮৫—১৯৬৯]

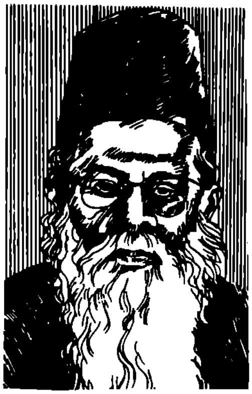

উপমহাদেশের এক জন সম্মানিত ভাষাতাত্ত্বিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য যে ঐতিহাসিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তার সূচনা যাঁদের চিন্তা থেকে তিনি তাঁদের পুরোধা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই শুক্রবার চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মফিজউদ্দীন আহমদ, মায়ের নাম হুরুন্নেসা। পিতা ছিলেন পীর গোরাচাঁদের দরগাহের খাদেম। পিতামহ খাদেম ছিলেন, প্রপিতামহও খাদেম ছিলেন। উর্ধ্বতন ছয় পুরুষ পর্যন্ত তাঁরা এই পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি জ্ঞানচর্চা ও ভাষাচর্চার দিকে এগিয়ে এলেন। ছেলেবেলায় বাড়িতেই উর্দু (দ্র), আরবী (দ্র) ও ফার্সি শিখেছিলেন। মৌলভি সাহেবের মার খাওয়ার ভয়ে তিনি স্কুলে সংস্কৃত ভাষা (দ্র) নিয়েছিলেন দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে। ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে এফ. এ. পাশ করে বি. এ. পড়ার জন্য হুগলি কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে। পরে কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন; সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পান।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তিনি সংস্কৃতে এম. এ. পড়বেন। সংস্কৃত ভাষায় দখল মজবুত হলে বেদ পড়তে

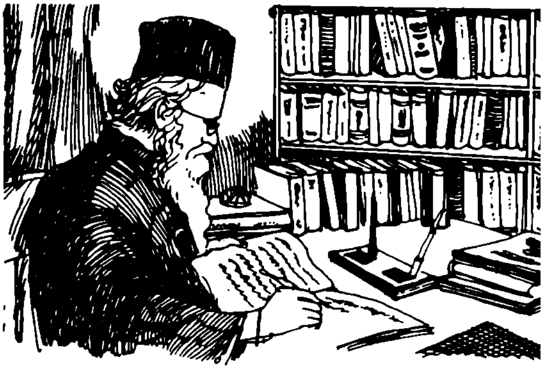

লেখার টেবিলে বহু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

পারবেন, কালিদাস পড়তে পারবেন, উপনিষদ পড়তে পারবেন। সমস্যা হল বেদ পড়া নিয়ে। সেকালে লোকে বিশ্বাস করতেন, বেদ পাঠের অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণের। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যেহেতু ব্রাহ্মণ নন, সুতরাং বেদ পড়ার অধিকার তাঁর নেই। পণ্ডিত অধ্যাপকও শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে তাঁকে বেদ পড়াতে সম্মত হলেন না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃপক্ষ তাঁকে নব প্রতিষ্ঠিত 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব' বিভাগে ভর্তি হতে অনুরোধ করেন। তিনি সানন্দে সে অনুরোধ রক্ষা করেন। ১৯১০ সালে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে প্রথম ও একমাত্র ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। দু'বছর পর ১৯১২ সালে যথারীতি তিনি এম. এ. পাশ করেন। স্বাস্থ্য ভালো না থাকায় সংস্কৃত পড়ার জন্য জার্মানিতে যাওয়ার বৃত্তি পেয়েও যেতে পারলেন না। ১৯১৪ সালে তিনি বি. এল. পাশ করেন। কিছুদিন চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার পর বসিরহাটে তিনি ওকালতি শুরু করেন। ওকালতিতে তিনি আনন্দ পান নি। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন গবেষণা করার জন্য বৃত্তি লাভ করেন, তখন আগ্রহভরে সেখানে যোগদান করেন। প্রখ্যাত গবেষক রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের (দ্র) তত্ত্বাবধানে শরৎকুমারী লাহিড়ী গবেষণাসহায়ক পদে কাজ শুরু করেন। এই সময়ে তিনি শিশুদের জন্য 'আঙুর' নামের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয়। তরুণ পণ্ডিত শহীদুল্লাহ বাংলার লেকচারার বা প্রভাষক হিসাবে সেখানে নিয়োগ লাভ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

তাঁর কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অতিবাহিত হয়। ১৯২৬ সালে তিনি ফরাসি দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যান। প্যারিসের বিখ্যাত সোর্বোন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমাও অর্জন করেন। কিছুদিন জার্মানির ফ্রাইবুর্গেও পড়াশোনা করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দশন চর্যাপদ সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেন। এই গবেষণার জন্য তিনি তিব্বতি ভাষাও শিখেছিলেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনেকগুলো ভাষা জানতেন, সে জন্য তাঁকে বহুভাষাবিদ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, তিনি মোট ১৮টি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এতগুলো ভাষায় দক্ষ হওয়ার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করা তাঁর জন্য খুবই সহজ হয়েছিল।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আরবি মাধ্যমে ইসলামী শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ফার্সিভাষা জানার ফলে পারস্যের নামিদামি সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের সাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা দেশবাসীকে জানানোর জন্য সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, আল-এসলাম, কোহিনূর, মোহাম্মদী, মাহে-নও প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। ইসলাম (দ্র) ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি গ্রামে-গঞ্জে ওয়াজের মাহফিলেও অংশগ্রহণ করতেন এবং বক্তৃতা দিতেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শুধু শিক্ষক ছিলেন না, শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করেছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ হল সলিমুল্লাহ হলের হাউজ টিউটর ছিলেন; পরে ১৯৪০ সালে ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি থেকে অবসরগ্রহণের পর বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবন ছিল কর্মবহুল। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর সব কাজের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তিনি এমন কতকগুলো কাজ করেছিলেন যাতে এ দেশের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়। এসব কাজের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই পরামর্শ অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকর বিবেচনা করে এর প্রতিবাদ করেন। তিনি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন। তাঁর এই মত সমাজ ও রাজনীতিতে প্রাধান্য লাভ করে এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের সমাপ্তিতে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবি স্বীকৃত হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বেশ কাজে লেগেছিল।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করেছেন। 'বুড্ডিস্ট মিস্টিক সংস' নাম দিয়ে চর্যাপদের অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন ইংরেজিতে। ফার্সি কাব্যের অনুবাদ করেছেন। সারা জীবন জ্ঞানসাধনা করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬৯ সালের ১৩ই জুলাই চুরাশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলা, ইংরেজি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। শহীদুল্লাহ রচনাবলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বহুল পরিচিত কয়েকটি গ্রন্থ হল—'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৫০), 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' (১৯৩৮), 'বাঙালা ব্যাকরণ' (১৩৪২), 'রকমারী' (১৯৩২), 'আমাদের সমস্যা' (১৯৪৫), 'পদ্মাবতী' : প্রথম খণ্ড (১৯৫০), 'বিদ্যাপতি শতক' (১৯৫৪), 'বাংলা সাহিত্যের কথা : ১ম খণ্ড' (১৯৫৩), 'বাংলা সাহিত্যের কথা : ২য় খণ্ড' (১৯৬৫), 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৩৬৫), 'Essays on Islam' (1945), 'Buddhist Mystic Songs' (1960)।

ম. মু.

শাক-সবজি

রান্না করে খাওয়ার যোগ্য লতাপাতার নাম শাক। এ ছাড়া যেসব উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের অংশ রান্না করে তরকারি বা কাঁচা অবস্থায় সালাদ হিসাবে খাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধারণভাবে সবজি বলা হয়। শাক-সবজি শর্করা, আমিষ, চিনি এবং খাদ্যের প্রধান দু'টি উপাদান ভিটামিন (দ্র) ও খনিজ লবণে সমৃদ্ধ। তবে এতে নায়াসিন্, রাইবোফ্লাভিন, থায়ামিন্ এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি' বেশি থাকে। সবজির সূপ (soup)

www.pathagar.com

অনেক দেশে খাদ্যের বিশেষ উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সবজির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেওয়া হল :

১. পাতা সবজি

ক. পালং শাক : চেনোপোডিয়েসি গোত্রভুক্ত একটি শীতকালীন সবজি। এর ইংরেজি নাম স্পিনাজ (spinach). মার্কিনেরা বলে স্পিনাচ এবং বৈজ্ঞানিক নাম *স্পাইনেসিয়া ওলারেসিয়া (Spinacea oleracea)*। এর পাতা শাক হিসাবে খাওয়া হয়। পালং শাক খুব সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

খ. পুঁই শাক : ব্যাসেলেসি (Baselaceae) গোত্রভুক্ত একটি লতাজাতীয় উদ্ভিদ। এর ইংরেজি নাম ইণ্ডিয়ান স্পিনাজ (Indian Spinach) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *ব্যাসেলা রুব্রা (Basella rubra)*। এর পাতা ও কাণ্ড সবজি হিসাবে খাওয়া হয়।

গ. লেটুস : কম্পোজিটি গোত্রভুক্ত একটি শীতকালীন সবজি। এর ইংরেজি নাম গার্ডেন লেটুস (Garden lettuce) ও বৈজ্ঞানিক নাম *ল্যাক্টুকা স্যাটাইভা (Lactuca sativa)*। এর পাতা সালাদেই বেশি ব্যবহার করা হয়।

ঘ. বাঁধাকপি : ক্রুসিফেরি (Cruciferae) গোত্রভুক্ত শীতকালীন সবজি। এর ইংরেজি নাম ক্যাবেজ (cabbage) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *ব্রাসিকা ওলারেসিয়া ক্যাপিটেটা (Brassica oleracea capitata)*। কুণ্ডলিত অবস্থায় একত্রে জড় হয়ে থাকা এর পাতা সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এ ছাড়া সর্ষে শাক, লাউ শাক, সজিনা শাক, কচু শাক, কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক, লাল শাক, মটর শাক ও কাঁটানটে শাক উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী।

২. মূলা সবজি

ক. মূলা : ক্রুসিফেরি (Cruciferae) গোত্রভুক্ত একটি বর্ষজীবী শীতকালীন বীরুৎ। এর ইংরেজি নাম র‍্যাডিশ (radish) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *র‍্যাফানাস্ স্যাটাইভাস্ (Raphanas sativus)*। মূলার কচি পাতা শাক এবং সঞ্চয়ী প্রধান মূল সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

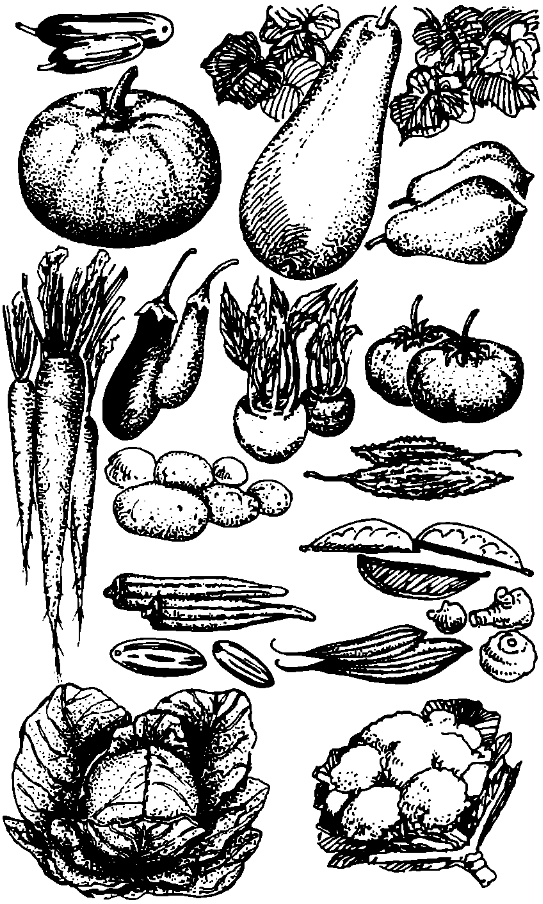

নানা রকম শাক-সবজি

খ. গাজর : আম্বেলিফেরি (Umbelliferae) গোত্রভুক্ত একটি বর্ষজীবী বীরুৎ। এর ইংরেজি নাম ক্যারট্ (carrot) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *ডওকাস ক্যারোটা এল (Doucas Carota L)*। এর হলদে-লাল রঙের সঞ্চয়ী মূল সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

গ. শালগম : ক্রুসিফেরি (Cruciferae) গোত্রভুক্ত একটি শীতকালীন বর্ষজীবী বীরুৎ। এর ইংরেজি নাম টার্নিপ (turnip) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *ব্রাসিকা ক্যাম্পেসট্রিস্ ভ্যার টার্নিপ (Brassica Campestris var turnip)*। এর সঞ্চয়ী মূল সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ঘ. বীট: চেনোপোডিয়েসি (Chenopodiaceae)

www.pathagar.com

গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ। এর ইংরেজি নাম সুগার বীট (sugar beet) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *বিটা ভাল্‌গারিস্ (Beta vulgaris)*। এর সঞ্চয়ী মূল সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বীট থেকে চিনিও তৈরি করা হয়।

৩. কাণ্ড সবজি

ক. কচু : অ্যারেসি (Araceae) গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ। এর ইংরেজি নাম অ্যারাম্ (Aram) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *কলোক্যাসিয়া এস্কুলেন্টা (Colocessia esculenta)*। কচু অনেক প্রকার। এর কাণ্ড সবজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

খ. মানকচু : অ্যারেসি (Araceae) গোত্রভুক্ত অপর এক উদ্ভিদ। *অ্যালোক্যাসিয়া ইণ্ডিকা (Alocassia indica)* এর বৈজ্ঞানিক নাম। এর বড় কাণ্ড রান্না করে সবজি হিসাবে খাওয়া হয়।

গ. ডাঁটা : অ্যামারান্থেসি (Amaranthaceae) গোত্রভুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম অ্যামারান্থাস্ গ্যাঞ্জেটিকাস্ এল *(Amaranthas gangeticas. L)*। এর কাণ্ড সবজি এবং পাতা শাক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ঘ. গোল আলু : সোলানেসি (Solanaceae) গোত্রভুক্ত একটি বর্ষজীবী বীরুৎ। এর ইংরেজি নাম পোটেটো এবং বৈজ্ঞানিক নাম *সোলানাম টিউবারোসাম (Solanum tuberosum)*। এটি ভূনিম্নস্থ টিউবার জাতীয় কাণ্ড এবং তা সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৪. ফুল সবজি : ফুলকপি দ্রষ্টব্য।

৫. ফল সবজি : ফল সবজির সংখ্যা অনেক। এগুলোর মধ্যে কুমড়া, চালকুমড়া, শসা (দ্র), শিম (দ্র) ও টমেটোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ গ্রন্থের অন্যত্র দেওয়া আছে। এখানে আরো কয়েকটির গোত্রসহ বৈজ্ঞানিক নাম (বৈ. না.) উল্লেখ করা হল :

ক. বেগুন : গোত্র–সোলানেসি, বৈ. না. –*সোলানাম্ মেলঙ্গেনা (Solanum melongena)*।

খ. কাঁচাকলা : গোত্র–মুজেসি, বৈ. না.–*মুজা প্যারাডাইসিয়াকা (Masa paradisiaca)*

গ. ঢেঁড়শ : গোত্র–মাল্‌ভেসি, বৈ. না.– *অ্যাবেল্‌মস্কাস্ এস্কুলেন্টাস (Abelmoscus esculentus)*।

ঘ. পেঁপে : গোত্র–ক্যারিকেসি, বৈ. না.–*ক্যারিকা পাপায়া (Carica papaya)*।

ঙ. বরবটি : গোত্র–প্যাপিলিওনেসি, বৈ. না.– *ভিগ্‌না সাইনেন্সিস্ (Vigna sinensis)*।

চ. লাউ : গোত্র–কিউকার্বিটেসি, বৈ. না.– *ল্যাজেন্নারিয়া ভাল্‌গারিস্ (Lagenenaria vulgaris)*।

ছ. পটল : গোত্র–কিউকার্বিচেসি, বৈ. না.– *ট্রাইকোপ্যান্থেস্ ডাইওকা (Trichopanthes Dioca)*।

জ. ঝিঙা : গোত্র–কিউকার্বিটেসি, বৈ. না.– *লুফ্‌ফা অ্যাকিউট্যাঙ্গুলা (Luffa acutangula)*।

ঝ. করলা : গোত্র–কিউকার্বিটেসি, বৈ. না.– *মমর্ডিকা ক্যারানশিয়া (Momordica charantia)*।

ঞ. কাঁকরোল : গোত্র–কিউকার্বিটেসি, বৈ. না.– *মমর্ডিকা কচিন্‌চাইনেন্সিস্ (Momordica cochinchinensis)*।

ড. মুকুল সবজি : পিঁয়াজের কলি সবজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

মু. আ.

শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধ দ্র

শাখানদী নদী দ্র

শান্তিনিকেতন

'শান্তিনিকেতন' শুরুতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) নির্মিত একটি বাড়ি ছিল। এই বাড়িটির নাম থেকেই ধীরে ধীরে আশ্রম, বিদ্যালয়, পোস্ট অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড, এমনকি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিরও নামকরণ হয়েছে। বোলপুর স্টেশনের নাম হয়েছে 'বোলপুর, শান্তিনিকেতন'। ১৮৬৩ সালে রায়পুরের জমিদার প্রতাপনারায়ণ সিংহের কাছ থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর মৌজার ভুবনডাঙা গ্রামে ২০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত নেন। মহর্ষি প্রথমে এখানে একটি একতলা বাড়ি তৈরি করেন। এই বাড়িটিই 'শান্তিনিকেতন'

www.pathagar.com

নামে পরিচিত ছিল। 'শান্তিনিকেতন'কে কেন্দ্র করে একটি আশ্রম গড়ে তোলার পরিকল্পনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল। তিনি একটি ট্রাস্ট গঠনের মাধ্যমে এই বাড়ি ও সংলগ্ন জমি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

১৮৯১ সালে এখানে ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) এখানে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে এই বিদ্যালয়ই 'বিশ্বভারতী' (দ্র) বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। প্রতি বছর এখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মে (দ্র) দীক্ষা-দিবস (৭ই পৌষ) উপলক্ষ করে পৌষমেলা উদ্‌যাপিত হয় এবং তখন ৩/৪ দিন ধরে মেলা ও কুটিরশিল্প প্রদর্শনী চলে।

মে. খা.

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ

শাপলা

নিমফিয়েসি (Nymphaeaceae) গোত্রভুক্ত এক প্রকার নোঙ্গরাবদ্ধ (যে উদ্ভিদের মূল পানির নিচের মাটিতে এবং পাতা পানির উপরে ভাসমান থাকে) পরিচিত উদ্ভিদ। এ গোত্রের ৪০টিরও বেশি প্রজাতির জলজ উদ্ভিদের সাধারণ নাম ওয়াটার লিলি (Water Lily)। পৃথিবীর প্রায় সমগ্র গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শাপলা জন্মে। বাংলাদেশের (দ্র) খাল, বিল, হাওর, ঝিল, পুকুর, দিঘি ও অন্যান্য পরিত্যক্ত জলাভূমিতেও শাপলা জন্মে থাকে। এর মূল বা শিকড় পানির নিচে মাটিতে লেগে থাকে। অপর দিকে এর বড় ও পুরু পাতা পানির উপরে প্রায় সমান্তরালভাবে ভাসমান থাকে। এর কার্ডেট বা হৃৎপিণ্ডাকার (বা প্রায় গোলাকার) পাতার ফলকের ব্যাস ১৫–২০ সেমি হয়ে থাকে।

শাপলার পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে খাড়াভাবে ফুটে থাকা ফুলের সৌন্দর্য অতীব মনোরম। শাপলা ফুল সাদা, হলুদ, ফ্যাকাশে লাল, টকটকে লাল, রক্তবর্ণ বা কালচে লাল, বেগুনি লাল, নীল, নীল-বেগুনি, রক্ত বেগুনি প্রভৃতি রঙের হয়ে থাকে। শাপলার কয়েকটি প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম নিম্নরূপ :

১. *নিম্ফিয়া লোটাস, এল (Nymphaea lotus. L)।* ইংরেজিতে এর নাম পণ্ড লিলি এবং বাংলা নাম শালুক, শাপলা।
২. *নিম্ফিয়া রুব্রা রক্সব (Nymphaea rubra Roxb)।* ইংরেজি নাম রেড ওয়াটার লিলি এবং বাংলা নাম রক্তকমল।
৩. *নিম্ফিয়া স্টিলেটা ওয়াইল্ড (Nymphaea Stellata Wild)।* ইংরেজি নাম ব্লু ওয়াটার লিলি (Blue Water Lily) এবং এর বাংলা নাম শালুক, নীল শালুক।
৪. *নিম্ফিয়া আলবা লিন (Nyaphaea alba Linn)।* বাংলাদেশের জাতীয় পুষ্প (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৯১ : ৪) সাদা রঙের, পানিতে ভাসমান শাপলার বৈজ্ঞানিক নাম *নিম্ফিয়া নৌচালি, (Nymphaea nouchali)।* সাদা রঙের শাপলাই সচরাচর বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় চোখে পড়ে।

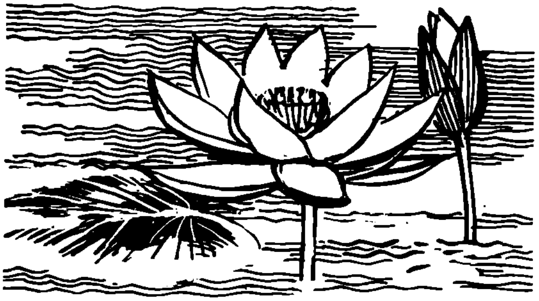

www.pathagar.com

এ ফুল প্রধানত বর্ষাকালের (জুলাই মাসের) ফুল। এ ফুল ৩০ সেমি পর্যন্ত বড় হয়ে থাকে।

শাপলার পুষ্পদণ্ড বিভিন্ন অঞ্চলে তরকারি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শাপলার পরিপক্ব ফলের ভেতরের ছোট ছোট দানা রোদে শুকিয়ে ভাজলে উন্নত মানের খৈ পাওয়া যায়। এ খৈ গ্রামাঞ্চলে অনেকের কাছে বেশ প্রিয়।

মু. আ.

শাফি'ঈ, ইমাম [?– ৮২০]

ইমাম শাফি'ঈ (র.) মুসলমানদের চার ইমামের (দ্র) অন্যতম ইমাম, শাফি'ঈ মজহাব বা মতবাদের স্থপতি। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ। তাঁর পিতার নাম ইদ্রিস।

তিনি মক্কায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর জন্মতারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি কুরাইশ বংশের লোক ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স.) (দ্র) এর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল বলেও জানা যায়।

তাঁর প্রথম জীবন খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তবু তাঁর ছিল প্রগাঢ় জ্ঞানতৃষ্ণা। তিনি হাদিস (দ্র), ফিক্‌হ এবং আরবি সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

তাঁর মতবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হল : ধর্মীয় বিধি-বিধান আলোচনা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উদারনীতি অবলম্বন, স্বাধীনভাবে আইন উদ্ভাবন ও তৎকালে সংগৃহীত হাদিস অনুসরণের নীতি গ্রহণ করে একটি মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন।

ইমাম শাফি'ঈ (র.) ৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

শাবাশ বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'শাবাশ বাংলাদেশ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) মতিহার সবুজ চত্বরে প্রধান ফটকের বাঁয়ে মুক্তাঙ্গনের উত্তর পাশে অবস্থিত। দু'পাশেই দেবদারুর সারি। মাঠের সম্মুখপ্রান্তে বড় বড় কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষ। রাজশাহী-নাটোর-পাবনা-ঢাকা প্রধান সড়ক থেকে দেখা যায়, রাইফেল হাতে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্মারক ভাস্কর্য আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) চেতনা ও সংগ্রামের প্রতীক। আর এটি নির্মাণ করেছেন ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী নিতুন কুণ্ডু।

এই ভাস্কর্যের উদ্যোক্তা রাকসু (RUCSU = Rajshahi University Central Students' Union)। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও অর্থানুকূল্যে এবং দেশের ছাত্র-জনতার অর্থসাহায্যে শিল্পী নিতুন কুণ্ডু বিনা পারিশ্রমিকে এই ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শহীদজননী জাহানারা ইমাম (দ্র)১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ তারিখে।

শাবাশ বাংলাদেশ : শিল্পী নিতুন কুণ্ডু

এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম ভাস্কর্য। প্রায় দেড় বছর ধরে শিল্পী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন। মাটি থেকে ৪ ফুট উঁচু ৪০ ফুট মাপের একটি বর্গক্ষেত্রাকার বেদির উপরে ভাস্কর্যটি স্থাপিত। বেদিতে চারটি স্তর রয়েছে। আড়াই ফুট, তিন ফুট, সাড়ে তিন ফুট এবং শেষে চার ফুট উচ্চতায় এই বেদি বা মঞ্চ, যেখানে ভাস্কর্যটিকে

www.pathagar.com

পেছনে রেখে সভা বা অনুষ্ঠান করা যাবে। এই মঞ্চের উপরেই তৈরি করা হয়েছে দু'জন মুক্তিযোদ্ধার মূর্তি। এক জন অসম সাহসের প্রতীক। অন্য মুক্তিযোদ্ধার হাত বিজয়ের উল্লাসে মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে পতাকার লাল সূর্যের মাঝে। এক জন মুক্তিযোদ্ধার উচ্চতা পনেরো ফুট। এক জন মুক্তিযোদ্ধা নগ্নপদ, লুঙ্গিপরা—গ্রামবাংলার প্রতীক। রাইফেল ডান হাতে, মুষ্টিবদ্ধ বামহাত, মাথায় তার গামছা বাঁধা। অন্য মুক্তিযোদ্ধা কিছুটা সামনে ঝুঁকে আছে, প্যান্ট পরা—শহরের প্রতীক, ডান হাতে রাইফেল, কোমরে গামছা, এলোকেশ। এ দু'টি মূর্তির ঠিক পেছনে আছে ছত্রিশ ফুট উঁচু, আট ফুট চওড়া, তিন ফুট পুরু দেয়াল। সবচেয়ে উপরে আছে পাঁচ ফুট ব্যাসের একটি গোলাকার শূন্যতা, যা বাংলাদেশের পতাকার লাল সূর্যের প্রতীক। ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয়েছে সিমেন্টের সঙ্গে বিদেশী লাল পাথর মিশিয়ে ছাঁচে ঢালাই পদ্ধতিতে, যেখানে রড ও পাইপ সংযোজিত করা হয়েছে। এর নির্মাণশৈলীতে নেই কোনো খাদ। এই ভাস্কর্যের মধ্যেই অমর হয়ে আছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) শাশ্বত ইতিহাস, যে ইতিহাস জন্ম দিয়েছে বাংলাদেশ (দ্র) নামে একটি দেশ।

ম. আ. খা

শামসুজ্জোহা, শহীদ ড. [১৯৩৪—১৯৬৯]

১৯৬৯-এর শহীদ এবং অধ্যাপক। ১৯৩৪ সালের ৫ই আগস্ট পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাঁকুড়ায় পড়াশোনা শেষ করে ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে রসায়নে অনার্স ও ১৯৫৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। '৫৭ সালে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ থেকে বি. এসসি. (অনার্স) এবং ১৯৬৪ সালে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

বিনয়ী, সদালাপী ও ক্রীড়ামোদী ড. শামসুজ্জোহা ১৯৬১ সালের মার্চে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন, ১৯৬৬ সালে রিডার পদে উন্নীত হন। একই বছরের ডিসেম্বরে প্রভোস্ট হিসাবে নিযুক্তি পান। ১৯৬৮ সালের ১লা মে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টরের দায়িত্ব লাভ করেন। '৬৮ সালের শেষদিক থেকে

পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রাজধানী ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র গণ-অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। এই ক্ষুব্ধ পরিবেশে ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (দ্র), ২৪শে জানুয়ারি কিশোর মতিউর রহমান মল্লিক (দ্র) এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক (দ্র) শাহাদাত বরণ করেন।

এই আন্দোলনের ঢেউ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কেও স্পর্শ করে। ছাত্ররা সমাবেশ ও মিছিল করে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে ছাত্ররা মিছিল নিয়ে সমবেত হলে সেনাবাহিনী বাধা দেয়। ড. শামসুজ্জোহা তখন ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু উপস্থিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তখন সৈন্যেরা তাঁকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। মৃত্যুর কিছু আগে তিনি সমবেত ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি গুলি চলে, তবে কোনো ছেলের গায়ে লাগবার আগে তা আমার গায়ে লাগবে।' তাঁর কথা ঠিক হয়েছিল, শহীদ হয়ে তিনি তা প্রমাণ করেছেন।

হা. র.

শামসুননাহার মাহমুদ [১৯০৮—১৯৬৪]

বাঙালি নারীসমাজে শিক্ষাবিস্তার ও নারীজাগরণের ক্ষেত্রে অগ্রপথিক মহিলা। ১৯০৮ সালে নোয়াখালি জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মোহাম্মদ নূরুল্লাহ চৌধুরী ও মাতা আসিয়া খাতুন চৌধুরানী। তাঁর পিতৃ-মাতৃ উভয় পরিবারে পুরুষ সদস্যরা ছিলেন উচ্চ

www.pathagar.com

শিক্ষিত, উদার ও প্রগতিশীল। তাঁর পিতামহ মৌলবি ফজলুল করিম বি. এ. বি. এল ছিলেন মুন্সেফ এবং মাতামহ খানবাহাদুর আবদুল আজিজ বি. এ. ছিলেন শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারক।

অতি অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটলে শামসুননাহার মাতামহের স্নেহে লালিত-পালিত হন। মাতামহের উৎসাহেই চট্টগ্রামে (দ্র) তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। চট্টগ্রাম শহরের খাস্তগীর স্কুলে পড়াশোনা করলেও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর ১৯২৭ সালে ডা. ওহীদুদ্দিন মাহমুদ নামে শিক্ষানুরাগী ও উদার এক যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ হলে তিনি স্বামীর কর্মস্থল কলিকাতায় চলে যান। স্বামীর উৎসাহে সেখানে তিনি ডায়োসেশান কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৮ ও ১৯৩২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি যথাক্রমে আই. এ. ও বি. এ. পাশ করেন। এর দশ বছর পর ১৯৪২ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে তিনি বাংলায় এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক–সাহিত্যিক হবীবুল্লাহ বাহার (দ্র) ছিলেন শাসসুননাহারের বড় ভাই। তাঁর প্রভাবে শামসুননাহারও শৈশবে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। প্রথম জীবনে রচিত তাঁর কবিতা-প্রবন্ধ চট্টগ্রামের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আই. এ. পড়ার সময় তিনি 'নওরোজ' ও 'আত্মশক্তি' নামে দু'টি মাসিক পত্রিকার মহিলা বিভাগ সম্পাদনা করতেন। বি. এ. পাশ করার পর তিনি বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'বুলবুল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে থাকেন। এর পাশাপাশি নিজের লেখালেখির কাজও চালিয়ে যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম 'পুণ্যময়ী' (১৯২৫), 'রোকেয়া-জীবনী' (১৯৩৭), 'বেগম মহল' (১৯৩৮), 'ফুল বাগিচা', 'আমার দেখা তুরস্ক' ইত্যাদি। তাঁর সাহিত্যচিন্তার মূল বিষয় ছিল নারীপ্রগতি ও দেশপ্রেম।

বেগম ক্লাবের অনুষ্ঠানে (১৩৬১ ব.) বেগম সুফিয়া কামালের পাশে শামসুননাহার মাহমুদ

সাহিত্যচর্চার সূত্রে শামসুননাহার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) সান্নিধ্য লাভ করেন। বেগম রোকেয়ার (দ্র) সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। বেগম রোকেয়া তাঁকে সমাজসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মুসলিম নারীসমাজে শিক্ষা ও জাগরণের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে রোকেয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সম্পাদিকা মনোনীত হন। ভারতবিখ্যাত মহিলা প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখায়ও যোগ দেন।

১৯৩৯ সালে মুসলমান মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের (দ্র) প্রচেষ্টায় কলিকাতায় লেডি ব্রার্বোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে শামসুননাহার সেই কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। অবশ্য তখনও তিনি এম. এ. পাশ করেন নি। পূর্বের পরীক্ষাসমূহের ফলাফল, সাহিত্যক্ষেত্রে সুনাম ও সাংগঠনিক কার্যে দক্ষতার জন্য তিনি এই পদ লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তাঁকে ঢাকা ইডেন গার্লস কলেজে বদলি করা হলে তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রী নারীসমাজের উন্নতির জন্য 'অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন' (A.P.W.A) নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করলে শামসুননাহার এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬১ সালে তাঁর চেষ্টায় 'পঙ্গু শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র' স্থাপিত হয়। এ ছাড়া তিনি

www.pathagar.com

তৎকালীন পূর্ব- পাকিস্তানের নারীমুক্তি আন্দোলন ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পাকিস্তান জাতীয় আইনসভা ও পারিবারিক আইন সংশোধন কমিশনের সদস্য ছিলেন।

শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ সরকার শামসুননাহারকে এম. বি. ই. (MBE= Member of the Order of the British Empire) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' (মরণোত্তর) প্রদান করে। তাঁর স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ছাত্রীহলের নাম রাখা হয়েছে শামসুননাহার হল।

১৯৬৪ সালের ১০ই এপ্রিল শামসুননাহার পরলোকগমন করেন।

সুজ. ব.

শায়ের দোভাষী সাহিত্য দ্র

শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খান মোগল আমলের এক জন স্বনামখ্যাত সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের (দ্র) পত্নী সম্রাজ্ঞী মমতাজ (দ্র) মহলের ভাই। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান (দ্র) ছিলেন তাঁর ফুপু। শায়েস্তা খানের পিতার নাম আসফ খান।

মোগল রাজপরিবারের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার কারণে শায়েস্তা খানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব যেমন ছিল, তেমনি স্বীয় যোগ্যতা, দক্ষতা ও বুদ্ধিবলেও তিনি সাম্রাজ্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ দাযিত্ব পালন করেছিলেন। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের (দ্র) বিশেষ প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

মারাঠার জাতীয় নেতা ও দুর্ধর্ষ সমরনায়ক শিবাজীকে (দ্র) দমনের জন্য ১৬৬০ সালে আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে দাক্ষিণাত্যের (দ্র) শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি এ সময় রাজধানী পুনাসহ শিবাজী-অধিকৃত প্রায় সবগুলি দুর্গ পুনর্দখল করেন।

শায়েস্তা খানের খ্যাতি মূলত বাংলার সুবাদার হিসাবেই। দু'দফায় সর্বমোট ২২ বছর সুবাদার হিসাবে তিনি বাংলায় শাসন করেন– প্রথম বার ১৬৬৪ সাল থেকে ১৬৭৮ সাল. এবং দ্বিতীয়বার ১৬৮০ সাল থেকে ১৬৮৮ সাল।

সুবাদার শায়েস্তা খান ব্যক্তিগত জীবনে আরাম-আয়েশ ও বিলাসপ্রিয় হলেও শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, তেজস্বী ও বুদ্ধিমান।

তাঁর আমলে চট্টগ্রাম মোগল শাসনাধীনে আসে (১৬৬৬ সাল)। তখন এর নতুন নাম হয় ইসলামাবাদ। তিনি বেশ ক'টি বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। তাঁর দৈনিক রাজস্ব আয় ছিল দু' লক্ষ টাকা, আর ব্যয় এক লক্ষ টাকা। দান-দক্ষিণা ও প্রজাদের নানাবিধ কল্যাণে অর্থ ব্যয় করতেন মুক্ত হস্তে। তাঁর সময়ে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাদরদী শাসক।

তাঁর নির্মিত অনেক সুন্দর সুন্দর ইমারত তাঁর স্থাপত্যপ্রীতি ও শিল্পরুচির পরিচয় বহন করে। এগুলোর মধ্যে হোসেনী দালান (১৬৭৬ খ্রি.), মিটফোর্ডে শায়েস্তা খানের মসজিদ (১৬৬৪ খ্রি.), ছোট কাটরা (১৬৬৪ খ্রি.), মোহাম্মদপুরের সাত গম্বুজ মসজিদ (১৬৮০ খ্রি.), নলগোলা শাহী মসজিদ (১৬৮০ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য।

ঢাকার লালবাগে শায়েস্তা খানের সদর দপ্তর ছিল। সেখানে অবস্থিত তাঁর বাসভবন এখন জাদুঘরে রূপান্তরিত।

১৬৮৮ সালে তাঁকে আগ্রায় বদলি করা হলে বাংলায় তাঁর সুবাদারির অবসান ঘটে।

মু. মা.

শারীরতত্ত্ব (physiology)

দেহযন্ত্রের কার্যক্রম বুঝে নেবার জ্ঞান শারীরতত্ত্বের (ফিজিয়োলজি) অন্তর্গত। শারীরতত্ত্বের জ্ঞান দেহযন্ত্রগুলোর কাজের নীতি, পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বুঝতে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত। দেহের কাজকর্মের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে কোষ। একই ধরনের কোষের সমষ্টি নিয়ে কোষকলা (টিসু) গঠিত। বিভিন্ন ধরনের কোষকলা দ্বারা দেহযন্ত্র গঠিত।

মানবশরীরের জ্ঞান বড়ই জটিল। শরীরের প্রধান যন্ত্র ও কোষকলার (টিসু) কাজকর্মকে শারীরতত্ত্ববিদেরা কয়েকটি প্রধান তন্ত্রে (system) ভাগ করেছেন, যেমন– কঙ্কাল ও পেশিতন্ত্র, যা দেহের মৌলিক গঠন ও নড়া-চড়াকে নিয়ন্ত্রণ করে; পরিপাকতন্ত্র (দ্র), যা খাদ্যর পরিপাক নিয়ন্ত্রণ করে; শ্বসনতন্ত্র (দ্র), যা দেহের শ্বাসপ্রশ্বাস ও খাদ্যের দহন নিয়ন্ত্রণ করে; রক্তসংবহন-তন্ত্র (দ্র), যা রক্ত সঞ্চলনের সঙ্গে সম্পর্কিত; স্নায়ুতন্ত্র (দ্র), যা দেহের সমগ্র ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক কাজকর্মের চালক; রেচনতন্ত্র (দ্র), যা দেহের বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশনের দায়িত্ব পালন করে; অন্ত:স্রাবীতন্ত্র, যা অন্যান্য তন্ত্রের রাসায়নিক চালক হিসাবে কাজ করে। এ ছাড়াও রয়েছে রক্তগঠনতন্ত্র, লসিকাতন্ত্র (দ্র), প্রজননতন্ত্র ইত্যাদি। এই তন্ত্রগুলো পরস্পর সম্পর্কিত এবং এদের কাজও সমন্বিতভাবে চলে। এই সমন্বিত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, মানুষ সুস্থ ও সচল জীবনযাপন করে।

শু. চৌ.

শারীরসংস্থান (anatomy)

শরীরের আকার, আকৃতি ও গঠন নিয়ে যে বিজ্ঞান, এক কথায় তার নাম শারীরসংস্থান, ইংরেজিতে ‘এনাটমি’। গ্রিক শব্দ ‘এনাটমি’র অর্থ ব্যবচ্ছেদ করা, কাটাকুটি করা অর্থাৎ কেটেকুটে দেহের গঠন সম্পর্কে জানা। আন্দ্রেয়াস ভেসালিউস (Andreas Vesalius) নামে এক জন শারীরবিজ্ঞানী বহুসংখ্যক মানুষের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে ১৫৪৩ সালে মানবদেহের কাঠামোর উপর বই লিখে প্রথম আধুনিক ‘এনাটমি’র গোড়াপত্তন করেন।

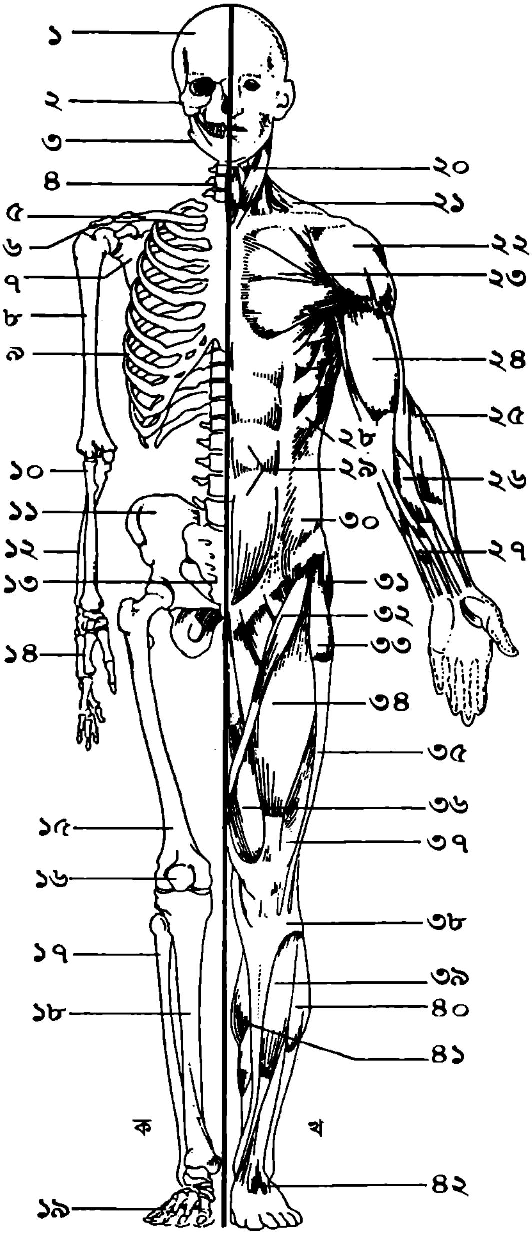

প্রধান অস্থিসমূহ এবং উপরতলীয় পেশি (সামনা-সামনি ছবি)

A. প্রধান অস্থিসমূহ। B উপরতলীয় পেশিসমূহ।

A. ১. করোটির সম্মুখভাগ, ২. কপোলাস্থি ৩. হনু (চোয়াল) ৪. গ্রীবা কশেরুকা, ৫. কণ্ঠাস্থি. ৬. অংসফলক (অ্যাক্রোমিয়ন অংশ) ৭. অংসফলক ৮. প্রগণ্ডাস্থি ৯. পাঁজরের হাড় ১০. বহিঃ-প্রকোষ্ঠাস্থি ১১. শ্রোণীচক্রের সম্মুখ অংশ ১২. অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি ১৩. ত্রিকাস্থি ১৪. করকূর্চাস্থি ১৫. উর্বস্থি ১৬. মালাইচাকি ১৭. অণুজঙ্ঘাস্থি ১৮. জঙ্ঘাস্থি ১৯.পদকূর্চাস্থি। B. ২০. স্টার্নোম্যাস্টয়েড ২১. ট্র্যাপিজিয়াস ২২. ডেল্টয়েড ২৩. প্রধান ক্ষপেশি ২৪. দ্বিশীর্ষ বাহুপেশি ২৫. ব্র্যাকিয়োর‍্যাডিয়ালিস ২৬. ফ্লেক্সর কার্পাই র‍্যাডিয়ালিস ২৭. ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম সাবলিমিস ২৮. সেরেটাস অ্যান্টিরিয়ার ২৯. উদরের লম্বাপেশি ৩০. এক্সটার্নাল ওবলিক ৩১. উরুর লম্বাপেশি ৩২. সারটোরিয়াস ৩৩. টেন্সর ফ্যাসাল্যাটা. ৩৪. উরুর লম্বাপেশি ৩৫, ফ্যাসাল্যটা ৩৬, ভাস্টাস মিডিয়ালিস ৩৭. ভাস্টাস ল্যাটারালিস ৩৮. জঙ্ঘ-কণ্ডরার সংযুক্তি ৩৯. জঙ্ঘাস্থির সম্মুখস্থপেশি ৪০. অণু-জঙ্ঘাস্থি সংলগ্ন লম্বাপেশি ৪১. জঙ্ঘার দ্বিশীর্ষ পেশি ৪২. পায়ের প্রতিনমক কণ্ডরা।

www.pathagar.com

শারীরসংস্থান বলতে আমরা আরো বুঝি গোটা দেহের আকার–আকৃতি, বিভিন্ন দেহযন্ত্রের গঠন এবং কোষকলা (টিস্যু) ও কোষের গঠন ও উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান। দেহযন্ত্রগুলো তাদের কাজের দিক থেকে একাধিক 'সিস্টেম' বা দেহতন্ত্রে বিন্যস্ত। যেমন দেহকঙ্কাল ও পেশিতন্ত্র।

২০৬টি অস্থি নিয়ে গঠিত আমাদের দেহকঙ্কাল। অস্থির কাজ দেহকাঠামো গঠন, দেহযন্ত্রের সংরক্ষণ, এমনকি অস্থিমজ্জা থেকে রক্তকোষ লোহিত কণিকা (দ্র) তৈরি করা। অস্থিগুলো পরস্পরযুক্ত অস্থিবন্ধনী পেশির সাহায্যে। পেশি দেহের অস্থিই ঢেকে রাখে না, দেহের যাবতীয় চলচ্ছক্তি ও কর্মতৎপরতা সম্পন্ন করে। দেহযন্ত্রগুলোতেও রয়েছে মসৃণ পেশি।

সিস্টেমিক এনাটমিতে তেমনি রয়েছে হৃৎপিণ্ড (দ্র)। ধমনী (দ্র), শিরা (দ্র), জালক ইত্যাদি নিয়ে রক্তসঞ্চালন তন্ত্র, যার প্রধান কাজ প্রতিটি অঙ্গে ও কোষে রক্ত পৌঁছে দেওয়া। রয়েছে ফুসফুস (দ্র), ক্লোমনালি, মধ্যচ্ছদা, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে গঠিত শ্বসনতন্ত্র (দ্র); মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত পরিপাকতন্ত্র (দ্র); বৃক্ক, মূত্রথলি, মূত্রনালি নিয়ে গঠিত রেচনতন্ত্র (দ্র), বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির (দ্র) তন্ত্র, প্রজননতন্ত্র, সর্বোপরি মস্তিষ্ক (দ্র), সুষুম্না কাণ্ড (দ্র) ও অসংখ্য স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুসূত্র নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র (দ্র), যা গোটা দেহতন্ত্রের পরিচালক বলা যায়।

কোষকলা বা টিস্যুর গঠন সম্বন্ধে গবেষণার ফলাফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শারীরসংস্থানের অন্য একটি দিক কলাতত্ত্ব বা 'হিস্টোলজি'। ইতালীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী মার্সেল্লো মাল্‌পিজি (Marcello Malpighi) এবং ফরাসি চিকিৎসাবিজ্ঞানী ফ্রাঁসোয়া বিশা (Francois Bichat)-র হাত দিয়েই এনাটমির এই শাখাটির প্রতিষ্ঠা।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (দ্র) আবিষ্কারের পর এই শাখাটির বিস্তার ঘটেছে দেহযন্ত্রের প্রাথমিক একক কোষের আকার-আকৃতি ও গঠন নিয়ে গবেষণায়। জন্ম নিয়েছে কোষতত্ত্ব। একালে এসে শক্তিশালী ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ আবিষ্কারের পর কোষের ভেতরকার সূক্ষ্ম উপাদান সম্পর্কেও জানা সম্ভব হয়েছে।

সুস্থ দেহযন্ত্রের পাশাপাশি রোগের আক্রমণে অসুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং. কোষকলার পরিবর্তন নিয়ে গবেষণার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মর্বিড এনাটমি' নামক শাখা। এই শাখার প্রথম পত্তন করেন ইতালীয় শারীরবিজ্ঞানী বাতিস্তা মর্গানি (Batista Morgagni), আঠারো শতকে। পরে এর বিকাশ ঘটান ইংরেজ শল্যবিদ (সার্জন) জন হাণ্টার (John Hunter)।

এ ছাড়াও অন্যান্য জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের জন্য রয়েছে তুলনামূলক শারীরস্থানবিদ্যা (কম্পারেটিভ এনাটমি)। এমনি শাখায় বিস্তৃত রয়েছে শারীরস্থান সংক্রান্ত জ্ঞানের চর্চা।

শু. চৌ.

শার্লক্ হোম্‌স্ (Sherlock Holmes)

আর্থার্ কোনান্ ডয়েল্

স্যার আর্থার্ কোনান্ ডয়েল্ সৃষ্ট ইংরেজি সাহিত্যের (দ্র) বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র। তাঁর 'এ স্টাডি ইন স্কার্লেট' (A Study in Scarlet) বই প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। সেই উপন্যাসে শার্লক্ হোম্‌স্ চরিত্রের জন্ম। লেখকের সৃষ্ট অন্য একটি চরিত্র ড. জন এইচ. ওয়াটসন্ লণ্ডনের ২২১বি বেকার স্ট্রিটে হোম্‌সের সঙ্গে একত্রে থাকত। এখানে লেখকের চারটি দীর্ঘ কাহিনীর সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে 'দ্য হাউণ্ড অব দ্য বাস্কারভিল্‌স্' সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে। এই গোয়েন্দা উপন্যাস ১৯০২ সালে ছাপা হয় এবং ১৯১৭ সালে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। এ ছাড়া লেখকের পাঁচ খণ্ড গল্পসঙ্কলনে শার্লক্ হোম্‌স্ দুর্ধর্ষ সব গোয়েন্দাগিরি করে পাঠকদের মোহিত করেছে। শার্লক্ হোম্‌স্‌কে লেখক এক কাহিনীতে মেরে ফেলেছিলেন, কিন্তু ভক্ত পাঠকদের প্রবল অনুরোধে তিনি হোম্‌স্‌কে আবার বাঁচিয়ে তুলে বাহিনীতে ফিরিয়ে আনেন। হোম্‌সের গোয়েন্দাগিরিপদ্ধতি ছিল তুচ্ছাতিতুচ্ছ সূত্র ধরে অপরাধীকে শনাক্ত করে সমস্যার সমাধান করা। হোম্‌স্ চরিত্র থেকে অনেক লেখক গোয়েন্দাগল্প লেখার প্রেরণা লাভ করেছেন, অন্তত ডজন খানেকের মতো ক্লাব ও সমিতি সৃষ্টি হয়েছে, অজস্র সিনেমা তৈরি হয়েছে। সিনেমায় হোম্‌স্ চরিত্রে অভিনয় করে বাসিল রথ্‌বোন্ (Basil Rathbone) সবচেয়ে সুখ্যাতি লাভ

www.pathagar.com

করেছেন। পুলিশের গোয়েন্দারা পর্যন্ত হোম্‌স্ চরিত্র থেকে প্রভূত উপকৃত হয়েছে। আর পাঠকের কাছে শার্লক্ হোম্‌স্ একটি কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বি. ব.

শালগাছ

ডিপ্টেরোকারপেসি (Dipterocarpaceae) পরিবারভুক্ত সোজা গুঁড়ি-বিশিষ্ট বৃক্ষ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *শোরিয়া রোবাস্টা (Shorea robusta)*। এর উচ্চতা ২৫ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর শাখা-প্রশাখা কম। শাল গাছের কাণ্ডের বেড় প্রায় ২–৩ মিটার।

বাংলাদেশে (দ্র)) ঢাকা (দ্র) ও ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী মধুপুর জঙ্গল এবং রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বনাঞ্চলে এ গাছ বেশি জন্মে। শীতকালে শালগাছের পাতা ঝরে যায়। শালপাতার দৈর্ঘ্য ১৫ থেকে ২৫ সেমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। শালপাতা ব্যবহার করে ঠোঙ্গা ও বিড়ি-চুরুট বানানো হয়।

শালকাঠ খুব মজবুত, টেকসই ও ভারী। সার কাঠের রঙ খয়েরি এবং অসার কাঠের রঙ সাদা। সার কাঠ পরিমাণে খুব বেশি থাকে। রেলপথের স্লিপার, কড়ি-বরগা, নৌকা ও আসবাবপত্র তৈরিতে শালকাঠ ব্যবহৃত হয়। এ কাঠ থেকে খুব ভালো মানের কাঠকয়লা পাওয়া যায়। শালগাছের কাণ্ড থেকে তেলযুক্ত এক ধরনের রেজিন (দ্র) পাওয়া যায়। এর নাম ধুনো শাল দামার। ধুনো পোড়ালে ঘ্রাণযুক্ত ধোঁয়া পাওয়া যায়। পাতিত করার পর এ গাছের ধুনো থেকে প্রাপ্ত উদ্বায়ী তেল ব্যবহার করে শাল আতর বানানো হয়। কার্বন পেপার, টাইপ রাইটারের রিবন ও জুতার কালি তৈরিতেও শালের রজন ব্যবহৃত হয়। শালগাছের ফুল হলুদ বর্ণের। শালগাছের বীজ থেকে প্রাপ্ত স্নেহজাতীয় একপ্রকার পদার্থ রান্নাবান্নায় এবং চকোলেট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

শালগাছের বাকলে শতকরা ৯ ভাগ ট্যানিন থাকে। তাই গাছ কাটার পর এর বাকল সংগ্রহ করা হয়। পরে সেই বাকলের সাহায্যে চামড়া ট্যান করা হয়। শালগাছের বাকল থেকে এক ধরনের লাল রঞ্জকও পাওয়া যায়। এ গাছের বাকল দিয়ে ট্যান করা চামড়া লাল রঙ ধারণ করে।

মু. আ.

শালবন বিহার

কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতীর অল্প উঁচু টিলায় শালবন বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত। বর্গাকারে তৈরি এই বিহারের প্রত্যেক বাহু ৫৫০ ফুট লম্বা। বিহারের সর্বমোট কক্ষ ১১৫টি। এতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা লেখাপড়া, ধর্মচর্চা ও বসবাস করতেন। উত্তর দিকে মাঝামাঝি জায়গায় একটি মাত্র সদর দরজা। বেষ্টনী দেয়াল ১৬.৫ ফুট পুরু। কক্ষের আয়তন ১২×১২ ফুট। দেয়াল ৫ ফুট পুরু। প্রত্যেক কক্ষে ৩টি করে কুলুঙ্গী, তাতে থাকত বুদ্ধমূর্তি, তেলের প্রদীপ।

এই বিহার নির্মিত হওয়ার পর আরো পাঁচ বার এটি নতুন করে কারুকাজে সজ্জিত করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্দির উত্তর-দক্ষিণে ১৬৮ ফুট ও পূর্ব–পশ্চিমে ১১০ ফুট চওড়া ছিল। বিহারের ভেতর হলঘর ও দু'টি ছোট ছোট মন্দির আছে। এখানে পাওয়া গেছে প্রাচীনকালের হাতিয়ার, তাম্রলিপি, মুদ্রা, অলঙ্কার, ১৫০টির বেশি ব্রোঞ্জের মূর্তি, পোড়ামাটির ফলকচিত্র, মাটির পাত্র, আরব দেশের একটি মুদ্রা ইত্যাদি। পোড়ামাটির ফলকে আছে মেয়ে-পুরুষ, যোদ্ধা, নর্তকী। আছে আধা মানুষ, আধা পশু ও কিন্নরী,

শালবন বিহারের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলকচিত্র

www.pathagar.com

শালবন বিহার—ময়নামতি

সিংহ, হরিণ, ঘোড়া, মোষ, শুয়োর, বানর, রাজহাঁস, সাপ, নেউল, কাছিম এবং পদ্মফুল। পাশে স্থাপিত ময়নামতী জাদুঘরে এসব জিনিসের কিছু কিছু রক্ষিত আছে।

দেব বংশীয় এক রাজা খ্রিস্টীয় ৮ম শতকে এই বিহার নির্মাণ করেন। তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, তাঁর নাম শ্রীভবদেব। এই বিহার ৪০০ বছর টিকে ছিল। ১৩ শতকের প্রথম দিকে শ্রীরণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেব নামক রাজার সময় পর্যন্ত এই বিহার সগৌরবে বর্তমান ছিল। তারপর এই বিহার রাজপৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

বি. ব.

শালিক

শালিক গায়ক পাখি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *স্টার্নিডি (sturnidae)* সুন্দর শালিকগুলোর বাস ভারত উপমহাদেশে। 'ময়না' শালিকের গোত্রভুক্ত। ময়নাসহ দু-তিন প্রজাতি কথা বলতে পারে। দুলে দুলে হাঁটে। উচ্চৈঃস্বরে ডাকে। প্রজাতির সংখ্যা শতাধিক।

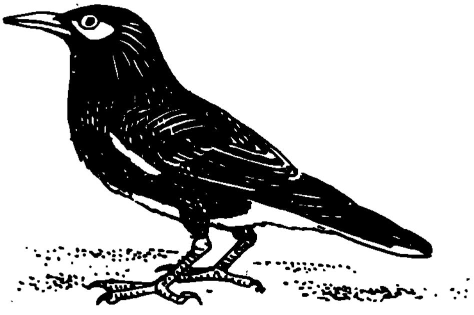

শক্ত ঠোঁট। সুন্দর চোখ। রঙ হয় প্রজাতিভেদে সাদা, কালো, বাদামি ইত্যাদি। খয়েরি রঙ বেশি। ময়না এ গোষ্ঠীর বড় পাখি। ছোট হচ্ছে বামন শালিক। স্টার্লিংও ছোট। লম্বায় ২১ সেন্টিমিটার।

বন-বাগান, মাঠঘাট ও নদীতীরে থাকে। বাড়ির আশেপাশে, শহরেও থাকে।

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ময়না, ভাত শালিক (সাধারণ ময়না), গ্রেহেডেড ময়না, গুব্‌রে শালিক (গাইড ময়না), ঝুঁটি শালিক (জাঙ্গাল ময়না) ইত্যাদি। শালিক পোকা-মাকড়, কীটপতঙ্গ (দ্র), ছোট ছোট ফল ও ফুলের মধু খায়, শস্যদানাও খায়।

শালিকের কণ্ঠ মিষ্টি। পিইও, চ্‌ব্‌র, রাডিও, কুইও হচ্ছে ডাকার শব্দ। বাসা করে দর-দালানের ফাঁক-ফোঁকরে, গাছের খোঁড়লে। কেউ নদী বা হ্রদের পাড়ে গর্ত করে, পাহাড়-টিলায়ও গর্ত করে।

ডিমের রঙ নীলাভ। সংখ্যায় ২-এর কম নয়, ৬-এর বেশি নয়। সাপ-বেজি তাড়াতে ওস্তাদ। সাহসী পাখি। হলুদাভ ঠোঁট। লাল পা।

পোষ মানে। তাল-খেজুরের রসও খায়। ভাত শালিক ৩৮ সেন্টিমিটার লম্বা হয়।

৬ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে। কেউ কেউ শীতে পরিযায়ী হয়। বাংলাদেশে ৮টি প্রজাতি আছে।

শ. খা.

শাহ আমানত আমানত শাহ দ্র

www.pathagar.com

শাহ পরান

শাহ পরান (রা.) হযরত শাহজালাল(রা.)-এর সমসাময়িক এক জন কামেল দরবেশ। হযরত শাহজালাল (রা.) যখন ইসলাম (দ্র) প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর ইয়েমেন থেকে শ্রীহট্টে (সিলেটে) আসেন, অন্যান্য সঙ্গীসাথীর সঙ্গে শাহ পরানও তখন তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন। জানা যায়, শাহ পরান (রা.) ছিলেন শাহজালাল (রা.)-এর ভাগ্নে এবং বিশিষ্ট শিষ্য। সিলেটের একটি আঞ্চলিক গানে উভয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পীর হযরত শাহজালাল (রা.)-এর সান্নিধ্যে থেকে শাহ পরান মা'রেফাতের (তত্ত্বজ্ঞান) গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে।

কথিত আছে, অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন সংক্রান্ত একটি ঘটনায় পীর শাহজালাল (রা.) শাহ পরানের ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে স্বাধীনভাবে অন্যত্র গিয়ে সাধনা ও মানুষকে হেদায়েত করার নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শাহ পরান সিলেট শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের চূড়ায় আস্তানা স্থাপন করেন এবং ইসলামের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তাঁর মৃত্যুর সঠিক সন–তারিখ জানা যায় না। তবে এখানে তাঁর মাজার এখনো বিদ্যমান।

মু. মা.

শাহ বদর

হযরত শাহ বদর (র.) বিশিষ্ট ইসলামপ্রচারক ও কামেল দরবেশ ছিলেন। তাঁর জন্মতারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না; তবে আজ থেকে প্রায় ছয় শতাধিক বছর পূর্বে তিনি যে বাংলা ও বিহারে ইসলাম প্রচার করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত শাহ বদর (রা.)-এর জন্ম ভারতের মীরাটে। তাঁর পিতার নাম ফখরুদ্দিন। তিনিও এক জন কামেল ওলি ছিলেন। শাহ বদর পিতার নিকট শরীয়ত ও মা'রেফাতের জ্ঞান অর্জন করেন এবং পিতার ন্যায় তিনিও এক জন কামেল ওলিতে পরিণত হন।

পুত্র বদরের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সন্তুষ্ট হয়ে পিতা ফখরুদ্দিন তাঁকে সমগ্র বাংলা ও বিহারে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব প্রদান করেন।

হযরত শাহ বদর সঙ্গীসাথীসহ বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আগমন করেন। এখানে আসার পর কতিপয় অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করলে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাঁর ভক্তের সংখ্যাও বাড়তে থাকে, তিনি সকলের মধ্যে ইসলাম ধর্মের (দ্র) বাণী ও শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

অন্যান্য পীর-দরবেশদের মতো হযরত শাহ বদরের জীবনকে ঘিরেও অনেক কিংবদন্তির জন্ম হয়েছে, যার কিছু কিছু এখনো স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে বেঁচে আছে। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খানের (দ্র) 'লায়লী-মজনু' (দ্র) কাব্যে শাহ বদরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম শহরের বকশির হাট এলাকায় অবস্থিত 'বদর পুকুর' ও 'বদর মসজিদ' এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করছে। ৮৪৪ হিজরিতে এই মহান দরবেশ বিহারে ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

শাহ মখ্‌দুম

হযরত শাহ মখ্‌দুম রূপোশ (রা.) ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের একজন কামেল দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক। তাঁর জন্মতারিখ নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নি। তবে তিনি ১২৮৭ থেকে ১২৮৯ সাল এই দুই বছর নোয়াখালি জেলাধীন শামপুর এলাকায় অবস্থান করে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন বলে জানা যায়। সেখান থেকে তিনি রাজশাহীতে (দ্র) যান এবং চারঘাট থানার বাঘা নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন।

জানা যায়, শাহ মখ্‌দুম (রা.)-এর প্রকৃত নাম আবুদল কুদ্দুস এবং তিনি প্রখ্যাত সুফিসাধক 'বড়পীর' হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (দ্র) পৌত্র। তাঁর জন্মস্থান বাগদাদ।

শাহ মখ্‌দুম মূলত ইসলামপ্রচারের কাজেই নিয়োজিত থাকেন। তিনি এ কাজে সহযোগিতার জন্য দক্ষ কর্মীবাহিনীও গড়ে তুলতে থাকেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তাঁকে স্থানীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। এই যুদ্ধ সংগঠিত হয় ১৩২৬ সালে। সমসাময়িক তাম্রলিপি ও প্রাচীন দলিলপত্র থেকে শাহ্ মখ্‌দুম সম্পর্কে অনেক কাহিনী জানা যায়।

www.pathagar.com

এই সাধক ৭৩১ হিজরি (দ্র) সনের রজব মাসে রাজশাহীতে ইন্তেকাল করেন। রাজশাহী শহরের উপকণ্ঠে এখনো তাঁর মাজার বিদ্যমান। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর ওরস (দ্র) উপলক্ষে এখানে সমবেত হন।

মু. মা.

শাহ মুহম্মদ সগীর

বাংলা সাহিত্যের (দ্র) প্রাচীনতম কবি। এই কবির জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। যেটুকু ইতিহাস নানা সূত্রে লেখা আছে তা থেকে জানা যায় যে তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের (দ্র) রাজত্বকালে (১৩৮৯–১৪১০ খ্রি.) 'য়ুসুফ জুলেখা' নামে একটি কাব্য রচনা করেন।

শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলার মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম। তিনি বাংলার কোনো দরবার বংশে জন্মেছিলেন, তবে নিশ্চিতরূপে বলার উপায় নেই। তাঁর কাব্যে ভনিতা পাওয়া যায়; তবে তা খুব কম। তিনি নিজেকে শাহ বলে পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—

কহে শাহা মোহাম্মদ য়ুছুফ জলিখা পদ
দেশি ভাষায় এই পয়ার রচিত।

শাহ মুহম্মদ সগীর গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের আদেশে 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য রচনা করেন নি। কিন্তু তিনি সুলতানের রাজকর্মচারী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কবির উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ধর্মীয় উপাখ্যান যোগানো। কিন্তু তিনি যে কাহিনী শোনালেন তা হচ্ছে রসাশ্রয়ী ধর্মকাহিনী। এসব কাহিনী বাইবেল (দ্র) ও কুরআন শরীফে (দ্র) পাওয়া যায়। ফেরদৌসী (দ্র) ও জামীর লেখা ইউসুফ-জোলেখাও আছে।

আ. হা.

শাহজাদপুর মসজিদ সাজাদপুর মসজিদ দ্র

শাহজালাল, হযরত [১১৯৬—১৩৪৬]

হযরত শাহজালাল (রা.) প্রখ্যাত দরবেশ ও ইসলাম-প্রচারক। ১১৯৬ সালে ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম শেখ জালালুদ্দীন।

তৎকালীন মুসলমান সমাজের রীতি অনুযায়ী জালালুদ্দীন কুরআন-হাদিস তথা ইসলামী শরীয়ত বিষয়ে বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর উচ্চতর মা'রেফাতের (তত্ত্বজ্ঞান) জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তিনি কামেল পীরের মুরীদ হন। পরপর দু'জন পীরের সাহচর্যে থেকে গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের পর তিনি নিজেই পীর হিসাবে স্বীকৃতি পান।

কথিত আছে, একদা বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম (দ্র) প্রচারের জন্য তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন। শাহজালাল স্বীয় পীরের নির্দেশ শিরোধার্য করে কতিপয় সঙ্গীসহ যাত্রা করেন। পথিমধ্যে আরো বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বঙ্গদেশ যাত্রায় শরিক হন।

অতঃপর বহু দেশ অতিক্রম করে তিনি বাংলায় এসে সোনার গাঁও-য়ে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। এ সময় শ্রীহট্টের রাজা ছিলেন গৌরগোবিন্দ।

শাহজালাল তৎকালীন বাংলার সুলতান ফিরোজ শাহের বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসাবে ৩৬০ জন অনুচরসহ গৌরগোবিন্দের মুখোমুখি হন। যুদ্ধে গৌরগোবিন্দ পরাজিত হন। হযরত শাহজালাল অতঃপর সঙ্গীসাথীসহ সিলেটে (দ্র) স্থায়ীভাবে বসবাস ও ইসলাম প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন।

এই মহান দরবেশ ১৫০ বছর বয়সে ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মার্চ সিলেটেই ইন্তেকাল করেন। সিলেটে শাহজালালের মাজার মুসলমানদের নিকট পবিত্র স্থান হিসাবে পরিগণিত।

মু. মা.

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেট (দ্র) শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে সিলেট – সুনামগঞ্জ সড়কের পাশে কুমারগাঁও-এ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এর শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৬টি প্রতিষ্ঠান (স্কুল) রয়েছে। এই স্কুলগুলো হচ্ছে– ১. স্কুল অব ফিজিক্যাল সায়েন্স, ২. স্কুল অব লাইফ সায়েন্স, ৩. স্কুল অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি, ৪. স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস্, ৫. স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড বিজনেস্ অ্যাডমিনিসট্রেশন এবং ৬. স্কুল অব অ্যাগ্রিকালচার অ্যাণ্ড মিনারেল সায়েন্সেস। এই ৬টি স্কুলের অধীনে পদার্থবিজ্ঞান (দ্র), রসায়নশাস্ত্র (দ্র), গণিত (দ্র), পরিসংখ্যান, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম,

www.pathagar.com

কম্পিউটার (দ্র) বিজ্ঞান—ইলেক্ট্রানিক্স (দ্র), রসায়ন প্রযুক্তি, মিনারেলোজি অ্যাণ্ড পেট্রোলিয়াম প্রযুক্তি বিষয়ে পাঠক্রম চালু হয়েছে। এ ছাড়া ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যাণ্ড এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ (I.F.E.S.) নামে দু'টি ইনস্টিটিউট প্রস্তাব আকারে রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা পাঁচ শতাধিক এবং এতে কৃতবিদ্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন।

মে. খা.

শাহ্জাহান [১৫৯২—১৬৬৭]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের (দ্র)মৃত্যুর পর শাহ্জাদা খুর্‌রম ১৬২৮ সালে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৬২৮ সাল থেকে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

১৬১৬ সালে আহমদনগর পুনরুদ্ধার করায় পিতা জাহাঙ্গীর খুর্‌রমকে 'শাহ্জাহান' উপাধি দান করেন। ইতিহাসে তিনি 'শাহ্জাহান' নামেই খ্যাত। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি 'আবুল মুযাফ্ফর শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্জাহান সাহিব কিরান-ই-সানী' উপাধি ধারণ করেন।

শাহ্জাহান তাঁর রাজত্বকালে বীর সিংহ বুন্দেলা ও খানজাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি পুত্র শাহ্ সুজার সাহায্যে বাংলায় পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করেন। ১৬৩৮ সালে তিনি কান্দাহার জয় করেন।

শাহ্জাহান ২১ বছর বয়সে সেনাপতি আসফ খানের কন্যা আরজুমান্দ বানুকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। আরজুমান্দ বানু 'মমতাজ মহল' নামেই পরিচিত। মমতাজ ছিলেন সুশিক্ষিতা, উদার ও ন্যায়পরায়ণা নারী। অনাথদের প্রচুর অর্থ দান করতেন।

মমতাজ মহলের অকালমৃত্যুর পর শোকার্ত সম্রাট তাঁর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য তাঁর কবরের উপর জগদ্বিখ্যাত 'তাজমহল' (দ্র) তৈরি করেন। পৃথিবীতে এমন সুন্দর সমাধিসৌধ আজ পর্যন্ত তৈরি হয় নি। প্রায় ২০ হাজার লোক ২২ বছর পরিশ্রম করে তাজমহল নির্মাণ করেছিল। তাজমহল স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন এবং বিশ্বের সপ্ত-আশ্চর্যের অন্যতম হিসাবে বিবেচিত।

শিল্পে ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ভারতের (দ্র) ইতিহাসে

সম্রাট শাহ্জাহানের ময়ূর-সিংহাসন

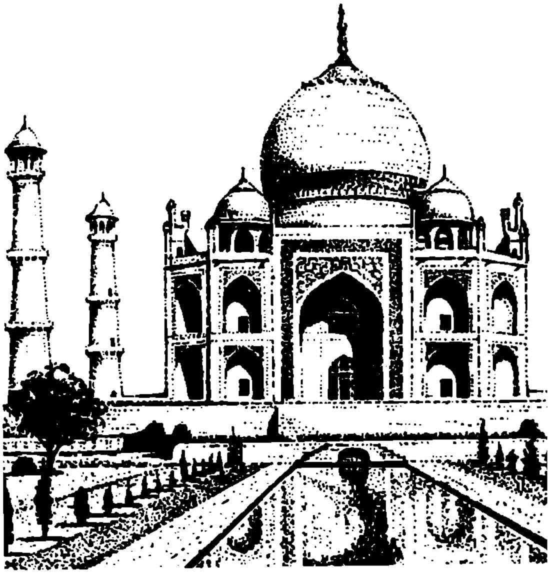

মমতাজের স্মৃতিবিজড়িত শাহ্জাহানের অমরকীর্তি তাজমহল

www.pathagar.com

শাহ্জাহানের তুলনা নেই। তিনি অত্যন্ত শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাজমহল ছাড়াও ময়ূর সিংহাসন, মতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস তাঁর অমর কীর্তি।

শাহ্জাহানের শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখের। ১৬৬৭ সালে শাহ্জাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে পুত্র দারা শিকোহ্ (দ্র), সুজা, মুরাদ ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে বিরোধ বেধে যায়। পুত্র আওরঙ্গজেব (দ্র) তাঁর ভাইদের পরাজিত করেন এবং পিতা শাহ্জাহানকে আগ্রা দুর্গে বন্দি করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বন্দি অবস্থাতেই শাহ্জাহানের মৃত্যু ঘটে। শাহ্জাহান অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ শাসক ছিলেন।

খু. জা.

শাহ্নামা

ইরানের সুবিখ্যাত মহাকাব্য (দ্র)। ফেরদৌসী (দ্র) এর রচয়িতা। খ্রিস্টীয় দশম—একাদশ শতকে ইরান-তুরান ও আরবদের জীবনে সঙ্কট নেমে এসেছিল। এ সময় বাগদাদের খলিফার প্রভাব দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে, তুর্কিদের প্রভাব বাড়তে থাকে। তখন ফেরদৌসীর মনে ইরানের সঙ্কট গভীর ছায়া ফেলে। তাই তিনি ইরানকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব মাথা পেতে নেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি শাহ্নামা রচনা করেন। শাহ্নামায় তিনি ইরানিদের জাগরণের জয়গান করেছেন।

ফেরদৌসী বন্ধুর উপদেশ অনুযায়ী শাহনামা সুলতান মাহমুদ (দ্র)-কে উৎসর্গ করেন। কিন্তু কবি সুলতান থেকে আশানুরূপ পারিতোষিক পান নি। এর কারণ, শাহ্নামায় কবি ইরানের স্বাধীনতা হরণকারী তুর্কি বংশোদ্ভুত গজনী রাজবংশের সুলতান মাহমুদকে সুনজরে দেখেন নি। ইরানের শাহদের কীর্তিনামা শাহ্নামায় বর্ণিত হয়েছে। তার সঙ্গে সুলতান মাহমুদের কোনো সম্পর্ক নেই। মহাকাব্যে সুলতানের যেসব প্রশংসা-প্রশস্তি রয়েছে তা সুলতানকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি।

ফেরদৌসী শাহ্নামা রচনা শুরু করেন ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে, শেষ করেন ১০১০ খ্রিস্টাব্দে। সুলতান মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে। কাজেই বোঝা যায়, সুলতানের আদেশে তিনি শাহ্নামা রচনা করেন নি। কবি যৌবনে তাঁর জন্মভূমি ইরানের বাদশাহদের কাহিনী গদ্যে রচনা করেছিলেন। পরে কবি দাকীকীর অনুসরণে তাঁর কাহিনীকে ছন্দোবদ্ধ করার প্রয়াস পান। কবি দাকীকীর পূর্ণ নাম আবু মনসুর মুহম্মদ ইবনে আহমদ (জন্ম ৯৩০ সালে, মৃত্যু ৯৮০ সালে) দাকীকী শাহ্নামার ১০০০ ছত্র মাত্র রচনা করেন। ফেরদৌসী এই শ্লোকগুলো তাঁর শাহ্নামায় সংযোজন করেন। দাকীকীর রচনা থেকে পথনির্দেশ পেয়ে ফেরদৌসী শাহ্নামা ছন্দে লিখতে শুরু করেন। সুলতান মাহমুদের উজীর হাসান মৈমুন্দীর সহায়তায় ফেরদৌসী গজনীর রাজসভায় স্থান পান। আলবেরুনী (দ্র) ছিলেন তখন সুলতানের সভার মধ্যমণি।

'শাহ্নামা' ইতিহাস নয়, মহাকাব্য। এর কেন্দ্রীয় শক্তি মহাকাল। কালের গর্ভে সবকিছু তুচ্ছ। রাজা-বাদশা শৌর্যে বীর্যে ও মহান মুল্যবোধ বিলীন হয়ে যায় মহাকালের মাঝে। এই মহাকাব্য শুরু হয় ইরানের প্রথম বাদশা কায়মুরসকে নিয়ে। তারপর হোশঙ্গ, এ সময় আগুনের আবিষ্কার হয়। তারপর সম্রাট জামশেদ, ফারেদূন। এসব বাদশার কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই, কারণ তখনো ইতিহাস লেখা শুরু হয় নি। ইতিহাস শুরু হলে পাওয়া যায় কায়কাউস, কায়খসরুকে। এ সময় ইরানের জাতীয় বীর রুস্তমের আবির্ভাব হয়।

শাহ্নামা বীররসপ্রধান মহাকাব্য। এর সঙ্গে বাৎসল্য, করুণ, আদি ও বীভৎস রস সবই এসেছে। বীররসের বিপরীতে বালক বীর সোহরাবের জন্য মা তাহমিনার বিলাপ পৃথিবীর সকল মায়ের বিলাপের ভাষা বলে মনে হয়। বারবার মনে হয়, রুস্তম যদি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে নিজের পরিচয় গোপন না করতেন, তাহলে তাঁর হাতে সোহ্রাবের মৃত্যু হত না, এই মহাসর্বনাশও ঘটত না। অথচ রুস্তম জ্ঞানী মহাবীর। কিন্তু তিনিও বিচারের উর্ধ্বে নন। তাঁর উপর নেমে আসা শাস্তিও হৃদয়-বিদারক। পুত্রহন্তা রুস্তমকে তা ভোগ করতে হয়েছে আমৃত্যু। সন্তানের প্রতি রুস্তমের ভালবাসা ও সন্তানের মৃত্যুতে এমন বিলাপ বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। রুস্তমের বীরত্বের কাছে তুরানের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে ইরানের সঙ্গে এক হয়ে যায়। অসামান্য বীর রুস্তম। তবুও কালের গতিতে ইরানের সামাজিক অবক্ষয় তাঁর সময়েই শুরু হয়। মহাকাব্যে রুস্তমকে দেখা যায়, কয়েক শত বছর বেঁচে ছিলেন। রুস্তমের এক ভাইয়ের চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

রুস্তম তাঁর প্রিয় অশ্ব রাখ্‌শসহ নিহত হন।

ফেরদৌসীর এই মহাকাব্যে রুস্তম ইরানের স্বর্ণযুগের প্রতীক। সেই স্বর্ণযুগের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বিশাল ইরান সাম্রাজ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গৌরব হারাতে বসেছে। আস্তে-আস্তে দিন ঘনিয়ে আসে। বাদশা ইয়াজ- দেগুরদের সময়ে কাদেসীয়ার রণাঙ্গনে নবোদিত ইসলামী শৌর্যের সামনে ইরান তার দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হল। এভাবে শাহ্‌নামার কাহিনীর শেষ হয়। ফেরদৌসী অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি টানলেন।

'শাহ্‌নামা'র ভাষা ক্লাসিক ফার্সি। এর শ্লোকসংখ্যা ৬০ হাজার। গ্রন্থ আগাগোড়া একই ছন্দে লেখা। মনিরউদ্দীন ইউসুফ (দ্র) বাংলায় 'শাহ্‌নামা' অনুবাদ করেছেন। বাংলা একাডেমী (দ্র) থেকে ১৯৯২ সালে এ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

বি. ব.

শাহীন শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র
শাহেদ সোহরাওয়ার্দি সোহরাওয়ার্দি, হাসান শাহেদ দ্র

শিউলি

ওলিয়েসি (Oleaaceae) পরিবারভুক্ত ছোট বৃক্ষ। এর অন্য বাংলা নাম শেফালী এবং বৈজ্ঞানিক নাম *নিক্ট্যান্থিস্ আর্বোরট্রিস্‌টিস্*, লিন *(Nyctanthes Arbortristis, Linn)*। শিউলি গাছের কাণ্ড মোটামুটিভাবে দীর্ঘ এবং এ গাছ বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট। এ গাছের বাকল অমসৃণ, পুরু এবং ফিকে বাদামি রঙের। নৈশকালীন সুবাসিত সাদা ফুলের জন্য এ গাছের কদর বেশি। ফুলের গোড়া নলের

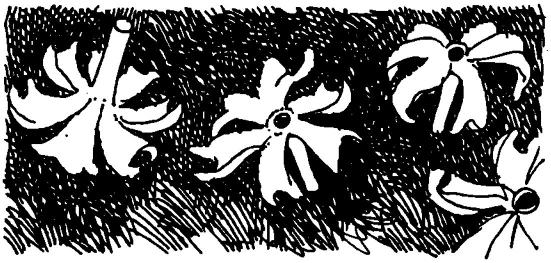

মতো এবং লালচে পীতবর্ণের। শিউলি ফুলকে রোদে শুকিয়ে পানিতে সিদ্ধ করা হলে গভীর পীতবর্ণের রঙ পাওয়া যায়। এ গাছের বাকল থেকেও এক ধরনের হলুদ রঙ পাওয়া যায়। কবিরাজি মতে শিউলির সিদ্ধ পাতা জ্বর ও বাতের জন্য উপকারী। এ ছাড়া এর খসখসে পাতা অনেকেই সিরিশ কাগজের মতো পালিশের কাজেও ব্যবহার করে। এ গাছের পাতা কৃমিনাশক হিসাবেও পরিচিত। শিউলি গাছের বাকলে ট্যানিন থাকায় মাঝে-মধ্যে চামড়া ট্যান করার কাজে তা ব্যবহৃত হয়।

মু. আ.

শিক্ষাক্রম

'শিক্ষাক্রম' একটি বাংলা পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজি কারিকুলাম (curriculum) শব্দের বাংলা পরিভাষা। মূল লাতিন শব্দ currere থেকে curriculum শব্দটি এসেছে। currere শব্দের অর্থ হল course of study বা পঠনীয় বিষয়সামগ্রী। বাংলা 'শিক্ষাক্রম' শব্দটির আভিধানিক অর্থ শিক্ষার ক্রম বা ধারাবাহিক পর্যায়। ইংরেজিতে কথাটি হল 'curriculum is a continuous process' অর্থাৎ শিক্ষাক্রম একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত কার্যক্রম শতবর্ষ পুরনো হলেও ধারণাটি অতি সাম্প্রতিককালের। তাই শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা নানা জন নানাভাবে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাসম্পর্কিত যাবতীয় পরিকল্পিত ও সংগঠিত কার্যক্রমই হল শিক্ষাক্রম।

শিক্ষাক্রম (Carriculum) ও পাঠ্যসূচি (Syllabus) এক নয়। পাঠ্যসূচি শিক্ষাক্রমের একটি অংশ বা উপাদান (component) মাত্র। পাঠ্যসূচি কথাটি অত্যন্ত সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জন কার (John Kerr) শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—'বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও নির্দেশিত সকল প্রকার শিখন যা বিদ্যালয়ে বা বিদ্যালয়ের বাইরে দলগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে বাস্তবায়ন করা হয় তাই শিক্ষাক্রম'। আজকাল শিক্ষাক্রম বলতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশকেই বোঝানো হয়। তাই আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়—'জাতীয় দর্শন, নীতি ও আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে যে-কোনো একটি শিক্ষাস্তরের (যেমন—প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, চাহিদা, গ্রহণযোগ্যতা এবং

www.pathagar.com

প্রবণতা অনুযায়ী পরিপূর্ণ দৈহিক ও মানসিক বিকাশের উপযোগী সামগ্রিক কার্যাবলিকে শিক্ষাক্রম বলা যায়।'

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হেরল্ড রাগ (Herold Rugg), সেলার (Saler), আলেকজাণ্ডার (Alexander), লিউই (Lewy), কানিংহাম (Cunninghum) প্রমুখ মনীষী শিক্ষাক্রমের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে মূল কথা হল—শিক্ষাসম্পর্কিত যে কোনো কার্যক্রমের একটি সার্বিক পূর্বপরিকল্পনাই হল শিক্ষাক্রম।

শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘস্থায়ী আচরণিক পরিবর্তনের জন্য একটি সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কোনো দেশের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলো বিবেচনায় আনতে হয় :

১. জাতীয় দর্শন ও নীতিমালা পর্যালোচনা;
২. শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য পর্যালোচনা;
৩. স্তর অনুযায়ী (প্রাথমিক/মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা;
৪. ঐ স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা (Terminal Competency) নির্ধারণ;
৫. বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ও আবশ্যকীয় শিক্ষাক্রম (Essential Learning Continuum) প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ;
৬. বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি (Syllabus) প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ।

রাল্‌ফ্ টাইলার (Ralph Tyler) শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য চার স্তরের প্রতিমান বা মডেলের কথা বলেছেন :

১. সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য
২. বিষয়বস্তু
৩. সংঘটন
৪. মূল্যায়ন

এ ছাড়াও হুইলার (Whiler) প্রমুখ মনীষী অন্য প্রতিমানও দিয়েছেন। তবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের সঙ্গে এর বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার (General Education) আওতায় ১. প্রাথমিক স্তর (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী) ২. মাধ্যমিক স্তর (ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণী) এবং ৩. উচ্চমাধ্যমিক স্তরের (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের সামগ্রিক দায়িত্ব অর্পিত আছে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড'-এর ওপর। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষার সংখ্যাগত ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম (Competency based curriculum) চালু করেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৯৬ সাল থেকে নতুন ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে কাজ করে যাচ্ছে। এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার (এব্‌তেদায়ী, দাখিল, আলিম ও ফাজিল শ্রেণী) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড। কারিগরি শিক্ষার (Technical Education) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। অন্য দিকে উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরি করছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সঙ্গে মূল্যায়নের যেমন গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি সম্পর্ক রয়েছে উপযোগী ও সহজলভ্য শিক্ষা-উপকরণ (পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক সামগ্রী) তৈরির ও শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করার সঙ্গে।

শ. আ.

শিখধর্ম

শিখধর্ম মূলত হিন্দুধর্মেরই (দ্র) একটি শাখা। গুরু নানক (দ্র) এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হিন্দু ও ইসলাম (দ্র) ধর্ম থেকে প্রয়োজনীয় সারতত্ত্ব সংগ্রহ করে নিয়ে আপন ধর্মমত হিসাবে প্রচার করতে থাকেন। গুরু নানকের প্রচারিত এই নতুন ধর্মের নাম শিখধর্ম। এই ধর্মের অনুসারীগণ শিখ নামে পরিচিত।

ইসলাম ও হিন্দুধর্মের অনেকেই গুরু নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জাঠ সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক কৃষকও শিখধর্ম গ্রহণ করেন।

শিখধর্মের মূলকথা হল—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার। দুঃখময় এই পৃথিবীতে মানুষকে ভালবাসলে শান্তিতে বসবাস করা যায়। আর ধর্মজীবন পালনের মাধ্যম

www.pathagar.com

হল গুরু।

গুরু নানকের উপদেশ সঙ্কলিত করে পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থই শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। নাম 'গ্রন্থসাহেব' (দ্র) বা আদিগ্রন্থ।

শিখধর্ম অন্য ধর্মকে ঘৃণার পরিবর্তে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। তবে গুরু নানক হিন্দুধর্মের বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন।

শিখদের ধর্মগুরু মোট দশ জন। সর্বশেষ গুরুর নাম গোবিন্দ সিংহ। শিখ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তিনিই প্রথম তাঁদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেন। এই সামরিক বাহিনীকে বলা হয় 'খালসা'। এর অর্থ ঈশ্বরের সম্পত্তি। খালসারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের নিদর্শন ছিল বড় বড় চুল ও দাড়ি, খাটো জাঙ্গিয়া, লোহার বালা, চুলে চিরুনি, কোমরে তরবারি। শিখরা এখনো এসব চিহ্ন ধারণ করেন।

পাঁচ শত বছর পূর্বেকার এই ধর্ম ভারতবর্ষে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। পরবর্তী এক শত বছরের মধ্যে শিখধর্ম ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে দিল্লি পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

পাঞ্জাবের অমৃতসরে অবস্থিত স্বর্ণমন্দির শিখদের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান এবং প্রধান উপাসনাগৃহ।

টি. কি.

শিখা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন দ্র

শিখা অনির্বাণ

বাংলাদেশের (দ্র) মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহীদ সৈনিকদের স্মৃতিকে জাতির জীবনে চিরভাস্বর ও চিরপ্রজ্জ্বলিত রাখার উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ। এটি ১৯৭৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা সেনানিবাসস্থ কুর্মিটোলা গল্‌ফ্‌ ক্লাব ও সেনানিবাস কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় শহীদ সরণির পূর্বপার্শ্বে স্থাপিত হয়। তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম পিএসসি স্মৃতিস্তম্ভটি উদ্বোধন করেন। এর স্থাপত্য পরিকল্পনা করেছে ঢাকার ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টার।

লাল সিরামিকের অবকাঠামোর উপর শ্বেতশুভ্র বেদিতে শিখা অনির্বাণ স্থাপন করা হয়েছে। এর পশ্চিম দিক প্রাচীরে ঘেরা আর অন্য তিন দিক উন্মুক্ত। জাতীয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যেমন স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও সশস্ত্র বাহিনী দিবসে শিখা অনির্বাণের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণের সময়ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে থাকেন। বিদেশী সামরিক/বেসামরিক অতিথিগণও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

সুজ. ব.

শিখা চিরন্তন

বাংলাদেশের (দ্র) ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী বীর শহীদদের স্মৃতিকে জাতির জীবনে চির অম্লান ও চির জাগরূক রাখার উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে (দ্র) স্থাপিত হয় শিখা চিরন্তন ১৯৯৭ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিখা চিরন্তন স্থাপন সম্পন্ন হয়।

এর আগে ৭ই মার্চ এখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিখা চিরন্তন প্রজ্জ্বলিত করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন এবং মুক্তিযোদ্ধারা শিখা চিরন্তন নিয়ে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত সারাদেশ ঘুরে ২৬শে মার্চ সকালে ঢাকা এসে পৌঁছেন। এদিন সকাল ১১টার দিকে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আহাদ ও তারামন বিবির হাত থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিখা চিরন্তন গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দীন আহমদ মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ও মেজর ওয়াকারের হাত থেকে জাতীয় পতাকা গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে দাঁড়িয়ে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' বলে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন এবং নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সে বছর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। তাই এই ঐতিহাসিক স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এখানেই শিখা চিরন্তন স্থাপন করা হয়। তবে এর স্থাপত্যপরিকল্পনা এখনো চূড়ান্ত রূপ লাভ করে নি।

শিখা চিরন্তন স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

www.pathagar.com

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যাণ্ডেলা, প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট সুলেমান ডেমিরেল যোগদান করেন।

সুজ. ব.

শিব / মহেশ্বর / মহাদেব

যে রূপে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি ধ্বংস করে সমতা সাধন করেন, সেই শক্তিরূপের নাম শিব। শিব হিন্দুদের অন্যতম প্রধান উপাস্য দেবতা। শিবকে মহাদেব বলা হয়। বেদে মহাদেব না থাকলেও রুদ্র আছেন, এই রুদ্রই পরে মহাদেবরূপে স্বীকৃত হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। শিব ভারতবর্ষের অন্যতম আদি দেবতা। শিবেরও অনেক নাম—শঙ্কর, পিনাকী, ভোলানাথ, ত্রিপুরারি ইত্যাদি। দেবতা ও দৈত্যরা যখন সমুদ্র মন্থন করছিলেন, তখন প্রথমে বিষ ওঠে। শিব সেই বিষ পান করে কণ্ঠে অর্থাৎ গলায় রেখে দেন। এ জন্য তাঁর আরেক নাম নীলকণ্ঠ। শিবের তিনটি চোখ এবং পাঁচটি মাথা। বৃষ তাঁর বাহন। তাঁর সারা শরীরে সাপের অলঙ্কার। শিব প্রথমে দক্ষের কন্যা সতীকে এবং সতীর দেহত্যাগের পরে উমা বা পার্বতীকে বিবাহ করেন। শিব শস্য ও উর্বরতার দেবতা বলেও পূজিত। যাঁরা শিবের পূজা করেন তাঁরা শৈব নামে পরিচিত। বছরের একটি বিশেষ চতুর্দশী তিথিতে শিবের পূজা করার বিধান রয়েছে।

শিব নানা শাস্ত্রে পারদর্শী। কঠিন ধ্বংস ও কোমল কল্যাণ—এই দুই রূপেই শিব পূজিত।

নি. অ.

শিবনাথ শাস্ত্রী [১৮৪৭—১৯১৯]

শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম ৩১শে জানুয়ারি ১৮৪৭ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়, মাতুলালয় জংড়িপোতা গ্রামে। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগনার মজিলপুর গ্রাম। ইনি পণ্ডিত, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্ম (দ্র) প্রচারক হিসাবে খ্যাত। পড়াশোনা করেছেন মজিলপুর পাঠশালা, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজে। ১৮৬৫ থেকেই সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে জড়িয়ে যান। বাল্যবিবাহের বিপক্ষে এবং বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে কাজ করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করেন ১৮৬৯-এর ২২শে আগস্ট। উপবীত ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করায় পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়। Indian Reform Association-এ যোগ দিয়ে মদ্যপান নিবারণ এবং শিক্ষা, সাহিত্য এবং কারিগরিবিদ্যার প্রচারে সহায়তা প্রদান করেন। ১৮৭২ সালে সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮-এর মধ্যে হরিনাভি স্কুল পরিচালনায় সহায়তা করেন, 'সোমনাথ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কলিকাতার ভবানীপুরে সাউথ সাবার্বান স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। দু'বছর পর হেয়ার স্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ১৮৭৭ সালে গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করেন। ১৮৭৮ সালে সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দেন। এ বছরেই প্রচলিত ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন ধরে। এই সময়ে এঁর নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৯ সালে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সিটি কলেজ' ও 'স্টুডেন্টস উইকলি সার্ভিস' নামে একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৮৮৩ সালে তাঁর উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে 'সখা' (দ্র) নামে ভারতের (দ্র) প্রথম কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময় 'তত্ত্বকৌমুদী' ও 'ইণ্ডিয়ান মেসেজ' নামে দু'টি পত্রিকা সম্পাদনা করেন ও বাংলা সাহিত্যের এক জন বিশিষ্ট লেখক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কাব্য : 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮), 'পুষ্পমালা' (১৮৭৫), 'হিমাদ্রিকুসুম' (১৮৮৭), 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৮৮)। উপন্যাস : 'মেজবৌ' (১৮৮০), 'যুগান্তর' (১৮৯৫), 'নয়নতারা' (১৮৯৯), 'বিধবার ছেলে' (১৯১৬)। প্রবন্ধ : 'বক্তৃতা স্তবক' (১৮৮৮), ধর্মজীবন (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮৯৯-১৯০১), 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪), 'প্রবন্ধাবলী' (১ম খণ্ড-১৯০৪), 'আত্মচরিত' (১৯১৮)। শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনাবসান ঘটে ১৯১৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরে। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের মধ্যে তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

হা. মা.

www.pathagar.com

শিবরাত্রি

মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। কখনো কখনো ফাল্গুন মাসের প্রথম কৃষ্ণ চতুর্দশী বা অমাবস্যা। একে শিব চতুর্দশী বা মহাশিবরাত্রিও বলে। এই দিন সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা নিরম্বু (জলহীন) উপবাস থেকে হিন্দুরা শিবকে পরিতুষ্ট করেন। এই দিনে পূজা অপেক্ষা উপবাস প্রধান। রাত্রি জেগে চার প্রহরে চার বার শিবপূজা করারও ব্যবস্থা আছে। পরদিন দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। বাংলাদেশের (দ্র) সীতাকুণ্ডে প্রতি বছর শিবরাত্রির খুব বড় মেলা হয়।

বি. ব.

শিবরাম চক্রবর্তী [১৯০৩—১৯৮০]

জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক। বাংলা শিশুসাহিত্যে হাসির গল্পের ধারা নির্মাণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি মুর্শিদাবাদের জরুরবাকলায়। শৈশব কেটেছে চাঁচল রাজবাড়িতে। তাঁর পিতার নাম শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। ঘরপালানো স্বভাবের কারণে অল্প বয়সেই তিনি বাড়ির বন্ধন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।

মালদহ জেলার চাঁচল হাই স্কুলের ছাত্র থাকাকালে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের (দ্র) সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এ-জন্য তাঁকে কারাভোগও করতে হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি প্রচণ্ড অর্থকষ্টে পড়েন। কোনো উপায় না পেয়ে তিনি 'দৈনিক বসুমতী' বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (দ্র) ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। এ সময় দেশবন্ধুর প্রেরণায় রাজনীতির ওপর লেখা তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' প্রকাশিত হয়।

সাংবাদিকতার সঙ্গেও তিনি দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন। মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'বিজলী' এবং ইংরেজি সংবাদপত্র 'ফরোয়ার্ড'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। তিনি 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। এ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি নানা রকম ব্যঙ্গরসাত্মক ফিচার লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে বসুমতীতে 'বাঁকা চোখে', আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় 'অল্পবিস্তর' ও 'বিসংবাদ' এবং 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'আপনি কি হারাইতেছেন আপনি জানেন না' উল্লেখযোগ্য।

মূলত স্কুলজীবনেই তিনি লেখালেখির দিকে ঝুঁকে পড়েন। কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু। এ সময় তাঁর প্রথম লেখা কবিতা মাসিক 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থের নাম 'মানুষ'। 'মাসিক বসুমতী'তে কাজ করার সময় তাঁর গল্প লেখার শুরু। তৎকালীন বসুমতীসম্পাদক সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নিকট থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পান। ক্রমে তিনি কথাসাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান। নানা বিষয়ে সাহিত্যচর্চা করলেও তিনি শিশুসাহিত্যিক হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর সৃষ্ট 'হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন' দুই ভাই ও 'বিনি' চরিত্র বিশেষ স্মরণীয়।

শিবরাম চক্রবর্তী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রায় দেড় শ' বই লিখেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' এবং 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ১৯৭৫ সালে প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। ১৯৮০ সালের ২৮শে আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

র. শা.

শিবাজী [১৬২৭—১৬৮০]

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ভারতে (দ্র) মারাঠা শক্তির সংগঠক শিবাজীর আবির্ভাব। শিবাজী মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের মারাঠা বলা হয়।

১৬২৭ সালে শিবাজীর জন্ম। তাঁর পিতা শাহজী ভোঁসলা ছিলেন আহমদনগর রাজ্যে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা।

মারাঠাগণ মুসলমানদের আধিপত্য মেনে নিতে রাজি ছিল না। শিবাজী ভারতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন।

www.pathagar.com

তাঁর নেতৃত্বে মারাঠারা এই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। শিবাজী মাওলী নামক এক পার্বত্য হাতিকে বিশেষ সমরকৌশলে শিক্ষিত করে একটি সৈন্যদল গঠন করেন। তারা সম্মুখসমরের পরিবর্তে গেরিলা যুদ্ধের (দ্র) কৌশলে শত্রুর উপর আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করত। আওরঙ্গজেব অনেক চেষ্টা করেও শিবাজীকে দমন করতে পারেন নি। শিবাজীর সাহস ও অপূর্ব রণকৌশলের কাছে মোগল সম্রাটকে বারবার হার মানতে হয়েছে।

শিবাজী ১৬৬৪ সালে বিজাপুরের তারানা নামক পার্বত্য দুর্গ এবং ১৬৫৬ সালে জাওয়ালি দুর্গ অধিকার করেন। ১৬৭৪ সালে শিবাজী রায়গড়ে 'রাজা' উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

৫৩ বৎসর বয়সে ১৬৮০ সালে শিবাজী পরলোক গমন করেন।

খু. জা.

শিম

লিগুমিনোসি (leguminosae) গোত্রের প্যাপিলিওনেসি (papilionaceae) উপ-গোত্রভুক্ত বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ। এর ইংরেজি নাম বিন্ (bean) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *ল্যাব্‌ল্যাব্ পার্পিউরিয়াস* (এল) *সুইট* (*Lablab purpureus* (L) *Sweet*)। অবশ্য *ডলিখস্ ল্যাব্‌ল্যাব্*, লিন্ (*dolichos lablab*, Linn) নামে এটি বহু আগে থেকেই পরিচিত। শিমগাছ কোনো কিছুকে অবলম্বন করে ওপরে উঠতে পারে। এ গাছের পাতা ত্রি-ফলকবিশিষ্ট। এর পুষ্পদণ্ড অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। শিমফুলের রঙ লাল, গোলাপি ও সাদা। এর ফল বারো থেকে চৌদ্দ সেমি চওড়া হয়ে থাকে। বীজের সাহায্যে শিমের বংশবিস্তার ঘটে।

কাঁচা শিম বাংলাদেশের (দ্র) শীতকালীন আমিষসমৃদ্ধ, পুষ্টিকর ও অন্যতম সুস্বাদু সবজি। এতে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ প্রোটিন থাকে। এ ছাড়া শিমে ক্যালসিয়াম (দ্র), পটাসিয়াম (দ্র) ও ফসফরাস থাকে। শিমের বীজ ক্ষুধা বাড়ায়। এ বীজ জ্বর কমায় এবং রক্তের (দ্র) জন্য উপকারী ভূমিকা পালন করে। প্রায় সব ধরনের মাটিতে শিমের চাষ করা যায়। পলিমাটিসমৃদ্ধ নদীতীরের মাটি শিম চাষের জন্য বেশি ভাল। খোলামেলা ও আলো- বাতাসপূর্ণ জমি শিম চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

বাংলাদেশে শিমের বেশ কয়েকটি ভালো জাত আছে। এগুলো হচ্ছে—কার্তিক, নলডক, ঘৃতকাঞ্চন ও বাঘনখা। এ ছাড়া পুসা আর্লি ও প্রলিফিক নামে পরিচিত বিদেশী জাতও এ দেশে ভাল ফলন দেয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (দ্র) কর্তৃক সুপারিশকৃত শিমের দু'টি জাত হচ্ছে এইচ সি-০০৮৪ এবং এইচ সি-০০১০।

মু. আ.

শিমুল

বোম্বাকেসি (Bombacaceae) পরিবারভুক্ত অতি বিরাটাকার সোজা উঁচু পাতাঝরা বৃক্ষ। এর সংস্কৃত নাম শাল্মলী এবং হিন্দি নাম শেম্বলী। ইংরেজিতে একে সিল্ক কটন ট্রি (silk cotton tree) বলা হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *সাল্‌মালিয়া মালাবেরিকা* (*salmalia malabarica*)। শিমুলগাছ বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। এ গাছের গায়ে,তরুণ কাণ্ড ও শাখায় কৌণিক আকৃতির বড় বড় কাঁটা থাকে।

শিমুলগাছ বড় হলে তা ধরে রাখার জন্য এর গোড়ায় বিশেষ ধরনের অধিমূল বা বাট্রেস (buttress) সৃষ্টি হয়। গাছের বাকল মসৃণ এবং রূপালি ধূসর বর্ণের। শিমুলপাতা বৃন্তযুক্ত, ১০–২০ সেমি লম্বা। ফুলের রঙ উজ্জ্বল লাল এবং আকারে বেশ বড়। ফুল উভলিঙ্গ ও শীতকালে ফোটে। শিমুলকাঠ নরম এবং পীতাভ রঙের। এ কাঠ টেকসই নয়। এ কাঠ দিয়ে প্যাকিং বাক্স, কাগজের মণ্ড, দিয়াশলাইয়ের কাঠি এবং বাক্স তৈরি হয়।

শিমুলগাছে ফুলের পরেই ফল আসে। ফল বড়। ক্যাপসিউল ১৫–১৮ সেমি লম্বা। লম্বা ফলত্বক তুলায় পরিণত হয়। পাকা ফল ফেটে গেলে এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা তুলা জড়ানো কালো রঙের বীজ বাতাসে দূর-দূরান্তে ভেসে চলে। বীজ দ্বারা শিমুলের বংশবৃদ্ধি ঘটে।

www.pathagar.com

শিমুল-বীজে শতকরা ২০ ভাগ তেল থাকে। প্রদীপ জ্বালতে ও সাবান তৈরিতে এই তেল ব্যবহার করা যায়। শিমুলগাছের কাণ্ড থেকে এক প্রকার আঠা পাওয়া যায়। এই আঠা কবিরাজি ঔষধ (দ্র) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া কচি গাছের শেকড়ও কবিরাজি ঔষধ হিসাবে কাজে লাগে। শিমুল তুলা দিয়ে গদি, তোষক ও বালিশ বানানো হয়।

মু. আ.

শিয়া সম্প্রদায়

শিয়া সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটি বিশেষ অংশের নাম। তাঁদের মতে, হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর ইন্তেকালের পর খলিফা (দ্র) হওয়ার ন্যায্য দাবিদার ছিলেন হযরত আলী (রা.) (দ্র)। তাঁদের মতে, নবী-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আলী ও ফাতিমা (রা.) (দ্র)-এর বংশধরদের মধ্য থেকেই ইমাম (নেতা) নির্বাচিত হবেন; পূর্ববর্তী ইমাম পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন; এভাবেই ইমামতের ধারা অব্যাহত থাকবে।

ইসলাম ধর্মের (দ্র) মূল বিশ্বাস ও মর্মবাণীর সঙ্গে শিয়া মতবাদের মৌলিক পার্থক্য না থাকলেও আচার ও দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য আছে।

মু. মা.

শিরা রক্তসংবহন-তন্ত্র দ্র

শিরক্

'শির্ক' অর্থ অংশীবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ। এক আল্লাহ্‌কে (দ্র) স্রষ্টা হিসাবে না মেনে তাঁর সমকক্ষ বা বিকল্প শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা এবং তাঁর আরাধনা করা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শির্ক্। অংশীবাদী বা বহু ঈশ্বরবাদীদের বলা হয় 'মুশরিক্'।

মুসলমানগণ 'এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই'—এই বাণীর ওপর আস্থাবান বিধায় তারা স্রষ্টার সমকক্ষ কিংবা বিকল্প শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনকে ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী এবং পাপকর্ম কাজ মনে করে।

মু. মা.

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি

শিলাইদহ

একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। কুষ্টিয়া জেলাশহর থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে পদ্মানদীর তীরে শিলাইদহ গ্রামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) কুঠিবাড়ি। গ্রামটির প্রাচীন নাম খোরশেদপুর। প্রবাদ আছে, ঠাকুরপরিবারের জমিদারিভুক্ত হবার আগে এখানে শেলী নামে এক নীলকর সাহেবের কুঠি ছিল। পদ্মা (দ্র) ও গড়াই নদীর সঙ্গমস্থলে সৃষ্ট দহের সঙ্গে শেলী সাহেবের নাম যুক্ত হয়ে জায়গাটির নতুন নামকরণ হয় শেলীদহ বা শিলাইদহ। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর (দ্র) এই গ্রামসহ বিরাহিমপুর পরগনা নিলামে কিনে নেন। বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাছারি শিলাইদহ।

আমবাগান ও সবুজ গাছপালায় ঘেরা তিনতলা কুঠিবাড়িটি প্রায় বারো-তেরো বিঘা জমির উপর অবস্থিত। শিলাইদহে থাকাকালীন এই বাড়িটিই ছিল কবির লেখাপড়া ও বসবাসের স্থান। বাড়ির জানালা দিয়ে সে সময় উত্তরে পদ্মা ও পশ্চিমে গড়াই দুটো নদীই দেখতে পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথ পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) নির্দেশে জমিদারি দেখাশোনার জন্য ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গে আসেন এবং তখন থেকেই শিলাইদহ-সাজাদপুর (দ্র)-পতিসরে (দ্র) বহুবার যাতায়াত করেছেন।

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রচিত হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'চৈতালী' কাব্য। 'গল্পগুচ্ছে'র ছোটগল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গল্প কবির শিলাইদহে অবস্থানকালে রচনা। সমাপ্তি, শাস্তি, একরাত্রি, সুভা, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এর মধ্যে অন্যতম।

www.pathagar.com

গল্প ও কবিতা ছাড়াও অসংখ্য গান রচিত হয়েছে এই অঞ্চলে এবং ছিন্নপত্রাবলীর পত্রগুচ্ছে ছড়িয়ে আছে শিলাইদহে বসবাসের স্মৃতি। 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য' ও 'বলাকা'র কিছু কবিতাও এ সময়ের রচনা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বল্পকালীন সংসারজীবনের বছর দুয়েক সময় শিলাইদহে সপরিবারে বসবাস করেন। বাংলা ১৩০৬ সালের গোড়ার দিকে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ও পুত্র-কন্যাসহ বসবাস করতে আসেন এবং মাত্র দু'বছর পরে ১৩০৮ সালের প্রথম দিকেই শিলাইদহের বাস তুলে চলে যান শান্তিনিকেতনে (দ্র)।

শিলাইদহ ছেড়ে গেলেও পরবর্তী সময়ে মাঝে মাঝে কবি এখানে এসেছেন এবং সেই সঙ্গে রচনা করেছেন বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা ও অন্যান্য রচনা। ১৯১২ সালে শিলাইদহে বিশ্রাম নিতে এসে এখানে বসেই কবি ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি'র (দ্র) গানের অনুবাদ শুরু করেন, যা তাঁকে পরে বিশ্বসভায় পরিচিত করে এবং এনে দেয় নোবেল পুরস্কার (দ্র)।

নদী, নৌকা, ভরাবর্ষার প্রকৃতি, নদীতীরবর্তী গ্রাম, ফসলের ক্ষেত—এ সবই কবির শিলাইদহ-জীবনের কবিতার প্রধান উপজীব্য। বিষয়বৈচিত্র্যে, ভাবে ও ভাষার ঐশ্বর্যে এবং প্রাচুর্যে স্থায়িত্বের দাবিতে শিলাইদহে বসবাসকাল কবিজীবনের এক শ্রেষ্ঠ ফলপ্রসূ সময়।

ফ. র.

শিল্প

যে সকল প্রতিষ্ঠান একই ধরনের দ্রব্য তৈরি করে অথবা বিশেষ ধরনের সেবা প্রদান করে তাদের শিল্প (Industry) বলা হয়। যেমন—অটোমোবাইল শিল্পে বিভিন্ন যানবাহন (কার, ট্রাক, বাস ইত্যাদি) প্রস্তুত করা হয়; ব্যাংকিং শিল্পে ঋণ দেওয়া হয়, মূলধন বিনিয়োগ করা হয় এবং অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়। এরকম শত শত শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে বিজ্ঞাপনশিল্প, নির্মাণশিল্প, খামারশিল্প, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, খনিজ শিল্প ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

অনেক শিল্পে এক একটি কাঁচামালকে ব্যবহারযোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়। যেমন—ইস্পাতশিল্পে লোহার আকরিক থেকে ইস্পাত বানানো হয়। কোনো কোনো শিল্পে (যেমন—জাহাজ এবং পরিবহণশিল্পে) এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পণ্য পরিবহণ করা হয়। বিদ্যুৎসরবরাহ, টেলিফোন যোগাযোগ শিল্প এরকম বিবিধ সেবা প্রদান করে থাকে।

অন্য কথায়, বিভিন্ন শিল্পব্যবস্থার ফলে আমরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারি।

শিল্পের কল্যাণে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আরামদায়ক হলেও এর অনেক ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। শিল্প-কারখানা থেকে বের হওয়া ধোঁয়া পরিবেশদূষণ ঘটায়। দ্রুত শিল্পায়নের ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজ তেল খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে।

সা. এ

শিল্পদূষণ

শিল্পায়নের অন্যতম ক্ষতিকর দিক হচ্ছে পরিবেশদূষণ। কলকারখানা থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া এবং বিষাক্ত গ্যাস বায়ু দূষিত করে এবং বিভিন্ন তরল বর্জ্য নদী ও সাগরের পানি দূষিত করে। এর ফলে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি মানুষের স্বাস্থ্যও হুমকির সম্মুখীন হয়। কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ঔষধের (দ্র) অপব্যবহারের ফলে মাটি এবং পানি দূষিত হচ্ছে এবং তা অনেক উপকারী কীটপতঙ্গ (দ্র) ও ব্যাক্টেরিয়াকে (দ্র) মেরে ফেলছে। খাদ্য ও পানির সঙ্গে এ সকল ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মানুষের দেহে ঢুকে নানারকম ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্যান্য শিল্পদূষণের মধ্যে বিকিরণ (দ্র), অ্যাসিড- বৃষ্টি; সীসা (দ্র), পারদ (দ্র), আর্সেনিক প্রভৃতি ভারী ধাতুর বিষক্রিয়া এবং শব্দদূষণ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পদূষণ প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় প্রতিরোধ এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যেমন—ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ নিষ্কাশন নিশ্চিত করা উচিত। এমন উৎপাদনপদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত যেন ক্ষতিকর বর্জ্য কম তৈরি হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থকে আবার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। যেমন—সিউয়েজ (sewage)-কে সার কিংবা জ্বালানি গ্যাস তৈরির কাজে ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়া শিল্পদূষণ

www.pathagar.com

প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন সরকারি এবং আন্তর্জাতিক আইন-কানুন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। তা ছাড়া শিল্পদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো উচিত।

সা. এ.

শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)

নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে শিল্পকারখানায় যে গুণগত পরিবর্তন দেশের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির পথ খুলে দেয় তার নাম শিল্পবিপ্লব। বলা যায়, আঠারো শতকের শেষদিকে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা। পরে তা ইউরোপের (দ্র) অন্যান্য দেশে এবং শেষে আমেরিকায় (দ্র) ছড়িয়ে যায়।

বিজ্ঞানী জন কে(John Kay)'র উদ্ভাবিত মাকু, জেম্‌স্ হারগ্রিভ্‌স (Hargreaves)-এর 'স্পিনিংজেনি' নামের চরকা, রিচার্ড আর্ক্‌রাইটের (Arkwright)-এর ওয়াটার ফ্রেম, স্যামুয়েল ক্রম্প্‌টমের মিউল, এডমাণ্ড কার্ট্‌রাইট (Cartwright)-এর যন্ত্রচালিত তাঁত, হামফ্রি ডেভির (দ্র) সেফটি ল্যাম্প, জেম্‌স্ ওয়াটের (দ্র) বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এবং জর্জ্ স্টিফেন্সনের রকেট নামের রেলগাড়ি (দ্র) এই বিপ্লবের ভিত্তি গড়ে তোলে। এর ফলে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তেমনি সমুদ্রপথের আবিষ্কারে বিশ্বজোড়া বাজার গড়ে উঠেছিল, নিশ্চিত হয়েছিল সঞ্চিত মূলধনের ব্যবহার। অন্যদিকে গ্রামীণ কুটিরশিল্প পিছু হটায় গ্রামের মানুষ দলে দলে শহরের কলকারখানায় এসে ভিড় করতে শুরু করে।

এই বিপ্লবের ফলে দেখা দিল কারখানা-শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, শ্রমিক-মালিকের নতুন সম্পর্ক, জমিকে ঘিরে গড়ে ওঠা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ভাঙন। বিশ্বের অগ্রগতির ইতিহাসে এই বিপ্লবকে সব থেকে বড় মাইলফলক হিসাবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

আ. হ.

শিল্পব্যাংক

দেশের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, রুগ্‌ণ শিল্পকারখানার পুনর্বাসন, চালু শিল্পের সুসামঞ্জস্যবিধান, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্য থেকে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত।

'বাংলাদেশ শিল্পব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২'-এর অধীনে ঐ বছরেই ৩১শে অক্টোবর এর জন্ম। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের লক্ষ্য থেকে পরবর্তী কালে উল্লিখিত অধ্যাদেশ জাতীয় সংসদে সংশোধিত হয়।

এই ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের ৫১ শতাংশ সরকার পরিশোধ করে থাকেন এবং বাকি ৪৯ শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার ভিতরে বসবাসকারী নাগরিক কিংবা দেশীয় বা বৈদেশিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিশোধযোগ্য।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ্ এক জন সভাপতি এবং এক জন ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ৯ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। এর সার্বিক নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিচালনা কার্যক্রমের সাধারণ দিঙ্‌নির্দেশনা নির্ধারণের বিষয়টি উল্লিখিত পর্ষদের উপর ন্যস্ত।

ঢাকায় অবস্থিত এই ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ৬টি বিভাগ ও ২৩টি উপবিভাগ সমন্বয়ে গঠিত। এ ছাড়া চট্টগ্রাম (দ্র), রাজশাহী (দ্র) ও খুলনায় (দ্র) ৩টি আঞ্চলিক অফিস এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জেলাসদরে এর ১৪টি শাখা-অফিস রয়েছে। ঢাকা মহানগরীর ব্যস্ততম এলাকা মতিঝিলে অবস্থিত এর কার্যালয়টি দেশের অন্যতম উঁচু ভবন এবং স্থাপত্যসৌন্দর্যেও অনুপম।

আ. হ.

শিশিরকুমার ভাদুড়ী [১৮৮৯—১৯৫৯]

বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট ও শক্তিমান অভিনেতা। তাঁর অভিনয়কাল-পর্ব 'শিশির যুগ' বলে অভিহিত। ১৮৮৯ সালে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার রামরাজ্যতলায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইংরেজি সাহিত্যে (দ্র) এম. এ. পাশ করার পর শিশিরকুমার ভাদুড়ী অধ্যাপনাকার্যে নিয়োজিত হন। অধ্যাপনা পেশার পাশাপাশি তিনি মঞ্চেও অভিনয় করতে থাকেন। পরে সেকালের

www.pathagar.com

বিখ্যাত 'ম্যাডান থিয়েটার'-এ পেশাদার অভিনেতা হিসাবে যোগদান করেন। এই থিয়েটারেই ১৯২১ সালে মঞ্চস্থ 'আলমগীর' নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করে তিনি দর্শক-শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেন। কিন্তু ম্যাডান থিয়েটারের পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি চলচ্চিত্রজগতে প্রবেশ করেন এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (দ্র) 'আঁধারে আলো' ও 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসদ্বয়কে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়ে চলচ্চিত্রপরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯২৩ সালে তিনি আবারও নাট্যজগতে প্রত্যাবর্তন করে মঞ্চাভিনয় শুরু করেন এবং এ বছরেরই ২৫শে ডিসেম্বর নিজস্ব নাট্যদল গঠন, 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ এবং তাতে রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করে বাংলার নাট্যপিপাসু দর্শকদের হৃদয়মন জয় করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে একের পর এক নাটকে অভিনয় করার পাশাপাশি তিনি নিজস্ব নাট্যদলসহ উপমহাদেশের নানাস্থানে গমন এবং নাটক মঞ্চস্থ ও সেগুলোতে অভিনয় করে অপরিসীম যশের অধিকারী হন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী বহু নির্বাক ও সবাক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেও অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তবে শিল্পী হিসাবে নাট্যমঞ্চই ছিল তাঁর সাধনার প্রধানতম ক্ষেত্র।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি নাটকের দল নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) সফরে যান। সেখানে তিনি 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ ও তাতে অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করলেও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং স্বদেশে ফিরে আসেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনয়খ্যাতি পেলেও জীবনব্যাপী আর্থিক সাফল্য লাভে সক্ষম হন নি। ভারত সরকার তাঁর অভিনয়প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৯ সালে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' খেতাবে ভূষিত করে সম্মানিত করেন। শিশিরকুমারের অভিনয়জীবনের সব থেকে বড় সাফল্য এই যে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই তাঁর সময়কালে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অন্য পেশা গ্রহণ না করে মঞ্চকেই তাঁদের শিল্পসাধনার প্রধান পাদপীঠ হিসাবে বেছে নেন।

তিনি ১৯৫৯ সালে কলিকাতার বরাহনগরে অবস্থিত নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

শিশু শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

শিশু-১

জাতিসংঘ (দ্র) কর্তৃক জারিকৃত শিশু-অধিকার বিষয়ক সনদে প্রদত্ত সংজ্ঞা মোতাবেক সর্বোচ্চ ১৮ বছর বয়সীদের শিশু বলা হয়। অধিকাংশ উন্নত দেশে ১৮ মাস থেকে ১৩ বছর বয়সীদের শিশু বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, ১৩ বছর বয়সের মধ্যেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করে। এ সময় শিশুর চিন্তা, ব্যবহার, মানসিক অবস্থা ইত্যাদিতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়।

শিশুদের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে এবং এদের বিভিন্ন বয়সের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়ে বাবা-

মা, সমাজ ও রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪৪তম অধিবেশনে শিশুদের মৌলিক অধিকারসমূহ মোট ৫৪টি ধারায় বর্ণিত হয়েছে, যা ১৯৯০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। শিশুদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদকে আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এতে স্বাক্ষর করেছে।

সি. না. হ.

শিশু-২

সাবালকত্ব প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়কালীন মানবসন্তানকে শিশু নামে অভিহিত করা হয়। এই সাবালকত্ব প্রাপ্তির বয়স সব দেশে এক নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বয়স নির্দিষ্ট করে শিশুত্বের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।

www.pathagar.com

জাতিসংঘ (দ্র) ঘোষিত শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুর বয়ঃসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের (দ্র) সংবিধানে তা ১৬ বছর ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়ঃসীমার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। শিশু (শ্রমবন্ধক) আইনে শিশু বলতে ১৫ বছর বয়সীকে বোঝানো হয়েছে। দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনে ১২ বছরের কম বয়সীকে শিশু বলা হয়। আবার কারখানার আইনে শিশুর বয়স অনূর্ধ্ব ১৬ বছর।

খু. জা.

শিশু অধিকার সনদ

১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের (দ্র) সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ। ইংরেজিতে একে সংক্ষেপে C.R.C (Convention on the right of the Child) বলা হয়। বাংলাদেশ এই সনদে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের অন্যতম। ১৯৯০ সালের ৩রা আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশসহ ২২টি দেশ এই সনদের প্রতি পুনরায় সমর্থন জানায়। ১০৫টি দেশ সনদটিতে স্বাক্ষরদানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে জাতিসংঘ গৃহীত 'শিশু অধিকার সনদ' সমগ্র বিশ্বের শিশুদের জন্য সর্বমোট ৫৪টি ধারা সংবলিত অধিকারকে স্বীকার ও সংরক্ষণের জন্য আইনগত ভিত্তি প্রস্তুত করে।

এই সনদে শরিক রাষ্ট্রসমূহ

জাতিসংঘ-ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানব জাতির প্রতিটি সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকারের স্বীকৃতি; এ কথা বিবেচনায় রেখে—

জাতিসংঘের আওতাভুক্ত সকল দেশ উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত মৌলিক মানবাধিকার এবং ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং আরো স্বাধীনভাবে সমাজপ্রগতিকে এগিয়ে নিতে ও জীবনমানের উন্নয়ন সাধনে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে; এই বিষয়টি মনে রেখে—

জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালায় এ কথা ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়েছে যে, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক কিংবা অন্যান্য মত, জাতীয় অথবা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য নির্বিশেষে কোনো প্রকার ভেদাভেদ ব্যতিরেকে প্রতিটি মানুষ উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে; এই বিষয় মেনে নিয়ে—

বিশেষ তত্ত্বাবধান ও সহায়তা শিশুদের প্রাপ্য, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত জাতিসংঘের এই উচ্চারণকে স্মরণে রেখে—

পরিবার যেহেতু সমাজের প্রাথমিক সংগঠন এবং এর সকল সদস্য বিশেষ করে শিশুদের বিকাশ ও কল্যাণের স্বাভাবিক পরিবেশ, সেহেতু তাকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং সহায়তা দিতে হবে যাতে সমাজের অভ্যন্তরে সে তার দায়িত্বসমূহ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে; এ ব্যাপারে আস্থাশীল হয়ে—

শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ও সুষম বিকাশের স্বার্থে আনন্দ, ভালবাসা ও সমঝোতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে তাকে বেড়ে উঠতে দিতে হবে; এ কথা অনুধাবন করে—

সমাজে স্বকীয় জীবনযাপনের জন্য শিশুকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে হবে এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত আদর্শসমূহের আলোকে বিশেষভাবে শান্তি, মর্যাদা, সহনশীলতা, স্বাধীনতা, সমতা ও সংহতির চেতনায় তাকে গড়তে হবে; এ বিষয়টি চিন্তায় রেখে—

শিশু অধিকার সম্পর্কে ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষণা ও ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের কথা বর্ণিত হয়েছে; এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালায় (বিশেষভাবে ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদ), অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালায় (বিশেষভাবে ১০ অনুচ্ছেদ) এবং শিশুকল্যাণের কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অপরাপর বিশেষ সংগঠনসমূহের বিধিবিধান ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রে তা স্বীকৃত রয়েছে; এটা মনে রেখে—

"শিশুর শারীরিক ও মানসিক অপরিপক্বতার কারণে তার জন্মের আগে থেকে এবং পরেও তার জন্য চাই যথাযথ আইনী রক্ষাব্যবস্থাসহ বিশেষ নিরাপত্তা ও যত্ন"—শিশু - অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় ব্যক্ত এই কথা চিন্তায় রেখে—

www.pathagar.com

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালক প্রদান ও দত্তক গ্রহণ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখসহ শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সম্পর্কিত সমাজিক ও আইনগত নীতিমালা সংক্রান্ত ঘোষণা, শিশু সংক্রান্ত বিচারকার্য পরিচালনার জন্য জাতিসংঘের আদর্শ ন্যূনতম বিধিমালা (বেইজিং রুলস্) এবং জরুরি অবস্থা ও সশস্ত্র সংঘাতকালীন মহিলা ও শিশুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘোষণার শর্তাবলি স্মরণে রেখে—

বিশ্বের সকল দেশেই এমন শিশুরা রয়েছে যারা বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে বাস করছে, সেই সব শিশুর জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন; এ কথা উপলব্ধি করে—

শিশুর সুরক্ষা ও তাদের সুষম বিকাশের স্বার্থে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের গুরুত্বের কথা যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে—

প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব অনুধাবন করে নিম্নোক্ত বিষয়াবলিতে ঐকমত্য ঘোষণা করছে :

পরিচ্ছেদ ১

ধারা—১

এই সনদে শিশু বলতে বোঝাবে ১৮ বছরের কমবয়সী প্রতিটি মানবসন্তান, যদি না শিশুদের জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় আরো কম বয়সে সাবালকত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ধারা—২

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ আওতাধীন প্রতিটি শিশুর জন্য এই সনদে নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং এগুলির নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ ব্যাপারে শিশু অথবা তার পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয়-গোষ্ঠীগত-সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, অসামর্থ্য, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য নির্বিশেষে কোনো ধরনের বৈষম্য করা হবে না।

(২) পিতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা পরিবারের সদস্যদের সামাজিক অবস্থান, কার্যকলাপ, ব্যক্ত মতামত কিংবা বিশ্বাসের কারণে যে কোনো ধরনের বৈষম্য অথবা শাস্তি থেকে শিশুরা নিরাপদ থাকবে; এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে শরিক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা—৩

(১) সমাজকল্যাণমূলক সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালত, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কিংবা আইনসভা—যেই হোক না কেন, শিশু সংক্রান্ত তাদের যে কোনো কার্যক্রমের প্রধান বিবেচ্য হবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ।

(২) শিশুর পিতামাতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা আইনত দায়িত্ব বর্তায় এমন কোনো ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য বিবেচনায় রেখে শিশুর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও যত্ন নিশ্চিত করতে শরিক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেবে।

(৩) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুপরিচর্যা ও সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান, সেবা ও সুবিধাদি নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কর্মচারীর সংখ্যা ও উপযুক্ততা সেই সাথে পর্যাপ্ত তদারকির ব্যবস্থা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মানের অনুরূপ হতে হবে।

ধারা—৪

এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে শরিক রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও অপরাপর সকল ব্যবস্থা নেবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে শরিক রাষ্ট্রগুলো প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকাঠামোর মধ্যে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো নেবে।

ধারা—৫

এই সনদে স্বীকৃত শিশুর অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশযোগ্যতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের প্রশ্নে পিতামাতা বা স্থানীয় রীতি অনুযায়ী সম্প্রসারিত পরিবার বা সমাজ-সদস্য, আইনসম্মত অভিভাবক অথবা আইনানুগভাবে শিশুর দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি শরিক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে।

ধারা—৬

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার রয়েছে।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের বেঁচে থাকা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধান করবে।

www.pathagar.com

ধারা—৭

(১) জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশুর নিবন্ধীকরণ করতে হবে এবং জন্ম থেকেই তার নামকরণ লাভের, একটি জাতীয়তা অর্জনের এবং যতটা সম্ভব পিতামাতার পরিচয় জানবার ও তাদের হাতে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইন অনুসারে এই অধিকারসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে, বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে, যেখানে এর অন্যথা হলে শিশু রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে।

ধারা—৮

(১) জাতীয়তা, নাম এবং পারিবারিক সম্পর্কসহ আইনসম্মত পরিচিতি সংরক্ষণে শিশুর অধিকারের প্রশ্নে শরিক রাষ্ট্রসমূহ উদ্যোগী হবে, যেখানে কোনো বেআইনি হস্তক্ষেপ চলবে না।

(২) কোথাও কোনো শিশু যদি তার নিজস্ব পরিচয়ের কতিপয় বা সব দিক থেকে বেআইনিভাবে বঞ্চিত হয়, তাহলে শরিক রাষ্ট্রসমূহ যত দ্রুত সম্ভব সেই পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যথাযথ সহায়তা প্রদান ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ধারা—৯

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ কোনো শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে আলাদা না করার নিশ্চয়তা বিধান করবে, তবে কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি প্রযোজ্য আইন ও বিধিবিধান অনুসারে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করে যে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন, কেবল সে ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হতে পারে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে, যেমন—সন্তানের প্রতি পিতামাতার উৎপীড়ন বা অবহেলা কিংবা পিতা ও মাতা আলাদা বাস করছে এবং সন্তান কোথায় বাস করবে তা নির্ধারণ যে ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়।

(২) এই ধারার অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী কোনো মোকদ্দমা হলে তাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে উপস্থিত থাকার এবং তাদের মতামত জ্ঞাপন করার সুযোগ দিতে হবে।

(৩) পিতা-মাতার যে কোনো এক জনের অথবা উভয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুর পিতামাতা উভয়ের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখার এবং নিয়মিত সরাসরি যোগাযোগ রাখার অধিকারের প্রতি শরিক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে, অবশ্য যদি তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।

(৪) শরিক রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কোনো কার্যব্যবস্থা, যেমন পিতামাতা যে কেউ অথবা দু'জনকে কিংবা শিশুকে আটক, কারাদণ্ড, নির্বাসন, স্বদেশ থেকে বিতাড়ন অথবা মৃত্যু (রাষ্ট্র কর্তৃক আটক ব্যক্তির যে কোনো কারণে মৃত্যুসহ) ইত্যাকার কারণে যদি এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা ঘটে, তাহলে পিতামাতা, শিশু কিংবা যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্যকে অনুরোধের ভিত্তিতে পরিবারের অনুপস্থিত সদস্য সম্পর্কে শরিক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জ্ঞাপন করবে, অবশ্য যদি সে তথ্যের বিষয়বস্তু শিশুর কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর না হয়। শরিক রাষ্ট্রসমূহ এটাও নিশ্চিত করবে যে এই ধরনের অনুরোধ পেশ করাটা যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য কোনো বিরূপ প্রতিফল ভোগের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

ধারা—১০

(১) নবম ধারার অনুচ্ছেদ-১-এর ভিত্তিতে শরিক রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা মোতাবেক কোনো শিশু বা তার পিতা-মাতা পারিবারিক পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে কোনো একটি শরিক রাষ্ট্রে প্রবেশ বা রাষ্ট্রত্যাগের দরখাস্ত করলে শরিক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক তা ইতিবাচক, মানবিক ও ত্বরিত পন্থায় বিবেচিত হতে হবে। শরিক রাষ্ট্রসমূহ আরো নিশ্চয়তা বিধান করবে যে এ ধরনের আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যদের জন্য কোনো বিরূপ প্রতিফল বয়ে আনবে না।

(২) কোনো শিশুর পিতামাতা পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে বাস করলে উভয়ের সাথে নিয়মিত এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিরাপদে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সরাসরি যোগাযোগ রাখাটা ঐ শিশুর অধিকার। সেই উদ্দেশ্যে এবং নবম ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্তব্য অনুসারে শিশু কিংবা তার পিতা-মাতার নিজেদের দেশসহ যে কোনো দেশ ত্যাগ করার এবং নিজেদের দেশে প্রবেশ করার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে শরিক রাষ্ট্রসমূহ। কোনো দেশ ত্যাগের এই অধিকার শুধুমাত্র এমন কিছু বিধিনিষেধ দ্বারা রহিত করা যাবে, যেগুলি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং যেগুলি জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য কিংবা নৈতিকতা কিংবা

www.pathagar.com

অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং সনদে স্বীকৃত অন্যান্য অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধারা—১১

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের অবৈধভাবে বিদেশে পাচার এবং দেশে ফিরতে না দেওয়া প্রতিহত করতে ব্যবস্থা নেবে।

(২) এই উদ্দেশ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগী হবে অথবা বিদ্যমান চুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবে।

ধারা—১২

(১) নিজস্ব ধারণা বা মত গঠনে সক্ষম শিশু তার নিজের সকল বিষয়ে অবাধে মতামত প্রকাশের অধিকারী। সেই অধিকার যাতে রক্ষিত হয় এবং শিশুর বয়স ও পরিপক্বতা অনুযায়ী তার সেইসব মতামতকে যাতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়, শরিক রাষ্ট্রসমূহ তার নিশ্চয়তা দেবে।

(২) এই উদ্দেশ্যে শিশুকে সুনির্দিষ্টভাবে এই সুযোগ দিতে হবে, যাতে শিশুর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক মোকদ্দমার ক্ষেত্রে শিশু সরাসরি অথবা কোনো প্রতিনিধি কিংবা কোনো উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় আইনের বিধিবদ্ধ ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার কথা বলতে পারে।

ধারা—১৩

(১) শিশুর স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশের অধিকার থাকবে। এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে সীমান্ত নির্বিশেষে সব ধরনের তথ্য ও ধ্যান-ধারণা জানতে চাওয়া, গ্রহণ করা এবং অবহিত করার স্বাধীনতা। এটি মৌখিকভাবে, লিখিত, মুদ্রিত কিংবা চারুশিল্পের আকারে অথবা শিশুর পছন্দসই অন্য কোনো পন্থায় হতে পারে।

(২) এই অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে, তবে তা হবে আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং নিম্নোক্ত প্রয়োজনে :

ক. অন্যের অধিকার ও সুনামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য;

খ. জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা সুরক্ষার জন্য।

ধারা—১৪

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর বিকাশযোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার অধিকার চর্চায় নির্দেশনা দেওয়ার ব্যাপারে পিতামাতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

(৩) কারো ধর্ম বা বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেই সব সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যাবে, যা আইনে উল্লিখিত রয়েছে এবং নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা কিংবা অন্যদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন।

ধারা—১৫

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের সংঘবদ্ধ হবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে স্বীকার করে।

(২) এই অধিকার চর্চার উপর আইনানুসারে প্রযোজ্য বিধিনিষেধ ছাড়া এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় কিংবা জননিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা এবং অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা ছাড়া অন্য কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না।

ধারা—১৬

(১) কোনো শিশুর নিজস্ব গোপনীয়তা, পরিবার, আবাস কিংবা পত্র-যোগাযোগের ওপর স্বেচ্ছাচারী অথবা বেআইনি হস্তক্ষেপ কিংবা তার মর্যাদা ও সুনামের ওপর বেআইনি আক্রমণ করা যাবে না।

(২) এই ধরনের কোনো হস্তক্ষেপ কিংবা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে।

ধারা—১৭

শরিক রাষ্ট্রসমূহ গণমাধ্যমের দ্বারা সাধিত কর্মকাণ্ডের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং তারা শিশুর জন্য বিভিন্নমুখী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করবে, বিশেষ করে যেসব তথ্য ও বিষয়বস্তু শিশুর সামাজিক, আত্মিক ও নৈতিক কল্যাণ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহ —

ক. শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উপকারী এবং ২৯ ধারায় ব্যক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য এবং বিষয়বস্তু প্রচারে গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করবে;

খ. বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে এ ধরনের তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রস্তুত, বিনিময় এবং প্রচারের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে;
গ. শিশুগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারে উৎসাহ যোগাবে;
ঘ. সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত বা আদিবাসী শিশুদের ভাষাগত চাহিদার প্রতি বিশেষভাবে সম্মান দেখাবার ব্যাপারে গণমাধ্যমকে উৎসাহ দেবে;
ঙ. ১৩ এবং ১৮ ধারায় বর্ণিত বিষয় মনে রেখে শিশুর কল্যাণের জন্য ক্ষতিকারক তথ্য ও বিষয়বস্তু থেকে তার সুরক্ষায় যথাযথ দিঙ্‌নির্দেশনা প্রণয়নকে উৎসাহিত করবে।

ধারা—১৮

(১) শিশুর প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও বিকাশের ব্যাপারে পিতা-মাতা উভয়ের অভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে–এই নীতির স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে শরিক রাষ্ট্রসমূহ সর্বাত্মক প্রয়াসী হবে। শিশুকে লালন-পালন, শিক্ষাদান ও গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে পিতামাতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই হবে তাদের মূল চিন্তা।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদে স্থিরকৃত অধিকারসমূহ নিশ্চিত এবং জোরদার করার উদ্দেশ্যে পিতামাতা ও আইনসম্মত অভিভাবককে তাদের শিশুর লালন-পালনে যথাযথ সহায়তা দেবে এবং শিশুপরিচর্যার প্রতিষ্ঠান সুযোগসুবিধা ও সেবামাধ্যমসমূহের বিকাশ নিশ্চিত করবে।

(৩) শরিক রাষ্ট্রসমূহ কর্মজীবী পিতামাতা-সন্তানদের প্রাপ্তিযোগ্যতা অনুসারে শিশুপরিচর্যা কার্যক্রম ও সুবিধাদি থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থাদি নেবে।

ধারা—১৯

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ পিতামাতা, আইনানুগ অভিভাবক অথবা শিশুপরিচর্যায় নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন শিশুকে আঘাত অথবা অত্যাচার, অবহেলা অথবা অমনোযোগী আচরণ, দুর্ব্যবহার অথবা শোষণ এবং যৌন অত্যাচারসহ সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক হিংস্রতা থেকে সুরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত সকল ব্যবস্থা নেবে।

(২) এ ধরনের সুরক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যথার্থ ব্যবস্থা হিসাবে শিশু এবং শিশুপরিচর্যায় নিয়োজিতদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার প্রশ্নে সামাজিক কর্মসূচি প্রবর্তন, সেই সঙ্গে প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাদির জন্য কার্যকর পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং উল্লিখিত শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে সে ক্ষেত্রে শনাক্তকরণ, বিবৃতকরণ, দায়িত্বপূর্ণ তদন্ত, চিকিৎসা ও পরবর্তী কার্যকারণ এবং প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ধারা—২০

(১) যে শিশু স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ভিত্তিতে তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত অথবা যে শিশুকে তার সর্বোত্তম স্বার্থে ঐ পরিবেশে থাকতে দেওয়া যাবে না, সেই শিশু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সুরক্ষা ও সহায়তার অধিকারী।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইনানুসারে এ ধরনের শিশুর জন্য বিকল্প তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে।

(৩) এ ধরনের পরিচর্যায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে পালিত সন্তান হিসাবে অর্পণ, ইসলামী আইনের কাফালা, দত্তক প্রদান কিংবা প্রয়োজনবোধে কোনো উপযুক্ত সংস্থার কাছে শিশুকে লালন-পালন করতে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে সমাধানের কথা ভাবার সময় শিশু প্রতিপালন অব্যাহত রাখার বাঞ্ছনীয়তা এবং শিশুর জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাগত পটভূমির প্রতি যথাযথ সম্মান দিতে হবে।

ধারা—২১

দত্তক পদ্ধতির স্বীকৃতিদান এবং/কিংবা অনুমোদনকারী শরিক রাষ্ট্রসমূহ এটা নিশ্চিত করবে যে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই হবে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিবেচনা এবং তারা —
ক. এটা নিশ্চিত করবে যে কোনো শিশুকে দত্তক গ্রহণের বিষয়টি শুধুমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হবে। ঐ কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য আইন ও কার্যপ্রণালী অনুসারে এবং সকল প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন যে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও আইনসম্মত অভিভাবকদের দিক থেকে শিশুর অবস্থান অনুযায়ী দত্তক অনুমোদনযোগ্য এবং আবশ্যক বিবেচনা করলে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় পরামর্শের ভিত্তিতেই দত্তকের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সম্মতি দিয়েছেন;
খ. এটা অনুমোদন করবে যে যদি শিশুকে পালক বা দত্তক হিসাবে কোনো পরিবারে স্থান করে দেওয়া না যায় কিংবা শিশুর নিজস্ব দেশে যদি উপযোগী কোনো পন্থায় প্রতিপালনের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে তার পরিচর্যার বিকল্প উপায় হিসাবে আন্তঃদেশীয় দত্তকের কথা বিবেচিত হতে পারে;

গ. এই বিষয় নিশ্চিত করবে যে আন্তঃদেশীয় দত্তকের ক্ষেত্রে শিশুর জন্য এমন রক্ষাব্যবস্থা ও মান বজায় রাখতে হবে, যা জাতীয় পর্যায়ের দত্তকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রক্ষাব্যবস্থা ও মানের অনুরূপ;

ঘ. আন্তঃদেশীয় দত্তকের ক্ষেত্রে শিশুকে প্রদান যাতে সংশ্লিষ্টদের অবৈধ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ নেবে;

ঙ. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহকে কার্যকর করতে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপাক্ষিক সমঝোতা বা চুক্তি সম্পন্ন করবে, এবং এই কাঠামোর মধ্যে এ কথা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হবে যে অপর দেশে শিশুর স্থানান্তরের বিয়ষটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কিংবা সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে।

ধারা—২২

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ এ বিষয় নিশ্চিত করতে যথাযথ কার্যব্যবস্থা নেবে যে প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক কিংবা দেশীয় আইন ও কার্যপদ্ধতি অনুসারে কোনো শিশু যদি শরণার্থীর অবস্থান প্রার্থনা করে কিংবা শরণার্থী বিবেচিত হয়,তার সঙ্গে পিতামাতা বা অন্য কোনো লোক থাকুক বা না থাকুক, ঐ শিশু এই সনদে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সামিল রয়েছে এমন অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কিংবা জনহিতকর দলিলে বর্ণিত অধিকারসমূহ ভোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা পাবে।

(২) ঐ ধরনের শিশুর সুরক্ষা ও সহায়তা এবং কোনো শরণার্থী শিশুর পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহার্থে তার পিতামাতা কিংবা পরিবারের জন্য সদস্যদের খোঁজ পেতে জাতিসংঘের যে কোনো প্রয়াস এবং জাতিসংঘকে সহযোগিতাকারী অন্যান্য উপযুক্ত আন্তঃসরকারি সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থাকে শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের বিবেচনা অনুযায়ী যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবে। যে ক্ষেত্রে পিতামাতা কিংবা পরিবারের অপর সদস্যদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না সে ক্ষেত্রে শিশুর জন্য এরূপ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে যা যে কোনো কারণে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে পারিবারিক পরিবেশ বঞ্চিত অন্য শিশুদের জন্য এই সনদে নির্ধারিত হয়েছে।

ধারা—২৩

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করছে যে মানসিক অথবা শারীরিকভাবে পঙ্গু শিশু এমন পরিবেশে পরিপূর্ণ ও সুন্দর জীবনযাপন করবে, যেখানে মর্যাদার নিশ্চয়তা থাকবে, আত্মনির্ভরতা বাড়বে এবং সমাজে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ পঙ্গু শিশুর বিশেষ যত্ন লাভের অধিকারকে স্বীকার করে এবং প্রাপ্ত সম্পদ অনুযায়ী পঙ্গু বলে গ্রহণযোগ্য শিশু ও তার পরিচর্যার দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে, আবেদনের ভিত্তিতে শিশুর পরিচর্যাকারী অন্যান্যদের পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদানকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করবে।

(৩) পঙ্গু শিশুর বিশেষ প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে এই ধারার অনুচ্ছেদ-২ মোতাবেক সহায়তা বিনামূল্যে প্রদান

করতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পিতামাতা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারী অন্যান্যদের আর্থিক সঙ্গতির বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে এবং সহায়তা এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে

www.pathagar.com

পঙ্গু শিশুর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যাব্যবস্থা, পুনর্বাসন পরিসেবা, কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি এবং বিনোদন লাভের ক্ষেত্রে কার্যকর সুযোগ থাকে এবং শিশু তা এমনভাবে লাভ করতে পারে যাতে শিশুর সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক বিকাশসহ ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং তার সম্ভাব্য পুরোপুরি সামাজিক সমন্বয় অর্জিত হয়।

(৪) শরিক রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চেতনায় প্রতিষেধক স্বাস্থ্যপরিচর্যা এবং পঙ্গু শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও ক্রিয়ামূলক চিকিৎসাক্ষেত্রে যথাযথ তথ্যের বিনিময়কে উৎসাহিত করবে। এই তথ্যবিনিময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুনর্বাসন, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক সেবার পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার এবং সংগ্রহ। এর লক্ষ্য হবে এই সব বিষয়ে শরিক রাষ্ট্রসমূহের যোগ্যতা ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং তাদের অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশসমুহের প্রয়োজনের কথা বিশেষ বিবেচনায় থাকবে।

ধারা—২৪

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য লাভ এবং ব্যাধির চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সুবিধাভোগের অধিকারকে স্বীকার করে। এ ধরনের স্বাস্থ্যপরিচর্যাসেবা প্রাপ্তির অধিকার থেকে কোনো শিশু যাতে বঞ্চিত না হয়, শরিক রাষ্ট্রসমূহ তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবে।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে এবং বিশেষভাবে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবে:

ক. নবজাত ও শিশুমৃত্যু হ্রাস করতে;

খ. প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিচর্যার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদানসহ সকল শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-সহায়তা ও স্বাস্থ্যপরিচর্যা প্রদানের ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করতে;

গ. প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিচর্যাকাঠামোর আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সহজলভ্য প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এবং পরিবেশগত দূষণের বিপদ ও ঝুঁকির কথা বিবেচনায় রেখে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিষ্কার খাবার পানির ব্যবস্থাসহ ব্যাধি ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে;

ঘ. মায়েদের জন্য গর্ভকালীন এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী উপযুক্ত স্বাস্থ্যপরিচর্যা নিশ্চিত করতে;

ঙ. শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মায়ের দুধ পানের সুফল, স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন এবং দুর্ঘটনা নিরোধ সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে সমাজের সকল অংশ, বিশেষভাবে পিতামাতা ও শিশুকে অবহিতকরণ, শিক্ষা ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে;

চ. প্রতিষেধক, স্বাস্থ্যপরিচর্যা ও পিতামাতার করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা উন্নত করতে।

(৩) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর চিরাচরিত সংস্কারসমূহ বিলোপ করার লক্ষ্যে কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

(৪) শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই ধারায় স্বীকৃত অধিকারের ক্রমোন্নয়নের ভিত্তিতে পূর্ণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার ও উৎসাহিত করতে প্রয়াসী হবে। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজনের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া হবে।

ধারা—২৫

শরিক রাষ্ট্রসমূহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরিচর্যা, সুরক্ষা অথবা শারীরিক বা মানসিক চিকিৎসায় নিয়োজিত শিশুকে প্রদত্ত চিকিৎসা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল পারিপার্শ্বিকতা সময়ে সময়ে পর্যালোচনার প্রশ্নে শিশুর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

ধারা—২৬

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর সামাজিক বীমাসহ সামাজিক নিরাপত্তা থেকে উপকৃত হবার অধিকারকে স্বীকার করে এবং নিজ নিজ জাতীয় আইনানুসারে এই অধিকারের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) এই সুবিধাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মঞ্জুর করার ব্যাপারে বিচার্য বিষয়সমূহ হল, সম্পদের সংস্থান এবং শিশু ও শিশুর ভরণ-পোষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা। এ ছাড়া, শিশু কিংবা তার পক্ষ থেকে সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্য পেশকৃত দরখাস্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য কোনো বিবেচনা।

ধারা—২৭

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

www.pathagar.com

(২) পিতামাতা কিংবা শিশুর দায়িত্ব গ্রহণকারী অন্যান্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে সামর্থ্য ও আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী শিশুর উন্নয়নের জন্য উপযোগী জীবনমান নিশ্চিত করা।

(৩) শরিক রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় পরিস্থিতি অনুসারে এবং তাদের সামর্থ্যানুযায়ী এই অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে কিংবা শিশুর দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যদেরকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত উপকরণ সাহায্য এবং সহায়তা কর্মসূচির ব্যবস্থা করবে, বিশেষভাবে পুষ্টি, পোশাক ও গৃহায়নের ক্ষেত্রে।

(৪) শরিক রাষ্টসমূহ দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রে শিশুর পিতামাতা কিংবা শিশুর অর্থনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিশুর খোরপোষ আদায় নিশ্চিত করতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশেষভাবে, যে ক্ষেত্রে শিশুর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি শিশুর থেকে পৃথকভাবে বসবাস করে, সে ক্ষেত্রে শরিক রাষ্ট্রসমূহ এতদসম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সামিল হবে কিংবা এ জাতীয় চুক্তি সম্পাদনে উৎসাহ যোগাবে, একই সঙ্গে অন্যান্য উপযোগী ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করবে।

ধারা—২৮

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকার করে এবং এই অধিকার প্রগতিশীলভাবে এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে অর্জনের লক্ষ্যে তারা, বিশেষভাবে—

ক. সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনা খরচে লাভের সুযোগ করে দেবে;

খ. সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করে গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহ দেবে এবং প্রতিটি শিশুর জন্য এই শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার এবং বিনা খরচে শিক্ষালাভ ও প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মতো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ দেবে;

গ. সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করবে;

ঘ. শিক্ষাগত ও বৃত্তিমূলক তথ্য এবং দিঙ্‌নির্দেশনা সকল শিশুর জন্য লভ্য ও প্রাপ্য করবে;

ঙ. বিদ্যালয়ের নিয়মিত হাজিরাকে উৎসাহিত করতে এবং স্কুল ত্যাগের হার কমাতে পদক্ষেপ নেবে।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধানের রীতি যাতে শিশুদের মানবিক মর্যাদা এবং এই সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সকল ব্যবস্থা নেবে।

(৩) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার এবং উৎসাহিত করবে, এ ক্ষেত্রে বিশ্বে বিরাজমান অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা দান এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি আয়ত্বে আনার পথ সুগম করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকবে। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ধারা—২৯

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত লক্ষ্য থাকবে —

ক. শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ;

খ. মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

গ. শিশুর পিতামাতা, তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা, ভাষা ও মূল্যবোধ, শিশু যে দেশে বাস করে সেখানকার জাতীয় মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

ঘ. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ, নৃগোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য শিশুর প্রস্তুতি;

ঙ. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

(২) এই ধারা কিংবা ধারা ২৮-এর কোনো অংশই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার ব্যাপারে ব্যক্তি বা সংস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যদি সব সময় এই ধারার অনুচ্ছেদ-১-এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসৃত হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত শিক্ষা রাষ্ট্রনির্দেশিত ন্যূনতম মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে।

ধারা—৩০

যেসব দেশে জাতি-গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত

www.pathagar.com

সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে, সেসব দেশে ঐ ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বা আদিবাসী শিশুকে সমাজে তার সম্প্রদায়ের অপরাপর সদস্যের সঙ্গে তার নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ, নিজস্ব ধর্মের কথা ব্যক্ত করা ও চর্চা করা কিংবা তার নিজ ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ ভোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা—৩১

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর বিশ্রাম ও অবকাশ যাপন, বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক জীবন ও সুকুমার শিল্পে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকার করে।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ সংস্কৃতি ও শিল্প সংক্রান্ত জীবনে শিশুর পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণের অধিকারকে সম্মান দেবে ও জোরদার করবে এবং সংস্কৃতি, সুকুমার শিল্প, বিনোদন ও অবকাশমূলক কার্যক্রমে যথাযথ ও সমান সুযোগ থাকার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে।

ধারা—৩২

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে রক্ষা করবে এবং শিশুকে দিয়ে যাতে বিপদাশঙ্কাপূর্ণ ও শিশুর শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কিংবা তার স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর কাজ করানো না হয় সে ব্যবস্থা নেবে।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই ধারার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত পদক্ষেপ নেবে। এই উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে শরিক রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে —

ক. কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে ন্যূনতম বয়ঃসীমা নির্ধারণ করবে;

খ. কর্মস্থলে কর্মঘণ্টা এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত নিয়ম-নীতি ঠিক করে দেবে;

গ. এই অনুচ্ছেদ কার্যকরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত শাস্তি বা অন্যান্য বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা রাখবে।

ধারা—৩৩

শরিক রাষ্ট্রসমূহ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তির বর্ণনা অনুযায়ী শিশুদের মাদক ও মনঃপ্রভাবী দ্রব্যের অবৈধ সেবন থেকে রক্ষা করবে এবং এই ধরনের বস্তুর অবৈধ উৎপাদন ও চোরাচালানের কাজে শিশুদের নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখার সকল প্রকার যথোপযুক্ত আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা—৩৪

শরিক রাষ্ট্রসমূহ সকল প্রকারের যৌন অপব্যবহার ও যৌন উৎপীড়ন থেকে শিশুকে সুরক্ষায় সচেষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ রোধ করতে শরিক রাষ্ট্রগুলো জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপক্ষীয় সকল উপযোগী কার্যব্যবস্থা নেবে :

ক. কোনো বেআইনি যৌন ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হতে শিশুকে প্ররোচিত কিংবা বাধ্য করা;

খ. পতিতাবৃত্তি কিংবা অন্যান্য বেআইনী যৌন তৎপরতায় শিশুদেরকে ব্যবহার করা;

গ. যৌন অশ্লীলতাপূর্ণ কোনো ক্রিয়াকর্ম বা বিষয়বস্তুতে শিশুদেরকে ব্যবহার করা।

ধারা—৩৫

শরিক রাষ্ট্রসমূহ যে কোনো উদ্দেশ্যে বা যে কোনো ধরনের শিশু অপহরণ, বিক্রয় বা পাচার রোধে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।

ধারা—৩৬

শরিক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর কল্যাণে যে কোনো দিক থেকে অনিষ্টকর অন্যান্য সব ধরনের শোষণ থেকে শিশুদেরকে সুরক্ষা করবে।

ধারা—৩৭

শরিক রাষ্ট্রসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে :

ক. কোনো শিশুই নির্যাতন কিংবা অন্যবিধ নৃশংস, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর কোনো আচরণ বা শাস্তির শিকার হবে না। ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোনো অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড অথবা মুক্তির সম্ভাবনাহীন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হবে না।

খ. বেআইনি কিংবা স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে কোনো শিশুকেই তার মুক্ত জীবন থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কোনো শিশুর গ্রেফতার, আটকাদেশ বা কারাদণ্ড আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং এই সকল পদক্ষেপ শুধুমাত্র সর্বশেষ উপায়

www.pathagar.com

হিসাবে এবং সবচাইতে সংক্ষিপ্ততম উপযুক্ত সময়ের জন্য গৃহীত হবে।

গ. মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর সঙ্গে মানবিক এবং মানুষের সহজাত মর্যাদার প্রতি সম্মান রেখে এবং তার বয়সানুপাতিক প্রয়োজনাবলির দিকে লক্ষ্য রেখে আচরণ করা হবে। বিশেষ করে, মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুকে পূর্ণবয়স্কদের থেকে পৃথক রাখা হবে, যতক্ষণ তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। এবং পত্রালাপ ও সাক্ষাতের মাধ্যমে পরিবারের সঙ্গে কেবলমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতীত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার অধিকার শিশুর থাকবে।

ঘ. মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর দ্রুততার সঙ্গে আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা লাভের এবং সেই সঙ্গে মুক্ত জীবন থেকে তাকে বঞ্চিত করার আইনগত বৈধতাকে আদালতে কিংবা অন্যান্য উপযুক্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের সামনে চ্যালেঞ্জ করার এবং ঐ ধরনের যে কোনো কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে ত্বরিত সিদ্ধান্ত লাভের অধিকার থাকবে।

ধারা—৩৮

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ সশস্ত্র সংঘাতকালে তাদের জন্য প্রযোজ্য এবং শিশুদের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের বিধিসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর পরিপালন নিশ্চিত করতে অঙ্গীকার করছে।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ ১৫ বছরের কম বয়সী কেউ যাতে সরাসরি কোনো সংঘাতে না জড়ায় তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেবে।

(৩) শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের সশস্ত্র বাহিনীতে ১৫ বছরের কম বয়সীদের অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকবে। যাদের বয়স ১৫ বছর হয়েছে কিন্তু ১৮ বছরের কম তাদেরকে সেনাদলে ভর্তির সময় শরিক রাষ্ট্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স্কদের অগ্রাধিকার প্রদানের চেষ্টা করবে।

(৪) সশস্ত্র সংঘাতকালীন বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার

www.pathagar.com

বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে শরিক রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধকবলিত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ফলপ্রসূ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা—৩৯

শরিক রাষ্ট্রসমূহ যে কোনো ধরনের অবহেলা, শোষণ বা দুর্ব্যবহার, নির্যাতন বা অন্য কোনো ধরনের নৃশংস, অমানবিক বা অমর্যাদাকর আচরণ বা শাস্তি কিংবা সশস্ত্র সংঘাতের শিকার শিশুদের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা এবং সামাজিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করতে উপযোগী সকল কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সুস্থতা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা এমন এক পরিবেশে হবে যা শিশুর স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান এবং মর্যাদাকে পুষ্ট করবে।

ধারা—৪০

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ ফৌজদারি আইন লঙ্ঘনকারী হিসাবে কথিত, অভিযুক্ত কিংবা চিহ্নিত প্রতিটি শিশুর এই অধিকারের স্বীকৃতি দেয় যে তার সঙ্গে এমন আচরণ করা হবে যা শিশুর আত্মসম্মান ও স্বকীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ফলে মানবাধিকার ও অপরের মৌলিক অধিকারসমূহের প্রতি শিশুর শ্রদ্ধাবোধ জোরদার হবে এবং এই ক্ষেত্রে শিশুর বয়স বিবেচনায় রেখে সমাজে তার পুনর্বাসন ও গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করতে হবে।

(২) এই উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলোর প্রতি সম্মান রেখে শরিক রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে নিশ্চিত করবে যে —

ক. কোনো কাজ করা বা না করার কারণে কোনো শিশুই ফৌজদারি আইনভঙ্গকারী হিসাবে কথিত, অভিযুক্ত বা চিহ্নিত হবে না, যে কাজ করা বা না করার সময়ে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইনে তা নিষিদ্ধ ছিল না;

খ. ফৌজদারি আইনভঙ্গকারী হিসাবে কথিত কিংবা অভিযুক্ত প্রতিটি শিশুর ন্যূনপক্ষে নিশ্চয়তা থাকবে যে :

১. আইনানুসারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ হিসাবে বিবেচিত হবে;

২. শিশুকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ দ্রুত এবং সরাসরি অবহিত করতে হবে এবং যথাযথ ক্ষেত্রে পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি ও তা তুলে ধরার জন্য আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা দিতে হবে;

৩. শিশুকে আইনগত ও যথাযথ সহায়তা প্রদানপূর্বক কালক্ষেপণ ব্যতিরেকে উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা বিচারসংস্থায় আইনানুসারে সুষ্ঠু শুনানির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে এবং শিশুর বয়স ও পারিপার্শ্বিকতা, পিতামাতা অথবা আইনসম্মত অভিভাবকের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে;

৪. প্রমাণাদি পেশ বা অপরাধ স্বীকার, প্রতিপক্ষ সাক্ষিদের জেরা করা বা তাদের জেরার জবাব দান এবং সমতার শর্তে তার পক্ষে সাক্ষি হাজির করা ও সেই সাক্ষিদের সওয়াল-জওয়াব করার ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না;

৫. শিশু ফৌজদারি আইন লঙ্ঘন করেছে বলে বিবেচিত হলে এবং তার পরিণতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং কোনো কার্যব্যবস্থা আরোপিত হলে তা উচ্চতর কোনো উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা বিচার-সংস্থায় আইনানুসারে পুনর্বিবেচিত হতে হবে;

৬. ব্যবহৃত ভাষা শিশু বুঝতে বা বলতে না পারলে বিনা ব্যয়ে এক জন দোভাষীর সহায়তা পাবে;

৭. বিচারপ্রক্রিয়ার সর্বস্তরে তার একান্ত গোপনীয়তার প্রতি পূর্ণ সম্মান দিতে হবে।

(৩) শরিক রাষ্ট্রসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে ফৌজদারি আইন ভঙ্গকারী হিসাবে কথিত, অভিযুক্ত কিংবা চিহ্নিত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে উৎসাহিত করবে এবং বিশেষভাবে—

ক. এমন একটি ন্যূনতম বয়ঃসীমা নির্ধারণ করবে, যার নিচের বয়সী শিশু ফৌজদারি আইন লঙ্ঘনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

খ. এই ধরনের শিশুর বেলায় কখনো বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে অন্য কোনো উপযোগী এবং বাঞ্ছনীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হলে অবশ্যই মানবাধিকার এবং আইনগত রক্ষাব্যবস্থার প্রতি পুরোপুরি মর্যাদা দিতে হবে।

(৪) শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের বন্দোবস্ত, যেমন তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও তদারকি, উপদেশ প্রদান, শিক্ষানবিশি, লালন-পালন; শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি এবং প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানের অন্যান্য বিকল্প লভ্য হতে হবে

www.pathagar.com

যাতে এ বিষয় নিশ্চিত হয় যে শিশুর সঙ্গে কৃত আচরণরীতি তার কল্যাণের জন্য উপযোগী এবং তার পারিপার্শ্বিকতা ও অপরাধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধারা—৪১

এই সনদের কিছুই সেই সব বিধি-ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, যা শিশু অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর অনুকূল এবং যা রয়েছে —

ক. শরিক রাষ্ট্রের আইনে; কিংবা

খ. ঐ রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক আইনে।

পরিচ্ছেদ-২

ধারা—৪২

শরিক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ এবং কার্যকর পন্থায় এই সনদের নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থাসমূহকে বয়স্ক ও শিশুর প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে উদ্যোগী হবে।

ধারা—৪৩

(১) এই সনদে বর্ণিত দায়দায়িত্বসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষার্থে শিশু অধিকার বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যে কমিটি অতপর প্রদত্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে।

(২) এই কমিটিতে থাকবে উচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন এবং এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রে স্বীকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন দশ জন বিশেষজ্ঞ। শরিক রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদের মধ্য থেকে কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবে এবং তাঁরা ব্যক্তিগত যোগ্যতাবলে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ক্ষেত্রে সুষম ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব এবং মুখ্য আইনগত কাঠামোসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

(৩) শরিক রাষ্ট্রসমূহের মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটে কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি শরিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্য থেকে এক জনকেই মনোনয়ন দেবে।

(৪) কমিটির প্রারম্ভিক নির্বাচন এই সনদ কার্যকর হবার ছয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীতে প্রতি দ্বিতীয় বছরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক নির্বাচনের অন্তত চার মাস আগে জাতিসংঘের মহাসচিব শরিক রাষ্ট্রসমূহকে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন পেশের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেবেন। এরপর মহাসচিব মনোনয়ন প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত তার উল্লেখ সহকারে উক্ত ব্যক্তিদের নামের বর্ণক্রমানুসারে একটি তালিকা তৈরি করে এই সনদের শরিক রাষ্ট্রসমূহের বরাবরে পেশ করবেন।

(৫) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতিসংঘ সদর দফতরে, মহাসচিব আহূত শরিক রাষ্ট্রসমূহের বৈঠকে। এই বৈঠকে দুই-তৃতীয়াংশ শরিক রাষ্ট্রের উপস্থিতি কোরাম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁরাই নির্বাচিত হবেন, যাঁরা উপস্থিত ও ভোটদানকারী শরিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বাধিক ভোট এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করবেন।

(৬) কমিটির সদস্যগণ চার বছর মেয়াদে নির্বাচিত হবেন। মনোনয়ন পেলে তাঁরা পুনর্নির্বাচিত হবার যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথম বারের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যকার পাঁচ জন সদস্যের মেয়াদ প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দুই বছরের শেষে উত্তীর্ণ হবে। এই পাঁচ জন সদস্যের নাম সভার সভাপতি কর্তৃক লটারির মাধ্যমে ঠিক হবে।

(৭) কমিটির কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, পদত্যাগ করলে কিংবা অন্য যে কোনো কারণে তিনি কমিটির দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে ঐ সদস্যের শূন্যপদে মনোনয়নদানকারী শরিক রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্য থেকে আরেক জন বিশেষজ্ঞ মনোনীত করবেন এবং তিনি কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বাদবাকি মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(৮) কমিটি তার নিজস্ব কার্যপ্রণালীবিধি প্রণয়ন করবে।

(৯) কমিটি দুই বছর মেয়াদে তার কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করবে।

(১০) কমিটির বৈঠক সাধারণত জাতিসংঘ সদর দফতরে কিংবা কমিটিনির্ধারিত অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সভা হবে সাধারণত বছরে একবার। কমিটির বৈঠকগুলির স্থায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে তা পুনর্বিবেচনা করা হবে এই সনদের শরিক রাষ্ট্রগুলোর বৈঠকে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে।

(১১) এই সনদে নির্ধারিত কমিটির ক্রিয়াকর্ম কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব প্রয়োজনীয় কর্মচারী এবং সুবিধাদির বন্দোবস্ত করবেন।

(১২) সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের

www.pathagar.com

আওতায় প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যগণ সাধারণ পরিষদ-নির্ধারিত শর্তানুযায়ী জাতিসংঘের সংস্থান থেকে বেতন–ভাতা গ্রহণ করবেন।

ধারা—৪৪

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘ মহাসচিব মারফত কমিটির কাছে এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাদের গৃহীত ব্যবস্থা এবং সব অধিকার ভোগের বিষয়ে অগ্রগতির ব্যাপারে প্রতিবেদন পেশের অঙ্গীকার করছে —
ক. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এই সনদে অন্তর্ভুক্তির দুই বছরের মধ্যে;
খ. এরপর থেকে প্রতি পাঁচ বছরে।

(২) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রতিবেদনে এই সনদের আওতাধীন বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিপূরণের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান এবং অসুবিধার, যদি থাকে, উল্লেখ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশে সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কমিটিতে একটি ব্যাপক ধারণা দেওয়ার জন্য প্রতিবেদনে পর্যাপ্ত তথ্যের সন্নিবেশও থাকতে হবে।

(৩) যে শরিক রাষ্ট্র কমিটির নিকট ব্যাপক প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করেছে, তাকে এই ধারার অনুচ্ছেদ-১ (খ) অনুযায়ী পেশকৃত পরবর্তী প্রতিবেদনসমূহে পূর্বে প্রদত্ত মৌলিক তথ্যাদির পুনরুল্লেখ করতে হবে না।

(৪) কমিটি শরিক রাষ্ট্রসমূহের নিকট সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আরো তথ্যের অনুরোধ জানাতে পারে।

(৫) কমিটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের নিকট প্রতি দু'বছরে তার কর্মতৎপরতার উপর প্রতিবেদন পেশ করবে।

(৬) শরিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ নিজ দেশের জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিত করার ব্যবস্থা নেবে।

ধারা—৪৫

এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করতে এবং এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে —

ক. এই সনদের সেই সব বিধিব্যবস্থা বাস্তবায়নের ব্যাপারে বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘের অপরাপর প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হবে, যে সকল বিধিব্যবস্থা উল্লিখিত সংগঠনসমূহের নিজস্ব দায়িত্বের আওতাভুক্ত। এই সনদের সেই সব বিষয় বাস্তবায়নের ব্যাপারে কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং অন্যান্য উপযোগী সংস্থার কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ-পরামর্শ আহ্বান করতে পারে, যে সকল ক্ষেত্রে ঐ সব সংস্থার নিজস্ব দায়িত্বের আওতাভুক্ত। বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে কমিটি এই সনদের সেই সব ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের ওপর প্রতিবেদন দাখিলের আহ্বান জানাতে পারে, যেগুলো ঐ সব সংস্থার তৎপরতার আওতায় পড়ে;

খ. শরিক রাষ্ট্রগুলোর কোনো প্রতিবেদনে যদি কারিগরি পরামর্শ কিংবা সহায়তার জন্য কোনো অনুরোধ কিংবা প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ থাকে, তা হলে উক্ত অনুরোধ কিংবা চাহিদা সম্পর্কে কমিটি তার মন্তব্য এবং পরামর্শ (যদি থাকে) উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদনটি বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং অন্যান্য উপযুক্ত সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেবে;

গ. কমিটি তার পক্ষ থেকে শিশু অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গসমূহ পর্যালোচনার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ জানাতে সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ করতে পারে;

ঘ) বর্তমান সনদের ৪৪ এবং ৪৫ ধারার আওতায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি প্রস্তাবাবলি ও সাধারণ সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে পারে। এ ধরনের প্রস্তাব ও সাধারণ সুপারিশ সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রসমূহের কাছে পাঠানো হবে এবং শরিক রাষ্ট্রগুলোর তরফ থেকে কোনো মন্তব্য থাকলে তা সহ তারা সাধারণ পরিষদে সুপারিশ পেশ করা হবে।

পরিচ্ছেদ–৩

ধারা—৪৬

এই সনদ সকল স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা—৪৭

এই সনদ অনুমোদনসাপেক্ষ। অনুমোদনের দলিল জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা থাকবে।

ধারা—৪৮

এই সনদে যে কোনো রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার পথ খোলা

www.pathagar.com

থাকবে। এই অন্তর্ভুক্তির দলিলাদি জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা থাকবে।

ধারা—৪৯

(১) জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে অনুমোদন বা অন্তর্ভুক্তির বিংশতিতম দলিল জমা হওয়ার পরবর্তী ত্রিশতম দিনে এই সনদ কার্যকর হবে।

(২) অনুমোদন অথবা অন্তর্ভুক্তির বিংশতিতম দলিল জমা দেওয়ার পর সনদ অনুমোদন অথবা সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রে ঐ রাষ্ট্র কর্তৃক তার অনুমোদন অথবা অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত দলিল জমা দেওয়ার পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে এই সনদ কার্যকর হবে।

ধারা—৫০

(১) যে কোনো শরিক রাষ্ট্র কোনো সংশোধনীর প্রস্তাব করতে পারবে এবং তা জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট পেশ করতে হবে। অতঃপর মহাসচিব প্রস্তাবিত সংশোধনী শরিক রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন, সেই সঙ্গে প্রস্তাবের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠানে তারা পক্ষপাতী কিনা তা উল্লেখ করার অনুরোধ জানাবেন। এই যোগাযোগের তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ শরিক রাষ্ট্র এ ধরনের

সম্মেলনের পক্ষপাতী হলে মহাসচিব জাতিসংঘের আয়োজনে সম্মেলন আহ্বান করবেন। সম্মেলনে গরিষ্ঠসংখ্যক শরিক রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং ভোটের মাধ্যমে যে কোনো সংশোধনী গৃহীত হলে তা অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে পেশ করতে হবে।

(২) এই ধারার অনুচ্ছেদ-১ মোতাবেক গৃহীত কোনো সংশোধনী কার্যকর হবে যখন তা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠ শরিক রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হবে।

(৩) যখন কোনো সংশোধনী কার্যকর হবে, তা ঐ সকল শরিক রাষ্ট্রকে বাধ্যবাধকতাধীন করবে, যারা তা গ্রহণ করছে। অন্যান্য শরিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই সনদের শর্তাবলি এবং তাদের দ্বারা গৃহীত যে কোনো পূর্বতন সংশোধনী বাধ্যবাধকতাধীন হবে।

ধারা—৫১

(১) অনুমোদন কিংবা অন্তর্ভুক্তির সময় রাষ্ট্রসমূহের উত্থাপিত কোনো আপত্তিকর বিষয়বস্তু জাতিসংঘ মহাসচিব গ্রহণ করবেন এবং তা সকল রাষ্ট্রকে অবহিত করবেন।

(২) এই সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোনো আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না।

(৩) জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে যে কোনো সময় আপত্তি প্রত্যাহার করা যাবে। মহাসচিব অতঃপর তা সকল রাষ্ট্রকে জানাবেন। মহাসচিব যেদিন নোটিশটি পাবেন সেদিন থেকে তা কার্যকর হবে।

ধারা—৫২

জাতিসংঘ মহাসচিবকে লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে কোনো শরিক রাষ্ট্র এই সনদ বর্জন করতে পারে। মহাসচিব কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছর পর এই বর্জন কার্যকর হবে।

ধারা—৫৩

জাতিসংঘ মহাসচিব এই সনদের সংরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা—৫৪

এই সনদের মূল কপি, যার আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় সংস্করণ সমান মানসম্পন্ন, জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে সংরক্ষিত থাকবে।

খু. জা.

www.pathagar.com

শিশু আইন

বাংলাদেশের (দ্র) সংবিধানে শিশুদের জন্য বিশেষ সুবিধামূলক আইন প্রণয়নে সরকারকে অধিকার দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালের ২২শে জুন 'চিল্ড্রেন অ্যাক্ট' (শিশু আইন) জারি করেন। এই আইন অনুযায়ী ১৬ বছর পর্যন্ত বয়স্ক অপরাধীদের জন্য স্বতন্ত্র হাজতগৃহ, নিরাপত্তা, বিচারব্যবস্থা এবং শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের আইনে শিশুর নাম ও জাতীয়তার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই আইন শিশুকে তার পিতামাতার নিকট থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে। সকল ধরনের অবহেলা, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, শোষণ, অপব্যবহার ও অবৈধ ব্যবস্থা থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করেছে।

খু. জা.

শিশু জাদুঘর

বাংলাদেশের (দ্র) ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করা ও জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (দ্র)-তে ১৯৯১ সালে শিশু জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এতে প্রদর্শনীর জন্য আছে ৭২টি শো-কেস। এতে ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে। এই জাদুঘরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে (দ্র) অংশগ্রহণকারী শহীদ শিশু-কিশোরদের প্রতিকৃতি, জীবনবৃত্তান্ত ও তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।

জাদুঘরের দোতলায় বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন তথ্য ও পরিচিতি আছে। এসব তথ্যসামগ্রী শো-কেসে সাজানো আছে। এখানে এসে শিশুরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও দেশের জনগণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পায়।

খু. জা.

শিশু পার্ক

দেশের শিশু-কিশোরদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনোদনস্থল হল শিশু পার্ক। এটি অবস্থিত ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে, সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের (দ্র) একটি পরিবেষ্টিত অংশ জুড়ে। এই স্থানেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং ঐ বছর ৭ই মার্চ এখান থেকেই বঙ্গবন্ধু (দ্র) স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (দ্র) সক্রিয় উদ্যোগে শিশু পার্কের রূপায়ণের কাজ শুরু হয়। ১৯৭৮ সালের ২০শে নভেম্বর এর ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার। জাপানি প্রকৌশলীদের একটি দল এর সার্বিক স্থাপনাকাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করা হয় ১৯৭৯ সালে।

শিশু পার্ক অবস্থিত ১৫ একর জায়গা জুড়ে। ছোট-বড় মিলিয়ে এখানে মোট বিনোদন আইটেমের সংখ্যা ১৩। এসবের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে 'উড়ন্ত বিমান', 'উড়ন্ত নভোযান', 'আনন্দঘূর্ণি', ' বৈদ্যুতিক ট্রেন', 'ঝুলন্ত চেয়ার', 'রোমাঞ্চ চক্র' ও 'ফুলদানি আসন'।

সূচনালগ্নে শিশু পার্কের সামগ্রিক পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের (দ্র) ওপর। বর্তমানে এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে। এক জন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী প্রকৌশলী) শিশু পার্কের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম তদারক করে থাকেন। তাঁর

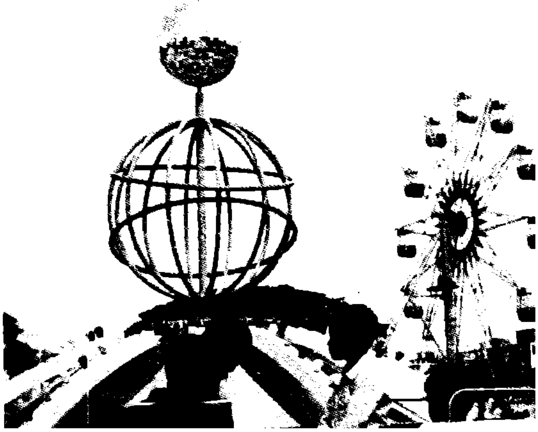

www.pathagar.com

অধীনে রয়েছে বেশ কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী, যাঁরা এই পার্ক পরিচালনা করে থাকেন।

শিশু পার্কে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জক আইটেম ছাড়াও তাদের জন্য রয়েছে বেশ কিছু খাবারের দোকান, রয়েছে একটি অনুসন্ধানকেন্দ্র, একটি অভ্যর্থনাকেন্দ্র, শৌচাগার ও একটি প্রশাসনিক দপ্তর। শিশু পার্কে জনপ্রতি প্রবেশ-ফি ৩ টাকা। প্রতিটি আইটেমে সওয়ার হওয়ার ফি ২ টাকা, কোনো কোনোটির ৪ টাকা। রোববার এই পার্ক বন্ধ থাকে। বুধবার কেবল দুঃস্থ ও গরিব শিশুদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। বিনোদন-ফি বাবদ এ দিন তাদের কাছ থেকে কোনো রকম অর্থ নেওয়া হয় না। সপ্তাহের বাকি পাঁচ দিন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সাধারণ শিশু-কিশোরদের জন্য এটি উন্মুক্ত থাকে।

আ. হ.

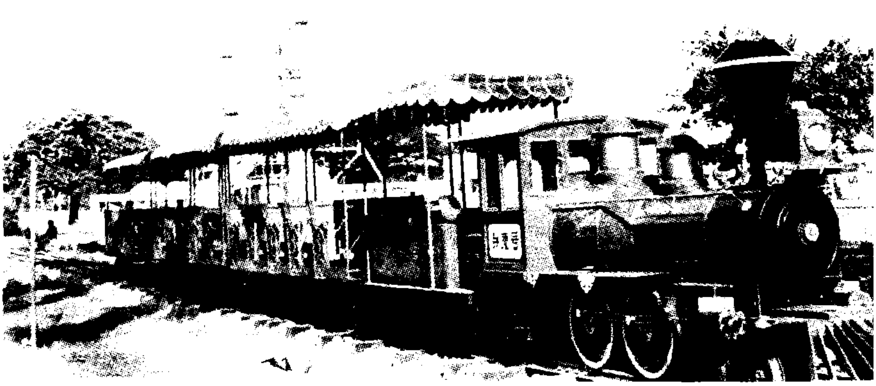

www.pathagar.com

শিশু হাসপাতাল

শিশুদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ও শিশুস্বাস্থ্য রক্ষার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সংবলিত হাসপাতালকে শিশু হাসপাতাল বলা হয়।

বয়ঃপ্রাপ্তদের চেয়ে শিশুদের রোগে ভোগার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে সংক্রামক, অপুষ্টিজনিত এবং জন্মগত রোগে শিশুরা সহজেই আক্রান্ত হয়। ফলে শিশু-চিকিৎসার ক্ষেত্রে শিশু হাসপাতালের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রোগভেদে শিশু হাসপাতালেও বয়স্কদের মতো বিভিন্ন বিভাগ গড়ে উঠেছে।

শিশুদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগের চিকিৎসার জন্য শিশু হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। তা ছাড়াও এ হাসপাতালে শিশুদের বিভিন্ন প্রকার স্নায়বিক রোগ, **শ্বসনতন্ত্রের** (দ্র) রোগ, অপুষ্টিজনিত রোগ, রক্তের ত্রুটিজনিত রোগ ইত্যাদিরও চিকিৎসা করা হয়।

শিশু হাসপাতালে শিশুদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক প্রদানেরও ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুরোগ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুচিকিৎসকগণ শিশু হাসপাতালে কর্মরত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিশু হাসপাতাল রয়েছে।

সি. না. হ.

শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের

১৯৪৭ সালের পর থেকে এ দেশে একের পর এক বেশ কিছু ছোটদের উপযোগী সাময়িকী বা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলোর কোনোটির আয়ু দীর্ঘ ও কোনোটির হ্রস্ব। আবার কোনো কোনোটির প্রকাশনা পাকিস্তান আমল থেকে এখনো অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের সামগ্রিক বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে এগুলোর অবদান কোনোক্রমে কম তো নয়ই, বরং গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে সেইসব শিশু-কিশোর পত্রিকা বা সাময়িকীর বিবরণ তুলে ধরা হল।

মুকুল : ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এটি প্রকাশিত হয় কেন্দ্রীয় মুকুল ফৌজ-এর পাক্ষিক মুখপত্র হিসাবে। সম্পাদক ছিলেন আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন। **পাকিস্তান আন্দোলনের** (দ্র) আদর্শ প্রচারই ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। তবে ছোটদের মনস্তত্ত্বনির্ভর নানাবিধ নির্মল রচনাও এতে প্রকাশিত হত। এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 'কায়েদে আজম সংখ্যা' হিসাবে। পরে 'মুকুল'-এর সম্পাদকের পরিবর্তন ঘটে। এবং এর প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং এক সময়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে 'মুকুল' আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে, পত্রিকাটির এ পর্যায়ে সম্পাদক হন হোসেন জামাল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হয় নি।

ঝংকার : পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বপ্রথম কিশোর মাসিক পত্রিকা। 'মুয়াজ্জীন' নামের একখানি হাতে লেখা পত্রিকাই পরে ছাপার অক্ষরে উল্লিখিত নাম গ্রহণ করে প্রকাশিত হতে থাকে।

'ঝংকার'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের (১৯৪৯) মাঘ মাসে। সম্পাদক ছিলেন মঈদ-উর রহমান। পরিচালক মীজানুর রহমান। প্রকাশিত হত ঝংকার কার্যালয়, ৩৬ চাঁদনী ঘাট, ঢাকা থেকে এবং ছাপা হত সম্পাদক কর্তৃক আলতাফ প্রেস, ১১ মাহুতটুলী, ঢাকা থেকে।

পত্রিকাটিতে নানা আকর্ষণীয় বিভাগ ছিল। তরুণ লিখিয়েদের পাশাপাশি প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনাসম্ভার প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩০। মূল্য ছিল ৬ আনা। পত্রিকাটি ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা পর্যন্ত বেরিয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

মিনার : শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। সম্পাদক ছিলেন বেগম ফওজিয়া সামাদ। প্রকাশিত হত ৬ ফোল্ডার স্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা থেকে। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৫৫। দাম ৮ আনা। প্রায় দুই বছরকাল নিয়মিত প্রকাশের পর এটি ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে (১৯৫১) বন্ধ হয়ে যায়। নিয়মিত বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আকর্ষণীয় ছিল পত্রিকাটি।

হুল্লোড় : কিশোর মাসিক পত্রিকা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ বঙ্গাব্দ ১৩৫৭। সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহ্‌মদ। উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী, শিল্পী কামরুল হাসান (দ্র) ও শিশুসাহিত্যিক হাবীবুর রহমান (দ্র)। মুদ্রণ পারিপাট্যে মনোরম এই পত্রিকাটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত হত মোহাম্মদ শফী খান কর্তৃক ক্যাপিটাল প্রিন্টিং প্রেস, ৫০

www.pathagar.com

বেগমবাজার রোড, ঢাকা থেকে। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪০। দাম ছিল ৭ আনা। পৌনে দু'বছরের মাথায় এর প্রকাশনা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

সবুজ নিশান : শিশু মাসিক। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯৫১ সালের এপ্রিল-মে)। সম্পাদক ছিলেন তৈয়েবুর রহমান। প্রকাশিত ও মুদ্রিত হত সম্পাদক কর্তৃক তমদ্দুন প্রেস, ৫০ লালবাগ রোড, ঢাকা থেকে। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪৮। দাম ছিল ৬ আনা।

'সবুজ নিশান'-এর আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র এক বছর। তবে এই এক বছরের মাথায় এর 'বর্ষ' পরিবর্তন করা হয়। প্রথম ৬টি সংখ্যা প্রকাশ করার পরপরই এর বর্ষ শেষ হয়। দু'মাস প্রকাশনা বন্ধ রাখার পর পৌষ মাস থেকে দ্বিতীয় বর্ষ শুরু করা হয়। এরপর কোনোক্রমে ৪টি সংখ্যা প্রকাশ করার পর এর প্রকাশনা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

আলাপনী : এক সময়ের জনপ্রিয় সচিত্র কিশোর মাসিক। ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (১৯৫৪ সালের আগস্ট) এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আবদুল ওয়াহেদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সম্পাদনা করতেন কবি আজিজুর রহমান।

সম্পাদক কর্তৃক পত্রিকাটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত হত মজিদ পাবলিশিং প্রেস, ২/২ রাজার দেউড়ী, ঢাকা থেকে। বার্ষিক সডাক মূল্য ছিল ৫ টাকা, ষান্মাসিক ৩ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৬ আনা। 'আলাপনী' তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের শিশু-কিশোরদের কাছে খুবই সমাদৃত হয় এবং আট বছর নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হবার সঠিক তারিখ বা মাস সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি।

সেতারা : পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম শিশু পাক্ষিক পত্রিকা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৯৫৫ সালের মার্চ (১৩৬১ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন) মাসে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দীন (দ্র)। ছয় থেকে নয় বছর বয়সী পাঠকদের দিকে লক্ষ রেখেই এতে রচনাদি প্রকাশ করা হত।

পত্রিকাটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত হত যথাক্রমে পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি এবং আল-হেলাল প্রেস, ৩/১ জনসন রোড, ঢাকা থেকে। এর বার্ষিক সডাক মূল্য ছিল ১ টাকা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল ১ আনা।

১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারি (২১শ সংখ্যা) থেকে পত্রিকাটির নাম সামান্য পরিবর্তন করে রাখা হয় 'সিতারা'। দ্বিতীয় বর্ষ নবম সংখ্যার (১৯৫৬ সালের ১লা জুলাই) পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

শাহীন : পাক্ষিক কিশোর পত্রিকা। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৯৫৫ সালের ৭ই মার্চ (১৩৬১ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন) প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দীন। এটি প্রতি ইংরেজি মাসের ৭ ও ২২ তারিখে প্রকাশ করা হত। 'শাহীন'-এর প্রতিটি সংখ্যা প্রবীণ ও নবীন লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ করার চেষ্টা লক্ষণীয় ছিল। প্রকাশিত ও মুদ্রিত হত যথাক্রমে পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি এবং আল-হেলাল প্রেস, ৩/১ জনসন রোড ঢাকা থেকে। পত্রিকাটির বার্ষিক সডাক চাঁদা ছিল ১ টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল ২ আনা এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১২।

পত্রিকাটি প্রথম দিকে অনিয়মিত ও পরে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হলেও ১৯৫৬ সালের ২৩শে জুলাই (দ্বিতীয় বর্ষ ১০ম সংখ্যা) থেকে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

সবুজ সেনা : কিশোর আন্দোলন 'পাকিস্তান সবুজ সেনা'র মুখপত্র ছিল এটি। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে (১৯৫৭ সালের এপ্রিল) প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আল কামাল আবদুল ওহাব। মোট ১১ টি সংখ্যা বেরুবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এটি মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হত।

খেলাঘর : সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ১৩৬২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন বেগম জেব-উন-নিসা আহমদ। মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত যথাক্রমে নারায়ণ মেশিন প্রেস, ১৩৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা ও কাজী শামসুল ইসলাম কর্তৃক ৯ নয়া পল্টন, ঢাকা থেকে। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩৮। দাম ছিল ৫ আনা। বার্ষিক সডাক চাঁদা ছিল সোয়া ৪ টাকা, ষান্মাসিক ২ টাকা। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ) থেকে এর প্রতি সংখ্যার মূল্য বেড়ে হয় ৪০ পয়সা। তবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে 'খেলাঘর'-এর প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে যায়। শেষের দিকে এটি

www.pathagar.com

জেসমিন প্রিন্টিং প্রেস, ৯ নয়া পল্টন থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির সম্পাদনায় নেপথ্যে থেকে কথাসাহিত্যিক কাজি আফসারউদ্‌দিন আহমদ বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। 'খেলাঘর' চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যায় ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে।

কিশলয় : সচিত্র শিশু-কিশোর পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আলমগীর জলীল। এটির বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছিল সাড়ে ৫ টাকা, যান্মাসিক ৩ টাকা। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৫৬। মূল্য ছিল ৮ আনা।

১৩৬৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস থেকে পত্রিকাটি পাক্ষিক থেকে মাসিকে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে এর চরিত্রও পরিবর্তিত হয়। পরিপূর্ণ সাহিত্যপত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এর সম্পাদক হন তখন আলাউদ্দিন আল আজাদ। পরিবর্তিত 'কিশলয়'-এর দাম রাখা হয় ৫০ পয়সা। পৃষ্ঠাসংখ্যা করা হয় ৬৮। মুদ্রাকর অপরিবর্তিত থাকেন। তবে পত্রিকাটির চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি।

রঙধনু : সচিত্র কিশোর মাসিক হিসাবে এটি প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ছিল বঙ্গাব্দ ১৩৬৭-র বৈশাখ মাস। সম্পাদক ছিলেন মোসলেম উদ্দিন। সহকারী সম্পাদক ছিলেন কাজী গোলাম আহমদ।

বিভিন্ন বিভাগ ও নানাবিধ রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে 'রঙধনু' প্রকাশিত হত। সম্পাদক কর্তৃক বুলবুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৯৫ ইসলামপুর রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পত্রিকাটি ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি সংখ্যার দাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬ আনা ও ৪৮।

পাপড়ি : এটি ছিল রাজশাহীর উত্তরায়ণ কচিকাঁচার মেলার মাসিক মুখপত্র। ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন হাবীবুর রহমান। পত্রিকাটি মাসিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও চতুর্থ সংখ্যা থেকে (১৯৬২ সালের এপ্রিল) পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি অর্থাৎ ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে মাসিক রূপে এবং ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যা থেকে চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত দ্বি-মাসিক হিসাবে

www.pathagar.com

প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য পরে এটি পুনরায় পাক্ষিকে পরিণত হয় এর ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা থেকে। 'পাপড়ি'র চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যাবার তারিখ বা মাস সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। এটি উল্লিখিত মেলার পক্ষে এ.কে.এম. আলী ইমাম কর্তৃক প্রকাশিত এবং মহিউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক স্ট্যাণ্ডার্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, সাহেব বাজার, রাজশাহী থেকে ছাপা হত। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮ এবং দাম ছিল ২৫ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছিল ৫ টাকা। আকার ছিল ১৫" X ১০"।

সবুজ পাতা : তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ইসলামী একাডেমীর মাসিক শিশু-কিশোর মুখপত্র হিসাবে ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন কথাসাহিত্যিক শাহেদ আলী। সহকারী সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ ইবরাহিম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইসলামী একাডেমী 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ'(দ্র)-এ রূপান্তরিত হলে নতুন কলেবরে এর প্রকাশনা শুরু হয়। পত্রিকাটি এখনো মাসিকরূপেই প্রকাশিত হচ্ছে।

সোনার কাঠি : বগুড়া থেকে এটি সচিত্র কিশোর মাসিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৭০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (১৯৬৩ সালের অক্টোবরে) এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর বার্ষিক সডাক চাঁদা ছিল সাড়ে ৩ টাকা, ষান্মাসিক ২ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল ৩১ পয়সা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২৪। আকার ছিল ৯ $\frac{১}{২}$" X ৪"। প্রকাশিত হত যথাক্রমে তছিরউদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ তাইফুল ইসলাম কর্তৃক মুসলিম বুক ডিপো ও সোনার কাঠি অফিস, ডা. মফিজউদ্দিন লেন, বগুড়া থেকে। মুদ্রিত হত খন্দকার আবু নাছের কর্তৃক বগুড়া লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড থেকে।

নবারুণ : সিলেট থেকে প্রকাশিত কিশোর মাসিক পত্রিকা। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে সম্ভবত এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন শামিম আজাদ। পরবর্তী কালে খায়রুল আমীন লস্কর এর সম্পাদক হন। ১৯৬৫ সালের মে সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

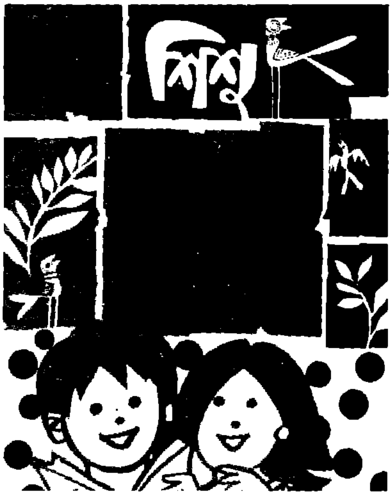

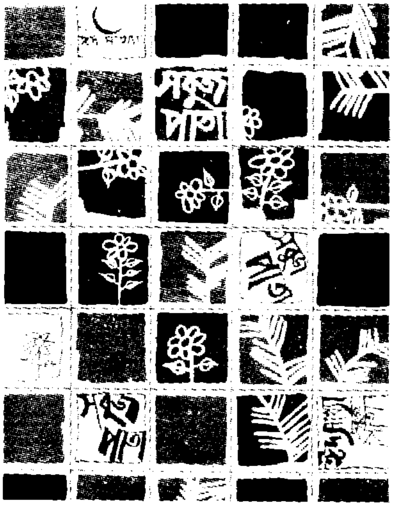

www.pathagar.com

টরেটক্কা : পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম কিশোর মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা। ঢাকার ওয়েস্ট এ্যাণ্ড হাই স্কুলের 'অগ্রণী বিজ্ঞান সংঘ'-র মুখপত্র হিসাবে ১৩৭১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মোঃ আবদুল কাদের এবং এ.কে.এম. রফিক উদ্দিন।

পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন ওয়েস্ট এ্যাণ্ড হাই স্কুল, আজিমপুর 'অগ্রণী বিজ্ঞান ক্লাব'-এর পক্ষে ভুঁইয়া ইকবাল। ছাপা হত এন. আর. জামালী বি. এ. কর্তৃক আমাদের প্রেস, ৩২/২ আজিমপুর রোড, ঢাকা-৯ থেকে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৬। দাম ১৫ পয়সা।

'টরেটক্কা'র বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এর প্রুফ দেখা, ব্লক তৈরি করা ও বাঁধাইসহ যাবতীয় কাজ করতেন এই ক্লাব-এর তরুণ সদস্য শিক্ষার্থীরা। বিষয়বৈচিত্র্য ও রচনায় সমৃদ্ধ হলেও পত্রিকাটির অকালমৃত্যু ঘটে ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর।

কচি ও কাঁচা : কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার মাসিক মুখপত্র। অঙ্গসৌষ্ঠব, বিষয়বৈচিত্র্য ও সম্পাদনাসহ যত্নশীলতায় এই সাময়িকীটি অত্যল্পকালের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের শিশুসাহিত্য জগতে নবতরঙ্গের সৃষ্টি করে। ১৩৭১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন রোকনুজ্জামান খান। উপদেষ্টামণ্ডলীতে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (দ্র), কবি বেগম সুফিয়া কামাল, মোহাম্মদ. নাসিরউদ্দীন (দ্র), অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, বেগম রোকাইয়া আনোয়ার, অধ্যক্ষ শফিকুল আমীন, ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন ও এ.বি.এম. মুসা।

প্রকাশিত হত রোকনুজ্জামান খান কর্তৃক ৬৬ পাটুয়াটুলি থেকে এবং ছাপা হত সওগাত প্রেস, ঢাকা থেকে। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪৮ এবং মূল্য ছিল ৩৭ পয়সা।

১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত একটানা ৭ বছর পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার পর আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে : কিশোর মাসিক পত্রিকা। ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে (১৩৭১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ) এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন গোলাম মোরশেদ। অঙ্গসৌষ্ঠব ও বিভাগীয় রচনার বিষয়বৈচিত্র্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। শান্তিনগর, ঢাকা থেকে নিলুফার বানু ও শামস্ প্রিন্টিং প্রেস, ৮৯ ঠাটারী বাজার, ঢাকা থেকে এম. আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত হত। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪৪। দাম ছিল ৪৪ পয়সা। বার্ষিক চাঁদার হার ছিল সাড়ে চার টাকা, ষান্মাসিক আড়াই টাকা। ২য় সংখ্যা থেকে পত্রিকাটির সম্পাদক নিযুক্ত হন নিলুফার বানু। তবে এটি ক্ষীণায়ু একটি সাময়িকী ছিল। ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি এর প্রকাশনা চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

টাপুর টুপুর : ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে এটি প্রথমে একটি সঙ্কলন হিসাবে প্রকাশিত হয়। প্রধান সম্পাদক ছিলেন এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন বুলবন ওসমান, শাহাদৎ চৌধুরী ও চৌধুরী আবদুর রহমান। সৈয়দ মোহাম্মদ শফি কর্তৃক ফিরিঙ্গী বাজার রোড, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২০০ (আর্ট পেপার)। দাম ছিল ৪ টাকা ২৫ পয়সা।

এরপর 'টাপুর টুপুর' নিয়মিত মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। মাসিক হিসাবে এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। প্রধান সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ শফি। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ।

'টাপুর টুপুর' মুদ্রণসৌকর্য, অঙ্গসৌষ্ঠব ও সম্পাদনা-রীতির ক্ষেত্রে শুধু অভিনবত্বই বয়ে আনে না, এক ঝাঁক নতুন শিশুসাহিত্যিক সৃষ্টির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পত্রিকাটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত হত সৈয়দ মোহাম্মদ শফি কর্তৃক শিশুসাহিত্য বিতান, ৮ ফিরিঙ্গী বাজার রোড, চট্টগ্রাম ও তৎকর্তৃক আর্ট প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'টাপুর টুপুর' পুনরায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। তবে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত এর ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যাই ছিল সর্বশেষ সংখ্যা। এরপর এটি আর প্রকাশিত হয় নি।

নবারুণ : সচিত্র কিশোর মাসিক। ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের

www.pathagar.com

আষাঢ় মাসে এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন আব্দুস সাত্তার। প্রথম দিকে এটি প্রকাশিত হত পাকিস্তান পাবলিকেশন্স্-এর পক্ষে মহিউদ্দিন আহমদ কর্তৃক পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে এবং এম.এ. হক কর্তৃক মুদ্রিত হত অ্যাবকো প্রেস, ঢাকা থেকে।

পত্রিকাটি এখন অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০ থেকে। প্রায় এক যুগ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন কথাসাহিত্যিক কাজি আফসারউদ্‌দিন আহমদ। কিছুকাল এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন কে. জি. মোস্তফা। তারপর কয়েক বৎসর প্রধান সম্পাদক ছিলেন ফরিদউদ্দিন আহমদ ও সম্পাদক—খালেদা এদিব চৌধুরী।

ধান শালিকের দেশ : বাংলা একাডেমী (দ্র) থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর পত্রিকা। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা মাসিকরূপে প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন ড. মযহারুল ইসলাম। এরপর পদাধিকারবলে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন বাংলা একাডেমীর বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত বেশ কয়েক জন মহা-পরিচালক। নির্বাহী সম্পাদকদের মধ্যে হাসান জান (দ্র), সেলিনা হোসেন ও ওবায়দুল ইসলামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ধান শালিকের দেশ' বেশ কয়েক বছর ধরে মাসিকের পরিবর্তে চতুর্মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

শিশু : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (দ্র) থেকে প্রকাশিত সচিত্র শিশু-কিশোর মাসিক। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন শিশু একাডেমীর প্রথম পরিচালক জোবেদা খানম (দ্র) এবং সহকারী সম্পাদক বিপ্রদাশ বড়ুয়া।

'শিশু' পত্রিকার বৈশিষ্ট্য এখানে যে জন্মের পর থেকে এটি কখনোই অনিয়মিতভাবে বের হয় নি। কোনো যুগ্মসংখ্যা প্রকাশিত হয় নি। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় এটি যেমন দেশের প্রবীণ-নবীন শিশুসাহিত্যিকদের নিয়মিত রচনা প্রকাশের নির্ভরযোগ্য বাহন হয়ে উঠেছে, তেমনি সারা দেশে উত্তরোত্তর এর জনপ্রিয়তা ও গ্রাহকসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

নিয়মিত কিছু বিভাগসহ নিত্যনতুন লেখা প্রকাশের পাশাপাশি বছরে কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা বের করাও 'শিশু'র অন্যতম সম্পাদনাবৈশিষ্ট্য। একেবারে ছোটদের রচনা ও তাদের আঁকা ছবি প্রকাশের ব্যাপারেও পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

আগাগোড়া চার রঙা প্রচ্ছদপটসহ হোয়াইট প্রিন্ট কাগজে ছাপা পত্রিকাটির প্রকাশনা এখনো অব্যাহত আছে।

'শিশু'র বর্তমান সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া ও সহকারী সম্পাদক বিপ্রদাশ বড়ুয়া। প্রতি সাধারণ সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮, মূল্য ৫ টাকা। প্রকাশিত হয় পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাই কোর্ট এলাকা, ঢাকা কর্তৃক এবং মুদ্রিত হয় বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস লিমিটেড, ৪৬/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে।

ফুলকুঁড়ি : সচিত্র শিশু-কিশোর পত্রিকা। ফুলকুঁড়ি আসরের মুখপত্ররূপে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে (১৩৮৫) এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন মাসুদ আলী ও সহ-সম্পাদক জয়নুল আবেদীন আজাদ।

ফুলকুঁড়ি প্রথম মাসিকরূপে প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে। বর্তমানে এর সম্পাদক মাহবুবুল হক। নির্বাহী সম্পাদক জয়নুল আবেদীন আজাদ। প্রকাশিত হয় ৪৫ পূর্ব তেজতরী বাজার (৪র্থ তলা), ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা থেকে। এর প্রকাশনা এখনো অব্যাহত।

কিশোর বাংলা : ট্যাবলয়েড সাইজের ছোটদের সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬ সালে। দৈনিক বাংলা গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স্-এর অন্যতম পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হত এটি। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। দ্বিতীয় সম্পাদক ছিলেন সানাউল্লাহ নূরী। প্রথম পর্যায়ে পত্রিকাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩২।

১৯৭৭ সালের দিকে 'কিশোর বাংলা' অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স্-এর তত্ত্বাবধানে নীত হয়। এই পর্যায়ে পত্রিকাটির সম্পাদক হন এস. এম. পারভেজ। তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদক নিযুক্ত হন আহমদ জামান চৌধুরী। উল্লেখ্য, পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকেই ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন রফিকুল হক।

www.pathagar.com

অবজারভার গ্রুপের তত্ত্বাবধানে আসার পর পত্রিকাটি বহুরঙা হয়। এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল ছোটদের উপযোগী করে দেশ-বিদেশের চলতি খবরাদি প্রকাশ করা। আকর্ষণীয় সব বিভাগ তো ছিলই। পত্রিকাটি তার আয়ুষ্কালে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৯৮৩ সালে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

কিশোর তারকালোক : সচিত্র শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এর প্রধান সম্পাদক আরেফিন বাদল, সম্পাদক আহসান আল বকর। প্রথম সম্পাদক ছিলেন ইমদাদুল হক। প্রকাশিত হয় ২৫/৩ গ্রীন রোড, ঢাকা থেকে। পত্রিকাটির প্রকাশনা এখনো অব্যাহত।

কিশোরপত্রিকা : ছোটদের কিশোর মাসিক পত্রিকা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কাজী আনোয়ার হোসেন। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাসসহ আকর্ষণীয় বিভিন্ন বিভাগ ও শিক্ষণীয় নিবন্ধসমৃদ্ধ হয়ে এর নিয়মিত প্রকাশনা এখনো অব্যাহত রয়েছে। দেশের জনপ্রিয়তম শিশু-কিশোর সাময়িকীগুলোর অন্যতম। প্রকাশিত হয় ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা থেকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ও পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ১০ টাকা ও ৮০।

টইটম্বুর : শিশু-কিশোর মাসিক। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে। সম্পাদক : সেলিমা সবিহ্। উপদেষ্টা : সবিহ্-উল-আলম।

আকর্ষণীয় সব বিভাগে সমৃদ্ধ হয়ে এটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কিশোর পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। জনপ্রিয়তাধন্য এই সাময়িকী প্রকাশিত হয় টইটম্বুর পরিচালনা সম্পাদক মেজবাহ্ উদ্দীন জঙ্গী কর্তৃক প্রেস লিংক পাবলিকেশন্স্, ৬২/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে। প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮ ও মূল্য ১২ টাকা।

আসন্ন : কিশোর-তরুণদের উৎকর্ষধর্মী মাসিক পত্রিকা। ১৯৮৭ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে এটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির বিশেষত্ব হল, এতে নবীন ও তরুণ শিশুসাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশ করা ছাড়াও বিশ্বের কালজয়ী রচনাসমূহ পুনর্মুদ্রিত হয়। তবে পত্রিকাটি অনিয়মিত ছিল। বেশ কয়েক বার সম্পাদক বদল হয়। সর্বশেষ সম্পাদক ছিলেন আমীরুল ইসলাম। বর্তমানে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ।

পত্রিকাটি আহমাদ মাযহার কর্তৃক ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভেনিউ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং খাজা প্রিন্টার্স, ৩৫ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত হত।

নবীন বিজ্ঞানী : এটি একটি বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের নবীন বিজ্ঞানীদের মুখপত্র এটি। প্রথম সম্পাদক ড. মো. মোবারক আলী আখন্দ। প্রকাশিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা এবং মুদ্রিত হয় নূর কার্ড বোর্ড অফসেট প্রেস, ২৭৮ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে। ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞান বিষয়ক আকর্ষণীয় সব রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এর প্রকাশনা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

দুরন্ত : চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর পত্রিকা। কখনো মাসিক, কখনো দ্বি-মাসিক হিসাবে এটি প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পাদক রাশেদ রউফ।

অনিয়মিত হলেও পত্রিকাটি ইতিমধ্যে শিশু-কিশোরদের মনোযোগ কাড়তে সক্ষম হয়েছে। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে। এখনো এর প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। প্রকাশিত হয় নন্দন, ৫ সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে।

ছোটদের কাগজ : শিশু-কিশোর মাসিক, ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাস থেকে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, এর সম্পাদক লুৎফর রহমান রিটন।

এ ছাড়াও চট্টগ্রাম থেকে আবুল মোমেন-এর সম্পাদনায় **'খেলাপড়া'** নামে একটি পত্রিকা এখনো প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এটি কিশোরদের জন্য নয়, এর লক্ষ্য শুধু শিশু, যাদের বয়স কোনোক্রমেই দশের ওপরে নয়। এর আগে ১৯৮৭ সালে আবুল মোমেন **'ফুলকি'** নামে একটি ছোটদের সাময়িকী সম্পাদনা করেন। শিশু ও কিশোর উভয় শ্রেণীর পাঠকদের জন্যই তাতে বিভিন্ন স্বাদের রচনা সঙ্কলিত হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে **'পুটুস'** নামে একটি পত্রিকা বেরিয়েছিল বেগম সফুরা হোসেনের সম্পাদনায়। এগুলো এখন প্রকাশিত হয় না। বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে **'ঊর্মি'** নামে একটি শিশু-

www.pathagar.com

কিশোর সঙ্কলন প্রতি বছর বিশ্বশিশু দিবস (দ্র) উপলক্ষে প্রকাশ করা হত। এটিও আর এখন প্রকাশিত হয় না। বলা বাহুল্য, শিশু-কিশোর পত্রিকার এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়।

আ. হু.

শিশুনাট্য পুরস্কার অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য ও শিশুনাট্য পুরস্কার দ্র

শিশুনীতি, জাতীয়

বাংলাদেশের শিশুদের সার্বিক কল্যাণে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেন। শিশুনীতির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

ভূমিকা : দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশুদের জন্য সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণ অপরিহার্য। প্রত্যেক শিশুকে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সকলের অংশগ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শিশুদের উন্নয়নের সার্বিক কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

বাংলাদেশের জাতীয় নীতিতে প্রথম থেকেই শিশু উন্নয়নের চিন্তা স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(৪) ধারা অনুযায়ী শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে। শিশু উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন (দ্র) প্রণয়ন ও ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (দ্র) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতিসঙ্ঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর দানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম দিকে এবং এর বিভিন্ন ধারা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এবং জাতিসঙ্ঘ শিশু অধিকার সনদের উপর ভিত্তি করে শিশুদের নিরাপত্তা, কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিশুর সংজ্ঞা : বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়ঃসীমা ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ১৪ বছর বয়স পূর্ণ হয় নি এমন ছেলেমেয়েদের শিশু হিসাবে গণ্য করা হবে।

বাংলাদেশে শিশু পরিস্থিতি : বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সের জনসংখ্যা ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৯ হাজার ২২৭ জন (মোট জনসংখ্যার ৫০.৬৩%)। দেশে সম্পদের স্বল্পতা, অনুন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের অভাবে অনেক শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি : ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এখনো অনেক শিশু নানা রোগ এবং পুষ্টিহীনতার সম্মুখীন। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট মৃতের প্রায় অর্ধেক ছিল ৫ বছরের কমবয়সী শিশু। প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে মাত্র ১০০ জনের কম জন্ম নেয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর হাতে এবং ৩০০ জনের বেশি শিশুর জন্মকালীন ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম থাকে। জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ১২ জন শিশু মারা যায়। তন্মধ্যে ৮ জন জন্মকালীন আঘাতের কারণে, ৩ জন গর্ভাবস্থায় পূর্ণতাপ্রাপ্তি না ঘটার কারণে এবং অপর ১ জন অন্যান্য কারণে মৃত্যুবরণ করে। আরো ২৩ জন শিশু মারা

www.pathagar.com

যায় জন্মের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই। এর মধ্যে ১৬ জন মারা যায় পূর্ণতাপ্রাপ্তি না ঘটায় এবং ৫ জন মারা যায় প্রসবপরবর্তী ধনুষ্টঙ্কারে (দ্র)। এক সপ্তাহ বয়স থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে আরো ৭৫ জন শিশু মারা যায়। এর মধ্যে ১১ জন ধনুষ্টঙ্কারে, ২৪ জন নিউমোনিয়া (দ্র)সহ জটিল শ্বাসনালি সম্পর্কিত রোগে এবং ১৩ জন মারা যায় ডায়রিয়ায় (দ্র)। এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে আরো ৭৪ জন শিশু মারা যায়। এ হিসাবে প্রতি বছর ৫ বছরের কম বয়সের প্রায় ৮ লক্ষ শিশু নানা প্রতিরোধযোগ্য রোগে মৃত্যুবরণ করে। ইউনিসেফ (দ্র) কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত The Progress of Nations '93-তে ৫ বছরের কমবয়সী শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি হাজারে ১৩৩ জন উল্লেখ করা হয়েছে।

এ দেশে ১২-১৮ মাস বয়সের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের বেশি শিশু পুষ্টিহীন হয়ে পড়ে। শুধু দারিদ্র্যের কারণে এবং খাদ্যের অভাবেই এমন হচ্ছে না, বরং ঘন ঘন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং পুষ্টি সম্পর্কে অভিভাবকদের সঠিক জ্ঞান না থাকাও এর অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে সবচেয়ে গরিব পরিবারগুলোর শতকরা ১০ ভাগ তাদের মোট পারিবারিক আয়ের শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ উপার্জন খাদ্য বাবদ ব্যয় করে। ভিটামিন 'এ' -এর অভাবে প্রতিদিন প্রায় ১০০টি শিশু অন্ধ হয়ে যায় এবং অর্ধেকের বেশি অন্ধ হওয়ার ১ সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। ৬ থেকে ৭২ মাস বয়সের ১০ লক্ষ শিশু কম-বেশি ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে ভোগে।

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৮ জনই শরীরে আয়োডিন-স্বল্পতাজনিত বিভিন্ন রোগের আক্রমণের সম্মুখীন। শতকরা ১০ জনের গলগণ্ড (দ্র) রয়েছে এবং ৩ জন অন্যান্য আই ডি ডি জটিলতায় ভুগছে। উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় শতকরা ৫০ থেকে ৭০ জন লোক বর্তমানে গলগণ্ডের রোগী।

বাংলাদেশের ৯৬% লোকের বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১৬% লোক তাদের সব ধরনের কাজে টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে থাকে। পয়ঃনিষ্কাশনও একটি বড় সমস্যা। গ্রামাঞ্চলে ৩৩% এবং শহরাঞ্চলে ৫৫% পরিবার স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক জলাবদ্ধ পায়খানার অভাবে

জনসাধারণ খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে। ফলে রোগজীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা বাড়ছে এবং এসব কারণে সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবারের অল্পবয়স্ক শিশুরা।

শিক্ষা : সরকার ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তথাপিও দেশের শিক্ষা অবকাঠামোর অপ্রতুলতা এবং পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক শিশু শিক্ষা লাভ করতে পারে না। যদিও শতকরা ৮৬ ভাগ ছেলে-মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রায় ৪০% প্রথম দু' এক বছরের মধ্যে স্কুল ত্যাগ করে। স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের চেয়ে কম (৫৩% : ৪৭%)। ছেলেদের চেয়ে অধিক হারে মেয়েরা স্কুল ত্যাগ করে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল ত্যাগ করার প্রবণতা রোধ করা এবং কখনো স্কুলে ভর্তি হয় না এরকম শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করাই দেশের শিশুশিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য। এক হিসাবে দেখা যায়, দেশের ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ১ কোটি ৭৫ লক্ষ শিশুর মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ (১৪%) প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয় না এবং যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ৬০ লক্ষ (৪০%) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল ছেড়ে দেয়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্তমানে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

শিশুশ্রম : অর্থনৈতিক কারণে এবং পারিবারিক প্রয়োজনে বেশ কিছু সংখ্যক শিশু অতি অল্প বয়সেই নানা ধরনের শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলেই শিশুশ্রমিক নিয়োগ করা হয়। সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব মতে, দেশের মোট শ্রমিকের ১২%ই শিশুশ্রমিক; এ হিসাবে কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিশুশ্রমিকদের ধরা হয়েছে। অনিবন্ধনকৃত বা ননফরমাল সেক্টরে কর্মরত শিশুশ্রমিকদের হিসাব করলে এ সংখ্যা আরো বাড়বে। শুধু শহরাঞ্চলেই চরম দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মাঝে ১৫ বছরের কমবয়সী যেসকল শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে তাদের সংখ্যা ১৯৯১ সালে প্রায় ২৯ লক্ষ বলে এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশের প্রচলিত আইনে শিল্পকারখানায় শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও জীবিকার প্রয়োজনে শৈশবাবস্থায় অনেক শিশুকে নানা ধরনের শ্রমে নিয়োজিত হতে হচ্ছে।

শিশুর আইনগত অধিকার : শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে দেশে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সমস্ত আইন বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, কর্মসংস্থান, শিশুশ্রম, শিশুপাচার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে। এ ছাড়া ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিশু আইনে শিশু সংক্রান্ত অপরাধের জন্য শাস্তি ও শিশুঅপরাধীদের সংশোধনের বিষয়াবলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ আইনে শিশুদের হেফাজত (custody), সংরক্ষণ (protection) ও সংশোধনের (correction) জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশু : সমাজে অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে এতিম ও দুঃস্থ শিশু, গৃহহীন/পথ-শিশুর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নানাবিধ রোগ, দুর্ঘটনা ও মানবসৃষ্ট সঙ্কটের কারণে বহু লোক জীবিকার অন্বেষণে শহরমুখী হচ্ছে। ফলে শহরাঞ্চলে দুর্দশাগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক কারণেও অনেক শিশু দুর্দশায় পতিত হয়।

প্রতিবন্ধী শিশু : দেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যাও অনেক (মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০%)। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিশু। প্রতিদিন ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে ১০০টি শিশু অন্ধত্ব বরণ করে। জন্মগত কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, অপুষ্টি ও বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণে অনেক শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে যায়।

মেয়ে-শিশু : দেশে ছেলে-শিশু ও মেয়ে-শিশুর অবস্থা ভিন্নতর। সচেতন ও অসচেতনভাবে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা সকল ক্ষেত্রে মেয়ে-শিশুরা কম সুবিধা ভোগ করে থাকে। ছেলে-শিশুর তুলনায় মেয়ে-শিশুর মৃত্যুহার বেশি।

শিশুনীতির লক্ষ্যসমূহ : উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে শিশুদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিম্নলিখিত ৬টি প্রধান লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়েছে—

(ক) জন্ম ও বেঁচে থাকা : জন্মের পর শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তার স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শারীরিক নিরাপত্তা বিধান।

(খ) শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ : শিশুর সার্বিক মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে তার শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং তার নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন।

(গ) পারিবারিক পরিবেশ : পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সঠিক উন্নয়নের একটি প্রধান শর্ত বিধায় পারিবারিক পরিবেশের উন্নতিবিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ।

www.pathagar.com

(ঘ) বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুর সাহায্য : বিশেষ অবস্থায় পতিত অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং সমতা বিধান করা।

(ঙ) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ : সকল জাতীয়, সামাজিক বা পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার নীতি অবলম্বন।

(চ) আইনগত অধিকার : জাতীয়, সামাজিক বা পারিবারিক কর্মকাণ্ডে শিশুর আইনগত অধিকার সংরক্ষণ।

বাস্তবায়ন–পদক্ষেপসমূহ :

(ক) জন্ম ও বেঁচে থাকা :

(১) সকল শিশুর নিরাপদ জন্মগ্রহণ ও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য, পরিচর্যা এবং পরিবারপরিকল্পনা সেবার মাধ্যমে শিশুর নিরাপদ জন্ম এবং বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রসবপূর্ব ও প্রসবপরবর্তী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কর্মজীবী মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া।

(২) শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়েদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। কর্মজীবী মহিলারা যাতে তাদের কর্মস্থলে বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(৩) শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা। সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মায়েদের এবং শিশু লালনপালনকারীদের শিশুপুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। ভাল ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলা। বিশেষ করে অন্ধত্ব নিবারণে শিশুদের ভিটামিন 'এ'-সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

(৪) শিশুদেরকে ই পি আই টিকাদান কর্মসূচির আওতায় জীবননাশকারী ৬টি মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা করা। পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্যশিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া (দ্র) ও শ্বাসনালি সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাসের অভ্যাস করা।

(৫) সকল শিশুকে সমন্বিত স্বাস্থ্যপরিচর্যার আওতায় আনা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সচেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিচর্যার উপর জোর দেওয়া। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মায়েদেরকে শিশুবিকাশ, শিশুপুষ্টি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দান করা এবং মায়েদের শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন-কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যাতে পরিবারের সকল সদস্য শিশুস্বাস্থ্যপরিচর্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

(খ) শিক্ষা :

(১) সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

(২) মেয়ে–শিশুর শিক্ষার জন্য ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত শিশুদের জন্য উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৪) স্কুলত্যাগী শিশুদের, বিশেষত ভর্তি না হতে পারা মেয়ে–শিশুদের শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়ার জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানসমূহের (মাদ্রাসা) উপযুক্ত ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা।

(৫) শৈশবের শুরুতেই শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন/ শিক্ষাদান এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পক্ষে সমর্থন ও জোরালো প্রচারণা চালানো।

(৬) পরিশ্রমের প্রতি শিশুদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের জন্য প্রণীত সিলেবাসে এসব বিষয়ে আলোকপাত করা।

(৭) সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে শিশুদের জন্য তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী উপযুক্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি

www.pathagar.com

শিক্ষানবিশ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে উদ্বুদ্ধ করা।

(৮) শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক শিশুসাহিত্য, ছড়া, কবিতা ও গল্পের বই বিনামূল্যে, হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা। বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য উপযোগী বই-পুস্তক প্রকাশনা এবং বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া।

(৯) সরকারি/আধা-সরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থ শিশুদের জন্য সহজলভ্য করা।

(গ) মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ :

(১) সকল শিশুর সুস্থ মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(২) সকল শিশুকে তাদের স্বকীয়তা ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষিত করা। তাদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে তোলা।

(৩) শিশুর সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

(৪) শিশুকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ও ধর্মীয় চেতনার আলোকে চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৫) সকল শিশুকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা দেশ ও বিশ্বকে জানে, প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান লাভ করে।

(৬) শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে তাদের উপযোগী পূর্ণ ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ, চিত্রশালা, জাদুঘর, নৃত্য ও সঙ্গীত- বিদ্যালয়, চিত্রাঙ্কন বিদ্যালয় এবং শরীরচর্চাকেন্দ্র গড়ে তোলা।

(৭) শিশুকে তার শৈশবে সকল প্রকার খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সঙ্গীত, অভিনয়, আবৃত্তি, নৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহিত করা যেন সে নিজের ভিতরের প্রবণতাকে বিকশিত করে দেশের সাংস্কৃতিক মানকে উঁচু করতে সক্ষম হয়।

(ঘ) পারিবারিক পরিবেশ :

(১) শিশুর নিরাপত্তা, শিক্ষা ও উন্নয়নে পিতা-মাতা, অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব নিশ্চিত করা।

(২) সকল শিশুকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় মানব-জাতির পক্ষে বিশ্বশান্তি, বিশ্বসংস্কৃতি, সংহতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

(৩) কর্মজীবী মহিলাদের সন্তানদের জন্য দিবাকালীন শিশুযত্নকেন্দ্র স্থাপন করা।

(ঙ) আইনগত অধিকার :

(১) প্রচলিত আইনগুলোর প্রয়োগ/সংশোধন করার সময়ে শিশুস্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া।

(২) যে কোনো অপরাধের জন্য শিশুর উপর দৈহিক বা মানসিক পীড়ন পরিহার নিশ্চিত করা।

(৩) অভিযুক্ত শিশুর প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন ও তার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

(৪) বিপথগামী শিশুকে সংশোধন করাই হবে প্রচলিত বিচারব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

(চ) বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশু :

(১) পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অনাথ, দুঃস্থ ও আশ্রয়হীন শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে আশ্রয়, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

(২) প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সকল প্রতিকূল অবস্থায় শিশুদের ত্রাণসামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

(৩) দুর্যোগে সকল শিশুকে রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।

(৪) সমস্ত শিশুকেই মানবসৃষ্ট সঙ্কট, ঝুঁকিপূর্ণ কায়িক শ্রম, শোষণ এবং দূষিত পরিবেশের ভয়াবহতা হতে রক্ষা করা।

(৫) শিশুশ্রম, শিশুঅপব্যবহার, শিশুনির্যাতন ও শিশুপাচার কার্যকরভাবে বন্ধ করা এবং অপরাধী

www.pathagar.com

(২) শিশুদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা অব্যাহত রাখা।

(৩) প্রতি বছর শিশুদের অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং বহুল প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া।

(৪) নির্ধারিত দিনে "জাতীয় শিশু দিবস"/ "বিশ্বশিশু দিবস" পালন করা।

কর্মকৌশল :

১. ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ব্যবস্থাপনা: শিশুরা যে পরিবেশে জন্মলাভ করে, সে পরিবেশকে উন্নত, সুন্দর ও প্রগতিশীল করে গড়ে তুলে শিশুদের সার্বিক কল্যাণের জন্য পরিবার, গোষ্ঠী তথা সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

২. সরকারি ব্যবস্থাপনা : শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসহ গ্রাম পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। বিশেষত আশ্রয়হীন, অসহায়, অবহেলিত, পরিত্যক্ত, অসুবিধাগ্রস্ত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের ভরণ-পোষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদেরকে সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে লালন-পালনের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

৩. বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান : সরকারি ব্যবস্থাপনার সম্পূরক হিসাবে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সহায়তা নেওয়া হবে এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে এরূপ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে।

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(ছ) প্রতিবন্ধী শিশু :

(১) যেসকল শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয়, যত্ন, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

(২) শৈশবকালীন প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি, বিশেষ করে টিকাদানের মাধ্যমে পোলিওমায়েলাইটিস (দ্র), আয়োডিন (দ্র) বা ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত পঙ্গুত্ব নির্মূলকল্পে কর্মসূচির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(জ) মেয়ে-শিশু :

মেয়ে-শিশু ও ছেলে-শিশুর মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

(ঝ) "সবার আগে শিশু"

(১) সর্বাবস্থায় শিশুর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান।

জাতীয় শিশু পরিষদ :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত

www.pathagar.com

মন্ত্রীকে সভাপতি করে "জাতীয় শিশু পরিষদ" গঠন করা হবে। শিশুকল্যাণ সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিবর্গ, সচিবগণ এবং শিশুর সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এ পরিষদের সদস্য হবেন।

পরিষদের কার্যপরিধি :

(১) "জাতীয় শিশু পরিষদ" শিশুকল্যাণ সম্পর্কিত সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করা।

(২) দেশের সকল শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৩) শিশুর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে প্রচলিত আইনসমূহের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

(৪) প্রয়োজনে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত প্রদান।

(৫) শিশু-অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

(৬) "শিশুর অধিকার সনদ"–এর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

উপসংহার : দেশের শিশুদের প্রতি অঙ্গীকার স্বরূপ এ "জাতীয় শিশুনীতি" গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এবং তাদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ "শিশুনীতি" কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এ জাতীয় শিশুনীতির আওতায় বাংলাদেশের সকল শিশু গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম বা অন্য কোনো মতাদর্শ, সামাজিক প্রতিপত্তি, সম্পদ, জন্ম বা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে সকল অধিকার ও সুবিধাসমূহ সমানভাগে ভোগ করবে।

শিশুরোগ

যেসকল রোগ বিশেষভাবে শিশুদের মধ্যে দেখা দেয় সেগুলোকে শিশুরোগ বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার শিশুরোগের মধ্যে সংক্রামক রোগ (দ্র), জন্মগত রোগ, অপুষ্টিজনিত রোগ উল্লেখযোগ্য।

শিশুদের যেসকল সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো হল ডিফথেরিয়া (দ্র), হুপিংকাশি, ধনুষ্টঙ্কার (দ্র), পোলিওমায়েলাইটিস (দ্র), হাম (দ্র), যক্ষ্মা (দ্র), জলবসন্ত (দ্র), মাম্প্‌স্ (দ্র) ইত্যাদি। এসকল সংক্রামক রোগ শিশুমৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী।

পুষ্টিহীনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শরীরের রোগ-প্রতিরোধশক্তি হ্রাস, চিকিৎসাসুবিধার অভাব, অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে মলমূত্র ত্যাগ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, প্রতিষেধক টিকাদানে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে শিশুরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগসমূহের মধ্যে কোয়াশিওরকর, মারাস্‌মাস, ঠোঁটের কোণায় ঘা, ভিটামিন-এ'র অভাবজনিত অন্ধত্ব, লৌহাভাবজনিত রক্তাল্পতা, স্কার্ভি (দ্র), রিকেট্‌স্ (দ্র) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অপুষ্টির প্রধান কারণ আমিষ, শর্করা, ভিটামিন (দ্র), খনিজ লবণ ইত্যাদির অভাব।

শিশুরা যেসকল জন্মগত রোগে ভোগে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জন্মগত হৃদ্‌রোগ (দ্র), জন্মগত ঠোঁট ও মুখের তালু কাটা, জন্মগত বিপাকীয় ত্রুটি, জন্মগত রোগপ্রতিরোধশক্তির অভাব, স্নায়ুতন্ত্র (দ্র) ও পরিপাকতন্ত্রের (দ্র) জন্মগত ত্রুটি ইত্যাদি।

শিশুদের শ্বসনতন্ত্রের (দ্র) যেসকল সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো হল টন্‌সিল প্রদাহ, স্বরনালির প্রদাহ, এলার্জিজনিত নাসিকানালির প্রদাহ (rhinitis)

www.pathagar.com

ইত্যাদি। শিশুরা বাতজ্বরে (দ্র) আক্রান্ত হলে যথাযথ চিকিৎসার অভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

শিশুদের রক্তত্রুটিজনিত যেসকল রোগ দেখা দিতে পারে সেগুলো হল হিমোফিলিয়া, পার্‌পুরা, রক্তাল্পতা, লিউকেমিয়া (দ্র) নামক রক্তক্যান্সার, রক্তের শ্রেণীগত অসামঞ্জস্যজনিত রোগ ইত্যাদি। শিশুদের উচ্চতাপমাত্রার জ্বরজনিত খিঁচুনি, মৃগীরোগ (দ্র) মস্তিষ্কের অতিরিক্ত জলীয় চাপ (hydrocephaly), স্নায়ুরজ্জুর গঠনের অসম্পূর্ণতা (spina bifida), মেনিঞ্জাইটিস (দ্র) ইত্যাদি স্নায়বিক রোগ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

বড়দের মতো শিশুদেরও বিভিন্ন মানসিক রোগ হতে পারে। সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার কারণে বয়ঃসন্ধিকালে অনেক শিশুকেই বিভিন্ন রকম মানসিক সমস্যায় ভুগতে দেখা যায়। ফলে শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আসক্তি, সমাজবিমুখতা, এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতাও সৃষ্টি হয়।

সি. না. হ.

শিশুরোগ-বিদ্যা (paediatrics)

শিশুদের রোগ নিরাময়, প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যসেবার উদ্দেশ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের (দ্র) যে শাখা গড়ে উঠেছে, তার নাম শিশুরোগ-বিদ্যা।

শিশুদের মধ্যে বিশেষ ধরনের কিছু রোগ দেখা দেওয়ার প্রবণতা থাকে। তার মধ্যে সংক্রামক রোগ (দ্র), জন্মগত রোগ, অপুষ্টিজনিত রোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে সংক্রামক রোগের কারণে শিশুমৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। সুতরাং শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসাব্যবস্থা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়েছে।

শিশুদের দৈহিক গঠন, শারীরিক অবস্থা এবং আচরণবিধি বড়দের চেয়ে পৃথক হওয়ার কারণে শিশুদের রোগনিরাময়পদ্ধতিও ভিন্ন প্রকৃতির। তা ছাড়া শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত দ্রুত বলে এদের বৃদ্ধিকালীন বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। রোগনিরাময়ক্ষমতার অভাব বা অসম্পূর্ণতার কারণে শিশুরা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই শিশু-স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ অপরিহার্য বিধায় শিশুরোগ-বিদ্যার উদ্ভব।

শিশুচিকিৎসার গুরুত্ব অনুধাবন করে শিশুরোগ-বিদ্যার আরো নানান শাখা, যেমন—শিশু-শল্যবিদ্যা, শিশু-মনোরোগবিদ্যা, শিশু-দন্তচিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। শিশুদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক প্রদানের ক্ষেত্রে শিশুরোগ-বিদ্যার ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষণীয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিশুচিকিৎসা হাসপাতাল এবং শিশুরোগ-বিদ্যা বিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশেও রয়েছে শিশু হাসপাতাল (দ্র)।

সি. না. হ.

শিশুসংগঠন, বাংলাদেশের

১৯৪৭ সালের পর থেকেই ধীরে ধীরে এ দেশে একের পর এক শিশু-কিশোর সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। এর মূলে ছিল কলিকাতা মহানগরীতে ত্রিশের দশকের শেষভাগ ও চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে গড়ে ওঠা শিশু-কিশোর সংগঠন 'মণিমেলা', 'মুকুল ফৌজ' ও 'কিশোর বাহিনী'র সাংগঠনিক ও আদর্শগত ভিত্তি। 'মণিমেলা' গড়ে উঠেছিল 'দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা'কে কেন্দ্র করে, 'মুকুল ফৌজ

www.pathagar.com

ছিল' 'দৈনিক আজাদ' এবং 'কিশোর বাহিনী' ছিল তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'-র ছোটদের বিভাগসমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা। বাংলাদেশে এখনো সক্রিয় এ জাতীয় কিছু প্রধান সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হল :

কেন্দ্রীয় মুকুল ফৌজ : শিশু-কিশোরদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িত করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্য থেকে ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট কলিকাতা মহানগরীতে এই সংগঠনের জন্ম হয়।

বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের (দ্র)-এর উদ্যোগ-উৎসাহেই প্রাথমিকভাবে 'মুকুল মেলা' নামে গঠিত এই সংগঠন অল্পদিনের মধ্যে ব্যাপক সাংগঠনিক কাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করে। কলিকাতা থেকে সেই কালে প্রকাশিত 'দৈনিক আজাদ'-এ একটি পৃষ্ঠাও মেলার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের নানাবিধ রচনা ও এর সাংগঠনিক খবরাখবর পরিবেশনের জন্য 'মুকুলের মহফিল' নাম দিয়ে বরাদ্দ করা হয়। এই পাতার পরিচালক ছিলেন 'বাগবান' ছদ্মনামে মোহাম্মদ মোদাব্বের। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) 'মুকুলের মহফিল' ও 'বাগবান' নাম দু'টি ঠিক করে দেন।

সেই কালে বঙ্গদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত 'মুকুল মেলা'র সাংগঠনিক তৎপরতা বিস্তৃত হয়।

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে শিল্পী কামরুল হাসান (দ্র) এই সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন এর নাম 'মুকুল মেলা'র পরিবর্তে 'মুকুল ফৌজ' রাখা হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) রাষ্ট্রের জন্ম হলে মুকুল ফৌজ-এর সংগঠকদের অধিকাংশই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন এবং একে নতুন করে সংগঠিত করার কাজে তাঁরা ব্যাপৃত হন। এরই অংশ হিসাবে ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) ফজলুল হক হলে মুকুল ফৌজ-এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নিজস্ব মুখপত্রও বের হয় 'মুকুল' নামে। এর সম্পাদক ছিলেন আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন।

মুকুল ফৌজ এক সময় দেশব্যাপী শিশু-কিশোরদের বৃহত্তর সংগঠনে পরিণত হয়েছিল এবং এর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডগত তৎপরতা রীতিমতো আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। পুরো ৫০-এর দশক থেকে ৬০-এর দশকের শেষভাগ পর্যন্ত সারা দেশে এর শাখা-সংগঠনের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ শত এবং সদস্যসংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। ১৯৮২ সালের ১৩ই অক্টোবর সংগঠনটির ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়। প্রায় ৩ হাজার সদস্য এতে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে সংগঠনটি কেবল কিছু দিবসভিত্তিক কাজের মধ্যেই এর তৎপরতা সীমাবদ্ধ রেখেছে।

কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর : দেশের অন্যতম বৃহৎ শিশু-কিশোর সংগঠন। 'দৈনিক সংবাদ'-এর ছোটদের বিভাগ 'খেলাঘর'কে কেন্দ্র করেই খেলাঘর অল্পকালের মধ্যে তার সংগঠনগত চারিত্র্য লাভ করে। দেশের প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক হাবীবুর রহমান (দ্র) 'ভাইয়া' ছদ্মনামে এই পাতা সম্পাদনা করতেন। ১৯৫২ সালের ২রা মে তারিখ থেকে 'খেলাঘর' পাতা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং পাতা প্রকাশের উল্লিখিত তারিখকেই এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশের তারিখ হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৯৫৪ সাল থেকে বিভিন্ন জেলায় এর শাখা-সংগঠন গড়ে তোলার সূচনা হয়। ১৯৫৬ সালের ২২শে জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের প্রথম কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে এটি গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র গ্রহণের ভেতর দিয়ে তৎকালীন প্রদেশভিত্তিক সংগঠনের রূপ লাভ করে।

খেলাঘর একদিকে যেমন তার পাতার মাধ্যমে বাংলাদেশের একদল প্রতিশ্রুতিশীল ও প্রতিভাবান শিশুসাহিত্যিকের জন্ম দেয়, তেমনি শিশু-কিশোরদের কল্যাণকামী একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী-সংগঠকও সৃষ্টি করে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে খেলাঘরের নেতা-কর্মীবৃন্দ গৌরবজনক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং অনেকেই শহীদ হন। এঁদের মধ্যে আল-বদর (দ্র) ও আল-শাম্‌স্ (দ্র) বাহিনীর হাতে নিহত খেলাঘরের অন্যতম উপদেষ্টা সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সারের (দ্র) নাম স্মরণীয়। শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধের একেবারে সূচনায় 'দৈনিক সংবাদ' কার্যালয়ে অবস্থিত কেন্দ্রীয় খেলাঘর-এর দপ্তর পাকিস্তানি বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলে। এতে মূল্যবান

www.pathagar.com

দলিলপত্র বিনষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে খেলাঘরের সাংগঠনিক তৎপরতা বিস্তৃত হবার সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৩ সালে সংগঠনটি আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ সংস্থা 'সিমিয়া'র (CIMEA) সদস্যপদ লাভ করে।

খেলাঘরের আদর্শ ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, তাদের শরীর ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা এবং ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সারা বিশ্বের মানুষকে ভালোবাসতে শেখানো ইত্যাদি।

সারা দেশে বর্তমানে খেলাঘরের ৬ শতাধিক শাখা-সংগঠন রয়েছে। কেন্দ্রসহ শাখা-সংগঠনসমূহের দায়িত্ব বা কাজের অন্তর্ভুক্ত হল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো পালন করা, শিক্ষণীয় নানা বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা, নিয়মিত শরীরচর্চার অনুশীলন করা, বিজ্ঞানবিষয়ক নানাবিধ তৎপরতা পরিচালনা করা, সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান করা, কর্মী ও সংগঠকদের জন্য প্রশিক্ষণশিবিরসহ নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

বর্তমানে খেলাঘর আসর দু'টি ভাগে বিভক্ত। ১৯৯২ সালের ২রা ও ৩রা মার্চ একটি অংশের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং পৃথক কমিটি গঠন করা হয়। এই অংশটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকাতে অবস্থিত। ১৯৯২ সালের ৩০শে এপ্রিল ও ১লা মে অপর অংশটির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং পৃথক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। এর দপ্তর ঢাকার ৩১/এফ তোপখানা রোডে অবস্থিত।

বাংলাদেশ সবুজ সেনা : এই শিশু-কিশোর সংগঠনের জন্ম ১৯৫৫ সালে। এর কেন্দ্রীয় দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। দেশের শিশু-কিশোরদের কল্যাণ ও তাদের আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য থেকেই এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে।

ঢাকা শহরে এর ২০টি শাখা ছাড়াও দেশের ১৬টি জেলায় মোট ৮০টি শাখা রয়েছে।

এসব শাখার আওতায় ৬২ হাজার শিশু-কিশোর সংগঠিত হয়ে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা : দেশের শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ সাধন, চরিত্র গঠন, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চায় প্রেরণা দান, বিশেষত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্য থেকে দেশের অন্যতম বৃহৎ এই শিশু-সংগঠনটি ১৯৫৬ সালের ৫ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্রস্থল ৩৭/এ, সেগুন বাগিচায় নিজস্ব 'কচি-কাঁচা ভবন'-এ কেন্দ্রীয় দপ্তর অবস্থিত।

কচি-কাঁচার মেলা দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা 'ইত্তেফাক'-এর ছোটদের বিভাগ 'কচি - কাঁচার আসর'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক এই সংগঠন একটি স্বেচ্ছাসেবী জাতীয় সমাজকল্যাণ সংস্থারূপে রেজিস্ট্রিকৃত। ৫টি প্রধান ক্ষেত্রে এর কর্মসূচি সম্প্রসারিত : সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প (বিজ্ঞানসহ), সমাজসেবা ও খেলাধুলা।

সংগঠনটি দীর্ঘদিন যাবৎ চারুকলা ও কারুশিল্প, কম্পিউটার, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, সূচিশিল্প ও বস্ত্রতৈরি প্রভৃতি শিক্ষা-কেন্দ্রসহ শিশু আর্ট গ্যালারি এবং শিশু পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে আসছে। এই সব প্রশিক্ষণ-ক্লাসের কোনোটিতেই শিক্ষার্থীদের ফি হিসাবে টাকাপয়সা দিতে হয় না।

কচি-কাঁচার মেলা পরিচালিত চারুকলা কেন্দ্র সবচেয়ে বেশি সুনামের অধিকারী। ১৯৬৩ সাল থেকে এ যাবৎ এই কেন্দ্রের শিক্ষার্থী শিশু-কিশোর বহু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার অর্জন করেছে।

১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৭ বছর কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা 'কচি ও কাঁচা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে এসেছে। সাহিত্যমান, অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণপারিপাট্যে এটি ছিল একটি শীর্ষস্থানীয় শিশু-কিশোর সাময়িকী। আর্থিক অনটনের কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে এটি আর প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা ও এর বিভিন্ন শাখার সংগঠক ও কর্মীবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই শহীদ হন। ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী কেন্দ্রীয় মেলার সমৃদ্ধ পাঠাগারসহ এর কার্যালয়টি ভস্মীভূত করে।

www.pathagar.com

দেশের সক্রিয়তম শিশু-কিশোর সংগঠনগুলোর অন্যতম কচি-কাঁচার মেলার অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ। এর ভবিষ্যৎ কর্মসূচিতে রয়েছে নিজস্ব জমির ওপর 'কচি-কাঁচা ভবন'কে সম্প্রসারিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু-কিশোর কমপ্লেক্স নির্মাণ। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যমণি ও প্রাণপুরুষ হচ্ছেন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও সংগঠক রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই)।

চাঁদের হাট : অধুনালুপ্ত 'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকার ছোটদের বিভাগ 'চাঁদের হাট'কে কেন্দ্র করে এই শিশু-কিশোর সংগঠনটির জন্ম। 'আমরা সুন্দর হবো'—এই স্লোগান ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭৩ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে 'চাঁদের হাট'-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু এবং অত্যল্পকালের মধ্যে দেশের সর্বত্র এর শাখা গড়ে ওঠে। সংগঠনটির মূল চারটি স্লোগান হল : ১. দেশের মাটি সবচেয়ে খাঁটি, ২. আমরা সূর্যের সাথী, ৩. বিশ্বমানব আমাদের জাতি, এবং ৪. চাঁদের হাট একটি মিষ্টি পরিবার। এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শিশুসাহিত্যিক রফিকুল হক (দাদু ভাই)।

সংগঠনটির উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি : ১. স্লেট-পেন্সিল কর্মসূচি। এই প্রকল্পের অধীনে অবহেলিত শিশু-কিশোরদের অক্ষরজ্ঞানে সাহায্য করা হয়। চাঁদের হাট-এর সদস্যবৃন্দই এ ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ২. অঙ্কন : শিশু-কিশোরদের ছবি আঁকায় পারদর্শী হতে সাহায্য করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা। ৩. একটি করে পুরনো কাপড় : শীতকালে পুরনো কাপড় সংগ্রহ করে দুঃস্থ শিশু-কিশোরদের মধ্যে বিতরণ করা। ৪. কল্যাণ : এটি একটি সঙ্গীত শিক্ষার ক্লাস। এতে শিশু-কিশোরদের নানা বিভাগের সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

সারা দেশে চাঁদের হাট-এর ২৫০টি শাখা রয়েছে। কয়েকটি জেলায় শাখাগুলোর তৎপরতাকে সমন্বিত করার জন্য সমন্বয় পরিষদও রয়েছে। এই জাতীয় পরিষদের সংখ্যা বর্তমানে ৬টি।

চাঁদের হাট প্রবর্তিত পুরস্কার : পারভেজ স্মৃতি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং এহতেশাম হায়দার চৌধুরী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পুরস্কার।

সূর্য সেনা : 'সুন্দর দেশ গড়ব'—এই স্লোগানের ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি এই শিশু-কিশোর সংগঠনের জন্ম। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে শিশু-কিশোরদের জন্য সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, মানবতার সেবা, স্বাস্থ্য, সমবায়, সাধারণ বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা, কৃষিবিজ্ঞান, উদ্যান রচনা ও পশুপালন সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা।

রাজধানী ঢাকা শহর ও এর শহরতলীসহ দেশের অধিকাংশ জেলা, মহকুমা, থানা ও গ্রামে 'সূর্য সেনা'র ২৫০টি শাখা রয়েছে। সমাজের বহু অবহেলিত ও উপেক্ষিত শিশু-কিশোর এই সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে।

'সূর্য সেনা'-র অনেক শাখার উদ্যোগে সমবায়ের ভিত্তিতে হাঁস-মুরগির খামার ও মৎস্যচাষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে। এইসব প্রকল্প থেকে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে গরিব, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক বৃত্তি দানের লক্ষ্যে।

সংগঠনটির নিয়মিত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রসহ এর শাখাসমূহের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, বিশ্বশিশু দিবস (দ্র) পালন, দেশ-বিদেশের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বা মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু দিবসসহ নববর্ষ ইত্যাদি উদ্‌যাপন এবং সংগঠনের কর্মী ও সংগঠকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য থেকে প্রায় নিয়মিত কর্মশিবিরের আয়োজন। শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ওপরে এই সংগঠন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

ফুলকুঁড়ি আসর : এই শিশু-কিশোর সংগঠনের জন্ম ১৯৭৯ সালে। এর মূল স্লোগান : 'পৃথিবীকে গড়তে হলে নিজেকে গড়ো'। পাঁচটি প্রধান বিভাগের মাধ্যমে এর সামগ্রিক সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালিত হয়ে থাকে। পাঠাগার গড়ে তোলা, সাময়িকী ও দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা, আলোচনাসভা, সাধারণ জ্ঞানের আসর ও শিক্ষা-সফরের আয়োজন করা, কোচিং ক্লাস, বক্তৃতা অনুশীলন, বিতর্ক সভা ও সাহিত্য প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করা এর নিয়মিত কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ ছাড়া আসরের মুখপত্র হিসাবে মাসিক 'ফুলকুঁড়ি'র প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে।

সাংস্কৃতিক তৎপরতার অংশ হিসাবে সংগঠনের উদ্যোগে

www.pathagar.com

বিভিন্ন জাতীয়, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন এবং এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিরও আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক বিভাগের উদ্যোগে 'ফুলকুঁড়ি কিশোর থিয়েটার' নামে একটি সংগঠনও গড়ে তোলা হয়েছে। সংগঠনটি প্রায় নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে।

ক্রীড়া বিভাগের উদ্যোগে কুচকাওয়াজ, মৌসুমি খেলাধুলা, নানা ধরনের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতাসহ দিবসভিত্তিক শরীরচর্চা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যক্তিগত বাগান, বৃক্ষরোপণ, ক্ষুদে বিজ্ঞানীর আসর ও ছবি আঁকার ক্লাস ইত্যাদি। 'ফুলকুঁড়ি বিজ্ঞান চক্র'ও এই সংগঠনের একটি উল্লেখযোগ্য সক্রিয় প্রকল্প।

উল্লিখিত শিশু-কিশোর সংগঠন ছাড়াও স্থানীয় ও জাতীয়ভিত্তিক আরো কিছু এ জাতীয় সংগঠন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'বাংলাদেশ শিশু রক্ষা সমিতি', 'নবাঙ্কুর মেলা', 'সবুজ সেনা', নজরুল সেনা', 'সুকান্ত একাডেমী', 'শাপলা কুঁড়ির আসর', 'বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা', 'কিশোর মেলা' ইত্যাদি।

আ. হ.

শিশুসাহিত্য পুরস্কার অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার দ্র

শীতনিদ্রা (hibernation)

অনেক উষ্ণ রক্তের প্রাণী প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং খাবারের অভাব অতিক্রম করার জন্য শীতকালে ঘুমিয়ে সময় কাটায়। উষ্ণ রক্তের প্রাণীর দেহের উষ্ণতা নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখার জন্য মস্তিষ্কে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র রয়েছে। শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণীর (যেমন—সরীসৃপ ও উভচর) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের এরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। পরিবেশের তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীরের তাপমাত্রাও ওঠানামা করে। শীতনিদ্রায় যায় যেসকল প্রাণী তাদের শরীরের তাপমাত্রা খুব কমে যায় এবং তখন শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণীতে পরিণত হয়। এতে প্রাণীর বিপাকক্রিয়া, হৃদ্‌স্পন্দন এবং শ্বাসের গতি কমে যায়, যার ফলে শরীরে খাদ্য ও পানির চাহিদাও খুব কমে যায়। এ সময়ে প্রাণী ঘুমন্ত অবস্থায় সঞ্চিত চর্বির সাহায্যে অনেক দিন টিকে থাকতে পারে। শীতনিদ্রায় যাওয়ার আগে প্রাণী সাধারণত বেশি খাদ্য গ্রহণ করে এবং শরীরে চর্বির সঞ্চয় বাড়িয়ে নেয়। পরিবেশের তাপমাত্রা, খাদ্যের স্বল্পতা, দিনের আলোর স্বল্পতা, হরমোন (দ্র) ইত্যাদি শীতনিদ্রাকে প্রভাবিত করে। উষ্ণ আবহাওয়া ফিরে এলে, প্রাণীর সঞ্চিত চর্বি ফুরিয়ে গেলে এবং হরমোনের পরিবর্তনের ফলে প্রাণীর শীতনিদ্রা টুটে যায়। যেসকল প্রাণী শীতনিদ্রায় অভ্যস্ত তারা সাধারণত শীতপ্রধান অঞ্চলে বাস করে।

সা. এ.

শীতলক্ষ্যা নদী, বাংলাদেশের দ্র

শীল

বৌদ্ধশাস্ত্রে একটি গভীর ও বহু অর্থবোধক শব্দ। শীলের অর্থ অনুশীলন বা সমাধান। কথায়, চিন্তায় ও কাজে সংযম এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করার জন্যই শীল। এক কথায় 'শীল' হল সব রকম শিষ্টাচারের বিধান। শীল মোট দশটি : ১. প্রাণীহত্যা করব না; ২. পরধন চুরি করব না; ৩. ব্যভিচার করব না; ৪. মিথ্যা কথা বলব না; ৫. মাদকদ্রব্য সেবন করব না; ৬. বিকেলে ভোজন করব না; ৭. নাচ, গান, বাজনা, উৎসব উপভোগ করব না; ৮. শরীরের শোভাবর্ধনকারী মালা বা সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করব না; ৯. উচ্চাসন ও উচ্চশয্যা, মহাসন ও মহাশয্যায় উপবেশন ও শয়ন করব না; ১০. সোনা ও রূপা গ্রহণ করব না।

প্রতিটি শীল গ্রহণ করার সময় শীলের সঙ্গে 'এই শিক্ষা গ্রহণ করছি' কথাটিও বলতে হয়। দশ শীলের মধ্যে প্রথম পাঁচটি শীল বৌদ্ধ গৃহীদের প্রত্যহ পালন করতে হয়। এই পাঁচ শীলই 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বুদ্ধদেব (দ্র) এই পাঁচটি নিয়ম প্রবর্তন করেন। এগুলো বৌদ্ধ জীবনের মূলমন্ত্র। বৌদ্ধ মাত্রেই পঞ্চশীল গ্রহণ করে দৈনন্দিন জীবনে শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা সহকারে তা পালন করে। উল্লিখিত পাঁচ প্রকার কাজ তিনটি উপায়ে সম্পাদিত হতে পারে। যেমন নিজে করা, অন্যকে দিয়ে করানো, বা করার জন্য অন্যকে অনুমতি দেওয়া। এই তিনটি উপায়ের কোনো একটি দ্বারা উল্লিখিত পাঁচটি পাপকর্ম সম্পাদিত না করাই পঞ্চশীল পালনের মূলকথা। প্রতিপালনের চেতনা সৃষ্টি করলে পঞ্চশীল প্রতিপালন

www.pathagar.com

মোটেও অসম্ভব নয়। পাঁচটি শীল পরস্পর এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে একটি পালন করলে অন্যগুলো পালনের সদিচ্ছা জাগে। অপর দিকে একটি ভঙ্গ করলেও অন্য চারটির গুণ অটুট থাকে। বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুসারে পঞ্চশীল অনুশীলনে নৈতিক চরিত্র সংগঠন ছাড়াও ভবিষ্যৎ কুশলের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। দশ শীলের প্রথম আটটি পূর্ণিমা, অষ্টমী ও অমাবস্যায় ধর্মপ্রাণ গৃহী বৌদ্ধরা পালন করেন। এই শীল পালনকে 'অষ্টশীল' পালন বলা হয়। মোট দশটি শীল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সব সময় পালন করতে হয়।

সুজ. ব.

শীলভদ্র

আচার্য শীলভদ্র বাংলার এক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং সমতট (বঙ্গদেশ) রাজ্যের ব্রাহ্মণ রাজার পুত্র ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে চলে যান এবং আর কোনোদিন দেশে ফিরে আসেন নি। সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়ের (দ্র) রাজা শশাঙ্কের (দ্র) সময় তিনি নালন্দায় (দ্র) মহাচার্য ছিলেন। তাঁর জন্মের সঠিক তথ্য জানা যায় না।

সে সময় নালন্দা মহাবিহার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ছিল। আচার্য শীলভদ্র জ্ঞান অর্জন ও নানা স্থান ভ্রমণ করে অবশেষে নালন্দায় এসে আচার্য ধর্মপালকে গুরু হিসাবে বরণ করেন। এ সময় তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে শীলভদ্র নালন্দার মহাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হন। নালন্দায় তখন ১০,০০০ বৌদ্ধ শ্রমণ-ভিক্ষু বিদ্যাচর্চা করতেন।

শীলভদ্রের নিকট চীন পরিব্রাজক হিউএন-ৎ সাঙ (দ্র) শিষ্যত্ব বরণ করেন। এ সময় কযঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণে (বাংলা ও আসামের বিভিন্ন রাজ্যের তৎকালীন নাম) প্রবল জ্ঞানচর্চা হত বলে হিউএন-ৎসাঙ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন।

আচার্য শীলভদ্র রচিত একটি গ্রন্থের নাম জানা যায়। সেই গ্রন্থটির নাম 'আর্য-বুদ্ধ-ভূমি ব্যাখ্যান'। এই গ্রন্থটি তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এ ছাড়া তাঁর আর কোনো বইয়ের নাম এখন আর জানা যায় না।

বি. ব.

শুঁয়াপোকা (caterpillar)

প্রজাপতি (দ্র) ও মথের (দ্র) জীবন-চক্রের দ্বিতীয় পর্বটি লার্ভা, কীড়া, শূককীট বা শুঁয়াপোকা বা শুঁয়োপোকা। এদের মুখোপাঙ্গ কামড়ানোর উপযোগী। ডিম থেকে বেরিয়েই গাছের সবুজ পাতা ও ডাঁটা কামড়ে কামড়ে খায় ও বড় হতে থাকে।

মাথা বাদে শুঁয়াপোকার দেহটি তেরো ভাগে বিভক্ত। বুকে থাকে তিন জোড়া পা। এগুলোই পরবর্তী কালে সত্যিকারের পায়ে পরিণত হয়। পেটে পাঁচ জোড়া ফালতু পা থাকে। চোখ সরল প্রকৃতির। দেহ নগ্ন, চুল বা রোঁয়াযুক্ত। মথের শুঁয়াপোকা সাধারণত কালো ও ধারালো রোঁয়াযুক্ত—গায়ে লাগলে জ্বালা করে। প্রজাপতির এ ধরনের রোঁয়া থাকে না।

অন্যান্য প্রাণীর মতো দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের খোলস বাড়ে না। তাই কিছুদিন অন্তর অন্তর এটি বদলাতে হয়। জীবনে অন্তত ৪-৫ বার খোলস বদলায়। এ সময় এরা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ৭-৮ সেন্টিমিটার লম্বা হলে দেহনিঃসৃত আঠালো পদার্থের সাহায্যে শক্ত খোলস তৈরি করে শূককীটে রূপান্তরিত হয়। এ থেকেই পরবর্তী কালে প্রজাপতি বা মথ বেরোয়।

বেশির ভাগ শুঁয়াপোকাই গাছ-গাছড়া, ফসলাদির পক্ষে ক্ষতিকর। তবে, রেশম মথের শুঁয়াপোকা অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, এরাই শূককীট হওয়ার সময় রেশমি সুতো তৈরি করে। এ থেকেই মূল্যবান সিল্ক কাপড় তৈরি হয়।

আ. ন. ম. আ. র.

www.pathagar.com

খুব ভোরে সূর্য (দ্র) ওঠার আগে পুব আকাশের দিকে তাকালে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তাকে আমরা বলি শুকতারা। মাঝে মাঝে সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার সময় পশ্চিম দিগন্তে আরেকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, যাকে আমরা বলি সন্ধ্যাতারা। এই শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা আসলে কোনো তারা নয়। শুক্রগ্রহই সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা আর ভোরের আকাশে শুকতারা। নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে বলেই আমরা একে ভুল করে 'তারা' বলি। শুক্রের উজ্জ্বলতার এক প্রধান কারণ তার মেঘ। পুরো গ্রহটি মেঘের অন্তরালে ঢাকা থাকে; আর তাই মেঘ ও ঘন বায়ুমণ্ডল থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়া শুক্রকে এত উজ্জ্বল দেখায়। এই গ্রহে দিন ও রাতের মধ্যে আলোর বিশেষ কোনো তারতম্য হয় না। শুক্রের ঘন মেঘ প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইডের (দ্র) মেঘ, যা মানুষের জন্য বিষাক্ত গ্যাস। শুক্রে যে বৃষ্টি হয় তা সালফিউরিক অ্যাসিড বৃষ্টি। শুক্রের ইংরেজি নাম ভেনাস (Venus)। বুধের পরের কক্ষপথটিই হল শুক্রের চলার পথ। সূর্যকে ঘুরে আসতে শুক্রের সময় লাগে ২২৫ দিন। শুক্রের ব্যাস ১২,১০৪ কিলোমিটার। শুক্র তার নিজের অক্ষে খুবই ধীরগতিতে ঘোরে। এর আহ্নিক গতির দিক পূর্ব থেকে পশ্চিমে। এই গতি খুব মন্থর। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর পাক খেতে লাগে পুরো ২৪৩ সৌর দিন। এর অর্থ শুক্রের ১ দিন এর ১ বছরের চেয়ে বড়। শুক্র কেন এমন উল্টো দিকে সূর্যের চার পাশে ঘোরে আর এত ধীরে নিজ অক্ষের ওপর পাক খায় তা এখনো বোঝা যায় নি। মানুষ যখন শুক্র সম্পর্কে জানত না, তখন একে পৃথিবীর সুশ্রী যমজ বোন হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন শুক্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারল, তখন বোঝা গেল যে শুক্র পৃথিবীর সুশ্রী যমজ বোন নয়, বরং একেবারেই কুৎসিৎ যমজ।

সে. শা.

শুটিং (shooting)

ধর্মযাজক রোজার বেকন কর্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বারুদ আবিষ্কারের পর থেকে তৎকালীন বিশ্বে তীর-ধনুক ও অসির ব্যবহার উঠে গিয়ে বন্দুক ও পিস্তলের ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে শুটিং বা বন্দুক ছোঁড়া খেলাধুলার একটি বিষয় হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত হয়। পরবর্তী কালে ১ম ও ২য় মহাযুদ্ধে এই খেলাকে আরো বিস্তৃত ও জনপ্রিয় করেছে। ১৮৬০ সালে ব্রিটেনে এই খেলাকে প্রথম নিয়মের মধ্যে আনা হয়। ১৮৯৬ সালে প্রথম আধুনিক অলিম্পিকে এর অন্তর্ভুক্তি ঘটে। বিভিন্ন অবস্থান থেকে বিভিন্ন দূরত্বে রাইফেল ও পিস্তল ছোঁড়ার প্রতিযোগিতাটিতে ফ্রি পিস্তল, স্মলবোর রাইফেলপ্রোন পজিশন, র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল, ট্রাপ শুটিং, স্কিট শুটিং, রানিং ডিয়ার টার্গেট ইত্যাদি নানা রকম ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এগুলো ছাড়াও শুধু পিস্তলেই ১১ ধরনের শুটিংয়ের বিষয় রয়েছে। ১৯৭৪ সালে এটা এশিয়ান গেম্‌সে (দ্র) অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে শুটিং ফেডারেশন গঠিত হয়। প্রাক-বাংলাদেশ আমলে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে শুটারেরা তৎকালীন পাকিস্তান অলিম্পিক হতে বহু স্বর্ণপদক জিতে এনেছে। বর্তমানে সাফ গেম্‌স (দ্র), কমনওয়েলথ গেম্‌সেও (দ্র) তারা স্বর্ণপদক লাভের জয়যাত্রা অক্ষুণ্ন রেখেছে। বাংলাদেশে গুলশানে একটি উন্নতমানের শুটিং রেঞ্জ আছে।

কা. আ. আ.

শুবার্ট্, ফ্রান্‌ৎস্ পেটের্ [১৭৯৭—১৮২৮]

সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতরচয়িতা। ১৭৯৭ সালে ভিয়েনায় শুবার্ট্ (Franz Peter Schubert)-এর জন্ম। পিতার কাছে সঙ্গীত শিক্ষায় হাতেখড়ি। শৈশবেই তাঁর অসাধারণ সঙ্গীত-ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। স্কুলে ভর্তিকালে দেখা গেল যে তিনি বিদ্যাশিক্ষায়ও অত্যন্ত মেধাবী। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি এত চমৎকার বেহালা বাজাতে পারতেন যে তাতে সকলে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। এগারো বছর বয়সে তিনি রাজকীয় চ্যাপেলে কয়ার দলে ভর্তি হন। সেখানে একই সঙ্গে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সতেরো বছর বয়সে শুবার্ট্ সম্পূর্ণভাবে সঙ্গীত রচনায় নিয়োজিত হওয়ার আশায় সকল কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত জনপ্রিয়তা পেলেও আশানুরূপ অর্থসংস্থান হল না। শুবার্ট্ দারুণ কষ্টে পড়লেন।

www.pathagar.com

১৮১৮ সালে কাউন্ট্ জন এস্টার হাটসি তাঁকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। হাইড্ন্ও (দ্র) এই পরিবারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। কিছু দিন শুবার্ট্ এই পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর গান তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। তাঁর সিম্ফনি, চেম্বার মিউজিকও বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু শুবার্টের তাতে তৃপ্তি নেই। তিনি বৃহৎ কিছু করতে চান, সঙ্গীতের মহাকাব্য রচনা তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু তেমন কাজে নিয়োজিত হবার মতো অর্থের সংস্থান নেই তাঁর। অনেকের সাহায্য চাইলেন, কিন্তু তেমন সাড়া পেলেন না। এই অস্থিরতার মধ্যেই ১৮২৮ সালে মাত্র ৩১ বছর বয়সে শুবার্ট্ মারা যান। বেটোফেনের (দ্র) সমাধির পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

অতি দ্রুত সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন শুবার্ট্। বয়স ও জীবনযাপনের বিপত্তির তুলনায় তাঁর রচনাকর্ম বিস্ময়করভাবে বিপুল। একচল্লিশ খণ্ডে তাঁর রচনাবলি প্রকাশিত হয়েছে। সিম্ফনি (দ্র), অপেরা (দ্র), কোয়ার্টেট, চেম্বার মিউজিক প্রভৃতি ছাড়াও শুবার্ট্ ছয় শতাধিক গান রচনা করেন। সুর ও পদগৌরবে সেসব রচনা অবিস্মরণীয় মর্যাদা লাভ করেছে। জার্মান আর্ট সঙ-এর ধারা তাঁর রচনায় উজ্জ্বলতম রূপ পায়। শুবার্ট্কে 'সুরের স্বভাব-কবি' বলা হয়।

ক. গো.

শুমান্, রোবের্ট্ আলেক্সান্ডার [১৮১০—১৮৫৬]

স্বনামধন্য পাশ্চাত্য সঙ্গীতরচয়িতা। জার্মানিতে ১৮১০ সালে জন্ম। শৈশবেই শুমানের (Robert Alexander Schumann) সঙ্গীতপ্রতিভার লক্ষণ প্রকাশ পেলেও তাঁর পিতা কিছুতেই চান নি যে ছেলে সঙ্গীতবিদ হোক। পিতার আদেশে শুমান্ লাইপ্ৎসিগে আইনশাস্ত্র পড়তে যান। তখন তাঁর বয়স আঠারো। এর আগে তেমন কোনো সঙ্গীতশিক্ষা তিনি পান নি। এ সময় পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে শুমান্ আইন পড়া বন্ধ করে দিয়ে সঙ্গীতশিক্ষায় নিয়োজিত হন। প্রথমেই শেখেন পিয়ানো। শুমানের মধ্যে সাহিত্য ও সঙ্গীতপ্রতিভার সম্মিলন ঘটেছিল। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা ও নাটক রচনায় খ্যাতি লাভ করেন। সে জন্য সহজেই তিনি গান রচনার জন্যও যশস্বী হন। পিয়ানোর জন্য চমৎকার সব সঙ্গীত রচনা ছাড়াও শুমান্ সিম্ফনি (দ্র) ও কঞ্চার্টো রচনায়ও পারদর্শিতা দেখান। শুমান্ একটি সঙ্গীতপত্রিকা বের করেন ও কঠোর পরিশ্রম করে দশ বছর ধরে সেই পত্রিকা সম্পাদনা করে গেছেন। পত্রিকা সম্পাদনা করলে নিজের সঙ্গীতরচনা ব্যাহত হয় বলে তিনি সে কাজ ছেড়ে দেন ও পুনরায় পরিপূর্ণভাবে সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেন। সে সময় তিনি একের পর এক সিম্ফনি রচনা করে চলেন। সিম্ফনির পর চেম্বার মিউজিক, পিয়ানো (দ্র) ও অন্যান্য যন্ত্রের জন্য সঙ্গীত রচনা। এর জন্য যে পরিশ্রম হল তাতে শুমানের স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। বায়ু পরিবর্তনের জন্য ড্রেস্ডেন গেলেন ও সেখানে গিয়ে একটি সিম্ফনি, একটি অপেরা (দ্র) ও একটি পিয়ানো কঞ্চার্টো রচনা করেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হল না। ১৮৪৯ সালে শুমান্ ডুসেল্ডোর্ফের বিখ্যাত অর্কেস্ট্রার (দ্র) দলে পরিচালকের কাজ পান। সে কাজ তাঁর ভাল লাগে নি। শরীর আরো খারাপ হয়ে গেল। ভ্রমণে বের হলেন স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায়। কিন্তু কোনো ফল হল না। ক্রমে তাঁর মানসিক ব্যাধি দেখা দিল। প্রেতলোক সম্পর্কে তিনি উৎসাহী হয়ে উঠলেন। এই অবস্থায় শুমান্কে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানেই ১৮৫৬ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বহুমুখী সঙ্গীতপ্রতিভা ছিল শুমানের। সব মিলিয়ে তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিপুল সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁকে 'সঙ্গীতের দার্শনিক' বলা হয়।

ক. গো.

শুশুক ডলফিন দ্র

শূন্যবাদ নাগার্জুন দ্র

শৃঙ্খলক্রিয়া (chain reaction)

যে প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ পুনরায় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বিক্রিয়া চালু রাখে তা'-ই শৃঙ্খলক্রিয়া। কাজের সুবিধার্থে রাসায়নিক শৃঙ্খলক্রিয়া ও নিউক্লিয়ার শৃঙ্খলক্রিয়া এই দু' ভাগে শৃঙ্খলক্রিয়াকে বিবেচনা করা হয়।

রাসায়নিক শৃঙ্খলক্রিয়ায় প্রথমে একটি মধ্যবর্তী উৎপাদ তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে মধ্যবর্তী উৎপাদ আদি উপাদানসমূহের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মূল উৎপাদসমূহ (product) তৈরি করে। পলিমার প্লাস্টিক উৎপাদনে রাসায়নিক শৃঙ্খলক্রিয়া প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া, কুয়াশা সৃষ্টিও একটি প্রাকৃতিক শৃঙ্খলক্রিয়া।

একটি ক্রমাগত নিউক্লিয়ার ফিশন্ (দ্র) হল নিউক্লিয়ার

www.pathagar.com

শৃঙ্খলক্রিয়া। যেমন—ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর একটি কেন্দ্রিণকে নিউট্রন (দ্র) দ্বারা আঘাত করা হলে সেটি দু'টি হালকা পরমাণুতে (দ্র পরিণত হয়। এবং প্রতিবার ভাঙ্গনে গড়ে ২.৫টি নিউট্রন মুক্ত হয়। এর মধ্যে কিছু নিউট্রন বিক্রিয়াএলাকা ছেড়ে যায় এবং কিছু শোষিত হয়। কিন্তু যদি একটি নিউট্রন পুনরায় ইউরেনিয়াম-২৩৫কে আঘাত করে, তাহলে এই ফিশন্ চলতে থাকে।

কমপক্ষে যে পরিমাণ ফিশন্‌যোগ্য পদার্থকে একত্রিত করলে ফিশন্ আপনাআপনি শুরু হয়, সেটিকে ক্রান্তিভর (critical mass) বলে।

পরমাণু-বোমা (দ্র) ও পারমাণবিক চুল্লিতে শৃঙ্খলক্রিয়ার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

মু. হা.

শেওলা

শেওলার আর এক নাম শৈবাল। এরা উদ্ভিদজগতের অন্যতম আদিম ও স্বনির্ভর সমাঙ্গদেহী সদস্য। উদ্ভিদ-জগতের একটি বিরাট অংশ এদের নিয়ে গঠিত। এদের কোনো কোনোটি এককোষী, কোনোটি আণুবীক্ষণিক, আবার কোনোটি বহুকোষী ও বিশালাকার। আকৃতিতে এদের কোনো কোনোটি ২৫ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত লম্বাও হয়ে থাকে। মূল, কাণ্ড ও পাতায় এদের দেহ বিভক্ত নয়। তবু বিশাল দেহের জন্য সামুদ্রিক শৈবাল প্রজাতির দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত বলে মাঝেমধ্যে ভুল হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল জলাভূমিতেই এরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকায়ও এদের আধিপত্য চোখে পড়ে।

শেওলা কখনো মুক্তভাবে, আবার কখনো দলগতভাবে কলোনি তৈরি করে বসবাস করে। এরা কখনো পরাশ্রয়ী, কখনো মিথোজীবী, কখনো ভাসমান, তেমনি কখনো আবার নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে। এ ধরনের বহুবিধ, বৈচিত্র্যময় আকার ও প্রকৃতির বিরাট সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে সুবিশাল এক শৈবালজগৎ গঠিত। এখন পর্যন্ত মানুষের জানা মতে এর প্রজাতির সংখ্যা ৩০ হাজার।

শেওলার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ : এর দেহে ক্লোরোফিল থাকে। দেহে ক্লোরোফিল (দ্র) থাকায় শেওলা স্বভোজী। শেওলার দেহে কোনো পরিবহণতন্ত্র নেই। এদের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ্ (দ্র) ও পেক্টোজ দিয়ে তৈরি। শেওলার সঞ্চিত খাদ্য শর্করা। এদের জননাঙ্গ এককোষী, তবে কখনো বহুকোষী হলেও তা বন্ধ্যা কোষ দিয়ে ঢাকা থাকে না। স্ত্রী-জননাঙ্গে থাকাকালে এদের জায়গোট কখনোই বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় না। কিছু শেওলা অনেক দেশে উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মু. আ.

শেক্সপীয়র, উইলিয়াম [১৫৬৪—১৬১৬]

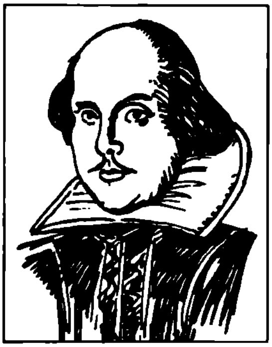

ইংরেজ কবি ও অভিনেতা। সাধারণভাবে শেক্সপীয়র (William Shakespeare) বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর সময়ে তিনি লণ্ডনে শ্রেষ্ঠ নাট্যসংস্থা 'লর্ড চেমবার্লিন্স মেন' (১৫৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত)-এর অংশীদার ছিলেন। তাঁর পিতা জন শেক্সপীয়র ও মাতা মেরি আর্ডেন। ইংল্যাণ্ডের স্ট্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন্ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ ও মৃত্যুতারিখ এক—২৩শে এপ্রিল। ১৫৬৪ সালে তাঁর জন্ম আর মৃত্যু ১৬১৬ সালে। তিনি সুশিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ মানুষ ছিলেন।

শেক্সপীয়র ১৫৮৮ সালে সম্ভবত শিক্ষানবিশ হিসাবে লণ্ডনের এক রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন। আনুমানিক ১৫৯০ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'দ্য কমেডি অব এরর্স' বা 'হেনরি দ্য সিক্সথ্'-এর প্রথম খণ্ড রচনা করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে তাঁর নাটক রচনার চর্চা চলতে থাকে। ১৫৯০ থেকে ১৬১১ সালের মধ্যে তিনি ৩৬টির মতো নাটক রচনা করেন। ঐতিহাসিক, কমেডি (দ্র) ওট্র্যাজেডি (দ্র) সব ধরনের নাটক রচনায় তাঁর অনন্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে 'দ্য লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ অব কিং রিচার্ড দ্য সেকেণ্ড', 'দ্য লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ অব কিং রিচার্ড দ্য থার্ড', 'টু জেন্টলমেন অব ভেরোনা', 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট', 'টুয়েলফ্‌থ্ নাইট', 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস্', 'কিং হেনরি দ্য

www.pathagar.com

শেক্সপীয়রের নাটক রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট্-এর একটি বিষাদঘন দৃশ্য

ফোর্থ', 'হ্যামলেট (দ্র)', 'ওথেলো', 'কিং লিয়ার', 'ম্যাকবেথ', 'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা', 'দ্য টেম্‌পেস্ট্' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অসাধারণ চরিত্রচিত্রণ, অপূর্ব কাহিনীবিন্যাস, চমকপ্রদ নাট্যশৈলী শেক্সপীয়রীয় নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রচনানৈপুণ্য ও নাটকের বাস্তব প্রয়োগ-কৌশলের জন্য তিনি প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তাঁর কবিত্বশক্তিও অসাধারণ। তাঁর নাটকগুলো মূলত ছন্দোবদ্ধ এবং অপরূপ কাব্যরসে পরিপূর্ণ। তিনি জীবনের জয়গানে মুখর। জীবন-জগতের সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যের প্রকাশই তাঁর নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। কিন্তু তাঁর বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। তিনি যে ছত্রিশটি নাটক লিখেছেন, সেগুলো প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের, কোনোটির সঙ্গে কোনোটির মিল পাওয়া যায় না।

শেক্সপীয়র ১৫৪টি সনেট এবং ২টি বর্ণনামূলক দীর্ঘ কবিতাও রচনা করেন। সনেটগুলোর অধিকাংশ তাঁর এক সম্ভ্রান্ত-সুদর্শন তরুণ বন্ধুর উদ্দেশে রচিত।

নাট্যকার হিসাবে শেক্সপীয়র বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তাঁর রচনাকর্ম সম্পর্কে বহু বিতর্ক আছে। পণ্ডিতদের অনেকেই মনে করেন, তাঁর নাটকগুলো সম্পূর্ণভাবে তাঁর রচনা নয়, আংশিক তাঁর রচনা। রচনা যাঁরই হোক না কেন, শেক্সপীয়রের নামে প্রচলিত নাটকগুলো যে পৃথিবীর সকল নাট্যামোদীর জন্য সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলায় শেক্সপীয়রের প্রায় সকল নাটকই রূপান্তরিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (দ্র) থেকে শুরু করে মুনীর চৌধুরী (দ্র) পর্যন্ত অনেক শক্তিমান লেখক তাঁর নাটক অনুবাদের সাধনা করেছেন।

জাহানারা ইমাম (দ্র) শেক্সপীয়রের অনেক ট্র্যাজেডি ও কমেডির কাহিনীকে কিশোরদের উপযোগী গল্পে রূপান্তর করে বাংলায় প্রকাশ করেছেন।

সুজ. ব.

শেখ ফজলল করিম [১৮৮২—১৯৩৬]

নীতিবাদী সাহিত্যিক। তিনি ১৮৮২ সালে লালমনিরহাট জেলার কাকিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ জানা যায় না। তিনি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শেখ ফজলল করিম এক জন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। নৈতিক আদর্শে সমৃদ্ধ কবিতা ও গদ্য লিখে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। মুসলিম ইতিহাস, মুসলিম উপাখ্যান, মুসলিম জীবন ইত্যাদি তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল—কবিতা : 'পরিত্রাণ' (১৯০৩), 'তৃষ্ণা', 'গাথা' (১৯১৩), 'ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি'; গদ্যগ্রন্থ : 'লায়লী মজনু' (১৯০৩), 'পথ ও পাথেয়', 'আসবাত্ উস-ছামী বা ছামীতত্ত্ব' (১৯০৩), 'চিন্তার চাষ' (১৯২৬), 'রাজর্ষি এবরাহিম', 'বিবি রহিমা'। তিনি ওমর খৈয়ামের অনুবাদও করেছিলেন।

শেখ ফজলল করিমের সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় ধর্মীয় হলেও দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও সাহিত্যিক প্রসাদগুণে তাঁর সৃষ্টি সর্বজনীন হয়ে উঠেছে।

তাঁর দু'টি জনপ্রিয় পঙ্‌ক্তি হল—

"কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।"

সুজ. ব.

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু [১৯২০—১৯৭৫]

স্বাধীন বাংলাদেশ (দ্র) রাষ্ট্রের জনক ও প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার (বর্তমান গোপালগঞ্জ) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সাহেরা খাতুন।

তিনি গোপালগঞ্জ থেকে স্কুলের পড়াশোনা সমাপ্ত করে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৪৭ সালে বি. এ. পাশ করেন। বি. এ. পাশ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) আইন বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই তৎকালীন মুসলিম লীগ (দ্র) রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান 'পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'-এর (১৯৪৮) প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। ১৯৪৯ সালের ৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের সমর্থনে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে আন্দোলনের কারণে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন।

১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হলে তিনি এর যুগ্ম সম্পাদক হন এবং পরে ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদক হন।

১৯৫৪ সালে প্রথমে তিনি পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদ ও

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ : 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, যার যা আছে ....।

www.pathagar.com

'৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল . কামারুজ্জামান ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

পরে (১৯৫৫) দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরপর দুই বার (১৯৫৪ ও ১৯৫৬) তিনি পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর শেখ মুজিবুর রহমান কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৯ সালে মুক্তিলাভ করলেও তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। ১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং একই বছরের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ৬-দফা (দ্র) দাবি উত্থাপন করেন।

পূর্বাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সাল থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের ওপর চলে রাজনৈতিক নিপীড়ন। তাঁকে প্রধান আসামি করে শুরু করা হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' (দ্র)। কিন্তু উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের (দ্র) চাপে এই মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে ২২শে ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) তিনি মুক্তি পান। ২৩শে ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ দল শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু তাঁকে সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান (দ্র) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৭ই মার্চ (১৯৭১) ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন— 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাঙালি নিধন শুরু করে। সে রাতে তিনি গ্রেফতার বরণ করলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাথমিক নির্দেশ তাঁর নামে প্রচারিত হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেলেও তাঁকে প্রতীক হিসাবে নিয়ে বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর অবর্তমানে রাষ্ট্রপতি এবং সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে (দ্র) স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারও গঠন করা হয়।

স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর বিশ্বজনমতের চাপে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং ১২ই জানুয়ারি (১৯৭২) বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ (দ্র), জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার (ও আই সি) সদস্যপদ লাভ করে। তাঁর অনুরোধে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে দ্রুত প্রত্যাহৃত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 'শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি' গণতন্ত্র (দ্র), সমাজতন্ত্র (দ্র), ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ (দ্র)কে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস'(দ্র) থেকে তা বলবৎ করা হলে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ বছরই (১৯৭২) ১৮ই মার্চ তাঁর উদ্যোগে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি (দ্র) সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ দেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের ২৩শে মে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে 'বিশ্বশান্তি পরিষদ'-এর তরফ থেকে 'জোলিও-

www.pathagar.com

কুরি'(দ্র) পদক প্রদান করা হয়।

১৯৭৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু নিজের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগসহ দেশের সব ক'টি রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটিয়ে একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম হিসাবে 'বাকশাল' (দ্র) বা 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' গঠন করেন।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীবলে সংসদীয় সরকার-ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার কায়েম করা হয়। ২৫শে জানুয়ারি (১৯৭৫) তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বগ্রহণ করেন এবং 'বাকশাল'-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। সেই সঙ্গে বড় বড় শিল্প-কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই এবং গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পোশাক প্রদান, ইসলামবিরোধী কাজ বিবেচনা করে রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় বন্ধ করার জন্য এই স্থানকে উদ্যানে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন প্রণয়ন করে সরকারি পর্যায়ে মদ তৈরি ও মদ আমদানি নিষিদ্ধকরণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (দ্র) প্রতিষ্ঠা, টঙ্গিতে বিশ্ব-এজতেমার জন্য জমি বরাদ্দ, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং ১০০ বিঘা জমির সিলিং ধার্য, সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী (দ্র) প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে (দ্র) ভারত (দ্র) থেকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। তিনি অফিস আদালতসহ সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষা (দ্র) প্রচলন বাধ্যতামূলক করেন।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে জাপান সফরকালে জাপান সরকারের নিকট যমুনা সেতু নির্মাণের প্রস্তাব করেন। বর্তমানে সেই সেতু নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শিশুর সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী কালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

জনতার অভিনন্দনের জবাবে হাত নাড়ছেন বঙ্গবন্ধু, পেছনে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা

(দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করা হয়।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা মার্চ কুমিল্লার দাউদকান্দিতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি ভারত (দ্র), পাকিস্তান (দ্র), নেপাল (দ্র), শ্রীলঙ্কা (দ্র) -কে নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পরবর্তী কালে তাঁর এই দর্শনের আলোকেই সার্ক (দ্র) বা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে বাংলাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাতে সামরিক বাহিনীর কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সদস্যের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। তাঁর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আ. হ.

শেখ লুতফর রহমান [১৯২০—১৯৯৪]

বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। সুরকার, গায়ক ও প্রশিক্ষক হিসাবেও খ্যাতিমান। সাতক্ষীরা জেলার বাঁকাল গ্রামে জন্ম। পিতা

www.pathagar.com

আবদুল হক, মাতা লতিফুন্নেসা। শৈশবেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ প্রকাশ পায়। সঙ্গীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে শেখ লুতফর রহমান অল্প বয়সেই কলিকাতা (দ্র) চলে যান। সঙ্গীতগুণী

হিসাবে অল্পেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেও সমর্থ হন। গণসঙ্গীতের (দ্র) প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায়। ১৯৪২ সালে তিনি কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন। দেশভাগের পর তিনি ঢাকা (দ্র) চলে আসেন এবং বর্তমান বাংলাদেশে (দ্র) সুরকার, গায়ক ও প্রশিক্ষকরূপে ভূমিকা পালনে ব্রতী হন। আমৃত্যু তিনি সেই ভূমিকা পালন করে গেছেন। নজরুলের ওজস্বী গীতসমূহের গায়নে শেখ লুতফর রহমান বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নজরুলসঙ্গীতের (দ্র) প্রসারেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশের সকল জাতীয় আন্দোলনে সাংস্কৃতিক পুরোধা হিসাবে শেখ লুতফর রহমান অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে নানা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ক. গো.

শেখভ, আন্তন চেখফ্, আন্তোন্ পাভ্লভিচ্ দ্র

শেয়াল (jackal)

শেয়াল, পাতিশিয়াল, শৃগাল বা শিয়ালপণ্ডিতের ছল-চাতুরির সঙ্গে সবাই পরিচিত। শেয়াল মাংসাশী, কুকুর (দ্র) পরিবারের স্তন্যপায়ী প্রাণী। পৃথিবীতে শেয়ালের প্রজাতি তিনটি। কালো-পিঠ ও পার্শ্ব-ডোরা প্রজাতি দু'টি আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বাস করে। সোনালি বা এশীয় শেয়াল পূর্ব-ইউরোপ, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি বাংলাদেশের সবখানেই আছে। সন্ধ্যা-রাতে ও ভোর-রাতে উচ্চৈঃস্বরে হুক্কা-হুয়া বা কেক্-কেক্-কা-হু রবে ডাকে।

শেয়াল নেকড়ের মতো হলেও আকারে ছোট। মুখ লম্বা, লেজ ফোলা ও সব সময় নিচের দিকে নামানো থাকে।

এরা খোলামেলা অঞ্চলের বাসিন্দা। দিনে ঝোপঝাড়ে গর্তে লুকিয়ে থাকে। রাতে শিকারে বেরোয়। একাকী, জোড়ায় বা দলে থাকে। মরা-পচা খেতে ভালবাসে। তা ছাড়া, ইঁদুর (দ্র), পাখি (দ্র), হাঁস-মুরগি, গোসাপ, সাপ (দ্র), কাঁকড়া (দ্র), মাছ (দ্র), ভুট্টা (দ্র), আখ (দ্র), তরমুজ, আম-কাঁঠাল সবই খায়। বাঘ (দ্র)-চিতা (দ্র)-সিংহের (দ্র) পিছু নেয়; তাদের ফেলে যাওয়া শিকারের উচ্ছিষ্টাংশ খায়। দল বেঁধে অ্যান্টিলোপ, ভেড়াকেও কাবু করে ফেলে। কুকুর, নেকড়ে ইত্যাদিকে ভয় পায়।

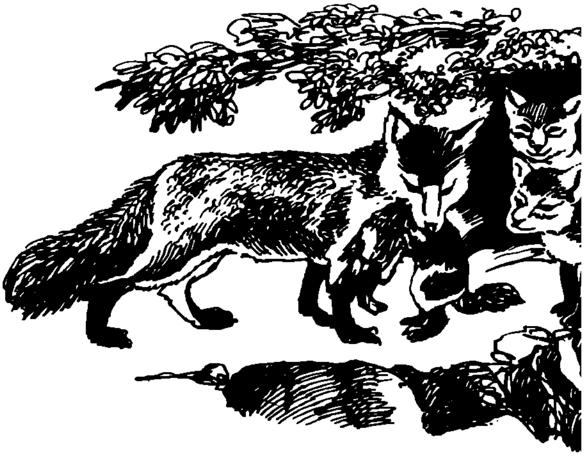

এরা কিছুটা ভীতু, তবে বুদ্ধিমান। ঘ্রাণশক্তি প্রবল। লেজের নিচের গ্রন্থির দুর্গন্ধ দিয়ে শত্রু তাড়ায়।

মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বাস করে। গর্তের অনেকগুলো মুখ। মূল গর্তের সঙ্গে এগুলোর যোগাযোগ থাকে। ৫৭–৭০ দিন গর্ভধারণের পর স্ত্রী-শেয়াল ২–৭টি বাচ্চা দেয়। ১০–১৫ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

শেরশাহ্ (১৪৭২—১৫৪৫)

শেরশাহের প্রকৃত নাম ফরিদ। তাঁর পিতা হাসান শূর ছিলেন বিহারের সাসারামের জায়গিরদার। সৎমায়ের অত্যাচারে গৃহত্যাগ করে তিনি আগ্রায় চলে যান। আত্মীয়-স্বজনের ষড়যন্ত্রে পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ১৫২২ সালে বিহারের শাসনকর্তা বাহার খানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। নিজ হাতে একটি বাঘ মেরে শের খাঁ উপাধি

www.pathagar.com

লাভ করেন।

১৫২৭ সালে শের খাঁ আগ্রায় বাবরের (দ্র) অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। এরপর ১৫২৮ সালে তিনি বৈমাত্রেয় ভাইদের হাত থেকে পিতার জায়গির উদ্ধার করেন। ১৫৩০ সালে চুনার দুর্গ অধিকার করেন। ১৫৩৭ সালে শের খাঁ বঙ্গদেশ আক্রমণ করে রাজধানী গৌড় (দ্র) অধিকার করেন।

বিদ্রোহী শের খাঁ-কে দমন করার জন্য হুমায়ুন (দ্র) বঙ্গদেশ আক্রমণ করলে শের খাঁ হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ভিন্ন পথে গিয়ে অধিকৃত বিহার ও জৌনপুর অধিকার করেন। এই সংবাদ পেয়ে হুমায়ুন শের খাঁ-কে দমন করার জন্য অগ্রসর হন এবং গঙ্গাতীরে বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে শের খাঁ-র সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৫৩৯ সালে সংঘটিত এই যুদ্ধে হুমায়ুন শের খাঁ-র হাতে পরাজিত হন। এই যুদ্ধের ফলে শের খাঁ বাংলা, বিহার ও জৌনপুরের স্বাধীন অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শেরশাহ্ উপাধি ধারণ করেন।

হারানো রাজ্য উদ্ধারের জন্য হুমায়ুন শেরশাহ্-এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৫৪০ সালে কনৌজের অদূরে বিল্বগ্রামে অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধে শেরশাহ্ হুমায়ুনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। হুমায়ুন লাহোর অভিমুখে যাত্রা করলে শেরশাহ্ দিল্লি (দ্র) এবং আগ্রা অধিকার করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর পর তিনি রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন। হুমায়ুনের ভাই কামরানকে পরাজিত করে শেরশাহ্ পাঞ্জাব দখল করেন। তিনি রাজপুতানার অনেকগুলো রাজ্যও জয় করেন। ১৫৪৩ সালে রাইসিনের পুরন মলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। কালিপুর দুর্গ অবরোধকালে শেরশাহ্ ১৫৪৫ সালের ২২শে মে বারুদের বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান।

শেরশাহ্ মাত্র পাঁচ বছর দিল্লির সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই অল্প সময়ে তিনি শাসনব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করে গেছেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে ২৪টি ভাগে বিভক্ত করেন এবং 'সরকার' নামীয় প্রতিটি বিভাগ দক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত করেন।

রাজকর্মচারীরা একই স্থানে অধিক কাল অবস্থান করে যাতে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে না পারে সে জন্য শেরশাহ্ তিন বছর অন্তর তাদের বদলির ব্যবস্থা করেছিলেন।

জমির রাজস্ব নির্ধারণের জন্য শেরশাহ্ জমি জরিপের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং দ্রুত যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। সোনারগাঁ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তাঁর স্মৃতি বহন করছে। রাস্তার দুই পাশে তিনি বৃক্ষ রোপণ ও সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। সংবাদ আদান-প্রদানে যাতে বেশি বিলম্ব না হয় সে জন্য দ্রুতগামী অশ্বারোহী দিয়ে ডাকব্যবস্থা (দ্র) দ্রুত করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

শেরশাহ্ এক জন সুদক্ষ শাসক ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাব ছিল না।

বিহারের সাসারামে তাঁর সমাধি রয়েছে।

খু. জা.

শেরে বাংলা ফজলুল হক, আবুল কাসেম দ্র

শেলি, পার্সি বিশি [১৭৯২—১৮২২]

মাত্র ত্রিশ বছরের জীবন তাঁর। সাসেক্সের একগ্রামে পার্সি বিশি শেলির (Percy Bysshe Shelly) জন্ম ৪ঠা আগস্ট ১৭৯২। ১৮২২ সালে একদিন তিনি হারিয়ে গেলেন পৃথিবী থেকে। দেশ থেকে বহু দূরে ইতালিতে স্পেৎসিয়া উপসাগরে ৮ই জুলাই তাঁর নৌকা কুয়াশায় হারিয়ে যায়। শেলি এবং তাঁর বন্ধু উইলিয়াম্‌স্-এর দেহ খুঁজে পাওয়া যায় দু'মাস পর।

শেলির পড়াশোনার প্রথম পাঠ ইটন স্কুলে এবং তার পরে অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ড থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া

www.pathagar.com

হয়। অপরাধ—তিনি নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন। সেটা ১৮১১ সাল। এর মধ্যে St. Irvyne নামে একটা রোমান্স লিখেছেন। ১৮১১ সালেই হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুককে বিয়ে করেন। তিন বছর পর এই বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁর এই সময়কার রচনা 'Queen Mab'। পরে শেলি ১৮১৬ সালে মেরি গডউইনকে বিয়ে করেন। এ বছরেই প্রকাশিত হয় Alastor। এ বছরেই আর এক বিখ্যাত কবি বায়রনের (দ্র) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং উভয়ের মধ্যে গভীর সখ্য স্থাপিত হয়। ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'The Revolt of Islam'। এর পর তিনি ইতালির উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেন। তিনি তখন প্লেটোর 'Symposium' অনুবাদ করছেন। বায়রনও তখন ইতালিতে। ভেনিসে বায়রনের আতিথ্য গ্রহণ করেন শেলি। ১৮১৯ সাল শেলির জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। তাঁর 'The Cenci' এবং বিখ্যাত গীতিনাটক 'Prometheus Unbound' প্রকাশিত হয় এই বছরে। ১৮১৯ সালের শেষ দিকেই রচিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত কবিতাসমূহ : 'Ode to the West Wind', 'To a Skylark' এবং 'The Cloud'। ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত রচনা 'Defence of Poetry'. এই রচনায় তিনি কবিতায় কল্পনা ও প্রেম বিষয়ে তাঁর অর্থবহ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ১৮২১ সালেই প্রকাশিত হয় দীর্ঘ কবিতা 'Adonais' —কবি কীটসের (দ্র) মৃত্যুতে রচিত এক অসামান্য শোকগাথা। মৃত্যুর আগে তিনি 'The Truimph of Life' রচনা করছিলেন এবং এই সময় খুব সুন্দর কয়েকটি গীতিকবিতাও রচনা করেন।

শেলি ছিলেন উদ্দামতা ও অসীম কল্পনার কবি। তিনি ছিলেন তাঁর কালের সবচেয়ে বড় রোম্যান্টিক কবি। চেনা পৃথিবীর কষ্ট আর ক্লেদ থেকে মুক্তির জন্য তিনি কল্পনার এক স্বর্গরাজ্য নির্মাণ করতেন এবং মনে করতেন দুর্দিন, অন্ধকার কেটে গিয়ে সুন্দর ও সত্য পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেছিলেন, শীত যদি আসে, বুঝতে হবে তার পিছু পিছু বসন্তও আসছে।

শ. আহ.

শেলি, মেরি ফ্র্যাঙ্কেন্স্টাইন্ দ্র

শেলিং, ফ্রিড্রিশ্ [১৭৭৫—১৮৫৪]

জার্মান রোম্যান্টিক দার্শনিক শেলিংয়ের পূর্ণ নাম ছিল ফ্রিড্রিশ্ ভিল্হেল্ম্ ইওসেফ্ ফন্ শেলিং (Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling)। দার্শনিক শ্লেগেল (দ্র) ও হেগেল (দ্র), কবি নোভালিস্, কবি হোয়ল্ডার্লিন্ (দ্র) তাঁর সমসাময়িক ছিলেন এবং চিন্তায় ও ধ্যানধারণায় প্রত্যেকের ওপরে প্রত্যেকের প্রভাব কোনো-না-কোনো ভাবে পড়েছিল।

হা. মা.

শোককাব্য / শোকগাথা

কোনো বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে যে কাব্য রচিত হয় সাধারণত তাকেই শোককাব্য বা এলিজি (Elegy) বলা হয়। বন্ধু আর্থার হ্যালামের অকালমৃত্যুতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি আলফ্রেড টেনিসন (দ্র) 'ইন মেমোরিয়াম' অর্থাৎ 'স্মরণে' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ শোককাব্য রচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর কবি ডব্লিউ. এইচ. অডেন রচিত 'ইন মেমোরি অব ডব্লিউ বি. ইয়েট্স্'-ও এই শ্রেণীর কাব্য। সাধারণভাবে মৃত্যুচিন্তা সংবলিত ভাবগম্ভীর কবিতা সম্পর্কেও এলিজি কথাটি প্রয়োগ করা হয়। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি টমাস গ্রে-র 'এলিজি রিট্ন্ ইন এ কাণ্ট্রি চার্চইয়ার্ড'।

একটি বিশেষ ধরনের শোককাব্য হল পাস্টোরাল এলিজি (Pastoral Elegy)। এখানে যার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং যে শোক প্রকাশ করে উভয়কেই মেষপালকরূপে চিত্রিত করা হয়। শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামীণ পটভূমিতে পরিবেশিত এই কাব্যধারার উদ্ভাবক খ্রিস্টপূর্ব প্রাচীন গ্রিক কবি থিওক্রিটাস। পরে রোমান কবি ভার্জিলের (দ্র) হাত ধরে এবং আরো পরে ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের (দ্র) যুগে ইউরোপের (দ্র) বিভিন্ন দেশে এ ধারার কাব্য আরো বিকাশ লাভ করে এবং ইংল্যাণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ভঙ্গিতে কাব্য রচনা অব্যাহত থাকে। ইংরেজি পাস্টোরাল এলিজির মধ্যে মিল্টনের (দ্র) 'লিসিডাস', শেলির (দ্র) এডোনিস' ও ম্যাথু আর্নল্ডের 'থার্সিস' সুপরিচিত।

বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর (দ্র) 'বন্ধুবিয়োগ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'স্মরণ' এবং কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) 'চিত্তনামা' সুপরিচিত শোকগাথা।

ক. চৌ.

www.pathagar.com

শোপেন্‌হাওয়ার, আর্টুর্‌ [১৭৮৮—১৮৬০]

জার্মান দার্শনিক শোপেন্‌হাওয়ার, (Arthur Schopenhauer) ১৭৮৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথাবদ্ধ পড়াশোনায় তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। ১৮১১ সালে তিনি মেডিক্যাল-ছাত্র হিসাবে গোটিঙ্গেন (Gottingen) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও দর্শনশাস্ত্র পড়ার জন্য বার্লিনে চলে যান। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করার পর ১৮৩১ সাল থেকে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট্‌ আম-মাইন্‌ নগরে নির্জনবাস শুরু করেন।

শোপেন্‌হাওয়ার দুঃখবাদী (pessimistic) ধারণার প্রবর্তক। জীবন-জগৎ সম্পর্কে অবিশ্বাস ও হতাশাই হল তাঁর দর্শনের মূল উপজীব্য। তিনি বুদ্ধির পরিবর্তে মানুষের ইচ্ছাশক্তির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রকৃত পরমসত্তা (True reality) একটি অন্ধ প্রেরণাদায়ক শক্তি, যা ব্যক্তি বা ব্যষ্টিতে ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায়। এই অন্ধ ইচ্ছাশক্তিই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাড়িত হয়। সব ইচ্ছার তুষ্টি বিধান করতে পারে না বলেই ব্যক্তিকে দুঃখময় জীবনযাপন করতে হয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হল ইচ্ছাকে দমন করা এবং লোভ-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনার গ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। তাঁর এই তত্ত্ব ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ-তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয়। অন্যের ব্যথায় সমবেদনা জ্ঞাপনের ওপরই তাঁর নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

শোপেনহাওয়ারের নিপুণ রচনাশৈলীসমৃদ্ধ পুস্তক-সমূহের মধ্যে ইংরেজি অনুবাদে সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয়ের নাম : 'The World As Will And Representation' (১৮১৮) এবং 'On the Will In Nature' (১৮৩৬)। পরবর্তী কালে দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে ফ্রিড্‌রিশ্‌ ভিল্‌হেল্‌ম্‌ নিট্‌শে (দ্র) ও জিগমুণ্ড্‌ ফ্রয়েড্‌ (দ্র) শোপেন্‌হাওয়ারের দর্শনচিন্তার দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হন।

১৮৬০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর শোপেন্‌হাওয়ার মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

শোলকফ্‌, মিখাইল্‌ আলেক্সান্দ্রভিচ্‌ [১৯০৫—১৯৮৪]

নোবেল পুরস্কার (দ্র)-বিজয়ী বিশ্ববিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক। দোন্‌ কসাক অঞ্চলে ১৯০৫ সালের ২৪শে মে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা আলেক্সান্দ্‌র্‌ সরকারি চাকুরে ছিলেন। খুব বেশি লেখাপড়া শেখেন নি। গ্রামীণ জীবন পছন্দ করতেন, মস্কো শহরে বছর দুয়েক কাটানো ছাড়া সারা জীবন গ্রামাঞ্চলেই কাটিয়েছেন।

তিনি প্রথমে গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) সময়ে তিনি 'প্রাভ্‌দা' সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রের খবর সরবরাহ করতেন। তাঁর সর্বাধিক খ্যাত উপন্যাসের নাম 'তিখি দোন্‌' (অর্থাৎ শান্ত দোন্‌), 'ধীরে বহে ডন' নামে বাংলা অনুবাদ আছে বইটির; এই উপন্যাসের জন্যই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৬৫ সালে। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্‌নিয়াতায়া ৎসেলিনা' (অর্থাৎ অনাবাদী জমি ওলোটপালট) কসাকদের জীবন নিয়ে লেখা। সোভিয়েত ইউনিয়নে (দ্র) লেখক হিসাবে আমৃত্যু তিনি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যু হয় রস্তোফ্‌ প্রদেশের স্তানিৎসা ভেশেন্‌স্কায়া নামক স্থানে, ১৯৮৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। জীবনের প্রায় ষাট বছর তিনি এখানেই কাটিয়েছিলেন।

হা. মা.

শ্বসনতন্ত্র (respiratory system)

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে মানেই আমরা বেঁচে আছি। এর জন্য শরীরের যে যন্ত্রগুলো প্রয়োজন, এদেরকে নিয়েই গঠিত শ্বসনতন্ত্র। যেমন– নাসাপথ, গলবিল, শ্বাসনালি, ক্লোমনালি ও দুটো ফুসফুস। শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে বাতাসের সঙ্গে শরীরের ভেতর ঢোকে অক্সিজেন (দ্র), দেহকোষে খাদ্যের দহনের জন্য এর প্রয়োজন। আবার কোষে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) তৈরি হয় তা এই তন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে।

নাসাপথ দিয়ে শ্বসনতন্ত্রের শুরু। নাকের ছিদ্রের ভেতর আছে সূক্ষ্ম রোম, আছে শ্লেষ্মার স্তর। বাতাসের ধূলিকণা

www.pathagar.com

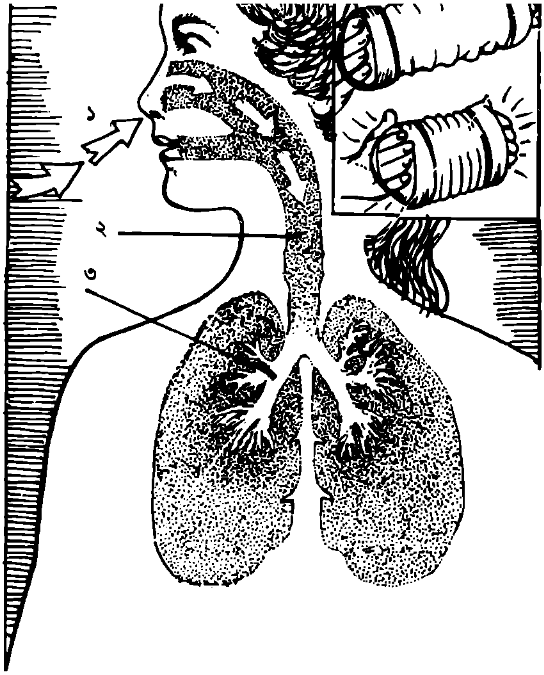

১. শ্বাসগ্রহণ, ২. শ্বাসনালি, ৩. শ্বাসনালিসমূহ, ৪. ফুসফুসের কার্যক্রম পদ্ধতি

এতে আটকা পড়ে। নাক থেকে গলবিল হয়ে বাতাস প্রবেশ করে শ্বাসনালিতে। এই নল শেষ হয় ফুসফুসে। শ্বাসনালির ভেতরে আছে শ্লেষ্মাঝিল্লি, আছে সূক্ষ্ম রোমের মতো 'সিলিয়া'। ঢেউ খেলার গতিতে সিলিয়া ধূলিময়লা ঝেড়ে বের করে দেয়, বাতাসকে ছেঁকে পরিশুদ্ধ করে। শ্বাসনালি ১০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ। শ্বাসনালির বাইরের আবরণে পর পর রয়েছে ২০টি কোমলাস্থির বলয়। এর প্রবেশমুখে স্বরযন্ত্র। এতে আছে যে স্বরতন্ত্রী, এর উপর দিয়ে বাতাস যাওয়ার সময় যে কম্পন হয়, এতেই শব্দের সৃষ্টি হয়।

শ্বাসনালি ভাগ হয়েছে দুটো শাখায়, এদের নাম 'ক্লোমনালি' (ব্রঙ্কাস)। একটি করে ক্লোমনালি প্রবেশ করেছে প্রতিটি ফুসফুসে। ক্লোমনালি আরো অনেক ছোট ছোট উপশাখায় ভাগ হয়েছে। এই উপশাখাগুলো এসে শেষ হয়েছে সূক্ষ্ম থলি বা বায়ুকোষে। বায়ুকোষের দেয়াল খুব পাতলা; এই দেয়াল দিয়ে রক্তে অক্সিজেন ঢোকে, এরপর হৃৎপিণ্ড (দ্র), ধমনী (দ্র) ও কৈশিকা পার হয়ে প্রবেশ করে কোষে। কোষের ছেড়ে দেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্তপথে এসে এই দেয়াল দিয়েই ঢোকে ফুসফুসে, এরপর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাইরে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রধান যন্ত্র হল 'ফুসফুস'। হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে বুকের খাঁচার ভেতরে সুরক্ষিত আছে গোল পিরামিড-আকৃতির দুটো ফুসফুস। ১২ জোড়া পাঁজর-অস্থি ও পেছনে কশেরুকা (দ্র) দিয়ে গড়া বুকের খাঁচার মেঝেটি পেশির পর্দা দিয়ে গঠিত। এই পর্দার নাম মধ্যচ্ছদা (ডায়াফ্রাম)। তরুণ ফুসফুস দেখতে ধূসর, স্পঞ্জের মতো নরম ও স্থিতিস্থাপক। ফুসফুস দুই স্তরবিশিষ্ট ঝিল্লি দ্বারা আবৃত।

শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়ুতন্ত্র। স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া হয় মিনিটে ১৪–১৮ বার। আমরা যখন শ্বাস নিই, বুকের খাঁচা ফুলে ওঠে, মধ্যচ্ছদা নিচে নামে, অক্সিজেনে ভরপুর বাতাস ফুসফুসে ঢোকে। নিঃশ্বাসের সময় বুকের খাঁচার পেশি শিথিল হয়, বুকের খাঁচা কুঁকড়ে আসে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভর্তি বাতাস বেরিয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি বার শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রায় ৫০০ মিলিলিটার বায়ু আসা-যাওয়া করে।

শ্বসনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য রোগের মধ্যে রয়েছে ফুসফুসীয় যক্ষ্মা (দ্র), নিউমোনিয়া (দ্র), ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস. ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস, হাঁপানি (দ্র), প্লুরিসি, ইনফ্লুয়েঞ্জা (দ্র), হুপিংকফ, ক্যান্সার (দ্র) ইত্যাদি।

শু. চৌ.

শ্বেত কণিকা রক্ত দ্র
শ্বেতসার কার্বোহাইড্রেট দ্র
শ্বেতাম্বর জৈনধর্ম দ্র

শ্বেতী (vitiligo, leucoderma)

দেহত্বকের কোনো অংশ হঠাৎ সাদা হয়ে যাওয়ার নাম শ্বেতী। সঠিক অর্থে চর্মরোগ নয়, আবার কুষ্ঠরোগও নয়। লৌকিক চিকিৎসাশাস্ত্রে 'ধবল কুষ্ঠ' নামে এর প্রচারের কারণে যত বিপত্তি।

জীনগত প্রভাবে ত্বকের নিচে উপস্থিত কালো রঞ্জক পদার্থের (মেলানিন) ঘাটতির কারণে শ্বেতী দেখা দেয়। এর সঠিক কারণ জানা নেই। বিজ্ঞানীদের হিসাবে জনসংখ্যার এক শতাংশ লোক এই রোগের শিকার। শ্বেতী যেমন হঠাৎ করে দেখা দেয়, তেমনি চিকিৎসা ছাড়াই আপনা থেকে অনেক সময়ে মিলিয়ে যায়। আবার কোনো কোনো রোগের

www.pathagar.com

লক্ষণ হিসাবে শ্বেতী দেখা দিতে পারে, যেমন থাইরয়েড-স্বল্পতা বা থাইরয়েড-আধিক্য, ডায়াবেটিস (দ্র), পাকস্থলীর ক্যান্সার (দ্র) এবং কোনো কোনো চর্মরোগ। শ্বেতী কোনো প্রকার ছোঁয়াচে রোগ নয়।

শ্বেতীর নির্ভরযোগ্য কোনো চিকিৎসা নেই। এর নিরাময় স্বতঃস্ফূর্ত। তবে চিকিৎসকগণ ত্বকে এক ধরনের লোশান ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আর উপদেশ দেন টকজাতীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন লেবু (দ্র), জাম্বুরা, টমেটো (দ্র) ইত্যাদি বাদ দিতে এবং ভিটামিন 'সি' না খেতে।

আ. র.

শ্যামদেশ থাইল্যাণ্ড দ্র

শ্যামা কালী দ্র

শ্রমণ, শ্রামণ্য, প্রব্রজ্যা

এক কথায় নবীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে শ্রমণ বলা হয়। শ্রামণ্য বা প্রব্রজ্যা গ্রহণের শ্রেষ্ঠ সময় ১৫ বছর বয়স। তবে ৭/৮ বছর বয়সেও মা-বাবার অনুমতি নিয়ে প্রব্রজ্যা নেওয়া যায়। এক জন ভিক্ষুর আশ্রয়ে এই শ্রমণ বা নবীন ভিক্ষু (দ্র) ধর্মশাস্ত্র ও আনুষঙ্গিক নিয়মকানুন শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে তিনি উপসম্পদা বা পূর্ণদীক্ষা লাভ করে ভিক্ষু হন। সিদ্ধার্থের (গৌতম বুদ্ধের গৃহী জীবনের নাম) পুত্র রাহুল ৭ বছর বয়সে শ্রমণ হয়েছিলেন। বুদ্ধ তাঁকে দীক্ষা দান করেন।

শ্রমণ থেকে ভিক্ষু হওয়ার ন্যূনতম বয়স কুড়ি বছর। উপসম্পদা বা ভিক্ষু হওয়ার আগে তাঁদের শ্রমণ বা শ্রামণ্য বা শ্রমণোদ্দেশক বলা হয়।

বি. ব.

শ্রীঅরবিন্দ অরবিন্দ ঘোষ দ্র

শ্রীকৃষ্ণ

পুরাণে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর (দ্র) অবতার। তিনি দ্বাপর যুগে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁর জন্মদিনকে 'জন্মাষ্টমী' (দ্র) বলে। তাঁর পিতার নাম বসুদেব, মাতার নাম দেবকী। দেবকী মথুরার রাজা কংসের বোন।

কথিত আছে, কংস দৈববাণী শোনে যে নিজের বোন দেবকীর অষ্টম সন্তানের হাতে তার মৃত্যু হবে। কংস তখনই দেবকীকে হত্যা করতে চায়। বসুদেব ও দেবকী তখন অনেক অনুনয়-বিনয় করে বলেন যে তাঁদের সন্তান হলে তাঁরা নবজাত সন্তানকে কংসের হাতে সমর্পণ করবেন। দেবকী তাতে প্রাণে বেঁচে যান। বসুদেব ও দেবকীর ছয়টি সন্তান শর্ত অনুসারে কংসের হাতে নিহত হয়। অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় সপ্তম সন্তান। পরে তিনিই বলরাম নামে খ্যাত হন। অষ্টম সন্তান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হলে বসুদেব তাকে যমুনার অপর তীরে গোকুলে নিয়ে যান। সেখানে তখন গোপদের রাজা নন্দের স্ত্রী যশোদার এক কন্যা-সন্তান হয়। বসুদেব ছেলে শ্রীকৃষ্ণকে রেখে যশোদার মেয়েটিকে নিয়ে চলে আসেন এবং কংসের হাতে তুলে দেন।

হিন্দু ধর্মমতে দুষ্টের দমন ও সৎমানুষের পালনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে পৃথিবীতে আসেন। শ্রীকৃষ্ণও সেরূপ এক জন অবতার। তিনি অত্যাচারী রাজা কংসকে হত্যা করেন। তিনি দাবাগ্নি নেভান, কালীয় নাগ নামক একটি বিষধর সর্পকে দমন করেন। অত্যাচারী চেদীরাজ শিশুপালকে হত্যা করেন। মহাভারতে (দ্র) বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে (দ্র) তিনি কৌরবদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেন। এই যুদ্ধ উপলক্ষে পাণ্ডববীর অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে উপদেশ দেন তা 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' (দ্র), সংক্ষেপে 'গীতা' (দ্র), নামে পরিচিত; ধর্মগ্রন্থরূপে গীতা এখনো হিন্দুদের ঘরে ঘরে পঠিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ, ধর্মপ্রবক্তা, সংস্কারক ও যোদ্ধা; আর ভক্তদের কাছে দেবতা—পূর্ণ অবতার।

নি. অ.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন / শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

১৯০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিন্যা গ্রাম থেকে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুঁথিখানার প্রথম ও শেষ অংশ এবং ভেতরেরও কিছু পাতা পাওয়া যায় নি। পুঁথির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি কোথাও ছিল না। বসন্তরঞ্জন রায় সেটি সম্পাদনা করে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (দ্র) থেকে প্রকাশ করেন। গ্রন্থের নামটি তাঁর দেওয়া। বইয়ের ভেতরের ভণিতা থেকে জানা যায় পুঁথির রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস (দ্র)। তিনি বাসলীদেবীর সেবক ছিলেন।

www.pathagar.com

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক এই কাব্যটি রাগ ও তাল সহযোগে গাওয়া হত। এর প্রত্যেকটি পদই একটি গীত। এর পদের সংখ্যা ৪১৭। মাঝে মাঝে কয়েকটি পদ সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি। কবি জয়দেবের (দ্র) 'গীতগোবিন্দ'(দ্র) কাব্যের অনুকরণে এটি গীতনাট্য শ্রেণীর রচনা। পদগুলো কৃষ্ণ, রাধা ও রাধার দূতী বড়াই-এর উক্তি এবং প্রত্যুক্তি। এর মধ্যে আবার ৯টি খণ্ড আছে। সেগুলো হল—জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার, বৃন্দাবন, যমুনা, বাণ, বংশী ও রাধাবিরহ। বাংলা সাহিত্যে এটি উল্লেখযোগ্য রচনা বলে বিবেচিত। এর সঠিক রচনাকাল জানা যায় না। সুকুমার সেনের (দ্র) মতে এর আনুমানিক রচনাকাল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। ড. শহীদুল্লাহর (দ্র) মতে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

বি. ব.

শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথদেবের মন্দির দ্র

শ্রীচৈতন্য [১৪৮৬–১৫৩৩]

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। তাঁদের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলায়।

শ্রীচৈতন্যের ডাকনাম ছিল নিমাই। ভালো নাম বিশ্বম্ভর। তাঁর গায়ের রঙ ছিল ফর্সা। গৌরবর্ণ দেহের জন্য লোকে তাঁকে গৌরাঙ্গ বলে ডাকত। তিনি যখন গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য।

তিনি নবদ্বীপের গঙ্গাধর পণ্ডিতের টোলে (সংস্কৃত শিক্ষার বিদ্যালয়) লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র।

পনেরো বছর বয়সে তিনি বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করেন। তারপর তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ (দ্র) অঞ্চলে আসেন। প্রথম স্ত্রীর সর্পাঘাতে মৃত্যুর পর তিনি সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করেন। তবু সংসারে তাঁর মন বসে না। মানুষের দুঃখকষ্ট, ধর্মের নামে অনাচার এবং জাতিভেদ ও বর্ণভেদ থেকে তিনি মুক্তির পথ খুঁজতে থাকেন। এ সময়ে তিনি গয়া যান এবং কৃষ্ণভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর শিক্ষক

ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নেন। পরে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসের দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান।

হিন্দুধর্মের (দ্র) জটিল ও কঠিন নিয়মকে তিনি সহজ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা হল : ঈশ্বরকে ভালবাস এবং তাঁর নামকীর্তন কর; ভুলে যাও সব ভেদাভেদ। তাঁর কাছে ধর্ম হল প্রেম ও ভক্তির ধর্ম। তাঁর প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম'।

সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীচৈতন্য সংসার ছেড়ে জীবের কল্যাণের জন্য, উদ্ধারের জন্য বেরিয়ে পড়েন। উড়িষ্যার নীলাচলে থেকে তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। রাজা রামানন্দ রায়, রাজা প্রতাপরুদ্র, সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য, প্রবীণ অদ্বৈত আচার্য, রাজকর্মচারী রূপ ও সনাতন, হরিদাস প্রমুখ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রভাবে হিন্দুধর্ম পেয়েছিল এক অনাড়ম্বর ও ভক্তিভিত্তিক পথ ও সত্যের সন্ধান। তাঁর প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য লাভ করেছিল নতুন বিষয়, ভাব ও গতি।

তিনি ১৫৩৩ সালের ৬ই জুন মৃত্যুবরণ করেন।

নি. অ.

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা গীতা / শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা দ্র
শ্রীরামপুর মিশন কেরি, উইলিয়াম দ্র

শ্রীলঙ্কা (Sri Lanka)

ভারতের (দ্র) দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা দ্বীপ অবস্থিত। পূর্বে বলা হত সিংহল, ইংরেজিতে সিলোন (Ceylone) পক্ প্রণালী এবং

www.pathagar.com

মান্নার উপসাগর এটিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে রামেশ্বর দ্বীপ, মান্নার দ্বীপ এবং আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ রয়েছে। এগুলোকে সেতুবন্ধ বলে। শ্রীলঙ্কার আয়তন প্রায় ৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ। অধিকাংশ অধিবাসীই উপকূলের সমভূমিতে বাস করে। অধিবাসীদের শতকরা প্রায় ৮৬ জনই অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রায় ৭০ শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক সিংহলী ও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক তামিল ভাষাভাষী।

শ্রীলঙ্কা দ্বীপের উত্তর-অর্ধাংশ শুষ্কপ্রায়, নিম্নাঞ্চল সমভূমি। মধ্যভাগের উচ্চভূমি ও পর্বতমালা চতুর্দিকের সমভূমি দ্বারা বেষ্টিত। দ্বীপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ পেড্রোতালাগালা (২,৫৩০ মিটার) কেন্দ্রভাগে অবস্থিত। পার্বত্য এলাকা থেকে অনেক ছোট ছোট নদী উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা দ্বীপের জলবায়ু উষ্ণ হলেও সামুদ্রিক প্রভাব ও আর্দ্রতার জন্য কখনো চরম ভাবাপন্ন হয় না। উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু (দ্র) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০৩ সেমি।

শ্রীলঙ্কার এক-পঞ্চমাংশ ভূমিতে কৃষিকাজ হয় এবং এক-পঞ্চমাংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। বাকিটা পাহাড়ি এলাকা।

বনভূমিতে আবলুস, সেগুন, মেহগিনি, সিঙ্কোনা প্রভৃতি গাছ জন্মে। পর্বতঢালের নিম্নভাগে চা (দ্র), কফি (দ্র) ও রাবার (দ্র) উৎপন্ন হয়। সমুদ্রোপকূলে নারিকেল (দ্র) এবং নদী-উপত্যকায় ধান (দ্র), তামাক (দ্র), সুপারি (দ্র), লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল ও এলাচি জন্মায়। শিল্পক্ষেত্রে এই দেশ তত উন্নত নয়। অধিবাসীদের অনেকেই নারিকেল তেল, ছোবড়া ও বাঁশের ব্যবসায় নিয়োজিত। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে

বিশ্বের একমাত্র হস্তী অনাথ আশ্রম—শ্রীলঙ্কার 'পিন্নায়েলা' নামক স্থানে অবস্থিত

www.pathagar.com

শ্রীলঙ্কার
ঐতিহ্যবাহী নাচের
দু'জন শিল্পী

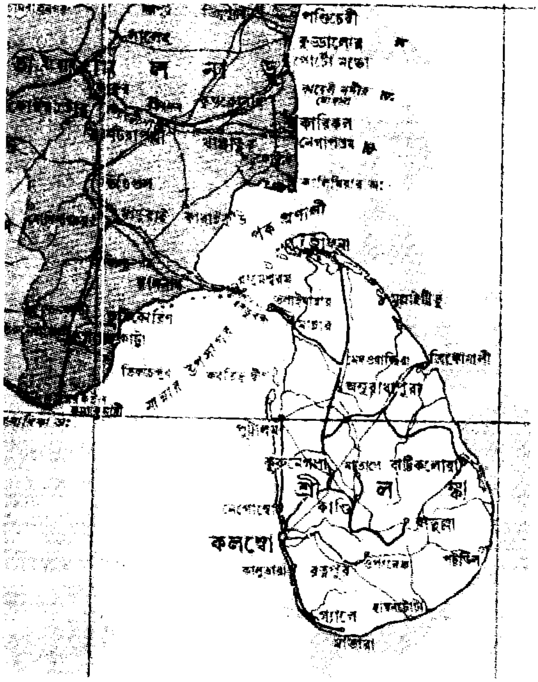

শ্রীলঙ্কার মানচিত্র

গ্রাফাইট (দ্র), চুনাপাথর (দ্র) ও লোহা উল্লেখযোগ্য। এখানে নানাবিধ মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়।

১৫০৫ সালে সর্বপ্রথম ইউরোপ (দ্র) থেকে পর্তুগিজেরা শ্রীলঙ্কায় বসতি স্থাপন করে। পরে ওলন্দাজ এবং সবশেষে ইংরেজেরা এখানে আসে। ১৮০২ সালে শ্রীলঙ্কা মদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক হয়ে কমনওয়েলথ (দ্র)-ভুক্ত একটি দেশে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালে শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা লাভ করে।

কলম্বো শ্রীলঙ্কার রাজধানী, প্রধান নগর ও বন্দর। মধ্যভাগের উচ্চভূমিতে অবস্থিত ক্যাণ্ডি দেশের প্রাচীন রাজধানী। অনুরাধাপুর বৌদ্ধদের প্রাচীন তীর্থস্থান। উত্তর উপকূলের জাফ্না, দক্ষিণ উপকূলের গ্যালে ও পূর্ব উপকূলের ত্রিঙ্কোমালি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শহর ও বন্দর।

মু. এ.

শ্লেগেল্, কার্ল্ ভিল্‌হেল্‌ম্ [১৭৭২—১৮২৯]

জার্মান কবি-দার্শনিক-চিন্তাবিদ কার্ল্ ভিল্‌হেল্‌ম্ ফ্রিড্‌রিশ্ ফন্ শ্লেগেল্ (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel) ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হানোভারে জন্মেছিলেন। জার্মানিতে রোম্যান্টিক আন্দোলনের জন্মদাতা হিসাবে শ্লেগেল্‌কে বিবেচনা করা হয়। ১৮০২ সালে তিনি প্যারিস যান সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য এবং দেশে ফিরে গিয়ে সংস্কৃত ভাষাকে পরিচিত করানোর কাজে ব্রতী হন।

শ্লেগেল্ রোম্যান্টিক উপন্যাস (দ্র), নাটক (দ্র) ও কবিতা (দ্র) লিখেছেন। কিন্তু বিশ্বে তাঁর খ্যাতির প্রধান কারণ দার্শনিক ও ভাবুক হিসাবে। ১৮২৯ সালে ড্রেস্‌ডেনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হা. মা.

শ্লোক

পদ্য, কবিতা, ছন্দোবদ্ধ কাব্য ইত্যাদিকে বলা হয় শ্লোক। বাল্মীকি (দ্র)-রচিত 'রামায়ণ' (দ্র) থেকে জানা যায় যে একদিন তিনি তাঁর শিষ্য ভরদ্বাজকে সঙ্গে নিয়ে তমসা নদীর তীরে ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন যে গাছের ডালে এক জোড়া আনন্দমগ্ন ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর প্রতি এক ব্যাধ শর নিক্ষেপ করল এবং সেই শরের আঘাতে ক্রৌঞ্চটি নিহত হল। ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে ক্রৌঞ্চী শোকে

www.pathagar.com

কাতর হয়ে করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগল। ক্রৌঞ্চীর বিলাপে বাল্মীকি এতই দুঃখ পেলেন যে তিনি ব্যাধকে এই গুরুতর অন্যায়ের জন্য অভিশাপ দিলেন এবং তা কবিতার আকারে উচ্চারিত হল :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।

(অর্থাৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের আনন্দের মুহূর্তে ব্যাধ যেহেতু ক্রৌঞ্চকে বধ করেছে, সেই জন্য সে কোনোদিন প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে না)। কিন্তু অভিশাপ দেওয়ার পর বাল্মীকির চিন্তা হল, পাখির শোকে কাতর হয়ে ব্যাধকে এরূপ অভিশাপ দেওয়া ঠিক হয় নি। পরে অবশ্য শিষ্যকে বললেন যে চার চরণযুক্ত এবং প্রতি চরণে সমান অক্ষরবিশিষ্ট বাক্য যেহেতু শোকের সময়ে তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছে, তাই এই বাক্যের নাম 'শ্লোক' হোক। তখন থেকে ছন্দোবদ্ধ বাক্যমাত্রকেই শ্লোক বলা হয়। শোক থেকে জন্ম বলে পদ্যের নাম 'শ্লোক' হয়েছে।

শা. হ.

ষ

ষাটগম্বুজ মসজিদ

ষাটগম্বুজ মসজিদ সুলতানি আমলে নির্মিত। বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও শাসক খান জাহান আলী (দ্র) কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদের নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতক বলে ধারণা করা হয়। কারণ ঐ শতকেই খান জাহান আলী যশোর-খুলনায় ইসলাম প্রচার ও নানা জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

খানজাহান আলী প্রতিষ্ঠিত বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ

www.pathagar.com

নামে 'ষাটগম্বুজ' হলেও এই মসজিদের গম্বুজসংখ্যা ৭৭টি। এটি বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত এক বিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তি।

মসজিদের বাইরের আয়তন ১৬০´ x ১০৪ এবং ভেতরের আয়তন ১৪৩ x ৮৮। চার কোণায় দ্বিতল গোলাকার মিনার। মূল অবকাঠামো ইটের তৈরি, এর দেয়ালগুলো খুবই পুরু ও মজবুত। ৭৭টি গম্বুজের মধ্যে ৭টি এ দেশীয় রীতিতে তৈরি চৌচালা গম্বুজ। পূর্ব দিকে ১১টি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ এবং উত্তর-দক্ষিণে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য ৭টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। পশ্চিম দেয়ালের প্রধান মিহ্‌রাবে (দ্র) পাথরের ওপর নকশা-করা হলেও অন্যান্য মিহ্‌রাবে রয়েছে টেরাকোটা (দ্র) বা পোড়ামাটির ফলকচিত্র।

ষাটগম্বুজ মসজিদ পরিচ্ছন্ন গঠনশৈলী ও আয়তনের কারণে এখনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

মু. মা.

ষোলকলা

পৃথিবী (দ্র) থেকে বিভিন্ন সময়ে চাঁদের আলোকিত অংশের বিভিন্ন অংশ দেখা যায়। চাঁদের এই পরিবর্তনের নাম কলা। শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় পায়।

চাঁদের কলাকে ষোল ভাগে ভাগ করে হয়েছে ষোলকলা। পুরাণ-গ্রন্থ মতে চন্দ্রে সুধা বা অমৃত আছে এবং তা এক এক ভাগ বা কলা বৃদ্ধি পেতে পেতে ষোলকলায় পূর্ণ হলে পূর্ণিমা হয় এবং এক এক কলায় হ্রাস পেতে পেতে অমাবস্যায় কলাহীন হয়। এ জন্য চাঁদের নাম কলাধর, কলানাথ, কলানিধি। চাঁদের ষোলকলার নাম অমৃতা, মানদা, পুষা, পুষ্টি, তুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা। কৃষ্ণপক্ষে ১৬ জন দেবতা এক এক দিনে এক এক কলা (বা অমৃত) পান করেন। আবার শুক্লপক্ষে প্রতিদিন ১ কলা করে বেড়ে পূর্ণিমায় ১৬ কলা পূর্ণ হয়। 'অমৃতা' পানকারী অগ্নি থেকে পরে দেবতাদের নাম হয় —সূর্য, বিশ্বদেব, বরুণ, বষট্‌কার, ইন্দ্র, দেবর্ষি, অজ একপাদ, যম, বায়ু, উমা, পিতৃগণ, কুবের, পশুপতি, প্রজাপতি। ষোলকলা অমাবস্যার দিন জল এবং ওষধিতে প্রবেশ করে। এই জল ও ওষধি পান করে গবাদির দুধ হয়। দুধ থেকে ঘৃত হয়। ঘৃত আহুতি দ্বারা তা আবার চাঁদে প্রবেশ করে।

বি. ব.

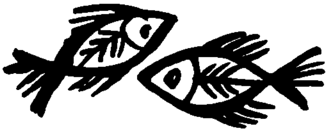

স

সংক্রমণ (infection)

দেহের কোষকলায় (দ্র) অণুজীবের অনুপ্রবেশ ও বংশবৃদ্ধির নাম সংক্রমণ। সংক্রমণের ফলে দেহকলায় পরিবর্তন এবং রোগের উৎপত্তি। সংক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ জীবাণু (দ্র), পরজীবী (দ্র), ভাইরাস (দ্র), ছত্রাক (দ্র) ইত্যাদি।

সংক্রমণ নানা রকমের হতে পারে, যেমন— একিউট (acute) বা তাৎক্ষণিক এবং ক্রনিক (chronic) বা দীর্ঘস্থায়ী। মানবদেহে সংক্রমণের উৎস একাধিক। যেমন— কীটপতঙ্গ (দ্র), মশা (দ্র), মাছি (দ্র), পানি (দ্র), খাদ্য, মাটি (দ্র) এবং প্রাণী (দ্র)— যেমন কুকুর (দ্র), বিড়াল (দ্র), শূকর, ইঁদুর (দ্র) ইত্যাদি, এমনকি মানুষ নিজেও। রোগাক্রান্ত বা রোগজীবাণুবাহক মানুষ থেকেও অন্য মানুষে রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

সাধারণত প্রত্যক্ষ স্পর্শ, শ্বাসগ্রহণ, পানি পান, ইনজেকশান ও কীটপতঙ্গের দংশনের মাধ্যমে রোগের সংক্রমণ ঘটে থাকে। তা ছাড়া জন্মগতভাবেও সংক্রমণ সম্ভব। অণুজীবের মাত্রার উপর সংক্রমণ ও তার তীব্রতা নির্ভর করে।

সংক্রমণ দ্বারা সৃষ্ট রোগের নাম সংক্রামক রোগ (দ্র)। যেমন— যক্ষ্মা (দ্র), ডিফথেরিয়া (দ্র), ম্যালেরিয়া (দ্র), টিটেনাস (দ্র), হাম (দ্র), বসন্ত (দ্র), কলেরা (দ্র), হুপিংকাশি, টাইফয়েড জ্বর (দ্র), ইনফ্লুয়েঞ্জা (দ্র), ফাইলেরিয়া (দ্র), কৃমিরোগ (দ্র) ইত্যাদি।

সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় রাসায়নিক বা এন্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয়। আবার

www.pathagar.com

সংক্রামক রোগের কোনো কোনোটির বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকার (দ্র) ব্যবস্থাও রয়েছে— যেমন ডিফথেরিয়া, টিটেনাস, পোলিও (দ্র), বসন্ত, হুপিংকাশি।

রু. হা.

সংক্রামক রোগ (infectious disease)

জীবাণু (দ্র), ভাইরাস (দ্র), ছত্রাক (দ্র) ও অন্যান্য পরজীবীর আক্রমণ এবং বংশবিস্তারের ফলে সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। শিশুদের শরীরে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল বিধায় তাদের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। ডিফথেরিয়া (দ্র), হাম (দ্র), জলবসন্ত (দ্র), হুপিংকাশি, মাম্প্‌স্‌ (দ্র), পোলিও (দ্র), মেনিঞ্জাইটিস (দ্র) ইত্যাদি সংক্রামক রোগে শিশুরাই আক্রান্ত হয়ে থাকে।

অধিকাংশ সংক্রামক রোগ এক দেহ থেকে অন্য দেহে সরাসরি বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। আবার নিজ দেহ থেকেও রোগের সংক্রমণ (autoinfection) ঘটতে পারে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে শরীরে সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটে। যেমন—কলেরা (দ্র), ডায়রিয়া (দ্র), আমাশয় (দ্র), টাইফয়েড (দ্র) ইত্যাদি রোগের জীবাণু পানিবাহিত হয়ে বা খাবারের মাধ্যমে সুস্থ মানুষের শরীরে সংক্রমণ ঘটায়। সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা (দ্র), যক্ষ্মা (দ্র) ইত্যাদি জীবাণু, থুথু বা হাঁচির মাধ্যমে বায়ুবাহিত হয়ে সুস্থ শরীরে রোগ সৃষ্টি করে।

কোনো কোনো সংক্রামক রোগ জীব-জন্তুর কামড় বা এদের সংস্পর্শের ফলে সংক্রমিত হয়। যেমন জলাতঙ্ক (দ্র) রোগ। ধনুষ্টঙ্কার (দ্র), গ্যাস গ্যাংরিন (gas gangrene) ইত্যাদি রোগের জীবাণু মাটির সংস্পর্শে ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। কীটপতঙ্গের দংশনের মাধ্যমেও শরীরের সংক্রামক রোগ বিস্তার লাভ করে, যেমন এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রী-মশার দংশনে ম্যালেরিয়া (দ্র) রোগের সংক্রমণ। রোগাক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের শরীর থেকে গর্ভজাত সন্তানের শরীরেও রোগ সংক্রমিত হতে পারে। সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এবং তার ব্যবহৃত কাপড়চোপড় ব্যবহারের ফলে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যথাসময়ে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা না নিলে সংক্রামক রোগ আরো বেশি সংক্রমিত হয়ে মহামারীর (দ্র) রূপ ধারণ করতে পারে।

সি. না. হ.

সংবাদ প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দ্র

সংবাদপত্র (newspaper)

চলতি ঘটনাবলির বিবরণ নিয়ে ছবি ও অলঙ্করণসহ নিয়মিতভাবে প্রতিদিন বা সপ্তাহে এক দিন প্রকাশিত এক ধরনের প্রকাশনা। তবে পৃথিবীর যাবতীয় চলতি ঘটনা সংবাদের মর্যাদা পায় না। যে ঘটনা কেবল অভিনব বা চমকপ্রদ তা-ই সংবাদ হতে পারে। সংবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ নিউজ (news) থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যা new বা নতুন তা-ই সংবাদ। আবার কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, news শব্দটি আসলে North, East, West এবং South এই চারদিকের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত। এতে বোঝা যায়, চারদিক অর্থাৎ সবকিছু সংবাদের আওতাভুক্ত। দেশ-বিদেশ, রাজনীতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, খেলাধুলা ইত্যাদির যাবতীয় খবর সংবাদপত্রে থাকে। তাই সংবাদপত্রকে চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি বলা হয়।

আগেকার দিনে জরুরি কোনো বিষয় জনগণকে অবগত করানোর প্রয়োজন হলে রাজা-বাদশাহরা ফরমান জারি করতেন এবং লোক দিয়ে তা প্রচার করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রের জরুরি সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যও দূত নিয়োগ করা হত। সংবাদ আদান-প্রদানের এসব প্রয়োজন থেকে প্রাচীন কালে সংবাদপত্রের উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

জুলিয়াস সিজারের (দ্র) রোমে খ্রিস্টপূর্ব ৫৯ অব্দে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তবে তা ছিল হাতে লেখা সংবাদপত্র। এর নাম ছিল 'আক্টা ভিরুনা' অর্থাৎ 'প্রতিদিনের ঘটনা'। কিন্তু এই সংবাদপত্র প্রতিদিন বের হত না, মাঝে মাঝে বের হত।

৭০০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম চীনে (দ্র) ছাপানো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এর নাম 'তাইপাও'। তখন সীসা (দ্র)-এর টাইপ ছিল না, কাঠ কেটে টাইপ বানিয়ে সংবাদপত্র ছাপানো হত।

১৬০৯ সালে জার্মানিতে প্রথম নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র

www.pathagar.com

প্রকাশ শুরু হয়। প্রথম যুগে বইয়ের আকারে সংবাদপত্র বের হত। ক্রমে তা পরিবর্তিত হয়ে এখনকার সংবাদপত্রের অর্ধেক আকার লাভ করে। এই আকারের নাম 'ট্যাবোলয়েড্'। ট্যাবোলয়েড্ আকারে অনেক দিন সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর বর্তমান আকারে বের হতে থাকে। এটাই এখন বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্রের স্বীকৃত আকার।

প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৬২২ সালে। এর নাম ছিল 'উইক্‌লি নিউজ'। তখন উন্নত যন্ত্রপাতি বিশেষ ছিল না বলে অধিক সংখ্যায় সংবাদপত্র ছাপা যেত না। ১৮১৪ সালে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম স্টিমচালিত প্রেস সংবাদপত্র ছাপার ক্ষেত্রে গতি নিয়ে আসে। এই প্রেস থেকে 'দ্য টাইম্‌স্' সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হত।

১৮৪০ সালে ছবি তোলার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হলে ছবি থেকে ব্লক তৈরি করে ক্রমে সংবাদপত্রে ছবি সংযোজনের পথ সুগম হয়। ১৮৪৪ সালে টেলিগ্রাফ (দ্র) আবিষ্কৃত হলে দূর থেকে খবর সংগ্রহ করার কাজও সহজ হয়। এভাবে নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সংবাদপত্র মুদ্রণের ক্ষেত্রে নানান বৈচিত্র্য আসে। এতে ছাপার কাজে যেমন দ্রুততা আসে, তেমনি রঙ ব্যবহারেও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এখন রঙিন সংবাদপত্রও প্রকাশিত হচ্ছে।

ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের নাম 'বেঙ্গল গেজেট'। ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি এটি প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন জেম্‌স্ অগাস্টাস হিকি। সাধারণ মানুষের কাছে এটি 'হিকির গেজেট' নামে পরিচিত ছিল।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র হল 'সমাচার দর্পণ'। এটি ১৮১৮ সালের ২৩শে মে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। এটি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে প্রতি শনিবার ভোর বেলা এটি বের হত। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু' আনা আর মাসিক চাঁদা ছিল দেড় টাকা।

দেশবিভাগের পর ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এর নাম ছিল 'দৈনিক জিন্দেগী'। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে এই দলের মুখপত্র হিসাবে মওলানা ভাসানীর (দ্র) সম্পাদনায় 'ইত্তেফাক' প্রকাশিত হয়। তখন এটি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯৫৩ সালে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার (দ্র) সম্পাদনায় এটি দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে 'ইত্তেফাক', 'ইনকিলাব', 'সংবাদ', 'জনকণ্ঠ', 'বাংলার বাণী', 'আজকের কাগজ', 'ভোরের কাগজ', 'বাংলাবাজার পত্রিকা', 'মুক্তকণ্ঠ', 'Daily Star', 'Bangladesh Observer' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে 'দৈনিক আজাদী' ও 'দৈনিক পূর্বকোণ'-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

এখন বিশেষ কয়েকটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর সব দেশ থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। অবশ্য সংবাদপত্রের আয়তন, বিষয়বস্তু, রূপ, প্রচারসংখ্যা, প্রচারপদ্ধতি ও মালিকানা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। সংবাদপত্রের বিলিব্যবস্থাও একেক দেশে একেক রকম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) স্কুলের ছেলেরা সংবাদপত্র ফেরি করে। ভারতে (দ্র) ও আমাদের দেশে ফেরি করে হকারেরা। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে নিউজ স্ট্যাণ্ডে গিয়ে সংবাদপত্র কিনতে হয়।

পৃথিবীর মধ্যে জাপান (দ্র) এবং সুইডেনের লোকেরা সবচেয়ে বেশি সংবাদপত্র পড়েন। জাপানের দৈনিক 'আশাহি সিম্‌বুন' পত্রিকার প্রচারসংখ্যা আশি লক্ষ।

আধুনিক সংবাদপত্র এক বিরাট শিল্পকারখানা। এখন সংবাদপত্র নানা বিভাগের সমন্বয় ও সহযোগিতার ফসল। এর মোটামুটি বিভাগগুলো হল—সম্পাদকীয়, প্রচার, বিজ্ঞাপন, প্রশাসন, রেফারেন্স, ছাপাখানা ইত্যাদি। প্রতিটি বিভাগই সংবাদপত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে যেহেতু সংবাদপত্রের মূল কাজ সংবাদপরিবেশন, সেহেতু সম্পাদকীয় বিভাগটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

সুজ. ব.

সংবাদসংস্থা (news agency)

এ এফ পি : বিশ্বের অন্যতম পুরনো সংবাদ সংস্থা এটি। ১৮৩৫ সালে প্যারিসে 'অজঁস্ আভা' (Agence Avas) নামে প্রথম বড় ধরনের যে সংবাদসংস্থার জন্ম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর তারই পরিবর্তিত রূপ অজঁস্ ফ্রাঁস্-প্রেস্ (Agence France-Presse) অর্থাৎ এ এফ পি। প্রথমে এটি সরকারের মালিকানাধীন ছিল। ১৯৫৭ সাল থেকে এটি সংবাদপত্রের (দ্র) সেবায় নিয়োজিত। এ এফ পি বার্তাসংস্থা বর্তমানে ১৬৪টি দেশে সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। এর

www.pathagar.com

প্রধান কার্যালয় প্যারিসে (দ্র) অবস্থিত।

রয়টার (Reuters) : ১৮১৫ সালে লণ্ডনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এটি ছিল সব থেকে প্রাধান্য বিস্তারকারী সংবাদসংস্থা। রয়টার বর্তমানে বিশ্বের ২০০টি দেশে তার সংগৃহীত সংবাদ সরবরাহ বা বিক্রি করে থাকে।

এপি : 'নিউ ইয়র্ক অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' থেকেই এ পি অর্থাৎ 'অ্যাসোসিয়েট প্রেস'-এর জন্ম ১৮৪৮ সালে। ১৯০০ সালে এর প্রশাসনিক কাঠামোকে ঢেলে নতুন করে সাজানো হয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাগুলোর মধ্যে এটিই বৃহত্তম। ১০০-রও বেশি দেশ থেকে এ পি সংবাদ সংগ্রহ এবং বিশ্বের ৬,৫০০-রও বেশি সংবাদপত্র, বেতার (দ্র) ও টেলিভিশন (দ্র) কেন্দ্রে তার সংগৃহীত খবরাদি প্রেরণ করে থাকে। এ পি-র ১৮৩ টি ব্যুরোতে ২,৫৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিযুক্ত (১৯৭৯ সালের হিসাবে)। এর প্রধান দপ্তর অবস্থিত নিউইয়র্কে (দ্র)।

ইউ পি আই : ইউনাইটেড প্রেস (১৯০৭) এবং ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস (১৯০৯) বিলুপ্ত করে ১৯৫৮ সালে ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল নামে এই সংবাদসংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রায় ১০০টি দেশে ইউ পি আই অর্থাৎ 'ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল' সংবাদ প্রেরণ করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ১,১৫০টি সংবাদপত্র এবং প্রায় ৩,৮৫০টি বেতার ও টেলিভিশনকেন্দ্রসহ বিশ্বের ৫৮৮০টি সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনকেন্দ্র এর সরবরাহ করা সংবাদের গ্রাহক। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ইউ পি আই-এর ১৬৪টি ব্যুরোতে কর্মরত ছিল ১,৭২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) একটি বেসরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে সংবাদ ও সংবাদসংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র প্রেরণে এ পি এবং ইউ পি আই উভয় সংবাদসংস্থারই ৪ লক্ষ মাইলেরও বেশি টেলিফোন-সংযোগলাইন রয়েছে। উভয়েই ব্যবহার করে থাকে উপগ্রহ, বেতার-টেলিপ্রিন্টার এবং বিশ্বব্যাপী খবর প্রেরণে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কেব্‌ল্। এসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সংবাদসংস্থা দু'টি বিশ্বের যে কোনো স্থানে যে কোনো সংবাদ বুলেটিন এক মিনিটের কম সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে সক্ষম।

এসব ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছোট-বড় আরো কয়েকটি সংবাদসংস্থা সক্রিয়। ১৯২৫ সাল থেকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে (দ্র) চালু করা হয় তাস (তেলিগ্রাফ্‌নয়ি আগেন্তস্‌ভা সোভিয়েৎস্‌কভা সইয়ুজা) নামের একটি সরকারনিয়ন্ত্রিত এ জাতীয় সংস্থা। এর পরিবেশিত সংবাদের ১০ হাজারেরও বেশি গ্রাহক, ব্যাপক জাতীয় নিউজ নেটওয়ার্ক এবং ১০০টিরও বেশি দেশে এর ব্যুরো ও সংবাদদাতা রয়েছে বলে দাবি করা হয়। বর্তমানে এই সংবাদসংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'ইতার-তাস'।

কয়েকটি জাতীয় সংবাদসংস্থারও মোটামুটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে : জাপানের 'কিওদো ৎসুশিন্ শা', জার্মানির 'ডয়েচে প্রেস্‌সে-আগেন্‌টুর' (Deutsche Presse-Agentur), কানাডার 'কানাডিয়ান প্রেস', চীনের 'হ্‌সিন্ হুয়া' এবং ভারতের 'প্রেস ট্রাস্ট্ অব ইণ্ডিয়া' (সংক্ষেপে পি টি আই) ইত্যাদি।

আ. হু.

সংসদ পার্লামেন্ট দ্র

সক্রেটিস [আনু. ৪৬৯—৩৯৯ খ্রি.পূ.]

ভাববাদী দার্শনিক। জন্ম ৪৬৯ বা ৪৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান গোষ্ঠী অ্যালোপেকি গোষ্ঠীতে। শোনা যায় সক্রেটিসের (Socrates) পিতা সাফ্রোনিস্‌কসের এবং যৌবনকালে সক্রেটিসের নিজেরও জীবিকা ছিল ভাস্কর্য তৈরি। মা ফেনারিটি ছিলেন ধাত্রী। উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কাছ থেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ পাওয়া সক্রেটিস সেনাবাহিনীতে কাজ পেয়েছিলেন। কারণ সম্পদশালী না হলে সেকালে এথেন্সে সেনাবাহিনীর কাজ পাওয়া যেত না। পেলোপনিশীয় যুদ্ধে কয়েক বার অতুলনীয় বীরত্বও দেখিয়েছিলেন তিনি। সক্রেটিসের চেহারা ছিল কিম্ভূত। বেঁটে ও মোটা ছিলেন, নাক ছিল ছড়ানো ও চ্যাপ্টা, চোখ দুটো ছিল কোটরের বাইরে। তাঁর স্ত্রী জান্‌থিপি খুব বদমেজাজি ছিলেন বলে শোনা যায়। কারো কারো মতে তা সত্য নয়। সক্রেটিসের তিন ছেলে।

www.pathagar.com

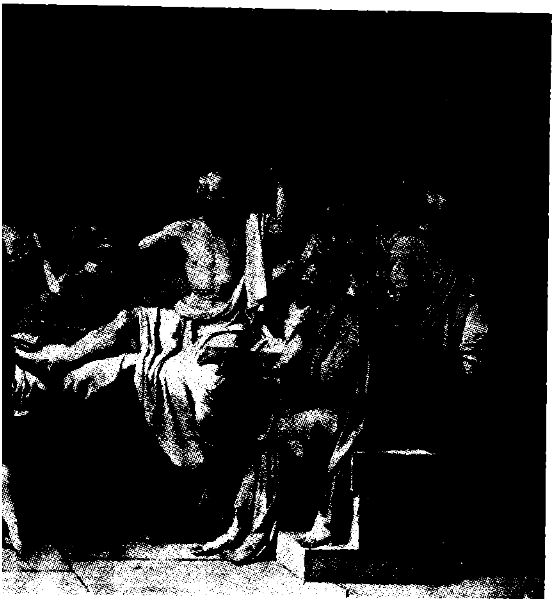

বিচারের রায় মেনে নিয়ে সক্রেটিস নিজের হাতে বিষপান করেন

জীবন রক্ষার জন্য জরুরি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ তিনি চাইতেন না। তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল খুবই সাদাসিধা। তাঁর ছিল বিস্ময়কর রকম কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা। খুব সাদামাটা পোশাক পরতেন। এমনকি জুতো পর্যন্ত পায়ে দিতেন না। বলতেন, পোশাক হল বাইরের আবরণ, মানুষের আসল সৌন্দর্য হচ্ছে তার জ্ঞান। সে জন্য জ্ঞানের সন্ধান করতেন তিনি। সে যুগের অভিজাত তরুণেরা ব্যাপকভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রচলিত ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির অসঙ্গতি সম্পর্কে তার যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা শাসকদের ক্ষেপিয়ে তোলে। দেশের তরুণদের বিপথগামী করা হচ্ছে এই অজুহাতে তারা সক্রেটিসের বিচারের আয়োজন করে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তবে বলা হয় যে শাসকদের কাছে ক্ষমা চাইলে এবং প্রচলিত ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে কথা না বলার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি মুক্তি পাবেন।

সক্রেটিসের শিষ্যেরা প্রহরীদের ঘুষ দিয়ে সহজেই তাঁর পালাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। কিন্তু সক্রেটিস পালান নি, ক্ষমাও চান নি। বিচারকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, তাঁর বিচার করার অধিকার তাঁদের নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ম তিনি অমান্য করবেন না বলে বিচারকদের দেওয়া দণ্ডাদেশ অনুযায়ী হেম্‌লক বিষ পানে মৃত্যুবরণ করেন।

সক্রেটিস ছিলেন জ্ঞানপ্রেমিক। তাঁর মতে জ্ঞান হচ্ছে জিজ্ঞাসা। তিনি বলেছেন, সবাই মনে করে তারা সবকিছু জানে এবং কোনো সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অনায়াসে তার সমাধানও করে ফেলে। কিন্তু আসলে তাদের দেওয়া সমাধানে অনেক ভুল, অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। ঐ ধরনের জ্ঞানীদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য সম্পর্কে সক্রেটিস বলেছেন— তারা জানে না যে তারা জানে না; আর আমি জানি যে আমি কিছু জানি না। তিনি বলতেন, নিজেকে জান। জ্ঞানের শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে উত্তর জেনে তাকে দেখানো যে জ্ঞান তার মধ্যেই ছিল। প্রশ্ন করে করে কোনো সমস্যার সমাধান বের করার পদ্ধতিটিকে সক্রেটিসীয় পদ্ধতি বলা হয়।

আ. মা.

সখা প্রমদাচরণ সেন ও ভীমের কপাল দ্র

সঙ্কর ধাতু

দুই বা তার বেশি ধাতু (দ্র) বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে একত্র গলিয়ে যে মিশ্রধাতু পাওয়া যায় তারই নাম সঙ্কর ধাতু। খাঁটি সোনা (দ্র), রূপা (দ্র), তামা (দ্র) প্রভৃতি ধাতু এত নরম যে তা দিয়ে তৈরি শিল্পদ্রব্য মোটেই মজবুত হয় না। কিন্তু রূপার সঙ্গে তামা, সোনার সঙ্গে রূপা অথবা তামা মেশালে সেই মিশ্রধাতু অপেক্ষাকৃত কঠিন ও মজবুত হয়। সঙ্কর ধাতুর প্রয়োজন এটাই। সঙ্কর ধাতুকে ইংরেজিতে বলা হয় 'অ্যালয়' (alloy)। আর সঙ্কর ধাতুর একটি উপাদান পারদ হলে তাকে বলা হয় 'অ্যামাল্‌গাম' (amalgum) বা পারদ সঙ্কর।

কাঁসা বা 'বেল মেটাল' (bell-metal) একটি অতি পরিচিত সঙ্কর ধাতু। শতকরা ৮০ ভাগ তামা ও ২০ ভাগ টিনের মিশ্রণে তৈরি হয় কাঁসা নামক সঙ্কর ধাতু। থালা, গেলাস, বাটি, মুদ্রা, মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করতে কাঁসা ব্যবহৃত হয়। শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ তামা ও ৪০ ভাগ থেকে ২০ ভাগ দস্তার (দ্র) মিশ্রণে তৈরি হয় 'পিতল' নামক সঙ্কর ধাতু। বাসনপত্র, নল, পাত্র, টেলিস্কোপ (দ্র), ব্যারোমিটার (দ্র) প্রভৃতি প্রস্তুতিতে পিতল ব্যবহৃত হয়। শতকরা ৭৫ থেকে ৯০ ভাগ তামা এবং ২৫ থেকে ১০ ভাগ টিনের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ (দ্র) নামক সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত হয়। মুদ্রা, মূর্তি, থালা ও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতিতে ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত

www.pathagar.com

হয়। আবার অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে শতকরা ৩-৪ ভাগ তামা, $\frac{১}{২}$-১ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম এবং $\frac{১}{২}$ - ১$\frac{১}{২}$ ভাগ ম্যাঙ্গানিজের সংশ্রিণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য সিলিকনসহ যে সঙ্কর ধাতুটি তৈরি হয় তার নাম 'ডিউরালুমিন'। বিমান, মোটর গাড়ির বিভিন্ন অংশ এবং নানা প্রকার যানবাহন তৈরিতে এই সঙ্কর ধাতুটি ব্যবহৃত হয়। জার্মান সিলভার হল তামা, দস্তা ও নিকেলের একটি সঙ্কর ধাতু। এতে প্রধানত ৫ ভাগ তামা, ২ ভাগ দস্তা ও ২ ভাগ নিকেল থাকে। সাদা রঙের এই সঙ্কর ধাতুটি দিয়ে শৌখিন বাসনপত্র তৈরি হয়। টাইপ মেটাল এক প্রকার সঙ্কর ধাতু। এতে ৬০% সীসা (দ্র), ৩০% অ্যান্টিমনি (দ্র) এবং ১০% টিন থাকে। এই সঙ্কর ধাতুটি দিয়ে ছাপার অক্ষর বা 'টাইপ' তৈরি হয় । তাই এর নাম 'টাইপ মেটাল'। এতে অ্যান্টিমনি থাকায় তরলীকৃত সঙ্কর ধাতুটি ঢালাই করে জমালে তা আয়তনে সঙ্কুচিত না হয়ে বরং একটু বেড়েই যায়; ফলে অক্ষরগুলো নিখুঁত ও পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

আ. হ. খ.

সঙ্কলন

যে গ্রন্থে সাধারণত বিভিন্ন লেখকের রচনা, গদ্য এবং / অথবা পদ্য একত্রে সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হয় তাকে সঙ্কলন বলা হয়। নানা পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করে সঙ্কলনগ্রন্থ প্রস্তুত করা সম্ভব। ১৯৭১ সালের শেষ দিকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, মুক্তিযুদ্ধের নাটক প্রভৃতি নামে আমরা বহু সঙ্কলনগ্রন্থ পেয়েছি। একক লেখকের নির্বাচিত রচনার সংগ্রহ নিয়েও অনেক উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'সঞ্চয়িতা' ও কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) 'সঞ্চিতা'র কথা সর্বজনবিদিত।

সঙ্কলনের ইংরেজি প্রতিশব্দ anthology— অ্যান্থোলজি। শব্দটি গ্রিক, এর আক্ষরিক অর্থ ফুলের সংগ্রহ। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও বিখ্যাত সঙ্কলনের নাম 'অ্যান্থোলজি'। ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত চার হাজার পাঁচ শ' স্বল্পদৈর্ঘ্য গ্রিক কবিতা সেখানে সঙ্কলিত হয়।

ইংরেজি সাহিত্যে, কবিতার ভুবনে, পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি 'Palgrave's Golden Treasury' —একটি সর্বজনপরিচিত কাব্যসঙ্কলন গ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে।

ক. চৌ.

সঙ্গীত

সম্যকভাবে গাওয়া হয়েছে, এই হচ্ছে 'সঙ্গীত' কথাটির মূল অর্থ। তাই সঙ্গীত বলতে মূলত বোঝায় গান, বা সুন্দর করে গাওয়া গান। তবে প্রাচীন কালে সঙ্গীত বলতে গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে বোঝাত। বর্তমান কালে সঙ্গীত বলতে গান বা কণ্ঠসঙ্গীতকেই বোঝায়। বাদ্য বা বাজনাকে বলা হয় যন্ত্রসঙ্গীত। নৃত্য বা নাচকে উল্লেখ করা হয় পৃথকভাবে। মাধ্যমের বিবেচনায় সঙ্গীত দুই প্রকার—কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত। নিয়ম ও গঠনের বিবেচনায় সঙ্গীত দুই প্রকার : শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত।

ক. গো.

সঞ্চারী

গানের বা গতের অংশ বিশেষের নাম। ধ্রুপদীয় ধারার গানে বা গতে চারটি অংশ—তুক্ বা ধাতু থাকে। সঞ্চারী তৃতীয় তুক্। অন্য তুক্গুলো হচ্ছে : স্থায়ী, অন্তরা, আভোগ। অন্তরা ও আভোগের মধ্যবর্তী স্থানে সঞ্চারীর অবস্থান।

ক. গো.

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য [১৯০৯—১৯৬৯]

কবি-ঔপন্যাসিক-সম্পাদক-সংগঠক সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরার (এখন বলা হয় কুমিল্লা) শ্যামগ্রামে ১৯০৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পরিতাপের বিষয় যে তাঁর মেধা, মননশক্তি, সাহিত্যপ্রেম, সৃজনীপ্রতিভা ইত্যাদির কারণে যে বিপুল খ্যাতি তাঁর প্রাপ্য ছিল, পাঠকসমাজের নিকট থেকে তিনি তা পান নি। তবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রপরবর্তী আধুনিক কথাশিল্পী ও মেধাবী সমালোচক হিসাবে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে শীর্ষদেশে।

www.pathagar.com

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন : আই. এসসি. পরীক্ষায় (১৯২৮) তিনি ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৩০ সালে বি.এ. এবং এর বহু বৎসর পরে প্রাইভেটে এম.এ. পরীক্ষা পাশ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি পত্রিকা সম্পাদনা ও সাহিত্যসাধনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বিখ্যাত সুরকার অজয় ভট্টাচার্য (দ্র)।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'পূর্বাশা' মাসিক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ। অত্যন্ত দৈন্যদশার ভিতরেও তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের রচনা তিনি বৎসরের পর বৎসর এই পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সম্ভবত 'সৃষ্টি'। এতদ্ব্যতীত 'বৃত্ত', 'মরামাটি', 'অপরা' ইত্যাদি প্রচুর কথাসাহিত্যের তিনি জনক। 'তিন জন আধুনিক কবি' তাঁর অন্যতম বিখ্যাত সমালোচনাগ্রন্থ। বাংলা ছাড়াও ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর প্রচুর রচনা রয়েছে। তাঁর অনুবাদের ভাণ্ডারও অজস্র। বস্তুতপক্ষে, গ্রন্থাকারে তাঁর যত রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি লেখা অমুদ্রিত পড়ে আছে।

হা. মা.

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৪—১৮৮৯]

সঞ্জীবচন্দ্র যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের (দ্র) মেজ ভাই। ছোট ভাইয়ের মতো তিনিও এক জন সুখ্যাত সাহিত্যিক। ১৮৩৪ সালে চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁটালপাড়ায় তাঁর জন্ম হয়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুর ইংরেজি স্কুলে ও হুগলি কলেজে পড়েছিলেন এবং শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) আইন পড়েন। ছাত্রজীবনে তিনি ভালো ইংরেজি শিখেছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের চাকুরিজীবন শুরু হয় বর্ধমানের কমিশনার অফিসের কেরানি হিসাবে। পরে তিনি আয়কর বিভাগে কাজ করেন। কিছুদিন তাঁর চাকুরি ছিল না। এর মধ্যে তিনি বাংলার কৃষক-প্রজাদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি ইংরেজি বই লেখেন। বইটির নাম 'বেঙ্গল রায়ত'। সে সময়ে বিচারের কাজে বইটি উপকারে লেগেছিল। এতে খুশি হয়ে ইংরেজ শাসক সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি দেন। সঞ্জীব বিশেষ সাব-রেজিস্ট্রারও ছিলেন এবং একবার আদমশুমারি অর্থাৎ লোকগণনার কাজেও তাঁকে নিয়োগ করা হয়।

সঞ্জীবচন্দ্র ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য-অনুরাগী ছিলেন। লেখা শুরু করেছিলেন অল্প বয়স থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখালেখিতে ফিরিয়ে আনেন। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (দ্র) পত্রিকা বের হয়। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁদের কাঁটালপাড়ার বাড়িতে এই পত্রিকার নামে 'বঙ্গদর্শন প্রেস' স্থাপন করেন। তখন থেকে এই ছাপাখানা থেকে 'বঙ্গদর্শন' বের হত। আর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় একটি ছোট মাসিক পত্রিকাও বের হত। পত্রিকাটির নাম ছিল 'ভ্রমর'। 'ভ্রমর' পত্রিকাতে সঞ্জীবচন্দ্র নিজেও লিখেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র একসময় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদকও হন এবং 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মালিকানাও তিনি কিনে নেন। শেষের দিকে আর্থিক অসুবিধার কারণে পত্রিকাটি তিনি আর চালাতে পারেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৮৯ সালে মারা যান।

সঞ্জীবচন্দ্র বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো খ্যাতি না পেলেও তিনি এক জন সুলেখক ছিলেন। তিনি প্রথম দিককার এক জন বাঙালি ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'মাধবীলতা', 'কণ্ঠমালা', 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'। প্রবন্ধ ও আলোচনার বই হল 'যাত্রা-সমালোচনা', 'সৎকার' ও 'বাল্য বিবাহ'। আর 'জাল প্রতাপচন্দ্র' ইতিহাসের বই। তবে সঞ্জীবচন্দ্রের সবগুলো বইয়ের মধ্যে 'পালামৌ' সুপরিচিত। এই বইয়ের লেখাগুলো তিনি প্রমথনাথ বসু ছদ্মনামে ছাপিয়েছিলেন ১২৮৭-৮৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র সংখ্যাগুলিতে। এটি ভ্রমণমূলক লেখা। সঞ্জীবচন্দ্র একবার সরকারি কাজ উপলক্ষে বিহারের ছোটনাগপুরের কাছাকাছি পালামৌ নামক এক বনাঞ্চলে যান। জায়গাটির প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করে। ফিরে এসে তিনি পালামৌ ভ্রমণের বিবরণ লেখেন। বইটি চমৎকার গদ্যে লেখা। তা ছাড়া, এর বর্ণনাভঙ্গি খুব সহজ, সরল ও আকর্ষণীয়। 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' এই সুপরিচিত প্রবাদতুল্য বাক্যটি আমরা পাই সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' বইতে। 'পালামৌ'র জন্যই সঞ্জীবচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

আ. ক.

www.pathagar.com

শিল্পী যামিনী রায়ের ছবি
দধি মন্থন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একটি ছবি

www.pathagar.com

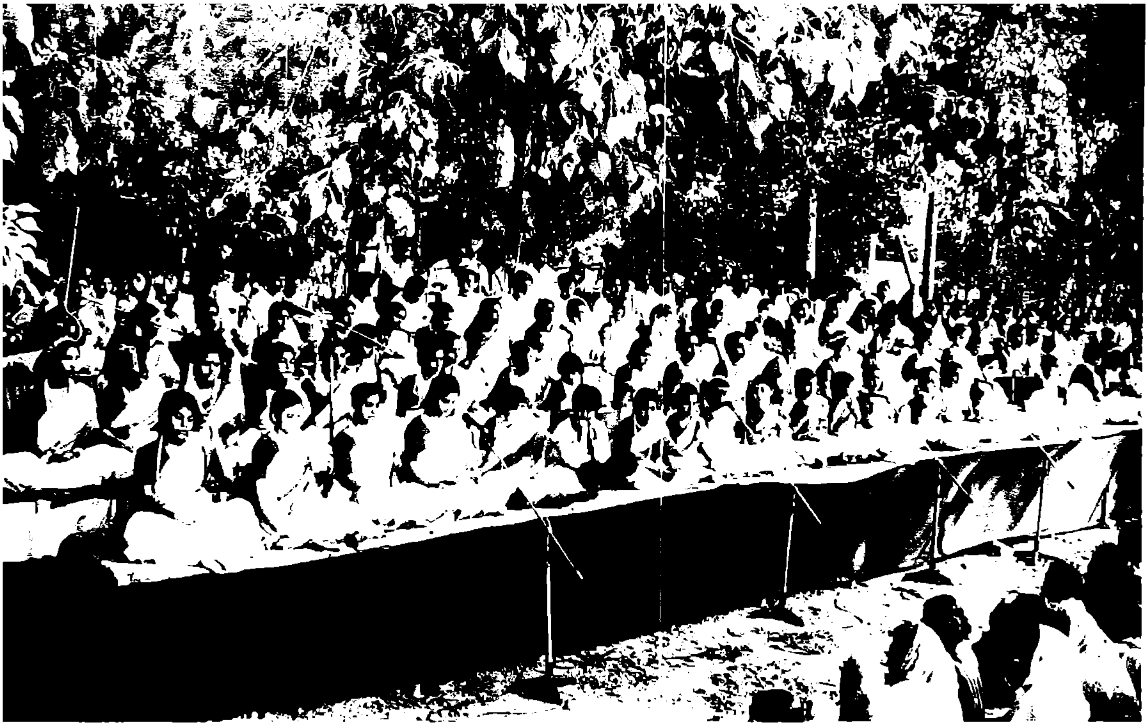

রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান—রমনার অশ্বত্থ গাছের নিচে 'ছায়ানট' কর্তৃক প্রতি বাংলা সনের ১লা বৈশাখ ভোরবেলা এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে

হাজার হাজার রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রেমীর সমাবেশ ঘটে 'ছায়ানট'-এর বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানে

www.pathagar.com

রাখাইন আদিবাসী তিন তরুণী

www.pathagar.com

রাখাইন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান

লাঠিখেলা (শ্রীমঙ্গল কচি-কাঁচার মেলা)

www.pathagar.com

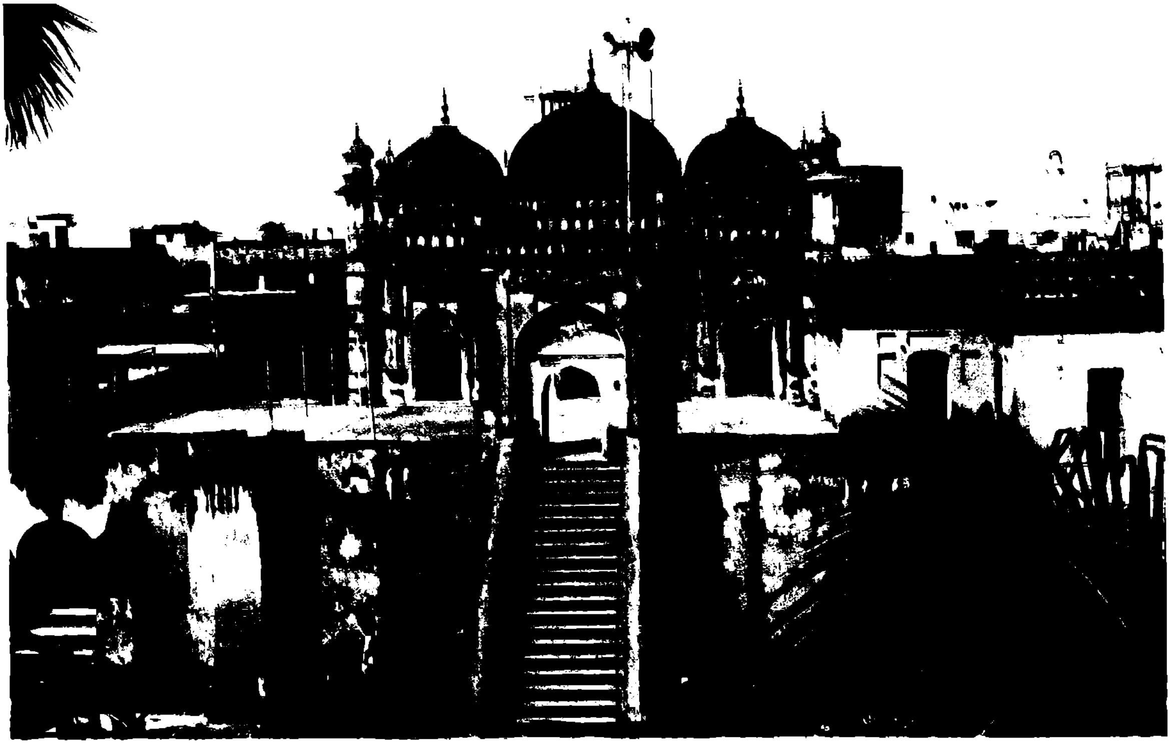

লালবাগ শাহী মসজিদ

শাপলা ফুল

www.pathagar.com

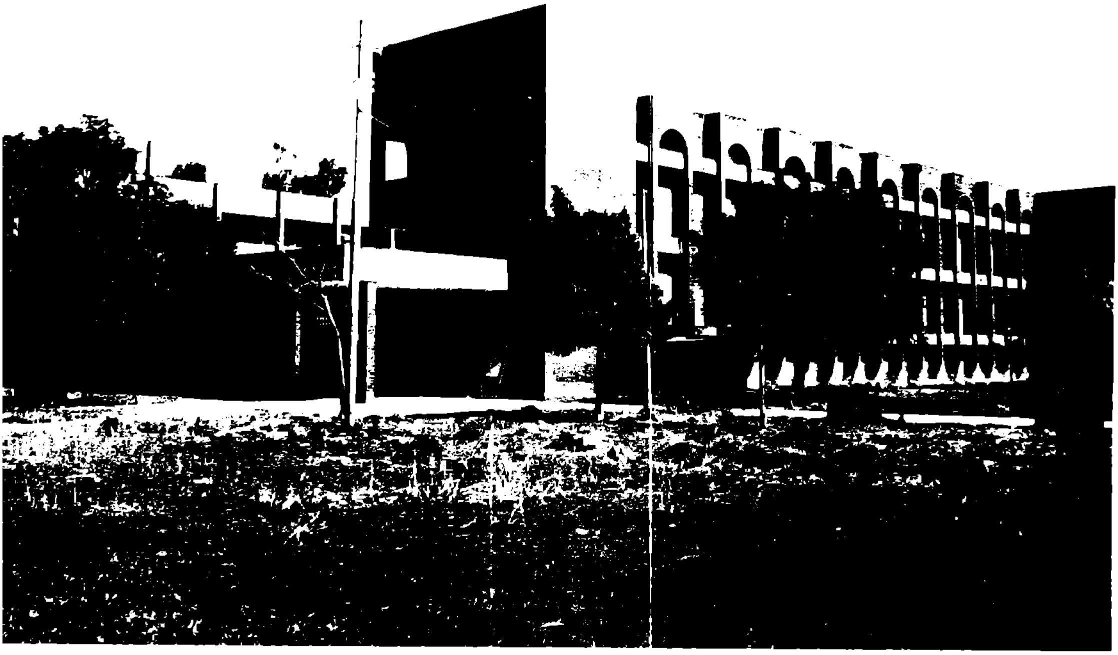

শহীদ শামসুজ্জোহা হল— রাজশাহী

শিশু—হাসিখুশি ওরা কয়েকজন

www.pathagar.com

শিশু —যে যার আনন্দে

শিশু—এরাও খুশি, মাছ ধরার আনন্দে

www.pathagar.com

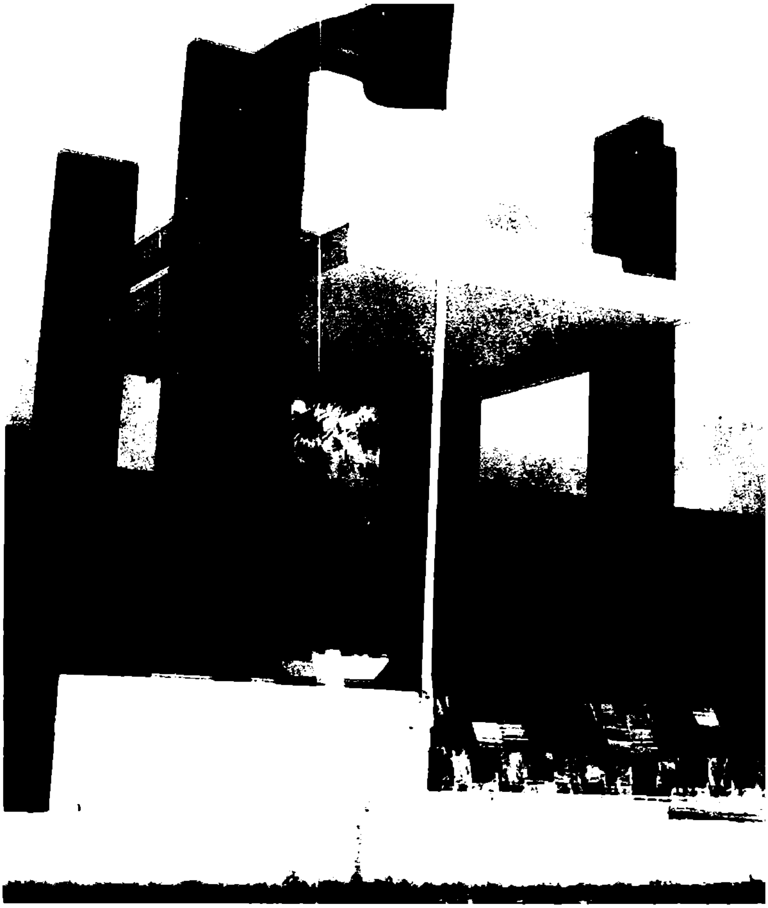

শিখা অনির্বাণ

শিশু হাসপাতাল

www.pathagar.com

শিমুল ফুল

শিশু: মণিপুরী নৃত্যের মহড়া

www.pathagar.com

শিশু পার্ক

www.pathagar.com

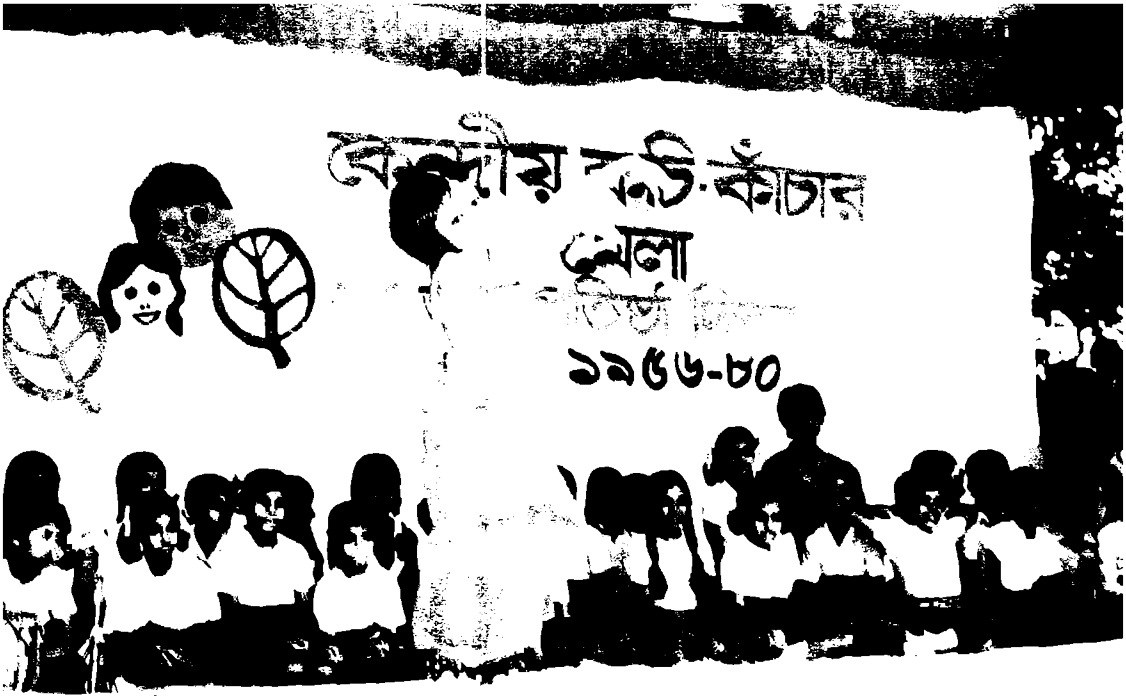

শিশু সংগঠন—কচি কাঁচার মেলার একটি অনুষ্ঠান

খেলাঘরের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা

www.pathagar.com

সরিষা ক্ষেত

সরীসৃপ—বাংলাদেশের গুইসাপ

www.pathagar.com

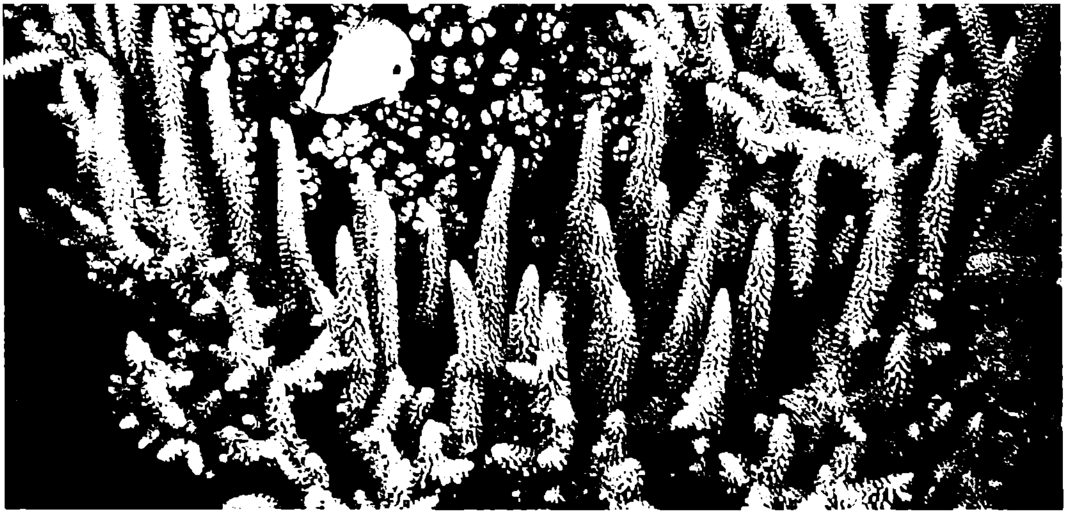

সমুদ্রের তলদেশে প্রবাল বাগানে ঘুরছে বাটারফ্লাই মাছ

সুন্দরবনের গোলপাতা

www.pathagar.com

স্মৃতিস্তম্ভ : স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের সম্মানে নির্মিত—সাভারে অবস্থিত

স্মৃতিসৌধ : শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সম্মানে নির্মিত —মীরপুরে অবস্থিত

www.pathagar.com

নীল-সারস হাড়গিলা

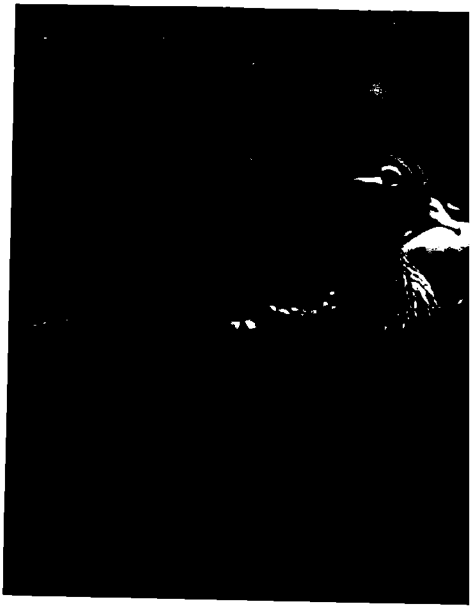

শালিক হাঁস

www.pathagar.com

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা : নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদের 'অন্যরকম ভালবাসা' নাটকে সুবর্ণা মোস্তফা, নাট্যকার নিজে এবং রায়হান গফুর ও তাহিতি

বাংলাদেশের নাট্যচর্চা : নাট্যকার মামুনুর রশীদের 'মানুষ' নাটকে নাট্যকার নিজে ও ডলি জহুর, নাটকের নির্দেশনা—ফয়েজ জহির

www.pathagar.com

সতীদাহ প্রথা

সতীদাহ বা সহমরণ পূর্বে প্রচলিত ভারতীয় হিন্দু সমাজের একটি নিষ্ঠুর প্রথা। ধর্মের নামে বিধবা স্ত্রীকে তার মৃত স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হত। হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল, এই বিসর্জনের ফলে পরলোকে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের আত্মার মিলন ও সদ্‌গতি হবে।

রাজা রামমোহন রায় (দ্র) প্রমুখ সমাজসংস্কারক মনীষীর উদ্যোগে এবং তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিয়াম্‌ বেণ্টিঙ্ক (দ্র)-এর সহযোগিতায় ১৮২৯ সালে আইন করে নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

খু. জা.

সতীনাথ ভাদুড়ী [১৯০৬—১৯৬৫]

বঙ্গসাহিত্যে কতিপয় সাহিত্যিক আছেন যাঁরা বঙ্গদেশের বাইরে বসবাস করে বাংলা ভাষায় (দ্র) লিখে গেছেন, আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

বিহারের পূর্ণিয়াতে তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে। পিতার নাম ইন্দুভূষণ। সতীনাথ পূর্ণিয়া জেলা স্কুল থেকে ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিক, পাটনা কলেজ থেকে ১৯৩০ সালে এম.এ. এবং ১৯৩১ সালে আইন পাশ করে ওকালতি শুরু করেন। পরে অবশ্য তিনি ওকালতি ত্যাগ করে সার্বক্ষণিকভাবে রাজনীতি-কর্মীরূপে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং দেশগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এর ফল স্বরূপ তাঁকে দু' বার (১৯৪০-৪১ ও ১৯৪২-৪৪ খ্রি.) কারাবরণও করতে হয়। দেশ স্বাধীন (১৯৪৭) হওয়ার পর তিনি আদর্শগত কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করে সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। যাই হোক, এত কিছু সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত পরিচয় রাজনীতিক নয়, কথাশিল্পী।

'জাগরী' তাঁর খুবই বিখ্যাত উপন্যাস, রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। তবে যে উপন্যাস তাঁকে খ্যাতির শীর্ষের নিয়ে গেছে তার নাম 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'। সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্যান্য রচনাও আছে, সেসব বর্তমানে একত্র সঙ্কলিত হয়ে বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জীবৎকালে তিনি বিখ্যাত ছিলেন তাঁর রাজনীতি ও দেশহিতকর কর্মের জন্য, কিন্তু মৃত্যুর পরে ক্রমশ তিনি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের দলে যোগ্য কারণেই বিবেচিত হচ্ছেন।

হা. মা.

সতীশচন্দ্র পাকড়াশী [১৮৯১—১৯৭৩]

ব্রিটিশ ভারতের প্রথম সারির বিপ্লবী, পরবর্তী কালে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা। তিনি ১৮৯১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তৎকালীন ঢাকা জেলাধীন মাধবদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় (১৯০৭-১৯০৮) তিনি গোপন বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি'র (দ্র) সংস্পর্শে আসেন। ফলে ১৯১১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তাঁর শিক্ষা-জীবনের অবসান ঘটে।

ইংরেজ শাসনবিরোধী এই বিপ্লবীর তৎপরতার ক্ষেত্র ছিল তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল। তাঁর নেতৃত্বে অনুশীলন দলের বহু গ্রুপ গঠিত হয়। এইসব গ্রুপের হাতে অত্যাচারী ইংরেজ কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সরকারের এ-দেশীয় বহু সহযোগী হতাহত হয়।

সতীশ পাকড়াশী তাঁর কর্মতৎপরতার কারণে বিভিন্ন মেয়াদে বহু বার কারাভোগ করেন। তাঁর নামে হুলিয়া জারি হলে তিনি আত্মগোপন করেন। ধরা পড়ে মামলার আসামিও হন। এর মধ্যে 'মেছুয়াবাজার বোমা মামলা' উল্লেখযোগ্য। এই মামলায় তাঁর ৭ বছরের জেল হয়। ১৯৩৩ সালে তাঁকে পাঠানো হয় কুখ্যাত আন্দামান সেলুলার জেলে (দ্র)। এখানেই তিনি মার্ক্সবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে বেরিয়ে ঢাকা শহরসহ আশেপাশের এলাকায় শ্রমিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি আই) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির এবং পরে এর কণ্ট্রোল কমিশনের সদস্য হন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে পূর্ণ একটি মেয়াদ সংসদে স্বীয় দলের প্রতিনিধিত্বও করেন। একাত্তর সালে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রাখেন।

www.pathagar.com

এই বামপন্থী নেতা ১৯৭৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক একমাত্র গ্রন্থের নাম 'অগ্নিযুগের কথা'।

আ. হ.

সত্যজিৎ রায় [১৯২১—১৯৯২]

চলচ্চিত্র (দ্র) পরিচালক, ভারতীয় চলচ্চিত্রের নবযুগের স্রষ্টা, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর ও সাহিত্যিক। তাঁর জন্ম কলিকাতায় (দ্র) ১৯২১ সালের ২রা মে (বঙ্গাব্দ ১৩২৮-এর ১৮ই বৈশাখ)। পিতা প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় (দ্র)। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (দ্র), বাংলা শিশুসাহিত্যে আরেক অগ্রণী পুরুষ এবং ভারতীয় মুদ্রণ-শিল্পের বিকাশের অন্যতম পথিকৃৎ। সত্যজিতের পরিবারের আদি নিবাস বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার মসুয়া গ্রামে।

সত্যজিৎ রায় প্রাথমিক ও প্রবেশিকা শিক্ষাজীবন কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) অর্থনীতিশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ. ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯৪০ সালের ১৩ই জুলাই বি. এ. পাশ করার পর শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে তাঁর একটি ইংরেজি গল্প প্রকাশিত হয়। এটা তাঁর জীবনের প্রথম সাহিত্যকর্ম। ১৯৪৩ সালে বিজ্ঞাপনী সংস্থা ডি. জে. কিশর-এর ভিজুয়ালাইজার পদে যোগ দেন। পাশাপাশি শুরু করেন গ্রন্থের নিয়মিত প্রচ্ছদপট আঁকার কাজ।

১৯৪৭ সালের ৫ই অক্টোবর ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র সংসদ 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি' প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫০ সালে প্রথম বার লণ্ডনে (দ্র) যান। সেখানে অবস্থানকালে লণ্ডন ফিল্ম ক্লাবের সদস্য হিসাবে সাড়ে চার মাসে বিশ্বের ধ্রুপদী ও নানা ধরনের ৯৯টি চলচ্চিত্রকর্ম দেখেন। এ বছরই জার্মানির লাইপৎজিগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মুদ্রণ প্রদর্শনীতে 'খাই খাই' ও 'অন্যান্য' গ্রন্থ দু'টির প্রচ্ছদপট অঙ্কনের জন্য পুরস্কৃত হন।

১৯৫৫ সালের এপ্রিলে নিউইয়র্কের (দ্র) মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট-এ তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' (দ্র) প্রথম প্রদর্শিত হয়। এ বছরের আগস্ট মাসে ছবিটি মুক্তি পায় কলিকাতায়। ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৫) সত্যজিৎসহ তাঁর চলচ্চিত্র ইউনিটের শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ সংবর্ধিত হন। ১৯৫৬ সালে কান্ চলচ্চিত্র উৎসবে 'পথের পাঁচালী' মানবিক আবেদনসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে পুরস্কৃত হয়। এ বছরের অক্টোবর মাসে মুক্তি পায় তাঁর পরিচালিত দ্বিতীয় ছবি 'অপরাজিত'। ১৯৫৭ সালে এ ছবিটি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোল্ডেন লায়ন অব সেন্ট মার্ক' লাভ করে।

১৯৫৫ থেকে ১৯৯২—এই ৩৭ বছর ধরে সত্যজিৎ পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র, প্রামাণ্য ও টেলিফিল্মসহ প্রায় ৫০টির মতো চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অপুর সংসার', 'পরশপাথর', 'দেবী', 'তিন কন্যা',

www.pathagar.com

'চারুলতা', 'জলসাঘর', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন,' 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'রবীন্দ্রনাথ', 'ইনার আই', 'পিকু', ও 'আগন্তুক' ইত্যাদি। নিজের পরিচালিত অনেকগুলি ছবির সঙ্গীত পরিচালনাও করেন তিনি।

১৯৬১ সালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'সন্দেশ' (দ্র) পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ শুরু করেন। এ বছর থেকেই শুরু হয় তাঁর নিয়মিত সাহিত্যজীবন। তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাস কিশোরসহ সব বয়সের পাঠকদের কাছে সমান উপভোগ্য। শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৬৭ সালে তিনি 'আকাদেমি পুরস্কার' এবং ১৯৮২ সালে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' লাভ করেন। অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে (দ্র) তাঁর 'ফেলুদা' ও 'প্রফেসর শঙ্কু' এক অনবদ্য সৃষ্টি।

চলচ্চিত্রে অবদানস্বরূপ তিনি দেশ-বিদেশে বহু উপাধি, সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পদ্মশ্রী (১৯৫৯), 'পদ্মভূষণ' (১৯৬৫), 'ম্যাগসেসে' (দ্র; ১৯৬৭), 'আনন্দ পুরস্কার' (১৯৭১), 'পদ্মবিভূষণ' (১৯৭৬), দেশিকোত্তম' (১৯৭৮), 'দাদা সাহেব ফালকে

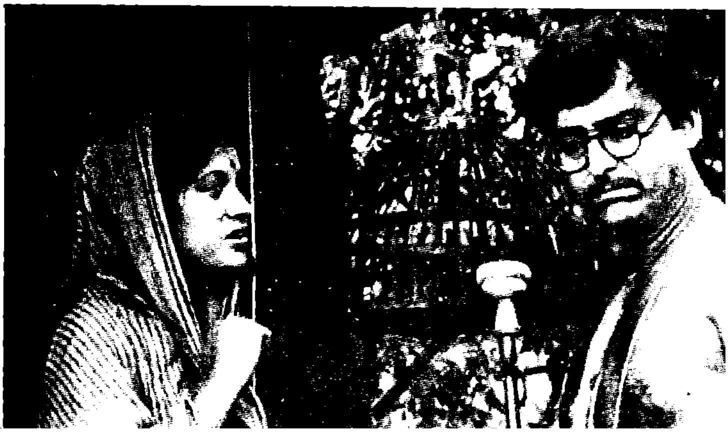

উপরে ও মাঝে: পথের পাঁচালী ছবির দু'টি দৃশ্যে অপু (সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়), দুর্গা (উমাদাশ গুপ্তা) ও ইন্দির ঠাকুরণ (চুনিবালা দেবী)। নিচে: অশনি সংকেত ছবিতে সৌমিত্র ও ববিতা

www.pathagar.com

পুরস্কার' (১৯৮৪), 'সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার' (১৯৮৪), ফরাসি সরকার প্রদত্ত ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিয়ন অব অনার' (১৯৮৭), 'ভারতরত্ন' (১৯৯২); তা ছাড়া জীবনাবসানের কিছু কাল পূর্বে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারের তুল্য সম্মানজনক 'অস্কার' দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন: 'লাইফ-টাইম অ্যাচিভমেন্টের' জন্য 'বিশেষ অস্কার' পুরস্কার (১৯৯২) তাঁকে প্রদান করা হয়। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বিশেষ সম্মান, ডক্টরেট ডিগ্রি ও ডি. লিট. উপাধি পেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে এনসাইক্লোপিডিয়ায় তাঁর নাম

জয়বাবা ফেলুনাথ ছবির তিনটি দৃশ্য। উপরে: সন্তোষ দত্ত, বামে উপরে: রুকু চরিত্রে জিৎ বসু, মাঝে: মাস্‌ল্‌ম্যান ও ফেলুর সহকারী সিদ্ধার্থ, নিচে: নায়ক ছবির শুটিংয়ের সময় উত্তমকুমারকে পরামর্শ দিচ্ছেন সত্যজিৎ রায়

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৭৫ সালে ব্রিটিশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি তাঁকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক রূপে সম্মানিত করে। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁকে 'সর্বকালের তিন জন সেরা পরিচালকের অন্যতম রূপে' সম্মানিত করা হয়। অপর দু'জন পরিচালকের এক জন চার্লি চ্যাপলিন (দ্র), অন্য জন ইঙ্গমার বার্গম্যান। ১৯৮২ সালে রোম চলচ্চিত্র উৎসবে 'ভিস্‌কন্তি' পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৯২ সালের ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৫-৪৫ মিনিটে কলিকাতার বেলভিউ নার্সিং হোমে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও পিতা সুকুমার রায়। উপরে: সত্যজিতের বই প্রফেসর শঙ্কুতে সত্যজিতের আঁকা ছবি। বামে উপরে: বাঘরহস্য গল্পের ছবি এবং নিচে: চার বছর বয়সে সত্যজিৎ

www.pathagar.com

সত্যাগ্রহ

'সত্যাগ্রহ' শব্দের অর্থ সত্যের প্রতি আগ্রহ, অর্থাৎ ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ। ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ প্রমাণের একটি লক্ষণ হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ।

'সত্যাগ্রহ' আসলে এক রাজনৈতিক আন্দোলনের নাম, যার জন্মদাতা মহাত্মা গান্ধী (দ্র)। এই আন্দোলনের মূলকথা জনগণের উপরে অন্যায় আইন চাপিয়ে দিলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা, তবে এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ঘটাতে হবে অহিংস পন্থায়। গান্ধী এর সূত্রপাত করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়; সেখানে ভারতীয় অধিবাসীদের উপর বলবৎ বিধিকরণ আইনের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পরে তিনি ভারতে চলে এলে রাউলাট আইনের (Rowlatt Acts, ১৯১৯) বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দেলন (দ্র) শুরু করেন। এটিও অহিংস পন্থায় পরিচালিত হয়েছিল, তাই একেও সত্যাগ্রহ বলা হয়। পরে ১৯৩০ সালে গান্ধী যখন ডাণ্ডি অভিযান শুরু করেন, তখনো এই একই অহিংস পন্থায় আন্দোলন করেছিলেন। এটিও ছিল সত্যাগ্রহ। এই সময়ের আন্দোলনটি তখন সরকারি আইন অমান্য আন্দোলন (দ্র) রূপে পরিচিতি লাভ করে।

হা. মা.

সত্যেন সেন [১৯০৭—১৯৮১]

জীবনবাদী কথাশিল্পী, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিসেবী। তাঁর জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং গ্রামের এক বিশিষ্ট পরিবারে, ১৯০৭ সালের ২৮শে মে।

সত্যেন সেন কৈশোরেই আকৃষ্ট হন রাজনীতির প্রতি। ছাত্রাবস্থাতে যুক্ত হন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'যুগান্তর দল' (দ্র)-এর সঙ্গে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সময়সীমার ভেতরে সামান্য বিরতি দিয়ে মোট ৭ বছর রাজনৈতিক কারণে জেল খাটেন। মাঝখানে একবার জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে (দ্র) যান। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও সত্যেন সেনের আপন কাকা বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ ক্ষিতিমোহন সেন (দ্র) এই সময় তাঁর বৃত্তির ব্যবস্থা করলেও শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নের সুযোগ গ্রহণ না করে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন উদ্যাগে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবশেষে জেলে বসেই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. এবং এম. এ. পাশ করেন। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ থেকে মার্ক্সবাদী দর্শনে দীক্ষিত হন এবং ১৯৩৯ সাল থেকে আত্মনিয়োগ করেন কৃষক-আন্দোলন সংগঠনের কাজে।

১৯৪০ সালের দিকে ঢাকায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' (দ্র) গড়ে উঠলে তিনি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। এই সময় তাঁর রচিত ও সুরারোপিত অজস্র গণসঙ্গীত (দ্র) শুধু পত্রপত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় নি, গীতও হয়েছে বহু সভাসমিতিতে ও সম্মেলনে। জনপ্রিয়তাধন্য সেই সব গণসঙ্গীত সংগৃহীত হলে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারের এক অমূল্য স্থায়ী সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হত। মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (দ্র) থেকে সম্প্রচারিত তাঁর রচিত গণসঙ্গীত স্বাধীনতাকামী দেশবাসীকে যারপরনাই উদ্বুদ্ধ করেছে।

পাকিস্তানের (দ্র) স্বৈর শাসনামলে সত্যেন সেন বিভিন্ন পর্বে মোট ১১ বছর জেল খাটেন। তাঁর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ বন্দি অবস্থাতেই রচিত। ১৯৬৪ সালে তিনি জেল থেকে মুক্ত হবার পর এগুলোর পর্যায়ক্রমিক প্রকাশনা শুরু হয়।

দেশের একাধিক সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও প্রকাশনা সংগঠন প্রতিষ্ঠার পিছনেও তিনি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উৎসাহদাতা ও জন্মদাতা। দেশব্যাপী একমাত্র সাংস্কৃতিক সংগঠন 'উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও এর প্রথম সভাপতি। 'কালিকলম' নামের একটি প্রকাশনী সংস্থারও গোড়াপত্তন করেন তিনি (১৯৭০)।

সত্যেন সেনের সাংবাদিকতার জীবনও ছিল কর্মমুখর। দীর্ঘকাল তিনি 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে।

১৯৭৩ সালে চিরকুমার এই সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে শান্তিনিকেতনে তাঁর বোনের কাছে চলে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৮১ সালের ৫ই জানুয়ারি।

www.pathagar.com

সত্যেন সেনের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম— উপন্যাস : 'ভোরের বিহঙ্গী' (১৩৬৬), 'অভিশপ্ত নগরী' (১৩৭৪), 'পাপের সন্তান' (১৩৮১), 'পদচিহ্ন' (১৩৮৫), 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৩৭৬), 'কুমারজীব' (১৩৭৬) ও 'উত্তরণ' (১৯৭০)। অন্যান্য রচনা : 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' (১৯৪৮), 'গ্রাম বাংলার পথে পথে' (১৩৭২), 'মনোরমা মাসীমা', 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' (১৯৭১), 'জীববিজ্ঞানের নানা কথা' (১৯৭৩), 'সীমান্তসূর্য আবদুল গাফ্ফার খান (১৩৮৩)। শিশুসাহিত্য: 'পাতাবাহার' (১৩৭৪)। বিভিন্ন খণ্ডে তাঁর রচনাবলি আংশিক প্রকাশিত হয়েছে।

পুরস্কার : 'আদমজী পুরস্কার'। উপন্যাসে 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৭০)।

আ. হু.

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪২—১৯২৩]

বিখ্যাত লেখক, সঙ্গীত রচয়িতা ও সমাজকর্মী। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে চাকুরি লাভ করেন। কলিকাতার (দ্র) জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র)। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) সাহিত্য ও সঙ্গীতজীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সত্যেন্দ্রনাথের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। রাগসঙ্গীত (দ্র) ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত এই উভয় ধারাতেই তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের সূচনা তাঁর হাতে। বাংলায় রচিত ভারতবর্ষের প্রথম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গানটি তাঁর রচনা। হিন্দু মেলায় (দ্র) প্রতিটি অধিবেশনই এই গান গেয়ে শুরু হত। ভাঙা গান এবং ধ্রুপদীয় আদর্শে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাতেও তিনি অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। নাট্যকার ও অনুবাদকরূপেও সত্যেন্দ্রনাথ বিখ্যাত।

তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও সুলেখিকা ও সমাজকর্মী ছিলেন। বাঙালি মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক করার ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য।

ক. গো.

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত [১৮৮২—১৯২২]

কবি। বাংলা কাব্যসাহিত্যে তিনি 'ছন্দের জাদুকর' রূপে খ্যাত। ১৮৮২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি চব্বিশ পরগনার নিমতা গ্রামে তাঁর জন্ম। এটি তাঁর মাতুলালয়। পৈতৃক নিবাস বর্ধমানের চুপীগ্রামে। তাঁর পিতা রজনীনাথ দত্ত ও মাতা মহামায়া দেবী। বিখ্যাত মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর পিতামহ ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সালে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৯০১ সালে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে এফ. এ. (ফার্স্ট আর্টস্, এখনকার এইচ. এস. সি-র সমপর্যায়ের) পাশ করেন। কিছুকাল ব্যবসা করার পর পিতামহের প্রভাবে তিনি সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর প্রথম যুগের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম জীবনে তিনি মধুসূদন (দ্র), রবীন্দ্রনাথ (দ্র), দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল (দ্র) প্রমুখ কবির রচনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখতে থাকেন। তিনি 'ভারতী' পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম কবি ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের মূল সুর ও বৈশিষ্ট্য হল— স্বদেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি, বাস্তববোধ, বিজ্ঞানচেতনা, তথ্যবহুলতা, ছন্দবৈচিত্র্য ইত্যাদি। ছন্দের কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ধ্বনির অনুরণনের মায়াজাল বিস্তার করে পাঠকদের সম্মোহিত করার অনন্য এক দক্ষতা ছিল তাঁর। নতুন উদ্ভাবনে ও তার সার্থক প্রয়োগে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রধানত সৃষ্টিশীল কবি হলেও বিদেশী ভাষার কবিতা অনুবাদে তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। তাঁর কাব্যে প্রচুর আরবি ও ফার্সি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ভাষা, ছন্দসহ সাহিত্যের নানা বিষয়ে

www.pathagar.com

তাঁর গদ্য রচনার পরিমাণও কম নয়। জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হল : 'সবিতা' (১৯০০), 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), হোমশিখা' (১৯০৭), 'তীর্থসলিল' (অনুবাদ ১৯০৮), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'তুলির লিখন' (১৯১৪), 'মণি-মঞ্জুষা' (অনুবাদ ১৯১৫), 'অভ্র-আবীর' (১৯১৬), 'হসন্তিকা' (১৯১৭)। মৃতুর পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলো হল 'বেলা শেষের গান' (১৯২৩), 'বিদায়-আরতি' (১৯২৪), 'কাব্য সঞ্চয়ন' (১৯৩০) ও 'শিশুকবিতা' (১৯৪৫) এবং একটি নাটিকা 'ধূপের ধোঁয়ায়' (১৯২৯)। গদ্য রচনা : 'জনম দুঃখী' (অনূদিত উপন্যাস-১৯১২), 'চীনের ধূপ' (অনুবাদ-প্রবন্ধগ্রন্থ ১৯১২)', 'রঙ্গমল্লী' (অনুবাদ-নাটক ১৯১৩), 'বারোয়ারি' (উপন্যাস—২৯ থেকে ৩২ পরিচ্ছেদ ১৯২১)।

সাহিত্যিক জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্র-আদর্শানুসারী কবি। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৯২২ সালে ২৫শে ফেব্রুয়ারি তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

সুজ. ব.

সত্যেনাথ বসু [১৮৯৪—১৯৭৪]

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। জন্ম কলিকাতায় (দ্র), ১লা জানুয়ারি ১৮৯৪। মৃত্যু কলিকাতায়, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু। ১৯০৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম এবং ১৯১১ সালে আই. এসসি.-তে প্রথম হন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে গণিতে অনার্স নিয়ে বি.এসসি. (১৯১৩) এবং এম. এসসি. (১৯১৫) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৫ সাল থেকে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার কাজ নেন। ১৯২১ সালে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসাবে যোগ দিয়ে ২৪ বছর একনিষ্ঠভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগটি গড়ে তোলেন। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান, এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির উপর গবেষণা করে তিনি খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেন। ১৯২৪ সালে তাঁর প্লাঙ্ক সূত্র এবং কোয়ান্টাম প্রকল্প নামের গবেষণা-প্রবন্ধটি পাঠ করে আইনস্টাইন (দ্র) চমৎকৃত হন এবং নিজেই প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ বিজ্ঞানবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব হিসাবে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়। তাঁর নামানুসারে পরমাণুর (দ্র) এক ধরনের বস্তুকণিকার নাম রাখা হয়েছে বোসন্ কণা।

১৯২৯ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি এবং ১৯৪৪ সালে মূল কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪৫ সালে তিনি ঢাকা ছেড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) গিয়ে যোগদান করেন। দু'বছর তিনি বিশ্বভারতী (দ্র) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক তিনি জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৪ সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধি পান।

তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন। তাঁর আরেক বড় পরিচয় বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ হিসাবে। এ জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। এর মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

স. রা.

সদারঙ্গ খেয়াল দ্র

সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্ম দ্র

সনেট কাব্য দ্র

সন্ত্রাস / সন্ত্রাসবাদ

চরম ভীতি প্রদর্শন, আতঙ্ক সৃষ্টি এবং অস্ত্রের সাহায্যে কোনো লক্ষ্য অর্জনের পন্থাকেই সন্ত্রাস বলে। এবং এই পন্থায় যারা লক্ষ্য সাধনে নিয়োজিত, তাদেরকে বলা হয় সন্ত্রাসী। প্রতিষ্ঠিত পুরাতন স্বৈরাচারী সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্যও এই পন্থার আশ্রয় নেওয়ার ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। 'সন্ত্রাস', 'সন্ত্রাসী' এবং 'সন্ত্রাসবাদ' ইত্যাদি শব্দের আনুষ্ঠানিক ব্যবহার এবং তার প্রচলন ফরাসি বিপ্লবের (দ্র) সময় থেকে।

www.pathagar.com

১৭৯৩ থেকে ১৭৯৪—এই এক বছর সময়সীমার ভেতরে জ্যাকোবিন দলের পরিচালিত কার্যক্রমকে ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror: Jacobin Terror) হিসাবে অভিহিত করা হয়। ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে তখন দেখা দিয়েছে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান। দেশটির জাতীয় সম্মেলনে তখন জ্যাকোবিন দলের গরিষ্ঠতা ও প্রাধান্য। বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য এর তিন নেতা যথাক্রমে রব্‌স্‌পিয়ের (Robespierre), দাঁতঁ (Danton) এবং মারা (Marat) কঠোর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং বিপ্লববিরোধীদের শনাক্ত করে বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সন্ত্রাসী শাসনের এই মেয়াদকালে প্রায় তিন হাজার ব্যক্তিকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। ১৭৯৩ সালে ১৬ই অক্টোবর রানী মারি আঁতোয়ানেৎ -কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা এ সময়েরই একটি প্রধান ঘটনা। অবশ্য নিজেদের মধ্যে মতভেদের কারণে রব্‌স্‌পিয়ের দলীয় সহকর্মী দাঁতঁরও প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। তবে ১৭৯৪ সালের জুলাই মাসে রব্‌স্‌পিয়েরের পতন ঘটলে তাঁকেও প্রাণ দিতে হয় গিলোটিনে। ফরাসি বিপ্লবের উল্লিখিত ঐ এক বছর ধরে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলেছিল, তাতে ফরাসি জনগণ চরমভাবে বিরক্ত হয়ে উঠলে সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

ফরাসি দেশের পর রুশ দেশে স্বৈরাচারী জারতন্ত্রকে উৎখাত করার পাশাপাশি বিশ্বের অন্য আরো বহু দেশে সন্ত্রাসী পন্থায় স্বৈরাচারী সরকার বা রাজতন্ত্রকে উৎখাত করার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশেও গান্ধীর অহিংস আন্দোলন-পন্থার পাশাপাশি 'যুগান্তর দল' (দ্র) ও 'অনুশীলন সমিতি'(দ্র) নামের দু'টি দলের নেতা-কর্মীরা সন্ত্রাসীপন্থায় ইংরেজ সরকারকে উৎখাত করার অভিযানে নিরত ছিল।

'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'—চীনের নেতা ও তাত্ত্বিক মাও সে-তুং (দ্র)-এর এই তত্ত্বসূত্রকে আদর্শ করে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পুরো সত্তর দশকের শেষ পর্যন্ত ইউরোপ (দ্র) ও লাতিন আমেরিকা (দ্র)-সহ এশিয়ার (দ্র) বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গ্রুপ গড়ে ওঠে তাদের স্ব স্ব দেশের স্বৈরাচারী সরকারগুলোর উৎখাত অভিযানের লক্ষ্য নিয়ে। এই পন্থার সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে নানা বিতর্ক অতীতেও চলেছে, এখনো অব্যাহত।

সাম্প্রতিক কালে সন্ত্রাস বিভিন্ন চেহারায় উপস্থিত। একে কেউ কেউ 'রাজনৈতিক আদর্শবিহীন' সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসবাদ বলে অভিহিত করছেন। চরম অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও রাজনৈতিক আদর্শশূন্যতা থেকেই এ জাতীয় সন্ত্রাসের উৎপত্তি। এবং এরই সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দল বা সামাজিক গ্রুপ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার তরুণ-যুবকদের সশস্ত্র করে তুলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন। সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী তাই উন্নত ধনী ও উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের প্রধানতম প্রকট সমস্যাগুলোর একটি।

অবশ্য কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিকের মতে– উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন আছে, অর্থনৈতিক সমস্যা নেই, কোনো রাজনৈতিক দলেরও সদস্য নন, এমন অবস্থাতেও কোনো ব্যক্তি সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে পারেন। তাঁদের যুক্তি—ব্যক্তির অহংবোধ কোনো-না-কোনোভাবে দলিত হলেই সে হীনম্মন্যতার শিকার হয়, এবং সেটা কাটিয়ে উঠতে হয় সে বেছে নেয় নির্জন গৃহকোণ, নয়তো লোকচক্ষে দ্রুত বীর হবার চেষ্টায় গ্রহণ করে নানা পন্থা। আর তার মধ্যে সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী পন্থা অন্যতম।

আ. হু.

সন্দেশ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী দ্র

সন্দ্বীপ, আবুল কাসেম [১৯৪৪—১৯৯৫]

স্বাধীন বাংলা বেতার (দ্র) কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক, মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল চট্টগ্রাম (দ্র) জেলার সন্দ্বীপের সারিকাইতগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নূর আহমদ।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ১৯৫৯ সালে সাউথ সন্দ্বীপ হাই ইংলিশ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট আই. আই. কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে আই.এ. পাশ করেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে

www.pathagar.com

১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বি. এ. অনার্স ও ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে একই বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ছাত্র অবস্থায় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি দেশের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের এক জন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি গভর্নমেন্ট আই. আই. কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার নির্মাণ কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক ছিলেন।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ষাটের দশকের প্রথম ভাগে গীতিকার ও কবিতা লেখক হিসাবে চট্টগ্রাম বেতারের সঙ্গে যুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৭০ সালের জুন মাসে তিনি সাংবাদিকতা পেশা ত্যাগ করে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি কলেজের সহ-অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন।

আবুর কাসেম সন্দ্বীপ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) শুরুর প্রাক্কালে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটে তিনিই এই বেতার কেন্দ্রের নাম ঘোষণা করে বলেন—'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি।' বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬শে মার্চ বেলা ১-৩ টার মধ্যে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নানের ভাষণের মাধ্যমে প্রচারের পর ঐ দিন সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের টেলিগ্রামটি আবুল কাসেম সন্দ্বীপ সংবাদ আকারে প্রচার করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম নীতি নির্ধারকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বার্তা বিভাগে কাজ করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এক জন শব্দসৈনিক হিসাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে (দ্র) উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ বেতার ঢাকা শাখায় যোগ দেন। ১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের নব প্রবর্তিত গণশিক্ষা প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণে তিনি স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য তিনি ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

১৯৯৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর তিনি ঢাকার সাভারে মৃত্যু বরণ করেন।

সুজ. ব.

সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa Major)

রাত্রিকালে উত্তর আকাশে লক্ষ করলে সাতটি তারকা প্রায় কাছাকাছি দেখা যায়। এই নক্ষত্রপুঞ্জকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলা হয়। এই সাতটি তারা একত্র করে ভাবলে একটি বড় ভল্লুকের মতো দেখায় বলে পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিদগণ একে বৃহৎ ভল্লুক (Great Bear) নাম দিয়েছিলেন। উপমহাদেশের প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ সাত জন ঋষির নামে এই তারকা কয়টির নামকরণ করেছেন। এই সাতটি তারকাকে কল্পিত রেখা দিয়ে যোগ করলে অনেকটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) মতো বা লাঙ্গলের মতো মনে হয়।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের ১ নম্বর তারা থেকে ২ নম্বর তারার দিকে মনে মনে যোগ করে বর্ধিত করলে ঐ সরল রেখা অনেক দূরে

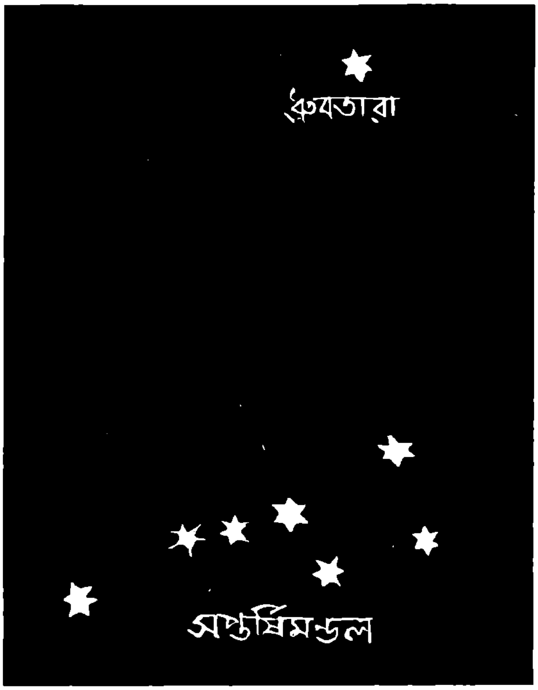

www.pathagar.com

একটি মোটামুটি উজ্জ্বল তারকার সঙ্গে মিলিত হয়। ঐ তারকার নাম ধ্রুবতারা (দ্র)। সপ্তর্ষিমণ্ডল সারা বছর ঐ ধ্রুবতারার চারদিকে ঘোরে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন যেখানেই থাকুক না কেন ১ নং ও ২ নং তারা সব সময়ই ধ্রুবতারাকে নির্দেশ করবে।

দিগ্ দর্শন যন্ত্র বা কম্পাস (দ্র) আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ রাত্রিকালে বা অকূল সমুদ্রে নাবিকেরা সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাহায্যে ধ্রুবতারা খুঁজে বের করে দিঙ্‌নির্ণয় করত। ধ্রুবতারাকে স্থির মনে হয় পৃথিবী থেকে দূরত্বের জন্য। ধ্রুবতারা থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে প্রায় ৪০ বছর সময় লাগে। দক্ষিণ গোলার্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখা যায় না। তা ছাড়া উত্তর আকাশেও সপ্তর্ষিমণ্ডলকে সব সময় দেখা যায় না।

একই মণ্ডলের তারাগুলো যে একই গতিবেগে একই দিকে চলেছে, এমন কোনো কথা নেই। সপ্তর্ষিমণ্ডলের পাঁচটি তারার গতিবেগ একদিকে এবং অন্য দুইটির গতিবেগ বিপরীত দিকে। ফলে অনেক হাজার বছর পরে হয়তো সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ভাল্লুক বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বলে চেনা যাবে না।

মু. এ.

সপ্তাশ্চর্য

প্রাচীন কালে মানুষের তৈরি সাতটি স্থাপত্য ও শিল্পকর্মকে বিস্ময়কর বলে মনে হত। তাই সেগুলিকে সপ্তাশ্চর্য নামে অভিহিত করা হত। ঐ সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে রয়েছে : ১. কালোসাস অব রোড্‌স্—এটি ইজিয়ান সাগরে রোড্‌স্ বন্দরের প্রবেশপথে স্থাপিত অ্যাপোলোর (গ্রিক সূর্যদেবতা) বিশাল প্রস্তরমূর্তি। প্রাচীন কালের সব চাইতে বড় এই মূর্তিটি চার্স (Chares of Lindos) নামক এক গ্রিক শিল্পী ২৭৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্মাণ করেছিলেন। মূর্তিটির উচ্চতা ছিল ২৮০ ফুট। এর বুড়ো আঙুল দুটো ছিল মানুষের হাতের চাইতেও বড় এবং অন্য আঙুলগুলি ছিল অনেক স্বাভাবিক মূর্তির চাইতেও বড়। ২২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক ভূমিকম্পে এটি ধ্বংস হয়ে যায়। ২. ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান—ব্যাবিলনের রাজা নবপ্লাসারের পুত্র নেবুকাদ্‌নেজার ছিলেন শক্তিশালী ও বিলাসপ্রিয় রাজা। তিনি ব্যাবিলনকে সাজিয়েছিলেন নানান শিল্পসামগ্রী দিয়ে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অপূর্ব কারুকাজখচিত ইশ্‌তার তোরণ ও মার্দুক্ দেবতার মন্দিরের রাজপথ। তবে নেবুকাদ্‌নেজারের যেজন্য বিশেষ খ্যাতি, তা হল তাঁর 'ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান' নির্মাণ। এটি ধাপে ধাপে ওপরে উঠে যাওয়া বাগান দিয়ে সুসজ্জিত। এর মধ্যে রয়েছে নানা ভবন, হলঘর এবং অন্যান্য অট্টালিকা। নানা গাছপালা এবং ফুলফল এগুলির শোভা বাড়িয়েছিল। প্রাসাদগুলির মধ্যে সব চাইতে উঁচুটি ছিল ৩০০ ফুট। ৩. আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর—মিশর দেশের উত্তরে সমুদ্রের উপকূলে এবং আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের নিকটে ফারোস (Pharos) নামে একটি দ্বীপ আছে। সেখানে একদা দাঁড়িয়ে ছিল একটি বাতিঘর যা 'আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর' নামে সুপরিচিত। ২৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম টলেমি (দ্র)-র নির্দেশে এটি তৈরি করেছিলেন ক্নিডাসের সোস্ট্রাটাস (Sostratus of Cnidus)। এটি সাদা মার্বেলের একটি চমৎকার ভবন; তৈরি করতে খরচ পড়েছিল ১,৬০,০০০ পাউণ্ড। ভবনটির নিম্নাংশ চার কোণা, তার ওপরের অংশটি আট কোণা এবং ওপরের তৃতীয় অংশটি গোলাকার। ঘরটি গ্যালারি এবং স্তম্ভ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ৪. পিরামিড—প্রাচীন মিশরের রাজাদের কবরের ওপর তৈরি স্মৃতিসৌধ। ত্রিভুজ-আকৃতির এই সৌধ ক্রমশ ছোট হয়ে ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। প্রাচীনতম যে পিরামিডটির নমুনা আজও সাকারা (Saqqara) নামক স্থানে দেখতে পাওয়া যায়, সেটি প্রায় ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জোসার (Zoser)-এর সমাধিসৌধ হিসাবে নির্মাণ করেছিলেন সেকালের এক জ্ঞানী লোক ইম্‌হোটেপ (Imhotep)। পিরামিডটির উচ্চতা ছিল প্রায় ২০০ ফুট এবং ধাপ ছিল ছয়টি। পুরা পাথর দিয়ে তৈরি এই ভবনটির শিল্পচাতুর্য ও চমৎকারিত্ব পরবর্তী ফারাওদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং নিজেদের সমাধিসৌধ হিসাবে পিরামিড নির্মাণকে তাঁরা গৌরবজনক কাজ মনে করেছিলেন। শেষে পিরামিড নির্মাণে ফারাওদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। এই প্রতিযোগিতায় সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিন জন ফারাও (Pharaoh)—খুফু (Khufu) বা কেয়প্‌স্ (Cheops), চেফ্রেন (Chephren) এবং মাইসেরিনাস (Myserinus)। কায়রোর অদূরে গিজা মরুভূমিতে এদের পিরামিডগুলি ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। খুফুর সবচাইতে বড় পিরামিডটি তেরো একর জমির ওপর স্থাপিত

www.pathagar.com

এবং ৪৮১ ফুট উঁচু। এটি তৈরি হয়েছে ২৩ লক্ষ পাথরের বিরাট চাঁই দিয়ে। প্রতিটি চাঁইয়ের ওজন প্রায় আড়াই টন। কবর হিসাবে পিরামিড তৈরি প্রমাণ করে যে মিশরীয়রা পরকালে বিশ্বাস করত এবং তারা এ-ও বিশ্বাস করত যে পরজীবন লাভের জন্য শরীরকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। তাই মৃতদেহকে মমি (দ্র) করার এবং আত্মার আশ্রয়ের জন্য পিরামিড তৈরির প্রচলন হয়েছিল। ৫. জুপিটারের মূর্তি—মূর্তিটি বিখ্যাত স্থপতি, ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী ফিডিয়াস (Phidias) (জন্ম প্রায় ৫০০ খ্রি. পূ.) তৈরি করেছিলেন এবং এটি গ্রিসের অলিম্পাসে স্থাপিত হয়েছিল। ৬. দেবী ডায়ানার মন্দির—এশিয়া মাইনরের (দ্র) সমুদ্র-উপকূলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ইফিসাসে (Ephesus) গ্রিক স্থপতি ডিনোক্রাটিসের (Dinocrates) তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ৩৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মন্দিরটির নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং এটি শেষ করতে এক শ' বছর সময় লাগে। ২৬২ খ্রিস্টাব্দে গথরা (জার্মান গোষ্ঠীভুক্ত জাতিবিশেষ) এটি পুড়িয়ে দেয় এবং ধ্বংস করে। মন্দিরটি আবার তৈরি হয়। কিন্তু রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াস (Theodosius —আনু. ৩৪৬-৩৯৫ খ্রি.) এটি চিরতরে বন্ধ করে দেন। ৭. মোসলিয়াম (Mausoleum)—কারিয়া (Caria) নামক স্থানে রাজা মোসলাস (Mausolus)-এর স্মৃতির সম্মানে নির্মিত সুদৃশ্য সমাধিসৌধ (৩৫৩ খ্রি. পূ.)। এটি এশিয়া মাইনরের হ্যালিকার্নাসাস (Halicarnassus)—এ তৈরি করেছিলেন মোসলাসের স্ত্রী আর্টেমিসিয়া (Artemisia)। রাজার নাম অনুসারে সমাধিসৌধটির নাম হয়েছে মোসলিয়াম এবং এটি ১৪০ ফুট উঁচু ছিল।।

উপরিউক্ত সাতটি আশ্চর্য জিনিসের সঙ্গে 'চীনের মহাপ্রাচীর' (নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল খ্রি. পূ. ২১৫ অব্দে), সম্রাট শাহজাহান (দ্র)নির্মিত আগ্রার 'তাজমহল' (দ্র) এবং নিউ-ইয়র্ক পোতাশ্রয়ে স্থাপিত 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি (Statue of Liberty)-র নামও যোগ করতে হয়।

শা. হ.

সফ্‌ট্‌ওয়্যার কম্পিউটার দ্র

সবাক চলচিত্র চলচ্চিত্র দ্র

সবুজ নিশান শিশু -কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

সবুজ পাতা শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

সবুজ সেনা শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

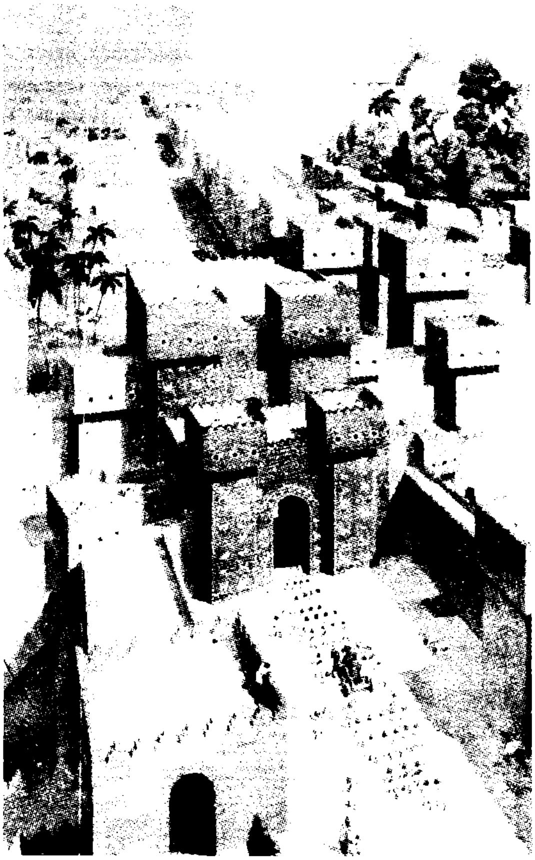

ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

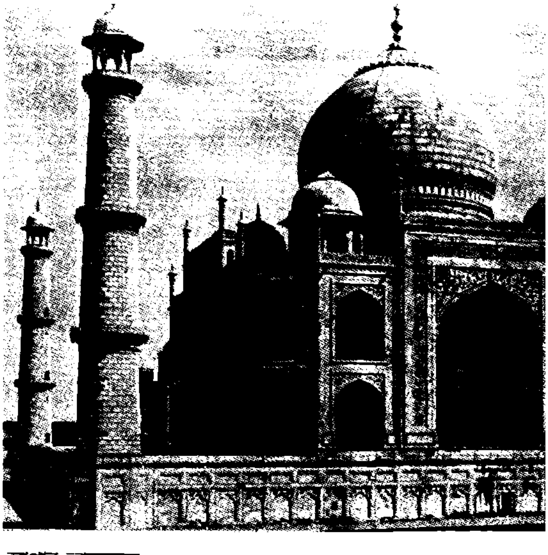

আগ্রার তাজমহল

www.pathagar.com

সবুজপত্র প্রমথ চৌধুরী দ্র
সমকাল সিকান্দার আবু জাফর দ্র

সময়

সময়ের কখন শুরু আর কখন শেষ তা নিয়ে মানুষ ভাবছে বহুকাল থেকে। মহাবিশ্বের (দ্র) যখন শুরু তখন থেকেই সময়েরও শুরু।

কোন ঘটনা কত আগে, আর কোন ঘটনা কত পরে ঘটেছে তা নির্ধারণ করার জন্য আমরা সময়কে মোটামুটিভাবে ভাগ করে নিই—যার নাম হচ্ছে বছর, মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিট ইত্যাদি। সব দেশের হিসাবের মধ্যেই এককগুলো আছে। দিন ও রাত মিলে যে সময় হয় তাই দিন।

সুবিধার জন্য দিনকে আবার ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়। এ ভাগের হিসাব সব দেশে এক রকম নয়। ভারতে প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হিসাব অনুযায়ী—

৬০ অনুপলে	১ বিপল
৬০ বিপলে	১ পল
৬০ পলে	১ দণ্ড
৬০ দণ্ডে	১ দিন

কিন্তু ইউরোপীয় হিসাবে—

৬০ সেকেণ্ডে	১ মিনিট
৬০ মিনিটে	১ ঘণ্টা
২৪ ঘণ্টায়	১ দিন

দিনের মাপটা সব দেশেই এক। পৃথিবীর নিজ মেরু-রেখায় বা অক্ষে (দ্র) এক বার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। এই সময়কে সৌরদিন বলে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, দিন কখন আরম্ভ হয় ?

তিন-চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনিয়ার পণ্ডিতেরা মনে করতেন ভোর হলেই নতুন দিন আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহুদি আর গ্রিকেরা দিনের আরম্ভ ধরত সূর্যাস্ত থেকে, অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে। আর রোমানেরা ধরে নিল, মাঝরাত থেকে দিন শুরু হয়। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশই এই রোমান পঞ্জিকার নিয়ম মেনে নিয়েছে। এই নিয়মে আমাদের দেশেও রেলের সময়-সূচিতে রাত বারোটাকে লেখে শূন্য দিয়ে। ০২ অর্থ রাত ২টা। ১৩ ঘণ্টা লিখলে বুঝতে হবে দুপুর ১ টা। এই ভাবে ১৬, ২০, ২৩ হয়ে রাত বারোটা হল ২৪ অথবা ০ (শূন্য)।

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময়ের একক হিসাবে যথাক্রমে কিলোগ্রাম, মিটার ও সেকেণ্ড ব্যবহার করা হয়। ১৯৬৩ সালের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেকেণ্ডের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। ১৯০০ সালের বছরটিকে আদর্শ বছর ধরে তার $\frac{১}{১,৩১৬৫৬৯২৫·৯৭৪৭}$ অংশকে এক আদর্শ সেকেণ্ড হিসাবে ধরা হয়। বর্তমানে সিজিয়াম পরমাণুর কম্পাঙ্কের (দ্র) ভিত্তিতে আদর্শ সেকেণ্ডের মান নির্ধারিত হয়েছে।

মু. এ.

সমর সেন [১৯১৬—১৯৮৭]

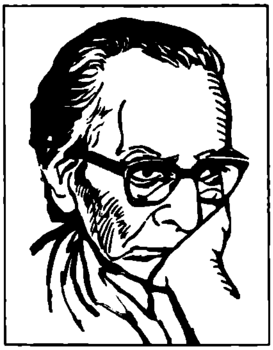

সমর সেন অতি আধুনিক বাংলা কবিতার এক জন বড় কবি। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের (দ্র) নাতি। দীনেশ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণচন্দ্র সেন ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান সমর সেন। তিনি ১৯১৬ সালের ১০ই অক্টোবর কলিকাতায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম ছিল 'খোকা'। ছোটবেলা থেকেই সমর সেন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৩২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৩৮ সালে এম. এ.-তেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ইংরেজিতে তিনি বরাবরই ভাল ছিলেন। বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় ইংরেজিতে উৎকৃষ্ট ফলের জন্য তিনি বিশেষ পুরস্কার পান। এম. এ. পাশ করে তিনি একটি মফস্বল কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। তারপর দিল্লির (দ্র) একটি কলেজে চাকুরি নিয়ে তিনি চলে যান। সেখানেই বিয়ে করেন ১৯৪১ সালে। স্ত্রীর নাম সুলেখা। এক সময় কলেজের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তিনি দিল্লির আকাশবাণী (দ্র) কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে কলিকাতা ফিরে এসে তিনি বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এর সাংবাদিকরূপে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি মস্কো (দ্র) যান বিদেশী

www.pathagar.com

ভাষা প্রকাশনালয়ে চাকুরি নিয়ে। সেখানে অনুবাদের কাজ করেন এবং গোর্কির (দ্র) নাটক, তল্‌স্তোয় (দ্র) ও চেখফের (দ্র) গল্পের অনুবাদ করেন। মস্কোতে বছর চারেক কাজ করে ১৯৬১ সালে তিনি আবার কলিকাতা চলে আসেন এবং একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ নেন। অল্পদিন এ চাকুরি করে ১৯৬২ সালে তিনি 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় যোগ দেন এবং ১৯৬৪ সালে এ পত্রিকাও ছেড়ে দেন। তারপর বিখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ হুমায়ুন কবিরের (দ্র) 'নাউ' (Now) পত্রিকার সম্পাদক হন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় তিনি 'নাউ' পত্রিকা ছেড়ে দেন এবং ১৯৬৮ সালে 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই পত্রিকার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। সমর সেনের চাকুরিজীবন যে সুস্থির ছিল না সেটি বোঝা যায়। তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর নিজের মত ও আদর্শ ছিল। ১৯৮৭ সালের ২৩শে আগস্ট কলিকাতার এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সমর সেন সাংবাদিকতা পেশায় জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন। তবে এক সময় কবিতা লেখা ছিল তাঁর নেশা। অল্প বয়সেই কবি হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেন এবং স্বীকৃতি পান। স্কুলে-কলেজে পড়ার সময়ই তিনি ভাল কবিতা লিখেছেন। ১৯৩৩-এ তাঁর প্রথম কবিতা 'তুমি ও আমি' 'শ্রীহর্ষ' নামক একটি পত্রিকায় বের হয়। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় আধুনিক বাংলা কবিতার একটি বিখ্যাত পত্রিকা বুদ্ধদেব বসু (দ্র) সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন আধুনিক কবিদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি সমর সেনকে 'কবিতা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিয়োগ করেন। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যাতেই সমর সেনের কবিতা প্রকাশিত হয়। এ-কবিতার জন্য সমর সেন প্রশংসিত হন। এমনকি লণ্ডনের এক সুবিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকাতেও তাঁর প্রশংসা করা হয়। পরে রবীন্দ্রনাথও (দ্র) তাঁর প্রশংসা করেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে দেন। আসলে অল্প বয়স থেকেই সমর সেন এক জন পাকা কবি। তাঁর কবিতার ভাষা ও ভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আধুনিক গদ্যছন্দে কবিতা লিখেছেন এবং গদ্যের শব্দ ব্যবহার করে কবিতায় নতুনত্ব ও ভিন্ন স্বাদ আনেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক ধারার কবি ছিলেন। তিনি সাধারণ ও শোষিত মানুষের মুক্তি যেমন চেয়েছিলেন, তেমনি শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। তাঁকে 'নাগরিক কবি' বলা হয়। সমর সেন বেশি দিন কবিতা লেখেন নি। ১৯৪৭-৪৮-এর দিকে তিনি কবিতা লেখা এক রকম ছেড়েই দেন এবং সাংবাদিকতায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। বহু দিন কবিতা না লিখলেও এ কথা সত্য যে তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার এক জন প্রধান কবি। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ' (১৯৪০), 'নানা কথা' (১৯৪২), 'খোলা চিঠি' (১৯৪৩), 'তিনপুরুষ' (১৯৪৪)। 'বাবু বৃত্তান্ত' সমর সেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা, সমর সেনের সর্বশেষ বই। 'সমর সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা'ও প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো ছাড়া সমর সেনের অনেক ইংরেজি লেখা আছে।

আ. ক.

সমাজতন্ত্র

শব্দটি ইংরেজি socialism শব্দের পরিভাষা হিসাবে বাংলায় চালু হয়েছে। আমরা socialist শব্দের বাংলা করি—সমাজতন্ত্রী, সমাজতান্ত্রিক।

'সমাজতন্ত্র' হল সমাজ, শ্রেণী, রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়ে এক আদর্শগত ধারণা। এর জন্ম উনিশ শতকে নয়, আরো আগে। ১৫শ-১৬শ শতকেই পণ্ডিতেরা সামাজিক শোষণের প্রকৃত কারণ হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে শনাক্ত করেছিলেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ব্যক্তিগত মালিকানায় কোনো সম্পত্তি থাকবে না; সম্পদের মালিক হবে সমাজ, অর্থাৎ সমবেতভাবে সকলে; সকলের জন্য শ্রমের সমান অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে; সম্পদের সমবণ্টন হবে। এ রকম সমাজেই মানুষ সবচেয়ে ভালভাবে, আত্মমর্যাদার সঙ্গে বাঁচবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন; কিন্তু ওরকম সমাজের অস্তিত্ব কোথাও ছিল না, তাই তাঁদের এই মতবাদকে 'ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজ্‌ম্' বা 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্র' বলা হয়ে থাকে। ইংরেজ দার্শনিক ও ধর্মবেত্তা টমাস মোর (দ্র) এই মতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা ছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঐ 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্র'

www.pathagar.com

মতবাদকেই তথ্য-যুক্তি-ব্যাখ্যা ইত্যাদি দ্বারা বাস্তবতাভিত্তিক মতবাদে রূপান্তরের চেষ্টা চলে। সংক্ষেপে, 'সমাজতন্ত্র' অর্থ এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন ও বণ্টন হবে যৌথ (অর্থাৎ সমাজের সকলের) মালিকানার ভিত্তিতে; এবং সাম্যবাদে যাওয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে সমাজতন্ত্র।

কলকারখানা ও জমি হচ্ছে রাষ্ট্রের উৎপাদনের উপায়। তার উপরে যৌথ মালিকানা দু'ভাবে কায়েম করা যেতে পারে: (১) রাষ্ট্রীয় মালিকানা; (২) সমবায়মূলক মালিকানা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণীশোষণের সম্ভাবনা থাকে না। উৎপাদনব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রশাসনে নিযুক্ত শ্রমজীবী জনতা সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি বিধান করে; ফলে, সেখানে জাতিগত ও শ্রেণীগত বৈষম্য থাকলে চলে না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফা ভোগকারী কোনো শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই সমাজের যে কোনো অংশের উন্নতি অপর অংশকেও উন্নতির দিকে চালিত করে। উপরন্তু, এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রাম ও শহরের ব্যবধান না বাড়িয়ে পরস্পরকে পরিপূরক আর্থিক ও সামাজিক অঞ্চল হিসাবে বিকাশের সুযোগ দেয়।

সমাজতন্ত্রে সৌভ্রাতৃত্বমূলক দু'টি প্রধান শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে: কারখানার শ্রমিক শ্রেণী এবং যৌথখামারের কৃষক শ্রেণী। বুদ্ধিজীবী নামে অন্য কোনো সুবিধাভোগী বিশেষ শ্রেণী সেখানে থাকে না। সেখানে শ্রমজীবী ব্যক্তিমাত্রেরই জীবিকার জন্য শ্রম করা, বিশ্রাম ও অবকাশ ভোগ, বৃদ্ধ বয়সে অবসর যাপনের নিশ্চয়তা থাকে। ব্যক্তিমাত্রেই রাষ্ট্রীয় খরচে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার ভোগ করে। সমাজের কোনো ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য থাকে না, উভয়েরই সমান অধিকার। দৈহিক ও মেধার ক্ষমতার ভিত্তিতে কাজ এবং কাজের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার প্রতিটি নাগরিকেরই।

জার শাসিত রুশ সাম্রাজ্যে ১৯১৭ সালে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এবং বিশ্বের প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হা. মা.

সমার্থশব্দকোষ

বিশেষ ধরনের অভিধান (দ্র)। অজানা শব্দের অর্থ জানতে সাহায্য করে যেসব সাধারণ অভিধান বা শব্দকোষ, তার সঙ্গে এর বেশ পার্থক্য রয়েছে। একটি শব্দের অর্থ, তার ভাব কিংবা বিষয় জানা থাকলেও লিখতে বসে কিংবা কথোপকথনের সময় সেটি মনে আসছে না, অথবা মনে এলেও যখন সেই একই শব্দের সম- অর্থ -প্রকাশক ভিন্ন বা বিকল্প শব্দের প্রয়োজন, তখনই হাতের কাছে এ জাতীয় অভিধান থাকা অতীব জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন, মনে করা যাক, 'অদক্ষতা' শব্দটি এক জনের জানা, কিন্তু তিনি এই শব্দটি তাঁর বাক্য বা বাক্যবন্ধে ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক; এই রকম মুহূর্তে তিনি অনায়াসে সাহায্য নিতে পারেন সমার্থশব্দকোষের।

শব্দের কিংবা বিষয়ের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত এ জাতীয় অভিধান খুঁজলে বিকল্প শব্দ সন্ধানী ব্যক্তি অনায়াসে পেয়ে যাবেন উল্লিখিত 'অদক্ষতা' শব্দের আরো একাধিক বা একগুচ্ছ পরপর সাজানো প্রতিশব্দ। যেমন—অদক্ষতা, অপটুতা, অক্ষমতা, অপারঙ্গমতা, অপারগতা, অনৈপুণ্য, অসামর্থ্য, অপটুত্ব, অনিপুণতা, অযোগ্যতা, অনুপযুক্ততা, অনুপযোগিতা, অনভিজ্ঞতা, অনভ্যস্ততা, অনভ্যাস, অসাধ্যতা, অচর্চা ইত্যাদি।

সমার্থশব্দকোষকে ইংরেজিতে বলা হয় 'থিসোরাস' (Thesaurus)। পিটার মার্ক রোজেট (১৯৭৯-১৮৬৯) ইংরেজি ভাষায় এ জাতীয় শব্দকোষ প্রথম সঙ্কলন ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন ১৮৫২ সালে। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় পরবর্তী কালে সমার্থশব্দকোষের জন্ম।

বাংলা ভাষায় এ জাতীয় কোষগ্রন্থ বা অভিধানের প্রচলন-ঘটনা খুব বেশি দিন আগের নয়। রোজেটের থিসোরাসের অনুকরণে বাংলায় প্রথম এ জাতীয় শব্দকোষ বা অভিধান প্রস্তুত ও সম্পাদনা করার কৃতিত্ব বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের। ১৯৭৪ সালে 'যথাশব্দ' নামের এই বাংলা থিসোরাসটি প্রকাশ করে বাংলা একাডেমী। কিছুকাল আগে (১৯৮৭) কলিকাতার সাহিত্যসংসদ প্রকাশ করেছে অশোক মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত একই জাতীয় শব্দকোষ বা অভিধান, নাম 'সংসদ সমার্থশব্দকোষ'। বাংলা ভাষায় এ রকমের প্রাথমিক উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রত্নমালা' (প্রকাশকাল ১৯৫৫)। সংস্কৃত

www.pathagar.com

ভাষায় 'পর্যায় শব্দকোষ'ও এ রকমের আরো একটি দৃষ্টান্ত, 'অমরকোষ (দ্র)' যার প্রধানতম পূর্বসূরি। 'মণিমঞ্জুষা' নামের একটি বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষও ১৯৮৬ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। থিসোরাস বা সমার্থশব্দকোষ হিসাবে বিবেচিত এর সঙ্কলক ও সম্পাদক কবি-অধ্যাপক ড. জগন্নাথ চক্রবর্তী।

আ. হ.

সমালোচনা-সাহিত্য

যে রচনায় কোনো সাহিত্যকর্ম বা সাহিত্যতত্ত্ব বা সাহিত্যধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন পরিবেশিত হয় তা-ই সমালোচনা-সাহিত্য। সমালোচনা-সাহিত্যের উদ্দেশ্য ত্রুটি অনুসন্ধান নয়, বরং বুদ্ধিদীপ্ত, দৃষ্টি-উন্মোচক ও সম্প্রসারক, নিরপেক্ষ সাহিত্যবিচার। সমালোচনা-সাহিত্যের সাহায্যে পাঠক সাহিত্যকর্ম উপভোগ ও বিচারের দিঙ্‌নির্দেশনা লাভ করতে পারেন।

সমালোচনার নানা শাখা ও পদ্ধতি আছে। তত্ত্বীয় সমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্যবিচারের জন্য কিছু মৌল নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা। এ ধারার প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রূপে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত গ্রিক পণ্ডিত আরিস্টোটলের (দ্র) পোয়েটিক্‌স্ বা কাব্যতত্ত্ব। তত্ত্বীয় সমালোচনা ছাড়াও ঐতিহাসিক সমালোচনা, মনস্তত্ত্বমূলক সমালোচনা, তুলনামূলক সমালোচনা, সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা প্রভৃতি নানা ধারার রচনা নিয়ে বর্তমানে এক বিশাল ও সমৃদ্ধ সমালোচনা-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে (দ্র) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু (দ্র), আবু সয়ীদ আইয়ুব ও মুনীর চৌধুরী (দ্র) প্রমুখ সমালোচনা-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ক. চৌ.

সমুদ্রগুপ্ত গুপ্তবংশ দ্র

সম্পাদনা

সংবাদপত্রে কিংবা পুস্তকাকারে ছাপা হবে এরকম যে কোনো ধরনের লেখা সম্পাদনার পরই কেবল মুদ্রণের (দ্র) জন্য পাঠানো হয়। আর এই গুরুদায়িত্বটি থাকে প্রধানত লিপি-পাঠক বা কপি-রীডারের ওপর। সাধারণভাবে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্বাহক, নিষ্পাদক বা প্রধান কর্মসচিবকেই সম্পাদক বলা হয়। তবে সংবাদপত্রাদির বেলায় লেখা সংক্রান্ত পরিচালক বা প্রধান লেখককেই সম্পাদক বলে। সংবাদপত্রের (দ্র) পরিচালন বা এডিটিং-এর দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত। দৈনিক পত্রিকার কার্যালয়ে তিনি কপি-ডেস্কে বা অশ্বখুরাকৃতি টেবিলের ধারে বসে থাকেন। ছোট পত্রিকায় অবশ্য এই ধরনের ডেস্ক নেই। এসব ক্ষেত্রে নগর-সম্পাদক বা অন্যান্য সম্পাদকেরা এ কাজ দেখাশোনা করেন। আধুনিক সংবাদপত্রে দু'টি সাধারণ রীতির যে কোনো একটি অনুসরণ করা হয়। যেমন—সর্বজনীন ডেস্ক-পদ্ধতি ও স্বাধীন ডেস্ক-পদ্ধতি। পদ্ধতি যাই হোক, সম্পাদনার কাজ একই ধারায় এগিয়ে চলে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংবাদ-কাহিনী ইংরেজিতে 'শ্লটম্যান' বলে পরিচিত এক জন সাংবাদিকের কাছে যায়। এই সম্পাদক বা বার্তাসম্পাদক দ্রুত সংবাদ-লিপিগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে তার তুলনামূলক গুরুত্ব বিচার করে সংবাদলিপি কাগজের মুদ্রিত পৃষ্ঠার কতটুকু স্থান দখল করবে, তা নির্ধারণ করেন। সংবাদলিপি-পাঠকের দু'টি কাজ। এক, সংবাদ-কাহিনীর সম্পাদনা; এবং দুই, সংবাদ-কাহিনীর জন্য উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া। এ তো গেল দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদনার রূপরেখা। সাময়িকপত্র সম্পাদনার ব্যাপারটা অন্য রকম। দৈনিক পত্রিকায় এক জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী প্রাপ্ত সকল সংবাদখণ্ড বাছাই করেন। তারপর এক বিরাট শব্দসম্ভার কাটছাঁট ও সেসবের প্রয়োজন বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো রেখে খবরের বোঝা যথাসম্ভব হালকা করে প্রয়োজনীয় সংবাদখণ্ড বেছে নেন। কিন্তু সাময়িকীতে এরকম কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। সাময়িকী দৈনিক সংবাদপত্র, বেতার বা টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না এবং প্রকৃতপক্ষে সে ঐসব মাধ্যমের প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়। এর কারণ, সাময়িকপত্র একটা লম্বা সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া সংবাদ প্রকাশ সাময়িকীর আওতায় পড়ে না। সাময়িকী সম্পাদককে প্রকাশনার অন্যান্য দিক, বিশেষ করে মুদ্রণ সংক্রান্ত কারিগরী জ্ঞানও রাখতে হবে। সাময়িকপত্রিকা সম্পাদনা দক্ষতাপূর্ণ ও সৃষ্টিধর্মী কাজ। সঠিক বিষয়বস্তু ও লেখক বাছাই, কার্যকর শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম রচনা, উপযুক্ত ছবি ও সামগ্রিক পরিকল্পনার বিষয়ে সম্পাদকের সৃজনশীল

www.pathagar.com

মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে হবে। একটি নিবন্ধ বা গল্পকে বিশেষভাবে, বিশেষ করে উপস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদক পাঠকের মনকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়ে আকৃষ্ট করতে পারেন কিংবা পাঠকমনে ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য পাঠকের মনকে তৈরি করে নিতে পারেন। সম্পাদক যদি পরিণত ও সুষম মনের অধিকারী হন, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে চিন্তা করতে থাকেন, মন যদি তাঁর সংস্কারমুক্ত হয় এবং প্রতিভা আবিষ্কারের অনুসন্ধানী শক্তি যদি তিনি গড়ে তুলতে পারেন, তা হলেই কেবল তিনি সাফল্যের সঙ্গে এ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

আ. কা.

সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন প্যারাফিন দ্র

সয়াবিন (soybean/soyabean)

মটরশুঁটি (দ্র) জাতীয় একটি ফসল। এর বীজ অত্যন্ত পুষ্টিগুণ-সমৃদ্ধ। এটি ভোজ্য তেলের প্রধান উৎস। এ ছাড়াও এই বীজ থেকে পনির, দই, সয়ামিল্ক এবং বিভিন্ন ধরনের সস্ (sauce) উৎপাদন করা হয়। গ্লিসারিন (দ্র), রঙ, সাবান (দ্র), লাইনোলিয়াম, রাবার-বিকল্প, প্লাস্টিক (দ্র) ও মুদ্রণের কালি ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সয়াবিন একটি অপরিহার্য উপাদান। কাঁচা সয়াবিন গাছ গবাদি পশুর খুব প্রিয় খাদ্য। এর শুকনো খড় জমির উর্বরতা বাড়ায়।

সয়াবিন গাছ ৩০ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার বা ১ থেকে ৩ ফুটের মতো উঁচু হয়। এর শেকড়গুচ্ছ মাটির এক মিটার নিচে পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। এর ডালে ডালে তিনটি করে ছোট পাতা একসঙ্গে ডিমের আকার নিয়ে বড় হয়ে ওঠে। গাছের কাণ্ডে ফুল (দ্র) আসে। ফুল সচরাচর সাদা, গোলাপি ও বেগুনি রঙের হয়ে থাকে। ফুলই ক্রমে শিম্বাকার হয়ে ৫ সেন্টিমিটার বা ২ ইঞ্চির মতো লম্বা হয়। এর মধ্যেই বীজ থাকে। একটি খোসায় সর্বোচ্চ তিনটি পর্যন্ত বীজ জন্মে। আসলে এই বীজগুলোকেই সয়াবিন বলা হয়।

সয়াবিনকে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার আঙুর জাতীয় উদ্ভিদ *গ্লাইসিন্ ইউসুরিয়েন্সিস (glycine ussuriensis)*-এর বংশধর বলে মনে করা হয়। সয়াবিনের জন্ম চীন (দ্র) দেশে। আধুনিক যুগের আগে সয়াবিন চীন থেকে এশিয়ার (দ্র) বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) সয়াবিনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং চাষাবাদ শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর মোট সয়াবিন উৎপাদনের ৫৫% থেকে ৬০% ভাগ উৎপাদন করে। অন্য দুই প্রধান সয়াবিন উৎপাদনকারী দেশ হল চীন এবং ব্রাজিল। তবে এখন সারা পৃথিবীতে সয়াবিনের চাষ হয়।

সয়াবিনের উচ্চ পুষ্টিমূল্য এবং স্বল্প উৎপাদনব্যয়ের কারণে এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাংসের বিকল্প পুষ্টির জন্যও এখন অনেক ক্ষেত্রে সয়াবিন ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে সয়াবিন মানুষের অধিকাংশ খাদ্যের প্রধান উপাদানে পরিণত হবে।

সুজ. ব.

সরদার জয়েনউদ্‌দীন [১৯১৮—১৯৮৬]

কথাসাহিত্যিক। তাঁর প্রকৃত নাম মুহম্মদ জয়েনউদ্‌দীন বিশ্বাস। কলমী ছদ্মনাম গ্রহণ করেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন। তিনি ১৯১৮ সালে পাবনা জেলার সুজানগর থানার অন্তর্গত কামারহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী তাহেরউদ্দিন বিশ্বাস।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের বিশেষ সুযোগ ঘটে নি। অল্প বয়সে জীবিকার অন্বেষণে তিনি কলিকাতা (দ্র) গমন করেন। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় হাবিলদার হিসাবে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনি সেনাবাহিনীর চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় (দ্র) চলে আসেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য বহু বিচিত্র পেশায় নিয়োজিত হন।

প্রথম দিকে কিছুদিন স্লেট তৈরির ব্যবসায় ও ক্যান্টনমেন্টে মালপত্র সরবরাহের কাজ করার পর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সরদার জয়েনউদ্‌দীন 'দৈনিক

www.pathagar.com

পাকিস্তান' ও ইংরেজি 'অবজারভার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগে সহকারী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার বিজ্ঞাপন ম্যানেজার পদে যোগ দেন। ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি 'শাহীন'(দ্র) ও 'সিতারা' (দ্র) নামে শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশিত দু'টি পাক্ষিক সাহিত্যপত্রিকায় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ সালে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার ও ১৯৫৯ সালে 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি ইস্টার্ন ফেডারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে ইন্সপেক্টর পদে যোগ দেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সহকারী প্রকাশন অফিসার হিসাবে বাংলা একাডেমীতে (দ্র) কাজ করার পর ১৯৬৪ সালে রিসার্চ অফিসার হিসাবে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান'-এ যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী পরিচালক পদে উন্নীত হন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ (দ্র) স্বাধীন হওয়ার পর 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান'-এর নাম হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ'। ১৯৭২ সালে সরদার জয়েনউদ্‌দীন এর পরিচালক নিযুক্ত হন। পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে প্রকাশিত যাবতীয় বইয়ের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলেন। দেশের মানুষের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও বইকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বইমেলা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েই বই বিপণন ও প্রকাশনাসহ বইয়ের জগতের তথ্য সংবলিত 'বই' শিরোনামের পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশনা শুরু হয়। ১৯৭৮ সালে তিনি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে টেক্সট বুক বোর্ডে বদলি হন। ১৯৮০ সালে তিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন বড়দের পাঠ্য ও শিশু-কিশোর পাঠ্য উভয় ধরনের রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি গ্রামকে দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। তাই তাঁর সাহিত্যে গ্রাম ও গ্রামের মানুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হল—উপন্যাস : 'আদিগন্ত', 'পান্নামতি', 'অনেক সূর্যের আশা', 'বেগম শেফালী মির্জা', 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ', 'শ্রীমতি ক ও খ এবং শ্রীমান তালেবালি'; ছোটগল্প : 'নয়ানঢুলী', 'বীরকণ্ঠির বিয়ে', 'খরস্রোত', 'অষ্টপ্রহর', 'বেলা ব্যানার্জীর প্রেম'; শিশুসাহিত্য: 'অবাক অভিযান', 'উল্টো রাজার দেশ', 'টুকুর ভূগোল পাঠ', 'আমরা তোমাদের ভুলব না'। তিনি বেশ কিছু ছড়াও রচনা করেন।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস 'অনেক সূর্যের আশা'। পাকিস্তান আন্দোলন (দ্র) নিয়ে লেখা এই উপন্যাস শেষ হয়েছে একটি আশাব্যঞ্জক বর্ণনার মধ্য দিয়ে—কলিকাতা থেকে নতুন আশায় বুক বেঁধে নতুন দেশে উদ্বাস্তু আসছে। কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনায় মানুষের সেই আশা ভঙ্গ হয়। ফলে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনতে হয় স্বাধীনতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ (দ্র) নিয়েও সরদার জয়েনউদ্‌দীন প্রচুর লিখেছেন। তার মধ্যে বড়দের জন্য 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' আর ছোটদের জন্য 'আমরা তোমাদের ভুলব না' বই দু'টির নাম উল্লেখযোগ্য। 'আমরা তোমাদের ভুলব না' কিশোর-উপন্যাসটি বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর (দ্র) প্রযোজনায় চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া হয়েছে।

উপন্যাস-সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য সরদার জয়েনউদ্‌দীন ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) ও আদমজী সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৮২ সালে অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

১৯৮৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর সরদার জয়েনউদ্‌দীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুজ. ব.

সরস্বতী

(১) বিদ্যার দেবী। সরস্বতী দেবীর বর্ণ চন্দ্রের কিরণের মতো শুভ্র। তাঁর হাতে আছে বীণা ও পুস্তক। হংস তাঁর বাহন। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর পূজা করা হয়। দুর্গা প্রতিমায় দুর্গার একপাশে সরস্বতীর অবস্থান।

(২) প্রাচীন ভারতে সরস্বতী নামে একটি নদী ছিল; এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। এই নদী দেবী রূপে দেশকে উর্বরা করেন এবং জলকে পবিত্র করেন। এর তীরে নানা শাস্ত্রের রচয়িতা ও প্রবক্তা ঋষিরা বাস করতেন। তাই বলা হত,

www.pathagar.com

এখানে বাক্‌ অর্থাৎ কথা ও বিদ্যার দেবী বাস করেন।

(৩) বেদ-এ সরস্বতী এক জ্যোতির্ময়ী দেবী।

পরবর্তী কালে সরস্বতী নদী, বাক্‌ ও জ্যোতির দেবী এক হয়ে গেছেন এবং বিদ্যার দেবীরূপে পূজিত হচ্ছেন।

নি. অ.

সরিষা / সরষে / সর্ষে

ক্রুসিফেরি (cruciferae) পরিবারভুক্ত বর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সরিষা বা সর্ষে চাষ করা হয়। এর কয়েকটি প্রজাতি নিম্নরূপ :

১. *ব্রাসিকা নাইগ্রা (Brassica nigra) :* কালো সরিষা,

২. *ব্রাসিকা আলবা (Brassica alba) :* সাদা সরিষা,

৩. *ব্রাসিকা ন্যাপাস (Brassica napus) :* রাই সরিষা,

৪. *ব্রাসিকা জান্সিয়া (Brassica jancea) :* দেশী সরিষা।

সর্ষে গাছ সাধারণত ১ মিটার উঁচু হয়ে থাকে, তবে রাই সর্ষের গাছ প্রায় ২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।

সর্ষের তেল রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া শরীরে, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের গায়ে মাখার জন্য এ তেল ব্যবহার করা হয়। কলকব্জার ক্ষয় নিবারণ এবং প্রদীপ জ্বালানোর কাজে সরিষার তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ তেলের রঙ বাদামি হরিদ্রাভ। রাই সরিষায় শতকরা ২১-২৮ ভাগ এবং সরিষায় শতকরা ৩৩ ভাগ তেল থাকে। রাই সরিষার তেলে গ্লুকোসাইড থাকায় তা বেশি ঝাঁঝালো হয়ে থাকে। রাইয়ের তেলে বিদ্যমান গ্লুকোসাইড ভেঙে ঝাঁঝালো উদ্বায়ী তেল তৈরি করা হয়। সরিষার তেলে ক্ষতিকারক কিউরাসিক অ্যাসিড থাকায় তা বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত সরিষার প্রধান জাত হচ্ছে টরি-৭, রাই-৫ ও কল্যাণীয়া। উন্নত জাতের সরিষার মধ্যে সোনালি সরিষা (এম এস-৭৫), সম্বল, সম্পদ, দৌলত ও ন্যাপ-৩ উল্লেখযোগ্য।

সরিষার ডিম্বাকৃতি ও কিছুটা ঢেউ খেলানো পাতা শাক হিসাবে রান্না করে খাওয়া হয়।

মু. আ.

সরীসৃপ (reptiles)

সরীসৃপ শীতল রক্তবিশিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণী। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে উভচর প্রাণী থেকে এদের উৎপত্তি। এরা পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষত উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করে। স্থল, জল (মিঠা ও লোনা) সবখানেই এর দেখা মেলে। ডাইনোসর (দ্র) এবং ডাইনোসর জাতীয় প্রাণীরা বিলুপ্ত সরীসৃপ। সরীসৃপের জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৬,০০০। তন্মধ্যে প্রায় ৩,০০০ প্রজাতির গিরগিটি, ২,৭০০ প্রজাতির সাপ, ১৪০ প্রজাতির পোকা-গিরগিটি, ২০০ প্রজাতির কচ্ছপ (দ্র), ২০ প্রজাতির কুমির (দ্র) ও এক প্রজাতির টুয়াটারা রয়েছে। বাংলাদেশে ১২০-১২৫ প্রজাতির বাস।

দেহ-গঠনে এদের অবস্থান উভচর, পাখি (দ্র) ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের (দ্র) মাঝামাঝি। দেহ শুষ্ক আঁশে আবৃত। কচ্ছপের পিঠে শক্ত চামড়ার (plate) খোলস থাকে। এরা ফুসফুসের (দ্র)মাধ্যমে শ্বাসকার্য চালায়। তবে, কচ্ছপের ক্ষেত্রে পায়ু-শ্বসনও দেখা যায়। সরীসৃপের দেহে লোম, পালক বা স্তনগ্রন্থি নেই। সাপ বাদে প্রায় সব প্রজাতিরই চারটি করে পা। কুমির বাদে বাকিদের হৃৎপিণ্ডের (দ্র) নিলয় অসম্পূর্ণভাবে দ্বিধাবিভক্ত। লোহিত রক্তকণিকা ডিম্বাকৃতির ও নিউক্লিয়াসযুক্ত। প্রায় সব প্রজাতিরই লেজ থাকে। পা-যুক্ত সরীসৃপদের আঙুল ও নখর থাকে।

প্রজাতিভেদে আকৃতি ও বর্ণে অনেক পার্থক্য থাকে। কোনো কোনো প্রজাতি ময়লা, অনুজ্জ্বল; অন্যরা উজ্জ্বল রঙের। এক ধরনের টিকটিকি (Gecko) ক্ষুদ্রতম প্রজাতি, মাত্র ২·৫ সেন্টিমিটার। অজগর (অ্যানাকোন্দা ও গোলবাহার) বৃহত্তম, প্রায় নয় মিটার। সামুদ্রিক লেদারব্যাক কচ্ছপ ওজনে প্রায় ৬৮০ কেজি।

জলে বাসকারীরা সাঁতার কাটতে পারে। স্থলবাসীরা হাঁটা-চলা, দৌড়ানো বা গাছে চড়তে পারে। সাপ এঁকেবেঁকে চলে। টিকটিকি (দ্র) ছাদের নিচের তলেও স্বচ্ছন্দে দৌড়াতে পারে। বেশির ভাগ প্রজাতিই শীতকালে ঘুমিয়ে থাকে।

সরীসৃপ সাধারণত নিজের আওতার মধ্যে মেলে এমন ছোট-বড় প্রাণী খায়। কোনো কোনো প্রজাতি নিজেদের বা অন্যদের ডিম, বাচ্চা খায়। কোনো কোনো গিরগিটি ও

www.pathagar.com

কচ্ছপ শুধু গাছ-পাতা খেয়েই বাঁচে।

এদের স্ত্রী-পুরুষ আলাদা। স্থলে-জলে যেখানেই বাস করুক না কেন ডিম-বাচ্চা স্থলেই দেয়। বেশিরভাগ প্রজাতিই ডিম পাড়ে।

কোনো কোনো প্রজাতি বাচ্চা দেয়। সরীসৃপের ডিমের গঠন পাখিদের থেকে আলাদা। প্রজাতিভেদে স্ত্রী-সরীসৃপ গাছের খোড়লে, মাটি খুঁড়ে, লতা-পাতা জড়ো করে তাতে ২ থেকে ২০০টি ডিম পাড়ে। এরা ডিমে তা দেয় না। নির্দিষ্ট সময় পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। সদ্য ফোটা বাচ্চারা স্বাবলম্বী। সারা জীবন এরা বৃদ্ধি পায়। তবে জীবনের প্রথমভাগে দ্রুত ও শেষভাগে ধীরে বাড়ে। সরীসৃপদের আয়ু বেশি। কোনো কোনো কুমির ও কচ্ছপ প্রজাতি ১০০-১২৫ বছর বাঁচে।

বেশিরভাগ মানুষই সরীসৃপদের ভয় পায়। কিন্তু, মাত্র অল্প ক'টি প্রজাতিই মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। এরা সাধারণত মানুষকে এড়িয়ে চলে। তবে মানুষই এদের প্রধান শত্রু।

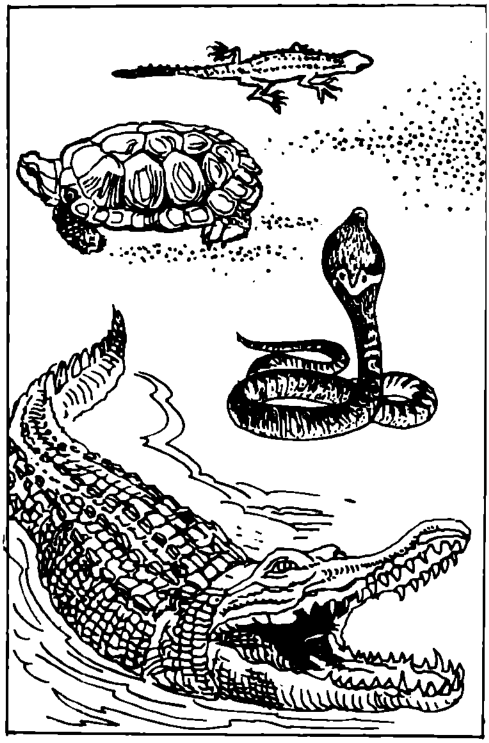

ডানে উপরে: সরীসৃপ শ্রেণী: ১. কচ্ছপবর্গ, ২. স্পেনোডনবর্গ (টুয়াটারা গিরগিটি) ৩. টিকটিকি ও সাপবর্গ, ৪. কুমিরবর্গ নিচে: কোমোডো ড্রাগন—ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে দেখা যায়। বাংলাদেশের গুই সাপের মতো দেখতে হলেও আকারে গুই সাপের চেয়ে অনেক বড়

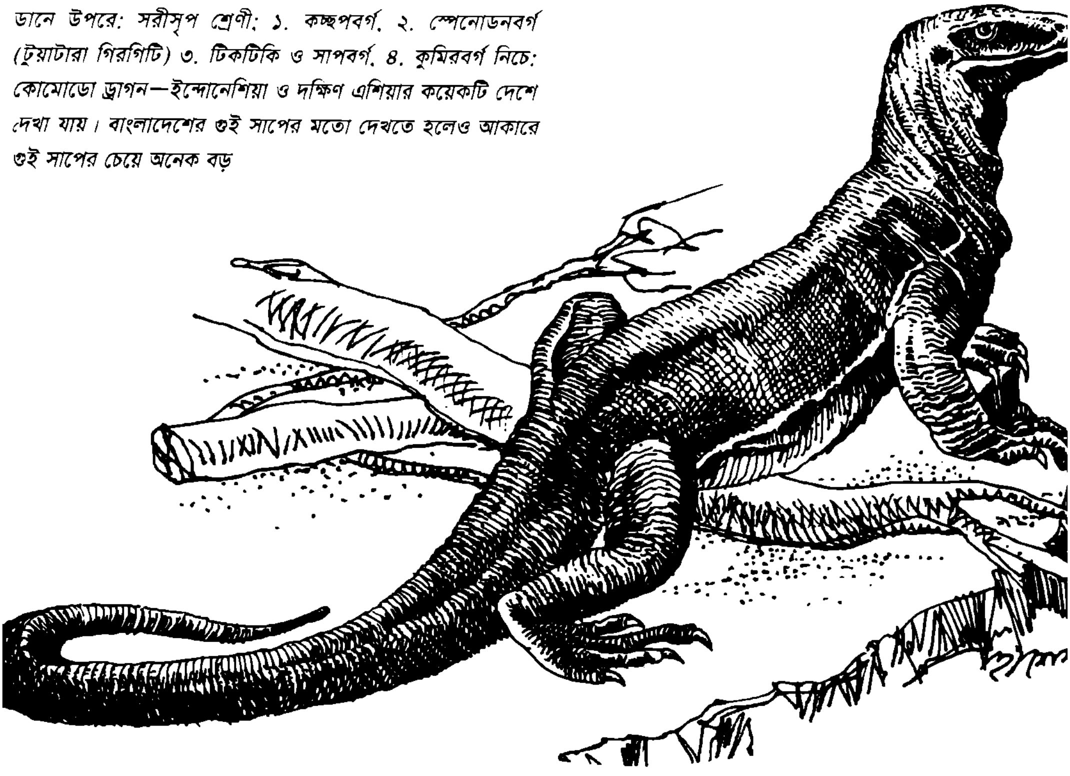

www.pathagar.com

পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই মানুষ এদের ডিম ও মাংস খায়। ডিম-মাংসের জন্য নির্বিবাদে হত্যার কারণে অনেক প্রজাতির সরীসৃপই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আ. ন. ম. আ. র.

তক্ষক

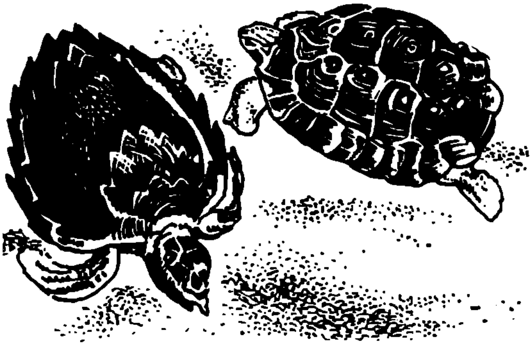

উপরে: মানুষের হাতের তালুতে টুয়াটারা এবং নিচে : কাছিম ও কচ্ছপ

সরোদ

সঙ্গীতযন্ত্র। তারে নির্মিত প্রধান শাস্ত্রীয় সঙ্গীতযন্ত্র। প্রাচীন রবাবের উৎকর্ষ সাধন করে সারোদ নির্মাণ করা হয়। সরোদের অবয়ব বা লকড়ি কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত। চার থেকে সাড়ে চার ফুট লম্বা একটি কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নাংশ গোলাকৃতি

খোলের মতো করে খোদাই করে এবং উপরিভাগ ফাঁপা দণ্ডের মতো করে এর অবয়ব গঠন করা হয়। নিম্ন প্রান্তের খোলটি চর্মাচ্ছাদিত হয় ও তার ওপর একটি সওয়ারি বা ব্রিজ বসানো হয়। দণ্ডের ওপরের প্রান্তে থাকে তারগহন বা তার বাঁধার স্থান। সেখানে চাবির সঙ্গে প্রধান তারসমূহ আবদ্ধ করা হয় এবং সেগুলোকে লম্বালম্বি সওয়ারির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে নিম্ন-প্রান্তে বা মেরুতে বাঁধা হয়। এ ছাড়া থাকে তরপের তার। সেগুলো পটরীর পাশ দিয়ে ছোট ছোট চাবির সাহায্যে যুক্ত হয়ে সওয়ারির ভেতর দিয়ে নিচের মেরুতে বাঁধা পড়ে। সরোদের প্রধান তার আটটি, চিকারির তার দু'টি, তরপের তার এগারোটি বা পনেরোটি। সরোদ পর্দাহীন। এর পটরী লোহার পাতে মোড়ানো থাকে। সরোদের স্বরসপ্তকক্রম বেশ প্রশস্ত। এতে সাড়ে চার সপ্তক

www.pathagar.com

পর্যন্ত ধ্বনিত করা যায়। সরোদের দণ্ডের ওপরের প্রান্তে লাউয়ের তুম্বা যুক্ত হয়ে থাকে। বাম হাতের আঙুলে তার টিপে ডান হাতে জবা দিয়ে টোকা দিয়ে সরোদ বাজানো হয়। সরোদের ধ্বনি যেমন মিষ্টি ও প্রবল তেমনি গাম্ভীর্যপূর্ণ।

ক. গো.

সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা

জাতি-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ (দ্র) সাধারণ পরিষদে গৃহীত নীতিমালাই সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা। এটি গৃহীত হবার দু' বছর পর (১৯৫০) সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখটি 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস' হিসাবে বিশ্বের সর্বত্র পালিত হবে।

এই ঘোষণার মূল কথা : প্রতিটি মানুষের নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতার নিশ্চয়তা; যে কোনো প্রকার নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি; আইনে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দান ও নির্বিচার গ্রেফতার থেকে অব্যাহতি লাভ; স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালে ন্যায়বিচার লাভ ও অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নির্দোষ হিসাবে গণ্য হওয়ার অধিকার; চলাচলের স্বাধীনতা; চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা; নিজস্ব মতামত গঠন ও তা প্রকাশ করা এবং সমাবেশে মিলিত হওয়ার অধিকার। এর ২২ থেকে ২৭ অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের, কর্মসংস্থান ও অবসর যাপনের, স্বাস্থ্যরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার উপযোগী জীবনযাত্রার মান অর্জনের, শিক্ষালাভের ও সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনধারায় অংশগ্রহণের অধিকারের কথাও বলা হয়েছে।

আ. হ.

সলিমুল্লাহ, নওয়াব [১৮৭১—১৯১৫]

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ (১৮৭১—১৯১৫) ব্রিটিশ-বঙ্গের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী। ঢাকার নওয়াব পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামহ নওয়াব আবদুল গনি ও পিতা নওয়াব খাজা আহসানউল্লাহ।

সলিমুল্লাহ্ পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের হাতে স্থানীয় শাসন-ক্ষমতা আনার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের জন্য ব্রিটিশ পরিকল্পনার সহযোগী ও সমর্থক হিসাবে কাজ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সেই পরিকল্পনারই ফসল। এর বিরুদ্ধে প্রধানত শিক্ষিত হিন্দু সমাজের ব্যাপক আন্দোলনের কারণে পরে বঙ্গবিভাগ রহিত করা হয় (১৯১১)।

তিনি ছিলেন ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের (All India Muslim League) অন্যতম রূপকার। পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলিম লীগেরও তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর চেষ্টা ও অবদান ছিল যথেষ্ট। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি জমি দান করেন। অবশ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯২১)।

সলিমুল্লাহ্ একাধিক মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ (দ্র), স্কুল-প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এতিম ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি এতিমখানা গড়ে তোলেন—বর্তমানে যা 'সলিমুল্লাহ্ মুসলিম এতিমখানা' নামে পরিচিত। ১৯১৫ সালের ১৬ই জানুয়ারি তিনি মাত্র ৪৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

সলিল চৌধুরী [১৯২৫—১৯৯৫]

সুবিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা ও গীতিকার। গণসঙ্গীত (দ্র) রচনায় অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। আসামে জন্ম। পিতা জ্ঞানেন্দ্রময় চৌধুরী। রাগসঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে অভিজ্ঞ পিতার কাছেই সলিল চৌধুরী সঙ্গীতে যথার্থ শিক্ষা লাভ করেন। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সঙ্গীতরচয়িতা হিসাবে তাঁর

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশ । সে ১৯৪৪ সালের কথা। এর কিছু পূর্বেই গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ঘটে (১৯৪৩)। দরিদ্র মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গান বিশেষ উদ্দীপনা জোগায়। আধুনিক বাংলা গানের বিকাশেও সলিল চৌধুরীর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহু অতি জনপ্রিয় আধুনিক গান রচনা করে তিনি এই গীতধারাকে সমৃদ্ধি ও উজ্জ্বলতা প্রদান করেন। সঙ্গীত রচনায় সলিল চৌধুরী একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তক। পাশ্চাত্য সঙ্গীতরীতির কুশলী প্রয়োগ ছিল তাঁর সঙ্গীত-রীতির একটি বিশেষ দিক। এ কালে আর কোনো বাঙালি সুরকার পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে এমন গভীর সৃজনশীল কাজ করেন নি। রাগসঙ্গীতেও তাঁর আগ্রহ ছিল অটুট। এই রীতিকেও তিনি নানাভাবে ভেঙে ব্যবহার করেছেন। সলিল চৌধুরী অত্যন্ত নিরীক্ষাপ্রিয় ছিলেন। সঙ্গীত রচনার নতুন নতুন ঢং গড়ে তুলতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। গায়ক হিসাবেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তবে তাঁর সর্বপ্রধান পরিচয় বাংলা গণসঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে। এই ধারার তিনি অন্যতম স্রষ্টা। মুক্তির সংগ্রাম তাঁর সঙ্গীতসাধনার কেন্দ্রীয় বিষয়। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামেও তাঁর গান গভীর প্রেরণা জোগায়। তিনি ১৯৯৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় (দ্র) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ক. গো.

সলোমন সুলাইমান, হযরত দ্র

সাইকেল চালনা (সাইক্লিং)

সাইকেল চালনা অর্থাৎ সাইক্লিং একটি ইউরোপীয় আবিষ্কার। ১৭৯০ সালে সম্ভবত ফরাসি দেশীয় কোনো ব্যক্তি এর ডিজাইন আবিষ্কার করেন। এই বেগবান যানটির হ্যাণ্ডেল ও প্যাডেল এক জন স্কটল্যাণ্ডবাসী কার্কপ্যাট্রিক ম্যাকমিলান কর্তৃক ১৮৩৪ সালে আবিষ্কৃত হয়। উনিশ শতকের শেষাংশে শৌখিন ও পেশাদারী সাইকেল চালনা বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৯৬ সালে প্রথম আধুনিক অলিম্পিক গেম্‌সে (দ্র) এটা অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি মূলত পুরুষদের খেলা। ১৯৫১ সালে এশিয়ান গেম্‌সেও (দ্র) এটি অন্তর্ভুক্তি পায়। সাইক্লিং প্রতিযোগিতা অনেক প্রকারের, যথা : সহিষ্ণুতার জন্য, লম্বা দূরত্বের জন্য, বেগের জন্য, দলগত, কম সময়ে নির্দিষ্ট দূরত্বের সাইকেল দৌড় ইত্যাদি বহু ধরনের সাইকেল রেস হয়ে থাকে। সাধারণ রেইসিং সাইকেলের ওজন ৮ কেজির

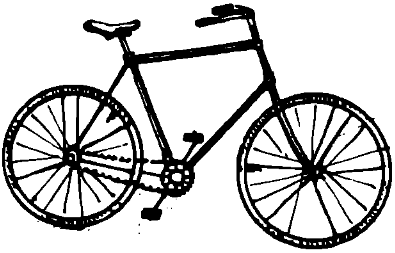

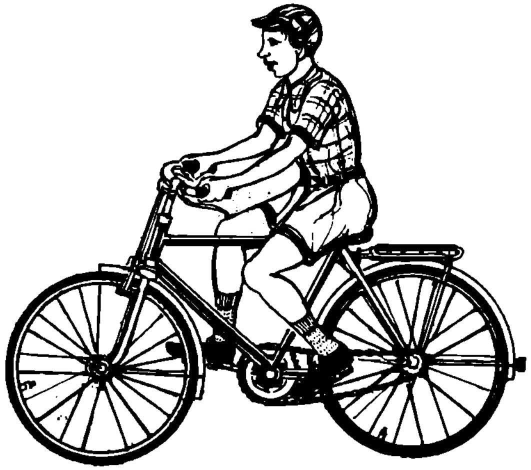

সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাইকেলেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে

www.pathagar.com

মতো হয়। ১৯০০ সালে আন্তর্জাতিক সাইক্লিং ফেডারেশন গঠিত হয়।

প্রতিযোগিতামূলক সাইকেল চালনার জন্য বিশেষ-ভাবে নির্মিত ৩৩৩.৩৩ মিটারের পেয়ালার আকৃতি ট্র্যাক বানানো হয়। এই ট্র্যাকের একটা ধার ২৫ ফুট উঁচু থাকে এবং ক্রমে নিচু হয়ে ধীরে ধীরে মাটিতে মিশে যায়। এই ধরনের সাইকেল চালনার ট্র্যাকের নাম ভেলোড্রোম (velodrome)। বাংলাদেশে (দ্র) কোনো ভেলোড্রোম নেই। ১০০ কিলোমিটারের রোড রেস ছাড়া অন্যান্য সব দূরত্বের সাইকেল চালনার প্রতিযোগিতা ভেলোড্রোমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ শৌখিন সাইকেল চালনা ফেডারেশন গঠিত হয়। সাইকেল চালনায় যেসব বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে তা হল :

১. ১,০০০ মিটার স্প্রিন্ট, ২. ১,০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল, ৩. ৪,০০০ মিটার ব্যক্তিগত পার্সুইট, ৪. ৪,০০০ মিটার দলগত পার্সুইট, ৫. ১০০ কিলোমিটার রোড টিম ট্রায়াল, ৬. ১৮৫ কিলোমিটার রোড মাস স্টার্ট, ৭. ৫০ কিলোমিটার পয়েন্ট রেস ইত্যাদি।

কা. আ. আ.

সাইক্লোট্রন (cyclotron)

চার্জ (দ্র) বিশিষ্ট পারমাণবিক কণিকাসমূহ, যেমন–প্রোটন (দ্র), ডয়টেরন, আলফা কণিকা (দ্র) ইত্যাদিকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন করে তোলার জটিল যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটনকে ১ কোটি ইলেক্ট্রন ভোল্ট-এর অধিক, ডয়টেরনকে ২ কোটি ইলেক্ট্রন ভোল্ট-এর অধিক এবং আলফা কণিকাকে প্রায় ৪ কোটি ইলেক্ট্রন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন করা যায়। এটি করা হয় কণিকাগুলিকে বায়ুশূন্য স্থানে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে অত্যধিক গতিশীল করার মাধ্যমে। এরূপ শক্তিসম্পন্ন দ্রুতগতির কণিকার আঘাতে পরমাণুর (দ্র) নিউক্লিয়াস ভেঙে ফেলা যায়। এভাবে সোডিয়াম প্রভৃতি পদার্থের নিউক্লিয়াস বিভাজনের ফলে সে পদার্থটি আবার তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থের সৃষ্টি হয়। বস্তুত সাইক্লোট্রন হচ্ছে নিউক্লীয় অ্যাক্সিলারেটর বা কণা-ত্বরণযন্ত্র।

নিউক্লীয় অ্যাক্সিলারেটর মূলত দু' ধরনের : ১. লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর; ২. সাইক্লোট্রন। লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটরে কণিকা সরলরৈখিক পথে পরিচালিত হয়। সাইক্লোট্রনে কণিকা চালিত হয় সর্পিল আকৃতির পথ দিয়ে। এ জন্য সাইক্লোট্রনে পরমাণু-কণিকাকে অধিক শক্তিসম্পন্ন ও গতিশীল করে তোলা যায়।

সু. ব.

সাইক্লোন (cyclone)

অল্প পরিসরে ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে পড়লে ঐ স্থানের বাতাস ওপরে উঠে যায়। ফলে সেখানে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ঐ নিম্নচাপ-কেন্দ্রের দিকে চারদিক হতে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবল বেগে ছুটে এসে ঘূর্ণির সৃষ্টি করে। প্রবল বেগে ছুটে আসা বায়ু কেন্দ্রে প্রবেশ করে সঙ্কুচিত হয়,

www.pathagar.com

ফলে উষ্ণতা আরো বৃদ্ধি পায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে বাতাস উষ্ণ ও ঊর্ধ্বগামী হয়। কেন্দ্রমুখী ঊর্ধ্বগামী এই বায়ুপ্রবাহকে ঘূর্ণিবাত বা সাইক্লোন বলে। উষ্ণমণ্ডল এবং নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে যে কোনো অঞ্চলে এ রূপ সাইক্লোন সৃষ্টি হতে পারে। সাইক্লোনের গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ থেকে ১৬০ কিলোমিটার এবং উচ্চতা ৯·৬ থেকে ১৬,০০০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। ব্যারোমিটারের (দ্র) পারদস্তম্ভ হঠাৎ নেমে গেলে সাইক্লোন আসন্ন বোঝা যায়। তখন আকাশ কালো করে ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা নিয়ে সাইক্লোন উপস্থিত হয়।

উষ্ণমণ্ডলে এই ঘূর্ণিঝড় বিভিন্ন নামে পরিচিত।

স্পার্সোর তোলা ঘূর্ণিঝড়ের চিত্র

টর্নেডোর ধরন

এই ঝড় চীন সাগরে তাইফুন বা টাইফুন (দ্র), পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (দ্র) হারিকেন (দ্র) এবং বঙ্গোপসাগর (দ্র), ভারত মহাসাগর (দ্র) ও আরব সাগরে সাইক্লোন নামে পরিচিত। বাংলাদেশের কালবৈশাখী এবং আশ্বিনের ঝড়ও এক ধরনের সাইক্লোন। আরেক ধরনের সাইক্লোনের নাম টর্নেডো। অল্পস্থান জুড়ে প্রবল বেগের ঘূর্ণিকে বলে টর্নেডো। এর শক্তি এবং ধ্বংসক্ষমতা অপরিসীম। এর টানে অনেক সময় বড় বড় গাছ উপড়ে গিয়ে বহু দূরে ছিটকে পড়ে। আমাদের দেশে এ ধরনের টর্নেডোতে টিউবওয়েলের পাইপ সমেত উপড়ে ফেলার দৃশ্যও দেখা গেছে।

স. রা.

সাঁওতাল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, পঞ্চগড় জেলায় সাঁওতালদের বাস। তাদের নিজস্ব ভাষার নাম সাঁওতালি ভাষা, এই ভাষার কোনো লিপি নেই। ঘরে তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলে এবং বাঙালিদের সঙ্গে বাংলা ভাষায় (দ্র)

www.pathagar.com

স্নানের ঘাটে দু'টি সাঁওতাল মেয়ে

বামে উপরে: হাসিখুশি দু'টি সাঁতাল মেয়ে ও নিচে: খরগোশ শিকার করে ফিরছে সাঁওতাল যুবক

কথা বলে। বাংলাদেশে (দ্র) তারা এখন বাংলা হরফে নিজেদের ভাষা লেখে। এভাবে তারা সাঁওতালি ও বাংলা ভাষা– দু'টি ভাষাই ব্যবহার করে।

সাঁওতালদের দেহের গঠন, আকৃতি ও গায়ের রঙ অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) প্রাচীন অধিবাসীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এরা প্রকৃতির উপাসক। আবার বহু দেবদেবীরও তারা পূজা করে। তাদের সৃষ্টিকর্তার নাম 'ঠাকুরজিয়ো'।

www.pathagar.com

সাঁওতাল মেয়েরা : ঘাঘরি ভরণে
শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদের কাঠখোদাই ছবি

সাঁওতালদের এগারোটি প্রধান গোত্র এবং তিন শতাধিক উপগোত্র আছে। গোত্র ও উপগোত্র অনুসারে তাদের নানা রকম বিধিনিষেধ আছে। এই বিধিনিষেধগুলো তারা খুব মানে। প্রত্যেক গোত্রের এক-একটি বিশিষ্ট নাম অর্থাৎ টোটেম (দ্র) আছে। এই নামগুলো পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি থেকে নেওয়া। ওরাঁও (দ্র)-দেরও এরকম।

সাঁওতালরা ফাল্গুন থেকে মাস গণনা করে। সারা বছর তাদের পূজা-পার্বণ লেগেই আছে। ঋতুতে ঋতুতে ও পূর্ণিমায় তাদের উৎসব। তখন নাচ-গানের সঙ্গে চলে ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়ার বাদ্য, আর চলে পান ও ভোজন।

সাঁওতাল মেয়েরা খুব উল্কি আঁকে। ওদের চলনভঙ্গি খুব বলিষ্ঠ ও সাবলীল। কৃষি তাদের প্রধান জীবিকা। এ ছাড়া কুলির কাজ, মাটি কাটা ও চা-বাগানে কাজ করা তাদের পেশা। তারা খুব পরিশ্রমী ও সহজ-সরল জীবন যাপন করে।

বি. ব.

সাঁওতাল বিদ্রোহ

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুর জেলার মধ্যবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে সাঁওতাল পরগণার (সাঁওতালি ভাষায় 'দামিন-ই-কো') আদিবাসীদের অধিকাংশই সাঁওতাল। ইংরেজ শাসনামলে এই সব সরল, নিরীহ আদিবাসীর উপর জমিদার, জোতদার, মহাজন এবং ইংরেজ কর্মচারীদের শোষণ-শাসন ও নিপীড়নের শেষ ছিল না। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন : 'শতকরা পঞ্চাশ থেকে পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত সুদ আদায়, বেআইনি কর আদায়, জমি ও ফসল জবরদখল, এমনকি দৈহিক অত্যাচার, মেয়েদের লাঞ্ছনা ও খুনজখম সাঁওতালদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।' প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েও কোনো দিন সুবিচার মেলে নি।

অত্যাচার-নিপীড়ন এক সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে এ অবস্থার অবসান ঘটাতে সাঁওতাল পরগণারই কয়েক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এগিয়ে আসেন—সিধু, কানু, ভৈরব ও চাঁদ। সিধু ও কানু দুই ভাই ভাগনাদিহি গ্রামের মোড়ল। এঁদের চেষ্টায় ১৮৮৫ সালের ৩০শে জুন ভাগনাদিহি গ্রামে গোটা অঞ্চলের সাঁওতালদের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় আপন শক্তিতে অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করার এবং তাদের চাষের জমি দখলে আনার।

সমাবেশের পর সাঁওতালগণ কলিকাতার (দ্র) দিকে যাত্রা করে। উদ্দেশ্য ইংরেজ সরকারের কাছে তাদের অভিযোগ তুলে ধরা এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এই যাত্রাপথে সাঁওতালবাহিনী পাঁচক্ষেতিয়ার বাজারে উপস্থিত হলে স্থানীয় দারোগা আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেন। ফলে উত্তেজিত সাঁওতাল জনতা কয়েক জন পুলিশসহ উক্ত অত্যাচারী দারোগাকে হত্যা করে। এভাবেই দারোগা হত্যাকে কেন্দ্র করে ৭ই জুলাই (১৮৫৫) থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রকৃত সূচনা।

ছোট ছোট দলে বিভক্ত সাঁওতালগণ এবার কুখ্যাত

www.pathagar.com

সিধু—সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা

জমিদার ও মহাজনদের বাড়ি, কাছারি ও গুদাম লুট করে সেগুলোতে আগুন দিতে থাকে। বিদ্রোহীদের পদযাত্রায় এমনি করে বিহারের একটি অংশ এবং বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহৎ অংশে ইংরেজ শাসন অচল হয়ে পড়ে।

সাঁওতাল বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য উদ্বিগ্ন ইংরেজ সরকার মেজর বারোজের অধীনে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। সিধু ও কানুর নেতৃত্বে পরিচালিত সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধে ১৬ই জুলাই বারোজের ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর ব্রিগেডিয়ার লয়েড-এর নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীও সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়।

বিপদ বুঝে ইংরেজ সরকার এরপর এক বিশাল বাহিনী গঠন করে সাঁওতাল নিধনে অগ্রসর হয়। এরা চারিদিক দিক থেকে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে। নবাব ও জমিদারগণ তাদের ভাড়াটে সৈন্য এবং হাতির দল পাঠিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে সাহায্য করে। কামানের গোলা ও হাতির সাহায্যে ওরা নিরীহ সাঁওতালদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয়, যাকে সামনে পায় তাকেই হত্যা করতে থাকে। উদ্দেশ্য ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টি করা। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে বিদ্রোহীরা সুবিধামতো নীলকুঠি এবং মহাজনের বাড়ি-গুদাম ধ্বংস করতে থাকে, মহাজনদের হত্যা করতে থাকে।

ইংরেজ বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার সাঁওতালদের মনোবল ভাঙতে পারে নি। ১৭ই আগস্ট বিদ্রোহের প্রধান নেতৃবৃন্দ বাদে সকল বিদ্রোহীর প্রতি সরকারি মার্জনা ঘোষণা সত্ত্বেও সাঁওতালগণ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তারা নতুন উদ্যমে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়।

অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ১৮৫৫ সালে ১০ই নভেম্বর ইংরেজ সরকার সামরিক আইন জারি করে। মুর্শিদাবাদ থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল সেনাবাহিনীর অধীনে চলে যায়। পনেরো হাজার নিয়মিত সৈন্য, পাইক-বরকন্দাজ ও বহু সংখ্যক কামান ও হাতিসহ বিশাল এক ইংরেজ বাহিনী সাঁওতাল পরগণায় হত্যার তাণ্ডব শুরু করে। হাজার হাজার সাঁওতাল যুবক, বৃদ্ধ, নারী, শিশু এই তাণ্ডবে প্রাণ দেয়। অন্য দিকে সিধু, কানু চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বাধীন সাঁওতালদের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর একের পর এক খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। তীর-ধনুকে সজ্জিত সাঁওতালগণ কামান-বন্দুক ও হাতির বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়।

ইংরেজ সৈন্যরা হাতি দিয়ে বিদ্রোহী সাঁওতালদের খুঁজছে

ইংরেজ বাহিনীর বর্বর গণহত্যায় সাঁওতাল পরগণার মাটি লাল হয়ে ওঠে। সিধু, কানু প্রমুখ নেতা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। প্রায় দু' বছর স্থায়ী এই যুদ্ধে বিদ্রোহী সাঁওতালগণ পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করে নি।

www.pathagar.com

এই যুদ্ধে স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও গরিব মুসলমানগণ সাঁওতালদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। এর পরও ১৮৭১ এবং ১৮৮০-৮১ সালে আবার সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেবারও একই ধরনের বর্বরতায় সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করা হয়।

আ. র.

সাঁতার (swimming)

জলের উপর হাত-পা নেড়ে নিজেকে ভাসিয়ে রেখে এগিয়ে ও পিছিয়ে যাওয়াকে আমরা সাঁতার কাটা বলে থাকি। সভ্যতার প্রভাতকাল থেকে মানুষ সাঁতার কাটতে শিখেছে। অতীতে মিশর, গ্রিস ও আমেরিকার মায়া সভ্যতার (দ্র) উষালগ্নে দেয়ালের গায়ে আঁকা চিত্র থেকে এ ব্যাপারের প্রাচীনত্ব বোঝা যায়। তবে যেসব দেশ সাগর, নদী-নালা দ্বারা বেষ্টিত তারাই সাঁতারের ব্যাপারে প্রাচীনত্ব ও পারদর্শিতার দাবিদার। উনিশ শতকের দিকে সাঁতার জনগণের কাছে লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়। তবে ব্রিটিশেরাই একে প্রতিযোগিতার অঙ্গনে নিয়ে আসে। ১৮৯৬ সালে প্রথম আধুনিক অলিম্পিকে পুরুষদের এবং ১৯১২ সালে স্টকহোল্‌ম্‌ অলিম্পিকে মহিলাদের সাঁতার যুক্ত হয়।

সাঁতার চারটি পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যথা—বুক সাঁতার, চিৎ সাঁতার, প্রজাপতি সাঁতার ও মুক্তহস্ত সাঁতার। এগুলি আবার ছোট-বড় বিভিন্ন দূরত্বে বিভক্ত। এ ছাড়া দূর পাল্লার সাঁতার, যেমন—ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম, নারায়ণগঞ্জ হতে চাঁদপুর ইত্যাদিও রয়েছে।

সাঁতারের জন্য যে জলাশয় ব্যবহার করা হয় তার আন্তর্জাতিক মাপ হল দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার, চওড়া ২১ মিটার, গভীরতায় সর্বত্র ১·৮০ মিটার। জলাশয়ের সীমানার দেয়ালগুলি সমান্তরাল ও লম্বাভাবে উঠবে।

প্রতি বছরর সাঁতারে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলাভিত্তিক, আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, সার্ভিসেস, যুব ও বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সাফ্‌ গেম্‌সে (দ্র), এশিয়ান গেইম্‌সে (দ্র) ও অন্যান্য আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে থাকে। বাংলাদেশে সাঁতারের মান এখন উন্নতির পথে। দূরপাল্লার সাঁতারে এদেশের ঐতিহ্য আছে। ব্রজেন দাশ (দ্র) ৬ বার এবং মালেক, মোশারফ ১ বার করে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে কৃতিত্বের প্রমাণ রেখেছেন।

কা. আ. আ.

সাগর / উপসাগর

মহাসাগরের কোনো অংশ যখন কোনো দেশ বা মহাদেশের উপকূলে এসে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, তখন তাকে বলা হয় সাগর। যেমন—আরব সাগর, জাপান সাগর, মিশর সাগর ইত্যাদি। আবার সাগরের তিন দিকে যেখানে ডাঙা আর এক দিকেই কেবল সাগর, তখন তাকে বলা হয় উপসাগর। যেমন বঙ্গোপসাগর (দ্র), পারস্য উপসাগর, মেক্সিকো উপসাগর ইত্যাদি। তবে বড় বড় সব সাগর, মহাসাগরেরই অংশ। সমুদ্রতত্ত্ববিদেরা বলেন—সব মহাসাগর ও সাগর হল প্রশান্ত মহাসাগর (দ্র), আটলান্টিক মহাসাগর (দ্র) ও ভারত মহাসাগরের (দ্র) অংশ। তাদের মধ্যে বেরিং সাগর, কোরাল সাগর, পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগর, ওখোৎস্ক্‌, জাপান সাগর, পীতসাগর, ফিলিপাইন সমুদ্র রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরকে ছুঁয়ে। আর আরব সাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, বঙ্গোপসাগর হচ্ছে ভারত মহাসাগরেরই প্রান্তিক সাগর। আবার ওদিকে উত্তর আমেরিকার স্কসিয়া সাগর, উত্তর সাগর, লাব্রাডার, ওয়েডেল সাগর, নরওয়ে সাগর, গ্রিনল্যাণ্ড সাগর আটলান্টিকের প্রান্তিক সাগর।

সাগরের উপরিভাগের মতো তার তলদেশ কিন্তু মোটেই সমতল নয়। এর কোথাও রয়েছে পাহাড়-পর্বত, কোথাও বা চওড়া মালভূমি, আবার কোথাও রয়েছে অতি গভীর খাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পাহাড়-পর্বতের চূড়াগুলো সাগরের অথৈ জলের নিচে ডুবে আছে। অবশ্য যেসব স্থানে মালভূমি বা পাহাড় জলভাগের চেয়ে উঁচু সেখানে দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে।

বেশির ভাগ সাগরের পাড়ের কাছে কিছু অগভীর চওড়া জায়গা থাকে, যেখান থেকে পানি ক্রমে ক্রমে নিচের দিকে গভীর হয়ে যায়। সাগরের এই অগভীর অংশকে 'মহীসোপান' বলা হয়। এর পরের ধাপের নাম 'মহীঢাল'। মহীঢালের পরেই গভীর সমুদ্র। প্রতিধ্বনির মাধ্যমে সাগরের গভীরতা মাপা যায়।

বায়ুপ্রবাহের কারণে সাগরে স্রোত প্রবাহিত হয়। এ ছাড়া পৃথিবী (দ্র) আপন অক্ষের (দ্র) ওপর ২৪ ঘণ্টায়

www.pathagar.com

সমুদ্রতল অসমান

একবার ঘোরে বলেও স্রোতধারা বয়ে যায়। বিষুবীয় অঞ্চলে সাগরের পানি উষ্ণ, আবার মেরু অঞ্চলে শীতল। সাগরের পানির স্বাদ কিন্তু নোনতা। বিজ্ঞানীদের মতে সাগরের পানিতে শতকরা প্রায় সাড়ে তিন ভাগ লবণ রয়েছে। তবে এর পরিমাণ সব অঞ্চলে এক নয়। বিষুব রেখার কাছে বৃষ্টি বেশি হয় বলে এবং মরু অঞ্চলে ঠাণ্ডার কারণে পানি বাষ্প হয়ে বেশি উবে যায় না বলে ঐসব অঞ্চলের সাগরে লবণের ভাগ কম। সাগরে নানা রকম মাছ (দ্র), বিচিত্র জীবজন্তু, ঝিনুক (দ্র), প্রবাল (দ্র), উদ্ভিদ এবং অঢেল খনিজ পাওয়া যায়।

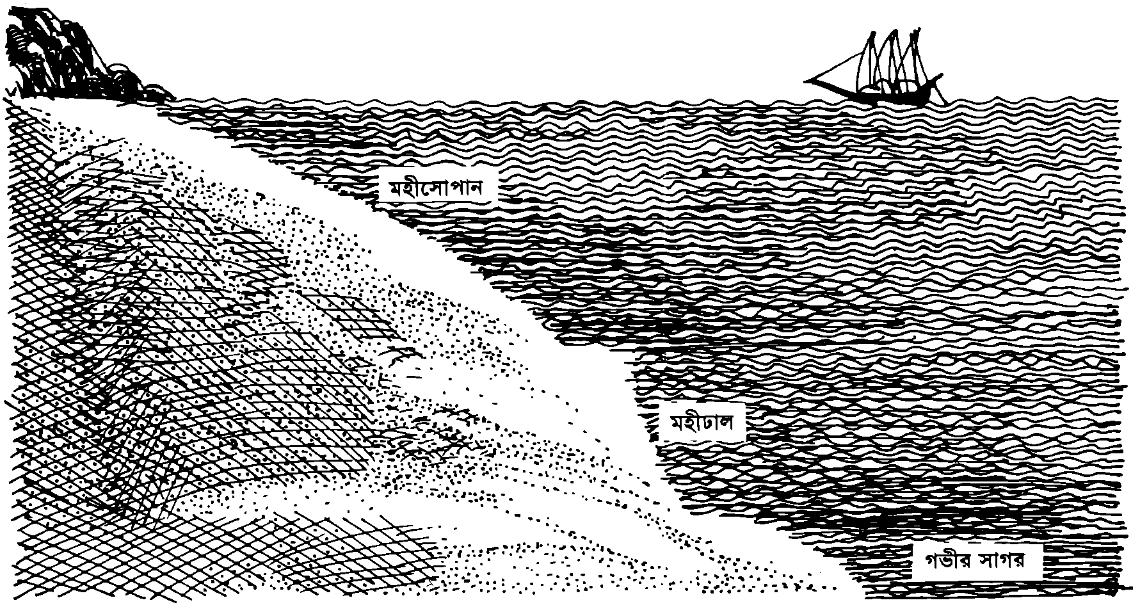

www.pathagar.com

কিন্তু সাগর সৃষ্টি হল কেমন করে ? আজ থেকে প্রায় পাঁচ শ' কোটি বছর আগে পৃথিবীসৃষ্টির মুহূর্তে পৃথিবীর মাটি (দ্র), পাথর বা পানি (দ্র) সবই সূর্য (দ্র) থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা একটি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ডের মধ্যে ছিল। এর ভিতরের নানা জায়গায় ধুলো-পাথর-ধাতু দারুণ গরম হয়ে গলে গিয়ে মাটি ফুঁড়ে ফুঁসে উঠতে থাকে। সেসব গ্যাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে প্রচুর জলীয় বাষ্প। সেগুলো আকাশে জমে মেঘ (দ্র) তৈরি করে। মেঘ থেকে অঝোর ধারায় শুরু হয় বৃষ্টি। এসব বৃষ্টির পানি পাহাড়-পর্বত থেকে গড়িয়ে নেমে নিচু জায়গগুলোতে জমা হতে হতে সাগরের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর ৭১ ভাগ জুড়ে আছে এই সাগর—অনন্ত রহস্যপুরী। যুগ যুগ ধরে এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন প্রাচীন কালের দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলো সাগর-নদীর উপকূলেই গড়ে উঠেছে।

সুজ. ব.

সাজাদপুর

রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত সাজাদপুর বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলায় নগরবাড়ি-বগুড়া মহাসড়কের সাজাদপুর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে মিনিট কয়েকের হাঁটাপথ পেরিয়ে যাওয়া যায়। রবীন্দ্রযুগে বৃহত্তর পাবনা জেলায় সাজাদপুর পরগনার সদরকাছারি সাজাদপুর ছিল ঠাকুর পরিবারের জমিদারির দুর্গম এলাকা। নদীপথে শিলাইদহ (দ্র) থেকে খাল-বিল-নদী-নালা পেরিয়ে ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) প্রথম বার সাজাদপুর কুঠিবাড়িতে এসে ওঠেন।

সাজাদপুরের কুঠিবাড়িটি বেশ প্রশস্ত। এর বাগানটিও পুরানো। জুঁই, গোলাপ (দ্র), বকুল, চাঁপা (দ্র) ও কামিনীর সৌরভ ছড়ানো সন্ধ্যা বেলা, পাখির ডাক, নির্জন দুপুর এবং বৈশাখী ঝড়ের দিনে ঝুঁটি দোলানো লিচু গাছ আর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আমের বোলের ঘ্রাণে মৌ-মৌ কুঠিবাড়ির চারপাশ—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সাজাদপুর। বড় বড় খোলামেলা চারটি ঘরে প্রচুর আলো-হাওয়ায় বোটের চেয়ে কুঠিবাড়িতে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন কবি।

সাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে 'সোনার তরী' ও 'চৈতালী'র বেশ কিছু কবিতা এবং 'বিসর্জন' নাট্যকাব্য রচিত হয়েছে। অসাধারণ কিছু গান এবং 'ছিন্নপত্রাবলী'র বহু সংখ্যক চিঠিপত্রও লেখা হয়েছে এখানে। তবে সাজাদপুরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ কবির লেখা ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পের পটভূমি বাংলাদেশ (দ্র)। অজ্ঞাত মানুষের জীবনকাহিনী অসামান্য হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পে। অতিথি, ক্ষুধিত পাষাণ, সমাপ্তি ও পোস্টমাস্টারসহ বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প কবির সাজাদপুর বাসের ফসল।

জমিদারি ভাগাভাগির ফলে সাজাদপুর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও তাঁর ভাইদের ভাগে পড়ায় রবীন্দ্রনাথের সাজাদপুরে আসা-যাওয়ায় ছেদ পড়ে।

বর্তমানে সাজাদপুর কুঠিবাড়িতে কবির ব্যবহৃত আসবাবপত্র, বাসনকোসন, পাল্কি, টেবিল ল্যাম্প, পিয়ানো (দ্র) সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ও কবিজীবনের বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র নিয়ে একটি জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে। কুঠিবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকা এখন বাংলাদেশ সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগের অধীনে।

ফ. র.

সাজাদপুর মসজিদ

সাজাদপুর মসজিদ সুলতানি আমলে তৈরি এক অসাধারণ স্থাপত্যকীর্তি। এই মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায় নি। তাই এর নির্মাণকাল জানা যায় না। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এটি খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। কারো কারো মতে, বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে এটি নির্মিত হয় এবং এই আমলে নির্মিত মসজিদগুলোর মধ্যে সাজাদপুর মসজিদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

মসজিদটির অবস্থান সিরাজগঞ্জ জেলার সাজাদপুর থানায়, সাজাদপুরের দরগাপাড়ায় 'হুয়া সাগর' নামক নদীর পাড়ে। কথিত আছে, মখদুম শাহ্‌দৌলা নামক একজন বিখ্যাত দরবেশ ও ধর্মপ্রচারক মসজিদটির নির্মাতা।

স্থাপত্যশৈলী ও কাঠামো বিন্যাসের দিক দিয়ে এই

www.pathagar.com

মসজিদ অনন্য। এর ভেতরের দিকের আয়তন ৫১´-৯´´× ৩১´-৫´´। দেয়ালগুলো ৫´-৭´´ পুরু। গম্বুজের সংখ্যা ১৫ টি। পূর্ব দিকে খিলানযুক্ত পাঁচটি এবং উত্তর-দক্ষিণ দিকে তিনটি করে দরজা রয়েছে। মসজিদের ভেতরে দুই সারিতে কালো পাথরের মোট আটটি স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলো অষ্টভুজাকৃতি। তবে দ্বাদশ ভুজাকৃতি স্তম্ভও আছে। এই মসজিদে মিহ্‌রাবের (দ্র) সংখ্যা চারটি।

সাজাদপুর মসজিদ

মসজিদের মিহ্‌রাবগুলো অলঙ্করণসৌকর্যে অনন্য-সাধারণ। ফুল, লতা-পাতা, আঁকাবাঁকা নকশা, জ্যামিতিক রেখাচিত্র এসব অলঙ্করণের বিষয়। নিপুণ হাতের এই কাজগুলো এখনো বিদ্যমান।

মু. মা.

সাজেদুল করিম [১৯১৫—১৯৯৪]

শিশুসাহিত্যিক। বাংলাদেশের (দ্র) শিশু-সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গল্প ও রম্যরচনার সার্থক ও মৌলিক রূপকার হিসাবে খ্যাত। তিনি ১৯১৫ সালের ২৮শে এপ্রিল কুমিল্লা জেলার ফাল্গুনকরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু রশীদ। তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিকের পূর্বপুরুষগণ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন।

সাজেদুল করিম ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্সসহ এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী কালে শিক্ষকতাকেই তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক পদে যোগ দেন এবং ক্রমে এই বিভাগেরই বিভাগীয় প্রধান পদে উন্নীত হন। এখান থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

শৈশবেই সাহিত্যে সাজেদুল করিমের অনুরাগ জন্মে। স্কুলজীবনে তিনি 'মুকুল' নামে হাতে লেখা একটি পত্রিকা নিয়মিত সম্পাদনা করতেন এবং তখন থেকেই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। লেখালেখির প্রথম জীবনে কলিকাতার (দ্র) 'মৌচাক', 'খোকাখুকু', 'উসখুস', 'আজাদ' ইত্যাদি কাগজে তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে তিনি ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেন। 'দস্যি ছেলের দশচক্রে', 'এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে', 'চেরাপুঞ্জি পলিটিক্স', 'চিংড়ি ফড়িং-এর জন্মদিনে', 'মাসী পিসীর এ্যালজেব্রা' ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থ। 'শব্দ রহস্য', 'সোনালী আঁশ, রূপালী আঁশ' এবং 'পানির কথা' নামে তাঁর তিনটি অনুবাদ-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক শ্রেণীর জন্য ইংরেজিতে দু'টি ও বাংলায় একটি পাঠ্য-গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

সাজেদুল করিমের রচনার বড় গুণ হল হাস্যোদ্দীপনা। তবে নিছক হাস্যরস পরিবেশনই তাঁর রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। হাস্যরসের সঙ্গে মেধা ও মননের সংমিশ্রণ তাঁর প্রতিটি রচনাকে শাণিত করে তুলেছে। তাঁর গল্পের উপস্থাপনা, কাহিনীর বুনন ও বিস্তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) এবং ১৩৯৬ সনে (১৯৮৯ খ্রি.) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

www.pathagar.com

সাতগম্বুজ মসজিদ

সাহিত্য পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

১৯৯৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

সুজ. ব.

সাতগম্বুজ মসজিদ

সাতগম্বুজ মসজিদ ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার জাফরাবাদ এলাকায় অবস্থিত। এই মসজিদের নাম অনুসারে এলাকার রাস্তাটির বর্তমান নাম 'সাত মসজিদ রোড' বলে মনে করা হয়।

এই মসজিদটি মোগল সুবাদার শায়েস্তা খাঁর (দ্র) আমলে তাঁর পুত্র উমিদ খাঁ নির্মাণ করান। এর নির্মাণকাল ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দ।

সাতগম্বুজ মসজিদ সপ্তদশ শতকের মোগল ও দেশীয় স্থাপত্য-রীতির সমন্বয়ে তৈরি। এর নামায-ঘরের আয়তন ৫৮´×২৭´। নামায-ঘরের ওপরে তিনটি গোলাকার ক্রমস্ফীত গম্বুজ এবং মসজিদের চার কোণায় চারটি আট বাহুবিশিষ্ট মিনার রয়েছে। মিনার চারটি নামায-ঘর থেকে একটু নিচে স্থাপিত। এগুলো দু'তলা-বিশিষ্ট এবং ছোট ছোট গম্বুজ দিয়ে সজ্জিত। এই চারটি মিনার এবং নামায-ঘরের মূল তিনটি গম্বুজ অর্থাৎ সর্বমোট সাতটি গম্বুজের কারণে মসজিদের নাম হয়েছে 'সাতগম্বুজ মসজিদ'।

মু. মা.

সাদি [১১৮৪—১২৯১]

ফার্সি কবি। শেখ সাদি নামেও তিনি পরিচিত। পুরো নাম মুশর্‌রফ উদ্‌দিন ইব্‌ন মুস্‌লিহুদ্‌দিন। জন্ম পারস্যের সিরাজ নগরীতে ১১৮৪ সালে।

সাদির জীবন বিষয়ে বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য বহু জনশ্রুতি ও গল্পকথা প্রচলিত। কথিত আছে, তিনি বাগদাদের নিযামিয়ায় শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৫ বার হজ্বব্রত পালন করেন। তিনি ভ্রমণ করেন ইউরোপের (দ্র) অনেকগুলো শহর। সুফি দর্শনের অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবধারার সমন্বয়ে রচিত তাঁর সাহিত্যকর্ম, বিশেষত কাব্য (দ্র) বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বিশ্বের অধিকাংশ প্রধান ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত ও বহুল পঠিত।

ইউরোপীয় মনীষীদের ভেতরে লা ফঁত্যান্‌, ভলত্যার (দ্র), গোয়টে (দ্র) প্রমুখ অনেকে সাদির কাব্যদর্শন পাঠে গভীরভাবে মোহিত ও আলোড়িত হন।

তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে 'দিওয়ান', 'বুস্তাঁ' (১২৩৭), 'গুলিস্তাঁ' (১২৫৮) ও 'পান্দ্‌নামা' উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় উল্লিখিত গ্রন্থগুলির অনুবাদ বহু আগেই সুসম্পন্ন হয়েছে।

সাদি মৃত্যুবরণ করেন ১২৯১ সালে। সিরাজে অবস্থিত তাঁর সমাধিক্ষেত্র তীর্থস্থানস্বরূপ।

আ. হ.

সান্‌ ইয়াৎ-সেন্‌ [১৮৬৬—১৯২৫]

চীনের (দ্র) জাতীয়তাবাদী নেতা এবং প্রথম চীনা বিপ্লবের প্রধান নায়ক। সান্‌ ইয়াৎ-সেন্‌ (Sun Yat-Sen)-এর জন্ম ১৮৬৬ সালে অতি দরিদ্র এক কৃষক পরিবারে।

প্রথমে হনলুলু ও পরে হংকং-এ প্রাথমিক ও দ্বিতীয়

www.pathagar.com

পর্বের শিক্ষাজীবন শেষে সান্ ইয়াৎ-সেন্ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন শেষোক্ত শহরেই।

চীনকে মাঞ্চু শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন ছিল তাঁর ছাত্রজীবন থেকে। ১৮৯৪ সালে তাঁর উদ্যোগেই 'চীন বাঁচাও সঙ্ঘ' গড়ে ওঠে। এই সঙ্ঘের মাধ্যমে বিপ্লবী তৎপরতা চালানোর অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন। পরে মুক্তি পেয়ে চলে যান বিদেশে।

১৮৯৮ সালে তিনি ঘোষণা করেন তাঁর রাজনীতির বিখ্যাত 'তিন নীতি': জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজবাদ। ১৯০৫ সালে গড়ে তোলেন 'তুং মেং হুই' নামের একটি সংগঠন। কুয়োমিন্টাং (দ্র) পার্টিরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত ১৯১১ সালের বিপ্লবে মাঞ্চু রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে। ১৯১৩ সালে তিনি এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। অল্প কাল পরে এই পদ ছেড়ে দিলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সুবিধাবাদী নেতা উয়ান শি-কাই, যিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ক্রমে একনায়কতাবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে উয়ানের মৃত্যু হলে ডা. সান্ ইয়াৎ-সেন্ পুনরায় রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে সমাসীন হয়েই তিনি সংঘটিত বিপ্লবকে সার্থক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালান। নিজে জাতীয়তাবাদী হলেও তিনি রাশিয়ার (দ্র) সহযোগিতায় চীনের উন্নতি সাধনে তৎপর হন। সেই সঙ্গে ঘোষণা করেন, কমিউনিস্টরাও হতে পারবে কুওমিন্টাং-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে তাঁর মৃত্যুর পর চিয়াং কাই-শেক (দ্র) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে চীনের কমিউনিস্টদের নির্মূল করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন। কুয়োমিন্টাং দল সান্ ইয়াৎ-সেনের চিন্তা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্নপথে চলতে থাকে।

আ. হু.

সান্তা ক্লজ (Santa Claus)

২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের (দ্র) রাতে সান্তা ক্লজ নামে এক বুড়ো চুপিচুপি এসে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের জন্য উপহার রেখে দিয়ে চলে যায়। সে এত বৃদ্ধ যে তার মাথার চুল, চোখের ভুরু, লম্বা দাড়ি সব কাশ ফুলের মতো সাদা। সে দেখতে মোটাসোটা গোলগাল, আর সব সময়েই একগাল হাসি তার মুখে লেগেই আছে।এই সান্তা ক্লজকে কেউ চোখে দেখতে পায় না, কিন্তু তার নিয়ে আসা উপহার সব ছেলেমেয়েই পায়। ক্রিস্‌মাসের (দ্র) সময়ে সান্তা ক্লজকে নিয়ে এটাই সবচেয়ে চালু কিংবদন্তি—প্রথমে ইউরোপে (দ্র), পরে সেখান থেকে গেছে আমেরিকায় (দ্র)। এখন অবশ্য যিশু খ্রিস্টের (দ্র) জন্মদিনের রাত্রিকে আরো আনন্দময় করে তোলার উদ্দেশ্যে পরিবারের বা পাড়াপড়শির কেউ এক জন সান্তা ক্লজ বুড়ো সেজে জোব্বার পকেট ভর্তি করে উপহার নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যায়।

সান্তা ক্লজ উপাখ্যানটির মূলে আছে সন্ত নিকোলাস (Saint Nicholas) নামে চতুর্থ শতাব্দীর এক সাধু পুরুষ। রাশিয়াতে (দ্র) ইনি পরিচিত 'তুষার দাদু' হিসাবে, ইংল্যাণ্ডে এঁকে বলে 'ফাদার ক্রিস্‌মাস্', ফ্রান্সে বলে 'প্যার নোয়েল্', আমেরিকাতে এঁর নাম 'সেন্ট নিক্'। অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম (দ্র) যেখানেই আছে সেখানে সান্তা ক্লজ বুড়োর মাধ্যমে সন্ত নিকোলাসের নাম ভোল পাল্টে রয়ে গেছে। তবে 'সান্তা

www.pathagar.com

ক্লজ' শব্দ দু'টির উদ্ভব ওলন্দাজ শব্দ Sante Klaus (সান্তে ক্লাউস) থেকে। কিংবদন্তির গল্প আরো বলে যে ইনি উত্তর মেরু অঞ্চলে থাকেন এবং বুড়ি বৌ, এন্তার চাকরবাকর আর এক পাল বল্গা হরিণ নিয়ে সেখানে মহাসুখে আছেন।

হা. মা.

সাপ (snake)

সাপ আধুনিকতম সরীসৃপ। বিজ্ঞানীদের মতে, এক জাতীয় গিরগিটি থেকে প্রায় ১০ কোটি বছর আগে এদের উৎপত্তি।

অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) ও কিছু দ্বীপাঞ্চল ছাড়া সর্বত্র বাস করে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। পৃথিবীতে প্রায় ২,৭০০ প্রজাতির সাপ আছে। বাংলাদেশে (দ্র) ৭৫-৮০ প্রজাতির বাস।

সাপের লম্বা দেহটি মসৃণ বা অমসৃণ শুষ্ক আঁশে আবৃত। পা নেই, তাই এঁকেবেঁকে চলে। ফুসফুস (দ্র) সাধারণত একটি; দু'টি থাকলে অন্যটি ছোট হয়। দেহের মতোই

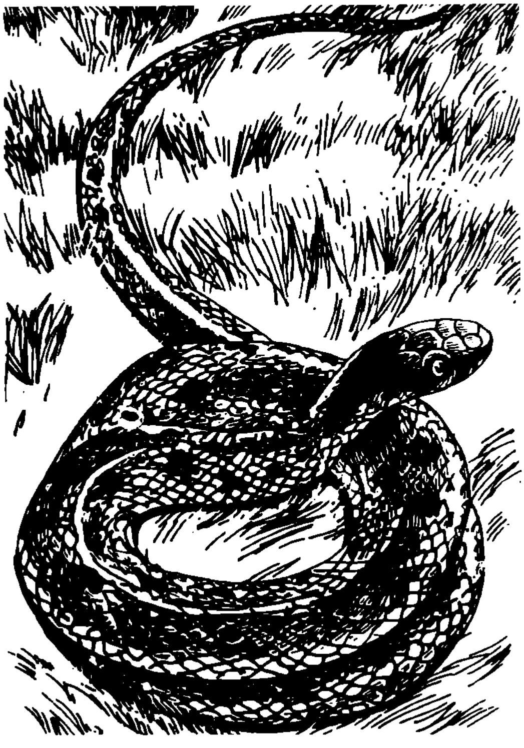

চন্দ্রবোড়া সাপ, এরা বিষধর নয়। এদের প্রায় ৪টি প্রজাতি বাংলাদেশে রয়েছে। ডানপাশে: বাংলাদেশে পাওয়া যায় এরকম কয়েকটি সাপের ছবি

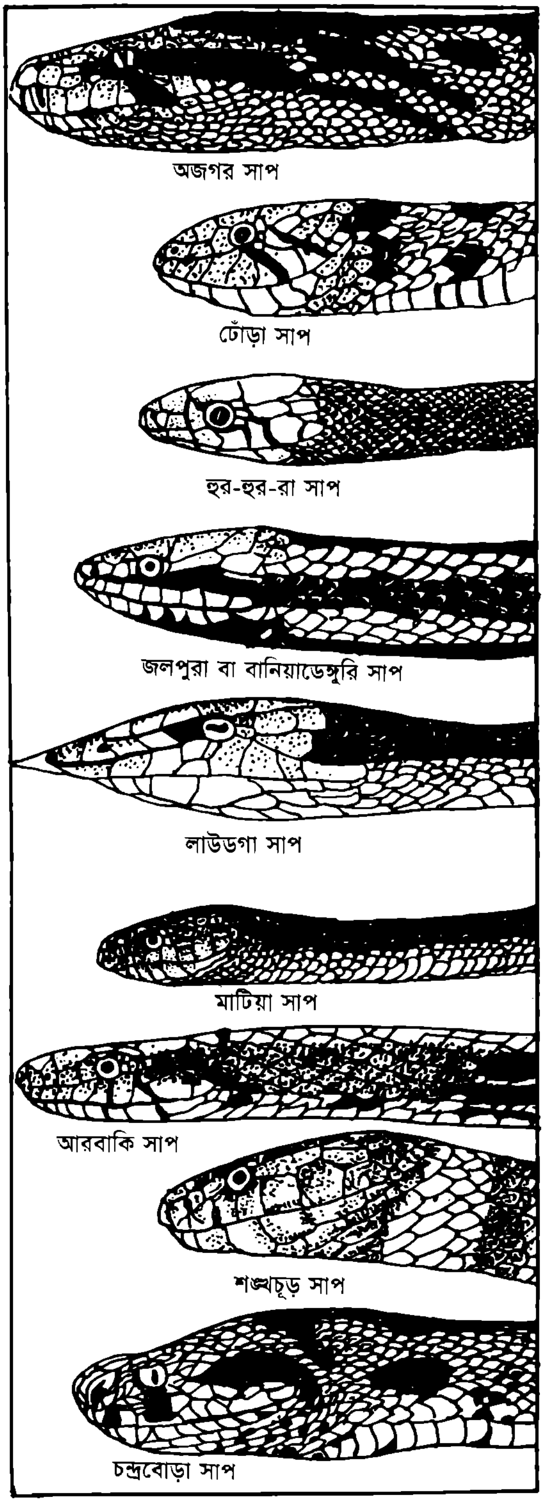

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো চিকন ও লম্বা। এরা বধির। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। চোখের পাতা নেই। তবে, ঘ্রাণশক্তি প্রখর। জিহ্বা দ্বিধাবিভক্ত; সাপ কিছুক্ষণ পরপর তা বের করে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর খোলস বদলায়। শীত কালে ঘুমিয়ে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ সাধারণত আকারে সমান।

প্রজাতিভেদে আকৃতি-বর্ণ-ওজনে বিস্তর পার্থক্য। বারো সেন্টিমিটার থেকে নয় মিটার পর্যন্ত হতে পারে। অজগর বেশ মোটা ও লম্বা। সূতানালি সাপ অত্যন্ত চিকন। 'ব্রাহ্মণী অন্ধ সাপ' মাত্র পনেরো সেন্টিমিটার। অজগর (অ্যানাকোন্দা ও গোলবাহার) লম্বায় প্রায় ৯ মিটার ও ওজনে ১১০-১১২ কেজি।

পৃথিবীতে ২৫০-২৭০ প্রজাতির বিষধর সাপ থাকলেও অল্প ক'টিই মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে। বাংলাদেশে ২৫টি বিষধর প্রজাতির বাস। এদের মধ্যে চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড়, গোক্ষুর ও কেউটে অন্যতম। বিষধর সাপের ওপরের চোয়ালে ছিদ্রযুক্ত দু'টি বিষদাঁত থাকে। বিষদাঁতের গোড়ায় থাকে বিষথলি। এগুলো কিছুদিন অন্তর ঝরে পড়ে ও পুনরায় নতুন বিষদাঁত গজায়।

ইঁদুর (দ্র), ব্যাঙ (দ্র), মাছ (দ্র), পাখি (দ্র), ডিম (দ্র), বাচ্চা ইত্যাদি এদের প্রিয় খাদ্য। ইঁদুর খেয়ে আমাদের বেশ উপকার করে। অজগর ৪৫ কেজি ওজনের প্রাণীও খেতে পারে।

এরা মাঠ-ঘাট, বন-জঙ্গল, গাছ, মিঠা ও লোনা পানিতে বাস করে। তবে, ডিম ফোটাতে বা বাচ্চা দেওয়ার জন্য স্থলে আসতে হয়। বেশির ভাগ প্রজাতিই ডিম পাড়ে। প্রায় ৫০টি প্রজাতি বাচ্চা দেয়। গাছের খোড়ল, গর্ত, পচা লতা-পাতা ইত্যাদিতে প্রজাতিভেদে স্ত্রী-সাপ ৬ থেকে ৬০টি ডিম পাড়ে। অজগর পাড়ে ৫০–১০০টি ডিম। ৮-১০ সপ্তাহে ডিম ফোটে। বাচ্চা প্রসবকারী কোনো কোনো প্রজাতি একসঙ্গে শ'খানেক বাচ্চা দেয়। সদ্যজাত বাচ্চাগুলো স্বাবলম্বী। প্রজাতিভেদে সাপ ১৫-৩০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

সাপাতা, এমিলিয়ানো (আনু. ১৮৭৯– ১৯১৯)

কৃষকবিদ্রোহের নেতা, ভূমিসংস্কারক, বিপ্লবী। মেহিকোর রাজনৈতিক ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয় একটি নাম। আমাদের দেশে ভুল উচ্চারণে 'জাপাতা' নামে পরিচিত।

এমিলিয়ানো সাপাতা (Emiliano Zapata) জন্মেছিলেন মেহিকো(Mexico)-তে মোরেলোস্ প্রদেশের আনেনেকুইল্কো (Anenecuilco) নামক স্থানে, সম্ভবত ১৮৭৯ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে। দরিদ্র কৃষকপরিবারের সন্তান ছিলেন বলে ভূমিহীন কৃষকদের কষ্ট ও সমস্যা সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝতেন। নিজে ছোটবেলায় জনমজুর খেটেছেন, খচ্চরে টানা মোট-বওয়া গাড়ির গাড়োয়ানি করেছেন ইত্যাদি।

১৯১০ সালে মেহিকো দেশে একটি রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সেই গণ্ডগোলের মধ্যে মোরেলোস্ অঞ্চলের চাষীরা সাপাতাকে তাদের নেতা নির্বাচন করে, যাতে সাপাতা কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভূমিহীনদের জমি বরাদ্দের একটা ব্যবস্থা করতে পারেন। এভাবে ক্রমে সাপাতা সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত হয়ে যান।

বিপ্লবশেষে নতুন সরকার গঠনের পরেও চাষীদের অবস্থার কোনোই উন্নতি হয় না। তখন বাধ্য হয়ে সাপাতা কৃষিসংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন এবং গেরিলা পদ্ধতিতে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল তিনি নিহত হন।

বর্তমানে সাপাতাকে জাতীয় বীরের সম্মান দেওয়া হয় এবং মেহিকোর পরবর্তী বিভিন্ন সরকার তার পরিকল্পিত কৃষিনীতির অনেক কিছুই বাস্তবায়িত করেছেন।

হা. মা.

সাফ্ গেম্স্ (SAF Games)

বিশ্বের নবীনতম আঞ্চলিক জোট গঠিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাতটি দেশের সমন্বয়ে। বাংলাদেশ (দ্র), ভারত (দ্র), পাকিস্তান (দ্র), নেপাল (দ্র), ভুটান (দ্র), মালদ্বীপ (দ্র) ও শ্রীলঙ্কা (দ্র) এই সাতটি দেশের মধ্যে (যারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিতে এই জোটের সৃষ্টি হয়। ১৯৮০ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের উদ্যোগে এই জোট গঠন করা হয়। সাতটি দেশের প্রতিনিধির শীর্ষ সম্মেলনের (ঢাকাতে)মাধ্যমে 'সার্ক' (দ্র) —বাংলায় 'দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা'— প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল সাফ্ (SAF=

www.pathagar.com

South Asian Federation) গেম্‌স্।

১৯৮৪ সালে ১৭ই হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে ১ম সাফ্ গেম্‌স্ অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৫ সালে ২১–২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় ২য় সাফ্ গেম্‌স্ অনুষ্ঠিত হয়। ভারত 'সাফ গেম্‌স্'-এর পদক তালিকায় প্রথম, পাকিস্তান দ্বিতীয় ও বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১৯৮৭ সালে ২০–২৮ নভেম্বর ভারতের কলিকাতায় (দ্র) ৩য় সাফ্ গেম্‌স্ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১১৬টি বিষয়ের প্রতিযোগিতা হয়। ভারত শীর্ষস্থান, পাকিস্তান দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতায় ৩টি স্বর্ণ ও ১৯টি রৌপ্য ও ৩২টি ব্রোঞ্জ পদক পায়।

১৯৮৯ সালে ২০শে অক্টোবর পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ৪র্থ সাফ্ গেম্‌স অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারত মোট ১২৪টি পদক লাভ করে তালিকার শীর্ষে, পাকিস্তান ৯৭টি পদক পেয়ে দ্বিতীয়, শ্রীলঙ্কা ৩৭টি, নেপাল ৪৬টি, বাংলাদেশ ২৭টি, ভুটান ৩টি পদক লাভ করে।

১৯৯১ সালে ২২শে হতে ৩১শে ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে ৫ম সাফ্ গেম্‌স্ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ভারত মোট ১৬৪টি, শ্রীলঙ্কা ১১৮টি, পাকিস্তান ৮৫টি, বাংলাদেশ ৪১টি, নেপাল ৪০টি, মালদ্বীপ ১টি পদক পায়, এবং ভুটান কোনো পদক পায় নি।

১৯৯৩ সালে নেপালের কাঠমাণ্ডুতে ৬ষ্ঠ সাফ্ গেম্‌স্ হওয়ার কথা ছিল। নেপাল এই খেলা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অপারগতা জানালে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ সাফ্ গেম্‌স্ অনুষ্ঠান করতে রাজি হয়। ২০শে হতে ২৭শে ডিসেম্বর ঢাকায় এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সবগুলি প্রতিযোগিতায় (১১টি বিষয়ে) অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৭ সালের ৪ঠা থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর নেপালের কাঠমাণ্ডুতে ৭ম সাফ গেম্‌স্ অনুষ্ঠিত হয়।

কা. আ. আ.

সাবমেরিন/ ডুবো জাহাজ

সাবমেরিন (submarine) এমন একটি জাহাজ (দ্র), যা

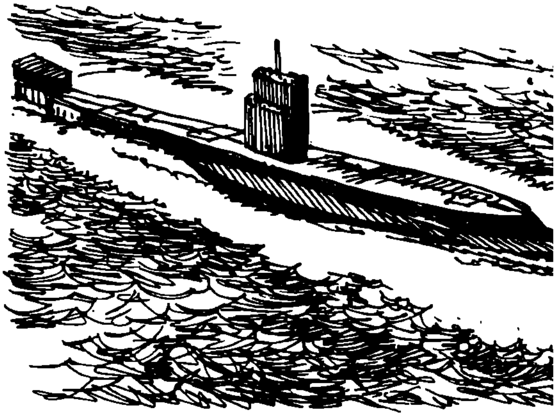

পানির (দ্র) ভিতর দিয়ে চলে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয়। এই সাবমেরিন থেকেই শত্রুপক্ষের জাহাজ আক্রমণ করে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং শত্রুর জাহাজের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। সাবমেরিন সাধারণত ৬১ মি. থেকে ১৫০ মি. পর্যন্ত লম্বা হয় এবং এর গোল কাঠামোর ব্যাস ৯ মি. হয়ে থাকে। এই ডুবে থাকা যুদ্ধজাহাজে প্রায় ১০০ জন ক্রু বা নৌসেনা থাকে।

কোনো কোনো সাবমেরিন গবেষণার কাজেও ব্যবহার করা হয়। তবে এগুলোর আকার অনেক ছোট এবং এতে লোকজনও অনেক কম থাকে। সমুদ্রে গভীরতা মাপা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়।

যুদ্ধের সময় পানির নিচে থেকেই সাবমেরিন শত্রুপক্ষের জাহাজে বা লক্ষ্যস্থলে হামলা চালায়। আক্রান্ত জাহাজ কিছুই দেখতে পায় না, কিন্তু পেরিস্কোপের সাহায্যে ডুবোজাহাজটি সামনের সব কিছুই দেখতে পায়। টর্পেডো (torpedo) নামক এক রকম বোমা ছুঁড়ে যুদ্ধজাহাজ ডোবানো হয়। ইঞ্জিনে ও ক্রুদের প্রয়োজনীয় বায়ু গ্রহণের জন্য কয়েক ঘণ্টা পর পরই এই সাবমেরিনগুলোকে পানির ওপরে ভেসে উঠতে হয়। বর্তমানে পরমাণুশক্তি চালিত সাবমেরিন আবিষ্কৃত হওয়ায় এগুলোকে আর পানির উপরে ভেসে উঠতে হয় না। ইঞ্জিন চালনার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও নাবিকদের জন্য বাতাস এই সাবমেরিন থেকেই পাওয়া যায়।

লম্বা দেহের চুরুটের মতো সাবমেরিনকে পানির চাপ থেকে রক্ষা করার জন্য ডবল কাঠামো বা খোল থাকে।

www.pathagar.com

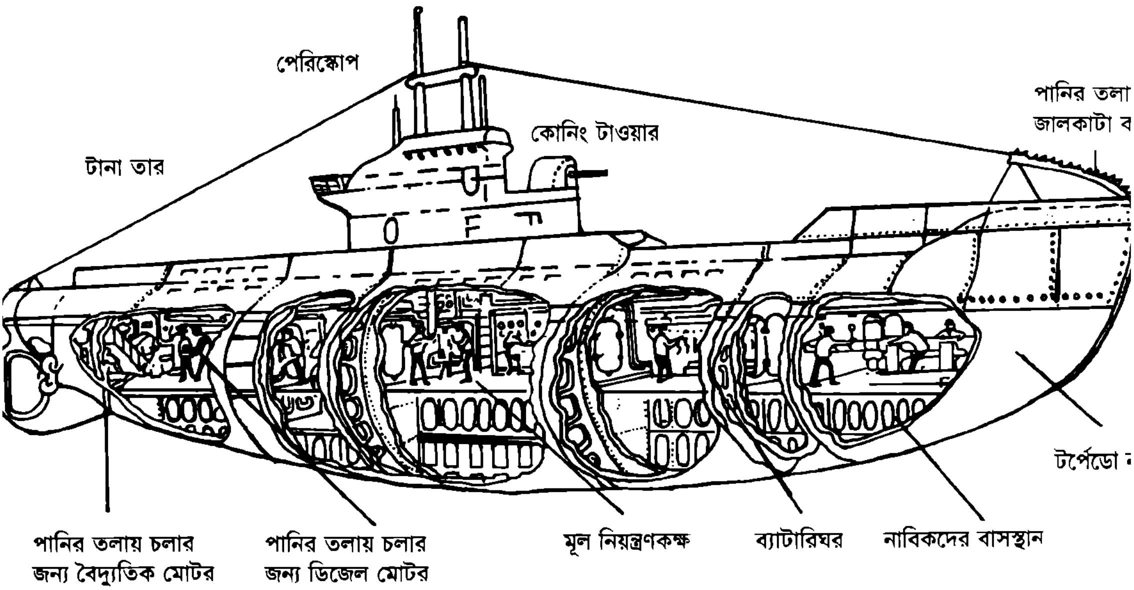

সাবমেরিনের অভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগের কিছু কারিগরি দিক

ভেতরের খোলটি শক্ত ও পুরু ইস্পাত (দ্র) দিয়ে তৈরি হওয়ায় গভীর পানির চাপ এর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। বাইরের খোলটির ছিদ্র দিয়ে পানি প্রবেশ করানো যেতে পারে যাতে প্রয়োজনবোধে এর ওজন বাড়িয়ে পানিতে ডোবানো যায়।

সাবমেরিনের মধ্যখান থেকে প্রায় ৬ মি. উঁচু সরু একটি মাস্তুল উপরে উঠে গেছে। এটি পেরিস্কোপ, রেডার (দ্র) ও রেডিও অ্যান্টেনা (দ্র)-কে ধরে রাখে। মাস্তুলের মাথা জাহাজের ব্রীজ হিসাবেও কাজ করে, যেখান থেকে ক্যাপ্টেন সাবমেরিন পরিচালনা করেন। মাস্তুলের দুই দিকে দু'টি ইস্পাতের পাখা থাকে। এই পাখা দু'টি সাবমেরিনকে বিভিন্ন গভীরতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। সাবমেরিনের পেছন দিকে একটি প্রপেলার থাকে এবং তার উপরে ও নিচে দু'টি হাল থাকে, যা জাহাজকে নির্দিষ্ট দিকে পরিচালনা করে। এক মিনিটের মধ্যেই এই সাবমেরিন ৩০ মি. পর্যন্ত গভীরতায় যেতে পারে। বিশেষ ধরনের তৈরি সাবমেরিন ১,৫০০ মি. পর্যন্ত গভীরতায় যেতে সক্ষম।

মু. এ.

সাবান

আমরা নিত্যই নানা কাজে সাবান ব্যবহার করে থাকি– কাপড়চোপড় ও দেহকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখাই এর প্রধান কাজ। ব্যবহারের বিধি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সাবান তৈরি করা হয়; তৈরি করার উপাদানগুলিও অনেকটাই ভিন্ন হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, একই ধরনের সাবান আবার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতেও তৈরি করা যায়। এইসব পদ্ধতির ওপর যেমন তৈরি সাবানের প্রকৃতি বা গুণাগুণ নির্ভর করে, তেমনি তা নির্ভর করে যেসব কাঁচামাল (raw material) থেকে তা তৈরি করা হয় তাদের ওপর।

সাবান তৈরির কাজে প্রধানত যে দু'টি দ্রব্য দরকার হয়, তাদের মধ্যে একটি হল ক্ষার আর অন্যটি তেল বা চর্বি কিংবা তাদের সংমিশ্রণ। এই ক্ষারের মধ্যে ব্যবহৃত হয় সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং তেল ও চর্বির মধ্যে নারিকেল (দ্র), বাদাম, মহুয়া, ভেরেণ্ডা বা রেড়ি, তিল, তুলা বীজের তেল ইত্যাদি এবং চর্বি হিসাবে গরু-ছাগল ও শূকরের চর্বি বা লার্ড (lard) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

সাধারণ সাবান হল চর্বি ও তেল জাতীয় জিনিসের মধ্যে যেসব ফ্যাটি অ্যাসিড (দ্র) থাকে তাদেরই সোডিয়াম (দ্র) ও পটাসিয়াম লবণের এক সংমিশ্রণ। তাই তেল ও চর্বিজাতীয় জিনিসকে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্বারা জলান্বিত (hydrolise) বা এ ক্ষেত্রে যাকে বলে সাবান্বিত (saponify) করে কিংবা উচ্চতর ফ্যাটি অ্যাসিড (higher fatty acids)-কে সরাসরি নিরপেক্ষ (neutral) করে তৈরি করা হয়। চর্বি ও তেলকে সাবান্বিত করার জন্য তিনটি বিশিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন (১) শীতল (cold), (২) আধা ফুটন্ত (semi boiled) ও (৩) ফুটন্ত (boiled) পদ্ধতি। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহার করে যেসব সাবান তৈরি করা হয় সেগুলিকে শক্ত সাবান (hard soap) ও পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহার করে যেসব সাবান তৈরি করা হয় তাদেরকে বলা হয় নরম সাবান (soft soap)। কাপড় কাচা ও গায়ে মাখা সাবান সাধারণত শক্ত শ্রেণীর ও দাড়ি কমানোর সাবান নরম শ্রেণীর হয়ে থাকে।

স্টিয়ারিক অ্যাসিড ও পামিটিক অ্যাসিড নামে যে দু'টি জৈব অ্যাসিড আছে সে দু'টি অ্যাসিড হচ্ছে উচ্চ আণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিড। এদেরই সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণকে বলা হয় সাবান। উত্তাপের সাহায্যে নানা রকম চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কস্টিক সোডার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে সাবান তৈরি করা হয়। সাবান তৈরির জন্য বড় বড় লোহার কড়াইতে চর্বি, তেল ও কস্টিক সোডা, ক্ষারের জলীয় দ্রবণ একত্রে নিয়ে বাষ্প বা স্টীমের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। এদের মধ্যে বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে খানিকটা খাদ্য-লবণ ঐ মিশ্রণের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। এর ফলে মিশ্রণটি দু'টি স্তরে পৃথক হয়ে পড়ে। উপরের স্তরে থাকে সাবান এবং নিচের স্তরে জমে গ্লিসারল, পানি (দ্র), খাদ্য-লবণ ও অতিরিক্ত ক্ষার। এই জলীয় স্তরটিকে 'সোপ লাই' (soap lye) বলা হয়। এই স্তরটিকে পাত্রের তলদেশ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। ওপরের স্তরে দৈয়ের আকারে সঞ্চিত সাবানকে তুলে আনা হয়। তারপর একে পানির সঙ্গে ফুটিয়ে মিশ্রিত ক্ষার (কস্টিক সোডা) দ্রবীভূত করে সাবানকে পৃথক করা হয়। ঐ সাবান ঠাণ্ডা হলেই কঠিন হয়ে পড়ে। এ সাবান হল 'ওয়াশিং সোপ' বা কাপড় কাচার সাবান।

সুগন্ধি সাবান বা প্রসাধনী সাবান তৈরি করতে হলে এই সাবানের সঙ্গে মেশানো অবিশুদ্ধিগুলি দূর করে নিতে হয়। তারপর তাতে সুগন্ধি, রঙ, ফিলার (filler) ইত্যাদি মিশিয়ে ছাঁচের মধ্যে ফেলে বিভিন্ন আকৃতির সাবানখণ্ড তৈরি করা হয়।

আ. হ. খ.

সামন্তবাদ

মানবসমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের একটি পর্যায়। শব্দটি ইংরেজি Feudalism শব্দের পরিভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

সামন্ত সমাজ বা সামন্তবাদী সমাজের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে জমি। জমির মালিকানার ভিত্তিতে ভূমিমালিক বা সামন্তপ্রভুর উদ্ভব ঘটে। আগেকার রাজরাজড়া, জমিদার ইত্যাদি সকলেই আসলে সামন্তপ্রভু। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রাচীন দাসভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পরে সামন্তবাদী সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব (দ্র) পর্যন্ত সময়কে সামন্ততন্ত্রের স্থায়িত্বকাল গণ্য করা হয়।

সামন্তবাদে জমি থেকে প্রত্যক্ষভাবে যারা ফসল ফলাচ্ছে সেই কৃষকদের কোনো অধিকার জমির উপরে নেই। সামন্তপ্রভু বা জমিদার, ধর্মযাজক বা পুরোহিত এবং রাজা পর্যায়ক্রমে সকলেই চাষীদের নিকট থেকে নানা ধরনের কর আদায় করত। এই করের পরিমাণ অনেক সময় এত বেশি হয়ে দাঁড়াত যে কৃষক যা উৎপন্ন করত তার প্রায় সবটুকুই ঐ কর পরিশোধে চলে যেত। এভাবে ক্রমশ কৃষক পরিণত হত ভূমিদাসে, জমির চৌহদ্দির বাইরে যাওয়ার অধিকার পর্যন্ত তার থাকত না। সামন্তবাদী সমাজ তৈরি হয়েছিল রাজা, সামন্তপ্রভু ও ধর্মাযাজকদের সমন্বয়ে গঠিত এক শাসক ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য। এদের অত্যাচারে শোষিত কৃষকশ্রেণীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ফলে মাঝেমধ্যেই কৃষকবিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে।

ক্রমে উৎপাদনের হাতিয়ারের নতুনতর বিকাশ তথা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে অধিক উৎপাদনক্ষম যন্ত্রাদি ও কৃৎকৌশল দেখা দিলে সামন্তবাদ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং

www.pathagar.com

তার স্থান দখল করে পুঁজিবাদ (দ্র)। তাই মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে সামন্তবাদের কাল চিহ্নিত হয়ে থাকে 'মধ্যযুগ' (দ্র) হিসাবে আর 'পুঁজিবাদ' দিয়ে শুরু হয় আধুনিক যুগের জয়যাত্রা। এই পুঁজিবাদেরই পরবর্তী ঐতিহাসিক উত্তরণ ঘটে সমাজতন্ত্রে (দ্র) বা সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায়।

হা. মা.

সাময়িকী

সাময়িকী হচ্ছে ছোটগল্প (দ্র) কিংবা প্রবন্ধ (দ্র) অথবা উভয়েরই মিলিত সঙ্কলন (দ্র), যা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বেশির ভাগ সাময়িকীই হয় সচিত্র। সাময়িকীতে বৈচিত্র্যময় তথ্যাবলি, মতামত এবং বিনোদনেরও সন্নিবেশ ঘটে। যেমন বহু সাময়িকীতেই থাকে সমকালীন ঘটনাবলি, ফ্যাশন, আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ এবং রান্নাবান্নার মতো বিষয়ও। কোনো কোনো সাময়িকীতে সন্নিবেশ ঘটে ব্যবসাবাণিজ্য, সংস্কৃতি, হবি, চিকিৎসা, ধর্ম, বিজ্ঞান এবং খেলাধুলা।

আবার এক ধরনের সাময়িকী আছে, পাঠকের জন্য যাতে থাকে কবিতা (দ্র) , গল্প, আলোকচিত্র, কার্টুন (দ্র), সিনেমা (দ্র) এবং টেলিভিশন (দ্র) প্রসঙ্গ। সাময়িকী অনেকটা সংবাদপত্রের (দ্র) মতোই বহু লেখকের রচনা প্রকাশ করে থাকে। তবে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকে তা সংবাদপত্র থেকে আলাদা হয়। সাময়িকী সাধারণত যে কাগজে ছাপা হয়, তা সংবাদপত্রের চেয়ে উন্নত মানের। তাই তার স্থায়িত্বও হয় বেশি।

সাময়িক পত্রিকার আকার নানা রকমই হতে পারে, এমনকি কদাচিৎ দৈনিক পত্রিকার আকারও। তবে এগুলোর সংখ্যা সীমিত। বহু দৈনিক পত্রিকায় স্বতন্ত্র চরিত্রের সাময়িকীর পাতা থাকে। বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সংবলিত এসব সাময়িকী নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এগুলোর পৃষ্ঠাসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। বহু বিখ্যাত লেখক তাঁদের প্রথম দিককার রচনা প্রকাশ করেছেন এই সব সাময়িকীর পাতায়। সাময়িকী প্রধানত দু' রকমের হয়ে থাকে। যেমন– স্পেশালাইজড্ এবং কনজ্যুমার ম্যাগাজিন; এগুলো বাণিজ্যিক সাময়িকী। তবে সাময়িকী আছে আরো অনেক রকমের। যেমন— শিশুপত্রিকা, হবি-পত্রিকা, বুদ্ধিজীবী পত্রিকা, পুরুষদের পত্রিকা এবং মহিলাদের পত্রিকা।

নির্দিষ্ট তারিখে এবং নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে সাময়িকী প্রকাশিত হয়। সাময়িক পত্র প্রকাশনার কাজ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। যেমন –পরিকল্পনা, সম্পাদক কর্তৃক লেখার দায়িত্ব বণ্টন, শিডিউল ঠিক করা, বিজ্ঞাপন দেওয়া, লেখা ও ছবি সম্পাদনা করা, মুদ্রণ, প্রুফ দেখা, চূড়ান্ত মুদ্রণ, বাঁধাই ও বাজারজাতকরণ। সাময়িকীর আয় আসে বিক্রি ও বিজ্ঞাপন থেকে।

দৈনিক পত্রিকা অথবা পুস্তক বিক্রেতাদের তালিকা থেকেই খুব সম্ভব সাময়িকীর উদ্ভব। এসব তালিকা বা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা বা বিবরণ থাকত। ষোড়শ শতকে ফ্রান্সে এ ধরনের তালিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা (দ্র) ও অন্যান্য দেশে এর প্রচলন হয়। প্রথম সাময়িকী প্রকাশ পায় সাহিত্য-পত্রিকা হিসাবে। ইংল্যাণ্ডের 'দ্য ট্যাটলার' এবং 'দ্য স্পেকটেটর'-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে বের হয় 'দ্য জেন্টলম্যান্স্ ম্যাগাজিন'। এর প্রকাশ অব্যাহত থাকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। প্রথম মার্কিন সাময়িকীর নাম 'দ্য আমেরিকান ম্যাগাজিন' অথবা 'এ মান্থলি ভিউ'। ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'লাইফ', 'টাইম', 'নিউজউইক' এবং 'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আ. কা.

সামাদ, সৈয়দ আবদুস [১৮৯৫—১৯৬৪]

এই উপমহাদেশের ফুটবল জাদুকর হিসাবে খ্যাত। উপমহাদেশের ফুটবলামোদীদের কাছে 'জাদুকর সামাদ' নামে পরিচিত। পুরো নাম সৈয়দ আবদুস সামাদ। তাঁর জন্ম ১৮৯৫ সালে, ভারতের বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়ায়।

১৯১৩ সালে রংপুরের তাজ ক্লাবের হয়ে কলিকাতায় (দ্র) খেলতে গিয়ে ফুটবল সংগঠকদের নজরে পড়েন। ১৯১৫ সালে কলিকাতার দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব এরিয়ান্স

www.pathagar.com

সামাদকে দলভুক্ত করে। সেবার অনেকটা সামাদের অসাধারণ নৈপুণ্যে এরিয়ান্স ক্লাব প্রথম বিভাগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। পাঁচ বছর পর ১৯২০ সালে সামাদ ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ক্লাবে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে ভারতীয় জাতীয় দলের খেলোয়াড় হিসাবে তিনি বার্মা (দ্র), যুক্তরাজ্য (দ্র) এবং চীন (দ্র) সফর করেন। চীনের পিকিং (এখন বেইজিং)-এ অনুষ্ঠিত খেলায় ভারতীয় দল প্রথমার্ধে ০-৩ গোলে পিছিয়ে পড়লে দ্বিতীয়ার্ধে বদলি খেলোয়াড় হিসাবে সামাদকে মাঠে নামানো হয় এবং তিনি পরপর ৪টি বিস্ময়কর গোল করে সে ম্যাচ জয় করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ঢাকার (দ্র) তৎকালীন শীর্ষ দল ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং এবং কলিকাতা মোহনবাগান ক্লাবে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এই সময় তাঁর দক্ষতা এবং নৈপুণ্য সারা বাংলার দর্শক ও কর্মকর্তাদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়ায়। ১৯৩৩ সালে সামাদ কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে যোগ দেন এবং এই ক্লাবে খেলেই তিনি ফুটবল থেকে অবসর নেন। বিভিন্ন সূত্রমতে তিনি ১৯৪১ সাল অর্থাৎ প্রায় ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ফুটবল খেলেছেন।

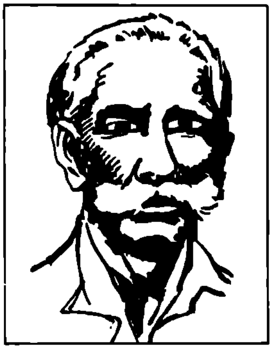

সামাদ ড্রিবলিং এবং গোলে লক্ষ্যভেদী শটের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

তিনি ১৯৬৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সৈয়দপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অ. ব.

সাম্যবাদ

ইংরেজি 'কমিউনিজ্‌ম্' (Communism) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত এটি এক আদর্শগত ধারণা ।

কমিউনিজ্‌ম্ শব্দের উৎপত্তি উনবিংশ শতাব্দীতে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে ১৮৪৮ সালে মার্ক্স (দ্র) ও এঙ্গেল্‌স্ (দ্র) লিখিত কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো (দ্র) বা সাম্যবাদী ইস্তাহার এবং তার সঙ্গে যুক্ত কমিউনিস্ট লীগ (Communist League) সংস্থা এই শব্দটি প্রচলনের জন্য দায়ী। আসলে তা নয়। ১৮৪১ সালে বিলেতে গুড্‌উইন্ বার্ম্‌বি (Goodwyn Barmby)) লণ্ডন কমিউনিস্ট প্রোপাগাণ্ডা সোসাইটি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখান থেকেই নামটি প্রথম চালু হয়। বার্ম্‌বি লিখেছেন যে তিনিই কমিউনিজ্‌ম্ কথাটা প্রথম উচ্চারণ করেন, যা পরে পৃথিবীব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। ফরাসি দেশেও কিন্তু ১৮৪০ সাল নাগাদ 'কমুনিস্ত' শব্দ উদ্ভাবিত হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিজ্‌ম বা সাম্যবাদ বলতে স্বাভাবিকভাবেই যে ধারণা প্রকাশিত হয়, তা হল : উৎপাদনের উপায় (অর্থাৎ মানুষের শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ) এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পত্তি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণী নয়, সকল মানুষই সমভাবে ভোগ করবে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের এক পর্যায়ে দেখা যায়, আদিম সমাজে এরকম গণসম্পত্তির ধারণা ও ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতেরা তার নাম দিয়েছেন Primitive Communism বা আদিম সাম্যবাদ। পরে সমাজবিকাশের ধারায় তা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্ত তা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে বা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু জনগোষ্ঠীতে ছোট আকারে এ ব্যবস্থা পরবর্তী কালে চালু থেকেছে।

যা হোক, আধুনিক কালে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ পুনরায় সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করে, সমাজের উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় অর্থনীতি–শ্রেণীস্বার্থ, ব্যক্তিশ্রম- শোষণের রূপ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে পুনরায় সমাজতন্ত্রের মতবাদটিকে তাত্ত্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন। পুঁজিবাদের (দ্র) বিপক্ষে সমাজতন্ত্রকে (দ্র) তাঁরা উন্নততর সমাজব্যবস্থা হিসাবে তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠা করে দেখান যে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নততম অবস্থা হল সাম্যবাদ বা কমিউনিজ্‌ম্ এবং সেখানে উপনীত হওয়ার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে সমাজতন্ত্র।

পৃথিবীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত (১৯১৭) হয়েছিল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে (দ্র)।

হা. মা.

সাম্রাজ্যবাদ

অনেক ছোট ছোট রাজ্য বা দেশ মিলে গঠিত হয় সাম্রাজ্য। বাংলা ভাষায় 'সম্রাট' ও 'সাম্রাজ্য' দুটো শব্দই যথেষ্ট

www.pathagar.com

প্রাচীন, কিন্তু 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দ বা শব্দটির যথার্থ অর্থ সে-তুলনায় বেশ আধুনিক, কারণ imperialism শব্দের পরিভাষা হিসাবে কথাটি বাংলায় চালু হয়েছে। ইংরেজি ভাষাতেও শব্দটির প্রচলন উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়েছিল।

সাধারণভাবে আমরা সাম্রাজ্যবাদ বলতে বুঝি কোনো দেশ বা জাতির ভিন্ন কোনো দেশ বা জাতির ওপর প্রভুত্ব করা, শাসনভার চাপানো। পৃথিবীর প্রাচীন কালের ইতিহাসে এরকম প্রায়ই দেখা গেছে : সুমেরীয়, আসিরীয়, গ্রিক, পারস্য, রোম ও চীন (দ্র) তাদের নিজ নিজ দেশের সীমানার বাইরে অন্য দেশ জয় করে শাসন করেছে, উপনিবেশ তৈরি করেছে। আধুনিক কালে ব্রিটিশ, ফরাসি, স্পেনীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশেষভাবে পরিচিত ও আলোচিত।

অতীতে সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্যতম প্রেরণা ছিল কোনো বিশেষ সম্রাট বা জাতির বাহুবল প্রদর্শন ও প্রতিষ্ঠা করা। অন্য জাতিকে পরাজিত করে তাকে দমন ও শোষণ করার মধ্যে বিজয়ী সম্রাট বা জাতি নিজের শৌর্য-বীর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করত। প্রাচীন এই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এখনকার আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য অনেক। প্রাচীন কালের তুলনায় বর্তমানে ভিন্ন দেশের উপর কর্তৃত্ব করার প্রধান উপায় অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা এবং তার মাধ্যমে অন্য দেশ বা জাতিকে শোষণ করা। আমেরিকা (দ্র) কোনো দেশ জয় করে ভোগদখল করছে না, তবুও যে বলা হয় 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ' তার কারণ ঐ অর্থনৈতিক আধিপত্য।

এই যে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, এর সঙ্গে পুঁজিবাদের (দ্র) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিগণ জোট বেঁধে আন্তর্জাতিক বাজারে একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশ্বের সমস্ত দুর্বল জাতিকে শোষণ ও শাসনের জন্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার চেষ্টা করে।

হা. মা.

সায়েন্স ফিকশান বিজ্ঞান কল্পকথা দ্র
সারা ব্রিজ হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দ্র

সারেঙ্গি

তারে নির্মিত সঙ্গীতযন্ত্র। লৌকিক সঙ্গীতযন্ত্ররূপে প্রাচীন

বাদ্যযন্ত্র সারেঙ্গি। বাজাচ্ছেন ওস্তাদ মোহাম্মদ সগীরউদ্দিন খাঁ

কাল থেকেই ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে সারেঙ্গির ব্যবহার ছিল। স্থানভেদে সারেঙ্গির আকারেও পার্থক্য ঘটত। সপ্তদশ শতক থেকে সারেঙ্গি রাগসঙ্গীতযন্ত্ররূপে প্রচলন লাভ করে ও কণ্ঠসঙ্গীতের সহায়ক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে সারেঙ্গিতে একক বাদনের ধারাও প্রচলিত হয়। তবে কণ্ঠসঙ্গীতের সহায়ক যন্ত্র রূপেই এর প্রধান ভূমিকা বজায় থাকে।

প্রায় দুই ফুট লম্বা একটি কাষ্ঠখণ্ড খোদাই করে সারেঙ্গির অবয়ব তৈরি করা হয়। কাষ্ঠখণ্ডের নিচের দিকটা খোলের মতো খোদাই করে চামড়ায় ছেয়ে দেওয়া হয়। ছাউনির মাঝখানে বসানো হয় একটি সওয়ারি বা ব্রিজ। কাষ্ঠখণ্ডের ওপরের দিকের দুই পাশে থাকে দুই-দুই করে চারটি চাবি বা কীলক বা কান। চারটি কানে সারেঙ্গির প্রধান

www.pathagar.com

চারটি তার বাঁধা থাকে। তারগুলো সওয়ারির ছিদ্রের ভেতর দিয়ে নিয়ে নিচের প্রান্তে বা মেরুতে বেঁধে দেওয়া হয়। এ ছাড়া সারেঙ্গিতে থাকে ২৫ বা ৩০টি তরপের তার। প্রধান চাবিগুলোর খানিক নিচে বাম পাশে বসানো চাবির সারিতে বাঁধা তরপের তার সওয়ারির দুই নম্বর সারির ছিদ্রের ভেতর দিয়ে গিয়ে মেরুতে বাঁধা পড়ে। স্বর নির্দেশ করার জন্য কোনো সারিকা সারেঙ্গিতে থাকে না। সারেঙ্গি ছড় দিয়ে বাজানো হয়। এর আওয়াজ সুমিষ্ট ও গম্ভীর। দিল্লি ঘরানা ও বারানসী ঘরানা হচ্ছে সারেঙ্গির দুই বিখ্যাত ঘরানা।

ক. গো.

সার্ক (SAARC)

SAARC

সার্কের মনোগ্রাম

দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ তথা বাংলাদেশ (দ্র), ভারত (দ্র), ভুটান (দ্র), মালদ্বীপ (দ্র), নেপাল (দ্র), পাকিস্তান (দ্র) ও শ্রীলঙ্কা (দ্র) নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম। ইংরেজিতে এর পুরো নাম South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC). বাংলায় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা।

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ৪ঠা মার্চ কুমিল্লার দাউদকান্দিতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ সালের মে মাসে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক ফোরাম গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে এর সম্ভাবনা ও গুরুত্ব যাচাইয়ের উদ্দেশে কলম্বো, কাঠমাণ্ডু ও ইসলামাবাদে সাতটি দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের মোট তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সালের ২রা আগস্ট দিল্লির বৈঠকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়।

সাতটি দেশের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেগুলো হল—১. কৃষি (সমন্বয়কারী: বাংলাদেশ); ২. গ্রামীণ উন্নয়ন (শ্রীলঙ্কা); ৩. টেলিযোগাযোগ (পাকিস্তান); ৪. আবহাওয়া (ভারত); ৫. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা (নেপাল); ৬. ডাকব্যবস্থা (ভুটান); ৭. পরিবহণব্যবস্থা (পাকিস্তান); ৮. প্রযুক্তি (পাকিস্তান); এবং ৯. খেলাধুলা, শিল্প ও সংস্কৃতি (ভারত)।

সার্কের মূল লক্ষ্যগুলো হল— ১. দক্ষিণ এশীয় জনগণের কল্যাণ সাধন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তাদানের মাধ্যমে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করে সকলের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা ও তাদের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো, ৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখা, ৪. পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতা বজায় রাখা এবং একে অন্যের সমস্যা উপলব্ধি করা ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং ৫. অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা।

সাতটি দেশের সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানেরা বছরে অন্তত এক বার তাঁদের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়ে থাকেন। সদস্য-দেশগুলোর একেক দেশে একেক বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী বৈঠক যে দেশে অনুষ্ঠিত হবে সে দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান সার্কের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বৈঠক অনুষ্ঠান করা পর্যন্ত তিনি সরাসরি সার্কের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন।

১৯৮৫ সালের ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর ঢাকায় সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী (দ্র), পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধন ও মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইউম যোগদান করেন। এরপর সার্কের আরো আটটি শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ নবম

www.pathagar.com

শীর্ষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে ১৯৯৭ সালের ১২ থেকে ১৪ই মে তারিখে।

সুজ. ব.

সার্জারি শল্যবিদ্যা / সার্জারি দ্র

সার্জেণ্ট জহুরুল হক [১৯৩৫—১৯৬৯]

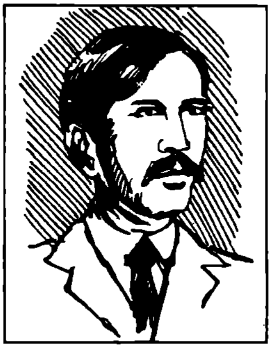

নোয়াখালি জেলার সুধারাম থানার সোনাপুরে ১৯৩৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি সার্জেণ্ট জহুরুল হকের জন্ম। পিতা কাজী মুজিবুল হক, মাতা দিল আরা বেগম। ১৯৫৩ সালে নোয়াখালি জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯৫৩-৫৫ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আই. কম. পড়া শেষ করেন।

১৯৫৬-র জুন মাসে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগ দেন এবং পরে সার্জেণ্ট পদে উন্নীত হন।

১৯৬৭-র ডিসেম্বরে সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় তাঁকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়। 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যরা' অর্থাৎ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' (দ্র) হিসাবে সুপরিচিত মামলার ৩৫ জন আসামীর মধ্যে তিনি ছিলেন ১৭ নম্বর ব্যক্তি। তাঁকে আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্স আইনের আওতায় কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ঢাকা সেনানিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঊনসত্তরের প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের (দ্র) মুখে পাকিস্তান সরকার এই মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। কিন্তু এ সময়েই সার্জেণ্ট জহুরুল হক বন্দিনিবাসের প্রহরী হাবিলদার মনজুর শাহ্-র দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন এবং সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ১৯৬৯-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রাণত্যাগ করেন।

সার্জেণ্ট জহুর ছিলেন অনমনীয় চরিত্রের এক জন দেশপ্রেমিক সৈনিক। এ জন্য সহকর্মী বন্ধুরা তাঁকে ভালবেসে 'মার্শাল' খেতাব দিয়েছিলেন। এক জন ভাল সাঁতারু, ফটোগ্রাফার ও আঁকিয়ে হিসাবে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। তাঁর আঁকা ছবি ঢাকার বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে (দ্র) রক্ষিত আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) অন্যতম ছাত্রাবাস 'সার্জেণ্ট জহুরুল হক হল' তাঁর নামের স্মৃতি বহন করছে।

হা. র.

সার্ত্র্, জঁ পল [১৯০৫—১৯৮০]

ফরাসি দার্শনিক, সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব ও সমাজ-সমালোচক। তবে সমধিক বিখ্যাত আধুনিক অস্তিত্ববাদের (দ্র) প্রবক্তা হিসাবে।

তাঁর সূত্রায়িত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি জোর দেওয়া হয়েছে মানুষের চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপরে। অবশ্য তিনি তাঁর পরবর্তী কালের রচনাকর্মের ভেতর দিয়ে ইতিহাস ও শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতা কীভাবে যুক্ত, সেটাও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

সার্ত্র্ [Jean Paul Sartre]-এর জন্ম ১৯০৫ সালের ২১শে জুন, প্যারিসে (দ্র)। ১৯২৯ সালে তিনি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন প্যারিসের ইকোল্ নর্মালি সুপেরিওর থেকে। এই সময়ই তাঁর পরিচয় ঘটে সিমন দ্য বোভোয়া-র সঙ্গে। এই সাহিত্যিক, সংগ্রামী, বুদ্ধিজীবী ও বিদূষী মহিলাই তাঁর আজীবন সঙ্গিনী হয়ে ওঠেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সার্ত্র্ শিক্ষকতার কাজ করেন, সম্পাদনা করেন 'লা তঁ মদ্যার্ন্' (মডার্ন্ টাইমস্ বা আধুনিক কাল) নামের বিখ্যাত একটি পত্রিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় সার্ত্র্ এক বছর বন্দিজীবন যাপন করেন। তিনি সেইসব সাহসী ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম, যাঁরা নাৎসি (দ্র) জবরদখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯৬৪ সালে সার্ত্র্কে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর অন্যতম 'ন্যসিয়া' (১৯০৮), 'বিয়িং অ্যাণ্ড নাথিংনেস' (১৯৪৩), 'দ্য রোড্স্ টু ফ্রিডম' (১৯৪৫), 'দ্য ক্রিটিক অব ডায়ালেক্টিক্যাল রিজ্ন্' (১৯৬০) ও 'দ্য ওয়ার্ড্স্' (১৯৬৯) ইত্যাদি।

আ. হ.

www.pathagar.com

সালাহ্উদ্দিন, গাজী [১১৩৮—১১৯৫]

খ্যাতনামা মুসলিম বীর ও সাহসী সেনানায়ক। তাঁর জন্ম ১১৩৮ খ্রিস্টাব্দে। পিতার নাম নাজমুদ্দিন আইয়ুব।

মাত্র ২৬ বছর বয়সে দামেস্কের খলিফা নূরউদ্দিনের এক সৈন্যদলের অধিনায়ক হিসাবে সালাহ্উদ্দিন মিশর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন (১১৬৪)। এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর গৌরবময় সৈনিকজীবন।

এরপর সালাহ্উদ্দিন বহু যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন এবং জয়লাভ করেন। পরে আপন যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে তিনি মিশরের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন (১১৬৯)। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বছর। ক্রমান্বয়ে সালাহ্উদ্দিন মুসলিম জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর ব্যক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

মুসলিম জগতের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, দুর্বলতা এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন (১১৭৪)।

সুলতান সালাহ্উদ্দিনের বিশ্বজোড়া খ্যাতি মূলত খ্রিস্টানদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে বা ক্রুসেডে (দ্র) জয়লাভের কারণে। ১১৭৯, ১১৮৭, ১১৮৮, ১১৮৯ এবং ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান 'ধর্মযোদ্ধা' বা ক্রুসেডারদের সঙ্গে সালাহ্উদ্দিনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। প্রতিটি যুদ্ধে সালাহ্উদ্দিন জয়লাভ করেন। ফলে ফিলিস্তিন, বায়তুল মোকাদ্দাসসহ বিরাট এলাকা মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। যুদ্ধে উপর্যুপরি বিজয় লাভের কারণে তিনি 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত হন।

সালাহ্উদ্দিন শুধু দক্ষ শাসক ও অসমসাহসী সেনানায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন উদারহৃদয় মানবতাবাদী। যুদ্ধজয়ের পর বিজিত খ্রিস্টান নরনারীর প্রতি তাঁর দয়া ও মহানুভবতার কথা ইতিহাসখ্যাত। ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দামেস্ক-এ মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

সালিম আলি [১৮৯৬—১৯৮৭]

ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান পক্ষীবিশারদ। ভারতের বোম্বাই(এখন মুম্বাই)-তে অবস্থিত গিরগাঁ অঞ্চলের খেতওয়াড়ি গ্রামে ১৮৯৬ সালের ১২ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। সালিম আলিরা ছিলেন তৎকালীন বৃহৎ 'ইসমাইলিয়া' সম্প্রদায়ের মুসলমান। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দিন ভাঙন সৃষ্টি হলে সালিম আলিদের বংশ-শেকড় ছোট হয়ে পড়ে। এখন কয়েক হাজার মাত্র মানুষ আছে এই ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম 'তায়েব্জি' পরিবার এবং খেলাধুলায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার 'ফৈজি' পরিবার সালিম আলিদের বংশধর।

সালিম আলির পিতার নাম মইজউদ্দিন এবং মাতার নাম জিনাতুন্নেসা। মাত্র তিন বছর বয়সেই পিতামাতা হারান তিনি। পাঁচ ভাই এবং চার বোনের সবার ছোট সালিম আলি। অনাথ শিশু হিসাবে তিনি মামা আমিরুদ্দিন তায়েব্জি এবং তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী হামিদা বেগমের আশ্রয়ে চলে যান এবং তাঁদের স্নেহ-যত্নে বড় হতে থাকেন।

ছোটকাল থেকেই সালিম আলির ছিল পাখির প্রতি ভীষণ ঝোঁক। কৈশোরেই তিনি গিরগাঁ অঞ্চলের বনে বনে ঘুরে পাখির গান শুনতেন, পাখিদের আচার-আচরণ দেখতেন, পাখির ডাক নকল করার চেষ্টা করতেন। মামা আমিরুদ্দিনের শিকারের নেশা ছিল প্রচণ্ড। পাখির প্রতি কিশোর সালিম আলির মনোযোগ দেখে আমিরুদ্দিন তাঁকে শিকারের সঙ্গী করে নেন। এভাবে সালিম আলি নিজেই পাখিশিকারিতে পরিণত হন। পাখিশিকারের সেই দুর্দমনীয় নেশা ধীরে ধীরে উজ্জীবিত হয়ে পাখি পর্যবেক্ষণে রূপ নেয়। পক্ষী পর্যবেক্ষণ তো একটি শাস্ত্র এখন, ইংরেজিতে বলে অর্নিথোলজি (ornithology)।

www.pathagar.com

পক্ষীবিশারদ অধ্যাপক সালিম আলির এই চমৎকার রসঘন চিত্রটি এঁকেছেন তাঁর বন্ধু শিল্পী জে. এন. লক্ষ্মণ

এক দিন এক শিকার-করা পাখিকে কেন্দ্র করে সালিম আলির সঙ্গে পরিচয় হয় ইণ্ডিয়ান ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির পরিচালক মিলাডের সঙ্গে। এই পরিচয়ের ফলে তাঁর সামনে খুলে যায় এক নতুন পথ। তিনি মিলাডের কাছ থেকে পাখি বিষয়ক অনেক বই সংগ্রহ করেছিলেন।

অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী সালিম আলি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নতুন নতুন পাখির খোঁজে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন। আশি বছর বয়সে তিনি লাদাকের পার্বত্য এলাকায় ছুটে গিয়েছিলেন বিলুপ্তপ্রায় এক সারসের সন্ধানে। পাখিদের সম্পর্কে নতুন নতুন বিষয়ে জানবার আগ্রহে প্রায় নব্বই বছর তিনি সাধনা করে গেছেন, লিখেও গেছেন প্রচুর। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে 'দ্য বুক অব ইণ্ডিয়ান বার্ড্স্', 'হ্যাণ্ডবুক অব দ্য বার্ড্স্ অব ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান' উল্লেখযোগ্য।

পাখি নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি পৃথিবীর অনেক দেশ থেকেই পেয়েছেন সম্মান ও পুরস্কার। ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৮ সালে 'পদ্মভূষণ' এবং ১৯৭৬ সালে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৮৭ সালের ২০শে জুন তিনি পরলোকগমন করেন।

র. শা.

সাল্‌ফার গন্ধক দ্র

সাল্‌ফোনেমাইড কেমোচিকিৎসা দ্র

সাহাবা / সাহাবী

'সাহাবা' এবং 'সাহাবী' শব্দ দু'টি আরবি। এর অর্থ সঙ্গী, সাথী, সহচর। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে স্বচক্ষে দর্শনকারী সহচর বা সঙ্গী।

সাহাবীগণ মুসলমানদের নিকট খুবই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। কারণ তাঁরা মহানবী (স.)-এর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য-সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং রসূল (স.)-এর অনুকরণে জীবনগঠনে সচেষ্ট ছিলেন।

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত সালমান ফারসি (রা.), হযরত বেলাল (রা.), হযরত উসামা (রা.), হযরত আবুজর গিফারী (রা.) প্রমুখ বিখ্যাত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সর্বশেষ সাহাবীর নাম আমির ইবনে ওয়াসিল আল কিনানী (রা)।

মু. মা.

www.pathagar.com

সাহারা মরুভূমি

আফ্রিকা (দ্র) মহাদেশে অবস্থিত সাহারা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি (দ্র)। এর আয়তন প্রায় ৯০ লক্ষ বর্গ কিমি এবং লোকসংখ্যা ২০ লক্ষের বেশি হবে না। অধিবাসীরা অধিকাংশই আরবীয়। পাহাড়, মালভূমি, বালি ও অনুর্বর ভূমি দ্বারা সাহারা মালভূমি গঠিত। বেশ কিছু মরূদ্যানও আছে। কূপ ও প্রস্রবণ থেকেই কিছু পানি পাওয়া যায়। নীল নদের ধারে কিছু চাষবাসও হয়।

মিশর, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, শাদ, সুদান, নাইজার, মালি প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত সাহারা মরুভূমির বিস্তৃতি। সাহারার লিবিয়া ও আলজেরিয়া অংশে প্রচুর তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে। তা ছাড়া এই মরুভূমিতে তামা (দ্র), লোহা (দ্র), ফসফেট ইত্যাদি অনেক খনিজ দ্রব্যও আছে।

আবহাওয়া অত্যন্ত গরম ও শুকনো। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০ সেমি-র বেশি হবে না। দিনে প্রচণ্ড গরম, রাতে ঠাণ্ডা। কখনো কখনো পাহাড়ের চূড়ায় বরফও জমে থাকতে দেখা যায়। শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ১০° সে. থেকে ৪৩° সে. পর্যন্ত ওঠানামা করে। ১৯১২ সালে লিবিয়ার আল্-আজিজিয়ার তাপমাত্রা ৫৮° সে. (১৩৬° ফা.) পর্যন্ত উঠেছিল।

অধিবাসীদের অধিকাংশই যাযাবর শ্রেণীর। তারা ছাগল, ভেড়া, উট (দ্র) পালন করে এবং পানির (দ্র) সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। খেজুর (দ্র), গম (দ্র), বার্লি ইত্যাদি চাষ করে। মরুভূমির কোনো কোনো জায়গায় ঘাস, গুল্ম ও ছোট গাছ জন্মে। পানির সন্ধানে গাছগুলোর মূল মাটির খুব গভীরে পৌঁছায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই বাতাস থেকে পাতার মাধ্যমে পানি গ্রহণ করে। সাপ (দ্র), গিরগিটি ও খেঁকশিয়ালের মতো প্রাণী বাস করে।

১০,০০০ বছর আগে সাহারার অবস্থা এরকম ছিল না। তখন আবহাওয়া অনেক ভাল ছিল, হ্রদ ও ছোট নদী ছিল। এই এলাকায় হাতি (দ্র), জিরাফ (দ্র) ও অন্যান্য প্রাণী বাস করত। প্রায় ৫,০০০ বছর আগে থেকে আফ্রিকার আবহাওয়া শুষ্ক হতে থাকে যার প্রভাব সাহারার ওপর পড়ে। ৪০ থেকে ২৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সাহারা রোমানদের দখলে ছিল। সেখানে তারা কিছু রাস্তাঘাট নির্মাণ করে এবং উন্নত চাষাবাদের প্রবর্তন করে। ৬০০ থেকে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরবেরা উত্তর আফ্রিকা দখল করে রাখে এবং এখানে ইসলাম ধর্ম (দ্র) প্রচার করে। এর আগে থেকেই চলাচলের জন্য উটের ব্যবহার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ হয় এবং তখন থেকেই আরবি ভাষা (দ্র) প্রধান ভাষা হিসাবে প্রচলিত থাকে। ১৮০০ সালের পর থেকে ইউরোপীয়রা সাহারা মরুভূমিতে অভিযানে বের হয়।

মু. এ.

সাহিত্য অকাদমি

জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন–সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা (দ্র), সঙ্গীত (দ্র), নৃত্যনাট্য (দ্র) এবং নৃত্যের উন্নয়ন ও উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে যেসব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় 'সাহিত্য অকাদমি' তার অন্যতম। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে দিল্লি (দ্র)-তে 'সাহিত্য অকাদমি' প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য অকাদমি সাহিত্যে গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক অনুদান ও পুরস্কার প্রদানসহ নানা রকম পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। এ

www.pathagar.com

ছাড়াও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার অনুবাদ করে থাকে। সাহিত্য অকাদমি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর নগদ অর্থ পুরস্কারসহ সম্মান প্রদান করে থাকে। ১৯৫৫ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। সাহিত্য অকাদমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (দ্র), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র), রাজশেখর বসু (দ্র), প্রেমেন্দ্র মিত্র (দ্র), সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে (দ্র), মনোজ বসু, বুদ্ধদেব বসু (দ্র), আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ রয়েছেন।

মে. খা.

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দ্র
সি. আর. দাশ চিত্তরঞ্জন দাশ দ্র

সি এন এন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) বেসরকারি টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র। সারা বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহ করে ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে তা ২৪ ঘণ্টা ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র -সহ বিশ্বের ৯০টি দেশে সম্প্রচার করে থাকে। শুধু সংবাদ প্রচারই এর মূল লক্ষ্য, অন্য কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি নয়। সি এন এন (CNN= Cable News Network)-র মালিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি টেড টার্নার।

১৯৮০ সালের জুন মাসে এর সম্প্রচারকাজ শুরু হলেও অত্যল্পকালের মধ্যে এটি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় টেলিভিশন (দ্র) বা কেব্‌ল্‌ নেটওয়ার্কে পরিণত হয়।

সি এন এন -এর দফতর প্রথমে স্থাপিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়। বর্তমানে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ওয়াশিংটন ডিসি-তে।

বাংলাদেশ সম্প্রচারিত খবরাদির গ্রাহক ও সম্প্রচারক। দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্থানীয় নেতারাও এর সম্প্রচারিত কর্মসূচি বিটিভি-র মাধ্যমে দেখার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬ কোটি মানুষ এর পরিবেশিত সংবাদ ইত্যাদির আগ্রহী দর্শক-শ্রোতা। প্রথম দিকে তেমন জনপ্রিয় না হলেও ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে সূচিত উপসাগরীয় যুদ্ধের খবর ২৪ ঘণ্টা ধরে প্রচারের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সি এন এন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

আ. হু.

সি পি বি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দ্র

সিংহ (lion)

পশুরাজ সিংহ বিড়াল পরিবারের বৃহত্তম সদস্য। বৈজ্ঞানিক নাম *প্যানথেরা লিও (Panthera leo)*। এক সময় আফ্রিকা

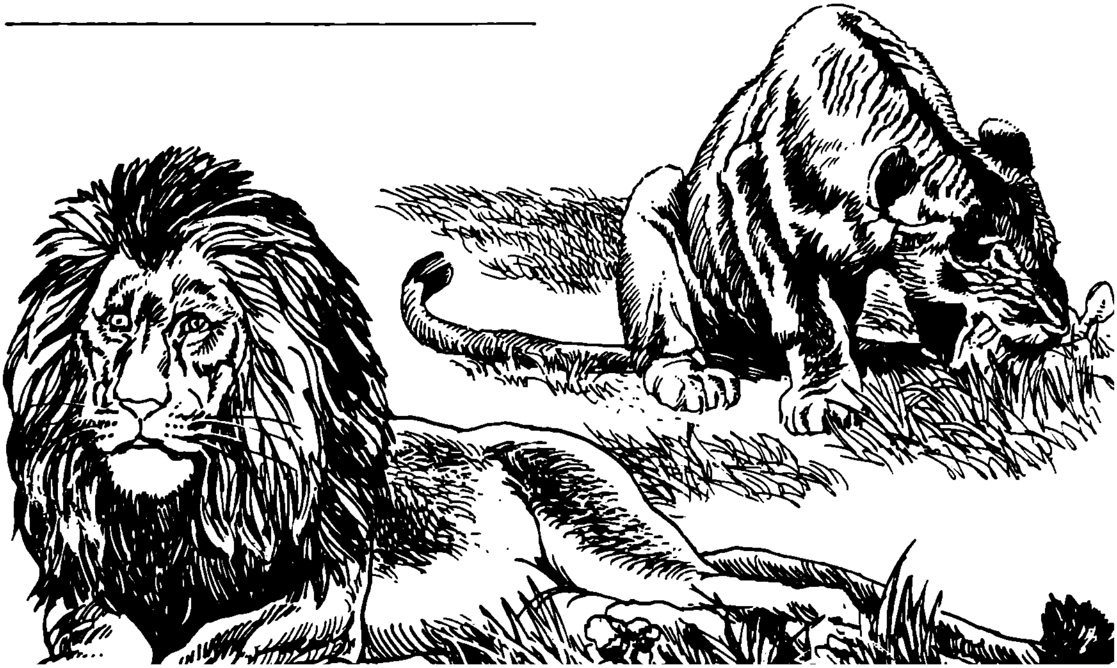

(দ্র), ইউরোপ (দ্র) ও এশিয়ায় (দ্র) বাস করত। বর্তমানে শুধু আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের দেশগুলোতে টিকে আছে। ভারতের (দ্র) গুজরাট রাজ্যের গির অরণ্যে ছোট আকৃতির গির সিংহের বাস। বর্তমানে মাত্র ২৮০-৩০০টি বেঁচে আছে! আফ্রিকারগুলো থেকে এরা কম শক্তিশালী। বাংলাদেশে (দ্র) শুধু চিড়িয়াখানাতেই সিংহের বাস।

পশুরাজের শক্তিশালী দেহটি লম্বা, পা ছোট, মাথা বড়। লেজসহ পুরুষ-সিংহ তিন মিটার লম্বা, লেজ প্রায় এক মিটার। মিটারখানেক উঁচু সিংহের ওজন ১৫০-২৫০ কেজি। সিংহী কিছুটা ছোট। দেহ হালকা হলুদ থেকে গাঢ় বাদামি ছোট লোমে আবৃত। লেজের গোছার অগ্রভাগ গাঢ় বর্ণের।

পুরুষ-সিংহের শৌর্য-বীর্য এর কেশরে। লম্বা কেশরগুলো মাথার পেছন হয়ে ঘাড়, গলা পর্যন্ত বিস্তৃত। সিংহবিশেষে কেশরের রঙ হালকা থেকে গাঢ় হয়। বাদামি কেশরওয়ালা সিংহগুলো সবচেয়ে দামি। আফ্রিকার কোনো কোনো সিংহের কেশর হয় না। সব গির পুরুষ-সিংহেরই ছোট কেশর থাকে। সিংহীর কেশর হয় না।

সিংহ ফাঁকা, শুকনো, ছোট ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা বনে দল বেঁধে বাস করে। দলে পুরুষ-স্ত্রী-বাচ্চাসহ দশ-বিশটা সিংহ থাকে। বড়রা সাধারণত দল বেঁধে রাতে শিকারে নামে। সন্ধ্যা ও সকালে সিংহ গর্জন করে। প্রধানত জেব্রা (দ্র), অ্যান্টিলোপ, হরিণ (দ্র), জিরাফ (দ্র) ও গরুজাতীয় প্রাণী শিকার করে। এরা অলস ও নিরীহ। বুড়ো বয়সে অনেক সময় মানুষখেকো হয়।

বছরের যে কোনো সময় প্রজনন করে। ১০৫-১০৮ দিন গর্ভধারণের পর সিংহী দু' থেকে ছ' টি বাচ্চা প্রসব করে। নবজাতকের দেহে গাঢ় দাগ থাকে। বয়স বাড়লে এগুলো মিলিয়ে যায়। সিংহ অরণ্যে ১০-১৫ বছর এবং বন্দি দশায় ২০-২৫ বছর বাঁচে।

আ.ন.ম.আ. র.

সিংহল শ্রীলঙ্কা / সিংহল দ্র

সিকান্‌দার আবু জাফর [১৯১৯—১৯৭৫]

কবি, নাট্যকার, গীতিকার, সাংবাদিক ও সম্পাদক। তিনি ১৯১৯ সালে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি কলিকাতায় (দ্র) বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন এবং কিছুকাল এই কলেজে পড়াশোনা করেন।

সিকান্‌দার আবু জাফর ছাত্রজীবনেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং সেই সঙ্গে সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন। কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) সম্পাদিত কলিকাতার 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

১৯৫০ সালে কলিকাতা থেকে ঢাকায় (দ্র) এসে সিকান্‌দার আবু জাফর রেডিও পাকিস্তানে চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর সহযোগী সম্পাদক এবং ১৯৫৪ সালে 'দৈনিক মিল্লাত'-এর প্রধান সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নিয়মিত তাঁর সম্পাদনায় সাহিত্য মাসিক পত্রিকা 'সমকাল' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা সম্পাদনাই বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসাবে স্বীকৃত। সে সময়ের তরুণ লেখকদের উৎসাহদান ও জাতীয়তাবোধ সমুন্নত রাখার পাশাপাশি সৃজনশীল সাহিত্যচর্চাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আইয়ুব খানের (দ্র) শাসনামলে 'সমকালে' দেশাত্মবোধক, নির্ভীক ও মুক্তচিন্তার রচনা প্রকাশের জন্য তিনি সরকারের বিষনজরে পড়েন। 'সমকালে'র দু'টি সংখ্যা সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তবু তিনি সরকারের কাছে মাথা নত না করে তাঁর সম্পাদনাকর্ম চালিয়ে যান। ১৯৫৮ সালে 'সমকাল মুদ্রায়ণ' নামে একটি ছাপাখানা ও 'সমকাল প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থাও তিনি স্থাপন করেন।

সিকান্‌দার আবু জাফর সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ করেছেন। কবিতা (দ্র), নাটক (দ্র), উপন্যাস (দ্র), অনুবাদ (দ্র), গান, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি শাখায় তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল—কবিতা : 'প্রসন্ন প্রহর' (১৯৬৫), 'বৈরী বৃষ্টিতে' (১৯৬৫), 'তিমিরান্তিক' (১৯৬৫), 'কবিতা—১৩৭২' (১৯৬৮), 'বৃশ্চিক লগ্ন' (১৯৭১); নাটক : 'শকুন্ত

www.pathagar.com

উপাখ্যান' (১৯৫৮), 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৬৫), 'মহাকবি আলাওল' (১৯৬৫); উপন্যাস : 'মাটি আর অশ্রু' (১৯৪২), 'পূরবী' (১৯৪৪), 'নতুন সকাল' (১৯৪৫); কিশোর পাঠ্য: 'জয়ের পথে' (উপন্যাস ১৯৪২), 'নবী কাহিনী' (জীবনী ১৯৫১); অনুবাদ: 'রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম' (১৯৬৬) 'সেন্ট লুইয়ের সেতু' (১৯৬১), বার্নার্ড মালামুডের 'যাদুর কলস' (১৯৫৯), 'সিংয়ের নাটক' (১৯৭১); গান : 'মালব কৌশিক' (১৯৬৯)। তিনি ছয় শতেরও অধিক গান রচনা করেন। কবিতায় তিনি ছিলেন জীবনবাদী ও স্বাধীনতাকামী। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান (দ্র) এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) চলাকালে তাঁর রচিত 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই', 'বাংলা ছাড়ো' ইত্যাদি কবিতা জনগণকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর (দ্র) থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র 'অভিযান' সম্পাদনা করেন। স্বাধীনতার পর তিনি 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি' -র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হন।

১৯৬৬ সালে তিনি নাট্যসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ৫ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

সুজ. ব.

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ফ্রয়েড, জিগ্‌মুণ্ড দ্র

সিগারেট (cigarrete)

তামাকের (দ্র) গুঁড়াভর্তি নানা রকম পাতলা কাগজের শলাকা-বিশেষ। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বিগত চার শ' বছর ধরে তামাক চালু থাকলেও সিগারেটের ধোঁয়া সেবন শুরু হয়েছে উনিশ শতকের শেষের দিকে। বর্তমানে তামাক সেবনের এটি প্রধান উপায়। সিগারেটে ভার্জিনিয়া তামাক বেশি ব্যবহার করা হয়। আগে এটা আমেরিকায় (দ্র) জন্মাত। এখন বাংলাদেশ (দ্র)-সহ পৃথিবীর অনেক দেশে ভার্জিনিয়া তামাক উৎপন্ন হয়।

তামাক পাতার অসম্পূর্ণ দহনের ফলে সিগারেটের ধোঁয়া তৈরি হয়, যার মধ্যে বিভিন্ন গ্যাস (দ্র) ছাড়াও অনেক রকম পদার্থের কণা ভাসমান থাকে। সিগারেটের ধোঁয়ায় যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে তাদের সংখ্যা ৪,০০০-এর বেশি। প্রতিদিন এক প্যাকেট সিগারেট সেবন করলে বছরে এক ব্যক্তি প্রায় ৭০,০০০ বার সিগারেটে 'টান' (puff) দেয় এবং তত বার মুখ, নাক ও শ্বাসনালির আবরণকলা এর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সিগারেটের ধোঁয়ার ৯২ থেকে ৯৫ ভাগ গ্যাস। এর মধ্যে নাইট্রোজেন (দ্র), অক্সিজেন (দ্র) ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের (দ্র) পরিমাণই বেশি। অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে কার্বন মনক্সাইডের (দ্র) নাম উল্লেখ্য। বিভিন্ন পদার্থকণার মধ্যে আলকাতরা (দ্র), নিকোটিন, অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, বেনজোপাইরিন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নিকোটিন একটি অত্যন্ত বিষাক্ত উপক্ষার (alkaloid)। এটা শরীরে রক্তচাপ (দ্র), হৃদ্‌স্পন্দনের হার, হৃদ্‌পেশির সঙ্কোচনের পরিমাণ এবং হৃদ্‌পেশির অক্সিজেন ব্যবহারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তামাকের নিকোটিনই সিগারেটের প্রতি মানুষের নেশা জাগানোর জন্য দায়ী। সিগারেটের ধোঁয়ায় যে কার্বন মনক্সাইড গ্যাস থাকে, তা অত্যন্ত বিষাক্ত। এটা রক্তে অক্সিজেন পরিবহণ এবং ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি করে। সিগারেটের অনেকগুলো উপাদানকে মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর দেহে ক্যান্সার (দ্র) সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হয়েছে। এদের মধ্যে অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন, অ্যারোম্যাটিক অ্যামাইন এবং নাইট্রোস্-অ্যামাইনের নাম উল্লেখ্য।

১৯৬০-এর দশক থেকে সিগারেট সেবনের সঙ্গে মানুষের ফুসফুসের (দ্র) ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ (দ্র), শ্বাসনালির প্রদাহ প্রভৃতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে শুরু করে। অধূমপায়ী লোকদের চেয়ে ধূমপায়ীদের মৃত্যুহার শতকরা ৭০ ভাগ বেশি। সিগারেট সেবনের ফলে শুধু ফুসফুসের ক্যান্সার কিংবা হৃদ্‌রোগই বেশি হয়, তা নয়। এর ফলে হাঁপানির (দ্র) প্রকোপ বাড়ে, পেপ্‌টিক আলসার (দ্র) বেশি হয় এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

অনেক উন্নত দেশে টেলিভিশনে (দ্র) সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করা নিষেধ। বাংলাদেশ টেলিভিশনেও (দ্র) এখন সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় না। অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও সিগারেটের প্যাকেটের ওপর 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' কথাটি লেখা থাকে। উন্নত দেশের অনেক লোকজন আজকাল সিগারেট সেবন ছেড়ে দিচ্ছে। সিগারেট সেবনের অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া

www.pathagar.com

কঠিন নয়; এ জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট।

সা. এ.

সিঙ্কেভিচ, হেন্‌রিক্ কুও ভাদিস্ দ্র

সিজার, জুলিয়াস [খ্রি.পূ.১০০–খ্রি.পূ.৪৪]

ইংরেজিতে জুলিয়াস সিজার (Gaius Julius Caesar) নামে আমরা চিনলেও তাঁর নামের প্রকৃত উচ্চারণ গাইউস ইউলিউস্ কাইজার। পরবর্তী কালে জার্মান ও রুশ সম্রাটকে যে যথাক্রমে কাইজার (Kaiser) ও জার (Tsar) বলা হত, দুটো শব্দই ঐ লাতিন Caeser শব্দ থেকে এসেছে।

সিজার ছিলেন প্রায় আলেকজাণ্ডারের (দ্র) মতোই মহাবীর। দুর্ধর্ষ সেনানায়ক, রোমের স্বৈরাচারী একনায়ক এবং খ্যাতিমান লেখক। তাঁর জন্ম ১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৩ই জুলাই। পরিবারটি অভিজাত হলেও তেমন বিখ্যাত ছিল না। রোম প্রজাতন্ত্রের তখন পড়ন্ত দশা। তিনি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি, সাহসিকতা-শৌর্য ও রাজনৈতিক বুদ্ধির জন্য খ্যাতি অর্জন করছিলেন। তাঁকে গল্ প্রদেশের (প্রাচীন কালে ফ্রান্সের নাম) শাসনভার অর্পণ করা করা হয়। তখন সেখানে খুব অশান্তি চলছিল। সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর আশেপাশের দেশগুলোর যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা করেন তিনি, এর অন্যতম হল ব্রিটেন আক্রমণ। রোমের বাইরে এইসব যুদ্ধজয়, শক্তিশালী ও অনুগত সেনাবাহিনী তৈরি করা ইত্যাদির কারণে রোমে তাঁর সুনাম বাড়ছিল। বস্তুতপক্ষে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার এ ছিল এক কৌশল। তাঁর প্রবল শত্রু ছিলেন পম্পেই। পরে তিনি সেনাদল নিয়ে রুবিকন্ নদী অতিক্রম করে পম্পেইয়ের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, পম্পেই মিশরে পালিয়ে গেলে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে সেখানে গিয়ে হাজির হন। পম্পেই নিহত হন। মিশরে তখন সিংহসানের অধিকার নিয়ে ক্লিওপেট্রা (দ্র) ও তাঁর ভাই ত্রয়োদশ টলেমির মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ চলচিল।

সিজারের সহায়তায় ক্লিওপেট্রা মিশরের রানী হন। এইভাবে একের পর এক যুদ্ধজয় করে রোমে প্রত্যাবর্তনের পর সিজার রোমের একনায়কতন্ত্রী শাসক হিসাবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন এবং শাসনকার্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারসাধন করেন। বৎসর গণনার জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার তিনিই চালু করেছিলেন।

অত্যধিক ক্ষমতা ও সম্পদের লোভের কারণে জুলিয়াস সিজারকে শেষাবধি তাঁর পরিচিত ও প্রিয় জনেরাই হত্যা করে, ৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে সংসদকক্ষের অভ্যন্তরেই।

তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে মাত্র দু'টি উদ্ধার করা গেছে : 'গলের যুদ্ধ বিষয়ে' এবং 'গৃহযুদ্ধ বিষয়ে'। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিবেদন-পর্যালোচনা হিসাবে এ বই দু'টি পৃথিবীতে পথিকৃতের মর্যাদা পায় এবং ঐতিহাসিকদের নিকট অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়।

হা. মা.

সিণ্ডারেলা (Cinderella)

'সিণ্ডারেলা' নামে পরিচিত গল্পটি মূলত ইংরেজি ভাষার গল্প নয়। এই রূপকথাটি ফ্রান্সে 'সঁদ্রিঅঁ' (Cendrillon) আর জার্মানিতে 'আশেন্‌ব্রয়টেল্' (Aschenbrötel) নামে পরিচিত।

সর্বপ্রথম শার্ল্ পেরো (দ্র) গল্পটিকে তাঁর বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজে পরিচিত করান। সৎমায়ের যন্ত্রণায় একটি ছোট্ট মেয়ের দুঃখের জীবন স্বর্গের পরীদের কৃপায় পাল্টে যায়। কেননা মেয়েটি সরলহৃদয়, সৎ, পরিশ্রমী ও নিঃস্বার্থপর ছিল। তার সৎ বোনেরা তাদের কূটবুদ্ধি ও নির্দয়তার জন্য পরে শাস্তি পেয়েছিল।

বাংলা রূপকথাতেও অবিকল এরকমের রূপকথা রয়েছে।

হা. মা.

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ দ্র

সিন ফিন ডি ভ্যালেরা এয়মন্ দ্র

সিনেমা

সাধারণ ফটো বা আলোকচিত্র হচ্ছে স্থির চিত্র; এই ছবি

www.pathagar.com

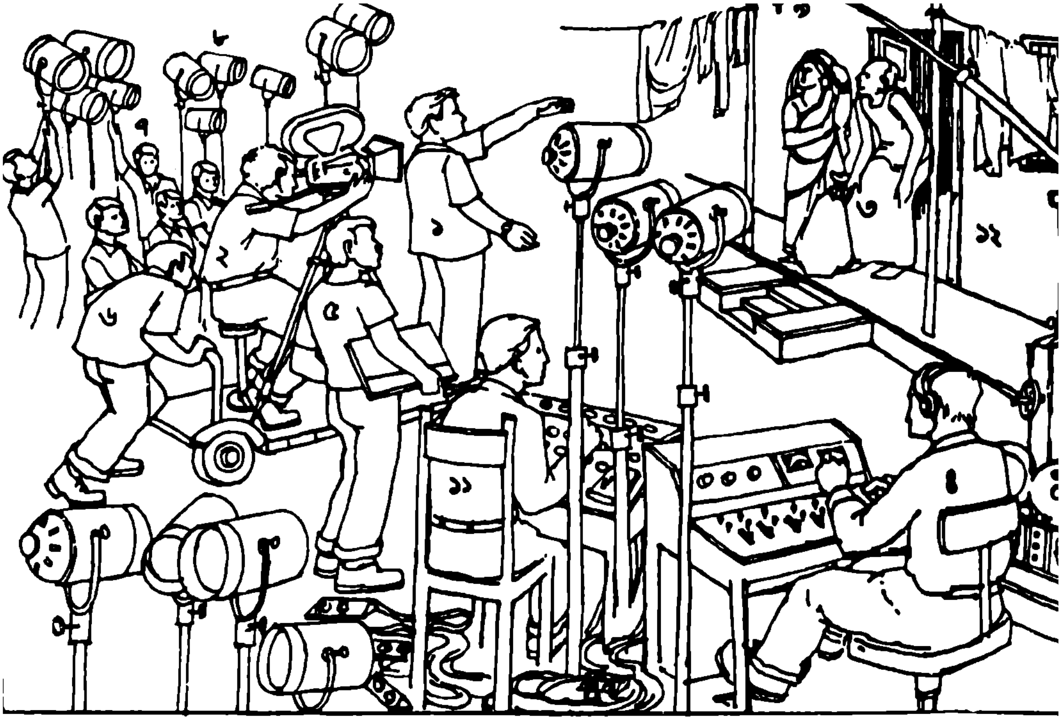

চলচ্চিত্র তৈরি করার জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কলাকুশলী

১. পরিচালক ২. চিত্রগ্রাহক. ৩. অভিনেতা-অভিনেত্রী. ৪. শব্দগ্রাহক. ৫. সহকারী পরিচালক. ৬. ডলিম্যান. ৭. আলো প্রক্ষেপক. ৮. মাইক্রোফোন. ১০. শব্দগ্রাহক যন্ত্র. ১১. ইলেক্ট্রিসিয়ান. ১২. সেট

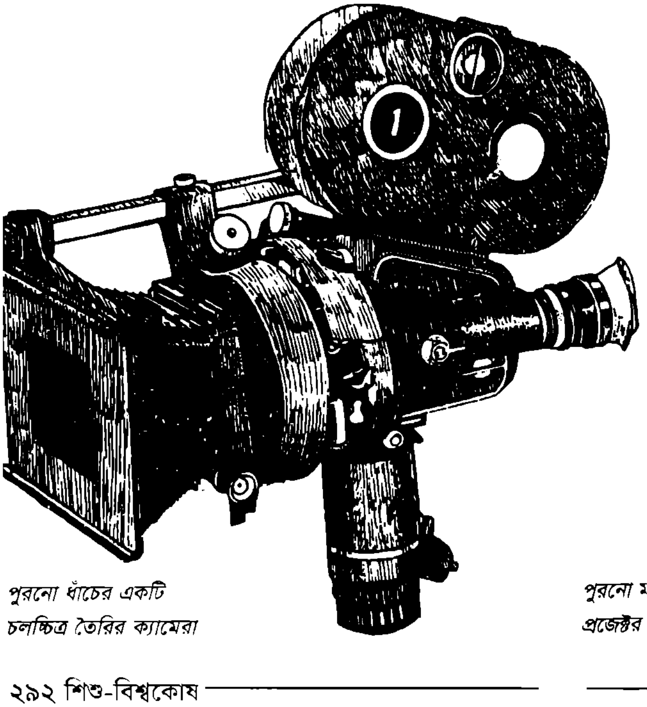

পুরনো ধাঁচের একটি চলচ্চিত্র তৈরির ক্যামেরা

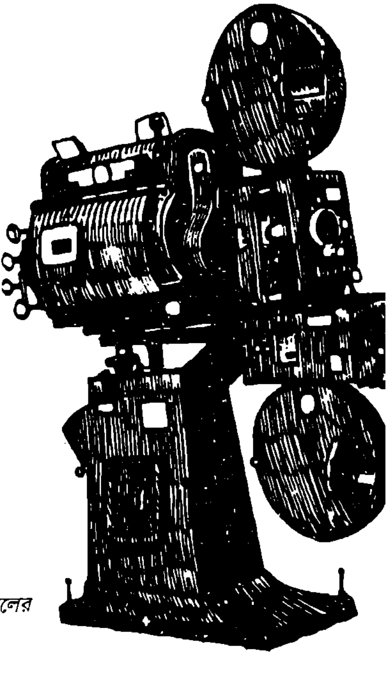

পুরনো মডেলের প্রজেক্টর

www.pathagar.com

চলমান নয়। ছবিকে চলমান দেখাবার জন্য ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ হর্নার ১৮৩৩ সালে জোইট্রোপ (zoetrope) বা জীবনচক্র নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। যন্ত্রটি ফাঁপা নলের মতো, যার উপরিভাগে কতকগুলো গর্ত থাকে। নিচের দিকে ভিতরে গোল করে পর্যায়ক্রমে ছুটন্ত ঘোড়ার বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি আঁকা থাকে। চোঙটা ঘোরালে উপরের ফুটো দিয়ে দেখা যাবে যেন ঘোড়াগুলো ছুটছে। একটা ছবি শেষ হয়ে গেলেও তারপর এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত আমাদের চোখে সেই ছবির রেশ থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে যদি অন্য একটি ছবি এসে যায়, তবে তাকে আর আলাদা ছবি বলে মনে হবে না। মনে হয় যেন আগের ছবিটাই নড়ছে। এইভাবে তাড়াতাড়ি কতকগুলো আলাদা ভঙ্গির ছবি দেখলে মনে হয় যেন একটি গতিশীল সজীব ছবি দেখছি। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই বর্তমান ছায়াছবি বা চলচ্চিত্রের (দ্র) সৃষ্টি। বর্তমানে ছায়াছবিতে প্রতিটি সেকেণ্ডে ১৬টি ছবি চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে।

ইতিমধ্যে ছবি তোলার ফিল্ম (দ্র) আবিষ্কৃত হল। আমেরিকার জর্জ ইস্টম্যান ১৮৮৪ সালে সেলুলয়েড ফিল্ম আবিষ্কার করে ফটোগ্রাফিতে (দ্র) যুগান্তর এনে দিলেন। মার্কিন বিজ্ঞানী উইলিয়াম ডিক্সন (Dickson) ১৮৮৮ সালে টমাস্ আল্ভা এডিসনের (দ্র) গবেষণাগারে আবিষ্কার করলেন কিনেটোস্কোপ (Kinetoscope)। এই যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে চলন্ত ছবি দেখা গেল, যাকে বলে চলচ্চিত্র।

টমাস্ আল্ভা এডিসন্ ১৮৭৭ সালে ফোনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করে শব্দতরঙ্গকে ধরে রাখতে এবং তাকে বাজিয়ে শোনাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি কিনেটোস্কোপ ও ফোনোগ্রাফ এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মানুষকে চলতে ফিরতে, কথা বলতে, গান গাইতে দেখানোর কাজে সফল হলেন এবং সবাক চলচ্চিত্র তৈরির পথ সুগম করলেন। ১৯২৭ সালে 'দ্য জ্যাজ সিঙ্গার' নামে এক সবাক চলচ্চিত্রের (talkie) আমদানি হল আমেরিকায়। কারও মতে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র হল 'দ্য সিঙ্গিং ফুল' (The Singing Fool)।

ভারতের (দ্র) প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের সবাক ছবি 'আলম আরা'। ১৯৩১ সালে বোম্বাই (এখন মুম্বাই) শহরে এটি নির্মিত হয়। প্রথম বাংলা টকি দেখানো হয় ১৯৩১ সালে। তার নাম 'জামাই ষষ্ঠী'।

মু. এ.

সিন্‌কোনা কুইনিন দ্র

সিন্ধু সভ্যতা

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। খ্রিস্টজন্মের আনুমানিক চার থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এর গোড়াপত্তন। সিন্ধু সভ্যতার দু'টি প্রধান কেন্দ্র মহেনজোদারো (দ্র) ও হরপ্পা (দ্র)। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীনতম এই নগরী দু'টি যথাক্রমে বর্তমান পাকিস্তানের (দ্র) লারকানা জেলায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাবে অবস্থিত।

অন্যান্য সভ্যতার মতো সিন্ধু সভ্যতারও উৎপত্তি সিন্ধু নদের তীরে। পরে তা পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বহু দূর বিস্তৃত হয়। কারো কারো মতে, এটি ১৫ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

এই সভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার (দ্র)। কৃষিকর্মের উন্নতি সত্ত্বেও এটি ছিল নগর ও বাণিজ্যভিত্তিক সভ্যতা। অনেকের ধারণা, চীন (দ্র), সুমেরীয় ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা ছিল অনেক বেশি অগ্রসর ও উন্নত।

মহেনজোদারো ও হরপ্পাতে খননকার্য চালিয়ে পাওয়া গেছে এক উন্নত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ও পোতাশ্রয়ের সন্ধান।

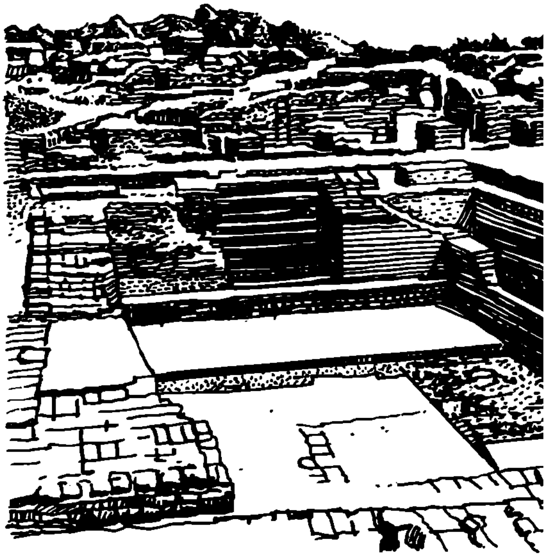

সিন্ধু সভ্যতা: মহেনজোদারোর ধ্বংসাবশেষ, সামনেই দেখা যাচ্ছে বৃহৎ স্নানাগার

www.pathagar.com

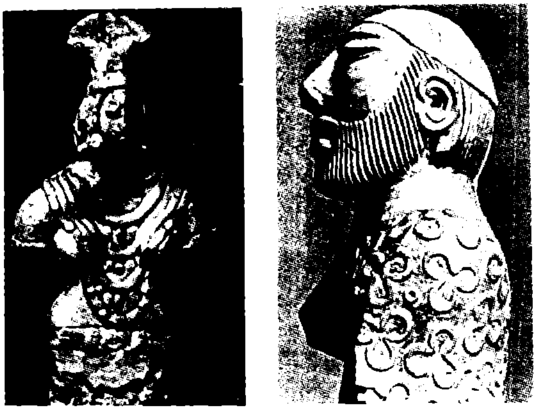

হরপ্পায় প্রাপ্ত রমনীয় মূর্তি এবং মহেনজোদারোতে রাজার শিল্পকৃতি
নিচে: কয়েকটি সীল মোহর

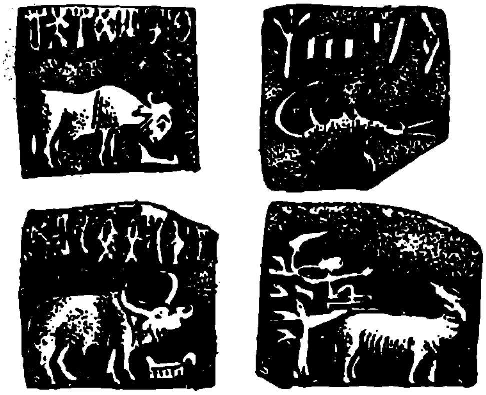

সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, আগুনে পোড়ানো ইট ও পাথরের তৈরি বাড়িঘর, সুদৃঢ় ও উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ, শস্যাগার, মন্দির, সমাধিস্থল ও শিক্ষায়তনের নিদর্শনও পাওয়া গেছে এখানে। অর্থাৎ সংঘবদ্ধ নাগরিক জীবনের যাবতীয় কিছু ছিল এই সভ্যতার অন্তর্গত। হাতিয়ার-যন্ত্রপাতি ছিল তামা (দ্র) ও ব্রোঞ্জের (দ্র) তৈরি।

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের ছিল সুবিন্যস্ত শাসন-ব্যবস্থা এবং ভাষার রূপদানের জন্য ছিল নিজস্ব চিত্রলিপি (দ্র) ও লিখনপ্রণালী। তবে এখন পর্যন্ত হরপ্পা ও মহেনজোদারোতে প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার করা যায় নি। ফলে তাদের উৎস ও ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা সম্ভব হয় নি।

প্রাক্-বৈদিক সভ্যতার অন্তর্গত এখানকার অধিবাসীরা পশুপতি শিব (দ্র) ও মাতৃকাদেবীর পূজা করত। তাদের দেবালয় বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, বহির্বিশ্বের সঙ্গে তারা ব্যবসাবাণিজ্যও করত। তাদের আহারসামগ্রীর তালিকায় ছিল যব, গম (দ্র), ধান (দ্র), মটর ও রাইসহ নানা ধরনের শস্য এবং বিভিন্ন ধরনের পশুপাখির মাংস, শামুক, মাছ (দ্র) ও শুঁটকি। গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে ছিল কুকুর (দ্র), ভেড়া, ছাগল, মুরগিসহ বিভিন্ন ধরনের গবাদি পশু।

পোশাক-পরিচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কার্পাস সুতোর বস্ত্র ও চাদর ইত্যাদি। দেহের শোভা বর্ধন করার জন্য তারা ব্যবহার করত সোনা (দ্র), রূপা (দ্র), শঙ্খ (দ্র) ও মূল্যবান পাথরের অলঙ্কার, পশুর অস্থি, হাতির দাঁতের চিরুনি, আয়না, ক্ষুর ইত্যাদি। মেয়েরা যে সূচিকর্ম জানত তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। এ ছাড়া পাওয়া গেছে তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি নানা ধরনের গৃহসামগ্রী।

এই সভ্যতার প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে আর্যদের আক্রমণে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এর সমূল বিনাশ ঘটে।

আ. হ.

সিপাহি বিদ্রোহ [১৮৫৭]

১৮৫৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে এ দেশে ইংরেজ শাসনের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। সে সময় ইংরেজের রাজ্যবিস্তারের নীতির বিরুদ্ধে এবং আরো নানা কারণে ভারতবাসীর মধ্যে অসন্তোষ জমে উঠতে থাকে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর অন্তর্গত ভারতীয় সিপাহিদের সঙ্গে শাসকদের ব্যবহারেও তাদের মনে ইংরেজবিরোধী অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। তা ছাড়া সাধারণভাবে বিদেশী শাসনের প্রতি বিরূপতাও কম ছিল না।

সে সময় মারাঠাশাসক দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেব এবং তাঁর মুসলমান শিষ্য আযিমুল্লাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের নানা স্থানে জনগণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা চালান। ঠিক এমন সময়েই ইংরেজেরা সিপাহিদের মধ্যে এমন এক ধরনের বন্দুক বিতরণ করে যার কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরতে হত। জনরব ওঠে যে ঐ কার্তুজে শূকর ও গরুর চর্বি মেশানো আছে। এ খবরে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহি তাদের ধর্ম নষ্ট

www.pathagar.com

হবার আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

সে সময় বঙ্গদেশের ব্যারাকপুর, রানীগঞ্জ ও বহরমপুরে সিপাহিদের ছাউনি ছিল। বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে ওঠে ব্যারাকপুর সেনাছাউনিতে। ক্রমে এর বিস্তার ঘটে অন্যান্য ছাউনিতে। ইংরেজশাসনের অন্যায় সম্পর্কে প্রচার বিভিন্ন অঞ্চলের সিপাহিদের সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করে।

উত্তর অঞ্চলে অসন্তোষ আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে। মীরাটে সিপাহিরা ক্ষেপে গিয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করে এবং কারাপ্রাচীর ভেঙে সহকর্মীদের মুক্ত করে। চল্লিশ মাইল দূরে দিল্লি (দ্র) পৌঁছে সিপাহিরা পুনরায় মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। একে একে বিদ্রোহ দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, মুরাদাবাদ, বেরিলি, সাহরানপুর, শাহজাহানপুর, বদাউন, আলমোড়া, আলীগড়, মৈনপুরী, ফতেহগড়, নিমাচ (রাজপুতানা) ও নাসিরাবাদে ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহিরা ঐসব স্থানের ইংরেজদের হত্যা করে রাজকোষ লুণ্ঠন করে।

সিপাহিরা দিল্লি পৌঁছে বাহাদুর শাহ জাফরকে দেশের সম্রাট হিসাবে বরণ করে। সরদার বাহাদুর খানের নেতৃত্বে বেরিলির অধিবাসী নানা সাহেবের নেতৃত্বে কানপুরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ঝাঁসীর রানী বিশ বছর বয়সী লক্ষ্মীবাঈ (দ্র) ইংরেজদের নির্মূল করে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে যুদ্ধে নিহত হন।

ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জন্মলাভ না করায় স্বাধীনতার ঐ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। সিমলা ও লাহোর থেকে ইংরেজ সৈন্য এসে পুনরায় দিল্লি অধিকার করে। সম্রাট বাহাদুর শাহ (দ্র) এবং তাঁর বেগমকে বন্দি করে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হয়। কঠোর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ইংরেজেরা তাদের শক্তি পুনরায় সংহত করে। তবে এর ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার সরাসরি ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার (দ্র) হাতে অর্পিত হয়। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হলেন রাজপ্রতিনিধি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেনাবাহিনীতে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হয়।

সিপাহি যুদ্ধের পরও ইংরেজ নব্বই বছর এ দেশে রাজত্ব করেছে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে ভারত (দ্র) ও পাকিস্তান (দ্র)-এ বিভক্ত করে দিয়ে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে। সিপাহি বিদ্রোহই হচ্ছে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আ. মা.

সিমলা চুক্তি

ভারতের (দ্র) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী (দ্র) এবং পাকিস্তানের (দ্র) প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর (দ্র) মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি। ১৯৭২ সালের ২৯শে জুন থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলাতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (দ্র)-কে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধে তাতে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর দু'টি দেশের মধ্যে এটি প্রথম রাজনৈতিক সংলাপ। সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ ঐ দুই দেশসহ অন্যান্য দেশেও প্রশংসা পায়।

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যকার সমস্যা সমাধানের পথ না খোঁজা, একে অন্যের সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা চালানো থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দুই দেশের সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক সীমানার নিজ নিজ অংশে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতির সময়কার নিয়ন্ত্রণরেখা উভয় দেশ মেনে চলবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দুই দেশের মধ্যে বার্তা বিনিময়ের জন্য ডাক ও তার ব্যবস্থা উন্নয়ন, যাতায়াতের জন্য জল, স্থল ও বিমান ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন, বাণিজ্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতামূলক শর্তও এই চুক্তির আওতায় আনা হয়। অতি দ্রুত দুই দেশের পরিষদ এই চুক্তির সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে।

আ. মা.

সিমেন্ট (cement)

বহু প্রাচীন কাল থেকেই সিমেন্ট দালান-কোঠা, প্রাসাদ, ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মিশরে ফারাওদের যুগে বা রোমান যুগেও সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়েছে। এখন যে ধরনের সিমেন্ট ব্যবহৃত হয় তার সাধারণ নাম 'পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট'।

সিমেন্ট তৈরির প্রধান উপাদান চুন (দ্র) ও সিলিকা।

www.pathagar.com

পরিষ্কৃত কাদামাটি ও চুনাপাথর মোটামুটি ১ ঃ ৩ অনুপাতে পানির সাঙ্গে মিশিয়ে ঘন লেই তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণকে একটি উত্তপ্ত লম্বা সিলিণ্ডার আকৃতির চুল্লির মধ্যে উপর দিক থেকে প্রবেশ করানো হয়। চুল্লিটি প্রায় অনুভূমিক অবস্থায় থাকে, তবে এক দিকে একটু ঢালু থাকে। চুল্লিটি ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে এবং নিচের দিক থেকে উত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে কোক-চূর্ণ প্রবেশ করানো হয়। এতে ভেতরের তাপমাত্রা প্রায় ১,৪০০° সে. হয়। অত্যধিক তাপে ক্যালসিয়াম সিলিকেট এবং অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেটের এক জটিল মিশ্রণে কাঁকর উৎপন্ন হয়। কাঁকরগুলোকে বিচূর্ণ করে সিমেন্ট প্রস্তুত করা হয়। পানির সংস্পর্শে এসে সিমেন্ট কঠিনাকার ধারণ করে এবং পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। কংক্রিট (দ্র) তৈরি করতে সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

নির্দিষ্ট অনুপাতে (৬ ঃ ১) বালি ও সিমেন্ট একত্রে পানির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গাঁথুনির মসলা তৈরি হয়। ইস্পাতের (দ্র) শিক ভিতরে রেখে নির্দিষ্ট অনুপাতে (৪ ঃ ২ ঃ ১) ইটের বা পাথরের টুকরা, বালি এবং সিমেন্ট একত্রে পানির সঙ্গে মিশিয়ে যে কংক্রিট তৈরি করা হয় তার দৃঢ়তা অনেক বেশি। একে রি-ইনফোর্সড্ কংক্রিট বলে। দালানের ছাদ, পুল প্রভৃতি এ ধরনের কংক্রিটে তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে দু'টি সিমেন্টের কারখানা আছে। একটি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে এবং অন্যটি চট্টগ্রামে। তা ছাড়াও বাংলাদেশকে প্রতি বছর চীন (দ্র), ভারত (দ্র), কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া (দ্র) থেকে সিমেন্ট আমদানি করতে হয়।

মু. এ.

সিম্ফনি

একত্রে ধ্বনিত করা—এই অর্থে 'সিম্ফনি' (symphony) কথাটির প্রচলন হয়। বর্তমান কালে খুব সংক্ষেপে সিম্ফনির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়, সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার (দ্র) জন্য রচিত সোনাটা বা যন্ত্রবাদন। এই যন্ত্রবাদনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তা কয়েকটি মুভ্মেন্ট্ বা পর্যায়ে রচিত হয়। মুভ্মেন্টের সংখ্যা হয় সচরাচর চার। মুভ্মেন্ট্সমূহ মেজাজের দিক থেকে পরস্পরের বিপরীত হয়। লয়ের দিক থেকে সিম্ফনির মুভ্মেন্ট্ সাইক্ল্ বা পর্যায়চক্র সাধারণত দ্রুত-বিলম্বিত, প্রায়-দ্রুত-বিলম্বিত। সিম্ফনির প্রথম মুভ্মেন্ট্ দ্রুত বা প্রায়-দ্রুত লয়বিশিষ্ট হয় এবং গোটা রচনার মধ্যে একটি গভীর নাট্যগুণ সঞ্চারিত করে। এটি সাধারণত সোনাটা এলেগ্রো রীতিতে রচিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় মুভ্মেন্ট্ প্রথম মুভ্মেন্টের বিপরীত-গুণবিশিষ্ট হয়। এর লয় হয় বিলম্বিত বা প্রায়-বিলম্বিত। দ্বিতীয় মুভ্মেন্টের চলন অত্যন্ত কমনীয় হয়। তৃতীয় মুভ্মেন্ট্ হয় লয় ও মেজাজের দিক থেকে দ্রুত ও মজাদার। সারা মুভ্মেন্টে এক ধরনের বিস্ময় জড়িয়ে থাকে। এই মুভ্মেন্টে প্রবলভাবে লয়দার মিনিউয়েট বা স্কার্টসো-র প্রয়োগ হয়। বেটোফেন্ (দ্র) সিম্ফনিতে মিনিউটের স্থলে স্কার্টসো ব্যবহার করেন। চতুর্থ মুভ্মেন্ট্ পূর্ববর্তী মুভ্মেন্ট তিনটির ওজন রক্ষা করে ও সম্পূর্ণ বাদনকে একটি পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এই মুভ্মেন্টে এক ধরনের আশা ও বিশ্বাস ধ্বনিত হয়। প্রথম মুভ্মেন্টের মতো শেষ মুভ্মেন্ট্ও সোনাটা এলেগ্রো রীতিতে রচিত হয়ে থাকে। হাইড্ন্ (দ্র) -কে সিম্ফনির জনকরূপে বিবেচনা করা হয়। মোৎসার্ট (দ্র) হাইড্নের ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলেন। বেটোফোনের রচনায় সিম্ফনির সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি ধরা পড়ে।

ক. গো.

সিয়াটো (SEATO)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার দেশসমূহের শান্তি রক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত চুক্তি সংস্থা। নাম South-East Asia Treaty Organization বা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থা। এই সংস্থা গঠনের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলে প্রভাব বলয় সৃষ্টি। ১৯৫৪ সালে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই দুই অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থেকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরদাতা দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া (দ্র), ফ্রান্স (দ্র), গ্রেটব্রিটেন (দ্র), নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান (দ্র), ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ড (দ্র)। প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনও এর অন্যতম লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়। সংস্থার সামরিক ও বেসামরিক সদর দপ্তর ছিল ব্যাংককে। সদস্য-দেশগুলোর সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

ওপর নির্ভরশীল এই সংস্থার নিজস্ব কোনো স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। প্রতি বছর এই চুক্তির অধীনে যৌথ মহড়ার ব্যবস্থা ছিল।

১৯৬২ সালে লাওস ও ভিয়েতনামে যুদ্ধ শুরু হলে সংস্থার পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী থাইল্যাণ্ডে মোতায়েন করা হয়। ১৯৭২ সালে পাকিস্তান এই সংস্থা ত্যাগ করে। ১৯৭৪-৭৫ সালে ইন্দোচীন (দ্র) এলাকায় কমিউনিস্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী থাইল্যাণ্ড ত্যাগ করে। ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে সিয়াটো ভেঙে দেওয়া হয়।

আ. মা.

সিয়াম রোজা দ্র

সিরাজউদ্দৌলা, নবাব [১৭৩২—১৭৫৭]

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব। ১৭৩২ সালে তাঁর জন্ম। পিতার নাম জৈনুদ্দিন, মায়ের নাম আমিনা বেগম।

নবাব আলীবর্দী খাঁ (দ্র) ছিলেন সিরাজের মাতামহ। ১৭৫৬ সালে আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর ঐ বছর ৯ই এপ্রিল সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২৪ বছর বয়সে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই তরুণ নবাব সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল নবাবের ক্ষমতালিপ্সু নিকট আত্মীয়স্বজন, প্রভাবশালী অসন্তুষ্ট অমাত্যবর্গ এবং রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ইংরেজ বণিকগণ। এদের মধ্যে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর (দ্র) এবং জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখ অমাত্য ও বণিকের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ বণিক এই আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রের পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এগিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিকদের উদ্ধত আচরণে বিরক্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাসিমবাজারের ইংরেজ কুঠি এবং পরে কলিকাতা (দ্র) দখল করে নেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কমিয়ে আনা। কিন্তু প্রভাবশালী অমাত্য ও স্বজনদের অসহযোগিতা ও গোপন চক্রান্তের কারণে তা সম্ভব হয় নি।

অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর প্রান্তরে নবাব-সৈন্যদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের এক যুদ্ধ হয়। ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের (দ্র) সঙ্গে নবাবের সেনাপতি মীরজাফরের এক গোপন সমঝোতার ফলে পলাশীর যুদ্ধে (দ্র) মীর জাফর নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ফলে যুদ্ধের নামে এই প্রহসনে নবাববাহিনী পরাজিত হয়। নবাব সপরিবারে পাটনায় পলায়নকালে পথিমধ্যে ধৃত হন। এরপর মুর্শিদাবাদে ১৭৫৭ সালে ২৭শে জুন তারিখে মীর জাফরের পুত্র মীরনের আদেশে মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে। মীর জাফর ইংরেজের সহায়তায় সিংহাসনে বসেন।

মু. মা.

সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ পাবনা / সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ দ্র

সিরাজুদ্দীন হোসেন [১৯২৯—১৯৭১]

সাংবাদিক ও শহীদ বুদ্ধিজীবী। তিনি ১৯২৯ সালে যশোরের বর্তমান মাগুরা জেলার শরুগুণা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে তিনি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন।

বি. এ. পরীক্ষা শেষেই সিরাজুদ্দীন 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার বার্তা বিভাগে যোগদান করেন। দৈনিক 'আজাদ' ছিল তৎকালীন মুসলিম লীগের (দ্র) সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর (দ্র) পত্রিকা। এই পত্রিকায় সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে সিরাজুদ্দীন ১৯৫০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় (দ্র) সংঘটিত রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা পালন করেন এবং ক্রমে এই পত্রিকাকে তিনি সরকারবিরোধী আন্দোলনের বাহনরূপে গড়ে তোলেন। ফলে মওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির পর এই বিরোধ চরম আকার ধারণ করলে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার চাকুরিতে ইস্তফা দেন।

সিরাজুদ্দীন ১৯৫৪ সালে ইউ এস আই এস (United States Information Service)-এ জুনিয়র এডিটর পদে যোগদান করেন। এরপর তিনি 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের (দ্র) নির্বাচনের প্রচারণা ও সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কিছুকাল দৈনিক ইত্তেফাকের অস্থায়ী সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। ফ্র্যাঙ্কলিন পাবলিকেশনের প্রধান সম্পাদক হিসাবেও তিনি কাজ করেন। সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা-লগ্নে তিনি এর সহ-সভাপতি ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি দু'বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নেরও সভাপতি ছিলেন।

সিরাজুদ্দীন সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে (দ্র) অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ঢাকায় থেকে তিনি গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় তিনি দেখে যেতে পারেন নি। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর এ দেশীয় দোসর আল-বদর (দ্র), আল-শাম্‌স্ (দ্র) বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

সিরাজুদ্দীন বিভিন্ন চিন্তাশীল নিবন্ধ রচনা ও অনুবাদ-কর্মে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'মহিয়সী নারী', 'Man against Nature', 'Sun', 'Democracy', 'Gone is Gone' উল্লেখযোগ্য।

সুজ. ব.

সিরামিক (ceramic)

মানুষের তৈরি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণসামগ্রীর একটি সিরামিক। শব্দটি তৈরি হয়েছে গ্রিক keramos শব্দ (অর্থাৎ কুমারের কাদা) থেকে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কাদামাটি দিয়ে পাত্র তৈরি হয়ে আসছে। মাটির পাত্রকে রৌদ্রে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী করা হয়। এই কাদামাটির পাত্র থেকেই সিরামিক শিল্পের উদ্ভব। আমাদের দেশে সিরামিকের পরিচিতি চীনামাটি হিসাবে। বিভিন্ন খনিজ, যেমন –বক্সাইট, ক্লে, ফেল্‌স্পার, সিলিকা ট্যাল্‌ক্ ইত্যাদি সিরামিক তৈরির উপাদান।

ক্লে এবং অন্যান্য উপাদান বিচূর্ণ করে নির্দিষ্ট অনুপাতে পানির সঙ্গে মিশিয়ে কাদায় পরিণত করা হয়। ফলে একে প্রয়োজন মতো আকার দেওয়া যায়। এভাবে তৈরি সিরামিক দ্রব্যকে ১০০°–২০০° সে. তাপে উত্তপ্ত করে শুকানো হয় এবং বিশেষ ধরনের চুল্লিতে পোড়ানো হয়। এতে সিরামিক অত্যন্ত শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনেক সিরামিক দ্রব্যের উপর উজ্জ্বল প্রলেপ দেওয়া হয়। একে বলে গ্লেইজ। গ্লেইজ থাকলে সিরামিক পাত্র উজ্জ্বল ও মসৃণ হয়, তা তরল পদার্থ শোষণ করতে পারে না, সহজে পরিষ্কারও করা যায়।

সিরামিকের ব্যবহার ব্যাপক। নির্মাণসামগ্রী হিসাবে ড্রেনের পাইপ, সিঙ্ক, বাথটাব, টয়লেটসামগ্রী, বাসন-কোসন, খাবার প্লেট, চায়ের কাপ, পিরিচ ইত্যাদি সিরামিক থেকে তৈরি হয়। সিরামিক দিয়ে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম; গ্লাস, সুইচ, কানেক্টর, ক্যাপাসিটর (দ্র), বয়লারের চুল্লি, নভোযান

www.pathagar.com

ও রকেটের (দ্র) 'নোজ কোন' ইত্যাদি তৈরি হয়।

স. রা.

সিলিকন (silicon)

অধাতব রাসায়নিক মৌল। কার্বন (দ্র) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সিলিকনের পারমাণবিক সংখ্যা ১৪ এবং প্রতীক Si। পৃথিবীগাত্রের ২৭·৭ শতাংশই সিলিকন। কিন্তু প্রকৃতিতে মুক্তভাবে সিলিকন পাওয়া যায় না। যৌগ হিসাবে শিলা, পাথর, বালি, কাদা প্রভৃতিতে সিলিকন বিদ্যমান। বেশির ভাগ সিলিকনই সিলিকা (SiO_2) হিসাবে প্রকৃতিতে রয়েছে।

১৮২৪ সালে ইওন্স ইয়াকব বার্জেলিয়াস (Jöns Jakob Berzelius) নামে এক সুইডিশ বিজ্ঞানী প্রথম সিলিকনকে মৌল হিসাবে শনাক্ত করেন। বিশুদ্ধ সিলিকন শক্ত এবং গাঢ় ধূসর বর্ণের। কার্বনের মতো সিলিকনও সাধারণ উষ্ণতায় কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। মৌলিক সিলিকন ধাতব বিদ্যায় বিজারক হিসাবে এবং ইস্পাত (দ্র), তামা (দ্র) ও কাঁসা তৈরির উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সিলিকনের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পে। সিলিকন একটি আদর্শ অর্ধপরিবাহী (semi- conductor)। ট্রানজিস্টর (দ্র), সমন্বিত বর্তনী ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী তৈরিতে সিলিকন ব্যবহৃত হয়। যৌগ হিসাবে সিলিকা, সোডিয়াম সিলিকেট প্রভৃতিরও ব্যবহার রয়েছে।

মু. হা.

সিলেট বিভাগ

সিলেটের মানচিত্র

মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের (দ্র) একটি বিভাগ। ১৯৯৪ সালে সিলেটকে বিভাগ হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং ১লা আগস্ট ১৯৯৫ তারিখ থেকে পৃথক বিভাগ হিসাবে এর প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু হয়। পূর্বে সিলেট নামে শুধু একটি জেলা ছিল। ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবিভক্তি হয়, তখন গণভোটের মাধ্যমে এই জেলা ও বর্তমান বিভাগের অন্যান্য জেলা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পাহাড়, হাওর-বাওর, বিল, নদী (দ্র), উঁচু ভূমি ও সমতল ভূমি নিয়ে সিলেট বিভাগ গঠিত। এর আয়তন ১২,৫৯৬ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে নদী ২৯০ বর্গ কিলোমিটার ও বনভূমি ১,২৫১ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯১ সালের গণনা অনুযায়ী এই বিভাগের মোট জনসংখ্যা ৭১,৪৮,০০০ জন।

সিলেটে বহু গুণীজনের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী (দ্র) ও উপ-প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম.এ. রব-এর জন্মস্থান সিলেট বিভাগে। এই উপমহাদেশের বিখ্যাত আউলিয়া হযরত শাহজালাল (রা.) (দ্র)-এর মাজার, হযরত শাহ পরান (রা.) (দ্র)-এর মাজার সিলেটে অবস্থিত। রাজা গৌর গোবিন্দের শাসনামলে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহজালাল (রা.) তিন শতাধিক সঙ্গী নিয়ে এ দেশে আসেন। সঙ্গীদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব প্রদান করে তিনি সিলেটে অবস্থান করেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ১৩১ জনের মাজার এই বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় আজও আছে।

সুরমা, কুশিয়ারা ও মনু এ বিভাগের প্রধান নদী। সিলেটের উত্তরাঞ্চলে পাহাড়ের পাদদেশের নিম্নভূমি,

www.pathagar.com

হযরত শাহজালালের (রা.) মাজার. মাঝে: সুরমা নদীর ওপর ব্রিজ ও বিখ্যাত ঘড়ি. নিচে: চা বাগান

পূর্বাঞ্চলের সমভূমি এবং দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উঁচু ভূমি সিলেটকে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে। দক্ষিণাঞ্চলে তুলনামূলক উঁচু ভূমিকে কাজে লাগানো হয়েছে চা-বাগান হিসাবে। বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানিদ্রব্য চা-এর প্রায় পুরোটাই উৎপন্ন হয় সিলেট বিভাগের চা-বাগানে। ছোট ছোট টিলার উপরে গড়ে ওঠা এসব চা-বাগান দেখতে খুবই সুন্দর। বাংলাদেশের মধ্যে এই বিভাগে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এই জন্যই এখানে জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে। পাশাপাশি আনারস (দ্র), কমলা (দ্র) লেবু, পেয়ারা (দ্র) ইত্যাদি ফলের বাগানও এখানে সৃষ্টি হয়েছে। সিলেটের জঙ্গলে পাওয়া যায় প্রচুর বেত (দ্র)। এই বেত থেকে তৈরি হয় বিভিন্ন আসবাবপত্র। বেতকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে অসংখ্য কুটিরশিল্পও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রধান এলাকা সিলেট বিভাগ। কৈলাশ টিলা, হরিপুর দুয়ারাবাজার এলাকায় গ্যাস (দ্র) ও তেল পাওয়া যায়। গ্যাস প্রাপ্তির কারণে এখানে গড়ে উঠেছে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, ছাতকের সিমেন্ট (দ্র) কারখানা এবং আরো অনেক কারখানা।

সিলেট বিভাগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাসকে চিহ্নিত করে। এখানকার হযরত শাহজালাল (রা.)- এর মাজারঅঙ্গনের বড় গম্বুজ মসজিদ (১৬৭৮), তিন গম্বুজ মসজিদ (১৬৭০-৮৮), রাইনগরের শাহী ঈদগাহ ও মসজিদ (১৬৮৪) মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন। হযরত শাহ পরানের মাজারসংলগ্ন মনোরম মসজিদটি তৈরি হয় মোগল আমলের শেষ পর্যায়ে। শঙ্করপাশার মসজিদ তৈরি হয় হোসেন শাহী আমলে।

সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত বহু প্রাচীন শিলালিপি থেকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়।

মো. হো.

সিলেটী নাগরী নাগরী লিপি দ্র

সিল্ক রেশম / সিল্ক দ্র

সীমান্ত

পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) প্রকাশিত, এ দেশের প্রথম মাসিক সাহিত্যপত্রিকা। এর সম্পাদক ছিলেন মাহবুব-

www.pathagar.com

উল আলম চৌধুরী। যুগ্ম সম্পাদক সুচরিত চৌধুরী (দ্র)।

এটি প্রকাশিত হত 'সীমান্ত' কার্যালয়, নন্দনকানন থেকে এবং মুদ্রিত হত মডার্ন প্রিন্টিং কোং লিঃ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে।

'সীমান্ত'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের অব্যবহিত পরেই। এর সম্পাদক মাহবুব-উল আলম চৌধুরী ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের (দ্র) সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকায় তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে পত্রিকাটির প্রকাশনা চিরতরে বন্ধ (১৯৫২) হয়ে যায়।

তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধ পরিবেশে 'সীমান্ত'র মতো একটি পরিচ্ছন্ন ও প্রগতিশীল সাহিত্যপত্রের প্রকাশ ছিল নানা দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এতে উভয় বাংলার শীর্ষস্থানীয় লেখকবৃন্দের পাশাপাশি তখনকার নবীন ও প্রতিশ্রুতিশীল বহু কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকেরও রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় অর্ধযুগের আয়ুষ্কালে সাময়িকীটির মোট ৬০টি সংখ্যা বের হয়। এর প্রকাশকালে একে আশীর্বাণী দিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার ঘোষ ও পূর্ববাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (দ্র)।

আ. হ.

সীমান্ত গান্ধী গফ্ফার খান, খান আবদুল দ্র

সীরাত

প্রকৃত আরবি উচ্চারণ সীরহু। আভিধানিক অর্থ : অভ্যাস, নিয়মাবলি, জীবনযাপন-পদ্ধতি, জীবনচরিত। ইসলামী পরিভাষায় হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর জীবনরচিত অর্থেই 'সীরাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, সীরাতুন্নবী অর্থাৎ নবীর জীবনচরিত। নবীর জীবনচরিত আলোচনার জন্য সাধারণত তাঁর জন্মদিন (এবং মৃত্যুদিনও) আরবি মাসের ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে আমাদের দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

মু. মা

সীরাতুন্নবী মিলাদুন্নবী দ্র

সীল (seal)

পানিতে বাস করলেও সীল মাছ নয়, স্তন্যপায়ী প্রাণী।

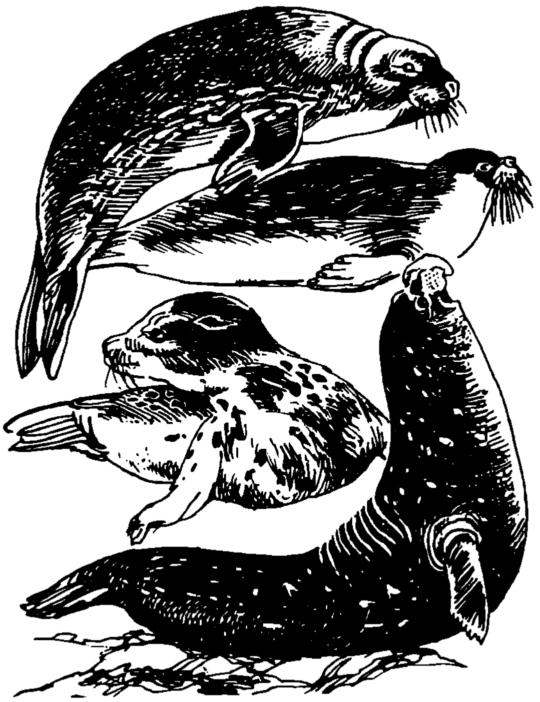

চার ধরনের সীল মাছ

পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ করে শীতপ্রধান অঞ্চলে, সমুদ্রতীরে এরা বাস করে। কোনো কোনো প্রজাতি মিঠা পানির বাসিন্দা। এদের প্রজাতি প্রায় ৩০টি।

সীলের দেহ টর্পেডো (torpedo) আকৃতির। চামড়া নরম ও মসৃণ। চামড়ার নিচের পুরু চর্বিস্তর শরীর গরম রাখা, দুর্দিনে খাদ্য সরবরাহ করা প্রভৃতিতে কাজে লাগে। চারটি পা ফ্লিপার-এ (flipper) পরিবর্তিত হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে সাঁতার কাটে। একনাগাড়ে ১৬-১৬০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়। কোনো কোনো প্রজাতির বহিঃকর্ণ ও লোম নেই।

প্রজাতিভেদে আকৃতি-বর্ণে পার্থক্য থাকে। কোনো কোনো প্রজাতির পুরুষগুলো আকারে ছোট। সাদার্ন এলিফ্যান্ট সীল বৃহত্তম প্রজাতি। পুরুষগুলো দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬·৪ মিটার ও ওজনে ৩৬০০ কেজি হয়। রিংওয়ালা সীল ক্ষুদ্রতম : ১·৪ মিটার ও ৯১ কেজি।

এরা মাংসাশী প্রাণী। স্কুইড, অক্টোপাস (দ্র), চিংড়ি (দ্র), ঝিনুক (দ্র), মাছ (দ্র), ছোট হাঙ্গর, পেঙ্গুইন ইত্যাদি

www.pathagar.com

খায়।

প্রজননের সময় দলে বাস করে। দলে একটি পুরুষের সঙ্গে চল্লিশটি পর্যন্ত স্ত্রী-সীল থাকে। পানিতে বাস করলেও স্থলে এসে বাচ্চা দেয়। স্ত্রী-সীল ৮-১২ মাস গর্ভধারণের পর একটি বাচ্চা প্রসব করে। ৫০% চর্বি-সমৃদ্ধ দুধ খেয়ে বাচ্চারা দ্রুত বেড়ে ওঠে। চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

সীলের মাংস এস্কিমো (দ্র) ও আলাস্কাবাসীদের প্রিয় খাদ্য। চামড়া থেকে কোট, টুপি তৈরি হয়। চর্বি (দ্র) বহু কাজে লাগে। চামড়া, চর্বি ও মাংসের জন্য নির্বিবাদে সীল শিকার করা হয়।

আ. ন. ম. আ. র.

সীসা (lead)

সীসা বা লেড নরম নীলচে ধূসর ধাতু। প্রাচীন কালেও সীসার পরিচয় জানা ছিল। আগে পেন্সিলের (দ্র) শিস সীসা দিয়ে তৈরি করা হত, এখন অবশ্য গ্রাফাইট (দ্র) দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রকৃতিতে বেশির ভাগ সীসা গ্যালেনা বা লেড সালফাইড (PbS) রূপে পাওয়া যায়। তবে এটা সেরুসাইট ($PbCO_3$) এবং অ্যাঙ্গলিসাইট ($PbSO_4$) রূপেও পাওয়া যায়। সীসা সহজে ক্ষয় হয় না। রোমানদের স্থাপিত অনেক সীসার নল এখনো টিকে আছে। রঞ্জনরশ্মি (দ্র)-রোধক আবরণী তৈরি করতে, গোলাবারুদে এবং বিদ্যুৎ-তারের আবরণীর জন্য সীসার ব্যবহার রয়েছে। সীসার লবণ অনেক কাজে লাগে। লেড সালফেট ($PbSO_4$)-এর রঙ সাদা, লেড ক্রোমেট ($PbCrO_4$)-এর রঙ হলুদ, লেড অক্সাইড (Pb_3O_4) লাল এবং লিথার্জ (PbO) কমলা রঙের। এ সকল লবণ রঙ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

সীসার বিষক্রিয়ার ফলে বমি এবং ডায়রিয়া(দ্র) হয়। অনেকদিন ধরে অল্প পরিমাণে সীসা গ্রহণ করলে পেটে ব্যথা, মাংসে ব্যথা, রক্তশূন্যতা এবং স্নায়ুর গোলযোগ দেখা দেয়। শিশুরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। অনেক দিন সীসা নিয়ে কাজ করলে দাঁতের মাড়িতে এক রকম নীলাভ দাগ পড়তে দেখা যায়।

সীসার পারমাণবিক সংখ্যা ৮২; পারমাণবিক ওজন ২০৭·১৯।

সা. এ.

সুইফ্‌ট, জোনাথন্‌ [১৬৬৭—১৭৪৭]

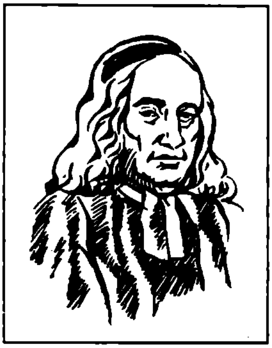

ইংরেজি সাহিত্যের (দ্র) নব্য ক্লাসিক্যাল যুগের প্রতিভাবান লেখক। সুইফ্‌ট্‌ [Jonathan Swift]-এর জন্ম আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিনের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৬৬৭ সালের ৩০শে নভেম্বর। ১৬৮৬ থেকে ১৬৯২ সাল সময়সীমার ভেতরে বি. এ. এবং এম. এ. পাশ করেন।

১৬৯১ থেকে ১৬৯৪ সালের মধ্যে বেশ কিছু কবিতা রচনা করলেও তার জন্য প্রশংসা অর্জন করতে পারেন নি। ১৬৯৩ থেকে ১৬৯৪ সাল পর্যন্ত এক বছর সুইফ্‌ট্‌ ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ পান। দূতিয়ালিও করেন বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে। এই সময়ই তিনি তাঁর সময়কার অভিজাত শ্রেণীর একগুঁয়েমি, অহংবোধ ও স্বেচ্ছাচারী তৎপরতা এবং মনোভাবের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। এইসব কিছুর প্রতি তাঁর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া, তার সূচনা এখান থেকেই।

১৬৯৬ থেকে ১৬৯৯ সাল সময়সীমার মধ্যে রচিত হয় সুইফ্‌টের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গরচনা 'এ টেইল অব এ টাব'। ১৭০৪ সালে তা বেনামিতে ছাপা হয়। ১৭০৯ সালে ছাপা হয় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ডেসক্রিপশান অব দ্য মর্নিং', যাতে তিনি লণ্ডন শহরের বিত্তশালীদের প্রতি ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাত হানেন।

১৭১০ সালে তিনি 'টোরি' অর্থাৎ রক্ষণশীল দলের সাময়িকপত্র 'দ্য একজামিনার'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে এক বছর তা পরিচালনা করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনাবলির মাধ্যমে বিবেকের স্বাধীনতার কথা টোরিবাদে সংযোজিত করার কৃতিত্ব বলতে গেলে সুইফ্‌টেরই।

১৭১৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ডাবলিনের সেন্ট পেট্রিক্স ক্যাথিড্রালের ডীন হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন।

www.pathagar.com

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭১৪ সালে টোরি মন্ত্রিসভা ভেঙে গেলে সুইফটের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এরপর তিনি কেবল সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগে করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও রচনার মধ্যে রয়েছে 'দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ফোর লাস্ট ইয়ার্স অব দ্য কুইন' (১৭১২-১৩), 'দ্য ডে অব জাজমেন্ট', আত্মজীবনীমূলক কবিতা 'ভার্সেস অন দ্য ডেথ অব ড. সুইফ্‌ট্' এবং 'গ্যালিভার্স্ ট্রাভেল্স্' (১৭২৬)। শেষোক্ত গ্রন্থ এবং গদ্য রচনাশৈলীর জন্যই বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন জোনাথন্ সুইফ্‌ট্।

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৭৪৭ সালে।

আ. হ.

সুকান্ত ভট্টাচার্য [১৯২৬—১৯৪৭]

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় সাম্যবাদী কবি। অত্যন্ত অল্প বয়সে তাঁর কবিপ্রতিভা প্রকাশিত হওয়ায় ও তাঁর মৃত্যু তরুণ বয়সে হওয়ায় তিনি 'কবিকিশোর' বলে খ্যাত। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে শ্রাবণ (১৯২৬ খ্রি.) কলিকাতায় (দ্র) তাঁর জন্ম। আদি নিবাস ফরিদপুরের কোটালীপাড়া। তাঁর পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও মাতা সুনীতি দেবী। ছেলেবেলায় মাতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি অযত্ন-অবহেলায় শৈশব অতিবাহিত করেন। ১৩৫২ বঙ্গাব্দে তিনি বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

সুকান্ত যখন কৈশোরে পদার্পণ করেন, তখন পৃথিবী জুড়ে চলছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) ধ্বংস ও তাণ্ডবলীলা। এই যুদ্ধ, ধ্বংস ও দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে এবং তিনি সামাজিক অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। অল্প বয়সেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এক জন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

ছড়া রচনার মধ্য দিয়ে শৈশবে সুকান্তের সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। এরপর কবিতা (দ্র), ছোটগল্প (দ্র), নাটক (দ্র), নাটিকা, এমনকি একটি উপন্যাসের অংশবিশেষও তিনি রচনা করেন। 'আজকাল', 'স্বাধীনতা', 'পরিচয়', 'রংমশাল', 'বসুমতী'সহ সে সময়ের বিখ্যাত সব পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

সুকান্তের প্রধান চর্চাক্ষেত্র ছিল কবিতা। সমাজের নিপীড়িত নিরন্ন মানুষের প্রতি ভালবাসা আর তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের কঠিন পণই ছিল তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। তাঁর সমগ্র রচনাকর্মে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীসহ শোষণহীন এক নতুন সমাজ গড়ার অঙ্গীকার ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার বৈপ্লবিক ভাবধারাটি যাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভায় সমৃদ্ধ হয়েছে, সুকান্ত তাঁদের অন্যতম। তাঁর কবিতার ছন্দ (দ্র), ভাষা, রচনাশৈলী এত স্বচ্ছন্দ, বলিষ্ঠ ও নিখুঁত যে তাঁর বয়সের বিবেচনায় এরূপ রচনা বিস্ময়কর ও অসাধারণ বলে মনে হয়। তিনি যে শুধু বড়দের জন্য লিখেছেন তা নয়, ছোটদের জন্যও লিখেছেন অসংখ্য ছড়া-কবিতা ও গান। তাঁর গ্রন্থগুলো হল— কাব্য : 'ছাড়পত্র' (১৩৫৪ ব.), 'ঘুম নেই' (১৩৫৭ ব.) ও 'পূর্বাভাস' (১৩৫৭ ব.)। অন্যান্য রচনা : 'মিঠেকড়া' (১৩৫৮ ব.), 'অভিযান' (১৩৬০ ব.), 'হরতাল' (১৩৬৯ ব.) এবং 'গীতিগুচ্ছ' (১৩৭২ ব.)। এ ছাড়া ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের পক্ষে 'আকাল' (১৩৫১ ব.) শিরোনামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন।

সুকান্ত তখনকার দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র 'কিশোর সভা' বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন। তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২৯শে বৈশাখ (১৩. ৫. ১৯৪৭) কলিকাতার (দ্র) যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরেই একে একে তাঁর গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়।

সুজ. ব.

সুকার্নো, আহমেদ [১৯০১—১৯৭০]

জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী রাজনীতিবিদ এবং স্বাধীন

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়ার (দ্র) প্রথম প্রেসিডেন্ট। তাঁর প্রকৃত নাম কুস্নাসোস্রো। জাভায় ১৯০১ সালে ৬ই জুন তাঁর জন্ম।

বান্দুং টেকনিক্যাল কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি লাভ করেন। এই কলেজের জেনারেল স্টাডি ক্লাসই ১৯২৮ সাল নাগাদ ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী পার্টির রূপ পরিগ্রহ করে এবং অচিরেই এর তরফ থেকে ডাচ উপনিবেশবাদী সরকারের সঙ্গে অসহযোগের ডাক দেওয়া হয়। সুকার্নো এই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য।

১৯৩০ এবং '৪০-এর দশকে তিনি ওলন্দাজ সরকারের নির্দেশে বেশ কয়েক বার নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেন এবং বন্দিও হন। ১৯৪২ সালে জাপান নেদারল্যাণ্ডস্ ইস্ট ইণ্ডিজ দখল করে নেওয়ার পর সুকার্নো দেশটির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) চলাকালে (১৯৩৯-৪৫) দেশের আত্মগোপনকারী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে তিনি ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট) এবং দেশের প্রেসিডেন্ট হন।

নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের কর্ণধার হিসাবে সুকার্নো জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চলেন। তাঁর চেষ্টাতেই ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে আফ্রো-এশীয় বান্দুং সম্মেলন (দ্র) অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই তাঁকে পেয়ে বসে একচ্ছত্র ক্ষমতার মোহ। ১৯৫৯ সালে তিনি নির্বাচিত সংসদ ভেঙে দেন এবং ১৯৬৩ সালে নিজেকে ইন্দোনেশিয়ার 'আজীবন প্রেসিডেন্ট' ঘোষণা করেন। অন্য দিকে তিনি দেশের ভেতরে ও বাইরে ক্রমশ কমিউনিস্ট-সমর্থক নীতি অনুসরণ করতে থাকেন।

১৯৬৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর দেশের সমর-নেতাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের পরিচালিত অভিযানে সুকার্নোর হাত ছিল বলে অভিযোগ আনা হয় এবং বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমর্থন নিয়ে জেনারেল সুহার্তোর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় পাল্টা কমিউনিস্টবিরোধী অভ্যুত্থান। জয়ী হয় মার্কিনপন্থী সুহার্তোগোষ্ঠীর জেনারেলগণ। দেশ ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে। ১৯৬৮ সালে সুকার্নোকে রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হন।

সুকার্নো মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭০ সালের ২১শে জুন।

আ. হু.

সুকুমার রায় [১৮৮৭—১৯২৩]

আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। তিনি বাংলা মুদ্রণশিল্প ও শিশুসাহিত্যের অগ্রপথিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (দ্র) জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রকৃত নাম সুকুমার রায়চৌধুরী হলেও তিনি সংক্ষেপে সুকুমার রায় নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ১৮৮৭ সালে কলিকাতায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন।

সুকুমার রায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান (দ্র) এবং রসায়নশাস্ত্র (দ্র) বিষয়ে ডবল অনার্স নিয়ে তিনি বি. এসসি. পাশ করেন। ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করে ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানকার ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অব টেক্‌নলজি থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আলোকচিত্র (ফটোগ্রাফি) ও মুদ্রণপ্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে ১৯১৩ সালে দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তী কালে তিনি উপেন্দ্রকিশোর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইউ. রায় এণ্ড সন্স' এবং 'সন্দেশ' (দ্র) পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

শৈশবে সুকুমার রায় ছবি আঁকা, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে পিতা উপেন্দ্রকিশোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। অল্প বয়সেই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৩০২ বঙ্গাব্দে মাত্র আট বছর বয়সে শিবনাথ শাস্ত্রী (দ্র) সম্পাদিত

www.pathagar.com

'মুকুল' পত্রিকায় 'নদী' নামে তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। পরে ১৩২০ বঙ্গাব্দে পিতা উপেন্দ্রকিশোর 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলে তিনি এর নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন। এখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে ছড়া (দ্র), কবিতা (দ্র), ছোটগল্প (দ্র), নাটক (দ্র), নিবন্ধ ইত্যাদি লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

সুকুমার রায়ের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল হাস্যরস পরিবেশন। বাংলা শিশুসাহিত্যে তিনি উদ্ভট খেয়ালখুশির এক অদ্ভুত জগতের স্রষ্টা। লোকসাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ আটপৌরে ছড়া চর্চার যুগে তিনিই প্রথম বাংলা ছড়ায় হাস্যরসপ্রধান একটি ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর কল্পনাশক্তি যেমন আকাশচুম্বী ছিল, তেমনি ভাষা আর বিষয়ও ছিল সরস এবং সচেতন। 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই' তাঁর লেখা ছড়া ও কবিতার বই। 'অবাক জলপান', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'হিংসুটি', 'ভাবুকসভা', 'চলচ্চিত্ত চঞ্চরী', 'শব্দকল্পদ্রুম' ইত্যাদি ৭টি নাটকের বই। তাঁর গল্পের বইগুলো হল 'হযবরল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী'। তাঁর সব ক'টি বইই মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

*'খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতী লোফেন যখন তখন,
দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন।'
ছড়ার সাথে মজার ছবিও এঁকেছেন*

সুকুমার রায় নিজের লেখায় মজার মজার প্রাণীর বর্ণনা দিয়েছেন এবং ছবিও এঁকেছেন। ল্যাগব্যাগর্নিস, হ্যাংলাথেরিয়াম ও ল্যাংড়াথেরিয়াম

সুকুমার রায় নিজের লেখার ছবি নিজেই আঁকতেন। তাঁর অদ্ভুত কায়দায় আঁকা ব্যতিক্রমধর্মী ছবিগুলো তাঁকে অমর করে রেখেছে। শুধু লেখক ও চিত্রশিল্পী হিসাবেই নয়, গায়ক ও অভিনেতা হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অভিনয়ের জন্য তিনি প্রথম জীবনে 'ননসেন্স ক্লাব' নামে একটি সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন। বাংলা মুদ্রণশিল্প এবং আলোকচিত্রশিল্পের অগ্রগতির পিছনেও তাঁর অবদান অনেক।

সুকুমার রায় ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

সুকুমার সেন [১৯০০—১৯৯২]

বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন, কিন্তু জীবনে কোনোদিন জ্ঞানসাধনার জন্য স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। অথচ যেসব শাস্ত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিবেচিত হতেন সেসব ক্ষেত্রে যাঁরা পণ্ডিতজন তাঁরা তাঁর কাছে এসেছেন, আলাপ করেছেন, চিঠি লিখে সহায়তা লাভ করেছেন।

কলিকাতায় (দ্র) ১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে সুকুমার সেন জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্রে তিনি প্রখর মেধার পরিচয় দিয়েছেন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মোহিনীমোহন মিত্র মেডেল পেয়ে উত্তীর্ণ হন। বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন সংস্কৃত, বাংলা ও গণিত (দ্র) শাস্ত্রে লেটার নম্বর পেয়ে। গণিতজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছে থাকলেও আবাসিক অসুবিধার কারণে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজে। সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। এম. এ. পড়লেন অন্য বিষয়ে- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে। ১৯২৩ সালে সোনার মেডেল পেয়ে এম. এ. পাশ করেছিলেন। পরের বছরই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (দ্র) বা P R S (অর্থাৎ Premchand Roychand Scholarship) লাভ করেন। পরবর্তী বছর গবেষণার জন্য পান আশুতোষ মেডেল। এর পরে পান গ্রিফিথ প্রাইজ। ১৯২৬ সালে মোয়াট মেডেল লাভ করেন। পরবর্তী কালে পুনরায় এক বার আশুতোষ মেডেল ও দু' বার গ্রিফিথ প্রাইজ পেয়েছিলেন। এ সবই তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার স্বীকৃতি।

১৯২৫ সালে সুকুমার সেন তাঁর কর্মক্ষেত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন প্রথমে অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে। পরবর্তী চল্লিশ বছর সম্মান ও গৌরবের সঙ্গে এখানেই কর্মরত থেকে অবসর নেন ১৯৬৪ সালে। এরই ভিতরে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি (১৯২৭) লাভ করেন। পরে খয়রা অধ্যাপক (১৯৫২), বিভাগীয় সভাপতি ইত্যাদি পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কিন্তু সুকুমার সেনের মূল পরিচয় প্রাইজ-পদক পাওয়া কি চাকুরিতে উন্নতি বা সুনাম করার সঙ্গে যুক্ত নয়। তাঁর সাধনার শ্রেষ্ঠ ফসল তাঁর কিছু বই : ইংরেজিতে—'এ হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটারেচার' (১৯৩৫), 'এ কম্প্যারেটিভ গ্রামার অব দ্য মিড্‌ল ইণ্ডোএরিয়ান' (১৯৫১), 'হিস্টরিক্যাল সিনট্যাক্স অব দ্য মিড্‌ল ইণ্ডোএরিয়ান' (১৯৫৩), 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচার' (১৯৬০), দু'খণ্ডে লেখা 'এটিমোলজিক্যাল ডিক্শনারি অব বেঙ্গলি'(১৯৭১); বাংলায়—'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৯), চার খণ্ডে রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৪০-৫৮), 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য'(১৯৩৪), 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' (১৯৫১), 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৬২) 'বটতলার ছাপা ও ছবি' (১৯৮৪) ইত্যাদি। এ ছাড়া অজস্র দুরূহ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন।

তাঁর অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র ছিল বিশাল। জীবনের শেষ দিকে ভূতের গল্প ও রহস্যকাহিনীর দিকে তাঁর ঝোঁক পড়েছিল। এ সব নিয়ে গবেষণা করে যেমন বই লিখেছেন, তেমনি নিজে কিছু গল্পও রচনা করেছেন। তাঁর দু'খণ্ডে লেখা আত্মজীবনী 'দিনের পরে দিন যে গেল' (১৯৮২ ও ১৯৮৬) কেবল সুখপাঠ্যই নয়, এদেশে শিক্ষাজগতের ঐতিহাসিক দলিলও বটে।

১৯৯২ সালের মার্চ মাসে কলিকাতাতেই তাঁর দেহাবসান ঘটে।

হা. মা.

সুখলতা রাও [১৮৮৬—১৯৬৯]

শিশুসাহিত্যিক ও সমাজসেবিকা। তিনি ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও 'সন্দেশ' (দ্র) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (দ্র) তাঁর পিতা এবং তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যের অমর লেখক সুকুমার রায়ের (দ্র) ছোট বোন অর্থাৎ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের (দ্র) পিসি।

সুখলতা রাও কলিকাতার বেথুন কলেজ থেকে

www.pathagar.com

বি.এ.পাশ করেন। শিক্ষাজীবনশেষে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯০৭ সালে ওড়িষ্যানিবাসী ড. জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এরপর স্বামীর উৎসাহে তিনি নারী ও শিশুকল্যাণমূলক সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কটকের শিশু ও মাতৃমঙ্গলকেন্দ্র ও ওড়িষ্যার নারীসেবা সংঘসহ বহু সেবাসংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী। সমাজসেবায় অবদানের জন্য তিনি 'কাইজার -ই-হিন্দ' পদক লাভ করেন।

শিশুসাহিত্যিক পিতা ও বড় ভাইয়ের প্রভাবে শৈশবেই সুখলতা রাওয়ের সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রথম তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই লিখতেন। বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা কুড়ি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'গল্প আর গল্প', 'গল্পের বই' (১৯১৩), 'আরো গল্প' (১৯১৫), 'খোকা এলো বেড়িয়ে', (১৯৬১), 'নতুন ছড়া' (১৯৫২),'নানান গল্প' (১৯৬৯), 'নিজে পড়ো' (১৯৫৬), 'নিজে শেখো' (১৯৫৭), 'নতুন পড়া' (১৯২২), 'পড়াশোনা', 'বিদেশী ছড়া' (১৯৬২), 'সোনার ময়ূর', 'স্বাস্থ্য', 'লালিভুলির দেশে' (১৯৫৭), 'খেলার পড়া' (১৯৬১),'নানান দেশের রূপকথা', 'পথের আলো', 'ঈশপের গল্প', 'হিতোপদেশের গল্প', 'New Steps' ইত্যাদি। ইংরেজিতে রচিত তাঁর কবিতার গ্রন্থ 'Living Lights'। তাঁর সাহিত্যকর্মে শিশুদের চরিত্রগঠন ও শিক্ষামূলক দিক প্রাধান্য পেয়েছে।

সুখলতা রাও নিজের সম্পাদনায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় 'আলোক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ছবি আঁকায়ও তিনি ছিলেন দক্ষ। তাঁর আঁকা অনেক ছবি তাঁর বইগুলোতে পাওয়া যায়।

শিশুসাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত 'নিজে পড়ো' বইটির জন্য ১৯৫৬ সালে সুখলতা রাও ভারত সরকারের পুরস্কার পান।

সুখলতা রাও ১৯৬৯ সালের ৯ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

সুচরিত চৌধুরী [১৯৩০—১৯৯৫]

ছোটগল্পকার, সঙ্গীত বিষয়ক লেখক এবং বংশীবাদক। ১৯৩০ সালের ২১শে জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার কদুরখিলে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম আশুতোষ চৌধুরী আর মায়ের নাম চারুবালা চৌধুরী। লোকগাথা - সংগ্রাহক পিতার অনুপ্রেরণায় সাহিত্য-জীবনের শুরু। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়।

গল্পকার হিসাবে পরিচিতি অর্জন করলেও সুচরিত চৌধুরী উপন্যাস (দ্র), নাটক (দ্র) ও কবিতাও (দ্র) লিখেছেন। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শুধু চৌধুরীর শুধু কবিতা'। প্রথম গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে ১৯৫২ সালে সুরাইয়া চৌধুরী ছদ্মনামে লিখিত 'সুরাইয়া চৌধুরীর সেরা গল্প'। তাঁর অন্যান্য বইগুলোর মধ্যে 'আকাশে অনেক ঘুড়ি' (১৯৬১), 'একদিন একরাত' (১৯৬৬), 'সুচরিত চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৭), 'নদী নির্জন নীল' (১৯৮৭), 'কিংবদন্তীর গল্প : চট্টগ্রাম' (১৯৯৩) উল্লেখযোগ্য।

সুচরিত চৌধুরী মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'সীমান্ত'র সহ-সম্পাদক ও সিনেমাপত্রিকা 'মাসিক উদয়ন'-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'দিগন্ত' ও 'প্রাচী' নামের দু'টি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনও সম্পাদনা করে বের করতেন পঞ্চাশের দশকে।

তিনি গুণী সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। চমৎকার বাঁশি বাজাতেন। বাঁশিতে রাগ-সঙ্গীত পরিবেশন করে দেশে-বিদেশে প্রচুর খ্যাতি পেয়েছেন। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি বাঁশির জন্য খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। এই বাঁশির জন্যই তিনি পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞে পরিণত হন। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গানের বই 'সুর লেখা'।

১৯৭৬ সালে সুচরিত চৌধুরী ছোটগল্পের (দ্র) জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) পান। ১৯৯৫ সালের ৬ই জানুয়ারি তিনি হৃদ্‌রোগে (দ্র) আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

র. শা.

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত [১৯০১—১৯৬০]

রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে কয় জন কবি

www.pathagar.com

খুব বিখ্যাত হয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের এক জন। জীবনানন্দ দাশ (দ্র), অমিয় চক্রবর্তী (দ্র), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু (দ্র) ও বিষ্ণু দে (দ্র) এই পাঁচ জন কবিকে বলা হয় তিরিশের কবি। বাংলা সন ১৩৩০-এর পরে এ পাঁচ জন কবির দ্বারা একটি নতুন ও আলাদা কাব্যধারা সৃষ্টি হতে থাকে। এ কারণে এঁদের এই নাম। এঁরা রবীন্দ্রনাথের (দ্র) চেয়ে একটু ভিন্ন রকম কবিতা (দ্র) লিখেছেন। এঁরা সবাই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার সঙ্গেও এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এঁদের হাতেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারার এক জন খুব নামকরা কবি হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯০১ সালের ৩০শে অক্টোবর কলিকাতার এক অভিজাত পরিবারে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। সুধীন্দ্রনাথের পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বিরাট পণ্ডিত ও দার্শনিক; তিনি এক জন রাজনীতিবিদ এবং হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতাও ছিলেন; বিদ্বান হিসাবে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। সুধীন্দ্রনাথের পিতৃব্য অমরেন্দ্রনাথ এক জন খ্যাতিমান অভিনেতা ও নাট্যকার। সুধীন্দ্রনাথের মা কলিকাতার বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের মেয়ে, নাম ইন্দুমতী বসুমল্লিক। মামা সুবোধ বসুমল্লিক ছিলেন সে সময়ের কলিকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বংশগৌরব ছিল উঁচু। চার ভাই এক বোনের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বিতীয়। দেখতেশুনতেও তিনি খুব সুন্দর ছিলেন, চেহারা ছিল অভিজাত।

পণ্ডিত পিতার কঠোর তত্ত্বাবধানে সুধীন্দ্রনাথের লেখাপড়া শুরু হয়। বাড়িতেই পড়াশোনা করেছিলেন। পিতার কাছে পড়েছিলেন ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শন। শৈশবে কাশীর এক বিখ্যাত স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। এ প্রতিষ্ঠানে সুধীন্দ্রনাথ খুব ভালভাবে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ মাতৃভাষা বাংলা শিখেছিলেন আরেকটু পরে, খুব যত্নের সঙ্গে। ১৯১৮ সালে কলিকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল থেকে সুধীন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আই. এ. (১৯২০) ও বি. এ. (১৯২২) পাশ করেন। তারপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) ইংরেজিতে এম. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু পড়া শেষ করেন নি। কিছুদিন আইনও পড়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দেন নি। এর পরে তিনি সাংবাদিকতায় যোগ দেন। ইংরেজিতে খুব ভালো ছিলেন বলে কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁকে কাজ করতে অনুরোধ জানায়। সুধীন্দ্রনাথ বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা 'দ্য স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন (১৯৪৫-৪৯)। এরপর তিনি কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং শেষে কলিকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন (১৯৫৬-১৯৬০)। তখন একই বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন বাংলা সাহিত্যের আরেক বিখ্যাত কবি ও গদ্যলেখক বুদ্ধদেব বসু। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় সুধীন্দ্রনাথ হঠাৎ মারা যান ১৯৬০ সালের ২৫শে জুন। সুধীন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রীর নাম ছবি দত্ত। পরে তিনি রাজেশ্বরী বাসুদেব নামে এক পাঞ্জাবি মহিলাকে বিয়ে করেন। রাজেশ্বরী দত্ত ছিলেন এক বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলি, জাপান ও আমেরিকা। আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কাজ করেছিলেন। আসলে মনের দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন আন্তর্জাতিক; তাঁর লেখাতেও এ পরিচয় ফুটে উঠেছে। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি প্রমথ চৌধুরীর বিখ্যাত পত্রিকা 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তারপর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজের সম্পাদনায় একটি পত্রিকা বের করেন। পত্রিকাটির নাম 'পরিচয়' (১৯৩১)। এটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলির একটি। বাংলা সাহিত্যের অনেক বড় লেখক ও কবি এই পত্রিকাতে লিখেছেন। প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিকেরা এই পত্রিকার সঙ্গে ছিলেন জড়িত। পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সব সময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তরুণ বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কবিতা লিখেছেন, পরে নিজের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পান। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯)

www.pathagar.com

কাব্যটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। আর এর আগে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'তন্বী' (১৯৩০) রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'কুক্কুট'। এটিও রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে সে আমলের বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বইয়ের সংখ্যা সাতটি। 'তন্বী' ছাড়া অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তরফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৩), 'প্রতিধ্বনি' (১৯৫৪), 'দশমী' (১৯৫৬)। ইংরেজি ছাড়া সুধীন্দ্রনাথ ফরাসি ও জার্মান ভাষাও জানতেন। আধুনিক ইউরোপীয় কবিদের কিছু কিছু কবিতা অনুবাদ করে সেগুলো 'প্রতিধ্বনি' গ্রন্থে সঙ্কলিত করেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ অনেক গদ্যও লিখেছেন। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক জন ভাল গদ্যলেখক ও সমালোচক। তাঁর গদ্যভঙ্গি একটু জটিল, একটু আলাদা। তাঁর দুটি প্রবন্ধের বই আছে—'স্বগত' (১৯৫৭), 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭)। ইংরেজিতেও তাঁর বই ও প্রবন্ধ আছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন কবিতা লিখেছেন তখন পৃথিবীতে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট চলেছে। দু'টি মহাযুদ্ধ তিনি দেখেছেন। যুদ্ধের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে নানা পরিবর্তনও তিনি দেখেছেন। আর দেখেছেন পুরানো বিশ্বাস ও পুরানো মূল্যবোধের ভাঙন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় এইসব বিশ্বাসভঙ্গের কথা আছে। এগুলো নিয়ে তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শব্দকুশলী ও ছন্দনিপুণ কবি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) মতো তিনি অনেক ভারি ভারি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন, নতুন শব্দও তৈরি করেছেন। ছন্দে (দ্র) তাঁর হাত ছিল খুব পাকা। তিনি বাংলা মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনেক চমৎকার কবিতা লিখেছেন। এ কারণে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় থাকবেন।

আ. ক.

সুন-ৎজু [খ্রি.পূ.৩৩০-২২৫]

প্রাচীন চীনের বস্তুবাদী দার্শনিক। প্রচলিত চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি সৃষ্টির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

সুন-ৎজু (Hsun- tzu) মনে করেন, প্রকৃতির মধ্যে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি—অস্তি ('ইয়াং') ও নাস্তি ('ইন')-র নিরন্তর ক্রিয়া ও সংঘাত বিদ্যমান। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই বস্তুর সৃষ্টি, অন্য কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তির ইচ্ছায় বা সাহায্যে নয়।

তাঁর মতে, মানুষের জ্ঞানের সূচনা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে কেন্দ্র করে। অন্য দিকে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকৃতি থেকে সর্বদা জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করে থাকে। মানুষের মহৎ প্রকাশ শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। আর শিক্ষা মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ করে থাকে। চীনা দর্শনের বিকাশে সুন-ৎজু'র এইসব চিন্তার তাত্ত্বিক প্রভাব অনস্বীকার্য।

সুন-ৎজু'র জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে এবং মৃত্যু ২২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

আ. র.

সুনির্মল বসু [১৯০২—১৯৫৭]

কবি, শিশুসাহিত্যিক ও সম্পাদক। অবিভক্ত ভারতের বিহারের গিরিডিতে ১৯০২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

সুনির্মল বসু আজীবন প্রধানত শিশুতোষ সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর কাব্যাদর্শ ছিল শিশু-কিশোরদের নির্মল আনন্দ দান। এর লক্ষ্য থেকেই তিনি অসংখ্য ছড়া (দ্র) ও কবিতা (দ্র) রচনা করেন, যা বাংলা শিশুসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত।

সম্পাদক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল সুবিদিত। শিশু-কিশোর সাময়িকী 'কিশোর এশিয়া' সম্পাদনা করে তিনি যশস্বী হয়ে আছেন। চল্লিশের দশকে কিছুকাল 'শিশু সওগাত' পত্রিকার সঙ্গেও সম্পাদনাসূত্রে তিনি জড়িত হয়েছিলেন।

ছড়া-কবিতা রচনার পাশাপাশি সুনির্মল বসু বেশ কিছু

www.pathagar.com

শিশুতোষ ছোটগল্প (দ্র), উপন্যাস (দ্র), নাটিকা ও প্রবন্ধেরও (দ্র) রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ছানাবড়া', 'বেড়ে মজা', 'হৈ-চৈ', 'হুলুস্থুল', 'আনন্দনাড়ু, 'ছন্দের টুংটাং', 'কিপ্টে ঠাকুরদা' প্রভৃতি।

১৯৫৭ সালে কলিকাতায় (দ্র) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় [১৮৯০—১৯৭৭]

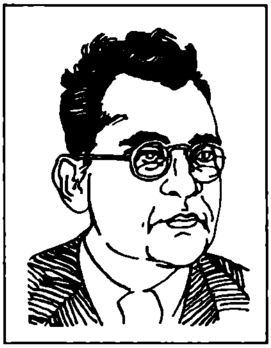

বাংলা ভাষাতত্ত্ব গবেষণায়, ভারততত্ত্ব (বা 'ইণ্ডোলজি') ও মানবসংস্কৃতি আলোচনায় খ্যাতনামা, প্রভাবশালী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত। বস্তুত বাংলা ভাষা (দ্র) নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ রচনা করে গেছেন যে ক'জন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

সুনীতিকুমারের জন্ম হাওড়া-শিবপুরে তাঁর মাতুলালয়ে ১৮৯০ সালের ২৬শে নভেম্বর। তাঁদের বংশ অত্যন্ত প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্যাচর্চার ঐতিহ্যও কয়েক পুরুষের। তাঁর পিতার নাম হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম কাত্যায়নী দেবী। ছাত্রজীবনে মেধাবী হিসাবে সুখ্যাতি ছিল তাঁর; ক্লাসে সর্বদা প্রথম হতেন, ইংরেজিতে খুব বেশি আর গণিতে খুব কম নম্বর পেতেন। পাঠ্য বইয়ের বাইরে বিভিন্ন ধরনের বই পড়তেন, ফলে কিশোর বয়স থেকেই কৌতূহল ছিল সর্বব্যাপী— ইতিহাস, চিত্রকলা, রাজনীতি ইত্যাদি সব দিকেই আগ্রহ ছিল।

১৯০৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে মাসিক কুড়ি টাকার বৃত্তি পান। অতঃপর স্কটিশ চার্চ কলেজে এফ.এ. (অর্থাৎ ফার্স্ট আর্টস্, এখনকার এইচ.এস.সি. পরীক্ষার সমতুল্য) পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এরপর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র)। ১৯১১ সালে সেখান থেকে অনার্সে ১ম শ্রেণীতে ১ম হয়ে বি.এ. পাশ করেন এবং ১৯১৩ সালে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে কলিকাতায় (দ্র) বিদ্যাসাগর কলেজে কিছুকাল ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপনার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালে সংস্কৃতের মধ্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (দ্র) ও জুবিলী পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯১৯ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ইউরোপ যান ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পঠনপাঠনের জন্য। সেখানে প্রথমে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা লাভ করেন। পরে ১৯২১ সালে তাঁর সর্ববৃহৎ গবেষণাকর্ম Origin and Development of Bengali Language (যে বইকে সংক্ষেপে সকলেই ODBL বলে থাকেন) সম্পন্ন করার জন্য ডি. লিট (D.Litt) উপাধি পান। এর পর লণ্ডনে বসেই তিনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নিকট ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধ্বনিতত্ত্ব, ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রাকৃত ভাষা, ফার্সি সাহিত্য, প্রাচীন আইরিশ ও ইংরেজি ভাষা, প্রাচীন ইরানীয় ভাষা ইত্যাদির পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে ফ্রান্সে গিয়ে প্যারিসের (দ্র) সর্বোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়ে ভারতীয় আর্যভাষাতত্ত্ব, স্লাভ ও ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব, অস্ট্রো-এশীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন মোগ্দিয়ান ও খোটানি ভাষা, গ্রিক ও লাতিন ভাষার ইতিহাস ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করেন। ১৯২২ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষের (দ্র) আমন্ত্রণে তিনি ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের প্রথম 'খয়রা অধ্যাপক' হিসাবে যোগ দেন। এই পদে দীর্ঘ ৩০ বছর আসীন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৫২ সালে প্রফেসর এমেরিটাস নিযুক্ত হন এবং তার পরে জাতীয় অধ্যাপক।

সুনীতিকুমার বিশেষ স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের (দ্র)। ১৯২৭ সালে কবির সহিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণের অনবদ্য বর্ণনা লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে। দেশে-বিদেশে কত সম্মানসূচক পদ যে অলঙ্কৃত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভাষাচার্য' উপাধি দিয়েছিলেন। এ ছিল তাঁর যোগ্য অলঙ্কার। বস্তুতপক্ষে, সুনীতিকুমারের আগ্রহের পরিধি ছিল আরো বিশ্বকৌষিক। কেবল ভাষা নয়, মানববিদ্যার যত শাখাপ্রশাখা আছে, তার সমস্ত কিছু নিয়েই তাঁর কৌতূহল ছিল বিপুল।

বইপত্র ও প্রবন্ধ যত লিখেছেন সব এখনো গ্রন্থাকারে

www.pathagar.com

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়— তাঁর ছাত্র ড. এনামুল হকের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন— ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব ও সরদার জয়েনউদদীন

প্রকাশিত হয় নি। সেসবের কিছু ইংরেজিতে আবার কিছু বাংলায় লেখা। তবে সব মিলিয়ে তাঁর রচনাসংখ্যা অন্তত চার শ'র কাছাকাছি। যথার্থ অর্থে বিজ্ঞানমনস্ক ও উদারপন্থী ছিলেন তিনি।

১৯৭৭ সালের ২৯শে মে কলিকাতায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

হা. মা.

সুন্দরবন

বাংলাদেশের (দ্র) জাতীয় বন। সুন্দরবন সবচেয়ে বড় 'ম্যাঙ্গ্রোভ্' (দ্র) জঙ্গল। গঙ্গানদ (দ্র)- ব্রহ্মপুত্র নদের (দ্র) মোহনায় এই বন।

ম্যাঙ্গ্রোভ্ বন বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপকূলে জন্মায়। শান্ত সাগর, খাড়ি ও নদীর মোহনাও উপযুক্ত স্থান। ম্যাঙ্গ্রোভ্ জঙ্গলের গাছপালা-লতাগুল্ম লবণাক্ত সাগরের তীরে আপনা আপনিই গড়ে ওঠে। গাছপালা-লতাগুল্মের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

গাছের বীজ থেকে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা মূল গজায়। জলে বা ডাঙায় বীজ পড়েই মূলকে ওপর দিকে রাখে। কাদা বা মাটি পেলে মূল বীজের সহায়তায় জীবন্ত প্রাণীর মতো তা আঁকড়ে ধরে। মূল কাজ করে শ্বাসমূল হিসাবে। স্রোতে বালুকণা ভেসে যাবার সময় শ্বাসমূল বালু ও পলি জমা করে। ম্যাঙ্গগ্রোভ্ এভাবে ভূখণ্ড তৈরি করে। গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিছু শিকড় মাটির তলায়, কিছু ওপর দিকে থাকে। একে বলে 'শূল'। এটি খুবই ধারালো।

বিশ্বের সেরা প্রজাতির গাছপালাসমৃদ্ধ ম্যাঙ্গ্রোভ্ জঙ্গলকে বলা হয় লাল ম্যাঙ্গ্রোভ্ (Rhitophora mangle)। এই বন আছে ফ্লোরিডা থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলে। এই বনে গুল্ম ও ফার্ন (দ্র) জাতীয় ছোট গাছ জন্মে। কিছু প্রজাতির গাছ ২৫ মিটার লম্বা হয়। গাছের বাকলে ট্যানিক অ্যাসিড থাকে। এটি চামড়া ট্যান করতে ব্যবহৃত হয়।

সুন্দরবনের আয়তন ৫,৭০৪ বর্গকিলোমিটার (৫৭,৭২,৮৫৬ হেক্টর), ১০০ বছর আগে ছিল ১০,৬০০ বর্গকিলোমিটার। এ বন বঙ্গোপসাগর (দ্র) থেকে প্রায় ৮০ কিমি উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতে (দ্র) পড়েছে ৪,২৬৪ বর্গকিলোমিটার। ২১° ৩০-২০° ৩৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°-৯০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে সুন্দরবন অবস্থিত।

www.pathagar.com

জলবায়ু আর্দ্র ভাবাপন্ন। তাপমাত্রা ৭৫°–৯৫° ফারেনহাইট। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৭৭ সেন্টিমিটার। ৬৮·৫১% বন, ৩০·৪২% নদ-নদী-খাল, ১·০৭% ঝোপঝাড় ও নতুন বন।

লবণাক্ততার ভিত্তিতে সুন্দরবন তিনভাগে বিভক্ত—। স্বাদুপানি, মধ্য লবণাক্ত ও অধিক লবণাক্ত এলাকা।

বিশ্বের ৫০টি প্রকৃত উপকূলীয় প্রজাতির গাছের অন্তত ৪০ প্রজাতি আছে সুন্দরবনে। ৭০–৭৫ রকমের উদ্ভিদ আছে। সুন্দরী, গর্জন, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন ইত্যাদি সহ সুন্দরী লতা, কেঁয়াকাঁটা, হেঁতাল, কাঁকড়া, হুদোবন উল্লেখযোগ্য।

সুন্দর বা সমুন্দর বন থেকে অথবা সুন্দরী গাছের জন্য নাম হয়েছে সুন্দরবন। সুন্দরী গাছ সুন্দরবনে জন্মেছে সবার শেষে। একে বাদাবনও বলা হয়।

সুন্দরবন নিয়ে নানা রকম কিংবদন্তি ও কুসংস্কার রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত বনবিবি, বড় গাজী, বাদার রানী ও রাজা। বাওয়ালিরা বাদায় নামার আগে তাঁদের নাম স্মরণ করে, মানত-পূজা দেয়। তারা বাঘের নাম উচ্চারণ করে না। 'বাঘবন্দ' দেবার গুনিন আছে।

সুন্দরবনে ২৪ ঘণ্টায় দু'বার জোয়ার-ভাটা হয়। মানুষের বসতি নেই। পায়ে চলার পথ নেই।

সুন্দরবনের বাঘ (দ্র) দুনিয়ার সেরা, চিত্রল হরিণও। এ ছাড়া আছে শূকর, অজগর সাপ, উদবিড়াল ও পাখিসহ নদী-খালে কামট *(কার্চা রাইনাস)*, কুমির (দ্র)।

এখানে আছে অসংখ্য নদী-খাল। যমুনা, কলাগাছিয়া, ফুলখালি বিখ্যাত। দুবলার চরও বিখ্যাত। সুন্দরবনের বাঘ বাংলাদেশের জাতীয় পশু।

সুন্দরবনে যারা কাঠ-গোলপাতা কাটে, তাদের বলা হয় বাওয়ালি। জেলে, শামুক খোটা, মৌয়ালও আছে। এই বনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

বছরে নিউজপ্রিন্ট মিলের জন্য প্রয়োজন ৫০ হাজার ঘনফুট গেওয়া কাঠ। ম্যাচ ফ্যাক্টরিতেও তা লাগে। সুন্দরী কাঠ লাগে হার্ডবোর্ড মিলে। পল্লীবিদ্যুতায়নে বছরে ১৪ হাজার আর. ই. বি. বল্লী সরবরাহ করা হয়। এখানে প্রচুর মাছ (দ্র), মধু (দ্র) ও গোলপাতা সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবছর ৪০ জন লোক মানুষখেকো বাঘের পেটে যায়। কামটে পা

www.pathagar.com

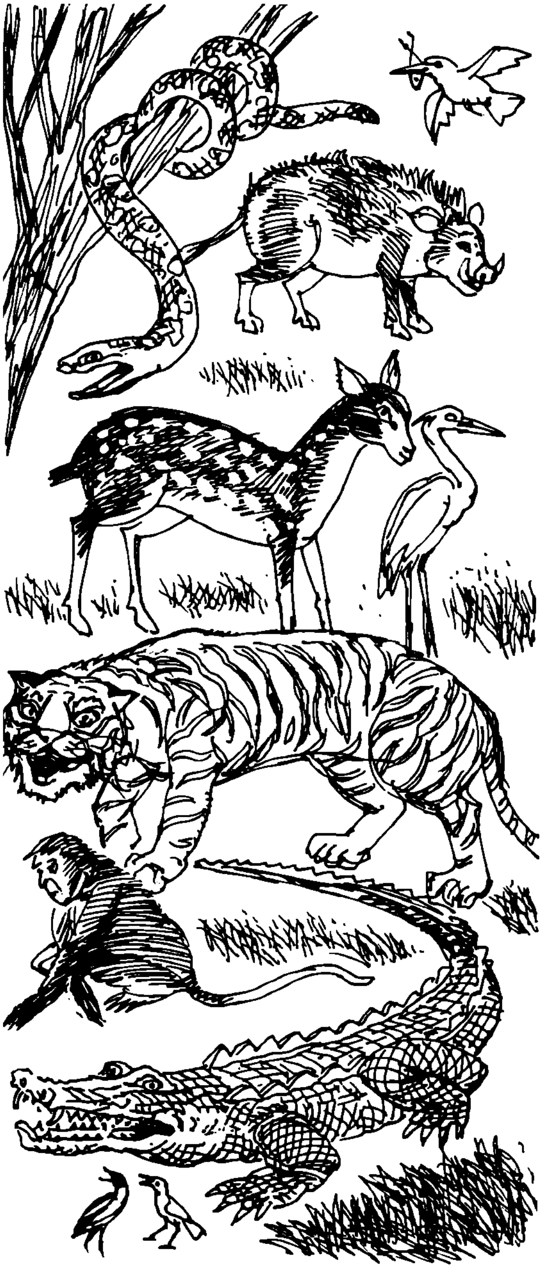

সুন্দর বনের জীবজন্তু

কাটে। বিষাক্ত সাপে (দ্র) কামড়ায়।

কাজের সুবিধার জন্য সুরন্দরবন কয়েকটি রেঞ্জে বিভক্ত— যেমন চাঁদগাই, নলিয়ান, শরণখোলা রেঞ্জ।

শ. খা.

সুন্নাত

সুন্নাত বা সুন্নাহ্-এর আভিধানিক অর্থ নীতি, আদর্শ, পথ, প্রথা ইত্যাদি। ইসলামী বিধান মতে রসূলুল্লাহ্ (স.) (দ্র)-এর বাণী, কাজ, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস এবং নির্দেশাবলি সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। এ ছাড়া তিনি যে সকল বিষয়ে নীরব কিংবা সরব সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, তা-ও সুন্নাত।

সুন্নাত দুই প্রকার— কর্মমূলক ও বাণীমূলক। রসূলুল্লাহ্ (স.) যে সকল কাজ নিজে করেছেন, অন্যকে করতে বলেছেন কিংবা অন্যের কাজে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, সেগুলো কর্মমূলক; এবং তিনি যে সকল কথা বলেছেন কিংবা অন্যের যে কথা সমর্থন করেছেন, সেগুলো বাণীমূলক সুন্নাত। তাঁর হাজার হাজার হাদিস (দ্র) এই পর্যায়ে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

মু. মা.

সুন্নি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত দ্র

সুপারি

পাল্‌মি (Palmae) পরিবারভুক্ত, বৈজ্ঞানিক নাম *এরিকা কটেচ্যু (Areca catechu* Linn*)*। আমাদের দেশে দু'রকম সুপারি হয়। চট্টগ্রামে (দ্র) লাল রঙের সুপারি দেখা যায়, সেরকম আছে আন্দামান ও সুমাত্রায়। দেশের অন্যান্য অংশে কমলা ও হলদে রঙের হয়। এই জাতের সুপারি আসাম ও সিকিমে প্রচুর হয়।

সাধারণত অল্প নোনা বেলেমাটিতে সুপারি বেশি বাড়ে। সে জন্য উপকূলীয় এলাকায় এর ফলন ও বাড়-বাড়ন্ত বেশি। ৭-৮ বছরে ফলন হয়, তারপর ৮-১০ বছরে সবচেয়ে বেশি ফল দেয়। ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। লম্বায় ৪০-৫০ ফুট। গাছ শক্ত, সরু ও লম্বা। নারকেলের মতো বা পাম গোত্রের অন্যান্য গাছের মতো শাখা-প্রশাখাহীন। মোটা হয় বড় বাঁশের মতো। ভেতরটা ফাঁপা না হলেও আঁশযুক্ত ও অন্যান্য গাছের মতো নিরেট নয়। এটিও পাম গোত্রের বৈশিষ্ট্য। নারকেল পাতার মতো পত্রদণ্ডের পরস্পর বিপরীত দিকে পাতাগুলো থাকে, পাতা লম্বায় ২ ফুটের মতো, পত্রদণ্ড হয় ৭-৮ ফুট। পুষ্পদণ্ড প্রায় নারকেলের পুষ্পদণ্ডের মতো, বহু শাখা-প্রশাখা থাকে, চলতি কথায়

www.pathagar.com

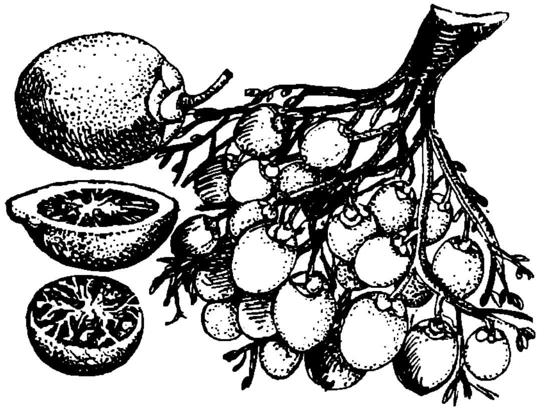

বলে 'কাঁদি'। এক কাঁদিতে প্রচুর সুপারি হয়। ছিবড়ের মতো খোসা ছাড়ালে তার মধ্যে শক্ত শাঁস পাওয়া যায়। সারা বছর কম-বেশি ফল হয়, তবে পৌষ-মাঘ মাসে হয় সবচেয়ে বেশি।

সুপারির অনেক গুণ। দাঁতের ব্যথায়, কৃমিতে, পায়োরিয়ায় মাঢ়ীর রক্তপাতে সুপারি উপকারী। এর রস মারাত্মক ব্যাধি দূর করার ক্ষমতা রাখে। আসামে এক রকম সুপারি আছে, যা খেলে গা দিয়ে ঘাম ঝরে ও মাথা ধরে। তার নাম গুয়া। আমাদের দেশেও সেরকম গরম সুপারি আছে। সুপারির সঙ্গে পান ও চুন মিশিয়ে লোকে খায়।

বি. ব.

সুফি সাহিত্য

সুফি ধর্মমতকে ভিত্তি করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে (দ্র) যে বিশেষ কাব্য রচিত হয়েছে তা সুফিসাহিত্য নামে পরিচিত। সুফি আলাদা কোনো ধর্মমত নয়, ইসলাম ধর্মেরই (দ্র) এক বিশেষ রূপ হল সুফিধর্ম। সুফিধর্মের জন্ম হয়েছে ইরানে। ইরানীরা আবেগী ও ভাববাদী। আরবের ইসলাম ধর্ম ইরান অধিকার করার পরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে সুফি ধর্মমত গড়ে উঠেছে। ইরানে বড় বড় সুফি কবি ছিলেন। তাঁদের খ্যাতি এখনো বিদ্যমান। এই সব কবির মধ্যে রুমি (দ্র), জামী, নিজামী, সাদি (দ্র), হাফিজ (দ্র) প্রমুখ খুবই পরিচিত। সুফিরা উদার ধর্মসাধক। তাঁরা প্রেমের পথের পথিক। তাঁরা ইসলামের শরিয়ত পালন করেন না। অর্থাৎ ধর্মের বাহ্যিক আচার পালনে তাঁদের আনন্দ নেই। তবে পরম স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে তাঁরা গভীরভাবে অনুভব করতে চান। সে জন্য তাঁরা আল্লাহ্‌কে 'মাশুক' বা প্রেমিকা হিসাবে কল্পনা করেন, আর নিজেরা হন 'আশেক' বা 'প্রেমিক'। সুফিরা আত্মাকে খুব মূল্য দেন এবং তাঁরা মনে করেন, আত্মার মধ্য দিয়েই পরম আত্মাকে অর্থাৎ স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা যায়। এ থেকে বোঝা যায়, সুফিরা প্রেম ও উদারতার পথে মহান স্রষ্টাকে পেতে চান। সুফিরা গুরুর প্রতি ভক্তিমান্। গুরুকে বলা হয় পীর বা মুরশিদ। পীরদের খানকাহ্ আছে এবং সেখানে আল্লাহ্‌র যিকির হয়। যিকির অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাম বার বার উচ্চারণ করা সুফিদের আবশ্যিক কাজ।

সপ্তম–অষ্টম শতক থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামের যোগ সাধিত হয় এবং এই সূত্রে সুফি মতও ভারতে এসে যায়। স্থানীয় ধর্মমতের সঙ্গে সুফি ধর্মমতের সংঘর্ষের কারণে সুফি ধর্মমতেও কিছু পরিবর্তন আসে। তবে এ কথা সত্য, ভারতীয় ভাবসাধনায় সুফি মতের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাবের পরিচয় পাই বাংলার বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনে। বাংলাদেশে সুফি মতের প্রবেশ ঘটে মুসলমান কর্তৃক বাংলাদেশ বিজয়ের পরে, তেরো শতকে। মুসলমান ফকির-দরবেশেরা এবং সুফিপন্থী শাসকেরা বাংলাদেশে সুফি মতের প্রসার ঘটায়। স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে কালে কালে সুফিদের মধ্যেও নানা মত-উপমত গড়ে ওঠে। প্রধান চারটি মত বা 'তরিকা' হল—১. চিশ্‌তিয়া, ২. কাদেরিয়া, ৩. সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া, ৪. নক্‌শ্‌বন্দিয়া। মত যা-ই হোক, সুফিরা ভাবের সাধক এবং উদারপন্থী মুসলমান।

বাংলা সাহিত্যে সুফি ধর্মমতের প্রভাবের অনেক পরিচয় আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুফিধর্মের পরিচয় ও ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ নিয়ে বেশ কিছু রচনা আছে। 'যোগ কলন্দর' সম্ভবত সুফিশাস্ত্রের আদি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম জানা যায় না। অন্যান্য কিছু গ্রন্থের এবং গ্রন্থকার সময়কাল নিম্নরূপ :

সৈয়দ সুলতান মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি। তিনি ষোল শতকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর নিবাস চট্টগ্রামে। তাঁর সুফিশাস্ত্র বিষয়ক দু'টি গ্রন্থ হল 'জ্ঞানপ্রদীপ' ও 'জ্ঞানচৌতিশা'।

শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র 'গোরক্ষ বিজয়' নাথ সাহিত্যের

www.pathagar.com

বিখ্যাত বই, কিন্তু এ গ্রন্থে সুফিতত্ত্ব আছে। শেখ ফয়জুল্লাহ্ ষোল শতকের কবি।

শেখ চাঁদের জন্ম কুমিল্লায়, সতেরো শতকে। তাঁর বইয়ের নাম 'হরগৌরী সম্বাদ' ও 'তালিবনামা'।

তাত্ত্বিক কবি হাজী মুহম্মদের বাড়ি চট্টগ্রামে। তিনি ষোল শতকের মাঝামাঝি থেকে সতেরো শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর 'সুরতনামা' সুফিতত্ত্বের বিখ্যাত বই।

মীর মুহম্মদ সুফি সতেরো শতকের প্রথমার্ধের কবি। তিনি ছিলেন হাজী মুহম্মদের শিষ্য এবং চট্টগ্রামবাসী। তাঁর গ্রন্থের নাম 'নূরনামা'।

'সির্নামা' কাজী শেখ মনসুরের গ্রন্থ। এটি রচিত হয়েছে আঠারো শতকের প্রথমে।

আলী রজার নিবাস চট্টগ্রামের আনোয়ারায়। আলী রজা আঠারো শতকের কবি। তাঁর বই 'আগম-জ্ঞানসাগর' একটি বিখ্যাত রচনা।

শেখ জাহিদ সতেরো বা আঠারো শতকের কবি। তাঁর বইয়ের নাম 'আদ্য পরিচয়'।

আরো কিছু সুফি শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আবদুল হাকিমের 'চারি মোকামভেদ' ও 'সিহাবুদ্দীন পীরনামা', বালক ফকিরের 'জ্ঞান-চৌতিশা', মোহাসেন আলীর 'মোকাম-মঞ্জিল কথা', রহিমুল্লাহ্‌র 'তনতেলাওত' ইত্যাদি।

আ. ক.

সুফিবাদ

সুফিমতে স্রষ্টার ইচ্ছায় ও আনন্দে সৃষ্টির সূচনা। এই ইচ্ছার পেছনে রয়েছে জীব ও জগতের প্রতি পরমশক্তি বা আল্লাহ্‌র প্রেম। এক আধ্যাত্মিক প্রেমশক্তি সৃষ্টি রক্ষার পেছনেও কাজ করে। বিশ্বজগৎ এই প্রেমের আকর্ষণেই স্থিত।

সুফিমতে মানুষ আল্লাহ্‌র অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্রষ্টার কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে অজ্ঞতা, অমঙ্গলের উদ্ভব। অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় পৌঁছাতে পারলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান দূর হয়ে যায় এবং সীমাবদ্ধতা কেটে গিয়ে মানুষ তখন ঐশীসত্তার অংশে পরিণত হতে পারে।

বৈষ্ণব ও বাউল (দ্র) মতেও অনুরূপ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁরাও এক রূপের মধ্যে ঐশী অরূপের উপস্থিতি অনুভব করেন। সুফিমতে ঐশীপ্রেম থেকে জন্ম নেয় মানুষের পরমজ্ঞান ও গূঢ়জ্ঞান, যা 'মারেফাত' নামে পরিচিত। স্রষ্টার প্রতি প্রগাঢ় ধ্যানে তন্ময় অবস্থায় সুফি জ্ঞানলোকে পৌঁছান, যেখানে তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পারেন। ব্যক্তিচেতনা ও বস্তুচেতনা পরমশক্তির চেতনায় একাকার হয়ে যায়।

সুফিদের মধ্যে তাপসী রাবেয়া (মৃ. ৮০১), মনসুর আল হাল্লাজ (৮৫৮-৯২২), ইমাম গাজ্জালি (দ্র) জালালউদ্দিন রুমি (দ্র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আ. র.

সুফী মোতাহার হোসেন [১৯০৭—১৯৭৫]

১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭) ফরিদপুর জেলার ভবানন্দপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পৈতৃক নিবাস ছিল বাখরগঞ্জ জেলায়। তাঁর পিতা মুহম্মদ হাশিম বেঙ্গল পুলিশের সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। কবি কুমিল্লা ও বরিশালে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে ফরিদপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পড়েন জগন্নাথ কলেজে এবং সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশও করেন। ১৯৩১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বি. এ. পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কবি আবদুল কাদির (দ্র) ও কথাশিল্পী আবুল ফজল (দ্র)-এর সহপাঠী ছিলেন।

সুফী মোতাহার হোসেন ১৯২৭ সালে ঢাকার পূর্ব বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সফল সনেটকার রূপে তিনি সুপরিচিত।

১৯৪০ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সনেট 'দিনান্তে' বিশ্বভারতী (দ্র) থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) -এর 'বাংলা কাব্য-পরিচয়'-এ সঙ্কলিত হয়। প্রকৃতি আর প্রেম তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য।

www.pathagar.com

সুফী মোতাহার হোসেন বি. এ. পাশ করার পর দু' বছরের মতো সময় সরকারি চাকুরি করেন। ১৯৩৪ সালে কবি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রায় ১২ বছর রোগ ভোগের পর তিনি প্রথমে মহেজউদ্দিন হাই স্কুলে এবং পরে ঈশান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। আর্থিক অসচ্ছলতা ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য কবির শেষ জীবন খুবই কষ্টে কাটে।

কবির যেসব কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের সবগুলোই সনেটের সঙ্কলন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'সনেট সঙ্কলন' (১৯৬৫), 'সনেট সঞ্চয়ন' (১৯৬৬),'সনেট শতক', 'সনেটমালা' (১৯৭০) ইত্যাদি। তিনি 'স্বাপ্নিক' নামে একখানি কিশোর সাহিত্য-সঙ্কলনও সম্পাদনা করেছিলেন। সম্পাদনাকাজে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এ. টি. এম. শামসুল হুদা।

সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৬৫ সালে আদমজী পুরস্কার, ১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার এবং ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

সুফী মোতাহার হোসেন ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের ৭ তারিখে ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শা. হ.

সুভাষচন্দ্র বসু [১৮৯৭-১৯৪৫]

বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ। 'নেতাজী' নামে তিনি অধিক পরিচিত। ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি কটকে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জানকীনাথ বসু। ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ইংরেজের অধীনে কাজ করতে হবে বলে সেই চাকুরি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯১২ সালে মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) নির্দেশে এবং চিত্তরঞ্জন দাশের (দ্র) প্রেরণায় রাজনীতিতে যোগ দেন। প্রথম দিকে কংগ্রেসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পর ১৯২৮

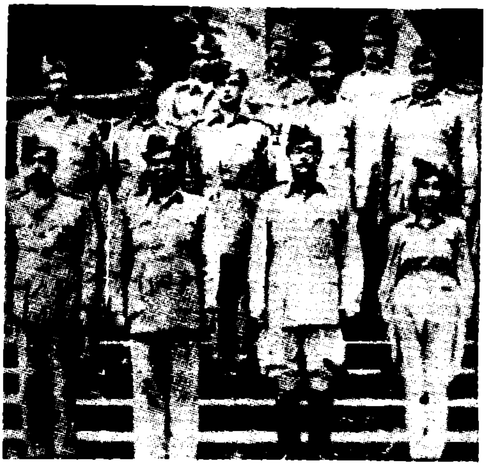

আজাদ হিন্দ্‌ফৌজের কয়েক জন কর্মকর্তা

সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (দ্র) সম্পাদক এবং ১৯৩০ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি দেশের স্বাধীনতার লড়াইকে পিছিয়ে দিয়েছে এই যুক্তিতে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। গান্ধীজীর অহিংসা নীতিরও তিনি বিরোধিতা করেন। স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে তিনি মত পোষণ করতেন। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেসের রক্ষণশীল জোটের চাপে তাঁকে সেই পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পটভূমিতে তাঁর উগ্র স্বদেশী মতবাদের জন্য সরকার তাঁকে গৃহবন্দি করে। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি বন্দি অবস্থা থেকেই পালিয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে কাবুল হয়ে রাশিয়া চলে যান। কিছুদিন পর জার্মানিতে গিয়ে জার্মান সরকারের সহায়তায় একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করেন। এরপর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের নেতা রাসবিহারী বসুর আহ্বানে জাহাজযোগে সিঙ্গাপুরে পাড়ি জমান। সেখানে রাসবিহারী বসুর (দ্র) গঠিত 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' (দ্র)-এর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করা হয়। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠিত হয় এবং এই ফৌজ নিয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতা

www.pathagar.com

অর্জনের লক্ষ্যে সশস্ত্র অভিযান শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে রেঙ্গুনে তাঁর বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার্স স্থাপিত হয়। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে ফরমোজার তাইহুকু বিমান ঘাঁটিতে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটে বলে মনে করা হয়।

সুজ. ব.

সুভাষণ (euphemism)

কথাটির আক্ষরিক অর্থ সুন্দর ভাষণ। যে সুন্দর উক্তি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, জীবনের চলার পথে দিঙ্-নির্দেশনা দেয়, আনন্দ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা যোগায় কিংবা দ্বিধাদ্বন্দ্বের নিরসন ঘটায় তাই 'সুভাষণ' হিসাবে পরিচিত। বিশ্বের তাবৎ পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ, যেমন— মুসলমানদের কুরআন শরীফ (দ্র), খ্রিস্টানদের বাইবেল (দ্র), হিন্দুদের গীতা (দ্র), বৌদ্ধদের ত্রিপিটক (দ্র) এবং পার্সিদের জেন্দাবেস্তা সুভাষণে পূর্ণ। অনেক বিশ্ববরেণ্য লেখক, যেমন— শেক্সপীয়র (দ্র), গোয়টে (দ্র), রবীন্দ্রনাথ (দ্র) প্রমুখের সুভাষণ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

ক. চৌ.

সুভো ঠাকুর [১৯১২—১৯৮৫]

চিত্রশিল্পী, কবি, পত্রিকা সম্পাদক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও শিল্পসংগ্রাহক সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের (দ্র) সেজভাই হেমেন্দ্রনাথের পৌত্র, সে অর্থে কবিগুরুর নাতি।

ঠাকুরপরিবারের এই সন্তান যে বিদ্রোহী ছিলেন তার বড় প্রমাণ, নিজের নাম পাল্টে তিনি 'সুভো ঠাকুর' করেছিলেন। তাঁর মনের কাঠামো ছিল অভিজাত, কিন্তু সামাজিক আচরণে তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষদের ভিড়ে। যৌবনে এক কবিতায় লিখেছিলেন : " 'পয়েট টেগোর হন কে তোমার, জোড়া সাঁকোতেই থাক ?/ 'বাবার খুড়ো যে হন শুনিয়াছি, মোর কেহ হয় নাকো।' " তেত্রিশ বছর বয়সে একটি গদ্যগ্রন্থ লিখে তার যে নাম দিয়েছিলেন ('নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে') তাতেও ঐ সাধারণ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা ব্যক্ত হয়েছে।

তবু আসলে মানুষটি ছিলেন অ-সাধারণ। জীবদ্দশায় তাঁকে বলা হত 'ঠাকুরবাড়ির কালাপাহাড়', বলা হত 'বোহেমিয়ান'। সারা জীবন কোনো কাজ করেন নি, অর্থাৎ চাকরিবাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি কিছুই না। সাহিত্যচর্চা করেছেন, ছবি এঁকেছেন, নানান হবি (hobby) বা খেয়ালের পিছনে ছুটেছেন—যেসব দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা তৈরি হয়েছিল। কি সাহিত্যে, কি চিত্রকলায়, কি পত্রিকা সম্পাদনায় সর্বত্র অভিনব কিছু করার প্রয়াস পেয়েছেন।

১৯৪৩ সালে কলিকাতায় (দ্র) নিজের বাড়িতে চিত্রশিল্পীদের নিয়ে 'ক্যালকাটা গ্রুপ' নামে একটি দল গঠন করেন। উদ্দেশ্য নবীন শিল্পীদের নিয়ে নতুন শিল্পধারা সৃষ্টি করা। কলেজে পড়ার সময়ে 'চতুরঙ্গ' নামে একটি পত্রিকা বের করেছিলেন। পরে, ত্রিশের দশকে মাসিক 'ভবিষ্যৎ' প্রকাশ করেন এবং আশু চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সেকালের বিখ্যাত সাহিত্যসাপ্তাহিক 'অগ্রগতি'র অন্তরালে মূল অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় সম্ভবত 'সুন্দরম' নামে একটি শিল্পসংক্রান্ত পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করা।

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখতেন। সব মিলিয়ে কুড়িটির মতো বই : নাটক–'রুদ্ররাজ' (১৯২৮); কাব্য–'দিগন্তর' (১৯৩২), 'স্বপ্নশেষ' (১৯৩৫), Flames of Passion (১৯৪২); বেল্-লেৎর—'নীল-রক্ত লাল হয়ে গেছে' (১৯৪৬); উপন্যাস—'অলাতচক্র' (১৯৪৮); চিত্রকলা –Art of Subho Tagore ইত্যাদি।

১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে মারা যান কলিকাতায়।

হা. মা.

সুমেরীয় সভ্যতা মেসোপটেমীয় সভ্যতা দ্র

সুমেরু

সুমেরু অঞ্চল উত্তর মেরুরই অন্য নাম। ইংরেজিতে আর্ক্‌টিক্ (Arctic) অঞ্চল বা নর্থ পোল্ (North Pole) বলে। এর বিপরীতে দক্ষিণ মেরুকে তেমনি কুমেরু, অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) বা সাউথ পোল বলা হয়।

সুমেরু অঞ্চল বলতে বোঝায় ৬৬° ৩০ উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে অবস্থিত এলাকা। এর ভিতরে পড়ে আর্ক্‌টিক্ ওশেন্ (অর্থাৎ উত্তর মহাসাগর বা সুমেরু মহাসাগর), উত্তর আমেরিকার সর্বাধিক উত্তরাংশ (অর্থাৎ আলাস্কা ও কানাডার উত্তরাংশ), গ্রিনল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার উত্তরাংশ, রাশিয়ার

www.pathagar.com

উত্তরাংশ এবং বেশ কিছু দ্বীপ।

১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল মার্কিন নৌ-কম্যাণ্ডার রবার্ট ই. পিয়ারি (Robert E. Peary) সর্বপ্রথম সুমেরুতে পৌঁছতে সক্ষম হন। ১৯৭৮ সালের ১লা মে জাপানি অভিযাত্রী নাওমি উয়েমুরা একাকী তাঁর অভিযাত্রা সম্পন্ন করেন।

হা. মা.

'সুমো' খেলা

'সুমো' (sumo) এক ধরনের কুস্তিখেলা। অসম্ভব স্থূলকায় কুস্তিগীরেরা এই খেলায় অংশ নেন। বর্তমানে জাপানে সুমো খেলা ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সুমো খেলোয়াড়দেরকে জাপানি ভাষায় 'রিকিসি' বলে। খেলাটির উদ্ভব হয়েছে জাপানে খ্রিস্টজন্মেরও পূর্বে এবং মূলত এটি জাপানেরই একটি খেলা।

সুমো খেলা নিয়ে জাপানের ঘরে ঘরে আলোচনা হয়। এক জন রিকিসির অগণিত ভক্ত থাকে। রিকিসিরা অসম্ভব স্থূলকায় হলেও তাদের শরীরে কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো মেদ থাকে না। শরীরের উপরিভাগে মেদের মতো যা দেখা যায়, তা আসলে মাংসপেশি। এই মাংসপেশি খুব কোমল হয়। রিকিসিদের যার যত মাংসপেশি থাকবে তার তত সুবিধা। প্রতিপক্ষের ঘুষি ঠেকাতে এই মাংসপেশিই একমাত্র সম্বল।

মুষ্টিযুদ্ধের (দ্র) মতোই সুমো খেলার রিং তৈরি করা হয়। সেখানে উঠে দুই সুমো খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

রিকিসিদের মধ্যে বিভিন্ন পদ রয়েছে। নতুন সুমো খেলোয়াড়দেরকে 'মায়েজুমো' বলা হয়। রিকিসিদের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন পদ। উপরের দিকে রয়েছে ক্রমশ 'জুনোকুচি', 'জুনিদান', 'সানদানমে', 'মাকুচিতা', 'জুরিও' এবং 'মাকু-উচি'। সর্বশেষ দুই পদের অধিকারী রিকিসিরা নির্ধারিত অঙ্কের বেতন পেয়ে থাকেন। 'মাকুচিতা' থেকে 'মায়েজুমো' পদের অধিকারী রিকিসিরা উচ্চ পদাসীন রিকিসিদের ফাই ফরমাশ পালন করে থাকেন। এটা তাঁদের এক ধরনের প্রশিক্ষণ। এর মাধ্যমে তাঁরা নম্বর অর্জন করেন। এই নম্বরের উপর তাঁদের পদোন্নতি নির্ভর করে।

সরাসরি সুমো খেলা দেখার সৌভাগ্য খুব কম জাপানির

জাপানের একটি সুমো প্রতিযোগিতা

ভাগ্যেই জুটেছে। কারণ সুমো খেলার আয়োজন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। তার উপর টিকিটের উচ্চমূল্য সাধারণ ক্রেতার ধরাছোঁয়ার বাইরে। অবশ্য তারা টেলিভিশনে (দ্র) সুমো খেলা দেখার সুযোগ পায়।

টি. কি.

সুয়েজ খাল (Suez canal)

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। এই জলপথ এশিয়া (দ্র), ইউরোপ (দ্র) ও আফ্রিকা (দ্র) তিন মহাদেশ ছুঁয়ে আছে। এর দৈর্ঘ্য ১৭২·২০ কিমি বা ১০৭ মাইল, প্রস্থ ৬০ মিটার বা ১৯৭ ফুট এবং গভীরতা ১৩ মিটার বা ৪২·৫ ফুট। এতে পানি ঢোকার বা বের হওয়ার জন্য কোনো কপাট-কল (locks) নেই। এটি মিশরের পোর্ট সাঈদ থেকে পোর্ট তওফিক পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রস্তরের সমান করে কাটা এই কৃত্রিম জলপথ ভূমধ্যসাগর (দ্র)-কে লোহিত সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এতে আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এই খালের পশ্চিম তীরে মিশর এবং পূর্ব তীরে মিশরের সিনাই উপদ্বীপ।

খ্রিস্টপূর্ব ২০শ বা ১৯শ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে একটি

www.pathagar.com

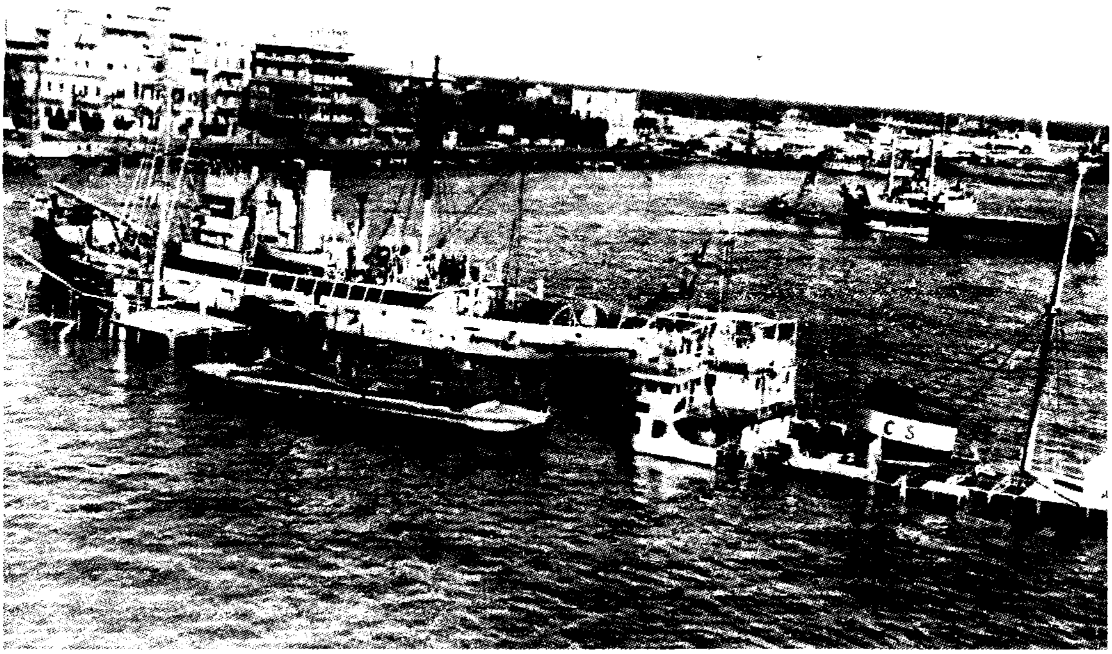

সুয়েজ খাল নিয়ে মিশর ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধের (১৯৫৬) সময় খালের মাঝ বরাবর জাহাজ রেখে চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়

খাল তিম্‌সা হ্রদ পর্যন্ত কাটা হয়েছিল। তখন এই হ্রদ ছিল লোহিত সাগরের উত্তরাংশ। লোহিত সাগর ক্রমে দূরে সরে গেলে ১ম যার্ক্সিজ্ (Xerxes I) কর্তৃক এটি সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু ৮ম শতাব্দীতে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৫৪ সালে আবার নতুন করে সুয়েজ খাল খননের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই অঞ্চলে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি ও স্বার্থ বেশি ছিল বলে খননপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ফ্রান্সেরই প্রাধান্য ছিল। এর জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশনও গঠিত হয় এবং খননকার্যের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনাঁ দ্য ল্যস্যপ্ (Ferdinand de Lesseps)-এর ওপর। ১৮৫৯ সালে খননকার্য শুরু হয় এবং ১৮৬৯ সালে শেষ হয়। ১৮৭৫ সালের পর ব্রিটিশ সরকারও সুয়েজ খালের অন্যতম নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রভূত সামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্য মিশরের স্বাধীনতার পরও এতে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন থাকত। ১৯৫৬ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের (দ্র) হঠাৎ সুয়েজ খালকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেন। তখন ইসরায়েল রাষ্ট্র এই অঞ্চল আক্রমণ করলে ফরাসি ও ইংরেজ সৈন্যদল সুয়েজ অবরোধ করে রাখে। অবশেষে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় দখলদারগণ সরে পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধে নিমজ্জিত জাহাজগুলো অপসৃত না হওয়ার দরুণ সুয়েজ খাল প্রায় ৮ বছর অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে থাকে। ১৯৭৫ সালে সুয়েজ খাল জাহাজ চলাচলের জন্য আবার খোলা হয়।

সুয়েজ খাল খননের ফলে ইউরোপের সঙ্গে দূর প্রাচ্যের দূরত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। এটি খননের আগে ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরের সব জাহাজকে পূর্ব-আফ্রিকায় বা এশিয়ায় যেতে হলে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে বহু পথ ঘুরে যেতে হত। যেমন আগে আফ্রিকা উপকূল হয়ে বোম্বাই থেকে লণ্ডনের আনুমানিক দূরত্ব ছিল ২০,০০০ কিমি, (১২,৪০০ মাইল), সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে এর দূরত্ব ৪২% শতাংশ কমে হয়েছে ১১,৭০০ কিমি. (৭২৭০ মাইল)।

সুজ.ব.

www.pathagar.com

সুর

আমরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের শব্দ (দ্র) শুনে থাকি। কিছু শব্দ আমাদের শুনতে ভাল লাগে বা শ্রুতিমধুর—যেমন কণ্ঠযন্ত্রের শব্দ, টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার শব্দ ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো শব্দ আমাদের কাছে বিরক্তিকর ঠেকে—যেমন যানবাহনের শব্দ, হাটবাজারের শব্দ, গোলাগুলির শব্দ ইত্যাদি। এই সুরযুক্ত ও সুরবর্জিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (দ্র) কারো কাছে শ্রুতিমধুর আবার কারো নিকট কর্কশ অনুভূতির সৃষ্টি করে। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাটের শব্দ পীড়াদায়ক হলেও, দূর থেকে হাটের শব্দ শুনতে তেমন বিরক্তিকর মনে হয় না।

শব্দের উৎসের কম্পন যদি নিয়মিত, পর্যায়ক্রমিক ও নিরবচ্ছিন্ন হয় তবে সে শব্দ শ্রুতিমধুর বলে মনে হয়। অপর দিকে উৎসের কম্পন যদি অনিয়মিত, অপর্যায়ক্রমিক ও আকস্মিক হয়, তবে সে শব্দ শ্রুতিকটু বলে মনে হবে। শব্দ সৃষ্টিকারী উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দে যদি একটি মাত্র কম্পাঙ্ক (দ্র) থাকে, তাহলে সেই শব্দকে সুর বলে। সুরে একটি মাত্র কম্পাঙ্ক বিদ্যমান। কিন্তু কতকগুলো বিভিন্ন কম্পাঙ্কের সুরের সমষ্টি হল স্বর। কোনো স্বরের সুরগুলোর মধ্যে যার কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম তাকে মূল সুর বলে। অন্যান্য কম্পাঙ্কের সুরগুলোকে উপসুর বলে। উপসুরগুলোর কম্পাঙ্ক মূল সুরের সরল গুণিতক হলে সেই সব উপসুরকে হার্মনিক (harmonic) বলে।

সুরযুক্ত বা সুশ্রাব্য শব্দের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে—যেমন তীব্রতা বা প্রাবল্য, তীক্ষ্ণতা এবং গুণ বা জাতি। তীব্রতা নির্ভর করে শব্দের উৎসের আকার ও কম্পনের বিস্তার, মাধ্যমের ঘনত্ব ও গতি, উৎস থেকে শ্রোতার দূরত্ব এবং অনুনাদী বস্তুর উপস্থিতির উপর। সুরযুক্ত শব্দের খাদের সুরের তীক্ষ্ণতা কম এবং চড়া সুরের তীক্ষ্ণতা বেশি। অন্য দিকে সেতার (দ্র), গিটার (দ্র), বাঁশি (দ্র) প্রভৃতি কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রকে একসঙ্গে বাজানো হলে এবং নিঃসৃত সুরগুলোর প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা এক হলেও কোন্ সুরটি কোন্ বাদ্যযন্ত্রের তা আমরা বলতে পারি। কেননা প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্রের সুরের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে আমরা গুণ বা জাতি বলে থাকি।

মু. এ.

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি [১৮৭০–১৯২১]

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (দ্র) দৌহিত্র ছিলেন। পিতার নাম গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি। সুরেশচন্দ্রের জন্ম কলিকাতায় (দ্র) হলেও আদি পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়া জেলায়। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ ঘটলে মাতামহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছেই বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়।

সাহিত্যচর্চার শুরু কৈশোরকাল থেকেই। পরে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে 'সাহিত্য' নামে মাসিকপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং তৎকালীন প্রায় সব বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের রচনা তাতে ছাপা হতে থাকে। এভাবে দেশের বিদ্বজ্জন মহলে তাঁর প্রভাবপতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ক্রমে ক্রমে রক্ষণশীল একটি বিশেষ সাহিত্যগোষ্ঠীর চালিকাশক্তি রূপে দেখা দেন। তাঁর সমকালে তাঁর সামাজিক প্রভাব প্রনিধানযোগ্য ছিল।

পত্রিকা সম্পাদনা ও সাহিত্যিক সৃষ্টির বাইরে তিনি কিছু গ্রন্থও রচনা করেছিলেন, যেমন—'কল্কিপুরাণ', 'সাজি', 'রণভেরী', 'ইউরোপের মহাসমর' ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ' এখনো বিশিষ্ট সমালোচনাগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

হা. মা.

সুরেশ্বরী, মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ আহমদ আলী

'সুরেশ্বরী' বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ আলী (রা.)-এর আলঙ্কারিক নাম বা উপাধি। তিনি সুর ভালবাসতেন এবং সুরের মাধ্যমেই পরম প্রভুকে পাওয়ার আরাধনা করতেন বলে ভক্তগণ তাঁর উপাধি দিয়েছিলেন সুরেশ্বরী। শরীয়তপুর জেলার সুরেশ্বর গ্রামে

www.pathagar.com

তাঁর আস্তানা ছিল এবং সেখানেই তাঁর মাজার আছে। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ শরীফ। মাতার নাম হাফেজা সৈয়দা নূরজাহান খাতুনে জান্নাত। বাংলা ১২৬৩ সনের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে সুরেশ্বর গ্রামে তাঁর জন্ম। এখানেই বাংলা ১৩২৬ সনের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শাহ্ আহমদ আলী সুরেশ্বরীর বাল্যশিক্ষা সম্পন্ন হয় পিতা-মাতার কাছেই। উল্লেখ্য, তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। এরপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বিখ্যাত দরবেশ আল্লামা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফতেহ্ আলী ওয়াইসি (রা.)-এর শিষ্যত্বগ্রহণ করে কঠোর সাধনাবলে সিদ্ধিলাভ করেন। অতঃপর স্বীয় পীর কেবলা তাঁকে পীরের মর্যাদায় ভূষিত করেন। তিনি বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও মানুষকে দীক্ষা দেওয়ার কাজে ব্রতী হন। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তিনিই প্রথম উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্‌র যিকির এবং সাধনার অঙ্গ হিসাবে আধ্যাত্মিক গান-বাজনার প্রবর্তন করেন বলে তাঁর ভক্তরা দাবি করে থাকেন। এ ছাড়া তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পীরের শিষ্যত্বগ্রহণ, পীর-দরবেশদের মাজারের ওপর সৌধ নির্মাণ, মাজারে চাদর, ফুল ও গোলাপজল দেওয়া, ওরস শরীফের আয়োজনসহ আরো কিছু আনুষ্ঠানিকতার প্রবর্তক ছিলেন বলে জানা যায়।

তিনি দায়রা শরীফ, মসজিদ-মাদ্রাসা, লাইব্রেরি, মুসাফিরখানা, লঙ্গরখানা, এতিমখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এগুলোর ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজের সকল সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ্ (দ্র) করে দেন।

বাংলা (দ্র), আরবি (দ্র), ফার্সি ও উর্দু ভাষায় (দ্র) তিনি বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এগুলোর মধ্যে সির্‌রে হক জামে নূর (আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায়), নূরে হক গঞ্জে নূর (বাংলা ভাষায়, অমিত্রাক্ষর ছন্দে), লতায়েফে শাফিয়া (উর্দু), ছফিনায়ে ছফর, কৌলুল কেরাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শরীয়ত-মারেফাত, হাদিস-কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক জগতের নিগূঢ় রহস্য, গান-বাজনা, ওলী-আউলিয়া প্রসঙ্গ, মাজার শরীফের তত্ত্বাবধান, পীর-দরবেশদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

অন্যান্য পীর-দরবেশদের মতো সৈয়দ আহমদ আলী সুরেশ্বরী (রা.)-র জীবনকে ঘিরে বহু অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে।

প্রতি বছর এই মহান সাধকের জন্ম ও মৃত্যুদিবস ২রা অগ্রহায়ণ তারিখ থেকে সপ্তাহব্যাপী ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয় সুরেশ্বর দরবার শরীফে।

মু. মা.

সুররিয়ালিজম্ স্যুররিয়ালিজ্‌ম্ দ্র
সুর্মা অ্যান্টিমনি দ্র
সুলতান, এস.এম. এস. এম. সুলতান দ্র

সুলতান মাহমুদ [? —১০৩০]

গজনীর (আফগানিস্তানে) সুলতান সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মাহমুদ নিজ ভাই ইসমাইলকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করে ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১০০০ সাল থেকে ১০২৭ সালের মধ্যে সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। প্রতিবার প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন ও বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। এই সব অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুজরাটে অবস্থিত সোমনাথের শিবমন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন (জানুয়ারি, ১০২৬ সাল)। মন্দিরের বহু ধনরত্ন তাঁর হস্তগত হয়।

সুলতান মাহমুদ এত বার ভারত আক্রমণ করলেও একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোনো অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

সুলতান মাহমুদ এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। বাগদাদের খলিফা তাঁকে 'ইয়ামিনুদ্দৌলা আমিনুল মিল্লাত' খেতাবে ভূষিত করেন।

সুলতান মাহমুদ শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী ও গণিতশাস্ত্রবিদ আলবেরুনী (দ্র), মহাকবি ফেরদৌসী (দ্র) প্রমুখ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

১০৩০ সালে ষাট বছর বয়সে সুলতান মাহমুদ

www.pathagar.com

গজনীতে প্রাণত্যাগ করেন।

খু. জা.

সুলতানা রাজিয়া [শা. ১২৩৬—১২৪০]

সুলতান ইলতুৎমিস (দ্র) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর যোগ্য কন্যা রাজিয়াকে দিল্লির(দ্র) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু তাঁর আমীর-ওমরাহগণ এই মনোনয়নকে অস্বীকার করে ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠপুত্র রোকনউদ্দীনকে সিংহাসনে বসান।

রোকনউদ্দীন শীঘ্রই অযোগ্য প্রমাণিত হওয়ায় রাজিয়া তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীসহ কয়েক জন প্রাদেশিক শাসনকর্তা নারীর কর্তৃত্ব স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা রাজিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

রাজিয়া সাহস ও বুদ্ধিমত্তার বলে শত্রুদের দমন করে রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বঙ্গ ও উচ্-এর শাসনকর্তাগণ স্বেচ্ছায় রাজিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু বিদ্রোহদমন সত্ত্বেও রাজ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা যায় নি।

রাজিয়া গোঁড়া মুসলমানদের মতামত অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্যে পুরুষের পোশাক পরে সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর আচার-আচরণ রাজদরবারের পুরুষদের সহ্য হয় নি। ১২৪০ সালে প্রাসাদষড়যন্ত্রের শিকার রাজিয়া আততায়ীর হাতে নিহত হন।

রাজিয়াই সর্বপ্রথম নারী যিনি দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করে তিনি নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুলতানা রাজিয়া বিদূষী, বুদ্ধিমতী এবং অস্ত্রচালনায় পারদর্শী ছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিজেই সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছেন।

খু. জা.

সুলাইমান (আ.), হযরত

হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র সুলাইমান (আ.) ছিলেন বনী ইসরাইলিদের বাদশাহ্ ও নবী। 'সুলাইমান' নামের অর্থ শান্তিপ্রিয়। বাইবেলে তাঁর নাম 'সলোমন' (Solomon)।

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সমকালে যে চার জন শাসক বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, প্রতিভা ও শাসনদক্ষতায় বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর পিতা দাউদ (আ.)-ও একাধারে বাদশাহ্ এবং নবী ছিলেন।

সুলাইমান (আ.) আনুমানিক ৯৭২—৯৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনপরিচালনা, বিচারক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং নানা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ কাহিনী আছে। পবিত্র কুরআন শরীফের (দ্র) বহু স্থানে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

জেরুজালেমের (দ্র) বিখ্যাত আল-আক্সা মসজিদ (দ্র) নির্মাণ তাঁর অমর কীর্তি। তিনি আরবি ও প্রাচীন মিশরীয় বর্ণমালার আবিষ্কারক বলেও জানা যায়।

হযরত সুলাইমান (আ.) ৯৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

সুলিভান, অ্যান ম্যান্সফিল্ড কেলার, হেলেন দ্র

সুশ্রুত

তিনি পঞ্চম শতাব্দীর এক জন ভারতীয় চিকিৎসক। তাঁকে মহাভারতে (দ্র) বিশ্বমিত্রপুত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় নবম–দশম শতকের মধ্যে তাঁর চিকিৎসাখ্যাতি পশ্চিমে আরব ও পূর্বে কম্বোজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি 'সুশ্রুত সংহিতা' নামক আয়ুর্বেদ বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা প্রায় ৯০০ খ্রিস্টাব্দে আরবি ভাষায় (দ্র) অনূদিত হয়েছিল।

মোট ছয় খণ্ডে বিভক্ত 'সুশ্রুত সংহিতা' গ্রন্থে ভেষজসমূহের শ্রেণী বিভাগ, রোগের কারণ ও লক্ষণ, অঙ্গসংস্থান-বিদ্যা, শল্যবিদ্যা (দ্র), ভ্রূণতত্ত্ব, বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি, বিষতত্ত্ব ও বিষের প্রতিকার প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সি. না. হ.

www.pathagar.com

সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord)

এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের (দ্র) একটি অংশ। সুষুম্নাকাণ্ড (দ্র) মস্তিষ্কের মেডুলা নামক অংশ থেকে শুরু হয়ে মেরুদণ্ডের (দ্র) কশেরুকা স্তম্ভের (vertebral column) ভেতর দিয়ে ১ম কটিদেশীয় কশেরুকার (1st lumbar vertebra) নিম্নভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে শারীরিক বর্ধনের প্রাথমিক পর্যায়ে সুষুম্নাকাণ্ড মেরুদণ্ডের নিম্নভাগস্থ স্যাক্রাম (sacrum) নামক অংশের নিম্ন প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত থাকে।

সুষুম্নাকাণ্ডের বহিরাংশ ধূসর পদার্থ (gray matter) এবং অন্তরাংশ শ্বেত পদার্থ (white matter) দ্বারা গঠিত। ধূসর পদার্থে স্নায়ুকোষ এবং শ্বেত পদার্থে স্নায়ুসূত্রের গুচ্ছ রয়েছে। এরা স্নায়বিক উদ্দীপনা বহন করে। সুষুম্নাকাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া সুষুম্নাস্নায়ু বের হয়। সুষুম্নাস্নায়ুসমূহ সাধারণত ত্বক (দ্র), দেহ, পেশি (দ্র), হাত, পা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত। সুষুম্নাস্নায়ু মস্তিষ্কের ১২ জোড়া 'করোটি স্নায়ু'র (cranial nerves) সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠন করেছে।

সুষুম্নাকাণ্ডের দৈর্ঘ্য পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রায় ৪৩ সেন্টিমিটার। সুষুম্নাকাণ্ডের ওজন প্রায় ৩৫ গ্রাম হয়ে থাকে। সুষুম্নাকাণ্ড বাইরে থেকে ভেতরের দিকে যথাক্রমে 'ডুরা ম্যাটার' (dura matter), 'এরাক্নয়েড ম্যাটার' (arachnoid matter) ও 'পায়া ম্যাটার' (pia matter) নামক সূক্ষ্মঝিল্লি (meninges) দ্বারা আবৃত। এরাক্নয়েড ম্যাটার ও পায়া ম্যাটারের মধ্যবর্তী স্থান 'সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড' (cerebrospinal fluid) নামক তরল পদার্থে পূর্ণ, যা সুষুম্নাকাণ্ডকে ঘিরে রাখে।

সুষুম্নাকাণ্ড নানা কারণে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। তার মধ্যে পক্ষাঘাত (দ্র), মেনিঞ্জাইটিস (দ্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সি. না. হ.

সূরা

আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ : অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, খণ্ড, শ্রেষ্ঠত্ব, চিহ্ন, সুরম্য উচ্চ প্রাসাদ। ইসলামী পরিভাষায় প্রধানত কুরআন শরীফের (দ্র) এক-একটি অধ্যায়কেই 'সূরা' নামে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে ভাব ও বিষয়ভিত্তিক ১১৪টি সূরা বা অধ্যায় আছে। এদের মধ্যে প্রথম সূরার নাম সূরা ফাতিহা এবং সর্বশেষ সূরার নাম সূরা নাস।

মু. মা.

সূর্য

সৌরজগতের (দ্র) কেন্দ্রীয় বস্তুপিণ্ড সূর্য একটি মাঝারি ধরনের নক্ষত্র (দ্র)। পৃথিবী (দ্র) প্রত্যক্ষভাবে সৌর প্রভাবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং সূর্যনির্ভর বলে আমাদের কাছে সূর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিমি। সূর্য আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়। এর ব্যাস প্রায় ১৪ লক্ষ কিমি। সূর্যের ওজন পৃথিবীর ওজনের ৩·৩ লক্ষ গুণ বেশি। সূর্য প্রায় এক মাসে নিজ অক্ষের (দ্র) উপর এক বার আবর্তন করে এবং বৃহৎ বৃত্তাকার পথে প্রায় ২২ কোটি বছরের ব্যবধানে এক বার আপন গ্যালাক্সির (দ্র) চতুর্দিকে পরিক্রমণ করে। সূর্য থেকে আলো সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিমি গতিতে পৃথিবীতে আসতে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ড সময় নেয়। সূর্য ও পৃথিবীর বয়স প্রায় একই, অর্থাৎ প্রায় ৫০০ কোটি বছর।

সূর্য প্রচণ্ড রকম উত্তপ্ত নক্ষত্র। এর কেন্দ্রভাগের উত্তাপ ১,৫০,০০,০০০° সেলসিয়াস এবং পৃষ্ঠভাগের তাপ আনুমানিক ৬,০০০° সে.। সূর্যের মধ্যে জ্বলন্ত বাষ্পকণাসমূহ প্রবল গতিতে ছুটোছুটি করে আগুনের ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে। ফলে সূর্যপৃষ্ঠের কোনো কোনো স্থানে তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে। যেসব স্থানের তাপমাত্রা এর পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে কম, পৃথিবী থেকে সে স্থানগুলোকে কালো দেখায়। এই কালো দাগগুলো সৌরকলঙ্ক নামে পরিচিত। গালিলেও (দ্র) প্রথম এই কালো দাগগুলো দূরবীনের (দ্র) সাহায্যে আবিষ্কার করেন।

পৃথিবীর শক্তির মূল উৎসই সূর্য। সূর্য প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তির আধার এবং এই শক্তি প্রায় অফুরন্ত। এই সূর্যের অতি সামান্য পরিমাণ শক্তি এসে পৃথিবীতে পৌঁছায়। জ্বলন্ত সূর্য যে প্রচণ্ড তাপ বিকিরণ করে তার ২০০ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এই তাপের ফলেই ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষ প্রাণধারণ করে।

সূর্য কোনো কঠিন বা তরল বস্তু নয়। বায়বীয় পদার্থই এর মৌলিকত্ব। বেশির ভাগই হাইড্রোজেন (দ্র), কিছুটা

www.pathagar.com

হিলিয়াম (দ্র) এবং ১% অন্যান্য প্রায় ৭০ রকম গ্যাসের সমন্বয়ে সূর্য গঠিত। পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সূর্যে অনবরত হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম এবং হিলিয়াম থেকে শক্তি তৈরি হচ্ছে। সূর্যে মূল গ্যাসসমূহের যে পরিমাণ রয়েছে এ প্রক্রিয়ায় তা নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। প্রতিদিন সূর্যে যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয় তার জন্য মোট ৪$\frac{১}{২}$ লক্ষ টন গ্যাস প্রয়োজন।

মু. এ.

সূর্য সেন, মাস্টারদা [১৮৯৩-১৯৩৪]

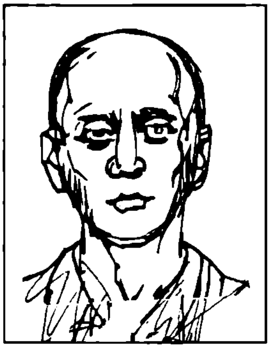

শহীদ (দ্র) বিপ্লবী, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের মহান সৈনিক এবং চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের (ইংরেজেরা যাকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারলুণ্ঠন নামে অভিহিত করত) নায়ক। ১৮৯৩ সালের ১৮ই অক্টোবর চট্টগ্রাম (দ্র) জেলার রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এবং মাতা যথাক্রমে রাজমণি সেন ও শশীবালা।

সূর্য সেন চট্টগ্রাম ও বহরমপুর কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯১৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বি.এ. পাশ করেন। বহরমপুর কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক সতীশ চক্রবর্তীর মাধ্যমে তিনি গোপন বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ভারতের মুক্তির জন্য বিপ্লবী সংগ্রামে যোগদানের প্রেরণা লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন শেষে সূর্য সেন চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ানবাজার এলাকার উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। লাজুক-নম্র স্বভাব ও দৃঢ় চরিত্রের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। সাধারণভাবে তিনি 'মাস্টারদা' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি সূর্য সেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী কর্মী অনুরূপ সেন, চারুবিকাশ দত্ত, অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখের সঙ্গে গোপন বিপ্লবী দল গঠনের কাজ শুরু করেন। দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে তিনি কিছুদিনের

গোপন আস্তানায় ইংরেজ পুলিশের অতর্কিত আক্রমণ থেকে প্রীতিলতা ও অন্য সহযোগীসহ মাস্টারদা কৌশলে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন

মধ্যেই দলের নেতা হিসাবে স্বীকৃত হন।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) অসহযোগ আন্দোলনের (দ্র) প্রতি সমর্থন জানিয়ে সূর্য সেন যুবকদের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিছুদিন পর গান্ধীজী অহিংস আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে সূর্য সেন অস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের অর্থসংগ্রহের নির্দেশ দেন। ১৯২৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর দুপুরে তাঁরই নির্দেশে অনন্ত সিংহ, দেবেন দে ও নির্মল সেন চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়তলীতে অবস্থিত 'আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে' কোম্পানির কারখানার কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সতেরো হাজার টাকা ছিনতাই করেন।

এর কিছু দিন পর পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সূর্য সেনের আস্তানায় হানা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ

www.pathagar.com

হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'নগরখানা পাহাড় খণ্ডযুদ্ধ' নামে পরিচিত। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শারীরিক সামর্থ্য হারিয়ে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী বিষপানে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। কিন্তু বিষক্রিয়া তীব্র না হওয়ায় তাঁরা বেঁচে যান এবং গ্রেফতার হন। তবে বিচারে তাঁদের কোনো অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁরা মুক্তি পান।

কিন্তু এদিকে সরকার বাংলার চরমপন্থী যুবনেতাদের বন্দি করার জন্য এক অর্ডিন্যান্স জারি করে। সূর্য সেন তখন কলিকাতায় (দ্র) চলে যান। সেখানে ১৯২৬ সালে টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার দায়ে গ্রেফতার হয়ে কারাভোগের পর ১৯২৮ সালে বোম্বাইয়ের রত্নগিরি জেল থেকে মুক্তি পান।

১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ বছরই তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে চারটি বড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে জেলা যুব সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (দ্র)।

১৯৩০ সালের শুরুতে সূর্য সেন চট্টগ্রামে একটি সুসংগঠিত বিপ্লব সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেন। এ বছর ১৮ই এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে মোট ৬০ জন বিপ্লবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পাহাড়তলীর ফৌজী অস্ত্রাগার, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ভবন এবং পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করে নেয়, এবং চট্টগ্রামকে স্বাধীন ঘোষণা করা হয়। এই সঙ্গে চট্টগ্রামে সামরিক বিপ্লবী সরকারও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সশস্ত্র বিদ্রোহের চার দিন পর অর্থাৎ ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সূর্য সেন আর লোকনাথ বলের চাতুর্যপূর্ণ আক্রমণে ইংরেজ বাহিনী অসহায় হয়ে কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচে। এই যুদ্ধের পর ইংরেজদের সঙ্গে বিপ্লবীদের আরো কয়েক বার যুদ্ধ হয়। তখন সূর্য সেন আত্মগোপন করে বিপ্লবী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে গ্রেফতারের জন্য সরকার অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি সূর্য সেন তাঁর এক নিকট-আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় চট্টগ্রামের পটিয়ার গৈরলা গ্রামের ক্ষীরোদাপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে অবস্থানকালে ধরা পড়েন। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সুজ. ব.

সূর্যগ্রহণ গ্রহণ দ্র

সূর্যমুখী

কম্পোজিটি (Compositae) পরিবারভুক্ত বর্ষজীবী খরাসহিষ্ণু ফসল। ইংরেজিতে একে সানফ্লাওয়ার (Sunflower) বলা হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *হেলিয়ান্থাস্ অ্যান্নাস্*, লিন্ (*Helianthus annus*, Linn)। সূর্যমুখী ফুল বেশ আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। বছরের যে কোনো সময় সূর্যমুখীর চাষ করা যায়। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সূর্যমুখী চাষের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বারি (দ্র) কিরণী নামে একটি জাত সুপারিশ করেছে। এ ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে হেলিয়ান্থাস্ রিজিডাস্, হেলিয়ান্থাস্ আর্গোফাইলাস্ ও হেলিয়ান্থাস্ অ্যান্নাস্-ই উল্লেখযোগ্য।

সূর্যমুখী সাধারণত সারিবদ্ধভাবে বোনা হয়। প্রতি সারির দূরত্ব ৪৫ সেমি এবং এক গাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব ৩০ সেমি. হলে বিঘাপ্রতি দুই কেজি বীজের দরকার। সূর্যমুখী বীজ পাকতে তিন মাস থেকে সাড়ে তিন মাস সময় লাগে।

সূর্যমুখী পরিচর্যার মধ্যে আগাছা দমন, পানি সরবরাহ বা সেচ এবং পোকা দমন অন্তর্ভুক্ত। গাছ বড় হলে এবং ফুলে দানা এলে তা ভারি হয়ে যায়। তাই গাছকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার দরকার হয়।

www.pathagar.com

চীনাবাদামের মতো সূর্যমুখীর বীজ ভেজে খাওয়া যায়। সূর্যমুখীর বীজে শতকরা ৪০–৪৫ ভাগ তেল থাকে। রান্নার কাজে এ তেল ব্যবহার করা হয়। শারীরিক পুষ্টির জন্য সূর্যমুখী তেল সরিষার তেলের চেয়েও উন্নত। সূর্যমুখীর খৈল গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগির উত্তম খাবার।

মু. আ.

সূর্যসেনা শিশুসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র
সূর্যাস্ত আইন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্র
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

সেগুন

পৃথিবীর সবচেয়ে দামি এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *টেকটোনা গ্রাণ্ডিস (Tectona grandis* Linn.f.) গোত্র ভার্বেনেসি (Verbenaceae)। আদি বাসস্থান মায়ান্মার (দ্র), বাংলাদেশ, ভারত ও মালয় উপদ্বীপ। চট্টগ্রাম (দ্র) ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এই গাছ অযত্নে বেড়ে ওঠে। দীর্ঘজীবী বড় গাছ, ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে মহীরুহে পরিণত হয়। পাতা খুব বড়, এরকম বড় পাতার গাছ কম আছে। বসন্তের শুরুতে পাতা ঝরে যায় ও পরে নতুন পাতা গজায়। পাতা লম্বায় ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। আকার ডিমের মতো, আগা ক্রমশ সরু, উপরের দিক খসখসে ও নিচের দিক ঈষৎ পীতাভ রঙের এবং সূক্ষ্ম রোমশ। পুষ্পদণ্ড প্রায় ১–৩ ফুট লম্বা হয়, শাখা সূক্ষ্ম রোমশ, মসৃণ। ফুল ছোট ও সাদা এবং উভলিঙ্গবিশিষ্ট। একটি পুষ্পদণ্ড শাখা-প্রশাখায় অজস্র ফুল হয় ঝাড়বাতির মতো। ফল দেখতে ৪ অংশে বিভক্ত, ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চির মতো। বাইরের আবরণ নরম লোমাবৃত। গ্রীষ্মে ফুল হয় ও বর্ষা পর্যন্ত থাকে। এ সময় নতুন পাতাসহ ফুলে-ফুলে জমকালো দেখায়।

মায়ানমার উঁচু দরের সেগুনের জন্য বিখ্যাত। জাহাজ তৈরি, রেলের কামরা ও ওয়াগন নির্মাণ, খোদাই কাজ, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার কাজ, আসবাবপত্র, দারুশিল্পের সূক্ষ্মকাজ, ঘরের খুঁটি ও তক্তা, দরজার পাল্লায় সেগুন অতুলনীয়। কাঠের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে এক রকম তেল এর সুগন্ধি ও স্থায়িত্বের কারণ। মায়ানমার, চীন (দ্র), জাপান (দ্র), কোরিয়া ও কক্সবাজারে (দ্র) এই কাঠের প্রাচীন রাজবাড়ি ও বৌদ্ধ বিহার (দ্র) আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই কাঠ অবিকৃত থাকে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় তাপমাত্রার তারতম্যে ও বৃষ্টিতে ভিজলেও এর পরিবর্তন হয় খুব সামান্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেগুনবন আছে।

সেগুন বাগান

বি. ব.

www.pathagar.com

সেচ (irrigation)

মাটি শুকনো হলে তাতে ফসল ফলে না। মাটি ভেজানোর জন্য পানি দরকার হয়। সেচ হল ফসল ফলানোর জন্য শুষ্ক জমিতে পানি সরবরাহ করার পদ্ধতি। পৃথিবীর শুকনো অঞ্চলের কৃষকদের জন্য সেচ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেচকাজের জন্য প্রায়ই নদী (দ্র), ঝর্না বা কুয়ো থেকে পানি উপরে তোলার দরকার হয়। সেচের জন্য সেই আদিকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি, যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে। হাজার হাজার বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে শ্যাডাফ (shaduf) নামের একটি যন্ত্র। এটি ভারত (দ্র), মিশর ও পূর্বের কোনো কোনো দেশে পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর্কিমিডিসীয় স্ক্রু (Archimedean screw) মিশরে প্রথমদিকে তৈরি একটি সেচযন্ত্র, যা এখনো কোনো কোনো অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। পানিসেচের আরেকটি পুরাতন যন্ত্র হচ্ছে ওয়াটার হুইল (water wheel) বা পানি চাকা, এটি কোথাও কোথাও এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লিখিত যন্ত্রগুলোর কোনটিই তাড়াতাড়ি পানি ওঠাতে পারে না। বর্তমানে এসব যন্ত্রের পরিবর্তে মোটর পাম্প (motor pump) ব্যবহার করা হয়। সেচের ফলে যাতে অতিরিক্ত পানি জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। জমিতে নালা কেটে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায়। জমিতে সঠিক পরিমাণ পানি সেচের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে স্প্রিঙ্কলার (sprinkler) —পানি ছিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা, অথবা ড্রিপ (drip) পদ্ধতি অর্থাৎ পানি ফোঁটা ফোঁটা করে প্রয়োজনীয় জায়গায় দেওয়ার ব্যবস্থা।

হো. আ.

সেজান্, পল্ [১৮৩৯—১৯০৬]

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি চিত্রকর। ১৮৩৯ সালের ১৯শে জানুয়ারি সেজান্ (Paul Cézanne) ফ্রান্সের অ্যাজঁ প্রভঁস্ (Aix-en Provence)-এ জন্মগ্রহণ করেন।

সেজানের শিল্পীজীবন ইউরোপীয় চিত্রকলার পাঁচ শ' বছরেরও অধিক প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধারণ করে গড়ে উঠেছে। তাঁর অঙ্কনশৈলীর ক্ষেত্রে ধ্রুপদরীতি, রোম্যান্টিসিজ্‌ম্ ও ন্যাচারালিজ্‌ম্ বা বাস্তববাদী রীতি ইত্যাদি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

পল সেজান নিজেই এঁকেছেন নিজের ছবি

পল্ সেজান্ ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জন্মশহর অ্যাজঁ প্রভঁসের স্কুল ও বুর্বঁ কলেজে প্রথাবদ্ধ শিক্ষা লাভ করেন। স্কুলজীবনেই তাঁর সঙ্গে ভবিষ্যতের বিখ্যাত বাস্তববাদী ফরাসি কথাসাহিত্যিক এমিল্ জোলার (দ্র) বন্ধুত্ব হয়, এই বন্ধুত্ব দীর্ঘদিন অটুট ছিল।

১৮৫৬ সালে পিতার আদেশে আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করলেও রাতের বেলা তিনি একাডেমী অব আর্ট-এ শিল্পকলার ক্লাসে নিয়মিত যোগ দিতে থাকেন। ১৮৬১ সালে তিনি প্যারিসে (দ্র) আসেন। এখানেই তিনি খুঁজে পান তাঁর প্রকৃত শিক্ষকদের। লুভর্ (দ্র) মিউজিয়ামে সংরক্ষিত তিশিয়ান, ভেরোনেসে, তিন্‌তোরেত্তো, রুবেন্স ও পুজ্যাঁর শিল্পকর্ম তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ১৮৬২ সালে চিত্রকর হবেন বলে পল্ সেজান্ সিদ্ধান্ত নেন। এই সময়ে বিখ্যাত চিত্রকর কামিল্লো পিসারোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলে তিনি তাঁকে ছবি আঁকার ব্যাপারে নতুন করে প্রেরণা যোগান। এরপর বিখ্যাত চিত্রকর এদুয়ার্ মানে-র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলে সেজান্ তরুণ প্রজন্মের চিত্রকরদের দলভুক্ত হবার সুযোগ লাভ করেন এবং স্বাধীনভাবে ছবি

www.pathagar.com

স্টিল লাইফ: শিল্পী পল সেজান

আঁকার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হন।

সেজানের কর্মময় জীবন তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা : রোম্যান্টিক পর্ব (১৮৬৪–১৮৭২), ইম্প্রেশনিস্ট পর্ব (১৮৭২–১৮৮২) এবং অন্তিম পর্ব, যা অব্যাহত ছিল তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।

১৮৯০ সালের দিক থেকে পল্ সেজান্ চিত্রকর হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেন। প্যারিসসহ ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে তাঁর চিত্রকর্মের একাধিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সমকালীন অন্য দুই বিখ্যাত চিত্রকর পল্ গোগ্যাঁ (দ্র) ও ভান্ গখ্ (দ্র)-এর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

'দ্য হাউজ অব দ্য হ্যাঙ্গড় ম্যান', 'দ্য ব্ল্যাক ক্লক', 'দ্য রেলওয়ে আউট', 'দ্য বয় উইথ দ্য রেড ভেস্ট' -সহ আরো অসংখ্য বিভিন্ন রীতি ও প্রকৃতির চিত্র তাঁর শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

১৯০৬ সালের ২২শে অক্টোবর পল্ সেজান্ মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

সেন্ট মার্টিন দ্বীপ

বাংলাদেশের (দ্র) একমাত্র প্রবাল (দ্র) পরিবৃত দ্বীপ। সম্ভবত কক্সবাজারের (দ্র) কোনো ইংরেজ প্রশাসক দ্বীপটির এই নামকরণ করেন। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড বদরমোকাম থেকে দক্ষিণে এর দূরত্ব মাত্র ১২ কিলোমিটার বা ৮ মাইল আর মায়ানমার (দ্র) উপকূল থেকে পশ্চিমে সোজাসুজি এর দূরত্ব মাত্র ১৪ কিলোমিটার বা ৯ মাইল। অর্থাৎ উত্তর ও পূর্বদিকের ভূখণ্ড থেকে দ্বীপটি মাত্র ১২ থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সাগরতলের ভিত শিলার উত্থানের উপর দ্বীপটির ভিত্তি গড়ে উঠেছে। দ্বীপের ৯ কিলোমিটার পশ্চিমে সাগরে ডোবা একটি প্রবাল প্রাচীর আছে। প্রাচীরটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এটি মালয়েশিয়া উপকূলের প্রবাল প্রাচীরের অংশ বলে ধারণা করা হয়।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এর আয়তন ৩ বর্গকিলোমিটার। ছোট ছোট চারটি দ্বীপের সমন্বয়ে এই দ্বীপ গঠিত। দ্বীপগুলো হল— জিঞ্জিরা, গলাচিরা, দক্ষিণ পাড়া ও চেরাদিয়া। দ্বীপে কড়ি, ঝিনুক (দ্র), শামুকের খোল ছাড়াও বেলাভূমিতে বিচিত্র ধরন ও রঙের প্রবালখণ্ড পাওয়া যায়। সেন্ট মার্টিন দ্বীপটি ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। শীত ও গ্রীষ্মকালে এখানে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর (দ্র) প্রভাবে বর্ষাকালে ১৩০ থেকে ১৪০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।

এই দ্বীপে এখন প্রায় চার হাজারের মতো লোক বাস করে। তাদের জীবিকার প্রধান উপায় কৃষিকাজ ও মাছ ধরা।

সেন্ট মার্টিন—প্রবাল দ্বীপ

www.pathagar.com

এখানে মসজিদ (দ্র), মাদ্রাসা, প্রাইমারি স্কুল, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, থানা-ফাঁড়ি ইত্যাদি আছে। ঘূর্ণিঝড় (দ্র) ও জলোচ্ছ্বাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটি আশ্রয়কেন্দ্রও নির্মিত হয়েছে।

সুজ. ব.

সেতারা শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

সেতু

নদী, নালা, খাল বা কোনো জলাশয়ের ওপর দিয়ে উভয় পাশের স্থলভাগের যোগাযোগ সাধনকারী পথ। আদিম যুগে গাছের গুঁড়ি ফেলে ছোট নালা বা জলাশয়ের ওপর দিয়ে পারাপারের ব্যবস্থা করা হত। তারপর খুঁটি গেড়ে একটু দীর্ঘ সেতু তৈরি হত। খ্রিস্টপূর্ব ২,০০০ থেকে ৪,০০০ বছর পূর্বে পাথরের খিলানযুক্ত সেতু নির্মিত হয়। এই জাতীয় সেতু থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে খিলানযুক্ত রোমদেশীয় সেতু এবং তারপর আধুনিক ইস্পাতনির্মিত সেতু রূপ লাভ করেছে। লোহা (দ্র) ঢালাই করে ইস্পাত (দ্র) তৈরির প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের পর থেকে সেতু নির্মাণশিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এর পর কড়ি (beams) পদ্ধতি ব্যবহার শুরু হওয়ার পর আজকাল বড় বড় ও দীর্ঘ সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। লোহার সঙ্গে সিমেন্টের (দ্র) ঢালাই ব্যবস্থা এখন সেতু নির্মাণের অন্যতম প্রধান কৌশল। এ ছাড়া ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করে নিচ দিয়ে জাহাজ চলাচলে সুবিধাও করা হয়। এরকম সেতুতে প্রয়োজন মতো উপরে-নিচে ওঠানামার লিফ্‌ট ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়াও আরো কয়েক রকম সেতু আছে।

বর্তমানে প্রায় সব সেতু নির্মিত হয় ভেতরে ইস্পাত-শলাকা বা ধাতব জাল ব্যবহার করে কংক্রিটে (দ্র) জমিয়ে। প্রাচীন কালের বিখ্যাত সেতুর মধ্যে রোমের দক্ষিণ এঞ্জেলার সেতু ১৩৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এবং এখনো তা বর্তমান। তারপর ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ভেনিসের রিয়াল্‌তো সেতু। ফ্লোরেন্সের পোন্তে সান্তা সেতু পৃথিবীর একটি সুদৃশ্য সেতু। এটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) সময় ১৯৪৪ সালে জার্মানেরা ধ্বংস করলেও আবার মেরামত করে চালু করা হয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত সেতুগুলো হল নায়গ্রা চতুর্থ রেলসেতু, লণ্ডন টাওয়ার সেতু, স্কটল্যাণ্ডের টায় (Tay) সেতু, মন্ট্রিয়েলের সেন্ট লরেন্সের ওপর ভিক্টোরিয়া জুবিলি সেতু, সিডনি হার্বার সেতু, লোয়ার জাম্বেসি সেতু, ডেনমার্কের স্টোরস্টর্ম সেতু, হাওড়ার ঝুলন্ত সেতু, ঘানার ভোল্টা সেতু, অকল্যাণ্ডের হার্বার সেতু, নিউইয়র্কের ভেররাজানো-ন্যারোজ সেতু (Verrazano-Narrows bridge), সানফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট সেতু, ইংল্যাণ্ডের শেফিল্ডের টিন্সলে সেতু।

বাংলাদেশের বিখ্যাত সেতুগুলো হল সারা সেতু বা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (দ্র), ভৈরব সেতু ও কর্ণফুলি সেতু। তিনটি সেতুই রেলচলাচলের জন্য ইংরেজ আমলে নির্মিত হয়েছিল। কর্ণফুলি সেতু দিয়ে এখন অন্যান্য গাড়িও চলাচল করে। এ ছাড়া মেঘনা (দ্র), শীতলক্ষ্যা (দ্র), বুড়িগঙ্গার (দ্র) ওপর গাড়ি ও লোক চলাচলের জন্য বড় বড় সেতু আছে। বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত দীর্ঘতম সড়ক সেতু হল মেঘনা-গোমতী সেতু।

বি. ব.

সেনবংশ

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে কয়টি রাজবংশ রাজত্ব করে, তাদের মধ্যে সেন রাজবংশ অন্যতম। সেন রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের (দ্র) কর্ণাট দেশের অধিবাসী ছিলেন। কখন, কীভাবে সেনগণ সুদূর কর্ণাট থেকে বাংলায় এসে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি।

যতদূর জানা যায়, সেন রাজবংশের প্রথম রাজা হেমন্ত সেন। হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিজয় সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সেন রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। বিজয় সেন থেকে শুরু করে সেন রাজবংশের রাজত্বকাল নিম্নরূপ :

রাজার নাম	রাজত্বকাল	রাজত্বলাভের বছর
বিজয় সেন	৬২	১০৯৬ খ্রি.
বল্লাল সেন	১১	১১৫৮ খ্রি.
লক্ষ্মণ সেন	২৭	১১৭৯ খ্রি.
বিশ্বরূপ সেন	১৪	১২০৬ খ্রি.
কেশব সেন	৩	১২২৫ খ্রি.

সেন রাজবংশের রাজাদের মধ্যে প্রথম তিন জন অর্থাৎ বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন ভারতের ইতিহাসে

www.pathagar.com

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। বিজয় সেন বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে বঙ্গদেশে এক অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন ছিলেন একাধারে দিগ্বিজয়ী বীর, দক্ষ শাসক, সমাজ সংস্কারক, শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন নিজ যোগ্যতাবলে পিতৃরাজ্যকে আরো বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন। তিনি শাস্ত্র ও ধর্মচর্চায় পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি এক জন কবিও ছিলেন এবং কয়েক জন বিখ্যাত কবি তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্র ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। জানা যায়, তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার নামক এক জন তুর্কি সেনানায়ক অতর্কিতে বঙ্গদেশের রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করলে তিনি রাজপ্রাসাদের পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে পলায়ন করেন। এর পর বখ্‌তিয়ার তিব্বত অভিযানে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুবরণ করলে লক্ষ্মণ সেন স্বীয় রাজত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। লক্ষ্মণ সেনের পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। এই দুই রাজার রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে আরো সেন রাজার রাজত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় নি।

মো. ই.

সেনেকা, লুসিউস্ আন্নায়েউস্ [আনু. খ্রি. পূ. ৪–খ্রি. ৬৫]

রোমান সম্রাট নিরোর (দ্র) শিক্ষক এবং স্টোয়িক বা নিস্পৃহবাদী দর্শনের প্রবক্তা। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

সেনেকা (Lucius Annaeus Seneca) সম্রাট নিরোর শিক্ষক ও উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর সমকালের রাষ্ট্র-পরিচালনাব্যবস্থা ও জনগণের ওপর সম্রাট পরিচালিত চরম নিপীড়ন-নির্যাতনের বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি তৎকালীন রোমের সাধারণ মানুষের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র দেখে রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতির প্রশ্নে চরম হতাশার শিকার হন। এই হতাশা থেকেই তাঁর মনে নিস্পৃহবাদী দর্শনের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

সেনেকার দার্শনিক মতবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, বিশ্ব যেমন কোনো বিশেষ রাষ্ট্রসীমানাতেই আবদ্ধ নয়, তেমনি ব্যক্তিও বিশেষ কোনো সমাজের গণ্ডিতে বন্দি নয়। ব্যক্তি বৃহত্তর মানবসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বব্যাপী বিরাজমান এক সত্তা ও এক প্রজ্ঞা। মানুষের দৃষ্টিকে ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে অসীমে প্রসারিত করার ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রের অথবা মানুষের মুক্তি অর্জন সম্ভব।

সেনেকা বহু গ্রন্থের রচয়িতা। এসবের মধ্যে একমাত্র 'এপিস্টলি মরালিস্ অ্যাণ্ড লুসিলিয়াম' গ্রন্থটি অবিকৃত আকারে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সম্রাট নিরো সেনেকাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. হু.

সেন্টো বাগদাদ চুক্তি দ্র

সেফ্‌টি ল্যাম্প ডেভি, স্যার হামফ্রি দ্র

সেলুলয়েড্ (celluloid)

কৃত্রিম প্লাস্টিক পদার্থ হিসাবে প্রথম ১৮৫৬ সালে সেলুলয়েড্ তৈরি করেন আলেক্সাণ্ডার পার্ক্‌স্ (Alexander Parkes)। ১৮৬৯ সালে জন্ ওয়েস্‌লি হায়াট্ (John Wesley Hyatt) এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেন। এটা সেলুলোজ্ নাইট্রেট এবং কর্পূরের (দ্র) সমন্বয়ে তৈরি। এর কঠিনতা, উজ্জ্বলতা, বর্ণময়তা এবং কম দামের জন্য হাতির দাঁত দিয়ে আগে যেসকল সামগ্রী তৈরি করা হত, এখন সেগুলো সেলুলয়েড্ দিয়ে তৈরি করা হয়। রাসায়নিকভাবে নাইট্রোসেলুলোজ্ (দ্র) বিস্ফোরকের সঙ্গে সেলুলোজ নাইট্রেটের মিল রয়েছে। সেলুলোজ্ খুব সহজে জ্বলে। ফটোফিল্ম কিংবা এক্সরে ফিল্ম হিসাবে সেলুলোজ্ (দ্র) ব্যবহার করা হলে আগুন লাগার ভয় থাকে। এ জন্য আজকাল সেলুলোজ্ অ্যাসিটেট (cellulose acetate) ব্যবহার করা হয়।

সা. এ.

সেলুলোজ্ (cellulose)

সেলুলোজ্ এক রকম জটিল কার্বোহাইড্রেট (দ্র) —পলি স্যাকারাইড। এটা উদ্ভিদকোষের প্রাচীরের অন্যতম প্রধান উপাদান। হাইড্রোলাইসিস (দ্র) বিক্রিয়ার ফলে এটা ভেঙে

www.pathagar.com

গ্লুকোজ (দ্র) তৈরি হয়। মাঠে চরে বেড়ানো জাবর কাটা প্রাণীদের যেমন –গরু (দ্র), ছাগল– এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। এদের পাকস্থলীতে (দ্র) সেলুলোজ্ ভাঙার জন্য দরকারি এনজাইম (দ্র) থাকে। সেলুলোজ্ পানিতে গলে না এবং রাসায়নিকভাবে মূলত নিষ্ক্রিয়। অবশ্য নাইট্রিক অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এরা নাইট্রেট এস্টার (যেমন— গান কটন) তৈরি করে। সেলুলোজ্-এর অ্যাসিটেট এস্টার প্লাস্টিক যা ফিল্ম রূপে ব্যবহৃত হয়।

কার্বন ডাই–সালফাইড এবং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের মিশ্রণ মেশালে সেলুলোজ্ আংশিকভাবে হাইড্রোলাইসিস হয়ে দ্রবীভূত হয় এবং সোডিয়াম জ্যান্থেট নামে একটি অস্থিতিশীল এস্টার তৈরি করে। এ দ্রবণ ভিন্‌কোজ্ নামে পরিচিত। ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অম্লীয় দ্রবণে প্রবাহিত করলে সরু সুতো কিংবা পাতলা সিট (sheet) রেয়ন বা সেলোফেন তৈরি হয়।

কাগজও এক রকম সেলুলোজ্। কাঠের মণ্ড থেকে লিগ্‌নিন (lignin) সরিয়ে নিয়ে কাগজ তৈরি করা হয়।

সা. এ.

সেহ্‌রি

মূল আরবি শব্দ 'সহরু' থেকে জাত। 'সহরু' অর্থ রাত্রি-শেষের ক্ষণ। ইসলামী পরিভাষায় 'সেহ্‌রি' অর্থে রমযান (দ্র) মাসে রোজাদার কর্তৃক গৃহীত রাত্রিশেষের আহারকে বোঝায়।

রমযান মাসে সেহ্‌রি গ্রহণের সময় সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে (দ্র) উল্লেখ আছে। সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াত বা অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে পূর্ব দিগন্তে শুভ্ররেখা (অর্থাৎ দিনের আলো) কৃষ্ণরেখা (অর্থাৎ রাতের আঁধার) থেকে সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেহ্‌রি গ্রহণের সময়। বস্তুত সারা দিনের রোজার ক্লান্তি উপশমের সহায়ক শক্তি হিসাবেই সেহ্‌রি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মু. মা.

সৈয়দ আহমদ, স্যার [১৮১৭—১৮৯৮]

শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। জন্ম ১৭ই অক্টোবর ১৮১৭, দিল্লিতে। পিতার নাম সৈয়দ মোহাম্মদ মুত্তাকী খান।

সৈয়দ আহমদ সরকারি চাকুরিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। কালক্রমে যোগ্যতা, মেধা ও প্রতিভাবলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

নওয়াব আবদুল লতিফের (দ্র) মতো তিনিও মনে করতেন, ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধিতা নয়, সমঝোতার মাধ্যমেই ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহের (দ্র) ওপর একখানি বই লেখেন, তাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অন্যতম কারণ হিসাবে ভারতীয় আইন পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি না থাকার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্যপদ লাভ এই যুক্তিরই পরিণতি বলা যায়।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। কলেজ প্রতিষ্ঠা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমিতি গঠন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তিনি অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়কে আধুনিক মানসম্মত একটি পর্যায়ে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। আলীগড় অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি—পরবর্তী কালে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ ইসলাম ধর্ম (দ্র)-কে আধুনিক জ্ঞান ও চিন্তার আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পক্ষপাতী ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একাধিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

সৈয়দ আহমদ ১৮৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ দ্র

সৈয়দ নজরুল ইসলাম [১৯২৫—১৯৭৫]

আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন মহকুমা কিশোরগঞ্জের যশোদল গ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে এম. এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনে (দ্র) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৫৩ সালে আইন পাশ করে ময়মনসিংহ কোর্টে এবং এর অব্যবহিত পরে আওয়ামী লীগে (দ্র) যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত একাধিক বার আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) অনুপস্থিতিতে তিনি ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে (দ্র) গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন এবং মুক্তিযুদ্ধে (দ্র) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি গঠিত সরকারের তিনি শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭২ সালের ৯ই এপ্রিল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠিত হলে সৈয়দ নজরুল তার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন।

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম

১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে তিনি ময়মনসিংহের একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন এবং ঐ বছরেরই ১২ই মার্চ দ্বিতীয় বারের মতো আওয়ামী লীগ পার্লামেণ্টারি পার্টির উপনেতা মনোনীত হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই জানুয়ারি দেশে একদলীয় পদ্ধতির সরকার কায়েম হলে সৈয়দ নজরুল উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হন। ১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল (দ্র) গঠিত হলে তিনি দলের নির্বাহী কমিটির দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পান।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হবার পর খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হয়ে সৈয়দ নজরুলকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করেন। সেখানেই আটকাবস্থায় তাঁর অপর তিন রাজনৈতিক সহকর্মীর সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে নৃশংসভাবে তিনি নিহত হন।

আ. হু.

সৈয়দ নূরুদ্দিন [১৯২৩—১৯৮১]

কৃতী সাংবাদিক, কবি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যসেবী। তিনি বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার ধারেশ্বর গ্রামে ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ইতিহাস শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করার পর কলিকাতায় (দ্র) যান এবং সেখান থেকে প্রকাশিত 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) রাষ্ট্রের জন্ম হলে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পর্বের সাংবাদিক জীবনের শুরু হয়। এ পর্যায়ে তিনি প্রথমে

www.pathagar.com

'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায়, পরে তৎকালীন 'পাকিস্তান অবজারভার' ইংরেজি পত্রিকায় বার্তা-সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৫১ সালে দৈনিক 'সংবাদ' প্রকাশিত হলে সৈয়দ নূরুদ্দিন পত্রিকাটির বার্তা-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন এবং পরে এর যুগ্মসম্পাদক হন।

১৯৬০ সালে তিনি কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক পদে যোগ দেন।

বাংলাদেশ (দ্র) স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের তথ্য বিভাগের কাউন্সিলর নিযুক্ত হন।

১৯৭৮ সালে সৈয়দ নূরুদ্দিন দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি দৈনিক 'সংবাদ'-এর অন্যতম পরিচালক নিযুক্ত হন।

১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে সৈয়দ নূরুদ্দিন 'কথক' ছদ্মনামে 'নানা কথা' এবং এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'মধুব্রত' ছদ্মনামে 'মনে মনে' উপসম্পাদকীয় লিখে পাঠকমহলে জনপ্রিয় হন। এইসব উপসম্পাদকীয়তে তাঁর সমাজসচেতনতা ও মননশীলতার পরিচয় বিধৃত ছিল। সত্তর দশকে আবার তিনি 'কথক' ছদ্মনামে কলাম লিখতে শুরু করেন।

সৈয়দ নূরুদ্দিনের কবিতা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও এ দেশে আধুনিক কবিতার রচনা-রীতির গোড়া পত্তনে তাঁর নীরব অথচ সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ঢাকার 'প্রতিরোধ' ও কলিকাতার 'পরিচয়' পত্রিকায় চল্লিশের দশকে প্রকাশিত তাঁর কবিতাসমূহে এই পরিচয় বিধৃত। মধ্যপঞ্চাশের দশকে তাঁর 'চৌকা' বিষয়ক কবিতাবলি সুধী পাঠকমহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

চল্লিশের দশকে ঢাকায় যেসব তরুণ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী-সাহিত্যিকের উদ্যোগে 'প্রগতি লেখক সংঘ' (দ্র)-র শাখা গড়ে ওঠে, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সংগঠক।

সৈয়দ নূরুদ্দিন এ দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়া পত্তনেও মুখ্য ভূমিকা পালনকারীদের অন্যতম। এ দেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'সালামত'-এর তিনি ছিলেন কাহিনীকার। এ. জে. কারদার পরিচালিত রুচিশীল পূর্ণদৈর্ঘ্য জীবনধর্মী কাহিনীচিত্র 'জাগো হুয়া সাবেরা'র নির্মাণকাজের সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সৈয়দ নূরুদ্দিন ১৯৮১ সালের ২৩শে জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

সৈয়দ মুজতবা আলী মুজতবা আলী, সৈয়দ দ্র

সৈয়দ সুলতান

সৈয়দ সুলতান মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক জন সেরা কবি। তিনি আনুমানিক ষোল শতকের মাঝামাঝি থেকে সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মীর বংশে তাঁর জন্ম, পুরো নাম মীর সৈয়দ সুলতান। তাঁর জন্মস্থান নিয়েও বিতর্ক আছে। তবে এ কালের গবেষণায় স্থির হয়েছে যে তাঁর জন্ম হয়েছে চট্টগ্রাম (দ্র) জেলার চক্রশালা পরগনায় অর্থাৎ বর্তমান পটিয়া থানায়। কারো কারো মতে তিনি পরাগলপুরের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। পরাগলপুর বর্তমানে চট্টগ্রামের মীরসরাই থানার একটি গ্রাম। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়, তবে কিছুদিন কাজ উপলক্ষে তিনি পরাগলপুরে ছিলেন। সৈয়দ সুলতান শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনুজ কবিরা সবাই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর ভাবশিষ্যদের এক জন হলেন কবি মুহম্মদ খান। তিনি গুরুর আদেশে 'কিয়ামৎনামা' কাব্যখানি রচনা করেন।

সৈয়দ সুলতান বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'নবীবংশ' (দ্র)। গ্রন্থটি আকারে সুবিশাল। এটি মহাকাব্যের মতো বিরাট। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে এ রকম রচনা খুব কম দেখা যায়। সৃষ্টির আরম্ভ থেকে অর্থাৎ হযরত আদম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (দ্র) পর্যন্ত বিভিন্ন নবীর কাহিনী এবং হযরত মুহম্মদের (স.) (দ্র) আবির্ভাবের পটভূমি বর্ণনা করে কাব্যটি শেষ হয়েছে। নবী-রসূলেরা সাধারণ মানুষ নন। এই অসাধারণ মানুষদের মাহাত্ম্য রচনা করতে গিয়ে সৈয়দ সুলতান নানা অসম্ভব ও অলৌকিক কাহিনী অর্থাৎ মাজেজা বর্ণনা করেছেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় 'কাসাসুল আম্বিয়া', 'সিফাতুল আম্বিয়া' নামে নানা

www.pathagar.com

অলৌকিক নবীকাহিনী আছে। এই সব বই লেখা হয়েছে মানুষের মনে নবী-রসূলের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার জন্য। এই বইগুলোর অনুকরণে সৈয়দ সুলতান 'নবীবংশ' রচনা করেছিলেন।

'নবীবংশ' ছাড়াও সৈয়দ সুলতানের আরো কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলো হল 'শবে মিরাজ', 'রসুল বিজয়', 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইবলিসনামা', 'ওফাত-ই-রসুল', 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'জ্ঞানচৌতিশা' ইত্যাদি। 'শবে মিরাজ' ও 'রসুল বিজয়' বড় আকারের বই। হযরত মুহম্মদের (স.) মিরাজ গমন অর্থাৎ বেহেশ্‌তে আল্লাহ্‌র (দ্র) সাক্ষাৎলাভ 'শবে মিরাজ' কাব্যের মূলকথা। ইসলাম ধর্মের (দ্র) প্রচারক হযরত মুহম্মদের (স.) চরিত্রের প্রধান দিকগুলো তুলে ধরা 'রসুল বিজয়' কাব্যের বিষয়বস্তু। জয়কুম নামক এক পাপী রাজার সঙ্গে হযরতের যুদ্ধ 'জয়কুম রাজার লড়াই' কাব্যে বর্ণনা করা হয়েছে। কাব্যটি ছোট। 'ইবলিসনামা' ইবলিস অর্থাৎ শয়তানের কাহিনী। আর 'ওফাত-ই-রসুলে' আছে হযরত মুহম্মদের (স.) ওফাত অর্থাৎ মৃত্যুর করুণ বর্ণনা। সুফি সাধনার বই হল 'জ্ঞানপ্রদীপ' ও 'জ্ঞানচৌতিশা'।

এসব গ্রন্থ ছাড়াও সৈয়দ সুলতান অনেক ধর্মীয় গান ও পদাবলি রচনা করেছেন। এত সব রচনার জন্য সৈয়দ সুলতান মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সৈয়দ সুলতানের কাব্য পড়লে এক জন সঠিক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। খুব উদার মনের মানুষ ছিলেন তিনি। নিজ ধর্মকে তিনি ভালবাসতেন, কিন্তু অন্য ধর্মকে হেয় করতেন না। তাঁর রচনার মূল উদ্দেশ্য ইসলামের সৌন্দর্য, উদারতা, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করা। নবী-রসূলের কথা তিনি তুলে ধরেছেন যাতে তাঁদের আদর্শ লোকজন গ্রহণ করে। সুতরাং বোঝা যায়, সৈয়দ সুলতানের রচনার উদ্দেশ্য মহৎ। তিনি নিজেও মহৎ চরিত্রের লোক ছিলেন। সে জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

আ. ক.

সোক্রাতেস্ সক্রেটিস্ দ্র

সোডিয়াম লাইট বিজলি বাতি দ্র

সোনা / স্বর্ণ

ইংরেজিতে সোনাকে গোল্ড (gold) বলা হয়। সোনা একটি মৌলিক ধাতু। এর পারমাণবিক ওজন ১৯৭·২, পারমাণবিক সংখ্যা ৭৯, সাংকেতিক চিহ্ন Au, আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯·৩, গলনাঙ্ক ১০৬৩° সে.। সোনা উজ্জ্বল হলদে নমনীয় একটি পদার্থ। পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে পাথরের সঙ্গে মেশানো অবস্থায় বিশুদ্ধ সোনা আজও কিছু কিছু পাওয়া যায়। বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল অঞ্চলে, রাশিয়ায় (দ্র), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) ও কানাডায় এরূপ মিশ্রিত পাথুরে খনি আছে এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ সোনা এসব দেশে উৎপাদিত হয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতে কোলার অঞ্চলে এরূপ সোনার খনি আছে, তবে তা থেকে সামান্য পরিমাণে সোনা পাওয়া যায়। অতীত কালে কোনো কোনো স্থানের বালির সঙ্গে, বিশেষত নদীবাহিত বালুরাশি ও কাদার সঙ্গে যথেষ্ট স্বর্ণকণিকা পাওয়া যেত। শোনা যায়, সুবর্ণরেখা নদীর বালিতে এরূপ বিশুদ্ধ সোনার কণা পাওয়া যেত, আর সে জন্যই নদীটার এই নামের উৎপত্তি। সোনা বিশুদ্ধ অবস্থায় এমনি নানা জায়গায় পাওয়া যেত এবং এর স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে অতি প্রাচীন কালের গুহাবাসী মানুষেরাই বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে প্রথমেই সোনা চিনেছিল।

যা হোক, আজকাল স্বর্ণকণিকামিশ্রিত খনিজ পাথর থেকেই সোনা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। অবশ্য এই নিষ্কাশন পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হতে দেখা যায়, তবে মোটামুটি কৌশলটা একই। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় (রোটারি মিলে) সোনা-মেশানো পাথরকে অতি সূক্ষ্ম কণিকায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়। এরপর তাকে প্রশস্ত ও সামান্য হেলানো পাটাতনের ওপরে রেখে জলস্রোতে ধৌত করলে সোনার ভারি দানাগুলো পাথর ও অন্যান্য পদার্থ থেকে মোটামুটিভাবে পৃথক হয়ে পড়ে। এরপর সেই অধিকতর সোনামিশ্রিত চূর্ণকে প্রকাণ্ড পাত্রে নিয়ে তাতে পারদ মিশিয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাড়াচাড়া করলে সোনা ও পারদ মিশে 'অ্যামাল্‌গাম' বা পারদসঙ্কর তৈরি হয়ে প্রস্তরচূর্ণ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এই স্বর্ণ-পারদসঙ্কর উত্তপ্ত করে পাতন-পদ্ধতিতে পারদ বাষ্পাকারে পৃথক করে নিলে পাত্রে বিশুদ্ধ সোনা পড়ে থাকে। চূর্ণিত স্বর্ণ-প্রস্তর ধৌত করে বেশিরভাগ সোনা পৃথক করে নেওয়ার পরে অবশিষ্ট প্রস্তর-চূর্ণের সঙ্গে যে সামান্য সোনা থেকে যায় তাকে উদ্ধার করার জন্য ঐ চূর্ণের মধ্যে সোডিয়াম সায়েনাইড

www.pathagar.com

দিলে সোনা দ্রবণে গলে বেরিয়ে আসে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা পৃথক করা হয়। কেবল এই পদ্ধতিতেই নয়, স্বর্ণপ্রস্তর থেকে সোনা নিষ্কাশনের আরো নানা রকম পদ্ধতি আছে।

সাধারণ জল-হাওয়ায় সোনা তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারায় না। লোহার মতো সোনার অক্সাইড হয় না। সোনার সঙ্গে সহজে কোনো অ্যাসিড (দ্র) বা ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না। কোনো একক অ্যাসিডে সোনা গলেও না। সোনার একমাত্র দ্রাবক হল 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' (aqua regia)। এটি এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড ও চার ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের একটি মিশ্রণ। সোনা গলানোর এই অ্যাসিডমিশ্রণটি প্রাচীন আলকেমিস্টরাই উদ্ভাবন করেছিলেন এবং তাঁদের দেওয়া এই 'অ্যাকোয়া রিজিয়া' নামটি এখনো চলছে। অ্যাকোয়া রিজিয়াতে দ্রবীভূত সোনা 'গোল্ড ক্লোরাইড' নামক লবণের হলদে দানার আকারে দ্রবণ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। সোনার এই ক্লোরাইড লবণের জলীয় দ্রবণ ফটোগ্রাফের ছবি পরিস্ফুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সোনার সর্বাধিক ব্যবহার অলঙ্কারশিল্পে। তবে একেবারে বিশুদ্ধ সোনা দিয়ে তৈরি অলঙ্কারের গঠন ও কারুকার্য তেমন স্থায়ী হয় না, কারণ খাঁটি সোনা বেশ নরম। ধাতুটি এমনই প্রসারিত হতে পারে যে একে পিটিয়ে অতি সূক্ষ্ম পাতে এবং টেনে চুলের চেয়েও বহুগুণ সরু তারে পরিণত করা যায়। ফুঁ দিলে উড়ে যায় এমন সূক্ষ্ম সোনার পাতও তৈরি করা যায় যে, যার পুরুত্ব এক মিলিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ বা এক ইঞ্চির আড়াই লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র হতে পারে।

সোনার বিশুদ্ধতা সাধারণত ক্যারেট (carat) হিসাবে প্রকাশ করা হয়। বিশুদ্ধ সোনা হল ২৪ ক্যারেট। সোনা এত নরম যে এর সঙ্গে তামা ও রূপা মিশিয়ে ধাতুসঙ্কর তৈরি করে একে ব্যবহারযোগ্য কাঠিন্য দেওয়া হয়। স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানের ক্যারেট-সোনা ব্যবহৃত হয়। ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণমুদ্রায় থাকে ২২ ক্যারেট সোনা (যাকে বলে গিনি সোনা)। অর্থাৎ ২২ ভাগ বিশুদ্ধ সোনার সঙ্গে ২ ভাগ তামা ও রূপার মিশ্রণ। শতকরা হিসাবে গিনি সোনায় থাকে ৯১·৬৭ ভাগ সোনা, ২ ভাগ রূপা ও ৬·৩৩ ভাগ তামা। যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণমুদ্রায় থাকে শতকরা ৯০ ভাগ সোনা ও ১০ ভাগ তামা ও রূপা। ভারতে প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা 'মোহরে' সোনার বিশেষ কোনো সুনির্দিষ্ট মান ছিল না।

অলঙ্কারশিল্পে আমাদের দেশে সাধারণত ২২ ক্যারেট সোনাই ব্যবহৃত হয়, যাকে বলা হয় গিনি সোনা। অন্যান্য প্রায় সব দেশেই অনেক আগে থেকেই ১৮ ক্যারেট বা তারও নিম্নমানের সোনা অলঙ্কারশিল্পে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনেক দেশে অলঙ্কারশিল্পে 'শ্বেতস্বর্ণ' (white-gold) যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এটি দেখতে মূল্যবান প্লাটিনাম ধাতুর মতো চকচকে সাদা। সামান্য সোনার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে প্যালেডিয়াম বা নিকেল (দ্র) ধাতুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত একটা উজ্জ্বল সঙ্কর ধাতু হল এই শ্বেতস্বর্ণ।

সোনার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ফটোগ্রাফির (দ্র) কাজে ও ঔষধ (দ্র) রূপে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আ. হ. খ.

সোনা মসজিদ

'সোনা মসজিদ' শিরোনামে সুলতানি আমলের দু'টি মসজিদ (দ্র) নির্মাণশৈলী ও স্থাপত্য-কৌশলের অনুপম স্বাক্ষর বহন করছে। মসজিদ দু'টির নাম ছোট সোনা মসজিদ ও বড় সোনা মসজিদ। ছোট সোনা মসজিদ বাংলাদেশের (দ্র) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এবং বড় সোনা মসজিদ ভারতের (দ্র) গৌড়ে (দ্র) অবস্থিত।

ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (দ্র) রাজত্বকালে (১৪৯৩–১৫১৯)। মসজিদের প্রধান প্রবেশপথের উপরে স্থাপিত একটি ফলকলিপি থেকে জানা যায়, জনৈক আলীর পুত্র ওয়ালি মুহম্মদ মসজিদটি নির্মাণ করান। এই মসজিদের মনোরম স্থাপত্যশৈলী বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

মসজিদের আয়তন ৮২´ X ৫২´। এর চার কোণে চারটি মিনার, এগুলো আট বাহুবিশিষ্ট। দেয়ালগুলো ইটের তৈরি, কিন্তু এগুলোর বহিরাংশ কালো পাথরে ঢাকা। সম্মুখ ভাগের অলঙ্করণশৈলী অসাধারণ। পূর্ব দিকে খিলানযুক্ত পাঁচটি প্রবেশদ্বার। তিন সারিতে তিনটি সোনালি গম্বুজ।

www.pathagar.com

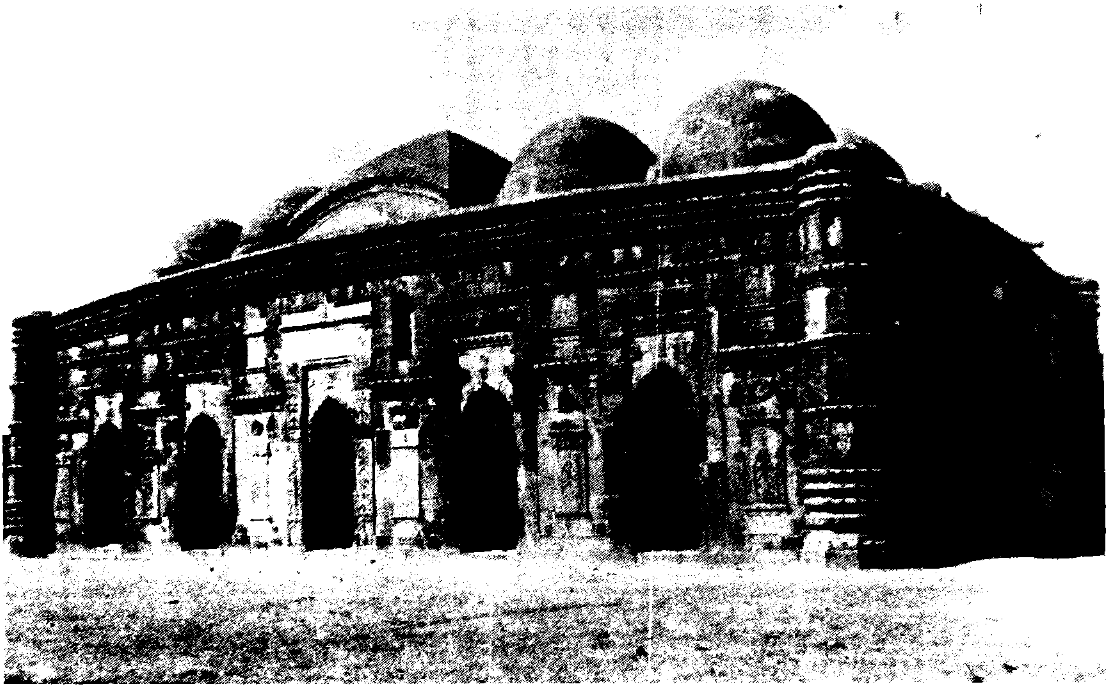

সোনামসজিদ— ছোট, রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবস্থিত

এক সময় এগুলো সোনার গিলটি করা ছিল বলে মসজিদের এ ধরনের নাম হয়েছে।

বড় সোনা মসজিদ ছোট সোনা মসজিদের পরে তৈরি। সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ ৯৩২ হিজরি (১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে) এটি নির্মাণ করান। এর ৪৪টি গম্বুজ এক সময় সোনার গিলটি করা ছিল এবং এর আয়তন ছোট সোনা মসজিদের চেয়ে বড় হওয়ায় এর নাম হয় 'বড় সোনা মসজিদ'।

২০০ বর্গফুটের একটি চতুর্ভুজাকৃতি প্রাঙ্গণের পশ্চিম প্রান্তে মসজিদটির অবস্থান। এর উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথ। প্রতিটি প্রবেশ-পথের পরিমাপ ৩৮ $\frac{১}{২}$´ X ১৩ $\frac{১}{২}$´। মসজিদের বহিরাংশের পরিমাপ ১৬৮´ X৭৬´। পূর্ব দিকে দরজার সংখ্যা ১১টি।

কাঠামোবিন্যাস ও স্থাপত্যশৈলীর দিক দিয়ে মসজিদটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মু. মা.

সোনার কাঠি শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন দ্র

সোফোক্লেস্ [আনু. খ্রি.পূ. ৪৯৫—৪০৬]

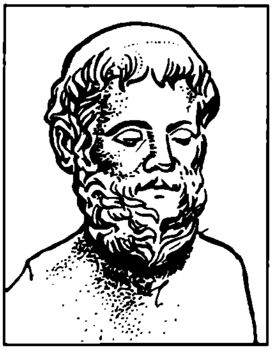

প্রাচীন গ্রিক নাট্যকার, ট্র্যাজেডিরচয়িতা। ইংরেজি বানানে Sophocles নামটি বাংলায় নানাভাবে লিখিত হয়ে থাকে— সফোক্লেস, সফোক্লিস, সোফোক্লিস, সোফো-ক্লেয়েস ইত্যাদি।

যা হোক, ট্র্যাজেডি লেখক হিসাবে বিখ্যাত নাট্যকার সোফোক্লেস্ গ্রিসের আথেন্স বা এথেন্স নগরের পাশে কলোনাস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ৪৯৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাঁর পিতা সোফিলুজ্ ছিলেন তরবারি-নির্মাতা। সোফোক্লেস্ যৌবনে তো বটেই, বৃদ্ধ বয়সেও অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন দেখতে, স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার আর প্রতিভাও ছিল বহুমুখী।

www.pathagar.com

'সোফোক্লেস্' শব্দের অর্থ বিজ্ঞ ও সম্মানিত ব্যক্তি। নামের মর্যাদা তিনি রেখেছিলেন। তিনি বহু সম্মানজনক রাষ্ট্রীয় পদ বিভিন্ন সময়ে অলঙ্কৃত করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৩ অব্দে তিনি রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পেলোপনেসীয় যুদ্ধে (আথেন্স ও স্পার্তার মধ্যে ৪৩১-৪০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যে যুদ্ধ হয়েছিল) তিনি সম্ভবত এক জন সেনাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সামাজিক মানুষ হিসাবেও তিনি বন্ধুবৎসল ও জনপ্রিয় ছিলেন। বল খেলা, কুস্তি লড়া, বীণা বাজানো ইত্যাদিতে তিনি এতখানিই পারদর্শী ছিলেন যে বহুবার পুরস্কার পেয়েছেন।

তবে সোফোক্লেসের মহত্তম কীর্তি তাঁর নাট্যসাধনা। তিনি ১২৩টি নাটক রচনা করলেও পাওয়া গেছে মাত্র ৭টি : 'আইয়াস্' (Ajax), 'আন্তিগোনে' (Antigone), ইলেক্ত্রা (Electra), 'রাজা অয়দিপাউস' (Oedipus Tyrannus বা Oedipus Rex), 'ফিলোক্তেতেস্' (Philoctetes), 'কোলোনায় অয়দিপাউস্' (Oedipus at Colonus) এবং 'ত্রাকিরমণী' (The Trachinan Women)। কিন্তু মাত্র এই সাতটি নাটকই তাঁর রচনাকুশলতা, মানবচরিত্র ও বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ও শিল্পবুদ্ধি এত নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবী সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করে আসছে। বিখ্যাত দার্শনিক ও সমালোচক আরিস্টোটল (দ্র) 'রাজা অয়দিপাউস' নাটককে এবং জার্মান দার্শনিক হেগেল্ (দ্র) 'আন্তিগোনে' নাটককে ট্র্যাজেডির (দ্র) আদর্শ রূপে গণ্য করেন। বলা হয়ে থাকে যে গ্রিক ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ তিন জন : এক প্রান্তে আছেন এস্খুলোস্ (দ্র), অন্য প্রান্তে রয়েছেন এউরিপিদেস্ (দ্র) আর মধ্যিখানে আলো করে আছেন সোফোক্লেস্।

হা. মা.

সোবার্স, গ্যারি [১৯৩৬–   ]

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের (দ্র) খ্যাতনামা ক্রিকেটার। তাঁর জন্ম ২৮শে জুলাই ১৯৩৬, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একটি দেশ বার্বাডোস্-এর ব্রিজটাউন শহরে।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা বাঁ-হাতী অলরাউণ্ডার হিসাবে খ্যাত গ্যার্ফিল্ড সোবার্স (Garfield Sobers) ছিলেন মা-বাবার ছয় সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। ডাক নাম 'গ্যারি' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ছেলেবেলা থেকেই গ্যারির ঝোঁক ছিল ক্রিকেটের দিকে। অবশ্য বার্বাডোসের সব ছেলেই ক্রিকেটকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

১৯৫২-৫৩ সালের বার্বাডোস একাদশে স্থান পাওয়ার পরের মৌসুমে ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রথম টেস্ট খেলেছেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। এরপর শুরু হয় নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি আর এগিয়ে যাওয়ার পালা। টেস্টে আট হাজার রান সংগ্রহকারী প্রথম ক্রিকেটার। টেস্টে সর্বোচ্চ অপরাজিত ৩৬৫ রানের রেকর্ড করেন ১৯৫৭-৫৮ সালে, কিংস্টন মাঠে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তাঁর এই রেকর্ড ভাঙেন ওয়েস্টইণ্ডিজেরই আরেক ব্যাটসম্যান লারা (দ্র), তিনি ১৯৯৩-৯৪ সালে সেন্ট জেন্স-এ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৩৭৭ রান করেন। সোবার্সের ব্যাটিং রেকর্ড : ৯৩টি টেস্টে ১৬০ ইনিংস ব্যাট করে ২৬টি সেঞ্চুরিসহ মোট ৮০৩২ রান করেন। এর মধ্যে অপরাজিত ছিলেন ২১ বার। গড় ৫৭·৭৮। ক্যাচ ধরেছেন ১০৯ বার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়কত্ব করেছেন ৩৯টি টেস্টে।

বোলিং রেকর্ড : ২১,৫৯৯ বল করে ২৩৫টি উইকেট নেন। এক ম্যাচে ৫ উইকেট পেয়েছেন ৫ বার। সেরা বোলিং ৭৩ রানে ৬ উইকেট। গড় ৩৪·০৩।

সফর করেছেন অস্ট্রেলিয়া (দ্র), ইংল্যাণ্ড, ভারত (দ্র), পাকিস্তান (দ্র), নিউজিল্যাণ্ড ও শ্রীলঙ্কা (দ্র)।

১৯৭৪ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর 'নাইট' উপাধি লাভ করেন।

অ. ব.

সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়া ও রুশ বিপ্লব দ্র
সোমপুর বিহার পাহাড়পুর বিহার দ্র
সোমেন চন্দ প্রগতি লেখক সংঘ দ্র

সোলোন্ [আনু. ৬৩৯—৫৫৯ খ্রি.পূ.]

প্রাচীন গ্রিসে এথেন্সের শাসনকর্তা, কবি, বাগ্মী ও অসম, সাহসী দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রথম প্রবর্তক

www.pathagar.com

হিসাবে তাঁকে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

সোলোন (Solon) -এর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৬৩৯ সালে, এথেন্সে। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হলেও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। তরুণ বয়সেই কবি, বাগ্মী ও সাহসী যোদ্ধা হিসাবে তাঁর নাম এথেনীয়দের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৪ অব্দে এথেনীয় গণপরিষদের সমর্থন লাভ করে সোলোন এথেন্সের শাসনকর্তা নির্বাচিত হন। এই সময় নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ চরমে ওঠে, বিশেষ করে ধনী ও গরিবদের মধ্যকার প্রকট বৈষম্য নিয়ে। ফলে ক্ষমতাসীন হয়েই তিনি আইন সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর নির্দেশে গরিব কৃষকদের সমস্ত ঋণ মওকুফ করে দেওয়া হয়। ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এথেনীয় নাগরিকও মুক্তিলাভ করে। এ ছাড়াও অভিজাতদের একচ্ছত্র ক্ষমতা খর্ব করা এবং শাসনকাজে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ সোলোন্ কর্তৃক গৃহীত এই যুগান্তকারী সংস্কারের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

সোলোন্ খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

সোস্‌ঝেনিৎসিন্, আলেক্সান্দ্‌র্ রুশ সাহিত্য দ্র

সোহরাওয়ার্দি উদ্যান

এক সময়ে নাম ছিল রমনা রেসকোর্স, এখন সোহরাওয়ার্দি উদ্যান নামে পরিচিত।

মোগল শাসনামলেই (১৬১০) রমনা এলাকার পত্তন হয়। এটি তখন বাগান হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। নাম ছিল 'বাগ্-ই-বাদশাহি' অর্থাৎ বাদশাহি বাগান।

মোগল আমল থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এর আয়তন ও আকৃতি কখনো সঙ্কুচিত, কখনো সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে এর মূল অংশ বা কাঠামোটি প্রায় অবিকৃতই থেকে গেছে। কেবল পরিবর্তিত হয়েছে এর চারপাশের প্রাকৃতিক ও আবাসন-কাঠামো।

ইংরেজ আমলে এটি ইংরেজ ও দেশীয় অভিজাত-শ্রেণীর লোকজনদের অবসর যাপনের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

রমনা উদ্যান দু'টি স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত। একটি সোহরাওয়ার্দি উদ্যান, অপরটি তার আদি নাম 'রমনা পার্ক' নামেই পরিচিত। শিল্পকলা একাডেমী সংলগ্ন মৎস্য পরিদপ্তর থেকে পিজি হাসপাতাল অভিমুখী একটি প্রশস্ত সড়ক এই বিভক্তি ঘটিয়েছে।

১৮২৫ সালে ইংরেজদের উদ্যোগে বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যানকে চারদিক থেকে কাঠের রেলিং দ্বারা বেষ্টন করে ঘোড়দৌড়ের মাঠে রূপান্তরিত করা হয়। এই মাঠের ঘোড়ার রেস বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

উদ্যানটি বহু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনারও সাক্ষী।

১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ (দ্র) এই উদ্যানে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণে যখন বলেছিলেন, 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', তখন সভাস্থলে উপস্থিত বাঙালি ছাত্রসমাজ তাঁর সেই ভাষণের জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন। এই ঘটনার ধারাবাহিকতাতেই '৪৮ সালেরও পরে '৫২ সালের মহান রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের (দ্র) সূচনা হয়।

১৯৬৯ সালের ২৩শে মার্চ এই সোহরাওয়ার্দি উদ্যানেই ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত পাক হানাদারবাহিনীর আত্মসমর্পণ

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এখানেই বঙ্গবন্ধুর (দ্র) মুখে উচ্চারিত হয় 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয়ে যায় বাংলাদেশের (দ্র) স্বাধীনতার যুদ্ধ।

এই সময় বন্ধ করে দেওয়া হয় ঘোড়দৌড়। রমনা রেসকোর্সের নামও পরিবর্তন করে রাখা হয় সোহরাওয়ার্দি উদ্যান। সেই থেকে এটি এ নামেই পরিচিত।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এই সোহরাওয়ার্দি উদ্যানেই পাকিস্তানের বাহিনী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে এবং বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয় ঘটে।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী (দ্র) ১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চ এই উদ্যানে ভাষণ দেন।

সোহরাওয়ার্দি উদ্যান বর্তমানে নানা গাছপালা ও বাহারি ফুলের গাছসহ কংক্রিটের (দ্র) অপ্রশস্ত পথঘাটে আকীর্ণ। বর্তমানে এটি নগরবাসীর দ্বিপ্রাহরিক ও বৈকালিক অবসরবিনোদনের একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

আ. হু.

সোহরাওয়ার্দি, হাসান শাহেদ [১৮৯০—১৯৬৫]

শিল্প-সমালোচক, কূটনীতিক, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও নাট্য পরিচালক। জন্ম বিখ্যাত সোহ্‌রাওয়ার্দি পরিবারে ১৮৯০ সালের ২৪শে অক্টোবর, ভারতের (দ্র) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মেদিনীপুরে।

হাসান শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দি ১৮ বছর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ গ্র্যাজুয়েট হন। পরের বছর ইতিহাস ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান, ভর্তি হন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকেই তিনি ১৯১৪ সালে ইতিহাসশাস্ত্রে অনার্সসহ স্নাতক হন। উল্লেখ্য, শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দি রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির (দ্র) অগ্রজ।

ইংল্যাণ্ডে বসবাসকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর (দ্র) সঙ্গে তাঁর যে সখ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা আজীবন অক্ষুণ্ন ছিল। সমকালীন বহু ইংরেজ কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গেও তাঁর গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

অক্সফোর্ড থেকে শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দি রাশিয়ায় (দ্র) যান। সেখানে তাঁর তৎপরতা ছিল বহুমুখী। সেন্ট পিটার্সবুর্গ ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় ও মস্কোর উইমেন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনা, রাশিয়ার স্বল্পকাল স্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সান্দ্র্ কেরেন্স্কিকে ইংরেজি শিক্ষা দান, বিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সেখানে রুশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'রাজা' নাটক মঞ্চস্থ করা—এই সবই ছিল তাঁর বিভিন্নমুখী তৎপরতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। নাট্যপ্রযোজক-পরিচালক হিসাবে তিনি রাশিয়ায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তবে ১৯১৭ সালে সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লবের সময় তিনি রাশিয়া ত্যাগ করে জার্মানির তৎকালীন রাজধানী বার্লিনে চলে যান। সেখানে তাঁর সহযাত্রী মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে নাটক প্রযোজনা করেও তিনি ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেন।

বার্লিন থেকে শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দি ১৯২০ সালে যান ফ্রান্সে এবং শুরু করেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি আবার ফিরে যান রাশিয়ায়। ১৯২১ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম নাট্যপ্রযোজক হিসাবে কাজ করেন। তিনি প্যারিসে জাতিসংঘ পরিচালিত আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সংস্থারও থিয়েটারবিশেষজ্ঞ ছিলেন।

১৯৩১ সালে শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দি ভারতে ফিরে আসেন। পরের বছর তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) সুপারিশক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। দীর্ঘ ১২ বছর তিনি সেখানে অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি বিখ্যাত চিত্রকর যামিনী রায়ের (দ্র) শিল্পকর্ম বিষয়ে প্রথম মূল্যায়নধর্মী নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সময় দৈনিক পত্রিকাসমূহে তিনি শিল্পকলা বিষয়ে সমালোচনা লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য দেশীয় চিত্রকলা বিষয়ক অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয়, জার্মান,

www.pathagar.com

রুশ ও চীনা ভাষার ওপর দখল ছিল তাঁর।

১৯৪৭ সালে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং স্পেনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম 'এসেজ ইন ভার্স' (১৯৩৭) ও 'প্রেফিসেস্' (১৯৩৮)। অনুবাদকর্ম, রুশ পণ্ডিত ভাসিলি ভ্লাদিমিরভিচের 'মুসলিম সংস্কৃতি' ও 'লি হৌ চু-র কবিতা'। তাঁর 'এসেজ ইন ভার্স্' কাব্যভুক্ত গীতিকবিতাসমূহ বিখ্যাত ইংরেজি কবি রবার্ট ব্রিজেসের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে।

শাহেদ সোহরাওয়ার্দি করাচি শহরে ১৯৬৫ সালের ৪ঠা মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

সোহরাওয়ার্দি, হোসেন শহীদ [১৮৯২—১৯৬৩]

আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। ১৮৯২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা (দ্র) মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্যার জোহাদুর রহিম জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। মাতা খুজিস্তা আখতার বানু ছিলেন এক জন বিদূষী মহিলা। তিনি কলিকাতার মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) এবং ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

১৯২০ সালে দেশে ফিরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। মওলানা মুহম্মদ আলী (দ্র) ও মওলানা শওকত আলীর (দ্র) আহ্বানে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং খিলাফত আন্দোলন (দ্র) ও স্বরাজ আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (দ্র) সহযোগিতায় 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে কাজ করেন। এ সময় দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে তিনি কলিকাতা

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি— ১৯৫৬ সালে তৎকালীন তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে গ্রামে ঘুরছেন

কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। তিনিই কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মুসলমান ডেপুটি মেয়র।

১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর হিন্দু মহাসভাপন্থী নেতাদের প্রবল আপত্তির মুখে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল হয়ে গেলে সোহরাওয়ার্দি কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগে (দ্র) যোগ দেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি কলিকাতার দু'টি আসনে নির্বাচিত হন।

বাংলায় এ. কে. ফজলুল হকের (দ্র) কৃষক-প্রজা পার্টির (দ্র) সঙ্গে মুসলিম লীগের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে সোহরাওয়ার্দিকে বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের (দ্র) মন্ত্রিসভায় তিনি খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের সাধারণ নির্বাচনের পর

www.pathagar.com

তিনি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) প্রতিষ্ঠার পর তিনি কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন। ১৯৫০ সালে মওলানা ভাসানীর (দ্র) প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। ১৯৫৪ সালে সরকার-বিরোধী নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্ট (দ্র) গঠন এবং সেই নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ের পেছনে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরই চেষ্টায় ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। সে বছরই তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর শরিক দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। ১৯৬০ সালে সরকার ছয় বছরের জন্য তাঁর রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকদের পরামর্শে জুরিখ, লণ্ডন এবং জার্মানি ঘুরে পাকিস্তানে ফেরার পথে তিনি ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

সোহরাব-রুস্তম শাহনামা দ্র

সোহাগা

সোডিয়াম পাইরোকেরেট ($Na_2 B_4 0_7.10H_2 0$) নামক সাদা স্ফটিকাকার পদার্থটিকে আমরা বাংলায় 'সোহাগা' বলে থাকি। এর ইংরেজি নাম 'বোরাক্স' (Borax)। প্রকৃতিতে এই যৌগটিকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাপ প্রয়োগ করলে এই যৌগটির কেলাস পানি উবে যায় এবং কাচের মতো এক রকম স্বচ্ছ কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হয়। সল্ডারিং-এর কাজে, কাচশিল্পে এবং অগ্নি-নিরোধক পদার্থ প্রস্তুত করতে সোহাগা ব্যবহৃত হয়। মৃদু অ্যান্টিসেপটিক পদার্থ হিসাবেও এর ব্যবহার আছে।

আ. হ. খ.

সৌরকোষ

এক ধরনের ব্যবস্থা যা সূর্যের (দ্র) আলোর তড়িৎচুম্বক শক্তিকে রূপান্তরিত করে ব্যবহারযোগ্য তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে। সৌরকোষ গঠিত হয় সিলিকন (দ্র) কেলাস দিয়ে। বিশেষ উপায়ে সিলিকন কেলাসের P-N সংযোগের দু'টি স্তর করা হয়। দুই স্তরের সীমানা বরাবর বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। শক্তিশালী আলোক-কণা (ফোটন) দুই স্তরের সীমানায় আপতিত হলে তড়িৎচালক বল উৎপন্ন হয়। তখন P এবং N স্তরকে পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করলে সার্কিটের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

প্রতি সিলিকন সৌরকোষের তড়িৎচালক বল ০·৬ ভোল্ট্ (দ্র)। তাই ব্যবহারিক কাজের জন্য অনেকগুলি সৌরকোষকে বিন্যস্ত করে একটি বোর্ড (প্যানেল) তৈরি করা হয়। এক বর্গমিটার জুড়ে সৌরকোষের সজ্জাকে সূর্যের দিকে ধরলে তা থেকে ২০০ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সৌরকোষের সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরের দক্ষতা ১৫% থেকে ২০%।

১৮৯৩ সালে বেকেরেল্ (দ্র) প্রথম তড়িৎকোষের আলোকসংবেদনশীলতা লক্ষ করেন। ১৮৭৭ সালে অ্যাডাম্‌স্ এবং ডে সেলেনিয়াম ধাতু নির্মিত আলোক-তড়িৎকোষ নির্মাণ করেন। ১৯৫১ সালে জে. এল. পিয়ার্সন সর্বপ্রথম কার্যকর সৌরকোষ উৎপাদন করেন। ১৯৫৮ সালে মহাকাশযান ভ্যানগার্ড-১-এ প্রথম সৌরকোষ ব্যবহৃত হয়। এক সময় সৌরকোষ উৎপাদন ব্যয়বহুল ছিল; ইদানীং উৎপাদনব্যয় দ্রুত কমে যাচ্ছে। সিলিকন ছাড়াও অন্যান্য মৌল সৌর প্যানেল তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘড়ি (দ্র), রেডিও (দ্র), ক্যালকুলেটর (দ্র) থেকে শুরু করে গাড়ি ও বিমান চালনার জন্যও ইদানীং সৌরকোষ ব্যবহৃত হচ্ছে।

স. রা.

সৌরজগৎ

সূর্য (দ্র) মহাকাশের অন্যতম নক্ষত্র (দ্র)। ৯টি গ্রহ (দ্র), ৬৩টি উপগ্রহ, হাজার হাজার গ্রহাণু (দ্র) এবং বহু লক্ষ ধূমকেতু (দ্র) নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত। গ্রহ ও উপগ্রহসমূহ সূর্য এবং নিজেদের পারস্পরিক মহাকর্ষণশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে

www.pathagar.com

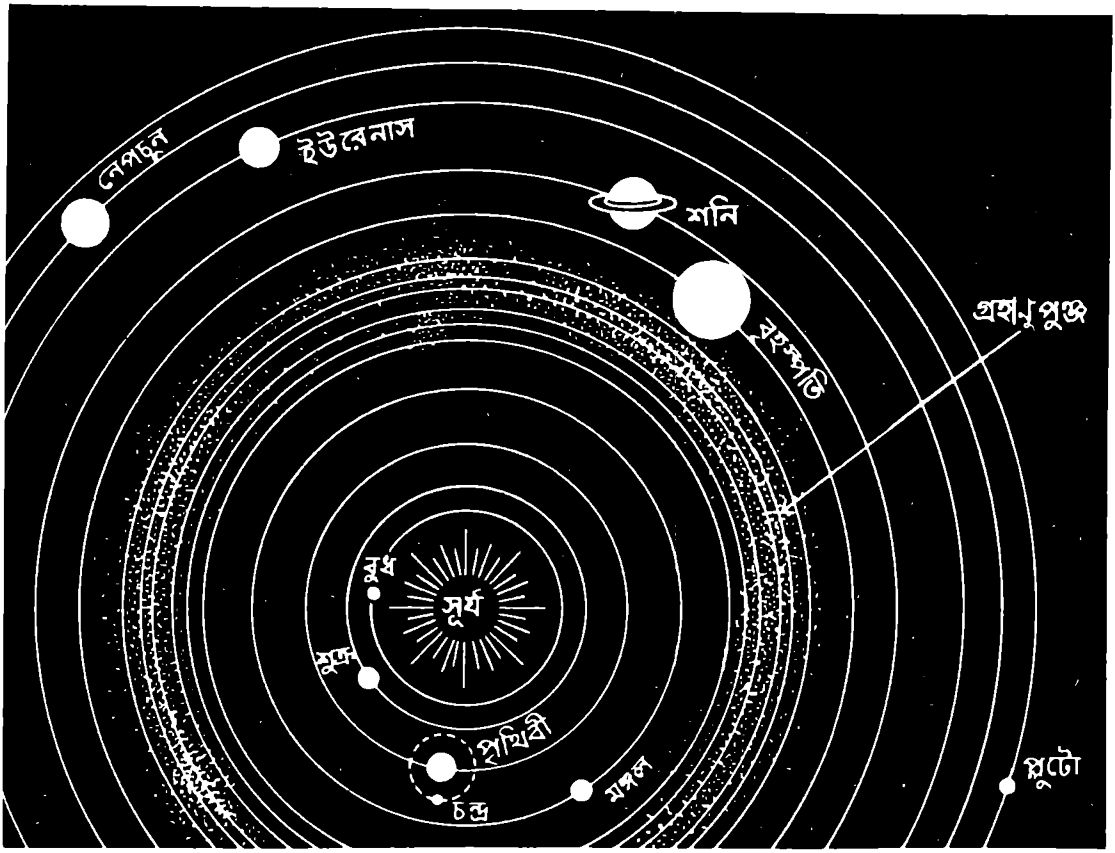

সৌরজগতের নয়টি গ্রহ, হাজার হাজার গ্রহাণুপুঞ্জ ও সূর্য

পরিক্রমণ করে। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান এই জোতিষ্কমণ্ডলীকে সৌরজগৎ বলে। অন্য দিকে সূর্য এই গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১.৯০০ কিমি বা ১,২০০ মাইল বেগে মহাশূন্যে ভ্রমণ করছে।

গ্রহগুলোর মধ্যে বুধ (দ্র) সূর্যের নিকটতম। এর পর ক্রমান্বয়ে অবস্থান করছে শুক্র (দ্র), পৃথিবী (দ্র), মঙ্গল (দ্র), বৃহস্পতি (দ্র), শনি (দ্র), ইউরেনাস (দ্র), নেপচুন (দ্র) ও প্লুটো (দ্র)। কোনো কোনো গ্রহের এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। যেমন পৃথিবীর ১টি (চাঁদ), মঙ্গলের ২টি, বৃহস্পতির ১৬টি, শনির ১৮টি, ইউরেনাসের ১৭টি, নেপচুনের ৮টি এবং প্লুটোর ১টি— এই হিসাবে মোট ৬৩টি উপগ্রহ আছে। বুধ ও শুক্র গ্রহের কোনো উপগ্রহ নেই। প্লুটো ব্যতীত অন্য সব গ্রহ একই সমতলে থেকে সূর্যকে পরিক্রমণ করে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্থানে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। এগুলোকে গ্রহাণুপুঞ্জ বলে। গ্রহ ও উপগ্রহগুলোর নিজস্ব কোনো আলো নেই। এরা সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়।

সৌরজগতের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীদের নানারূপ মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু আজও নিশ্চিতরূপে রহস্যটির সমাধান সম্ভব হয় নি। ১৭৯৬ সালে ফরাসি গণিতবিদ পিয়ের সিমঁ লাপ্লাসের (Pierre Simon Laplace : ১৭৪৯-১৮২৭) মতে সুদূর অতীতে বিশ্বে যে উষ্ণ গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ ছিল তা অনবরত পাক খেতে খেতে মাঝখানে জমাট বেঁধে ওঠে খানিকটা বস্তুর ঘনপিণ্ড। এই পিণ্ডটি সূর্যের রূপ নেয়। তার চারপাশে বস্তুপুঞ্জ ঠাণ্ডা হতে শুরু করলে বস্তুপুঞ্জের আকার ছোট হয়ে আসে, কিন্তু ঘোরার বেগ বাড়ে। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ঘুরন্ত খোলস পৃথক হয়ে পড়ে এবং সেগুলো জমাট বেঁধে নানা গ্রহ-উপগ্রহের রূপ নেয়।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী স্যার জেম্‌স্

www.pathagar.com

জীনসের (James Hopwood Jeans: ১৮৭৭-১৯৪৬) মতে একটি অতি বিশাল নক্ষত্র সূর্যের নিকট দিয়ে ঘুরে যাওয়ার সময়ে আকর্ষণের টানে সূর্যের বুক থেকে গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ পটলের আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ে। এ বস্তুপুঞ্জ সূর্যের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হয়।

১৯৪৩-৪৪ সালে জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ভাইৎসেকার ও সোভিয়েত গণিতবিদ অটোশ্মিট পৃথকভাবে যে মত প্রকাশ করেন সে মতানুসারে উত্তপ্ত গ্যাসীয় সূর্য থেকে নয়, বরং শীতল বস্তুকণিকাপুঞ্জ থেকে একই সময়ে সূর্য ও সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি। বিশ্বে শীতল বস্তুকণিকাপুঞ্জে নিরন্তর গতিশীলতার ফলে ছোট-বড় অসংখ্য ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত বড় একটি ঘূর্ণিতে বস্তুকণা ঘনীভূত হয়ে আদিসূর্যের কেন্দ্রবস্তুর সৃষ্টি হয়। এর চার পাশে ঘুরন্ত অন্যান্য পাকে বস্তুকণার সমাবেশ নানা আকারে শীতল আদি গ্রহণকণিকাপিণ্ড সৃষ্টি করে। শীতল সূর্যে ক্রমান্বয়ে বস্তুর সঙ্কোচন, সংঘাত ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে অন্যান্য গ্রহ পরবর্তী পর্যায়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথের মধ্যবর্তী গ্রহাণুপুঞ্জের বলয় এবং ধূমকেতু, উল্কা (দ্র) প্রভৃতির উৎপত্তিও এই একই আদি বস্তুকণাপুঞ্জ থেকে। আধুনিক কালে অধিকাংশ বিজ্ঞানী এই মতের সমর্থক।

মু. এ.

স্কট, স্যার ওয়াল্টার [১৭৭১—১৮৩২]

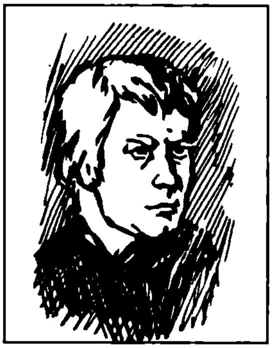

রোম্যান্টিক যুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। স্কট (Sir Walter Scott) তাঁর জীবদ্দশাতেই বর্ণনামূলক কবিতা ও ঐতিহাসিক কাহিনীনির্ভর রচনাকর্মের জন্য নজিরবিহীন জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। লেখক হিসাবে তাঁর বড় কৃতিত্ব ছিল নিখুঁত বর্ণনা সহযোগে কোনো ঐতিহাসিক সময় বা কালপর্বকে পুনশ্চ সৃষ্টি করা। তিনি সেই সব সর্বাগ্রগণ্য লেখকের অন্যতম যাঁরা তাঁদের চারপাশের বাস্তব পরিবেশের সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বারোপ করে গেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করলেও তাঁর ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম, যথা উপন্যাস 'আইভান্‌হো' (Ivanhoe) এবং 'ওয়েভার্লি' (Waverley) এখনো বহুলপঠিত। উপন্যাসশিল্পের বিকাশে তাঁকে এক জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

স্যার ওয়াল্টার স্কট ১৭৭১ সালের ১৫ই আগস্ট স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান স্কট শৈশবে পোলিও (দ্র) রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর ডান পা খোঁড়া হয়ে যায়। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে পিতামহের স্কটিশ সীমান্ত-সংলগ্ন পল্লী অঞ্চলের খামারবাড়িতে। এ কারণেই স্কট-এর চরিত্র তাঁর পিতামাতার সহজ-সরল বুদ্ধি, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্কটিশ উত্তাধিকারের রোম্যান্টিক ঐতিহ্যে গড়ে ওঠে।

কৈশোরে স্কট প্রায় সব ধরনের বই পাঠ করেন। তিনি স্কটল্যাণ্ডের গীতযোগ্য বীরত্বব্যঞ্জক পল্লীগাথা এবং কাহিনীর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। 'মিন্স্‌ট্রেস্‌লি অব দ্য স্কটিশ বর্ডার' (১৮০২-১৮০৩) তাঁর এই জাতীয় গাথার অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম। 'লে অব দ্য লাস্ট মিন্স্‌ট্রেল' (১৮০৫) এবং 'লেডি অব দ্য লেক'ও (১৮১০) তাঁর একই পর্যায়ভুক্ত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

১৮৩৮ সালে তাঁর 'রকেবি' (Rokeby) প্রকাশিত হলে এর রচনাভঙ্গি থেকে দেখা যায়, স্কট গীতিময় কবিতার চাইতে চরিত্রাঙ্কনের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। এই জন্য তাঁকে ইংল্যাণ্ডের রাজকবি করার প্রস্তাব করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

স্কট-এর প্রথম উপন্যাস 'ওয়েভার্লি' যদিও ছদ্মনামে প্রকাশিত, তবু তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এরপর তিনি একনাগাড়ে পনেরো বছর ধরে একের পর এক উপন্যাস লিখে যান। মাঝখানে স্বল্পকালের জন্য তিনি আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হলেও স্বরচিত গ্রন্থ বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থে সমগ্র জীবন বিত্ত ও প্রাচুর্যের ভেতরেই কাটাতে পেরেছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসকর্ম হচ্ছে : 'গাই ম্যানারিং' (১৮১৫), 'ওল্ড মর্টালিটি (১৮১৬), 'রব রয়' (১৮১৭), 'আইভান্‌হো' (১৮২০), 'কুয়েন্‌টিন ডারওয়ার্ড' (১৮২১), 'দ্য টালিসম্যান' (১৮২৫) এবং 'অ্যান্‌ অব গেইয়ার্স্‌টেইন' (১৮২৯)।

অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত কারণে ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে স্যার ওয়াল্টার স্কট ১৮৩২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আ. হু.

স্কাউট বয় স্কাউট দ্র
স্কার্ভি রোগ ভিটামিন দ্র

স্কেটিং (skating)

স্কেটিং বস্তুত একটি পাশ্চাত্যদেশীয় খেলা। পায়ের তলায় জুতোর সঙ্গে লোহার চাকা লাগিয়ে স্কেটিং করতে হয়। পাকা মসৃণ তলবিশিষ্ট যে কোনো জায়গায় এই স্কেটিং করা যেতে পারে। এই ধরনের স্কেটিংকে রোলার স্কেটিং (roller skating) বলে। এ ছাড়া জুতোর নিচে লোহার ফলাওয়ালা জুতো পরে বরফের উপর স্কেটিং করা হয়। এই ধরনের স্কেটিংকে আইস স্কেটিং (ice skating) বলে। ১৯৪২ সালে

এডিনবরায় প্রথম স্কেটিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কেটিংয়ে 'ফিগার স্কেটিং' (figure skating) বরফের উপর স্কেটিং রিংয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর রোলার স্কেটিং যত্রতত্র—রাস্তায়, ব্যায়ামাগারে, সব জায়গায় করতে দেখা যায়। বাংলাদেশে রোলার স্কেটিংয়ের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। আজকাল বহু তরুণ-তরুণী রোলার স্কেটিং করে থাকে। বাংলাদেশ থেকে রোলার স্কেটিংয়ে দিল্লি (দ্র)-তে প্রতিযোগিতা করে দেশের জন্য স্কেটিং দল সম্মান কুড়িয়ে এনেছেন। এই খেলায় বিনোদনের প্রচুর খোরাক রয়েছে।

কা. আ. আ.

স্কেল (scale)

স্বর সোপান। ইতালীয় 'স্কালা' (scala) শব্দ থেকে স্কেল কথাটি এসেছে। স্কালা বলতে বোঝায় সোপান। সুতরাং সোপানক্রমে স্বরসমূহ সজ্জিত হলে 'স্কেল' হয়। তবে স্বরসমূহ একটি বিশেষ ধারণার ভিত্তিতে সজ্জিত হয়ে থাকে। সে জন্য বলা হয় যে সপ্তক বা অক্টেভের অন্তর্গত টোন বা স্বরসমূহকে আরোহ-অবরোহ ক্রমে নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্বাচন করে পরস্পর সংশ্লিষ্ট করলে স্কেল হয়। স্কেল-কী (scale-key) এর টোনসমূহকে উপস্থাপিত করে।

যে অর্থে বর্তমানে স্কেল কথাটি আমরা সঙ্গীতে ব্যবহার করি তা পাশ্চাত্য সঙ্গীত থেকে গ্রহণ করা। তবে পাশ্চাত্যে স্কেল বলতে যে একটি পূর্ণ স্বরক্রম বোঝায় আমরা তেমন বোঝাই না। আমরা স্কেল বলতে শুধুমাত্র কোনো রচিত সঙ্গীতের ষড়জ স্বরের স্থান নির্দেশ করে থাকি।

স্কেল বলতে প্রথমেই আসে মেজর স্কেলের কথা। এটি সপ্তস্বর স্কেল। সপ্তকের সাতটি স্বরকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে এই স্কেল গঠন করা হয়। সপ্তকের অন্তর্গত বারোটি স্বরের যে কোনো স্বর থেকে শুরু করে এই স্কেল গঠিত হতে পারে। তবে এতে টোন সেমিটোন বিন্যাসের একটি ব্যাপার আছে। টোন= T এবং সেমিটোন = S ধরলে এই বিন্যাসটি হচ্ছে T-T-S-T-T-T-S । এর পর আসে মাইনর স্কেলের কথা। ওপরে যে টোনবিন্যাসটি দেখানো হয়েছে, এর নাম মোড। মেজর স্কেলের মোড হচ্ছে মেজর মোড, আর মাইনর স্কেলের মোড হচ্ছে মাইনর মোড। এই মাইনর মোডের

www.pathagar.com

ভিত্তিতে যে স্কেল গঠিত হয় তারই নাম মাইনর স্কেল। মাইনর স্কেলও মেজর স্কেলের মতো সাত স্বরে গঠিত হয়। তবে তৃতীয় স্বরটি এই স্কেলে এক সেমিটোন নমিত হয়। মেজর কথাটি বৃহত্তর ও মাইনর কথাটি ক্ষুদ্রতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল স্বরের সঙ্গে তৃতীয় স্বরের যে ব্যবধান তা মেজর স্কেলে বৃহত্তর ও মাইনর স্কেলে এক সেমিটোন নমিত হওয়ায় ক্ষুদ্রতর। বারোটি টোনকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে যে স্কেল গঠন করা হয় তাকে বলা হয় ক্রোমাটিক স্কেল। এই স্কেলে প্রতি টোনই এক সেমিটোন দূরত্বে থাকে। ডায়াটোনিক স্কেল বলতে মেজর ও মাইনর স্কেলকে বোঝায়। কেননা, এই স্কেলদ্বয়ে টোনসমূহ পরস্পর দুই (ডায়া) প্রকার ব্যবধানে অবস্থিত।

ক. গো.

স্কোয়াশ [squash]

১৮৭০ সালের দিকে স্কোয়াশ র‍্যাকেট (Squash racquets) খেলাটি ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত হয়। উত্তর আমেরিকার (দ্র) কানাডাতেও এর প্রচলন দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পরপরই খেলাটি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্কোয়াশ র‍্যাকেট ২৭´´ –এর বেশি লম্বা হয় না, প্রায় ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের সমান হয়। র‍্যাকেটের মাথার দিকটা ৬ $\frac{৩}{৪}$´´ ইঞ্চি এবং ওজন ৮ থেকে ১০ আউন্স হয়। আর বলটি ভিতরে ফাঁপা বরাবরের গল্‌ফ্‌ বলের চেয়ে একটু বড় আকারের হয় ১ $\frac{৩}{৪}$´´ ব্যাসার্ধের এবং সিঙ্গল্‌ খেলার বলের ওজন ৩০ গ্রাম, ডবল খেলার জন্য ১ আউন্স থেকে ১·০৬ আউন্সের মধ্যে হয়ে থাকে। এই খেলা ছোট রবারের বল ও র‍্যাকেট দিয়ে উঁচু বদ্ধ ঘরের মধ্যে খেলতে হয়। দু' জন বা চার জন একত্রে এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশে(দ্র) এই খেলার বিশেষ একটা প্রচলন নেই। ঢাকা ক্লাব, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) এবং দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও ক্যান্টনমেন্টগুলিতে স্কোয়াশ কোর্ট রয়েছে। স্কোয়াশে শৌখিন ও পেশাদার দু'ধরনের খেলা হয়ে থাকে। ১৯৩০ সাল থেকে ওপেন চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯২২ সাল থেকে অ্যামেচার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পাকিস্তান (দ্র) বহু বছর ধরে এই খেলায় শীর্ষ স্থানে রয়েছে।

কা. আ. আ.

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া (Scandinavia) কোনো দেশের নাম নয়; এটি ইউরোপ মহাদেশের উত্তরাঞ্চলে একটি এলাকার নাম।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বলতে ৬টি দেশ বোঝায় : ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং সুইডেন।

হা. মা.

স্টক্‌হোম্‌ শান্তি সম্মেলন

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল দুই পরাশক্তি আমেরিকা (দ্র) ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) তথা পুঁজিবাদ (দ্র) ও সমাজতন্ত্রের (দ্র) মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই (দ্র)। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের চেহারা কী দাঁড়াবে মূলত এই নিয়ে সংঘাত শুরু হলেও তা ক্রমশই বিশ্বব্যাপী প্রভাববলয় বিস্তারের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে জাপানের হিরোশিমা (দ্র) ও নাগাসাকি (দ্র) শহরের ওপর আণবিক বোমা ফেলে আমেরিকা পারমাণবিক যুগের সূচনা করে। রাশিয়া তখনো আণবিক বোমার অধিকারী হয় নি, কিন্তু প্রস্তুতি চলছিল আণবিক বোমা তৈরির। পরমাণু বোমার (দ্র) ব্যাপক ধ্বংসক্ষমতা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া বিচারে এই অস্ত্র ছিল প্রচলিত সব রকম ধ্বংসাস্ত্রের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বন্দ্বসংঘাতের পটভূমিকায় আণবিক বোমা যে কোনো মুহূর্তে মানবসভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

এমনি পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিবেকবান মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী প্রমুখ ব্যক্তি শান্তির সপক্ষে জোরদার বক্তব্য তুলে ধরেন ও পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের দাবি জানান। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে সুইডেনের রাজধানী স্টক্‌হোল্‌ম্‌ (Stockholm) শহরে এক শান্তি সম্মেলন শেষে প্রকাশিত হয় স্টক্‌হোম্‌ ঘোষণা। (শহরটির নাম স্টকহোল্‌ম্‌ হলেও বাংলায় আমরা স্টক্‌হোম্‌ লিখে থাকি।) নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি পরমাণুবিজ্ঞানী ফ্রেদেরিক্‌ জোলিও-কুরি (দ্র) ছিলেন এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। পরমাণু বোমার অধিকারী দেশ অস্ত্র সংবরণ করবে এবং আর কোনো দেশই আণবিক বোমা তৈরিতে অগ্রসর হবে না এই ছিল ঘোষণার মূল বক্তব্য।

১৯শে মার্চ স্টক্‌হোমের একটি রেস্তোরাঁর ছোট কক্ষে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় স্টক্‌হোম্‌ ঘোষণা। শান্তি ও

www.pathagar.com

নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান সম্বলিত এই ঘোষণার প্রতি সমর্থনে স্বাক্ষরসংগ্রহ অভিযান পরিচালিত হয়। তৎকালীন পূর্ববাংলায় ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে এই ঘোষণা প্রচার ও স্বাক্ষর সংগ্রহে প্রচুর উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। বিশ্বব্যাপী স্টক্হোম্ ঘোষণার পক্ষে ৫০ কোটি স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। যদিও স্টক্হোম্ ঘোষণা পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ করতে পারে নি, তবুও এই সুবাদে গড়ে ওঠে জোরদার শান্তি-আন্দোলন। শান্তির সপক্ষে জনমতের এমনি প্রকাশ কোরিয়া যুদ্ধে আণবিক অস্ত্র ব্যবহার থেকে আমেরিকাকে বিরত রেখেছিল। পরবর্তী কালের শক্তিশালী শান্তি আন্দোলনের জন্য বিশেষ প্রেরণা ছিল স্টক্হোম্ ঘোষণা।

ম. হ.

স্টিভেন্সন, রবার্ট লুই [১৮৫০—১৮৯৪]

দিকপাল ইংরেজ সাহিত্যিক। তিনি ইংল্যাণ্ডের এডিনবরায় ১৮৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

রবার্ট লুই স্টিভেন্সনের (Robert Louis Stevenson) পিতা ছিলেন পেশায় এক জন প্রকৌশলী। পিতার ইচ্ছায় ১৮৬৭ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগে ভর্তি হন। পরে তিনি বিভাগ পরিবর্তন করে আইন অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ১৮৭৫ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করেন।

স্টিভেন্সনের সাহিত্যচর্চার সূচনা ছাত্রজীবনে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িকী ও 'পোর্টফোলিও' নামের একটি সাময়িকীতে কিছু রচনা প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্যিক মহলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

শারীরিকভাবে স্টিভেনসন কখনোই তেমন সুস্থ ছিলেন না। ছোটবেলায় তিনি ফুসফুসের (দ্র) যক্ষ্মা (দ্র) রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগ উপশমের জন্য ঘন ঘন সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সব ভ্রমণঅভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বেশ কিছু সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৭৯ সালে স্টিভেন্সন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ক্যালিফোর্নিয়ায় যান এবং বেশ কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। ১৮৮০ সালে এক মার্কিন মহিলাকে বিয়ে করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন।

১৮৮৮ সালে তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করেন এবং সেখানকার সামোয়া দ্বীপে যাত্রাবিরতি করেন। এই দ্বীপটি তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সহায়ক হওয়ায় এখানেই তিনি জায়গাজমি কিনে বসবাস করতে শুরু করেন, স্বাস্থ্যও ফিরে পান সাময়িকভাবে। সামোয়া দ্বীপেই তিনি ১৮৯৪ সালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মারা যান।

ছোটগল্প (দ্র), উপন্যাস (দ্র), প্রবন্ধ (দ্র), ভ্রমণকাহিনী, আত্মজীবনীমূলক রচনা, নাটক (দ্র) ও কবিতা (দ্র) —সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর পদচারণা ছিল স্বচ্ছন্দ। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ইংল্যাণ্ড ভয়েজ', 'ট্রাভেল্স্ উইথ্ এ ডাঙ্কি', 'ফেমিলিয়ার স্টাডিজ অব মেন অ্যাণ্ড বুক্স্', 'দ্য নিউ অ্যারাবিয়ান নাইট্স্', 'প্রিন্স ওট্টো', 'দ্য মেরি মেন', 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড', 'দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড' (দ্র), 'কিড্ন্যাপ্ড্', 'দ্য ব্ল্যাক অ্যারো', 'ইন দ্য সাউথ সিস্', 'এ ফুটনোট টু হিস্ট্রি', 'এ চাইল্ডস্ গার্ডেন অব ভার্স্' এবং 'আণ্ডার উড্স্' উল্লেখযোগ্য।

আ. হ.

স্টেইনলেস স্টিল ক্রোমিয়াম দ্র

স্টেথোস্কোপ (stethoscope)

রোগ (দ্র) নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে শরীরের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে হৃৎপিণ্ড (দ্র), ফুসফুস (দ্র), অন্ত্র (দ্র), ধমনী (দ্র), শিরা (দ্র) ইত্যাদিতে উৎপন্ন বিশেষ ধরনের শব্দ শোনার জন্য স্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

ফরাসি চিকিৎসক রনে তেওফিল্ লেনেক্ (René Theophile Laënnec : 1781-1826) ১৮১৬ সালে একটি ফাঁপা কাঠের নলের সাহায্যে প্রথম স্টেথোস্কোপ নির্মাণ করেন। সেটি ছিল স্টেথোস্কোপের আদি রূপ। পরে এর নানা রূপান্তর ঘটেছে। আধুনিক স্টেথোস্কোপে একটি নমনীয় রাবারের নল থাকে। নলের এক প্রান্ত ইয়ার পিস (ear piece) নামক শ্রবণযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ইয়ার পিস অংশটি কানে লাগিয়ে শব্দ শোনা হয়। রাবারের নলের অন্য

www.pathagar.com

প্রান্ত চেস্ট পিস (chest piece) নামক অংশের সঙ্গে যুক্ত। শরীরের কোনো স্থানের শব্দ শোনার জন্য সে স্থানে চেস্ট পিস স্থাপন করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের চেস্ট পিসবিশিষ্ট *স্টেথোস্কোপ* পাওয়া যায়। ঘণ্টাকৃতি এবং এক প্রান্ত খোলা চেস্ট পিসযুক্ত *স্টেথোস্কোপে* নিম্ন কম্পাঙ্কের (দ্র) শব্দ ভাল শোনা যায়। কম্পাঙ্কের শব্দ শোনার জন্য অর্ধকঠিন পর্দাযুক্ত চাকতি আকৃতির চ্যাপ্টা চেস্ট পিস ব্যবহৃত হয়। এই দু'জাতীয় চেস্ট পিস বিশেষ পদ্ধতিতে একই *স্টেথোস্কোপে* সমন্বয়ের মাধ্যমে আধুনিক *স্টেথোস্কোপ* নির্মিত হয়েছে, যা হৃৎপিণ্ডের বিশেষ শব্দ শোনার জন্য কার্যকর। অতি সম্প্রতি *স্টেরিওস্কোপিক স্টেথোস্কোপ* নামে এক ধরনের অত্যাধুনিক *স্টেথোস্কোপ* আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি এখনো বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে নি।

সি. না. হ.

স্টেফি গ্রাফ্ [১৯৬৯—]

খ্যাতিমান টেনিস (দ্র) খেলোয়াড়। গ্রাফের (Steffi Graf) জন্ম ১৪ই জুন ১৯৬৯; ব্রুল, জার্মানিতে। ৭/৮ বছর বয়স থেকে টেনিসের প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। ১০ বছর বয়স থেকে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট খেলা শুরু করে ১৮ই অক্টোবর ১৯৮২ সালে পেশাদার টেনিসে অবতীর্ণ হন। প্রথম গ্রাণ্ড স্লাম শিরোপা ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ী হন ১৯৮৭ সালে। ১৯৯৩ সালের উইম্বল্ডনসহ মোট ১২টি গ্রাণ্ড স্লাম শিরোপা জয় করেছেন।

১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালেও তিনি উইম্বল্ডন টেনিসে মহিলা এককের শিরোপা জয় করেছেন।

১৯৭০ সালের পর ১৯৮৮ সালের এক বর্ষপঞ্জিতে ৪টি গ্রাণ্ড স্লাম শিরোপাজয়ী প্রথম মহিলা। একই বছর সিউল অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জিতে গোল্ডেন গ্রাণ্ড স্লামের মর্যাদা লাভ করেন।

১৯৯১ সালে লাইপ্‌ৎজিগ্ টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউণ্ডে জয় ছিল সর্বকনিষ্ঠা খেলোয়াড় (২২ বছর ৩ মাস) হিসাবে ৫০০তম ম্যাচ জয়ের রেকর্ড।

১৯৯১ সালে সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি অর্থ উপার্জনকারী ক্রীড়াবিদদের তালিকায় ষোড়শ, মহিলা ক্রীড়াবিদদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন।

টেনিস র‍্যাংকিংয়ে ১৯৮৭ সালের ১৭ই আগস্ট থেকে ১৯৯১ সালের ১০ই মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮৬ সপ্তাহ শীর্ষস্থানে অবস্থানের রেকর্ড করেন, যা কোনো পুরুষ খেলোয়াড়ের পক্ষেও সম্ভব হয় নি।

এই পর্যন্ত আয় করেছেন প্রায় ১ কোটি মার্কিন ডলার (বাংলাদেশের টাকায় প্রায় ৪২ কোটি)।

অ. ব.

www.pathagar.com

স্টেরিও (stereo)

স্টেরিও বলতে আসলে স্টেরিওফোনিক শব্দকেই (stereophonic sound) বোঝানো হয়।

মানুষের দুটো কান। যে কোনো শব্দ দুই কানে পৌঁছানোর মধ্যে সময়ের সামান্য হেরফের ঘটে। সময়ের এই হেরফের এবং দুই কানে শব্দের প্রাবল্য থেকে মানবমস্তিষ্ক শব্দের উৎসকে শনাক্ত করতে পারে। মানবমস্তিষ্ক এক মিলিসেকেণ্ডেরও কম সময়ের হেরফের বুঝতে পারে।

স্টেরিওফোনিক শব্দ হল শব্দ ধারণ (recording) বা প্রেরণের (transmission) এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে শব্দকে দুই বা ততোধিক মাইক্রোফোনের সাহায্যে ধারণ করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে দুটো স্পিকারের সাহায্যে পুনরায় শ্রোতার কানে পৌঁছানো হয়। দু'টি মাইক্রোফোনের শব্দের প্রাবল্য আলাদা। আবার, অবস্থানের কারণে শব্দ দু'টি মাইক্রোফোনে পৌঁছাতে ভিন্ন সময়ের প্রয়োজন। এভাবে শ্রোতার দুই কানের সিম্যুলেশন তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে ঐ ধারণকৃত শব্দ পুনঃসৃষ্টি করা হলে শ্রোতা সহজে শব্দের উৎসকে চিহ্নিত করতে পারে।

স্টেরিওফোনিক পদ্ধতিতে শব্দের প্রায় অবিকল প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হয়। সে জন্য বর্তমানে অডিও-ভিজুয়াল সিস্টেমে এই পদ্ধতির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মু. হা.

স্টো, হ্যারিয়েট বীচার আঙ্কল্ টম্স্ কেবিন দ্র

স্টোকার ব্রাম ড্রাকুলা দ্র

স্টোন্, লুসি ব্ল্যাকওয়েল [১৮১৮—১৮৯৩]

মার্কিন সমাজসংস্কারক ও নারী অধিকার আন্দোলনের অগ্রনায়িকা। লুসির (Lucy Blackwell Stone) জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ম্যাসাচুসেট্স্-এর পশ্চিম ব্রুকফিল্ডের কাছে ১৮১৮ সালের ১৩ই আগস্ট।

নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য থাকা উচিত—পিতার এই দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে লুসি ব্ল্যাকওয়েল স্টোন্ নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন এবং ১৮৪৭ সালে ওবেরলিন কলেজ থেকে স্নাতক হন। তিনিই প্রথম মার্কিন মহিলা, যিনি প্রকাশ্যে নারীর অধিকার নিয়ে বক্তৃতা করেন।

'অ্যান্টি স্লেভারি সোসাইটি'র পক্ষ থেকে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার পাশাপাশি নারীর সমঅধিকারের দাবিতেও লুসি সমগ্র দেশ সফর করে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দেন। ১৮৫০ সালে ম্যাসাচুসেট্সের ওর্‌চেস্টারে অনুষ্ঠিত নারীর অধিকার সংক্রান্ত প্রথম জাতীয় সম্মেলনেরও তিনি ছিলেন এক জন সংগঠক।

১৮৫৫ সালে তিনি মহিলাদের ভোটাধিকারের দৃঢ় সমর্থক হেন্‌রি ব্ল্যাকওয়েলকে বিয়ে করেন। এরপর থেকে তিনি আইনের মাধ্যমে নারীসমাজের সমঅধিকার অর্জনের সংগ্রামে আত্মনিবেদিত হলেও লক্ষ্য অর্জনে প্রায়শ ব্যর্থ হন। ১৮৬৯ সালে মহিলাদের ভোটাধিকার সংক্রান্ত আমেরিকান সমিতি গড়ে তুলতে পালন করেন বিশেষ ভূমিকা।

১৮৭২ সালে তিনি এবং তাঁর স্বামী 'উওম্যান্স্ জার্নাল' নামের একটি সাময়িকী সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করেন। এই সাময়িকীই হয়ে ওঠে নারীর অধিকার বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের প্রধান বাহন।

১৮৯৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তিনি ম্যাসাচুসেট্সের ডর্‌চেস্টারে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

স্ট্যালিন্ স্তালিন, ইওসেফ্ দ্র

স্ট্রিণ্ডবার্গ্, আউগুস্ট [১৮৪৯—১৯১২]

ইউরোপীয় নাট্যজগতের এক জন প্রধান ব্যক্তিত্ব। স্ট্রিণ্ডবার্গ্ (August Strindberg)-এর রচিত নাটক বিংশ শতাব্দীর অভিব্যক্তিবাদী, পরাবাস্তববাদী, মনোবিশ্লেষণমূলক এবং অ্যাবসার্ড থিয়েটারের বিকাশে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে। সুইডিশ ভাষায় আধুনিক গদ্যরীতিরও তিনি জনক এবং আন্তর্জাতিক থিয়েটারে আধুনিকতার অগ্রদূত।

আউগুস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ্ ১৮৪৯ সালের ২২শে জানুয়ারি স্টক্‌হোল্‌মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য ও কৈশোর খুব সুখের ছিল না। এর জন্য দায়ী ছিল তাঁর পারিবারিক পরিবেশ। তিনি পরবর্তী কালে তাঁর এই জীবনকে এক জন বন্দির জীবন বলেই অভিহিত করেন।

স্ট্রিণ্ডবার্গ্-এর জীবনের মোড় ঘুরতে শুরু করে বিশ বছর বয়সের পর থেকে। উপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারার ব্যর্থতা, সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি

www.pathagar.com

নিয়ে তাঁর ভীতি, মঞ্চে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁর মনের আতঙ্ক এবং সাংবাদিকতার পেশাগত জীবনে তাঁর উত্থান-পতনময় অবস্থার প্রথম ক্ষতিপূরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় ১৮৭১ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত স্টক্‌হোল্‌মের কাইমেণ্ডো দ্বীপে বসবাসের সময়। এখানে বসেই তিনি এক বছরের মাথায় তাঁর জীবনের প্রথম নাটক 'মাস্টার ওলোফ'-এর (১৮৭২) খসড়া পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। এই ঘটনার পরপরই তিনি স্টকহোল্‌মের রয়্যাল লাইব্রেরির কর্মচারী হবার সুযোগ লাভ করেন। ১৮৭৯ সালে তাঁর সমাজ-সমালোচনামূলক বাস্তববাদী ধারার উপন্যাস 'দ্য রেড রুম' প্রকাশিত হলে লেখক হিসাবে তিনি স্বীকৃতি পান। লেখা থেকে প্রাপ্ত অর্থই তাঁর জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে।

১৮৮৩ সালে স্ট্রিণ্ডবার্গ স্বেচ্ছানির্বাসিতের জীবন বেছে নেন এবং সফর করেন ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, বাভারিয়া, ডেনমার্ক, এশিয়া (দ্র) এবং অস্ট্রিয়ার শহর ও পল্লী অঞ্চল। এই সময় তিনি নানা মানসিক ও আধ্যাত্মিক জটিলতার শিকার হন। অবশেষে ১৮৯৮ সালে তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্টক্‌হোল্‌মেই অতিবাহিত করেন।

স্ট্রিণ্ডবার্গ্‌-এর সাহিত্যজীবনের ব্যাপ্তি ৪০ বছরেরও বেশি। এই সময়ে তিনি ৬০টিরও বেশি নাটকের পাশাপাশি বেশ কিছু উপন্যাস (দ্র), ছোটগল্প (দ্র), প্রবন্ধ (দ্র), কবিতা (দ্র) ও ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। নাট্যতত্ত্ব ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থাদিও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-ফসলের অন্তর্গত।

স্ট্রিণ্ডবার্গ্‌-এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম : নাটক–'মিস জুলিয়া' (১৮৮৮), 'পাওনাদার' (১৮৮৮), 'মরণ-নৃত্য' (১৯০১), 'জনক' (১৮৮৭), 'স্বপ্নকথা' (১৯০২), 'দামেস্কের পথে' (১৮৯৮-১৯০৪), 'ভাসা নাট্যত্রয়ী' (১৮৯৮); উপন্যাস–'হেম্‌সোর বাসিন্দা' (১৮৮৭), 'শিখণ্ডী'; ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা 'কালো পতাকা' (১৯০৭) ইত্যাদি।

আউগুস্ট্‌ স্ট্রিণ্ডবার্গ্‌ স্টক্‌হোল্‌মে ১৯১২ সালের ১৪ই মে ক্যান্সারে (দ্র) মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ট্রপোস্ফিয়ার দ্র

স্তন্যপায়ী প্রাণী (mammals)

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণীদের মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীরাই সর্বাপেক্ষা উন্নত ও বুদ্ধিমান। পৃথিবীর সর্বত্র এরা বাস করে। বিজ্ঞানীদের মতে ১৮ থেকে ২২ কোটি বছর আগে, অর্থাৎ ট্রায়াসিক (Triassic) যুগে থেরাপ্‌সিড (Therapsid) নামক এক ধরনের মাংসাশী সরীসৃপজাতীয় প্রাণী থেকে উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট স্তন্যপায়ীগুলোর উৎপত্তি। প্রায় ৭ কোটি বছর যাবৎ এরাই পৃথিবীর অন্যতম প্রধান প্রাণিগোষ্ঠী। মানুষ এই গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। পৃথিবীর প্রায় ৪,০০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ীর মধ্যে বাংলাদেশে ১২০টির বাস।

স্তন্যপায়ীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্ত্রী-প্রাণী কর্তৃক সন্তানোৎপাদনের পর তাকে নিজের স্তননিঃসৃত দুধ পান করিয়ে বড় করে তোলা। এরাই একমাত্র প্রাণী যাদের দেহে লোম আছে। অবশ্য কিছু কিছু তিমি (দ্র)-র শুধু ভ্রূণাবস্থাতেই লোম থাকে। এদের মস্তিষ্ক বৃহদাকৃতির ও উন্নত ধরনের। চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডে (দ্র) অলিন্দ ও নিলয় দুটো করে। উটজাতীয় প্রাণী বাদে সকলের লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন। দেহের তন্ত্রসমূহ, যেমন অস্থি (দ্র)-তন্ত্র, পেশি (দ্র)-তন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র (দ্র), সংবহনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র, রেচনতন্ত্র (দ্র), পঞ্চেন্দ্রিয় ইত্যাদি উন্নত ধরনের। বেশিরভাগ প্রজাতির লেজ আছে। এরা সন্তানবৎসল। এরা সন্তানদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, আত্মরক্ষার কৌশল প্রভৃতি শিক্ষা দেয়।

প্রজাতিভেদে আকৃতি-ওজন-বর্ণে বিস্তর পার্থক্য। পিগমী শ্রু (shrew) ক্ষুদ্রতম প্রজাতি। মাত্র দু'গ্রাম। জলে বাসকারী নীল তিমি বৃহত্তম। প্রায় ত্রিশ মিটার লম্বা ও ওজন ২০০ মেট্রিক টন।

একেক ধরনের স্তন্যপায়ীর জীবনধারা একেক রকম। নিজ নিজ পরিবেশের সঙ্গে এরা সুন্দরভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কোনো কোনো প্রজাতি একাকী থাকে; বাকিরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। মানুষ সবচেয়ে সামাজিক প্রাণী। বেশির ভাগ প্রজাতিই স্থলে বাস করে। তিমি, ডলফিন (দ্র), সীল (দ্র) প্রভৃতি জলের অধিবাসী। মোলজাতীয় প্রাণীরা মাটির নিচে বাস করে। বাদুড়ই (দ্র) একমাত্র

www.pathagar.com

স্তন্যপায়ী যারা আকাশে উড়ে বেড়ায়।

একেক প্রজাতির খাদ্যাভ্যাস একেক রকম। কোনো কোনো প্রজাতি ঘাস-লতা-পাতা বা গাছজাতীয় খাদ্য খায়। যেমন— গরু (দ্র), ছাগল, ঘোড়া (দ্র), উট (দ্র), হাতি (দ্র) ইত্যাদি। কেউ কেউ মাংসাশী। যেমন— বাঘ (দ্র), সিংহ (দ্র), কুকুর (দ্র), সীল ইত্যাদি। শ্রূ, পিপীলিকাভুক, বাদুড় ইত্যাদি কীটপতঙ্গ (দ্র) খায়। মানুষ, ভালুক, শূকর প্রভৃতি প্রাণী সর্বভুক।

প্রজননের ওপর ভিত্তি করে স্তন্যপায়ী তিন ধরনের: ১. গর্ভফুলসম্পন্ন স্তন্যপায়ী (Placental mammals) —এ দলের স্ত্রী-প্রাণীরা নির্দিষ্ট সময় গর্ভধারণের পর সাধারণত পূর্ণ বিকশিত এক বা একাধিক বাচ্চা প্রসব করে। সোনালি হ্যামস্টার সর্বনিম্ন ১৬ দিন এবং হাতি সর্বোচ্চ ৬৫০ দিন গর্ভধারণ করে। মানুষসহ বেশির ভাগ প্রজাতি এ দলের সদস্য। ২. থলেযুক্ত স্তন্যপায়ী (Marsupial mammals)—এরা সাধারণত ১৩ থেকে ৩৮ দিন গর্ভধারণের পর একেবারে অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করে। এরপর বাচ্চারা পূর্ণবিকশিত হওয়া পর্যন্ত মায়ের থলেতে থাকে ও দুধ পান করে। ক্যাঙ্গারু (দ্র), কোয়ালা (দ্র), অপোসাম প্রভৃতি এ জাতীয় প্রাণী। ৩. ডিমপাড়া স্তন্যপায়ী (Egg-laying mammals) —এরা আদিম প্রকৃতির স্তন্যপায়ী। সরীসৃপের (দ্র) মতো ডিম পাড়ে। ৮–১৩ দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে মায়ের দুধ পান করে। অস্ট্রেলিয়াবাসী একিড্না ও প্লাটিপাস এ জাতীয় প্রাণী।

প্রজাতিভেদে স্তন্যপায়ীদের জীবনকাল কম-বেশি হয়। শ্রূ, ইঁদুর (দ্র) জাতীয় প্রাণীরা ১–২ বছর, বাঘ-সিংহ ২০–২৫, হাতি ৫০–৮০, মানুষ ১০০ বা আরো বেশি বছর বাঁচে।

সৃষ্টির সেরা জীবন মানুষ জীবনধারণের জন্য অন্যান্য স্তন্যপায়ীর ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। মানুষ কোনো কোনো প্রজাতিকে পোষ মানিয়েছে। এদের কাছ থেকে অন্ন, বস্ত্র, শক্তি, বাহন, চিত্তবিনোদনসহ অনেক উপকার পাচ্ছে। তবে, মানুষের কারণেই আবার অনেক স্তন্যপায়ী বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আ. ন. ম. আ. র.

স্তাঁদাল্ [১৭৮৩—১৮৪২]

ফরাসি ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রকৃত নাম অঁরি মারি বেইল (Henri Marie Beyle)। তবে স্তাঁদাল (Stendhal) নামের আড়ালে তাঁর পারিবারিক নাম ঢাকা পড়ে গেছে।

স্তাঁদাল্ ১৭৮৩ সালের ২৩শে জানুয়ারি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক জন বিত্তশালী আইনজীবী। সাত বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারান। ফলে তাঁর শৈশব ও কৈশোর তেমন সুখের ছিল না।

১৭৯৯ সালে স্তাঁদাল্ প্যারিসের (দ্র) পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। কিন্তু ধরাবাঁধা ক্লাস করার চেয়ে নাট্যকার হবার কল্পনা এই সময় তাঁকে পেয়ে বসে। এই রকম মানসিক অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন তাঁর এক আত্মীয়। এ সময় ইতালিতে অবস্থানকারী নেপোলিয়নের (দ্র) নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর একটি উচ্চ পদে তিনিই তাঁকে চাকুরি পেতে সাহায্য করেন।

সমরকর্তা হিসাবে স্তাঁদাল্ অধিকৃত ইতালির জনজীবন ও সমাজপরিপার্শ্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। পাশাপাশি নেপোলিয়নের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর প্রুশিয়া অভিযান ও তাদের দ্বারা মস্কো নগরীর বহ্ন্যুৎসবের প্রতিক্রিয়া তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্যজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

রোম সাম্রাজ্যের অবসানের পর স্তাঁদাল্ চলে আসেন মিলানে। এখানে তিনি অবস্থান করেন ১৮১৪ থেকে ১৮২১ সাল পর্যন্ত। এর পর তিনি ফিরে আসেন প্যারিসে।

জীবিতকালে স্তাঁদালের সাহিত্যকর্ম পাঠক ও সমালোচকদের চরম উপেক্ষার শিকার হয়। অবশ্য মৃত্যুর পর মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে 'মহান পুরোধা' হিসাবে যে স্বীকৃতি তিনি লাভ করেন, আজও তা অম্লান। ঐতিহাসিক বিস্তৃতি, আত্মজৈবনিক রীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিগত উজ্জ্বলতায় তাঁর প্রতিটি রচনাকর্ম বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

স্তাঁদালের উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম : 'হেইড্ন্, মোৎসার্ট ও মেতাস্তাসিওর জীবনী', 'ইতালীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাস', 'রোম, নেপ্ল্স্ ও ফ্লোরেন্স্', আত্মজীবনী বিষয়ক রচনা— 'ভালবাসা বিষয়ে', 'রস্সিনির জীবনকথা', 'রোমে ঘুরে বেড়ানো', 'পর্যটকের স্মৃতিচারণ' ইত্যাদি। তাঁর সবচেয়ে

www.pathagar.com

বিখ্যাত উপন্যাস : 'লাল এবং কালো'। ১৮৩০ সালে সংঘটিত বিপ্লবের পর স্তাঁদাল্ পুনরায় সরকারি চাকুরিজীবনে ফিরে আসেন। এক জন সাধারণ কন্সুলারের পদে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ১৮৪২ সালের ২৩শে মার্চ তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

স্তালিন, ইওসেফ [১৮৭৯—১৯৫৩]

প্রকৃত নাম 'উওসেফ্ ভিসারিওনভিচ্ জুগাশ্-ভিলি'। আমাদের দেশে জোসেফ্ স্তালিন বা স্ট্যালিন নামে পরিচিত। রুশ কমিউনিস্ট একনায়ক। ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের সময় লেনিনের (দ্র) অন্যতম প্রধান সহচর ছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) এবং কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে কর্তৃত্বময় ও প্রভাবশালী নেতা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

জন্ম ১৮৭৯ সালে, জর্জিয়ায়। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় তিনি লেনিনের প্রভাবে বলশেভিক মতবাদে দীক্ষিত হন। বৈপ্লবিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার পর তিনি 'স্তালিন্' (অর্থাৎ ইস্পাতের তৈরি) ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। বলশেভিক বিপ্লবের পর স্তালিন ১৯২২ সালে বলশেভিক দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর কামিনিয়েভ ও জিনোভিয়েভের সঙ্গে যৌথভাবে লেনিনের স্থলাভিষিক্ত হন। প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রৎস্কি ও জিনোভিয়েভ্কে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করে ১৯২৭ সালে তিনি পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই নের্তৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের অন্যতম ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জার্মান-সোভিয়েত অনাক্রমণ চুক্তি, পট্স্ডাম সম্মেলনে রুশ প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। স্বদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে চাঙ্গা করার জন্য স্তালিন্ তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত করে প্রশংসিত হন।

১৯৫৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে আমলাতন্ত্রের প্রবর্তক হিসাবে স্তালিনের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। তবে লেনিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনর্গঠনে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

টি. কি.

স্তোত্রকাব্য কাব্য দ্র

স্থবিরবাদ থেরবাদ দ্র

স্থায়ী

গানের বা গতের অংশবিশেষের নাম। ধ্রুপদীয় ধারার গানে বা গতে চারটি অংশ বা তুক্ বা ধাতু থাকে। অধ্রুপদীয় গানে বা গতে দু'টি তুক্ থাকে। তবে সর্বক্ষেত্রেই স্থায়ী প্রথম তুক্। স্থায়ীতে গান বা গৎ যেমন আরম্ভ হয়, তেমনি সমাপ্তির সময়ও গায়ক বা বাদক স্থায়ীতে ফিরে আসেন।

ক. গো.

স্নায়ুতন্ত্র (nervous system)

মস্তিষ্ক (দ্র), সুষুম্নাকাণ্ড (দ্র) ও স্নায়ু দ্বারা গঠিত আমাদের স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্রটি যেন সেনাপতিদের দপ্তর। এর আছে 'অনুসন্ধান বিভাগ', এটি সংবাদ সংগ্রহ করে; আছে 'বাহক বিভাগ', এটি বিভিন্ন অংশে নির্দেশ পৌছে দেয়। আর আছে 'প্রধান দপ্তর', যেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অসংখ্য স্নায়ুর জাল দিয়ে ঘেরা যে স্নায়ুতন্ত্র, এর প্রধান হল মস্তিষ্ক বা মগজ। করোটির ভেতরে পাতলা ঝিল্লি আবরণে ঢাকা নরম, স্পঞ্জের মতো, পাটল ধূসর বর্ণের নারকেলের মতো দেখতে এই মস্তিষ্কের ওজন ৪০-৬০ আউন্স। এর আছে দুটো গোলার্ধ। মস্তিষ্কের আছে চিন্তা করার ক্ষমতা, সংবাদ যাচাই করার ক্ষমতা। দেহের ঐচ্ছিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণও এর কাজ। সুষুম্নাশীর্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্নায়ু মিলে গঠন করে 'কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র'। চেতনমনের কাজগুলোকে এটি নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত আছে কিছু স্নায়ু, যা জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে সংবাদ নিয়ে যায় মস্তিষ্কে, আবার এমন কিছু স্নায়ু আছে যেগুলো মস্তিষ্ক থেকে নির্দেশ নিয়ে যায় পেশিতে। মস্তিষ্কের আরো কাজ হল দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কাজ পরিচালনা করা এবং দেহের ভেতরের যন্ত্রগুলোর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা।

www.pathagar.com

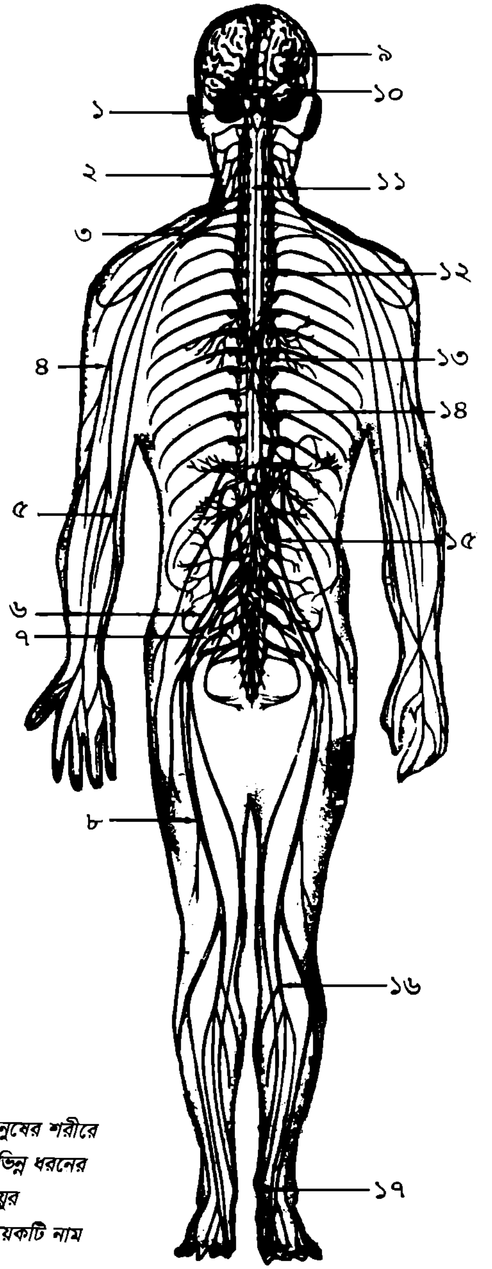

মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুর কয়েকটি নাম

১. সেরিবেলাম, ২. সারভিকাল প্লেক্সাস, ৩. ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস, ৪. র‍্যাডিয়াল নার্ভ, ৫. আলনার নার্ভ, ৬. ফিমুরাল নার্ভ, ৭. স্যাকরাল নার্ভ, ৮. সিয়াটিক নার্ভ, ৯. ফ্রন্টাল লোব, ১০. টেম্পোরাল লোব, ১১. স্পাইনাল কর্ড, ১২. ভেগার্স নার্ভ, ১৩. সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, ১৪. ইসোফেজিয়াল প্লেক্সাস, ১৫. লুম্বার প্লেক্সাস, ১৬. টিবিয়াল নার্ভ, ১৭. সুরাল নার্ভ

শরীরের মেরুদণ্ডের ৩৩টি অস্থির ভেতরের সুড়ঙ্গে আছে যে দীর্ঘ রজ্জু তার নাম 'সুষুম্নাকাণ্ড'—মগজের সঙ্গে দেহযন্ত্রের যোগাযোগ রক্ষা এর কাজ। দৈর্ঘ্য ১৮ ইঞ্চি। এই কাণ্ড থেকে কিছুদূর পর পর বেরিয়ে এসেছে সংজ্ঞাবহ ও চালক স্নায়ুর জোড়—দেহের নানা অংশে এদের বিস্তার। সংজ্ঞাবহ স্নায়ু দেহের বিভিন্ন চেতনা—যেমন চাপ, উত্তাপ, বেদনা, দৃষ্টি, গন্ধ, শব্দ ইত্যাদির সঙ্কেত নিয়ে আসে সুষুম্নাকাণ্ডে ও মস্তিষ্কে। চালকস্নায়ু সেখান থেকে নির্দেশ নিয়ে আসে দেহের পেশিতে কাজের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। দেহের প্রতিক্রিয়া-প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে (দ্র) সম্পন্ন করে সুষুম্নাকাণ্ড। এ ছাড়াও কিছু স্নায়ু আছে যেগুলো স্বয়ংক্রিয়। এরা দেহের ভেতরের যন্ত্রগুলোর তদারকি করে, যেমন—শ্বাসপ্রশ্বাস, পরিপাক, ঘাম ক্ষরণ—এ ধরনের কাজকর্ম। এদের বলা হয় স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম)।

স্নায়ুতন্ত্রের একক হল 'স্নায়ুকোষ'। ১২ জোড়া করোটি স্নায়ু, ৩১ জোড়া মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুব্যবস্থা মিলে প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। স্নায়ুচেতনা বহনের জন্য বিশেষ দুটো অঙ্গ 'এক্সোন' ও 'ডেনড্রাইট'। ডেনড্রাইট জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে সংবাদ নিয়ে আসে স্নায়ুকোষে, সেখান থেকে দীর্ঘ এক্সোন একে পৌঁছে দেয় অন্য স্নায়ুকোষে। এভাবে চলতে থাকে সংবাদ বহনের শৃঙ্খল।

স্নায়ুর জাল দেহের প্রতিটি অঙ্গ, এমনকি কোষ পর্যন্ত বিস্তৃত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্র পর্যন্ত এক জটিল সংযোগব্যবস্থা দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। পরীক্ষার আগে হাত যখন ঘামে ভিজে জব্‌জবে হয়ে যায়, তখন আমরা বুঝি আমাদের ঘর্মগ্রন্থির সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে মগজের। শরীরের বিভিন্ন অংশের সমন্বিত কাজ, চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ—এমনিধারা কত কাজই না করতে হয় স্নায়ুতন্ত্রকে। এর অনেক কিছুর ভিতরের রহস্য এখনো আমাদের অজানা।

স্নায়ুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ রোগের মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্কপ্রদাহ, মেনিঞ্জাইটিস (দ্র), এপিলেপ্‌সি বা মৃগীরোগ (দ্র), পক্ষাঘাত (দ্র), পার্কিন্সনরোগ, জলাতঙ্ক (দ্র), ক্যান্সার (দ্র)-সহ বিভিন্ন ধরনের টিউমার (দ্র)।

শু. চৌ

www.pathagar.com

স্নায়ুযুদ্ধ / ঠাণ্ডা লড়াই

সত্যিকার কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়েও বিভিন্ন দেশ বা রাষ্ট্র প্রতিযোগিতামূলকভাবে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং একে অপরকে দুর্বল করতে গিয়ে যে অবস্থা বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তাকেই স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই (cold war) বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর থেকে বিশ্ব দু'টি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ধনবাদের অনুসারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), গ্রেট ব্রিটেন (দ্র), ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের অনুসারী সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, রোমানিয়া প্রভৃতি পূর্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ। এই দুই শিবিরের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়, তা-ই 'ঠাণ্ডা লড়াই' নামে পরিচিত।

মধ্যপ্রাচ্য (দ্র), আফ্রিকা (দ্র) ও এশিয়ার (দ্র) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্যের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারই ছিল উল্লিখিত দুই শিবিরের রাজনৈতিক লক্ষ্য। অবশ্য ১৯৮৫ সালের পর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর থেকে ধনবাদী বিশ্বের সঙ্গে এইসব দেশের সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমঝোতামূলক বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের ভেতর দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াইজনিত পরিস্থিতির অবসান ঘটেছে।

আ. হু.

স্পঞ্জ (sponge)

স্পঞ্জ পরিফেরা (porifera) পর্বের জলজ প্রাণী। লাতিন শব্দ 'পরিফেরা' অর্থ ছিদ্রবাহক। ছিদ্রময় দেহের স্পঞ্জগুলো সূচাকৃতি, কাঁচদণ্ডাকৃতি বা শক্ত আঁশের কঙ্কাল নিয়ে গঠিত। একাকী বা দলবদ্ধভাবে সমুদ্রতলে কোনো প্রাণী, গাছ বা জড় পদার্থের গায়ে যুক্ত থাকে। প্রাপ্তবয়স্কগুলো নড়াচড়ায় অক্ষম, দেখতে গাছের মতো। তাই পূর্বে অনেকে গাছ মনে করত। কিন্তু, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন এরা প্রাণী। এরাও প্রাণীর মতো খাদ্য খায়; উদ্ভিদের মতো নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না।

পৃথিবীতে প্রায় ৫,০০০ প্রজাতির স্পঞ্জ আছে। অধিকাংশই সামুদ্রিক; অল্প ক'টি মিঠা পানিতে বাস করে। সব সমুদ্রেই এদের দেখা যায়, তবে উষ্ণ পানিতে বেশি থাকে। কোনো কোনোটা সমুদ্রপৃষ্ঠের ৮,৫০০ মিটার গভীরেও বাস করে।

এদের মাথা, হাত বা অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। নালা ও কুঠুরির সমন্বয়ে গঠিত ওয়াটার-কারেন্ট সিস্টেমে সব কাজ সম্পন্ন করে। এ পদ্ধতিতে পানিপ্রবাহের মাধ্যমে জীবিত, মৃত শেলফিশ (Shellfish) ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী খায়।

স্পঞ্জ আঙ্গুলাকৃতি, ঝোপঝাড়ের মতো, নলাকার বা চ্যাপ্টাকৃতির হয়ে থাকে। প্রজাতিভেদে ০.০১-২ মিটার হয়। সামুদ্রিকগুলো হলুদ, কমলা, বেগুনি, ধূসর বা বাদামি। স্বাদু পানির স্পঞ্জগুলো সবুজ, বেগুনি বা ধূসর।

এরা উভলিঙ্গ। যৌন ও অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। বছরে ১-২ বার প্রজনন করে। প্রথমে লার্ভার জন্ম হয়। লার্ভা সাঁতরে কোনো অবলম্বনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এরপর বড় হতে থাকে। ছোট প্রজাতিগুলো ১ বছর, বড়গুলো ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

স্পঞ্জ নিত্যনৈমিত্তিক বহু কাজে লাগে। উন্নত দেশগুলোতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এদের চাষ হয়। কৃত্রিমভাবেও স্পঞ্জ তৈরি হয়ে থাকে।

আ. ন. ম. আ. র.

স্পারসো বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর-অনুধাবন প্রতিষ্ঠান দ্র

স্পার্টাকাস্ [? —খ্রি. পূ. ৭১]

খ্রিস্টপূর্ব ৭৪ থেকে ৭১ অব্দ সময়সীমার ভেতরে রোমে (ইতালি) সংঘটিত দাসবিদ্রোহের নেতা। স্পার্টাকাস্ (Spartacus) নামটির প্রকৃত উচ্চারণ স্পার্তাকুস; তিনি ছিলেন এক জন থ্রেসিয়ান বংশোদ্ভূত দাস।

প্রাচীন ইতিহাসবিদগণ স্পার্টাকাস্‌কে এক জন প্রতিভাবান, রণকুশলী ও দক্ষ সংগঠক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। রোমের ভাড়াটে বাহিনীতে যোগ দিতে অসম্মতি জানালে তাঁকে পেশাদার মল্লযোদ্ধা (গ্ল্যাডিয়েটর) নিযুক্ত করা হয়।

কাপুয়ায় অবস্থিত মল্লযোদ্ধাদের (এদের বিভিন্ন দেশ থেকে দাস হিসাবে আনা হত) প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় (এইসব

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় ছিল আসলেই বন্দিশালা বিশেষ) থেকে রোমান শাসকদের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ অপর ৭০ জন মল্লযোদ্ধাসহ পলায়নের মধ্য দিয়ে স্পার্টাকাস্ দাসবিদ্রোহের সূচনা করেন। তাঁরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন প্রথমে মাউন্ট ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির নির্বাপিত গুহায় এবং সেখানে গড়ে তোলেন দুর্গের মতো একটি শিবির। ক্রমে স্পার্টাকাসের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষকেরাও তাতে অংশ নেয়। ফলে ভীত হয়ে পড়ে রোমের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক ও দাস-মালিকেরা। তাই স্পার্টাকাসের নেতৃত্বাধীন এই বিদ্রোহ দমনে অনতিবিলম্বে ৩ হাজার সদস্যবিশিষ্ট একটি রোমান সেনা ইউনিট পাঠানো হয়। তারা মাউন্ট ভিসুভিয়াস ঘিরে ফেলে। কিন্তু স্পার্টাকাস্ তাঁর অনুগত বাহিনীসহ বুনো আঙুরলতার মই বানিয়ে পাহাড়ের যে অংশে রোমানেরা তাদের বাহিনী মোতায়েন করে নি সেখানে অবতরণ করে দ্রুত আক্রমণে রোমক সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহী দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭০ হাজারে। কারো মতে, এই সংখ্যা ছিল ১ লাখ। অচিরেই দাসবিদ্রোহ কাস্পানিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

দাসবিদ্রোহীদের হাতে রোমান সৈন্যরা মোট ৭ বার পরাজিত হয়। দাসবিদ্রোহের নেতা স্পার্টাকাসের অভিপ্রায় ছিল, দাসেরা ইতালি ত্যাগ করে তাদের স্ব-স্ব দেশে ফিরে যাক অথবা ইতালির বাইরে গিয়ে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি গড়ে তুলুক। কিন্তু এই প্রশ্নে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ফলে স্পার্টাকাস্ ঠিক করেন, তাঁর বাহিনীসহ তিনি ইতালির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে সিসিলি দ্বীপে যাবেন এবং সেখানেই গড়ে তুলবেন মুক্ত, স্বতন্ত্র এক আবাসভূমি।

কিন্তু লুকানিয়ার কাছে রোমান সেনাধ্যক্ষ মার্কুস লিসিনিয়াস ক্রাসাসুসের নেতৃত্বাধীন বিশাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধে স্পার্টাকাস খ্রিস্টপূর্ব ৭১ সালে নিহত হন। এরপর সেনাধ্যক্ষ ক্রাসাসুস ও পম্পে কাপুয়া থেকে রোম অভিমুখী পথ বরাবর তাদের হাতে ধৃত স্পার্টাকাসের অনুগত বিদ্রোহী ৬ হাজার দাসকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। অন্য দিকে লড়াই শেষে স্পার্টাকাসের শিবিরে ৩ হাজার বন্দি রোমানকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়।

দাসবিদ্রোহের নেতা স্পার্টাকাস্ রোমানদের নিষ্ঠুর আচরণ ও অমানবিক নীতির বিরুদ্ধে সেই দূর অতীতে যে বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিলেন, ইতিহাসের পাতায় তা নির্যাতিত মানুষের প্রথম সক্রিয় সুসংগঠিত প্রতিবাদ তথা দাসবিদ্রোহ নামে পরিচিত।

স্পার্টাকাসের জীবন ও সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে 'স্পার্টাকাস্' নামের একটি বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেন মার্কিন সাহিত্যিক হাওয়ার্ড্ ফাস্ট্ (দ্র)।

আ. হ.

স্পিনোজা, বারুক্ [১৬৩২-১৬৭৭]

সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় বস্তুবাদী দার্শনিকদের অন্যতম। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হল্যাণ্ডে বারুক্ স্পিনোজা (Baruch Spinoza) জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তিনি ইহুদি। কিন্তু ইহুদিধর্মের (দ্র) অন্ধ প্রথা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য তাঁকে ১৬৫৬ সালে ইহুদি সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তবু তিনি মুক্তবুদ্ধি চর্চার আদর্শে অবিচল থাকেন।

স্পিনোজার দর্শনের প্রধান বিষয় জগতের স্বরূপ, স্রষ্টা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইত্যাদি। তিনি মনে করেন, সর্বস্থিতির মূলে রয়েছে এক সারবস্তু, যার নাম ঈশ্বর বা প্রকৃতি। মন, জড়বস্তু, সময় প্রভৃতি যা প্রতিভাত হয়, তা একই সত্তার প্রকাশ। জগৎ এবং বিধাতা—এ দুটোকে তিনি কখনো আলাদা মনে করেন নি। জগৎই অর্থাৎ বস্তুজগৎই একমাত্র সত্তা, জগৎ নিজেই নিজের কারণ এবং সৃষ্টি। জগতের মধ্যেই জগতের সৃষ্টির কারণ বিদ্যমান।

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে স্পিনোজা ছিলেন দার্শনিক দেকার্তের (Descartes) অনুসারী ও প্রজ্ঞাবাদী। তিনি মনে করেন, অভিজ্ঞতাগত বা ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়, এর সীমাবদ্ধতা আছে। বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞাগত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তাঁর মতে, জ্ঞানের লক্ষ্য হবে মানুষকে প্রকৃতির প্রভুতে পরিণত করা এবং মানুষের সার্বিক উন্নতি সাধন করা।

স্পিনোজার ধর্ম বিষয়ক অভিমতও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ ঘটানোর

www.pathagar.com

জন্যই ধর্ম। জীবন, জগৎ, সমাজ, ঈশ্বরসহ যাবতীয় বিষয়ে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে। ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তায় হস্তক্ষেপ বা তাকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার ধর্ম বা রাষ্ট্রযন্ত্রের নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের (দ্র) সমর্থক। তাঁর রচনাকর্মের মধ্যে 'এথিক্স', 'থিওলজিক্যাল-পলিটিক্যাল ট্রীটিজ', 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব দ্য ফিলসফি' ইত্যাদিগ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। ১৬৭৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুজ. ব.

স্পুৎনিক্

'স্পুৎনিক্' কথাটির অর্থ হল ভ্রমণের সঙ্গী। শব্দটি রুশ ভাষার। ইংরেজির অনুকরণে আমরা বাংলায় স্পুটনিক্‌ও লিখে থাকি। সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (দ্র) বা 'স্পুৎনিক্' উৎক্ষেপ প্রকল্প গ্রহণ করে এবং ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে পরপর তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উৎক্ষেপণ করে। স্পুৎনিক্‌গুলোর ওজন ছিল যথাক্রমে ৮৪, ৫১৯ ও ১,৩৫১ কিলোগ্রাম। এই স্পুৎনিক্ উৎক্ষেপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মহাশূন্যে অনুসন্ধান চালানো এবং সেখানে কোনো প্রাণী বাঁচতে পরে কিনা তা আবিষ্কার করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাশূন্যে 'কৃত্রিম উপগ্রহ' উৎক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলোতে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং আমেরিকাও (দ্র) মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ ও নভশ্চর (দ্র) পাঠাবার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

'স্পুৎনিক্' সর্বপ্রথম ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং এর মধ্যে একটি তাপমান যন্ত্র ও বেতারযন্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে এর ৯৫ মিনিট সময় লেগেছিল।

এক মাস পরে অর্থাৎ ৩রা নভেম্বর, ১৯৫৭ আধা টন ওজনের একটি 'স্পুৎনিক্' লাইকা নামের একটি জীবন্ত কুকুরসহ মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে এর ১০২ মিনিট সময় লেগেছিল। কুকুরটি দশ দিন বেঁচে ছিল এবং তাতে প্রমাণিত হয় যে বায়ুমণ্ডলের (দ্র) চাপ ও তাপের তারতম্য, ওজনহীনতা, অক্সিজেনের (দ্র) অভাব, অতিবেগুনি রশ্মি (দ্র), মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করলে মহাশূন্যেও প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। পরে 'বেল্‌কা' ও 'স্ত্রেল্‌কা' নামের দু'টি কুকুরকে 'স্পুৎনিকে'র

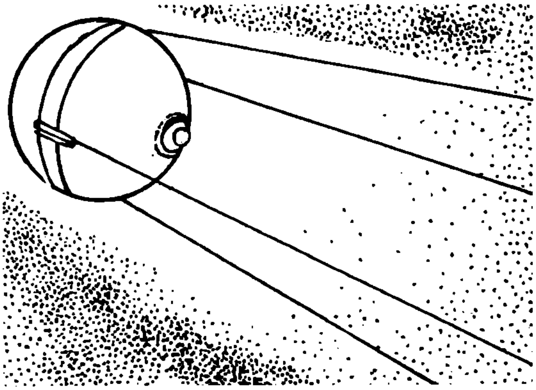

মাধ্যমে মহাশূন্যে পাঠানো হয় এবং এরা নিরাপদে জীবন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে সমর্থ হয়।

দেড় টন ওজনের 'স্পুৎনিক্'-৩ ১৯৫৮ সালের ১৫ই মে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই স্পুৎনিক্ নানা রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত ছিল যাতে মহাশূন্যের নানা ধরনের রশ্মির অস্তিত্ব ও পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

মু. এ.

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদীদের সামরিক নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা 'স্পেনের গৃহযুদ্ধ' (Spanish Civil War) নামে পরিচিত।

১৯৩১ সালে স্পেনের রাজা আল্‌ফন্সো ক্ষমতা ত্যাগ করার পর একটি প্রজাতন্ত্রী সরকার দেশ শাসন করতে থাকে। এই সরকারের যাজকবিরোধী নীতি ও বৈপ্লবিক কৃষি আইন দক্ষিণপন্থীদের চিন্তিত করে তোলে। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সমাজতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের বামপন্থী ফ্রন্ট জয়ী হয়। এই গণফ্রন্ট কিছু প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করলে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদীরা এর তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। ফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন মানুয়েল আথানিয়া ও লার্গো কাবালিয়েরো। অপর দিকে ফ্যাসিবাদীদের নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন প্রিমো দে রিভেরা এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কো।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণপন্থীরা ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস শুরু করলে স্পেনে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

www.pathagar.com

পাবলো পিকাসোর আঁকা স্পেনের গৃহযুদ্ধ ভিত্তিক বিখ্যাতচিত্র 'গের্নিকা'

সরকার মাদ্রিদ ও বার্সেলোনায় দক্ষিণপন্থীদের নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ প্রতিহত করে। কিন্তু কাদিথ্ বুর্হোস, সেভিইয়ে প্রভৃতি স্থান দক্ষিণপন্থী সৈন্যদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে এই যুদ্ধে অন্যান্য রাষ্ট্রও জড়িয়ে পড়ে। জার্মানি ও ইতালি প্রকাশ্যে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করতে থাকে। অন্য দিকে কেবল রাশিয়া (দ্র) ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষ সমর্থন করে। এভাবে যুদ্ধাবস্থা চরমে পৌঁছায়। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কোই জয়ী হন এবং স্পেনে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান ঘটে। এই যুদ্ধে গণতন্ত্রী নামে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), গ্রেট ব্রিটেন (দ্র), ফ্রান্স ইত্যাদি রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন রুখতে স্পেনের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষে এগিয়ে আসে নি।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ছিল নিষ্ঠুরতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। এই যুদ্ধে শুধু লক্ষ লক্ষ অসামরিক মানুষের প্রাণহানিই ঘটে নি, ধ্বংস হয়েছে হাজার হাজার ঘর-বাড়ি, শহর, সম্পদ। জার্মানির বিমান আক্রমণে উত্তর স্পেনের গের্নিকা (Guernica) শহর একেবারে মাটিতে মিশে গিয়েছিল। এই পাশব নিষ্ঠুরতা স্মরণে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো (দ্র) এঁকেছেন তাঁর 'গের্নিকা' ছবিটি।

এই গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত প্রগতিশীল শক্তির সমর্থনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে স্বেচ্ছাসেবীরা একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড (International Brigade) গঠন করেছিলেন। তার মধ্যে মানবতাবাদী বহু শিল্পী-সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সুজ. ব.

স্পেন্সার্, হার্বার্ট [১৮২০—১৯০৩]

ইংরেজ দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ। প্রকৃতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, তত্ত্ববিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যাপক জ্ঞানকে স্পেন্সার্ (Herbert Spencer) দর্শনশাস্ত্রে প্রয়োগ করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ১৮২০ সালের ২৭শে এপ্রিল ইংল্যাণ্ডের ডারবি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ না করলেও নানাবিধ জ্ঞানচর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি 'ইকনমিস্ট' পত্রিকায় সহাকারী সম্পাদক ছিলেন।

স্পেন্সার্ বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর চিন্তাধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানচর্চাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর গ্রন্থ 'The Principles of Biology' (১৮৬৪-৬৭) এবং 'The Principles of Psychology' (১৮৫৫) যথাক্রমে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড বিশ্বদ্যিালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) তাঁর 'Study of Sociology' (১৮৭৩) সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রাথমিক স্তরে অবশ্যপাঠ্য বই।

স্পেন্সার্ তাঁর দার্শনিক মতবাদকে সমন্বয়ধর্মী দর্শন বলে অভিহিত করেন। তিনি বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ওপর

www.pathagar.com

জোর দেন। তাঁর মতে মানবজ্ঞান আপেক্ষিক এবং তা কখনো সম্পূর্ণ, সংলগ্ন ও অসীম হয় না। ব্যক্তির এই সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাই হল বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তি। তাই বিজ্ঞানের পক্ষে অস্তিত্বের রহস্য উঘাটন সম্ভব নয়। তাঁর এই চিন্তাধারা অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) নামে পরিচিত। ডারউইনের (দ্র) পূর্বেই ক্রমবিকাশবাদ তত্ত্বের (Theory of Evolution) জন্য তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

স্পেন্সার ১৯০৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ১৯০৪ সালে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়।

সুজ. ব.

স্প্যানিশ গিটার গিটার দ্র
স্প্যানিশ ভাষা রোমান্স ভাষাগোষ্ঠী দ্র

স্ফিংক্স (Sphinx)

মিশরীয় ধর্ম থেকে গৃহীত গ্রিক পুরাণকাহিনীর দানবী। পাখাবিশিষ্ট এই দানবীর দেহের উপরের অংশ নারীদেহ এবং নিচের অংশ সিংহদেহ। থিবি-র নিকটে একটি উঁচু শিলার ওপর এই দানবী বাস করত এবং সেখানে সে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

কোনো মানুষ দেখতে পেলে স্ফিংক্স তাকে কেবল একটি ধাঁধা জিজ্ঞেস করত। ধাঁধাটি হল—সকাল বেলায় চার পায়ে হাঁটে, দুপুর বেলায় দু'পায়ে হাঁটে আর বিকেল বেলায় তিন পায়ে হাঁটে সে কোন প্রাণী ? এই ধাঁধার উত্তর যারা দিতে পারত না স্ফিংক্স তাদের হত্যা করত। বলা বাহুল্য যে থিবিতে কেউই ধাঁধাটির উত্তর দিতে সক্ষম হয় নি।

ঈডিপাস (দ্র) ধাঁধাটির সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। উত্তর হল 'মানুষ'। সকাল অর্থাৎ শৈশবে মানুষ দুই হাত দুই পায়ে হামাগুড়ি দেয়। দুপুর অর্থাৎ যৌবনে সুস্থ মানুষ দুই পায়ে সোজা হয়ে হাঁটে। আর বিকেলে অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে মানুষ লাঠি নিয়ে হাঁটে। ঈডিপাসের সঠিক উত্তর শুনে স্ফিংক্স অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। ঈডিপাস থিবি-র রাজা হন।

প্রাচীন মিশরের প্রত্যেক মন্দিরের সম্মুখে স্ফিংক্সের মূর্তি স্থাপন করা হত। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হল মিশরের গিজা নামক স্থানে অবস্থিত গ্রেট স্ফিংক্স। স্বাভাবিক শিলা কেটে এই বিরাট মূর্তিটি গঠিত হয়েছে।

সুজ. ব.

মিশরের 'গিজা' পিরামিডের কাছে অবস্থিত স্ফিংক্স

স্ফুটনাঙ্ক

যে তাপমাত্রায় কোনো তরল পদার্থ ফুটতে থাকে তাকে স্ফুটনাঙ্ক বলে। প্রত্যেক তরল পদার্থেরই নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক আছে। এই তাপমাত্রায় তরল পদার্থের বাষ্পের চাপ বাইরের আবহমণ্ডলের বায়ুচাপের সমান থাকে। মনে রাখা দরকার, বাইরের বায়ুচাপ কম বা বেশি হলে তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্কেরও পরিবর্তন ঘটে। এ জন্য কোনো তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বলতে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (৭৬০ মিলিমিটার উঁচু পারদস্তম্ভের ওজন) পদার্থটি যে তাপমাত্রায় ফোটে, সে তাপমাত্রাই বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন পানির স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সু. ব.

স্বতোদীপ্তি (fluroscence)

কোনো কোনো পদার্থকে শক্তি দ্বারা উত্তেজিত করলে সেটি

www.pathagar.com

আলো বিকিরণ করে। এ ধরনের আলোর বিকিরণ (দ্র) দু'ধরনের হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে, আলোর বিকিরণ শক্তি প্রয়োগ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ($১০^{-৮}$ সেকেণ্ডের মধ্যে) বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনাকে বলা হয় ফ্লোরোসেন্স বা স্বতোদীপ্তি। অপর প্রকার বিকিরণে শক্তি প্রয়োগ শেষ হবার পরও বিকিরণ ($১০^{-৩}$ সেকেণ্ড থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত) চলতে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের বিকিরণকে বলা হয় ফসফোরোসেন্স (phosphoroscence) বা স্বতঃপ্রভা। পরমাণুর (দ্র) ইলেক্ট্রনীয় কাঠামো থেকে স্বতোদীপ্তি ব্যাখা করা যায়। শক্তি গ্রহণ করে পরমাণুর ইলেক্ট্রন পরবর্তী উচ্চতর শক্তিস্তরে চলে যায়। শক্তি প্রত্যাহার করলে ইলেক্ট্রন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্বের স্তরে চলে আসে (spontaneous radiation) ও বাড়তি শক্তি আলো হিসাবে প্রকাশ পায়। স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হয় বলে এই বিকিরণের স্থায়িত্ব খুবই কম ($১০^{-৮}$ সেকেণ্ড)। কিন্তু ফসফোরোসেন্সের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রন সরাসরি প্রথম স্তরে আসতে পারে না। একটি মধ্যবর্তী স্তরে আটকা পড়ে ও বিকিরণের স্থায়িত্ব বেশি হয়।

ফ্লুরোসেন্স বা স্বতোদীপ্তির জন্য মূলত অতিবেগুনি রশ্মি (দ্র) ব্যবহৃত হয়, তবে অন্য কোনো শক্তি-উৎসও ব্যবহার করা যায়।

প্রচলিত টিউব বা ফ্লুরোসেন্ট বাতিতে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পারদবাষ্পকে উত্তেজিত করা হয়। উত্তেজিত পারদবাষ্পের অতিবেগুনি রশ্মি টিউবের গায়ের ফ্লুরোসেন্ট পদার্থকে উত্তেজিত করে সাদা আলো বিকিরণ করে।

মু. হা.

স্বদেশী আন্দোলন

'স্বদেশী আন্দোলন' কথাটির সাদামাটা অর্থ—স্বদেশের জন্য আন্দোলন। এই আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক। অথচ দেশের জন্য সব রাজনৈতিক আন্দোলনকে কিন্তু এই নামে ডাকা হয় না। তার কারণ, এর এক ভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে।

গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন (দ্র) ১৯০৫ সালে অখণ্ড বঙ্গদেশকে ভেঙে দু' টুকরো করেন। তাঁর এই বঙ্গভঙ্গ সরকারিভাবে কার্যকর হয় ঐ বছর ১৬ই অক্টোবর থেকে। এর প্রতিবাদে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য বাঙালি জাতি যে আন্দোলন করেছিল, ইতিহাসে তার নাম 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' (দ্র)। এই আন্দোলনেরই অপর নাম স্বদেশী আন্দোলন।

তবে ঐতিহাসিকভাবে বাঙালির স্বদেশী চেতনার উৎস উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে দেখতে পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের (দ্র) জাতীয়তাবাদী উপন্যাস 'আনন্দমঠ' রচনা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (দ্র) প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এর সঙ্গে যুক্ত। যা হোক, বঙ্গভঙ্গের পরে সংগঠিত স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল সমাজে নানাভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল : ১. রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত (নভেম্বর ১৯০৫) হল; ২. জাতীয় শিক্ষাপরিষদ স্থাপিত (মার্চ ১৯০৬) হল, যা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেবে; ৩. ইংল্যাণ্ডের যে কোনো দ্রব্য (যেমন— লবণ, চিনি, মনোহারী জিনিসপত্র, কাপড়চোপড়) বর্জন করা হল; অরবিন্দ ঘোষ (দ্র) 'বন্দেমাতরম্' নামে ইংরেজিতে পত্রিকা প্রকাশ (১৯০৬) করলেন। বাংলায় সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকা বেরুল।

হা. মা.

স্বপ্ন (dream)

ঘুমের মধ্যে দেখা ঘটনা ও দৃশ্য 'স্বপ্ন' নামে পরিচিত। ঘুমের যে কোনো পর্যায়ে মানুষ স্বপ্ন দেখে। এখানে বলে রাখা ভাল যে ঘুম দু'রকমের। এক ধরনের ঘুমের ভেতর মানুষের চোখের গোলক খুব নড়াচড়া করে। আরেক ধরনের ঘুমে চোখ স্থির থাকে। প্রতি রাতে অন্তত চার পাঁচ বার চোখের গোলক অস্থির হয়ে ওঠে এবং প্রতিবার তা প্রায় বিশ মিনিট স্থায়ী হয়। এসব সময়ে মানুষ বেশি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখার পর তাড়াতাড়ি জেগে উঠলে স্বপ্নে দেখা ঘটনা ভাল মনে থাকে।

স্বপ্ন দেখার সময়ে কাউকে জাগিয়ে দিলে সে ভীষণ বিরক্ত হয়, তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় এবং সে দিনের বেলা কাজে মন বসাতে পারে না।

সবাই স্বপ্ন দেখে—কারো তা মনে থাকে, কারো মনে থাকে না। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি স্বপ্নের ভেতর নতুন চিন্তা কিংবা আবিষ্কারের খোরাক পেয়েছেন। মনস্তত্ত্বে (দ্র) মানুষের অবচেতন মনের রহস্য বের করার জন্য স্বপ্নের ওপর বেশ জোর দেওয়া হয়।

সা. এ.

www.pathagar.com

স্বরবৃত্ত   ছন্দ দ্র

স্বরলিপি

সঙ্গীতকে লিখিতভাবে বিবৃত করার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সুর ও তাল উভয়ই বিবৃত হয়। স্বর বা স্বরচিহ্নের সাহায্যে সঙ্গীত লিখিত হয় বলে এর নাম স্বরলিপি। স্বরলিপি পদ্ধতিতে স্বরবাচক চিহ্নের সঙ্গে মাত্রাবাচক চিহ্নও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আমাদের সঙ্গীতপদ্ধতিতে স্বরলিপির গুরুত্ব খুব আগে অনুভব করা হয় নি। আমাদের সঙ্গীতকে লিখিতভাবে উপস্থাপিত করার রীতি এখনো ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। আমাদের সঙ্গীত মূলত গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রচারিত হয়। ফলে সব সঙ্গীতই শুনে শুনে গাওয়া হয় বা বাজানো হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে উপস্থাপন করার রীতিও পূর্বে ছিল মৌখিক। কিন্তু দীর্ঘ কাল পূর্বেই সেখানে সঙ্গীতকে লিখিতভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা চলে। চতুর্দশ শতক থেকেই সেই চেষ্টা ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। স্টাফ নোটেশন বর্তমানে একটি অতীব কার্যকর স্বরলিপি-পদ্ধতি হিসাবে পাশ্চাত্যে প্রচলিত। আমাদের সঙ্গীত পদ্ধতিতে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩) প্রথম স্বরলিপি প্রচলন করেন। ১৮৬৮ সালে তাঁর স্বরলিপিগ্রন্থ 'ঐকতানিক স্বরলিপি' প্রকাশিত হয়। ক্ষেত্রমোহনের স্বরলিপি পদ্ধতি দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি নামে খ্যাত। বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে (১৮৬০-১৯৩৬) একটি স্বরলিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এর নাম ভাতখণ্ড পদ্ধতি বা হিন্দুস্তানি পদ্ধতি। তবে বর্তমানে যে স্বরলিপি পদ্ধতির সাহায্যে আমরা সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করে থাকি এর নাম আকারমাত্রিক স্বরলিপি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। এই পদ্ধতিতে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ প্রভৃতি শুদ্ধ স্বরকে লেখা হয় স, র, গ, ম, প, ধ, ন বলে, কিন্তু উচ্চারণ করা হয় সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি বলে। কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদকে লেখা হয় ঋ, জ্ঞ, দ, ন বলে। কিন্তু উচ্চারণ করা হয় রে, গা, ধা, নি বলে। তীব্র মধ্যমকে লেখা হয় হ্ম বলে; উচ্চারণ করা হয় মা বলে। অতি কোমল বোঝাতে কোমল স্বরের ওপর ১ লেখা হয়, যেমন অতি কোমল ঋষভ বোঝাতে লেখা হয় ঋ^{১}। কোমল স্বরের ওপর ২ লেখা হলে তা অণুকোমল চিহ্নজ্ঞাপক হয়। মন্দ্র সপ্তক বোঝাতে স্বরের নিচে হস্ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, যেমন— স্, র্, গ্, ম্, প্, ধ, ন্। মধ্যসপ্তক বোঝাতে স্বরের নিচে বা ওপরে কোনো চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না, যেমন— স, র, গ, ম, প, ধ, ন। তার সপ্তক বোঝাতে স্বরের ওপর রেফ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, যেমন— র্স, র্র, র্গ, র্ম, র্প, র্ধ, র্ন। া চিহ্নের সাহায্যে মাত্রা নির্দেশ করা হয়। এক মাত্রায় এক া, দুই মাত্রায় দুই া া ইত্যাদি। ষড়জের পর দুই মাত্রা হলে লেখা হবে সা া। এক মাত্রায় একাধিক স্বর থাকলে লেখা হবে : সরা, সরগা, সরগমা প্রভৃতি। অর্ধ মাত্রায় চিহ্ন হচ্ছে ঃ। ষড়জে অর্ধ মাত্রা বোঝাতে লেখা হবে সঃ। সিকি মাত্রা বোঝাতে লেখা হবে ০। ষড়জে সিকি মাত্রা বোঝাতে লেখা হবে স ০। দেড় মাত্রার চিহ্ন াঃ। ষড়জে দেড় মাত্রা বোঝাতে লেখা হবে সাঃ। স্পর্শ স্বর মুখ্য স্বরের ডান বা বাম পাশে ছোট্ট করে লিখিত হয়। আশ বোঝাতে স্বরের নিচে শূন্য ব্যবহার করা হয়। গিটকিরি বোঝাতে স্বরের ওপর শূন্য ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় বন্ধনী পুনরাবৃত্তির চিহ্ন। পুনরাবৃত্তির সময় কোনো অংশ বাদ দিলে তাকে প্রথম বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতি তুকের আরম্ভে ও শেষে যুগল দণ্ড (II) বসে। তালের আরম্ভে ও শেষে এক দণ্ড (I) বসে। দাঁড়ির সাহায্যে তালের মধ্যবর্তী বিভাগ বোঝানো হয়। আকারের সাহায্যে মাত্রা বোঝানো হয় বলে এই পদ্ধতির নাম আকারমাত্রিক স্বরলিপি।

ক. গো.

স্বর্ণ   সোনা / স্বর্ণ দ্র

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) চলাকালে বাংলাদেশের একটি ফুটবল দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করে। এই ফুটবল দলটি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত অর্জন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করা।

বাংলাদেশের তৎকালীন অস্থায়ী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী গঠিত হয় স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল। দলটি গঠনে যেসব ক্রীড়াসংগঠক এবং খেলোয়াড় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হলেন মরহুম আলী ইমাম, জাকারিয়া পিণ্টু,

www.pathagar.com

প্যাটেল, প্রতাপশঙ্কর হাজরা, আশরাফ, লুৎফর রহমান প্রমুখ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক তরুণ ফুটবলার স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলে যোগদান করেছিলেন।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল প্রথম প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেয় ১৯৭১ সালের ২৪শে জুলাই। কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত এই খেলায় বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল নদীয়া জেলা একাদশ। খেলার পূর্বে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং জাতীয় সঙ্গীত (দ্র) বাজানো হয়। খেলাটি ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশ দলকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল। বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনে একটি স্বাধীন দেশের যাত্রা শুরু হল—এটিই সেদিন ছিল মুখ্য।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতের কৃষ্ণনগর, নরেন্দ্রপুর, বেনারস, বিহার প্রভৃতি স্থানে মোট ষোলটি প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে বারোটি খেলায় জয়লাভ করে, তিনটিতে পরাজিত হয় এবং অবশিষ্ট খেলাটি ড্র হয়।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্যরা ছিলেন শামসুল হক (প্রথম সভাপতি), আশরাফ আলী চৌধুরী (দ্বিতীয় সভাপতি), এন.এ. চৌধুরী (তৃতীয় সভাপতি), তানভীর মাজহারুল ইসলাম তান্না (ম্যানেজার), ননী বসাক (কোচ), জাকারিয়া পিন্টু (অধিনায়ক), প্রতাপশঙ্কর হাজরা (সহ-অধিনায়ক), লে. নুরুন্নবী, আলী ইমাম, লালু, শাহজাহান আলম, আইনুল হক, অমলেশ সেন, কায়কোবাদ, শেখ আশরাফ আলী, সুভাষচন্দ্র সাহা, বিমল কর, সাইদুর রহমান প্যাটেল, তসলিম, এনায়েতুর রহমান, অনিরুদ্ধ, আবদুল হাকিম. নওসুরুজ্জামান, কাজী সালাউদ্দিন, খোকন, সুরুজ, মোমিন, গোবিন্দ কুণ্ডু, মাহবুবুর রহমান, নিহার, সঞ্জিত, লুৎফর রহমান, মোজাম্মেল. পেয়ারা, সাত্তার ও মাহমুদ।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ফুটবলার মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরবময় অধ্যায় সংযোজন করেছেন।

টি. কি.

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ন' মাস (১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত) পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে মুক্তিবাহিনী (দ্র) ও দেশবাসীর মনোভাব উদ্দীপ্ত রাখতে যে বেতারকেন্দ্র থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হত, তা-ই 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নামে পরিচিত।

পাক বাহিনী ২৫শে মার্চের (১৯৭১) মধ্যরাতে ঢাকা দখল করে নিলে 'রেডিও পাকিস্তান'-এর ঢাকা কেন্দ্রও তাদের সম্পূর্ণ করতলগত হয়। এই পটভূমিতে চট্টগ্রামে অবস্থানরত পাক সেনাবাহিনী ও ই পি আর (EPR=East Pakistan Rifles)-এর সশস্ত্র বাঙালি সদস্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে চট্টগ্রাম শহর এবং কালুরঘাটে অবস্থিত এর আঞ্চলিক বেতারকেন্দ্রটি দখল করে নেন এবং এর নাম দেওয়া হয় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। এই বেতারকেন্দ্র থেকেই ২৬শে ও ২৭শে মার্চ কয়েক দফায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। প্রথমে এই ঘোষণাটি প্রচার করেন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান (২৬শে মার্চ), কিন্তু তা ভালমতো শোনা যায় নি। পরে ২৭শে মার্চ (১৯৭১) ওই একই বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামে অবস্থানকারী মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তী কালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট) বঙ্গবন্ধুর (দ্র) পক্ষ থেকে বাঙালি সৈন্যদের পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান সংক্রান্ত লিখিত প্রচার বা ঘোষণাটি পাঠ করেন। এবং দেশের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলের বেতারযন্ত্র থেকে তা শোনা গেলে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ২৬শে থেকে ২৯শে মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত চট্টগ্রামের কালুরঘাটে অবস্থিত এই বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান পরিচালনা, সংগঠন ও একে রক্ষার দায়িত্বে সম্মিলিত সাহসী ভূমিকা পালন করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, বেতার-সংশ্লিষ্ট বেশ কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রকৌশলী এবং বিভিন্ন স্তরের সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ।

৩০শে মার্চ পাক বাহিনী বোমা বর্ষণ করলে বেতার-কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। ৩১শে মার্চ এর ট্রান্সমিটার ভবন থেকে ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি বিচ্ছিন্ন করে প্রথমে পটিয়ায় ও পরে সেখান থেকে আগরতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। ৩রা এপ্রিল (১৯৭১) থেকে এই ১ কিলোওয়াট

www.pathagar.com

ট্রান্সমিটারের সাহায্যেই এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়।

ইতিমধ্যে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য আঞ্চলিক বেতারকেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সীমান্ত অতিক্রম করে নব পর্যায়ে এই কেন্দ্র চালু করেন। নাম রাখা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। এর কার্যালয় ছিল কলিকাতা (দ্র) শহরের থিয়েটার রোডের একটি স্বল্পপরিসর বাড়িতে। নব পর্যায়ে এই বেতারকেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয় ১৯৭১ সালের মে মাসের ২৫ তারিখ থেকে।

মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) ন' মাস যেসব উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠান এই বেতারকেন্দ্র থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হয়, সেগুলোর মধ্যে 'চরমপত্র', 'অগ্নিশিখা', 'রক্তস্বাক্ষর', 'বজ্রকণ্ঠ', 'দর্পণ', 'জাগরণী', 'ঐকতান', ইংরেজি ও বাংলা খবর এবং 'বিশ্বসংবাদ' উল্লেখযোগ্য।

'চরমপত্র' ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিশেষ জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। 'চরমপত্র' কথিকার মাধ্যমে লেখক এম. আর. আখতার মুকুল রণাঙ্গনে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সাফল্য ও বিজয়ের খবর আঞ্চলিক ভাষায় বিশেষ ভঙ্গিতে ফলাও করে প্রচার করতেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের খবর ব্যঙ্গ রসাত্মক ভাষায় প্রচার করা হত। এই অনুষ্ঠান যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীকে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করত। চরমপত্রের ভাষা ও উচ্চারণভঙ্গি বৈশিষ্ট্যের জন্য এই কথিকা একদিকে শ্রোতাদের যেমন প্রচুর আনন্দ দিত, আবার একই সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের মনোবল সুদৃঢ় করত।

এই বেতারকেন্দ্র-সংশ্লিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিক, বেতারকর্মী ও প্রকৌশলীবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের ন' মাস যে ভূমিকা পালন করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়রূপে বিবেচিত।

আ. হু.

স্বাধীনতা দিবস

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬শে মার্চ। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ট্যাঙ্ক, কামান এবং অন্যান্য আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক দিনেই হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে। সেই রাতেই পাক হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বক্ষণে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান– যা ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। সেদিন থেকে বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় এবং সেই জন্যই ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা দিবস'।

র. হা.

স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার

সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) বীর শহীদদের স্মরণে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' প্রবর্তন করে।

জাতীয় জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা, শিক্ষা, সাহিত্য, ললিতকলা, ক্রীড়া, পল্লী উন্নয়ন, জনসেবা, সমাজকল্যাণ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশের নাগরিককে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ ছাড়া জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও এ পুরস্কারে ভূষিত করার বিধান রয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেককে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা, একটি স্বর্ণপদক এবং একটা সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

ম. র.

স্বাধীনতা যুদ্ধ,বাংলাদেশের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দ্র

স্বাধীনতার স্মারক ভাস্কর্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে (দ্র) শহীদ হয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীবৃন্দ। তাঁদের স্মরণে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দীপ্ত রাখার লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য। চিত্রশিল্পী মূর্তজা বশীর এর নির্মাতা। ১৯৭৩ সালে এটি নির্মিত হয়।

ভাস্কর্যটির বেদিমূলে রয়েছে খোলা বই—পাতা ছেঁড়া—টুকরো কাগজ, তাতে বুলেটের ছিদ্র। এই বুলেট দিয়ে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে বাংলাদেশের পতাকা। বুলেটের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে আগুনের শিখা, যার স্ফুলিঙ্গের ওপর রয়েছে চারটি পাখি। এদের ডানায় দশটি বড় রঙিন

www.pathagar.com

পাথর ও একুশটি রক্তবিন্দু পাথর। পাখিগুলো মুক্তিযোদ্ধা—বড় দশটি পাথর দশটি বৃহৎ আন্দোলনকে এবং একুশটি লাল ছোট বিন্দু পাথর বাঙালির একুশের চেতনাকে ধারণ করে আছে।

শিল্পী মূর্তজা বশীরের এই ভাস্কর্যটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শাণিত করে—শহীদের বীরত্ব ও ত্যাগকে মনে করিয়ে দেয়।

হা. খা.

স্মৃতি

কোনো বস্তু বা ঘটনাকে আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি, তার একটা ছাপ আমাদের মনের অবচেতন স্তরে থেকে যায়। মনের এই অবচেতন স্তর থেকে পূর্বঅভিজ্ঞতাকে চেতন স্তরে পুনরুদ্রেক করাই হল স্মৃতি। আন্দালিবের স্মৃতি খুব বেশি, সব কিছু মনে রাখতে পারে। কণিকার স্মৃতি খুব কম, সে কিছুই মনে রাখতে পারে না। এসব কথা থেকে মনে হয়, স্মৃতি একটি গুণ। আসলে স্মৃতি কোনো গুণ নয়। স্মৃতি বলতে বিজ্ঞানীরা স্মরণক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকেন।

মনোবিদ্‌দের মতে, যেসব অভিজ্ঞতা বা ধারণা এখন চেতন মনে নেই অথচ পূর্বে ছিল, সেসব অভিজ্ঞতা বা ধারণাকে চেতন মনে আনাই হল স্মৃতি। এসব হল প্রাচীন ধারণা।

অনেক মনোবিজ্ঞানী স্মৃতিকে বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা পূর্বে শেখা কোনো কাজকে একইভাবে পরবর্তী কালে সম্পাদন করতে পারি, তা-ই হল স্মৃতি।' মনোবিজ্ঞানী রস-এর মতে, 'অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্রেক যে জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে তা-ই হল স্মৃতি।' স্মৃতির তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে। এরা হল শিখন বা স্থিরীকরণ (learning বা fixation), ধারণক্রিয়া (retention) ও পুনরুত্থাপন (reproduction)। যে প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা স্মরণ রাখার বস্তুকে মনের অন্তর্ভুক্ত করি তাকে বলে শিখন বা স্থিরীকরণ। যে মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই বস্তু সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাকে মনে স্থায়ীভাবে ধরে রাখছি তাই হল সংরক্ষণ বা ধারণ। মনে অবস্থিত বা সংরক্ষিত ধারণাগুলিকে আমরা যে প্রক্রিয়া দ্বারা কাজে লাগাই তাকে বলা হয় পুনরুত্থান।

আমাদের অনেকের ধারণা, স্মৃতিশক্তি বাড়ানো বা কমানো যায়। কিন্তু মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, স্মৃতিশক্তি মানুষের একটি সহজাত গুণের উপর নির্ভর করে। একে বাড়ানো-কমানো যায় না। বিজ্ঞানীরা স্মৃতিশক্তি ভালভাবে রক্ষা করার একাধিক নিয়মের কথা বলেছেন। মনোযোগ দিয়ে, অনুষঙ্গ স্থাপন করে, ছন্দোবদ্ধভাবে সাময়িক বিরতিসহ পড়লে এবং পড়ার পর লিখে ফেললে ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করলে তা অধিক মনে থাকে। কোনো মানুষের ভাল স্মৃতির লক্ষণ হল তিনি কোনো কিছু কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারেন, কত বেশি সময় মনে রাখতে পারেন, যদি ঠিক সময়ে পুনরুদ্রেক করতে পারেন এবং অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন।

হো. আ.

স্মৃতি অম্লান

একটি স্মৃতিসৌধের নাম। রাজশাহী শহরের শহীদ ক্যাপ্টেন বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর সড়কের দ্বীনে ভদ্রা এলাকায় এ স্মৃতিসৌধ অবস্থিত। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ১৯৯১

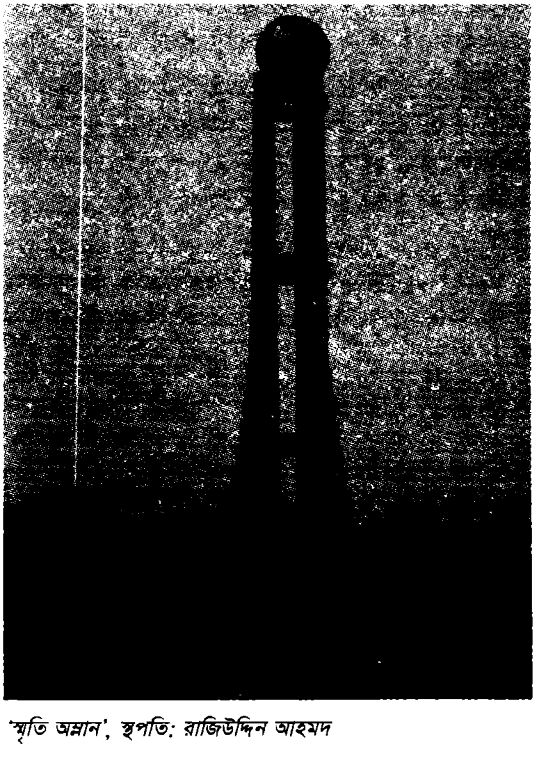

'স্মৃতি অম্লান', স্থপতি: রাজিউদ্দিন আহমদ

www.pathagar.com

সালের ২৬শে মার্চ এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আবুল খায়ের সাইফুল ইসলাম ঠাণ্ডুর বাবা আজিজুর রহমান সরকার। স্মৃতিসৌধের মূল পরিকল্পনা করেছেন রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তৎকালীন চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার আবদুর রব। এর নির্মাণ ও স্থাপতিক ডিজাইনে নির্দেশনা দিয়েছেন স্থপতি রাজিউদ্দিন আহমদ।

এই স্মৃতিসৌধ বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতীক। এই সৌধে মোট ৩টি স্তম্ভ আছে। প্রতিটি স্তম্ভের গায়ে আছে ২৪টি করে ধাপ। এ ধাপের মূল বৈশিষ্ট্য হল '৪৭ থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত আন্দোলনের ক্রমবিবর্তন এবং অবশেষে স্বাধীনতার ফসল। মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে স্তম্ভের মোট ৩০টি ছিদ্রের মাধ্যমে এবং প্রত্যেকটি স্তম্ভে আছে ১০টি করে ছিদ্র। তা ছাড়া বেদিমূলে রাখা আছে নীল-শুভ্র পাথরের আচ্ছাদন, যা ইঙ্গিত করছে দু' লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোনের বেদনাময় আর্তির কথা। সৌধের চূড়ায় রাখা আছে বাংলাদেশের মানচিত্রের লাল গোলক। এ গোলক স্বাধীনতা যুদ্ধের সূর্যের প্রতীক। ভূমি থেকে গোলকতল পর্যন্ত এর উচ্চতা ৭১ ফুট। বেদির ব্যাস ৪৬ ফুট। এটি একটি মনোরম স্থাপত্যকর্ম।

ম. আ. খা.

স্মৃতিসৌধ, বাংলাদেশের

১. **জাতীয় স্মৃতিসৌধ** : ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত। স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন। ১৯৮২ সালে নির্মাণকাজ শেষ হয়। নাম-না-জানা অগণিত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত। সাতটি জোড়া-ত্রিভুজাকার দেয়ালের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় হয়ে ধাপে ধাপে সৌধটি ১৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে। খুব সাধারণ আঙ্গিকে এবং সম্পূর্ণ কংক্রিট (দ্র) উপাদানের সাহায্যে একটি অসাধারণ শিল্পসুষমা অর্জিত হয়েছে। সাত জোড়া দেয়াল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাতটি ক্রমকালের প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১—এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সালের ঘটনাবলি স্বাধীনতা আন্দোলনে এসে রূপ নেয়। স্মৃতিসৌধটি ঐসব ঐতিহাসিক বছরগুলোর সঙ্গে অসংখ্য শহীদের আত্মত্যাগের সাহস ও গরিমাকে স্মরণ করায়।

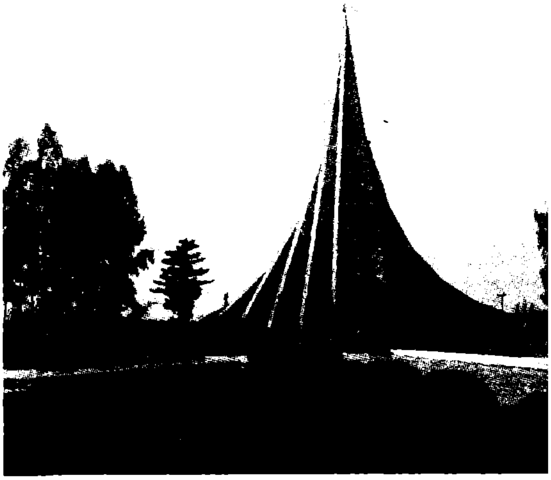

সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধ: স্থপতি: সৈয়দ মইনুল হোসেন

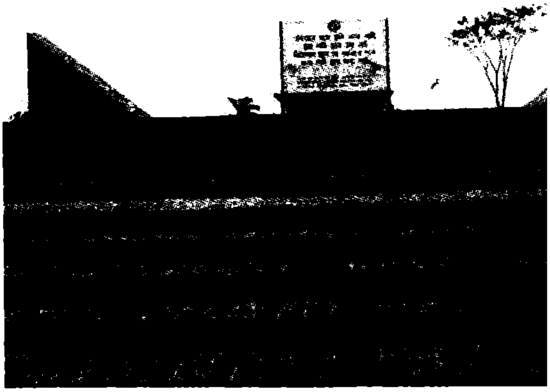

মীরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, স্থপতি: মোস্তফা হালী কুদ্দুস

২. **বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ** : ঢাকার মীরপুরে অবস্থিত। স্থপতি মোস্তফা হালী কুদ্দুস। ১৯৭২ সালে নির্মাণকাজ শেষ হয়। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী রাজাকার (দ্র) ও আল-বদরদের (দ্র) সাহায্যে বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। তাঁদের স্মরণে এই স্মৃতিসৌধ নির্মিত। তিনটি ত্রিভুজাকৃতি ইটের দেয়ালে তিনটি উচ্চতায় গতিশীলতা এবং বলিষ্ঠ উপস্থাপনায় শহীদদের চরম আত্মত্যাগ ও সাহসের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, স্থপতি: তানভীর করিম

বাহাদুর শাহ পার্কের স্মৃতিস্তম্ভ

৩. **মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ** : কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে অবস্থিত। স্থপতি তানভীর করিম। ১৯৮৬ সালে নির্মাণকাজ শেষ হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১—এই ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসনের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রপরিচালনা শেষে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে পৃথক পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে। স্মৃতিসৌধে ২৪টি পৃথক ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল বৃত্তাকারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সর্বশেষ উচ্চতায় স্থির হয়েছে। ২৪ বছরের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীকে এই গঠনশৈলী একটি চলমান সময়ের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। স্বাধীনতার জন্য জনগণের দৃঢ় সঙ্কল্প, সংগ্রাম ও মনোবল ক্রমশ একত্র হয়ে চূড়ান্ত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষায় উপস্থাপিত হয়েছে। স্মৃতিসৌধটি সেই স্বপ্নের বাস্তব, পরিশীলিত ও ত্রৈমাত্রিক স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যগুণমণ্ডিত রূপ।

র. হা.

স্মৃতিস্তম্ভ

কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষ ঘটনার স্মারক হিসাবেই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়ে থাকে। নানা দেশে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের হয় নানা রূপ। কোথাও গড়ে ওঠে প্রতিমূর্তি, কোথাও বা তৈরি করা হয় স্তম্ভ, ভবন বা উদ্যান।

যুক্তরাষ্ট্রের অজ্ঞাত সৈনিকের মূর্তি কিংবা স্ট্যাচু অব লিবার্টি, ভারতের তাজমহল, ফ্রান্সের আর্ক দ্য ত্রয়অঁফ্ বা আইফেল টাওয়ারের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে।

তবে সাধারণভাবে স্মৃতিস্তম্ভ বলতে আমরা বুঝি গৌরবময় ঘটনা বা মহান ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষায় নির্মিত স্তম্ভ-সমূহকেই। বাংলাদেশেও অনেক স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। যেমন বাহাদুর শাহ পার্কের (দ্র) স্মৃতিস্তম্ভ, শহীদ মিনার (দ্র), জাতীয় স্মৃতিসৌধ (দ্র) প্রভৃতি।

আ. কা.

স্যাঁৎজুপেরি, অঁতোয়ান্ দ্য [১৯০০—১৯৪৪]

ফরাসি ঔপন্যাসিক ও পেশাদার আদি বিমানচালকদের এক জন। স্যাঁৎজুপেরি (Antoine de Saint-Exupery) ১৯০০ সালে ফ্রান্সের লিওঁ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও পারিবারিক পদবি 'কাউন্ট' কখনো ব্যবহার করেন নি তিনি।

বিমানে করে প্রথম ডাক পরিবহণের কাজ শুরু হওয়ার

www.pathagar.com

অনতিকালের মধ্যেই স্যাঁৎজুপেরি বৈমানিকের পেশা গ্রহণ করেন। ফরাসি ডাকবিভাগের চিঠিপত্র ইত্যাদি বিমানে বহন করে তাঁকে দেশ থেকে দেশে যেতে হত। উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির ওপর দিয়ে নতুন নতুন অনেক বিমানপথের আবিষ্কারক বলতে গেলে তিনিই। এই সব পথে বার বার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিমান চালনা করতে গিয়ে বহু বার তিনি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। তাঁর বিমান কখনো কখনো ধ্বংস হয়ে গেলেও তিনি আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণে বেঁচে গেছেন বেশ কয়েক বার।

বৈমানিকের কাজ করার পাশাপাশি স্যাঁৎজুপেরি সাংবাদিকতাও করেছেন। জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছেন বিশ্বব্যাপী।

অঁতোয়ান্ দ্য স্যাঁৎজুপেরি বিখ্যাত বিশেষভাবে তাঁর রচিত Le Petit Prince (ল্য প্যতি প্র্যাঁস্) বা 'ছোট্ট রাজকুমার' গ্রন্থের জন্য। গ্রন্থটি ছোট-বড় সকল বয়সী পাঠকের কাছে সমানভাবে আদৃত হয়ে কালজয়ী মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। বিশ্বের বহু ভাষায় এটি অনূদিত, সেই সঙ্গে এর কাহিনীকাঠামোকে ভিত্তি করে তৈরি ও মঞ্চস্থ হয়েছে বিভিন্ন দেশে সার্থক চলচ্চিত্র ও ব্যালে নৃত্য।

মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে 'ছোট্ট রাজকুমার' গ্রন্থটি রচনা করেন স্যাঁৎজুপেরি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) শেষ পাদে হিট্লারের (দ্র) নাৎসি (দ্র) বাহিনীর নির্যাতনের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে তিনি স্বদেশভূমি ফ্রান্স থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) পালিয়ে যান। সেখানে বসেই ফরাসি ভাষায় তিনি এর পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। যুদ্ধশেষে মাতৃভূমি ফ্রান্সে ফিরে আসবার সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া তাঁর এক ক্ষুদে বান্ধবী সিলভিয়া রাইনহার্ট্কে পাণ্ডুলিপিটি উপহার দিয়ে আসেন। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। এর ভিতরের ছবিও তিনি নিজেই এঁকেছিলেন।

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে স্যাঁৎজুপেরি উত্তর আফ্রিকার ওপর দিয়ে বিমান চালিয়ে যাওয়ার সময় চিরকালের জন্য নিখোঁজ হয়ে যান। সম্ভবত জার্মানদের গোলাবর্ষণে বিমানটি বিশাল মরুভূমির মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। সবচাইতে দুঃখজনক ঘটনা, 'ল্য প্যতি প্র্যাঁস্' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তিনি যাঁকে উপহার দিয়েছিলেন, সেই সিলভিয়া রাইনহার্ট্ও বড় হয়ে একদিন কোথাও নিখোঁজ হয়ে যান, যাঁর কোনো সন্ধান আর কোনো দিন পাওয়া যায় নি।

বাংলা ভাষায় প্রথম কালজয়ী এই গ্রন্থটি অনুবাদের কৃতিত্ব শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক জহুরুল হকের। তাঁর অনূদিত গ্রন্থটি বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে।

আ. হু.

স্যাবাথ্ (Sabbath)

ইহুদিধর্মের (দ্র) পয়গম্বর মোজেস্ (দ্র) বা মুসা নবী তাঁর ধর্মাবলম্বীদের জন্য দশটি অনুশাসন বা করণীয় কর্তব্য নির্দেশ করেছিলেন। এই দশটি অনুশাসনের মধ্যে চতুর্থটি হল 'স্যাবাথ্'।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে আছে যে সৃষ্টিকর্তা ছ' দিন ধরে সৃষ্টিকর্ম সমাধা করার পর সপ্তম দিনে নাকি বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। বিধাতার এই কর্মের অনুকরণে মানুষও তার কাজ ছ' দিন করবে এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেবে—এই ধারণা থেকে স্যাবাথ্ পালনের নিয়ম উদ্ভূত হয়েছে। ইহুদিগণ প্রতি শনিবার নিষ্ঠার সঙ্গে স্যাবাথ্ পালন করে থাকেন। এদিন হল অবসর যাপনের দিন, কিন্তু সেইসঙ্গে প্রার্থনা ও ধর্মালোচনা করারও দিন। 'স্যাবাথ্' শব্দের অর্থ হল—বিরত থাকা, বন্ধ করা, বিশ্রাম করা।

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরাও স্যাবাথ্ মেনে চলেন, তবে ইহুদিদের মতো কট্টরভাবে নয়। কিন্তু খ্রিস্টানদের স্যাবাথ্ পালিত হয় শনিবারে নয়, রবিবারে।

হা. মা.

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় [১৮৬৪—১৯২৪]

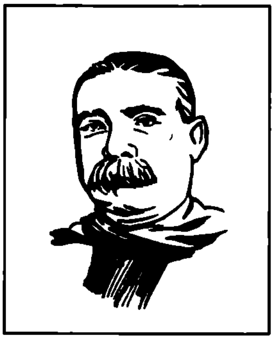

শিক্ষাব্রতী ও আইনজ্ঞ। ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন কলিকাতার (দ্র) ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন।

আশুতোষ মুখো-

www.pathagar.com

পাধ্যায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাল্যকালেই গণিত (দ্র) শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা লক্ষ করা যায়। তাঁর ছাত্রজীবন শুরু হয় চক্রবেড়িয়া ও সাউথ সাবার্বন স্কুলে। ১৮৭৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ২য় স্থান, ১৮৮১ সালে এফ. এ. (ফার্স্ট আর্টস্) পরীক্ষায় ৩য় স্থান এবং বি.এ. পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান এবং ১৮৮৫ সালে গণিত শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (দ্র) পান এবং পদার্থবিজ্ঞান (দ্র) বিষয়ে এম. এ. পাশ করেন।

১৮৮৮ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এক জন দক্ষ আইনজীবী হিসাবে চারদিকে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৪ সালে তিনি ডক্টর অব ল হন। আইনব্যবসার পাশাপাশি তিনি রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য এবং ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

১৯০৪ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ও ১৯২০ সালে কিছুকালের জন্য প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯০৮ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। পরবর্তী কালে আরো দুই বার তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম সংগঠক ও প্রথম সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া বহু বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি নানাভাবে যুক্ত ছিলেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক জন দেশপ্রেমিক ও অকুতোভয় মানুষ ছিলেন। বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। প্রথম থেকেই তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন। দেশের মানুষ উচ্চশিক্ষিত হলে স্বাধীনতা অর্জন সহজতর হয় এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন তিনি। এই বিশ্বাস থেকেই শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা উন্নয়নের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৮৯ সালে তিনি প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) সিনেটের সদস্য এবং পরে সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে তিনি চার বার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। এ সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য আর বিজ্ঞানের নানা শাখায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। তাঁরই চেষ্টায় বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছাত্রদের উচ্চতর বিষয়ে গবেষণা, বিদেশে শিক্ষালাভ প্রভৃতির জন্য অনুদান সংগ্রহ এবং বৃত্তির ব্যবস্থাও তিনি করেন। তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিত্বে ও বিচক্ষণতায় তৎকালীন ঔপনিবেশিক পরিবেশেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে। ১৯৩২ সালে ইংরেজ গভর্নর লর্ড লিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাকর্মে হস্তক্ষেপ করলে তিনি দৃঢ়ভাবে এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। রাজশক্তির সঙ্গে এই বাদানুবাদের এক পর্যায়ে গভর্নর শর্তসাপেক্ষে উপাচার্যপদে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর এই তেজস্বিতাপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য এ সময় দেশবাসী তাঁকে 'বাংলার বাঘ' আখ্যায় ভূষিত করে।

১৯২৩ সালে বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ডুমরাঁওয়ের রাজার পক্ষে বিখ্যাত ডুমরাঁও মামলা পরিচালনার জন্য আশুতোষ পাটনায় গমন করেন। সেখানে ১৯২৪ সালের ২৫শে মে তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল প্রবল। মায়ের নামে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রবর্তন করেন। তিনি বহু ভাষাবিদ ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীলঙ্কার (দ্র) মহাবোধি সোসাইটি তাঁকে 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধি এবং দেশীয় সুধীসমাজ ও পণ্ডিতবর্গ তাঁকে 'সরস্বতী' ও 'শাস্ত্রবাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত করে।

সুজ. ব.

স্যুর্‌রিয়ালিজ্‌ম্ (Surrealisme)

শব্দটি ইংরেজি নয়, ফরাসি এবং উচ্চারণ স্যুরেয়ালিজ্‌ম্; ইংরেজিতে অবশ্য Surrealism লেখা হয়। শব্দটির বাংলা করা হয়েছে 'পরাবাস্তবতা'। স্যুর্‌রিয়ালিজ্‌মের যিনি অনুসারী

www.pathagar.com

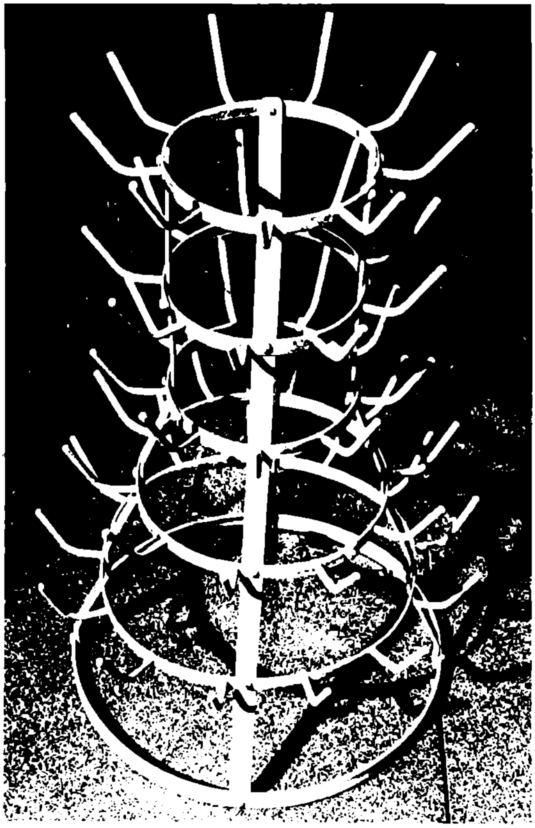

স্যুররিয়ালিজ্‌ম্ ছবি (১৯১৪), শিল্পী: মার্সেল দুচ্যাম্প

তাঁকে ইংরেজিতে বলা হয় স্যাররিয়ালিস্ট্ বা বাংলায় 'পরাবাস্তববাদী'।

ফ্রান্সে বিশ শতকের দুয়ের দশকে কবি- সাহিত্যিকেরা এই আন্দোলন শুরু করেন। 'স্যুররিয়ালিস্ত্' শব্দের উদ্ভাবক হলেন ফরাসি কবি গিওম্ আপলিন্যার্ (Guillaume Apollinaire) আর আন্দোলন যিনি গড়ে তোলেন তিনিও কবি, নাম—অঁদ্রে ব্রেতঁ (André Breton)।

পরাবাস্তবতাবাদ হল এক শিল্পদর্শন। এর মূল তত্ত্ব এ রকম : আমরা যাকে বাস্তব অভিজ্ঞতা বলি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) সাহায্যে যে বস্তুজগৎ প্রত্যক্ষ বলে বিশ্বাস করি, তার বাইরে এবং তারও আড়ালে আরেক রকম বাস্তবতা আছে। তা হল আমাদের মনের অবচেতন অবস্থার বাস্তবতা। শিল্পীর দায়িত্ব সেই গভীর ও গোপন অবচেতনকে শিল্পের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা। ডাক্তার ও মনঃসমীক্ষক জিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড্ (দ্র) দ্বারা এঁরা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন।

স্যুররিয়ালিজ্‌ম্ কেবল সাহিত্যক্ষেত্রেই নয়, চিত্রকলা (দ্র), চলচ্চিত্র (দ্র), ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলার প্রায় সকল শাখাতেই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

হা. মা.

স্যুরা, জর্জ ইম্প্রেশনিস্ট আর্ট দ্র

স্লাভনিক ভাষা রুশ ভাষা দ্র

স্লেজ এস্কিমো দ্র

হ

হকি (hockey)

লাঠি এবং বল দিয়ে যত ধরনের খেলা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও দ্রুততম বলের খেলা। এই খেলার মাধ্যমে কলাকৌশল, বেগ, সহ্যশক্তি এবং অক্লান্ত কর্মশক্তি লাভ করা যায়। ২০৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যে এর জন্ম। সেখান থেকে কালের বিবর্তনে আধুনিক হকি নতুন করে জন্মলাভ ও প্রসারলাভ করে ইংল্যাণ্ডে। ইংরেজদের মাধ্যমে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই খেলা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম ইংলিশ হকি ফেডারেশন ১৮৭৫, ইউরোপিয়ান হকি ফেডারেশন ১৯২৪ সালে গঠিত হয়। হকি ১৯০০ ও ১৯২০ সালে অলিম্পিকে সংযুক্তির পরে ১৯২৮ সাল হতে অদ্যাবধি অলিম্পিক গেম্‌সে (দ্র) অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিশ্বে এখন হকি খেলার দেশের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ভারত (দ্র), জার্মানি, পাকিস্তান (দ্র), হল্যাণ্ড, কেনিয়া, জাপান (দ্র), মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ প্রাধান্য বিস্তার করে হকি খেলছে।

বাংলাদেশে হকি ফেডারেশন গঠিত হয় ১৯৭২-৭৩ সালে। এখানে শহরগুলিতে ও কতিপয় সরকারি স্কুল-কলেজে হকি খেলা হয়। তবে মেট্রোপলিটান লীগ ছাড়া

www.pathagar.com

আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে লীগ ও নক্ আউট টুর্নামেন্ট খেলা হয়ে থাকে। সার্ভিসেস্ পুলিশ ও আনসারদের নিজস্ব টুর্নামেন্ট রয়েছে। বাংলাদেশের হকি খেলাতে ঢাকার নওয়াববাড়ির অনেক অবদান রয়েছে। হকি খেলায় এখন পর্যন্ত পেশাদারিত্ব আসে নি। এখনো এটা বিশ্বের সর্বত্র শৌখিন পর্যায়েই রয়েছে।

হকি খেলায় আবাহনী ক্রীড়াচক্র (দ্র) ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের (দ্র) মধ্যে লীগ বিজয়ের শিরোপার লড়াই ১৯৭৩ সাল থেকে চলছে। ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকায় হকি লীগ খেলায় এ পর্যন্ত (১৯৯৪) আবাহনী ক্রীড়াচক্র ৮ বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করে। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৫ বার, এজেক্স ক্লাব ২ বার আর মাহুতটুলী ও সাধারণ বীমা ১ বার করে লীগ শিরোপা পেয়েছে। জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে এস্ট্রোটার্ফ বসানোর জন্য হকি লীগ দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত হয় নি। বাংলাদেশ বিদেশে বহুদিন থেকে বিভিন্ন স্তরের হকি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আসছে। তবে চমকপ্রদ কোনো ফলাফল দেখাতে পারে নি। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (দ্র) আধুনিক কৃত্রিম হকি খেলার মাঠ এস্ট্রোটার্ফ রয়েছে।

কা. আ. আ.

হকিং, স্টিফেন ডব্লিউ [১৯৪২—   ]

বিজ্ঞানী, গণিত (দ্র) শাস্ত্রের অধ্যাপক হকিং (Stephen w. Hawking) একটি যুগান্তকারী বই 'A Brief History of Time' (১৯৮৮, অনুবাদে 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস')-এর জনক, যেটি অতি অল্প সময়ে পৃথিবীতে সর্বাধিক বিক্রীত একটি বই হিসাবে গিনেস্ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে (দ্র) স্থান পেয়েছে এবং এখনো সে -স্থানে রয়েছে। এ যাবৎ বিশ্বের তেত্রিশটি ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। বলে রাখা ভাল যে বইটি কোনো সস্তা, রগরগে গোয়েন্দা উপন্যাস নয়। 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' মহাবিশ্ব নিয়ে অবিচ্ছিন্ন আলোচনা। পদার্থবিদ্যা (দ্র) প্রাধান্য পেলেও বইটিতে মহাবিশ্বতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক অনেক শাখাই এসেছে।

লেখকের আরেকটি সাড়াজাগানো বই 'Blackholes and Baby Universes and other Essays' ('কৃষ্ণগহ্বর এবং শিশুমহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা')।

হকিং ১৯৪২ সালের ৮ই জানুয়ারি অক্সফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কেটেছে উত্তর লণ্ডনের হাইগেটে। পড়তে শিখেছিলেন ৮ বছর বয়সে। স্কুলে কখনোই 'মাঝামাঝি'র ওপরে উঠতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও বহু বিষয়েই প্রতিভার সন্ধান মিলেছিল ছোটবেলাতেই। লক্ষ করবার মতো বিষয় যে ১৭ বছর বয়সে সেই অ্যালবান্স স্কুল ছাড়ার পর গণিত শাস্ত্রে কোনো প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ না করেও তিনি আজ গণিতের অধ্যাপক। স্কুলশেষে অক্সফোর্ডের ভর্তি পরীক্ষায় এতই ভাল করলেন যে একটি স্কলারশিপও জুটে গেল তাঁর। পরে মহাবিশ্বতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য কেম্ব্রিজ যান। কেম্ব্রিজের কিজ কলেজের (Caius College) রিসার্চ ফেলোশিপও পান।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না কখনই। অক্সফোর্ডের শেষ বছরেই ঘোরতর অসুস্থ হন। ইংল্যাণ্ডে এ রোগের নাম এ.এল.এস. (ALS=Amylotrophic Lateral Sclerosis)। আমেরিকায় লু গেরিগের ব্যাধিও বলে। এর মধ্যে জেন ওয়াইল্ডের সঙ্গে বিয়ে হয়। গবেষণার কাজও চলতে থাকে। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত নিজে খেতে পারতেন, বিছানা থেকে নামতে বা উঠতে পারতেন। এর পর তাও কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। প্রথমে এক ছাত্র, পরে সকাল-বিকাল দু' জন নার্স আসতে শুরু করলেন। কথা ক্রমশই জড়িয়ে যাচ্ছিল। ১৯৮৫ সালে ট্রাকিওস্টমি অপারেশন (শ্বাসনালির একটা অপারেশন)-এর পর সম্পূর্ণভাবেই বাক্‌শক্তি হারান।

তিন সন্তানের জনক স্টিফেন ডাব্লিউ হকিং এখনো চলৎশক্তিহীন ও বাক্‌শক্তিরহিত, থাকেন কেম্ব্রিজে। শুধু তাই নয়, তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের লুকেসিয়ান অধ্যাপক (অর্থাৎ স্যার আইজাক নিউটনের চেয়ার এখন তাঁর দখলে)। বিশেষভাবে তৈরি একটি কম্পিউটার তাঁর হুইলচেয়ারের সঙ্গে লাগানো। তাই দিয়েই তিনি অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, নানা জায়গায় মহাকাশতত্ত্ব নিয়ে

www.pathagar.com

বক্তৃতাও করেন।

সৌ. মা.

হজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণপ্রস্তর

আরবি 'হজরে আসওয়াদ' শব্দের অর্থ কৃষ্ণপ্রস্তর। এখানে বিশেষ অর্থে হজরে আসওয়াদ বলতে বোঝায় মক্কায় কাবা (দ্র) শরীফের প্রাচীরগাত্রে স্থাপিত কৃষ্ণপ্রস্তর। হজ্বের (দ্র) সময় এই প্রস্তরের সম্মুখস্থল থেকে কাবা শরীফ 'তাওয়াফ' বা প্রদক্ষিণের সূচনা হয় এবং একবার প্রদক্ষিণ করে এসে এই প্রস্তর চুম্বন করতে হয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ইসলামপূর্ব যুগেও এই প্রস্তর পবিত্র বলে গণ্য হত। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) কর্তৃক মক্কাবিজয়ের পর কাবায় বিদ্যমান সকল প্রস্তরমূর্তি কাবা থেকে সরিয়ে ফেলার পরও এই কৃষ্ণপ্রস্তরটি স্বস্থানে রেখে দেওয়া হয় এবং ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে একে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। কারণ আরবেরা বিশ্বাস করত যে কৃষ্ণপ্রস্তরটি হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে বেহেশ্‌ত্ (দ্র) থেকে ভূপৃষ্ঠে আনীত হয়েছিল।

হজরে আসওয়াদ বিশ্বের সকল মুসলিম কর্তৃক একটি পবিত্রতম বস্তু বলে বিবেচিত।

মো. ই.

হজ্ব

হজ্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সঙ্কল্প করা, কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করা। ইসলামী বিধানমতে হিজরি (দ্র) সনের জিলহজ্ব মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মক্কায় (দ্র) অবস্থিত কাবা (দ্র) ঘর প্রদক্ষিণ ও অন্যান্য কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করাকে হজ্ব বলা হয়।

হযরত ইব্রাহিম (আ.) (দ্র)-এর সময়ে হজ্ব অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, যা এখনো চালু আছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রতি বছর হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় সমবেত হন।

হজ্ব বিশ্ব-মুসলিমের জন্য এক মহামিলনক্ষেত্র। হজ্বের সময় তাঁরা পারস্পরিক ভাববিনিময় ও শুভেচ্ছা আদান-প্রদানের সুযোগ পান, ঐক্য ও আত্মবিশ্বাসের চেতনায় উজ্জীবিত হন।

বিত্তবান মুসলমানের জন্য হজ্ব ফরয্ (দ্র) বা অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য।

মু. মা.

হব্‌স্, টমাস্ [১৫৮৮—১৬৭৯]

বস্তুবাদী ইংরেজ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। হব্‌স্ (Thomas Hobbes)-এর জন্ম ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল। আরো অনেকের মতো তিনিও মনে করতেন, বিশ্বভুবন বস্তুর সমষ্টিমাত্র, মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। মহাশূন্যে চলমান বস্তুপিণ্ডের গতির পরিপ্রেক্ষিতে হব্‌স্ সব কিছু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে বস্তুজগৎ, মানুষ ইত্যাদি সব কিছুই প্রাকৃতিক ও গাণিতিক নিয়মের অধীন, এমনকি মানুষের চিন্তাও। সে হিসাবে মানুষ এক ধরনের যন্ত্র বৈ কিছু নয়।

যান্ত্রিক বস্তুবাদের এই প্রবক্তা আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, বিধাতা মানুষের কল্পনামাত্র। তাঁর রাজনৈতিক রচনা চার্চের সর্বময় কর্তৃত্ব বাতিল করে দিয়েছিল। এসব কারণে কেউ কেউ ধর্মদ্রোহী হিসাবে তাঁর বিচারের দাবিও করেছে।

হব্‌সের ধারণায় জ্ঞান ইন্দ্রিয়নির্ভর, অভিজ্ঞতা-নির্ভর। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ছিল ভিন্ন ধরনের। তাঁর হিসাবে মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছা তথা চুক্তির ভিত্তিতে সমাজ তৈরি, সমাজের ইচ্ছায় রাজশাসন, যা চুক্তিভিত্তিক। সমাজের ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত একচ্ছত্র রাজশাসন সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার সহায়ক। তা সত্ত্বেও ব্যক্তির বিদ্রোহের অধিকার রয়েছে। তাঁর মতে বাস্তবতা ব্যক্তিভিত্তিক।

হব্‌সের বিখ্যাত গ্রন্থ 'লেভিয়াথান' (Leviathan)-এই তাঁর বস্তুবাদী, সংজ্ঞাবাদী (nominalist), চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও যাজকতন্ত্র-বিরোধী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর মৃত্যু ঘটে ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৬৭৯ সালে।

আ. র.

হবিবর রহমান [১৯১২—১৯৭৮]

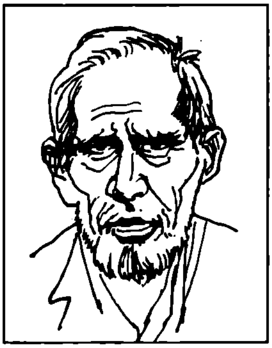

কাঠখোদাই ছাপচিত্রের এক জন দক্ষ শিল্পী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন শিল্পী ও শিক্ষক হবিবর রহমান। তাঁর জন্ম ১৯১২ সালে। কলিকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল থেকে ১৯৩৬ সালে পাশ করেন। ১৯৩৭ সালে

www.pathagar.com

উক্ত প্রতিষ্ঠানে কাঠখোদাই-এর শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটে কাঠখোদাই-এর শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে ১৯৭০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। পাকিস্তান (দ্র) আমলে এবং বাংলাদেশের (দ্র) প্রথম দিকে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীতে তাঁর সাদা-কালো কাঠখোদাই ছাপচিত্র দিয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এই শিল্পী ১৯৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

হা. খা.

হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী [১৯০৬—১৯৬৬]

রাজনীতিবিদ ও লেখক। তাঁর নাম বিভিন্ন জন নানা ভাবে লিখে থাকেন, যেমন— হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, হাবীবুল্লা বাহার চৌধুরী, হাবীবুল্লাহ বাহার ইত্যাদি। তিনি প্রথম দিকে নিজের লেখা বইয়ে বানান লিখেছেন— মুহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার। তিনি ১৯০৬ সালে নোয়াখালি জেলার ফেনীর গুথুমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। মাতামহ খান বাহাদুর আবদুল আজিজের চট্টগ্রামের বাড়িতে তাঁর শৈশব -কৈশোর অতিবাহিত হয়।

হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে ১৯২২ সালে ম্যাট্রিক, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ১৯২৪ সালে আই.এসসি., কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯২৮ সালে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। খেলাধুলায়ও তিনি প্রবলভাবে উৎসাহী ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে ক্লাবটি প্রথম বিভাগে উন্নীত হয়।

হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ১৯৩২ সালে ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সূর্য সেনের (দ্র) বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে পুলিশ রিপোর্ট অনুকূল না হওয়ায় তিনি চাকুরিতে নিয়োগ লাভে ব্যর্থ হন। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। ছোট বোন শামসুননাহার মাহমুদের (দ্র) যুগ্ম-সম্পাদনায় তিনি ১৯৩৩ সালে চতুর্মাসিক সাহিত্যপত্র 'বুলবুল' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষে (১৯৩৪) ত্রৈমাসিক ও তৃতীয় বর্ষে (১৯৩৬) মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হয়।

হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী পাকিস্তান আন্দোলনে (দ্র) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি মুসলিম লীগের (দ্র) ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (আপার হাউস) সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪৬ সালে ফেনীর পরশুরাম এলাকা থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। কলিকাতা পোর্ট হজ কমিটির (১৯৪৬-১৯৪৮) নির্বাচিত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান (দ্র) প্রতিষ্ঠার পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

তিনি ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি এবং পূর্ব-পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের (১৯৫১) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

নানাবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী নিরবচ্ছিন্নভাবে গদ্যচর্চা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হল 'ওমর ফারুক', 'আমীর আলী', 'মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ', 'পাকিস্তান' ইত্যাদি। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে নজরুল দু'বার চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেন। ১৯৬৬ সালের ১৫ই এপ্রিল তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। 'হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজ' নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তাঁর স্মরণে স্থাপিত হয়েছে।

সুজ. ব.

হযরত মুহম্মদ (স.) মুহম্মদ (স.), হযরত দ্র

হরতাল

ধর্মঘটের (দ্র) সর্বাত্মক রূপের একটি হচ্ছে হরতাল। সাধারণত হরতালের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে কোনো

www.pathagar.com

চরম দুঃখজনক, শোকাবহ কিংবা জনস্বার্থ-বিরোধী ঘটনার প্রতিবাদে কিংবা কোনো গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে ক্ষমতাসীন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য চরম রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে।

সাধারণ ধর্মঘটে বিশেষত এক বা একাধিক শিল্পকারখানা বা দপ্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি চলে থাকে। কিন্তু হরতালের চরিত্র ভিন্ন এবং এর আওতা আরো সম্প্রসারিত। হরতালের কর্মসূচিতে সাধারণ দোকানপাট, প্রায় সব ধরনের পরিবহণযান চলাচল, কলকারখানা, সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কাজকর্ম একযোগে বন্ধ রাখার এবং অতীব জরুরি কোনো কোনো সরকারি-বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ চালু রাখার ডাক দেওয়া হয়।

হরতাল পালনের মেয়াদকাল কখনো কখনো ৬ ঘণ্টা, ১২ ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টা, ৩৬ ঘণ্টা এবং ৪৮ ঘণ্টা কিংবা তারও অধিক সময়সীমা পর্যন্ত গড়াতে পারে। এর স্থায়িত্বকাল সম্পূর্ণতই নির্ভর করে হরতাল আহ্বানকারীদের রাজনৈতিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারবিবেচনা এবং তাদের দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষের মনোভাবের নমনীয়তার ওপর।

অবশ্য হরতাল যথাযথভাবে পালনের ব্যাপারটি নির্ভর করে যে রাজনৈতিক দল বা জোট যে বা যেসব কর্মসূচির ভিত্তিতে এটা আহ্বান করেছে, সেই কর্মসূচির গুরুত্বের ওপর এবং সমাজের সর্বশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকের তাতে স্বতঃস্ফূর্ত বা সচেতন সমর্থন ও সম্মতির ওপর। অবশ্য আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে অনেক সময় হরতাল পালনে জনসাধারণকে বাধ্য করার নজির আমাদের সমাজে বিরল ঘটনা নয়।

আ. হু.

হরপ্পা

হরপ্পা নগরী প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার (দ্র) অন্যতম নিদর্শন। পাঞ্জাবের মন্টগোমারি জেলায় বর্তমান জেলাশহরের ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন, খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দের কিছু পূর্বে সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। মহেনজোদারো (দ্র) থেকে প্রায়

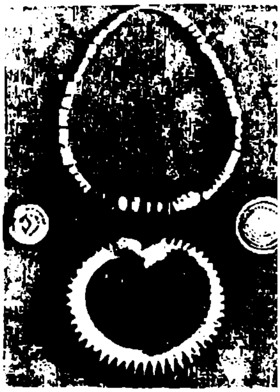

হরপ্পায় প্রাপ্ত চিত্রিত পাত্র ও পোড়ামাটির অলঙ্কার
নিচে: পোড়ামাটির গরুর গাড়ি

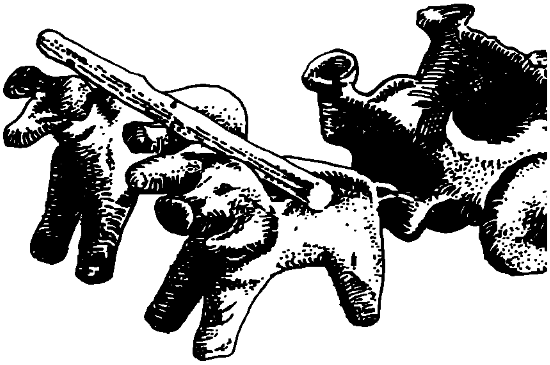

৪০০ মাইল দূরে অবস্থিত হলেও দু'টি নগরীই সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক কালের প্রতিনিধিত্ব করে। সম্ভবত আর্যদের হাতে একটি অনার্য গোষ্ঠীর পরাজয়ের স্থান হিসাবে ঋগ্বেদে (দ্র) উল্লিখিত হরি ইয়াপ্পা নাম থেকে বর্তমান হরপ্পা নামের উৎপত্তি।

হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা গেছে যে এখানে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পভিত্তিক একটি নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পরিকল্পিত নগরীটিতে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত দুর্গ, শ্রমিকদের কর্মশালা এবং আবাসগৃহ, শস্যভাণ্ডার এবং কবরস্থানের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। মূল দুর্গ উত্তর-দক্ষিণে ৪৬০ গজ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২১৫ গজ বিস্তৃত। হরপ্পার নির্মাণকাজে কাদামাটি এবং পোড়ামাটির ইট ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

হরপ্পার অধিবাসীরা ব্রোঞ্জ (দ্র) ও তামার (দ্র) তৈরি তৈজসপত্র এবং পাথরের তৈরি পাত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার জানত। অলঙ্কারাদিতে সোনা (দ্র) ও রূপার (দ্র) ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায় যে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে হরপ্পার ব্যবসায়িক যোগসূত্র ছিল। জলপথে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গেও হরপ্পার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল বলে অনুমান করা হয়। হরপ্পায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক থেকে জানা যায়, সেখানে দুই চাকা বিশিষ্ট বলদে টানা গাড়ির প্রচলন ছিল। ওজন এবং মাপের সঠিক ও প্রায় নির্ভুল ব্যবহার হরপ্পায় সামাজিক শৃঙ্খলার পরিচয় বহন করে। বহু সংখ্যক ওজন ও মাপের একক পরীক্ষা করে এই তথ্য পাওয়া যায়।

যদিও বাণিজ্য ও শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর নগরী হিসাবে হরপ্পা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয়, তবুও এর মূল অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। হরপ্পা সন্নিহিত এলাকায় বিভিন্ন ধরনের শস্য, বিশেষ করে গম (দ্র) ও বার্লির চাষ করা হত। গরু (দ্র), মহিষ (দ্র)ও কুকুর (দ্র) ছিল কৃষকের গৃহপালিত পশু। কৃষিকাজে পরিবহণের ক্ষেত্রে উট (দ্র) এবং গাধাও (দ্র) ব্যবহার করা হত বলে অনুমান করা হয়।

কারুকার্যখচিত ব্রোঞ্জ, তামা, রূপা ও মৃৎপাত্র এবং বিভিন্ন অলঙ্কারের নিদর্শন থেকে হরপ্পার কুশলী কারিগরদের শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

হরপ্পায় সিন্ধু সভ্যতার পতন সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে উন্নততর শক্তির অধিকারী আর্যদের আক্রমণ ও প্রতিকূল আবহাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে এই সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে।

ফ. র.

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [১৮৫৩—১৯৩১]

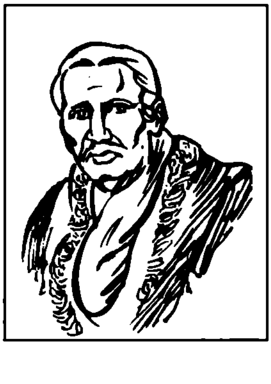

পণ্ডিত, বহুভাষাবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। ১৮৫৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটির এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রায়কমল ভট্টাচার্য। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হলে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যান। ১৮৭১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে এণ্ট্রান্স, ১৮৭৩ সালে এফ. এ. (ফার্স্ট আর্টস্) এবং ১৮৭৬ সালে অষ্টম স্থান অধিকার করে বি. এ. এবং ১৮৭৭ সালে এম. এ. পাশ করেন। এম. এ. পরীক্ষায় একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং এ জন্য 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন।

কলেজে বি. এ. অধ্যয়নকালে তিনি 'ভারত মহিলা' নামে গবেষণামূলক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে পুরস্কৃত হন। এই নিবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দ্র) তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এটিই হরপ্রসাদের প্রথম রচনা। পরে ১৮৮১ সালে এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা হেয়ার স্কুলের শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আগ্রহে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন এবং ১৮৯১ সালে সেখানকার সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পান। কয়েক বছর প্রেসিডেন্সি কলেজের (দ্র) সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকরূপে কাজ করার পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে ৮ বছর কাজ করে ১৯০৮ সালে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তিন বছরকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (দ্র)-এর জন্মলগ্ন থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কয়েক বার তিনি পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। পরপর দু'বার এশিয়াটিক সোসাইটিরও সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদকও ছিলেন। এই সূত্রে ভারতের নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত সংস্কৃত, বাংলা, মৈথিলী, রাজস্থানি প্রভৃতি ভাষার পুঁথি এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।

পুঁথির সন্ধানে হরপ্রসাদ কয়েক বার নেপালেও (দ্র) যান। তিনিই নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ বলে অনুমিত চর্যাপদ (দ্র) বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামক পুঁথি উদ্ধার করে এনে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-

www.pathagar.com

সাহিত্য- পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন। তিনি কবি অশ্বঘোষের (দ্র) 'সৌরানন্দ'-র পুঁথি আবিষ্কার করেন। পালযুগের বাঙালি কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর সংস্কৃত দ্ব্যর্থক ঐতিহাসিক কাব্য 'রামচরিতে'র পুঁথিও তাঁর আবিষ্কার। নিজের সংগৃহীত তথ্যসূত্র অবলম্বনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নানা দিক সম্বন্ধে, বিশেষভাবে মহাযান (দ্র) বৌদ্ধধর্ম নিয়ে ইংরেজি ও বাংলায় তিনি সর্বপ্রথম ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাধর্মী রচনার পাশাপাশি সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও হরপ্রসাদের সার্থকতা অনস্বীকার্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল—'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' (১৯২৩), 'বাল্মীকি জয়' (১৮৮১), 'মেঘদূত' (১৯০২), 'কাঞ্চনমালা' (১৯১৬), 'সচিত্র রামায়ণ', 'বেনের মেয়ে' (১৯২০), 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' (১৯৪৬), 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯৪৮) প্রভৃতি এবং 'Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education' (১৮৯১), 'Discovery of Living Buddhism in Bengal' (১৮৯৭), 'Magadhan Literature' (১৯২৩) প্রভৃতি। তাঁর এসব রচনা প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বহু নতুন তথ্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান করে। এর আগে ১৮৯৮ সালে তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন।

১৯৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

সুজ. ব.

হরমোন (hormone)

জীবদেহের অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক উপাদানের নাম হরমোন। হরমোন রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে শরীরের এক অংশ থেকে অন্য অংশে স্থানান্তরিত হয়ে দেহের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। হরমোন শব্দটি গ্রিক, এর অর্থ কর্মতৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করা।

বেলিস (Sir William Bayliss) ও স্টার্লিং (Earnest Henry Starling) নামে দুই শারীরবিজ্ঞানী ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম সিক্রিটিন নামক হরমোনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। সব মিলিয়ে মানবদেহে এ পর্যন্ত ৪০টির মতো হরমোনের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে। শরীরে হরমোনের অভাবে বা অতি-নিঃসরণের ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়। মানবদেহে হরমোন বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে। যেমন সোমাটোট্রফিন শরীর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, থাইরক্সিন সামগ্রিকভাবে বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, ইনসুলিন (দ্র) শরীরে গ্লুকোজ (দ্র) নামক শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ইত্যাদি।

বিজ্ঞানীরা শরীরের জীবন্ত কোষ থেকে হরমোন পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষণাগারে কৃত্রিম হরমোন উৎপাদনের ফলে নানা ধরনের হরমোন সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে। হরমোনের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসায় ও পশুসম্পদ উন্নয়নে কৃত্রিম হরমোন ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদজাত হরমোন বর্তমানে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

সি. না. হ.

হরলাল রায় [১৯১৪—১৯৯৪]

বিখ্যাত লোকসঙ্গীতগুণী। ভাওয়াইয়া গায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গীতি রচনায়ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রংপুর জেলার সুবর্ণখালি গ্রামে জন্ম। পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। কিন্তু গায়ক, গীতিরচয়িতা ও সুরকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত-শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় তাঁর পুত্র।

ক. গো.

হরিণ (deer)

হরিণ বিভক্ত-খুরবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী। গরু (দ্র)-ছাগল-মহিষের (দ্র) আত্মীয়। মরুভূমি (দ্র), তুন্দ্রা জলাভূমি, পার্বত্য এলাকাসহ পৃথিবীর সবখানেই বাস করে। পৃথিবীতে হরিণের প্রজাতির সংখ্যা ৬০। বাংলাদেশে ৫টি ছিল; বর্তমানে মায়া ও চিত্রাসহ দু'-তিনটি প্রজাতি সুন্দরবন (দ্র), সিলেট এবং চট্টগ্রামের (দ্র) অরণ্যে বেঁচে আছে।

www.pathagar.com

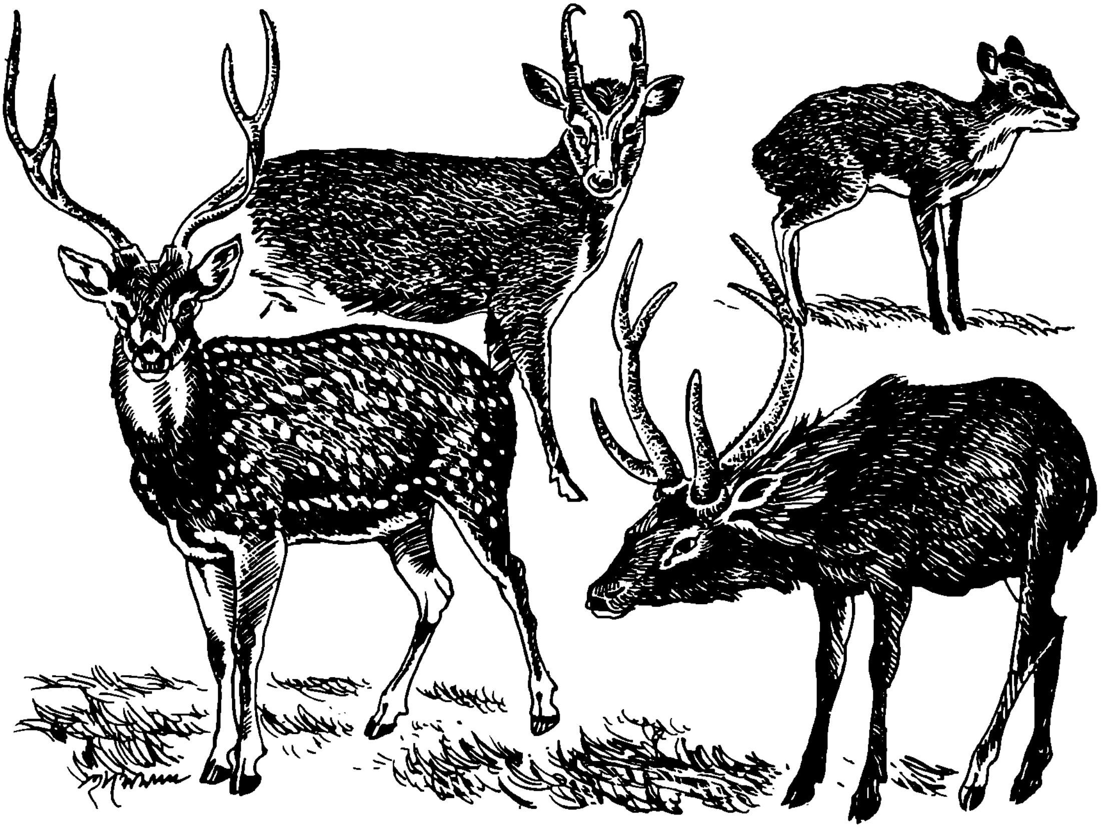

বাংলাদেশের পাঁচ প্রজাতির হরিণের মধ্যে উপরের চারটি হল চিত্রা, মায়া, মাউস ও শম্বর

হরিণের দেহ চিকণ, পা লম্বা, মাথা সরু, নাক ছোট, ঠোঁট নড়নক্ষম। গায়ের রঙ প্রধানত লালচে বাদামি। কোনো কোনো প্রজাতির দেহে ফোঁটা থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) পুডু (pudu) ক্ষুদ্রতম প্রজাতি। ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু ও ৯ কেজি ওজন। উত্তর আমেরিকার (দ্র) মুজ (moose) বৃহত্তম প্রজাতি। ২.৩ মিটার উঁচু ও ৮০০-৮২০ কেজি ওজন।

হরিণের বিশেষত্ব এর শাখা-প্রশাখাযুক্ত শিং বা অ্যান্টলার (antler)-এ। শুধু পুরুষ-হরিণেরই অ্যান্টলার গজায়। মাস্ক ও চায়নিজ ওয়াটার ডিয়ারের অ্যান্টলার নেই; স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে রেইন ডিয়ারের আছে। এটি প্রথম বেরোয় ১-২ বছর বয়সে। প্রতি বছর তা ঝরে পড়ে ও নতুনভাবে বেশি শাখা-প্রশাখা নিয়ে গজায়। কোনো কোনো প্রজাতির ওপরের চোয়ালে লম্বা ছেদনদাঁত থাকে।

তৃণভোজী হরিণের পাকস্থলী গরুর মতোই চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। ঘাস (দ্র), গাছের কুঁড়ি, পাতাসহ শাখা, ছাল প্রভৃতি খায়। খাদ্যের সন্ধানে বহুদূর পথ পাড়ি দেয়।

প্রজাতিভেদে ৫ থেকে ১০ মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-হরিণ এক বা দু'টি বাচ্চার জন্ম দেয়। নবজাতকের দেহে ফোঁটা থাকে।

মাংস, চামড়া ও শিং-এর লোভে, ঔষধ তৈরির জন্য অবৈধ শিকারের কারণে অনেক প্রজাতিই সংখ্যায় কমে গেছে। বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশেই খামারভিত্তিক হরিণ পোষা হচ্ছে।

হরিণ প্রজাতিভেদে ১০-২০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

www.pathagar.com

হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতের খ্যাতনামা সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ৬০৬–৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ (মতান্তরে, ৬৪৮ খ্রি.)। তাঁর পিতা মহারাজ প্রভাকরবর্ধন। বড় ভাই রাজ্যবর্ধন গৌড়ের সম্রাট শশাঙ্কের (দ্র) হাতে নিহত হলে হর্ষবর্ধন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং শশাঙ্ককে দমন করেন। তিনি আপন ক্ষমতা, বুদ্ধি এবং দক্ষতাবলে মাত্র ছয় বছরের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন। এভাবে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন।

শুধু রাজ্যশাসক হিসাবে নয়, কবি ও নাট্যকার হিসাবে হর্ষবর্ধন বিখ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী' তাঁর রচনা। তাঁর রাজধানী কনৌজ ছিল সাহিত্য ও শিল্পকলার যথার্থ লালনস্থল। বিখ্যাত কবি বাণভট্ট তাঁর সভাকবি ছিলেন। বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের জীবনভিত্তিক গ্রন্থ 'হর্ষচরিত' রচনা করেন।

মু. মা.

হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন শিবরাম চক্রবর্তী দ্র

হলুদ

বহু বর্ষজীবী ঔষধি। উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এর চাষ হয়। এই কন্দটির বৈজ্ঞানিক নাম *কারকুমা লঙ্গা* (Curcuma longa), গোত্র জিঞ্জিবেরাসি (Zingiberaceae)। আদাও এই গোষ্ঠীতে পড়ে। হলুদ নিত্য রান্নার কাজে লাগে রঙ করার জন্য। আসলে এর অনেক গুণ আছে ও তা শরীরের জন্য খুব দরকারি। এ ছাড়া নানা জিনিস রাঙানোর জন্যও এটি লাগে। পাতা কলাবতী, শটি বা ছোট কলাপাতার মতো। চৈত্র-বৈশাখ মাস রোয়ার সময়। আষাঢ়-শ্রাবণে ফুল ফোটে। ফুল সেদ্ধ করে ভর্তা করে খাওয়া যায়। দু' বছর পর তুললে ভালো হলুদ হয়। ফাল্গুন মাসে হলুদ তুলতে হয়, তখন গাছ মরে যায়। কাঁচা হলুদ পানিতে সেদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে তুলে রাখা যায়। খাওয়ার জন্য গুঁড়ো করে বা বেটে নিতে হয়। আমাদের দেশের সর্বত্র হলুদ জন্মে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ের গায়ের ঢালুতে ভালো হলুদ জন্মে।

বিবাহ ও মঙ্গলকাজে হলুদ অপরিহার্য। গায়ে-হলুদের সময় হলুদ-বাটা গায়ে মাখা হয়। তেল-হলুদ মেখে স্নান করলে গায়ের রঙ সুন্দর হয়। এ জন্য বয়স্করাও মসুর ডাল ও কাঁচা হলুদ বেটে দুধের সর মিশিয়ে মুখে মাখে। তাতে মুখের লালিত্য ফিরে আসে। হলুদে রয়েছে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা, ব্যাক্টেরিয়া (দ্র) নাশ করার শক্তি। এ ছাড়া কৃমিরোগে (দ্র), যকৃৎ (দ্র)-এর দোষে, তোতলামিতে, হাম (দ্র) জ্বরে, এলার্জিতে (দ্র), হাঁপানিতে (দ্র), চোখ ওঠায়, বিষাক্ত ক্ষতে, মচকানো ব্যথায়, ফোড়ায়, স্বরভঙ্গে হলুদ খুব উপকারী। জোঁকের মুখে হলুদ বাটা বা হলুদের গুঁড়ো দিলে জোঁক পড়ে যায়, রক্ত পড়াও বন্ধ হয়।

বি. ব.

হলোগ্রাফি (holography)

হলোগ্রাফি হল কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি ধারণ এবং তা পুনরায় প্রদর্শনের পদ্ধতি।

সাধারণ ফটোগ্রাফে কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির শুধু উজ্জ্বলতা ফিল্মে ধারণ করা হয়। হলোগ্রামে বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি ছাড়াও অপর একটি আলোকরশ্মির (যা রেফারেন্স রশ্মি হিসাবে পরিচিত) উজ্জ্বলতা এবং একই সঙ্গে তরঙ্গ-দশা (wave phase) ধারণ করা হয়। সাধারণ ফটোগ্রাফিক প্লেট বা ফিল্মই হলোগ্রামের জন্য ব্যবহৃত হয়। দু'টি আলোকরশ্মির উজ্জ্বলতা ও তরঙ্গ-দশার প্রভাবে ফটোগ্রাফিক ফিল্মে একটি ব্যতিচার নকশা বা ইন্টারফেরোগ্রাম ফুটে ওঠে।

হলোগ্রামটিকে অনুরূপ রেফারেন্স রশ্মি দ্বারা আলোকিত করা হলে আদি বস্তুর অবিকল ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

হলোগ্রাফির জন্য একই তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও দশার আলোকরশ্মি প্রয়োজন। এই জন্য লেজার রশ্মি (দ্র) ছাড়া হলোগ্রাফি সম্ভব নয়।

লেজার রশ্মির একটি বীমকে ভেঙে দু'টি বীমে পরিণত করা হয়। এর একটি রেফারেন্স রশ্মি হিসাবে সরাসরি ফটোগ্রাফিক প্লেটে পড়ে। অপর রশ্মিটি বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে প্লেটে পড়ে। দু'টি আলোকরশ্মি তখন ঐ প্লেটে একটি ব্যতিচার নকশা ফুটিয়ে তোলে। এভাবে একটি হলোগ্রাম তৈরি হয়।

ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থাপনা, ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ তৈরি,

www.pathagar.com

জীবকোষের এক্স-রে হলোগ্রাফি ইত্যাদিতে ব্যবহার ছাড়াও হালে কম্পিউটার মেমোরি ও ডাটা প্রসেসিং-এ হলোগ্রাফির ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে।

হলোগ্রাফির ব্যবহারের সাহায্যে অ্যানিমেশান চলচ্চিত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

মু. হা.

হাইগ্রোমিটার আর্দ্রতা দ্র

হাইড্‌ন্, ফ্রান্ৎস্ ইওসেফ [১৭৩২—১৮০৯]

বিশ্ববিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতকার। হাইড্‌ন্ (Franz Joseph Haydn) আধুনিক পাশ্চাত্য যন্ত্রসঙ্গীতের জনকতুল্য। অস্ট্রিয়ার বোরাউ গ্রামে দরিদ্র পরিবারে ১৭৩২ সালে জন্ম। প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের বলে খ্যাতির উচ্চতম শিখরে পৌছান। বাল্যে ফ্রানাখ নামক স্কুলশিক্ষকের সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত বেহালা ও কয়েকটি যন্ত্রে হাইড্‌নের হাতেখড়ি (দ্র) হয়। ন' বৎসর বয়সে আসেন ভিয়েনায় ও সেখানে কণ্ঠসঙ্গীতসহ পিয়ানো (দ্র), ক্ল্যাভিয়ার প্রভৃতি বাদনের পাঠ গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি লাতিন ভাষা ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ষোল বছর বয়স থেকে হাইড্‌ন্ গানবাজনা শিখিয়ে জীবিকা অর্জন করতে শুরু করেন। ক্রমে তাঁর খ্যাতি হয় ও তিনি একটি অর্কেস্ট্রা (দ্র) পরিচালকের কাজ পান। কিছু দিন পরে তিনি এস্টারহাটসি রাজকীয় পরিবারের ব্যাণ্ড পার্টির সঙ্গীত পরিচালক নিযুক্ত হন। এ সময়েই দেশে-বিদেশে হাইড্‌নের সঙ্গীতখ্যাতি বিস্তার লাভ করে। ১৭৯০ সালে তিনি লণ্ডন (দ্র) রওনা হন। সেখানে তাঁর অসামান্য সমাদর ঘটে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অব মিউজিক খেতাবে ভূষিত করে। ১৭৯৫ সালে তিনি ভিয়েনায় ফিরে আসেন এবং পরপর কয়েকটি ওরাটোরিও রচনা করেন। সঙ্গীত রচনায় মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করতেন বলে সে সময় থেকেই হাইড্‌নের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৮০৮ সালের দিকে তিনি একেবারে অসমর্থ হয়ে পড়েন। ১৮০৯ সালে ভিয়েনায় তাঁর মৃত্যু হয়। দেড় শতাধিক সিম্ফনি, সত্তরের ওপর স্ট্রিং কোয়ার্টেট, কয়েকটি অপেরা (দ্র), ওরাটোরিও, বেশ কিছু গান ও নানা ধরনের যন্ত্রসঙ্গীত রচনা করেন হাইড্‌ন্। তিনি ছিলেন সঙ্গীতের অসামান্য কবি। সুউচ্চ সৌন্দর্যবোধ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁকে আধ্যাত্মিক সঙ্গীতকার রূপে বর্ণনা করা হয়। বিশ্ববিখ্যাত বেটোফেন্ (দ্র) হাইড্‌নের ছাত্র ছিলেন।

ক. গো.

হাইডেল্‌বার্গ্ মানব (Heidelberg man)

হাইডেল্‌বার্গ্ হল জার্মানির একটি স্থানের নাম। ১৯০৭ সালে শ্রমিকেরা এখানে কাজ করতে গিয়ে একটি চোয়ালের হাড় ও দাঁত পায়। আধুনিক মানুষের চেয়ে চোয়ালটি বেশ বড়। থুতনি তার নেই বলতে গেলে। দাঁত বড় বড়, তবে মানুষের দাঁতের মতোই। চার থেকে সাড়ে ছ' লক্ষ বছর আগে এটি জীবিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। এর চোয়ালের ও দাঁতের গড়নে মানুষের বৈশিষ্ট্যের আভাস মেলে।

হাইডেল্‌বার্গে পাওয়া গেছে বলে এটি 'হাইডেল্‌বার্গ্ মানব' নামে পরিচিত। তবে একে 'মাওয়ের মানব'ও বলা হয়। কারণ আসলে হাইডেল্‌বার্গ্ থেকে মাইল কয়েক দূরে 'মাওয়ের' নামক গ্রামে এটি পাওয়া গিয়েছিল।

আজকের দিনে অবলুপ্ত মহিষ (দ্র) ধরনের জীব, হরিণ (দ্র), হাতি(দ্র), আমেরিকার চমরি গাইয়ের মতো পশু এবং গণ্ডার (দ্র) জাতীয় জীব হাইডেল্‌বার্গ্ মানব শিকার করে খেত। হাইডেল্‌বার্গ্ মানব সম্ভবত পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে জানত।

সৈ. আ. ই.

হাইড্রলিক প্রেস (hydraulic press)

এক ধরনের যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে আবদ্ধ পানির (দ্র) চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে সেই চাপ-শক্তি দ্বারা অনেক শক্ত কাজ সহজে করা যায়। তরল পদার্থের একটি সাধারণ ধর্ম হচ্ছে, আবদ্ধ পাত্রে রাখা তরল পদার্থের যে কোনো স্থানে চাপ প্রয়োগ করা হলে সেই চাপ একই শক্তিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আর পদার্থের উপরিভাগের আয়তন অনুসারে ঐ চাপের পরিমাণ বেড়ে যায়। হাইড্রলিক প্রেস যন্ত্রে এই নীতি ব্যবহার করা হয়। এতে তরল পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয় পানি। এই যন্ত্রে ছোট একটি পিস্টনের (দ্র) সাহায্যে অল্প পানিতে সামান্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। সামান্য পানির পাত্রের সাথের নলের মাধ্যমে বেশি পানির পাত্রের সংযোগ

www.pathagar.com

থাকে। ফলে ছোট পিস্টনের চাপ বেশি পানির উপরিভাগে অনেক বেশি চাপে পরিণত হয় অর্থাৎ সেখানকার বড় পিস্টনের নিচে যে ঊর্ধ্বমুখী চাপ পড়ে সেই চাপের পরিমাণ হয় অনেক বেশি। এভাবেই কম শক্তি ব্যবহার করে বেশি শক্তি পাওয়া যায় এবং তা নানা ধরনের কাজে লাগানো হয়। পাট (দ্র), তুলা (দ্র) ইত্যাদির গাঁট-বাঁধা এবং ভারি মাল উপরে তোলার কাজে হাইড্রলিক প্রেস ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সু. ব.

হাইড্রোকার্বন (hydrocarbon)

কার্বন (দ্র) ও হাইড্রোজেন (দ্র)-এর রাসায়নিক সংযোগের মাধ্যমে গঠিত বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সাধারণ নাম। যেমন মিথেন (দ্র), ইথেন (C_2H_6) ইত্যাদি। পেট্রোলিয়াম (দ্র) এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের (দ্র) প্রধান উপাদান হচ্ছে এই হাইড্রোকার্বন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহেও নির্দিষ্ট কয়েকটি হাইড্রোকার্বন আছে।

বর্তমানে হাইড্রোকার্বন বলতে আমরা প্রধানত পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বুঝে থাকি। এই দু'টি হাইড্রোকার্বন জ্বালানি হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ফলে এই হাইড্রোকার্বন সম্পদ যেসব দেশের রয়েছে, সেসব দেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা রপ্তানি করে বিপুল সম্পদ আহরণ করে চলেছে। হাইড্রোকার্বনের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ বাংলাদেশে (দ্র) বেশ উল্লেখযোগ্য।

সু. ব.

হাইড্রোজেন (hydrogen)

মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ। এটি স্বাদহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন, কিন্তু দাহ্য পদার্থ। এ গ্যাস নিজে জ্বলে, অক্সিজেনের (দ্র) মতো অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে না। সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ। এর রাসায়নিক সঙ্কেত H, পারমাণবিক ওজন ১.০০৮ এবং পারমাণবিক সংখ্যা ১। একে বাতাসে পোড়ালে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে পানি (H_2O) তৈরি করে। পানির প্রতিটি অণুতে রয়েছে দু'টি হাইড্রোজেন-পরমাণু অর্থাৎ এটি দ্বি-পরমাণু গ্যাস। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে রয়েছে একটি প্রোটন (দ্র) ও একটি ইলেক্ট্রন (দ্র), কোনো নিউট্রন (দ্র) নেই। এ মহাবিশ্বে (দ্র) অন্যান্য মৌল পদার্থের চেয়ে হাইড্রোজেন বেশি রয়েছে। পৃথিবীতে পানি (দ্র), প্রেট্রোলিয়াম (দ্র), চিনি (দ্র) ও অন্যান্য অনেক পদার্থে হাইড্রোজেন আছে। হাইড্রোজেনশিখায় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। অক্সিহাইড্রোজেন টর্চ বা শিখা উৎপাদনে হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয়। এই শিখা ধাতু (দ্র) কাটতে, গলাতে ও ঝালাইয়ে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া এর ব্যবহার রয়েছে কৃত্রিম উপায়ে অ্যামোনিয়া (দ্র) তৈরি ও উদ্ভিজ্জ ঘৃত উৎপাদনে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিশেষ যৌগ হাইড্রোজেন পারক্সাইড (দ্র) জীবাণুরোধক, বিরঞ্জক (ব্লিচিং) ও জারক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোজেন অত্যন্ত হালকা বলে এয়ারশিপ (ইঞ্জিনযুক্ত বেলুন) উড্ডয়নের জন্য হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হত। দুর্ভাগ্যক্রমে বায়ু (দ্র) ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ কোনোভাবে জ্বলে উঠলে তা বিস্ফোরণ ঘটায়। এভাবে অনেক এয়ারশিপ বিস্ফোরিত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে এয়ারশিপে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে হিলিয়াম (দ্র) ব্যবহৃত হয়। হিলিয়াম জ্বলে না। ফিউশান প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসকে একত্রিত করে ভারি পরমাণু (দ্র) তৈরির ফলে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তা হাইড্রোজেন বোমার (দ্র) কাজে লাগানো হয়।

হো. আ.

হাইড্রোজেন পারক্সাইড (hydrogen peroxide)

হাইড্রোজেন (দ্র) অক্সিজেনের (দ্র) সঙ্গে যুক্ত হয়ে দু' রকম অক্সাইড (দ্র) তৈরি করে। একটি অক্সাইডকে হাইড্রোজেন মনোক্সাইড (H_2O) বলা হয়। এটা আসলে আমাদের অতি পরিচিত পানির রাসায়নিক নাম। অপর অক্সাইডটিকে হাইড্রোজেন পারক্সাইড বলা হয়। এর সঙ্কেত H_2O_2। ১৮০৪ সালে বিজ্ঞানী লুই জাক্ তেনার্ (Thénard) এটি প্রথম আবিষ্কার করেন।

গবেষণাগারে সাধারণত বেরিয়াম পারক্সাইড এবং লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইড্রোজেন পারক্সাইড তৈরি করা হয়। মার্কের পদ্ধতিতে বেরিয়াম পারক্সাইডের বদলে সোডিয়াম পারক্সাইড ব্যবহার করা হয়। এভাবে তৈরি করা পাতিত তরলে ৩০% হাইড্রোজেন পারক্সাইড থাকে এবং তা বাজারে পারহাইড্রল নামে বিক্রি

www.pathagar.com

হয়। একে মার্কের পারহাইড্রল (Merck's Perhydrol) বলে।

ঘন হাইড্রোজেন পারক্সাইড বাজারে বিক্রি করা হয় না। বাজারে যে হাইড্রোজেন পারক্সাইড পাওয়া যায় তাতে পানি মেশানো থাকে। বোতলের গায়ে এর শক্তি লেখা থাকে ১০ আয়তন, ২০ আয়তন ইত্যাদি। এক মিলিলিটার হাইড্রোজেন পারক্সাইড থেকে প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে যত মিলিলিটার অক্সিজেন পাওয়া যায় সেটাকেই এর শক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। ১০ আয়তন-এর অর্থ ১ সিসি। ১০ আয়তন হাইড্রোজেন পারক্সাইড থেকে প্রমাণ বায়ুচাপ এবং তাপমাত্রায় ১০ সিসি অক্সিজেন পাওয়া যায়।

হাইড্রোজেন পারক্সাইড বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ। পানির সঙ্গে এটাকে যে কোনো অনুপাতে মেশানো যায়। হাইড্রোজেন পারক্সাইডের জারণ-ক্ষমতাই এর অন্যতম প্রধান রাসায়নিক ধর্ম।

চিকিৎসাক্ষেত্রে জীবাণুনাশক হিসাবে এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। এ ছাড়া রসায়নাগারে জারকরূপে এবং তৈলচিত্র, উল, সিল্ক (দ্র), হাতির দাঁতের সামগ্রী বিরঞ্জন ও পরিষ্কার করার জন্য হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়।

সা. এ.

হাইড্রোজেন বোমা (hydrogen bomb)

হাইড্রোজেন বোমা ভয়ঙ্কর এক মারণাস্ত্র। এর ধ্বংসক্ষমতা লক্ষ লক্ষ টন টি. এন. টি.-এর চেয়ে বেশি।

হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এমনকি পরমাণু-বোমা (দ্র) থেকেও বেশি। হাইড্রোজেন বোমাকে থার্মোনিউক্লিয়ার বোমাও বলা হয়। এটি একটি কৌশলগত (strategic) সমরাস্ত্র।

প্রচণ্ড উষ্ণতায় হাইড্রোজেন আইসোটোপ (দ্র) হিলিয়ামে (দ্র) পরিণত হয়। এই বিক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। এভাবে হালকা পদার্থের পরমাণু (দ্র) অপেক্ষাকৃত ভারি পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন।

হাইড্রোজেন বোমা হল প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী সমরাস্ত্র যার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার উৎস হল হাইড্রোজেন আইসোটোপের হিলিয়ামে পরিণত হওয়ার ফিউশন। একটি পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ সৃষ্টি করা হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ১৯৫২ সালে প্রথম এই বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ১৯৬৩ সালে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে বায়ুমণ্ডলে (দ্র), পানির (দ্র) নিচে ও মহাশূন্যে এই বোমা পরীক্ষা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ভূ-গর্ভে এই পরীক্ষা চালানো যায়।

যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন (দ্র), চীন (দ্র), ফ্রান্স ও ভারতের (দ্র) এই বোমা তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করা হয় নি।

মু. হা.

হাইড্রোফোবিয়া জলাতঙ্ক দ্র

হাইড্রোলাইসিস (hydrolysis)

পানির (দ্র) সঙ্গে কোনো পদার্থের বিক্রিয়ার ফলে আংশিক বা পূর্ণ বিশ্লেষণ ঘটলে সে রকম বিক্রিয়াকে হাইড্রোলাইসিস্ বলা হয়। সাধারণত অধিকাংশ লবণ পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড (দ্র) এবং ক্ষারক তৈরি করে। যেমন—

$$(Na_2CO_3 + 2H_20 = 2\ Na\ 0H + H_2C0_3$$

সোডিয়াম কার্বনেট	পানি	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড	কার্বনিক অ্যাসিড

এখানে সোডিয়াম কার্বনেট পানির সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করেছে।

সা. এ.

হাউই আতশবাজি দ্র

হাউজিং বাস্তুসংস্থান দ্র

হাওয়া (আ.), হযরত

ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী হাওয়া (আ.) মানবজাতির আদি মাতা। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) (দ্র)-এর স্ত্রী। হাওয়া শব্দের অর্থ জীবন্ত।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফ (দ্র), হাদিস (দ্র) এবং অন্যান্য ইসলামী ইতিবৃত্ত অনুযায়ী বিবি হাওয়া (আ.)-কে হযরত আদম (আ.)-এর বাম দিকের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয় এবং তাঁকে আদম (আ.)-এর স্ত্রী হিসাবে বেহেশ্‌তে (দ্র) বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। আল্লাহ্ (দ্র) আদম এবং হাওয়া (আ.)-কে বেহেশ্‌তে যথেচ্ছা অবস্থান এবং খাদ্যদ্রব্য গ্রহণেরও অনুমতি দেন; কিন্তু একটি নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট না যাওয়ার জন্য তাঁদের হুঁশিয়ার করে দেন।

কিন্তু এই নিষেধ মানা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। শয়তানের (দ্র) প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে তাঁরা ঐ বৃক্ষের নিকট গিয়ে তার ফল ভক্ষণ করেন। ফলে অবাধ্যতার কারণে তাঁরা স্রষ্টার শাস্তির মুখোমুখি হন। হাওয়া (আ.) ও তার স্বামী আদম (আ.) পৃথিবীতে প্রেরিত হন।

মু. মা.

হাওয়াইয়ান গিটার গিটার দ্র

হাঁপানি / অ্যাজ্‌মা (asthma)

হাঁপানির প্রধান লক্ষণ বিভিন্ন কারণে ক্লোমনালির সঙ্কোচনজনিত শ্বাসকষ্ট। ধুলোবালি, পাখির পালক, ফুলের পরাগ, ছত্রাকের বীজগুটি, ভাইরাস (দ্র) জ্বর, ঠাণ্ডা বাতাস, কোনো কোনো ঔষধ কিংবা বিভিন্ন ধরনের খাবার (যেমন ডিম, দুধ, বেগুন, চিংড়ি মাছ) ইত্যাদি কারণ ছাড়াও আপাত-অজানা কারণে হাঁপানি দেখা দেয়। এই রোগে ক্লোমনালি সঙ্কুচিত হয়। ফলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় বায়ু (দ্র) ও অক্সিজেনের (দ্র) অভাবে রোগী শ্বাসকষ্টে ভোগে। গুরুতর আক্রমণে রোগীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটতে পারে।

হাঁপানি অল্পবয়সে কিংবা বড় হয়েও দেখা দিতে পারে। হাঁপানির কাশি বিশেষভাবে রাতে ও সকালে দেখা দেয়। যেসব কারণে হাঁপানি দেখা দেয় সেগুলো যথাসম্ভব পরিহার করে চলা উচিত। হাঁপানির ঔষধ গ্রহণ করলে শ্বাসকষ্টের উপশম ঘটে। কিন্তু চিকিৎসা সত্ত্বেও এই রোগের পূর্ণ নিরাময় হয় না।

আ. আ. হা.

হাঁস (duck)

হাঁস পরিচিত পাখি (দ্র)। পৃথিবীতে (দ্র) প্রায় ৯০ প্রজাতির বুনো হাঁস আছে। বাংলাদেশে (দ্র) ২০–২৪টির দেখা মেলে। শীতকালে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে বেশ ক'টি পরিযায়ী (দ্র) প্রজাতি এ দেশে আসে।

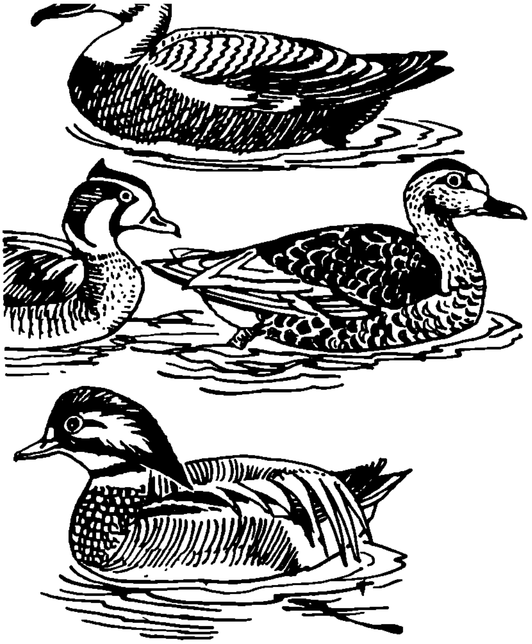

নানা রকম হাঁস আছে সারা পৃথিবী জুড়ে

প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বে বুনো মালার্ড ও মাস্কোভি প্রজাতি থেকে গৃহপালিত হাঁসের উৎপত্তি। এদের মাংস ও ডিম (দ্র) সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। ডিম ও মাংসের জন্য সারা বিশ্বে খামারভিত্তিতে উন্নত জাতের হাঁস পোষা হয়।

আকৃতি ও বর্ণে বুনো হাঁসের প্রজাতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। এরা ০·৪৫–১·৮ কেজি হয়। এদের দেহ ছোটখাট। ঘাড় ও ডানা ছোট। ঠোঁট বড় ও ওপরে-নিচে চ্যাপ্টা। পা পেছনের দিকে থাকে। সাঁতার কাটার জন্য পায়ের আঙুলগুলোর সঙ্গে চামড়া যুক্ত থাকে। স্ত্রী-পুরুষের রঙ আলাদা।

এরা নিজেদের আবাস এলাকায় পুকুর, নালা, খাল, নদী (দ্র) ও সমুদ্রে বিচরণ করে। শামুক, ছোট মাছ, ব্যাঙাচি, কেঁচো (দ্র), পোকামাকড় খায়। খামারের পোষা হাঁসকে উন্নতমানের খাবার দেওয়া হয়।

বুনো প্রজাতির হাঁসগুলো মৌসুমে ৩ থেকে ১৫টি ডিম পাড়ে। প্রজাতিভেদে ২৩ থেকে ৩২ দিন তা দিয়ে বাচ্চা

www.pathagar.com

ফোটায়। দেশীগুলো বছরে ৫০-৬০টি এবং উন্নত জাতেরগুলো ১৫০-২৫০টি ডিম পাড়ে। হাঁস ১০-১২ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

হাক্ল্‌বেরি ফিন্ [Huckleberry Finn]

মার্কিন ঔপন্যাসিক মার্ক টোয়েন্ (দ্র) রচিত কিশোরদের উপযোগী উপন্যাস। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত এই বইটির পুরো নাম The Adventures of Huckleberry Finn। বস্তুতপক্ষে এই কিশোর-উপন্যাসটি টম সয়্যার (দ্র)-এর দ্বিতীয় পর্ব।

হাক্ল্‌বেরি ফিন্ ডাকাতদের টাকা পেয়ে বড়লোক হয়েছিল (সে গল্প লেখা আছে টম্ সয়্যার-এ)। ডগ্‌লাস্ পরিবার তাকে পোষ্যপুত্র হিসাবে নেয়। হাক্ ফিন্ও তার নিজের পরিবারের দুর্বিষহ পরিবেশ থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু সভ্য মানুষের ধরা-বাঁধা নিয়ম-কানুনভরা জীবন একেবারেই বিরক্তি ধরিয়ে দেয় তাকে। টম্ ও সে ঠিক করে একটি ডাকাতদল তৈরি করবে। এই সব যখন চলছে এমন সময়ে নদীতে একটা মরা লাশ ভেসে যেতে দেখা যায়। শহরের লোকজন ভেবে নেয় যে ঐ লাশ নিশ্চয়ই হাক্ল্‌বেরির মাতাল বাপের। হাক্ কিন্তু তা বিশ্বাস করে না এবং ভয়ে ভয়ে থাকে তার বাবা কখন এসে হাজির হয়। মদ্যপ অত্যাচারী বাবাকে তার ভয় করে।

শেষ পর্যন্ত একদিন হাকের বাবা ঠিকই এসে হাজির হয় এবং হঠাৎ-বড়লোক ছেলের কাছে টাকা দাবি করে বসে। সে হাক্‌কে শহর থেকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখে। হাক্ল্‌বেরি বাবার অত্যাচার সইতে না পেরে পালিয়ে যায়। সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চারকাহিনী শুরু হয় এখান থেকে । কত মারাত্মক আপদ-বিপদে পড়ে হাক্ কীভাবে উদ্ধার পায়, মাঝখান থেকে এসে জোটে পলাতক এক নিগ্রো ক্রীতদাস জিম্, ভেলায় চড়ে খরস্রোতা মিসিসিপি নদী পাড়ি দেওয়া ইত্যাদি বহু কাণ্ড ঘটতে থাকে একের পর এক। ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট্ হেমিংওয়ে (দ্র) বলেছিলেন, এর চেয়ে সেরা বই আর নেই। মার্কিন সাহিত্যের (দ্র) শুরুই তো এ বই দিয়ে। এর আগেও কিছু ছিল না আর এর পরে এত ভালও কিছু আর হয় নি। বাংলায় অনূদিত হয়েছে এ বই, ঢাকা থেকেও।

হা. মা.

হাজী মুহম্মদ মহসীন [১৭৩২–১৮১২]

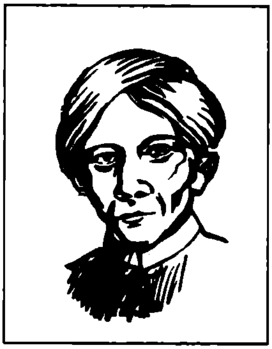

মানবকল্যাণে আত্ম-নিবেদিত পুরুষ। দয়া ও দানের সাগর বলে খ্যাত। ১৭৩২ সালে ভারতের (দ্র) পশ্চিমবঙ্গের হুগলি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পারস্য দেশীয় বণিক আগা মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ্ এবং মাতা জয়নব খানম। পিতা নিজের ভাগ্য-অন্বেষণে ভারতবর্ষে এসে হুগলিতে বসবাস করতে থাকেন।

শৈশবে পিতা-মাতার মৃত্যু হলে বড় বোন মন্নুজানের যত্নে মহসীন মানুষ হন। মন্নুজান ছিলেন আসলে মহসীনের সৎবোন। মন্নুজান যখন ছোট, তখন তাঁর ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পিতা আগা মোতাহার মারা যান। মাতা জয়নব খানম আবার আগা মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ্‌র সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। মৃত্যুর আগে কিন্তু আগা মোতাহার তাঁর সমস্ত সম্পত্তি একমাত্র কন্যা মন্নুজানকে দান করে গিয়েছিলেন।

পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে মহসীন বাল্যকালে স্থানীয় মক্তব ও মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। পরে তিনি আরব ও পারস্যে গিয়ে আরবি (দ্র), ফার্সি ভাষা ও সঙ্গীতে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ৩৫ বছর বয়সে তিনি হজ্ব (দ্র) পালন করেন। এর পর ইরান, ইরাক, তুরস্ক (দ্র), সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি মুসলিম দেশ পরিভ্রমণ করে দীর্ঘ সতেরো বছর পর দেশে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে ভগ্নীপতির মৃত্যু হওয়ায় বোনের অনুরোধে তাঁর অগাধ ধন-সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার মহসীনকে নিতে হয়। পরে নিঃসন্তান বোন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মহসীনকে দান করে দেন। কিন্তু মহসীন ছিলেন সংসারবিরাগী অকৃতদার মানুষ। ধনসম্পদের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁর বিশাল সম্পত্তি মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি দীন-দুঃখী ও দুঃস্থদের সেবায় এবং অনগ্রসর মুসলমান সমাজের

www.pathagar.com

শিক্ষাবিস্তারের জন্য দান করেন। জীবিতকালে তিনি হুগলিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ঢাকা (দ্র), চট্টগ্রাম (দ্র), রাজশাহী, যশোর প্রভৃতি অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলোর উন্নতিকল্পে বহু অর্থ দান করেন।

মৃত্যুর ৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৮০৬ সালে মহসীন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ধর্মকার্য ও জনহিতার্থে ট্রাস্টের অধীনে ন্যস্ত করেন। তাঁর ট্রাস্টের অর্থে হুগলিতে ১৮৩৬ সালে মহসীন কলেজ এবং পরে হুগলির দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সম্পত্তির আয়ে ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ১৮৬১ সালে হুগলির ইমামবারা (দ্র) পুনরায় নির্মিত হয়। এটি পশ্চিমবঙ্গের একটি দর্শনীয় স্থান।

মহসীনের সম্পত্তির আয় থেকে এখনো বহু দরিদ্র মুসলমান ছাত্র এবং মুসলমান পরিবার অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে। জনহিতকর কাজে তাঁর দানের হিসাব সঠিক জানা যায় না। কারণ তিনি প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনেই বেশি দান করতেন। তাঁর দানকর্ম নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তিনি ১৮১২ সালে নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

হাজী মোহাম্মদ দানেশ [১৯০৪—১৯৮৬]

বিশিষ্ট কৃষকনেতা। তিনি ১৯০৪ সালে তৎকালীন বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ থানার সুলতানপুরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শেষে তিনি পীরগঞ্জ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ও ১৯২৭ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ও ইতিহাসশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করার পর দিনাজপুরে এসে আইনব্যবসা শুরু করেন। আইনজীবী হিসাবে সাফল্য ও খ্যাতি লাভ করার এক পর্যায়ে তিনি মক্কায় (দ্র) গিয়ে হজ্ব (দ্র) পালন করেন এবং সেই থেকে তাঁর নামের সাথে 'হাজী' শব্দটি চিরকালের জন্য যুক্ত হয়ে যায়।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত কৃষাণসভার সক্রিয় সদস্য হিসাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার বিশাল এলাকা জুড়ে কৃষকদের মধ্যে যে তেভাগা আন্দোলনের (দ্র) সূচনা হয়, তিনি ছিলেন তার অন্যতম প্রধান সংগঠক ও নেতা। এই আন্দোলনের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে বেশ কয়েক বছর তাঁকে জেলও খাটতে হয়। হাজী দানেশ সারা জীবনে বিভিন্ন সময়ে মোট ১৮ বছর কারারুদ্ধ ছিলেন।

১৯৫৩ সালে গণতন্ত্রী দল গঠিত হলে তিনি দলটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে এই দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (দ্র) নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (দ্র)-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই দলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে দেশের বিভিন্ন পর্বের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। তিনি '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে (দ্র) সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালে 'বাকশাল' (দ্র) গঠিত হলে হাজী দানেশ তাতে যোগ দেন। বাকশাল বিলুপ্তির পর তিনি 'জাগমুই' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি জাতীয় পার্টির (দ্র) রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ ঢাকায় ১৯৮৬ সালের ২৯শে জুন ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

হাজী শরীয়তউল্লাহ্ [১৭৮১—১৮৪০]

ফরায়েজি আন্দোলনের (দ্র) নেতা ও ধর্মসংস্কারক। তিনি ১৭৮১ সালে বর্তমান মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার সামাইল (বাহাদুরপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল জলিল তালুকদার। আঠারো বছর বয়সে তিনি মক্কা (দ্র) গমন করেন। সেখানে প্রায় বিশ বছর অবস্থান করে ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

১৮১৮ সালে দেশে ফিরে শরীয়তউল্লাহ ভণ্ড

www.pathagar.com

পীর-ফকিরদের তৎপরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর এই আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত। আরবি 'ফরয্' (দ্র) শব্দের বহুবচন 'ফরায়েজ'-এর অর্থ হল ধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ। কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমান সমাজের কাছ থেকে এ সম্পর্কে যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে ১৮২০ সালের দিকে তিনি আবার মক্কায় চলে যান। এবার সেখানে তিনি আবদুল ওয়াহাব নামক এক ধর্মসংস্কারকের সংস্পর্শে এসে ওয়াহাবী আন্দোলনের (দ্র) আদর্শে প্রভাবিত হন। ইসলাম ধর্ম (দ্র)-কে সংস্কারমুক্ত করার এই নতুন দীক্ষা নিয়ে তিনি এক বছর পরে আবার দেশে ফেরেন।

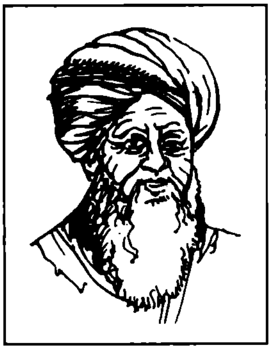

এবার শরীয়তউল্লাহ যথার্থ ধর্মমত ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে প্রকৃত ধর্ম ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে থাকেন। এই সঙ্গে তিনি বিদেশী শাসন-শোষণ এবং জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ সংগঠিত করেন। এভাবে অল্প দিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাঁকে শাসক ও শোষক শ্রেণীর রোষানলে পড়তে হয়। ১৮৩৮ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু আদালতে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত না হওয়ায় তিনি মুক্তি পান।

হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের আশরাফ-আতরাফ (অভিজাত-অনভিজাত) শ্রেণীর বিলোপ ঘটিয়ে পীরপূজা, কবরপূজা প্রভৃতি কুসংস্কারের মূল উৎপাটনের পাশাপাশি জমিদার-মহাজন ও নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে কৃষক-মজুরদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি কায়েম করা। তিনি ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' (যুদ্ধাবস্থা) ঘোষণা করে এখানে জুম্মা (দ্র) ও ঈদের নামায পড়া নিষিদ্ধ করেছিলেন।

১৮৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

হাডুডু / কাবাডি

হাডুডু বা কাবাডি বাংলাদেশের (দ্র) নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী একটি গ্রামীণ খেলা। বাংলাদেশের বহু জায়গায় এই খেলা হাডুডু নামেই পরিচিত। এই খেলার জন্ম ফরিদপুরে। কেউ কেউ এর উৎপত্তিস্থল বরিশাল বলে থাকেন। তবে বাংলাদেশেই এই খেলার জন্ম। বর্তমানে ভারত (দ্র), মরিসাস, মায়ানমার (দ্র), পাকিস্তান (দ্র), আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা (দ্র) ও বাংলাদেশে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। জাপান (দ্র), নেপাল (দ্র), মালদ্বীপ (দ্র), ভুটানে (দ্র) এই খেলা শেখার প্রচেষ্টা চলছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। জাতীয় কাবাডি খেলা ছাড়া জেলা, বিভাগ, আনসার, বিডিআর, আন্তঃস্কুল ও শহীদ স্মৃতি কাবাডি খেলা ১৯৭৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কাবাডির খেলোয়াড়দলে ১২ জন থাকলেও প্রতি বার ৭ জনের দল নিয়ে খেলতে হয়। বাকি ৫ জন অতিরিক্ত বা রিজার্ভে থাকে। ১২.৫ মিটার লম্বা ও ১০ মিটার চওড়া কোর্টকে মাঝখানে মধ্যরেখায় সমান ভাগ করে খেলা হয়ে থাকে। ৮০ কেজির বেশি ওজনের খেলোয়াড়কে খেলায় অংশ নিতে দেওয়া হয় না। মোট ৪৫ মিনিটের খেলায় (২০+৫+২০) বিশ মিনিট খেলা, ৫ মিনিট বিশ্রাম ও পুনরায় বিশ মিনিট খেলা হয়ে থাকে। মোট ৭ জন কর্মচারী এই খেলা পরিচালনা ও বিচারকার্য করে থাকেন। এঁরা হলেন এক জন রেফারি, দুই জন আম্পায়ার, এক জন স্কোরার ও দুই জন সহকারী স্কোরার।

এই খেলায় কোনো পয়সা খরচ হয় না। বুদ্ধি, ক্ষিপ্রগতি, শক্তি, কায়দা, দম, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস এবং সঠিক সিদ্ধান্তই এই খেলার জন্য বিশেষভাবে দরকার হয়ে থাকে।

কা. আ. আ.

হাড়গিলা / হাড়গিলে

সিকোনিডি (Ciconidae) গোষ্ঠীভুক্ত বড় আকারের পাখি।

www.pathagar.com

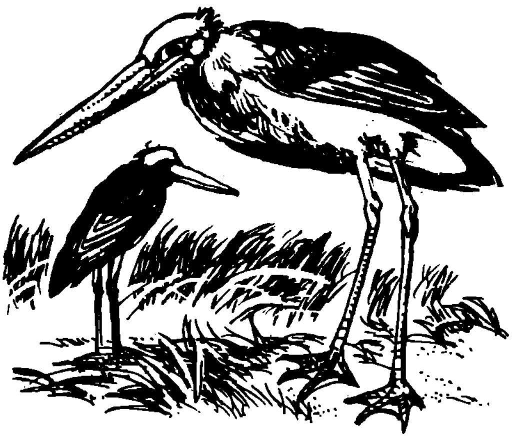

উচ্চতায় এরা প্রায় ১·৫০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের গায়ের রঙ ফ্যাকাশে কালো এবং ঠোঁট হলুদ রঙের লম্বা চতুষ্কোণ আকৃতিবিশিষ্ট। এদের পা-জোড়া অনেকটা বকের মতো লম্বা সরু। মাথা থেকে গলা পর্যন্ত অংশে পালক বিশেষ গজায় না। এদের বুকের কাছে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা পালকবিহীন চামড়ার একটি ঝুলন্ত থলি থাকে। তবে গলনালির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। খাবার জমিয়ে রাখার জন্যও এটি ব্যবহৃত হয় না। এটি আসলে হাওয়ার থলি, নাকের ছিদ্রের সঙ্গে এটি সংযুক্ত।

হাড়গিলা খুব স্বচ্ছন্দে উড়তে পারে না। আকাশে পাখা ছড়িয়ে দেবার আগে এরা মাটির ওপর বেশ খানিকটা দৌড়ে গিয়ে শব্দ করে উড়ে যায়। এরা উচ্চতা বেশ পছন্দ করে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে বৃত্তাকারে ঊর্ধ্বাকাশে এরা উড়ে বেড়ায়।

খাওয়ার ব্যাপারে হাড়গিলাদের কোনো কিছুতেই অরুচি নেই। আবর্জনা, এঁটোকাঁটা ইত্যাদি তো খায়ই, এ ছাড়া মাছ (দ্র), ব্যাঙ (দ্র), সরীসৃপ (দ্র), ছোটখাটো জীবজন্তু, পঙ্গপাল (দ্র)-সহ যে কোনো প্রাণীর মৃতদেহ পেলে শকুনের (দ্র) মতোই এরা ভোজে বসে যায়। শুষ্ক জলাভূমিতে অথবা লোকালয়ের আশেপাশে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়, সেসব জায়গায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। আহারের সন্ধানে এরা ভারিক্কি চালে পায়চারি করে বেড়ায় বলে ইংরেজিতে এদের Adjutant Stork নাম দেওয়া হয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *লেপ্টোপ্টিলোস ডিউবিয়াস (Leptoptilos Dubius)*।

বড় কোনো পাথরের খাঁজে বা জঙ্গলের কোনো বড় গাছের ডালে হাড়গিলারা বাসা বাঁধে। কখনো কখনো এরা পাশাপাশি বাসা করেও থাকে। এরা একেক বারে ৩/৪ টি ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ ময়লাটে সাদা।

হাড়গিলা এখন বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু কলিকাতা (দ্র) শহরের আদি যুগে অষ্টাদশ শতকে এই পাখি এত ছিল যে তারা প্রায় মেথরের ভূমিকা পালন করত বলা চলে।

সুজ. ব.

হাতি (elephant)

হাতি স্থলের বৃহত্তম প্রাণী। আফ্রিকা (দ্র) ও এশিয়ার (দ্র) ঘন জঙ্গল ও খোলা প্রান্তরে বাস করে। এ দেশেও হাতি আছে। পৃথিবীতে দু' প্রজাতির হাতির ছয়টি উপ-প্রজাতি রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, ৪৫০ কোটি বছর আগের জলহস্তীর (দ্র) মতো প্রাণী মিরিথোরিয়ম থেকে এদের উৎপত্তি।

হাতি ধূসর বা মেটে-ধূসর রঙের। তবে, থাইল্যাণ্ডের (দ্র) রাজকীয় হাতিশালায় সাদা হাতি আছে। স্ত্রী-হাতি আকৃতিতে ছোট। এশিয়ার স্ত্রী-জাতি ছাড়া বাকিদের গজদন্ত আছে। এগুলো লম্বায় ৬০-৯০ সেন্টিমিটার। হাতির চোখ ছোট। বাচ্চাগুলোর মাথা, মুখমণ্ডল, শরীরের ওপরের অংশ ও লেজে লম্বা লোম থাকে। পায়ের তলায় ইলাস্টিক ফাইবারের প্যাড থাকায় বিরাট শরীর নিয়েও ঘণ্টায় যথাক্রমে ৬-৮ এবং ৩৫-৪০ কিলোমিটার বেগে হাঁটতে ও দৌড়াতে সক্ষম।

এশিয়ার হাতি আকৃতিতে ছোট। ২·৫-৩ মিটার উঁচু ও ৩,৭০০-৫,৫০০ কেজি ওজন। কান ছোট, কপাল উঁচু, কপালের দু' পাশ ফোলা, পিঠ উঁচু। সামনের পায়ে পাঁচটি, পেছনের পায়ে চারটি করে আঙুল। চামড়া পুরু ও মসৃণ। আফ্রিকারগুলো ৩-৪ মিটার উঁচু ও ৫,০০০-৭,৫০০ কেজি ওজন। কান বড়, কপাল ছোট ও চ্যাপ্টা, পিঠ নিচু। সামনের পায়ে চারটি, পেছনের পায়ে তিনটি করে আঙুল। চামড়া খসখসে।

হাতির লম্বা শুঁড়টি বেশ নড়নক্ষম। শুঁড়ের অগ্রভাগের ছিদ্র দুটো মুখ-গহ্বর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এতে প্রায় ৪০,০০০

www.pathagar.com

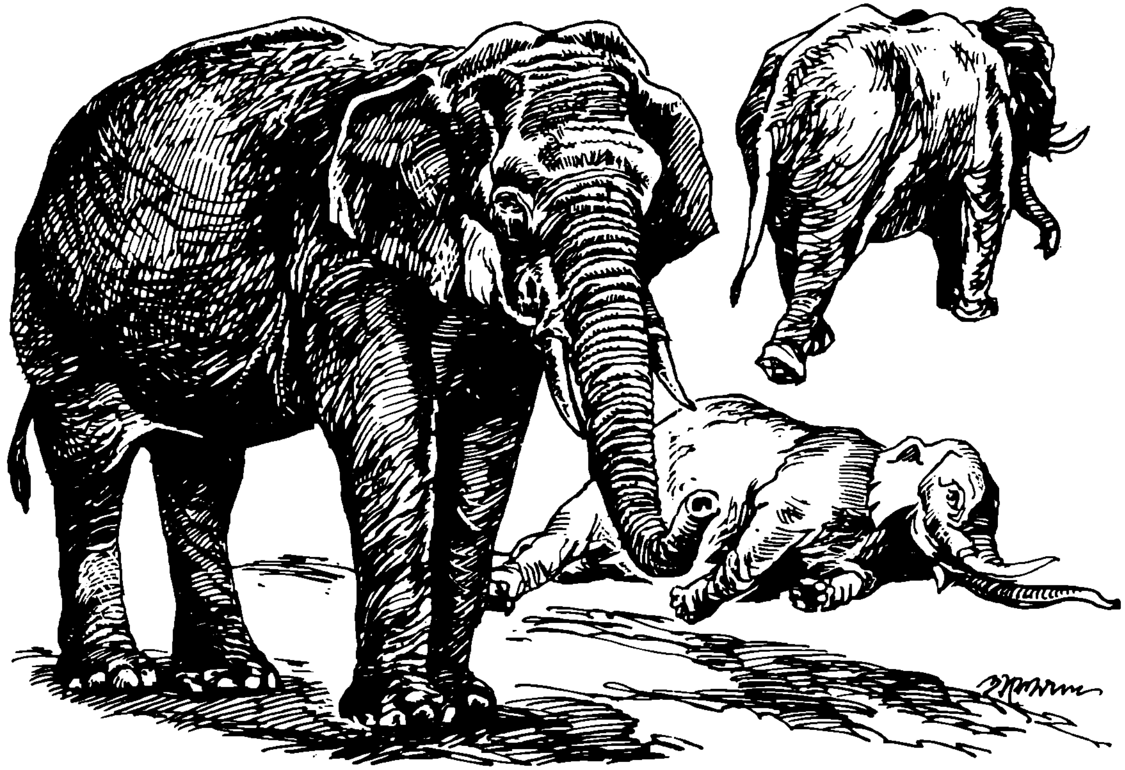

আফ্রিকার হাতি। এশিয়ার হাতির সঙ্গে এদের আকৃতিগত কিছু তফাৎ আছে

মাংসপেশি আছে। শ্বাসকার্য, খাবার ও পানি (দ্র) মুখে তোলা, গায়ে পানি ছিটানো প্রভৃতি কাজে এটি ব্যবহার করে।

পুরুষ-হাতি বদরাগী। তাই একা থাকে। একটি বয়স্ক স্ত্রী-হাতির নেতৃত্বে বেশ ক'টি স্ত্রী-হাতি বাচ্চা নিয়ে দলে থাকে। দৈনিক ২২৫-২৮০ কেজি ঘাস-পাতা, গাছের ছাল, আখ (দ্র) ইত্যাদি খায়। ১৮০-২০০ লিটার পানি পান করে।

৬১০-৬৭০ দিন গর্ভধারণের পর স্ত্রী-হাতি ৯০-১০০ কেজি ওজনের ৮০-৯০ সেন্টিমিটার উঁচু একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। এশিয়ারগুলো ৮-১২ এবং আফ্রিকারগুলো ১৪ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। এশিয়ারগুলো ৭০-৮০ ও আফ্রিকারগুলো ৫০-৬০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

হাতেখড়ি

প্রাচীন কালের রীতি অনুযায়ী বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে শিশু হাতে খড়ি বা চক নিয়ে স্লেট বা মাটির সরায় অক্ষর লেখে। এ থেকে চলতি কথায় বিদ্যারম্ভকে 'হাতেখড়ি' বলা হয়

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী (দ্র)। সরস্বতী পুজোর দিন ব্যতীত অন্য কোনো শুভ তিথিতে সরস্বতী পুজো করে শিশুর বিদ্যারম্ভ করানো হত। পাঁচ বছর বয়স শিশুর হাতেখড়ি দেওয়ার উত্তম কাল। এ কাজে শুক্লা পঞ্চমী তিথি ও বৃহস্পতিবার বিশেষভাবে উপযোগী। তবে বর্জনীয় তিথিগুলো বাদ দিয়ে যে কোনো শুভ তিথিতে হাতেখড়ি হতে পারে। জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানের মতো হাতেখড়ির অনুষ্ঠানও শিশুর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

ক. গো.

www.pathagar.com

হাতেম তাঈ

আরবের বিখ্যাত দানবীর। 'তাঈ' গোত্রের অধিপতি। তিনি উদারতা, মহানুভবতা, পরোপকার এবং দানশীলতার জন্য বিশ্ববিখ্যাত, এমনকি প্রবাদতুল্য। তাঁর দানশীলতার বহু বিস্ময়কর কাহিনী প্রচলিত আছে। কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁর জীবনালেখ্য অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেছেন। তন্মধ্যে সৈয়দ হামজা (জন্ম ১৭৩৩) রচিত পুঁথি (রোম্যান্টিক কাহিনীকাব্য) এবং কবি ফররুখ আহমদ (দ্র) রচিত রূপক কাব্য 'হাতেম তাঈ' উল্লেখযোগ্য। ইসলামপূর্ব যুগের যেসব সাধুপুরুষের স্মৃতি ইসলামপরবর্তী কালেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় তাঁদের মধ্যে হাতেম তাঈ অন্যতম। মহানবী (স.) (দ্র)-র আবির্ভাবের পূর্বে হাতেম তাঈর মৃত্যু হয়।

মহানবী (স.) নিজেও হাতেম তাঈর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

মো. ই.

হাদিস

হাদিস শব্দের আভিধানিক অর্থ উক্তি বা বর্ণনা। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর আচরণ ও কর্মসমূহ। তিনি যে কথা, ঘটনা বা কর্ম সমর্থন করেছেন, তাও হাদিস-এর অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, তাঁর সাহাবী (দ্র) বা সাহচর্য লাভকারীদের উক্তি ও কাজকর্মকেও হাদিস হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

ইসলামী বিধানে কুরআন শরীফের (দ্র) পরেই হাদিসকে স্থান দেওয়া হয়।

মু. মা.

হানাফী আবু হানিফা (রা.) দ্র

হানেমান্, ক্রিস্টিয়ান্ ফ্রিড্রিশ্ সামুয়েল্ [১৭৫৫—১৮৪৩]

জার্মান চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ। হানেমান্ (Christian Friedrich Samuel Hahnemann) এ দেশে তিনি হ্যানিম্যান্ নামে পরিচিত। তিনি হোমিওপ্যাথি (দ্র) চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক। জার্মানির অন্তর্গত সাক্সনি (Saxony)-র মাইসেন্ (Meissen) নামক স্থানে ১৭৫৫ সালের ১০ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোটফ্রিড হানেমান (Gotfried Hahnemann) ছিলেন চিত্রকর। চীনামাটির পাত্রে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তিনি খুরই পারদর্শী ছিলেন। ১৭৭৯ সালে সামুয়েল এলিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কয়েক বছর জার্মানির ড্রেসডেন ছাড়া আরো কয়েকটি স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায় নিয়োজিত থাকেন।

১৭৯৬ সালে ৪১ বছর বয়সে তিনি একটি নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং এর তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে রূপরেখা দাঁড় করান ও নিয়মশৃঙ্খলা নির্ধারণ করেন। ১৮১০ সালে চিকিৎসাপদ্ধতিটিকে সুশৃঙ্খল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে নাম দেন হোমিওপ্যাথি। তিনি যে বইয়ে এই চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তা ছিল স্বাভাবিকভাবে জার্মান ভাষায় লিখিত এবং সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১০ সালে। বইখানি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয় এবং নাম দেওয়া হয় 'অর্গাননন অব দ্য র‍্যাশনাল আর্ট অব হিলিং' (Organon of the Rational Art of Healing)। অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ১৮১৩ সালে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীকে সঠিক ঔষধ খুবই স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু রোগীকে স্বল্পমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগের বিষয়টি তাঁর রক্ষণশীল সমচিকিৎসকগণ, বিশেষ করে ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতারা তাঁদের স্বার্থবিরোধী বলে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁরা হানেমানের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন। ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে ১৮২১ সালে জার্মানির লাইপ্‌ৎজিগ্ (Leipzig) ত্যাগ করে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে (দ্র) আশ্রয় নিতে হয়। এখানেই তিনি ১৮৪৩ সালের ২রা জুলাই পরলোকগমন করেন।

শা. হ.

হান্স্ ক্রিস্টিয়ান্ এণ্ডারসেন্ এণ্ডারসেন্, হান্স্ ক্রিস্টিয়ান্ দ্র

হাফিজ [আনু. ১৩০০—আনু. ১৩৮৮]

বিশ্ববিখ্যাত ফার্সি কবি। তাঁর প্রকৃত নাম শামসুদ্দিন মুহম্মদ। হাফিজ তাঁর কবিনাম বা ছদ্মনাম এবং এই সংক্ষিপ্ত নামেই তিনি বিশ্বে পরিচিত।

হাফিজের জন্ম ইরানের ফার্স্ প্রদেশের রাজধানী সিরাজনগরে আনুমানিক ১৩০০ সালে।

www.pathagar.com

ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনে পণ্ডিত এই কবির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। সময়বিশেষে অর্থের জন্য পুঁথি নকল করার কাজও তাঁকে করতে হয়েছে। সিরাজের রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও তা তেমন নিয়মিত ছিল না। কেননা, এই সময় রাজাদের কেউই স্থির হয়ে তাঁদের রাজকার্য চালাতে পারেন নি। যুদ্ধবিগ্রহে পারস্য তখন ধ্বংসের প্রায় শেষ প্রান্তে।

হাফিজের কাব্যে জীবনের গভীর সত্য সহজসরল প্রকাশভঙ্গিতে অভিব্যক্তিময় এবং মুক্ত-উদার চিন্তার ছাপও তাতে অঙ্কিত। তাঁর গজল (দ্র) বা গীতিকাব্যের জন্য বিশ্বব্যাপী তিনি খ্যাতির অধিকারী। এ জাতীয় কবিতার সঙ্কলন 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'রুবাইয়াৎ', 'মুখাম্মিন্' ও 'কাসাইদ্' উল্লেখযোগ্য।

হাফিজ তাঁর উদার কাব্যদর্শনের জন্য তাঁর সমকালীন গোঁড়াপন্থীদের তীব্র আক্রমণের শিকার হন। তিনিও নির্ভীকভাবে তাদের পাল্টা আক্রমণ করতে পেছ-পা হন নি। সুফিবাদী দর্শনের নিষ্ঠাবান অনুসারী হাফিজ ভণ্ড তপস্বীদের ওপরও ছিলেন সম পরিমাণ খড়্গহস্ত।

কারো কারো রচনা-নিদর্শন থেকে জানা যায়, হাফিজ ভারতবর্ষে আসবেন বলে স্থির করেছিলেন। তিনি বহু দেশের রাজা-বাদশাহদের কাছ থেকে তাঁদের সভাকবি হবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ও (দ্র) তাঁকে সোনারগাঁওয়ে এসে অনুরূপ পদ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জন্মশহর সিরাজ ত্যাগ করেন নি। তবে ভারতবর্ষ ও বাংলার প্রতি যে তাঁর হৃদয়গত গভীর টান ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর একটি কবিতা থেকে। ঐ কবিতার দু'টি চরণে এ রকমের উল্লেখ পাওয়া যায়— 'দূর ভারতের শঙ্করা প্রিয় তোতা পাখি' এবং 'রূপসী বাংলায় আনা পারসী মিঠাই'। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত ও বহুল পঠিত। বাংলায় তাঁর প্রথম কবিতা অনূদিত হয় আজ থেকে দুই শতাধিক বছর আগে, ১৭৯১ সালে। হাফিজ মৃত্যুবরণ করেন আনুমানিক ১৩৮৮ সালে। সিরাজেই তাঁর সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত।

আ. হু.

হাবীবুর রহমান [১৯২৩—১৯৭৬]

কবি, সাংবাদিক, শিশু-সাহিত্যিক ও শিশু-সংগঠক। ১৯২৩ সালের ১লা জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার পালিশ গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা শেখ আবদুস সাত্তার এবং মাতা মোসাম্মৎ মোশরাতুন নেসা। পিতা-মাতার সাত সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়।

হাবীবুর রহমান কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) ভর্তি হন। কিন্তু সে সময়ে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) হিংস্রতা, আতঙ্ক, হতাশা আর দুর্ভিক্ষের শিকারে পরিণত হন। আর্থিক অনটনে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষাজীবনের ইতি টেনে তিনি আসানসোলের নলতা কয়লার খনিতে শ্রমিকের কাজ নেন।

হাবীবুর রহমান ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চা করতেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় স্কুল ম্যাগাজিনে 'বঙ্গমাতা' শিরোনামে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে 'ভাইবোন', 'পাঠশালা', 'রংমশাল', 'আনন্দমেলা', 'স্বপনবুড়োর আসর', 'ফুলকির আসর', 'মুকুলের মহফিল', 'শিশু সওগাত'সহ সে সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও শিশু-বিভাগে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে ছড়া, কবিতা, গল্প, রূপকথা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে থাকেন।

১৯৪৬ সালে 'জাগরণ' নামে ছোটদের একটি কাগজ সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে হাবীবুর রহমান কয়লার খনির কাজ ছেড়ে কলিকাতায় (দ্র) ফিরে আসেন। এ সময় তিনি কিছুদিন কলিকাতার মডেল হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেন। পরে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় প্রুফ রিডিং-এর কাজ নেন।

দেশবিভাগ হওয়ার পর হাবীবুর রহমান ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে ঢাকায় (দ্র) চলে আসেন এবং 'দৈনিক আজাদ'

www.pathagar.com

পত্রিকার ঢাকা অফিসে সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫১ সালের ৭ই মে 'দৈনিক সংবাদ' আত্মপ্রকাশ করলে তিনি সহ-সম্পাদক হিসাবে এ পত্রিকায় যোগ দেন। তাঁরই অনুপ্রেরণা, সম্পাদনা ও পরিচালনায় ১৯৫২ সালের ২রা মে সংবাদ-এর শিশু-কিশোর বিভাগ 'খেলাঘর' প্রকাশিত হয়। 'ভাইয়া' ছদ্মনামে তিনি বেশ কিছুদিন 'খেলাঘর' পাতা সম্পাদনা করেন। 'সংবাদ'-এর পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি মাসিক 'সওগাত', সাপ্তাহিক 'বেগম', সাপ্তাহিক 'খবর', মাসিক 'সবুজ নিশান', 'তাহজীব', 'কাফেলা' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার সঙ্গেও সাংবাদিকতা আর সম্পাদনাসূত্রে জড়িত ছিলেন।

দশকে ভয়েস অব আমেরিকা থেকে প্রচারিত একটি কথিকা
ন ড.এনামুল হক ও সুফিয়া কামালের সঙ্গে হাবীবুর রহমান

১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সংস্থা সিলভার বার্ডেট কোম্পানি বিশ্বব্যাপী তার পুস্তক ব্যবসার অংশ হিসাবে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে পাঠ্যপুস্তক রচনা, অনুবাদ, প্রকাশনা ও বাজারজাত কার্যক্রমের সূচনা

'আগডুম বাগডুম' বইয়ের প্রচ্ছদ

বনেবাদাড়ে বইয়ের টাইটেল পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

করলে হাবীবুর রহমান এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ীদের বিরোধিতার মুখে এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে তিনি বাংলা অনুবাদ বিভাগের প্রধান হিসাবে ইউসিসে (USIS = United States Information Service) যোগ দেন। সেই সঙ্গে দৈনিক আজাদ পত্রিকার ছোটদের বিভাগ 'মুকুলের মহফিল'-এর পরিচালক 'বাগবান ভাই'য়ের সহকারী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং পরে তিনি নিজেই দীর্ঘদিন এই বিভাগ পরিচালনা করেন। ১৯৭২ সালে তিনি ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম নামে একটি সংস্থায় যোগ দেন। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে তিনি সহকারী পরিচালক হিসাবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ (দ্র)-এ যোগদান করেন।

বিভাগোত্তর বাংলাদেশে যে আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে, হাবীবুর রহমান তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচনাশৈলী ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও মননসমৃদ্ধ। বড়দের পাশাপাশি তিনি ছোটদের জন্যও লিখেছেন প্রচুর ছড়া-কবিতা-গল্প, উপন্যাস-রূপকথা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—কবিতা : 'উপাত্ত' (১৯৬২); শিশুসাহিত্য : 'আগডুম বাগডুম' (১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৬২), 'সাগরপারের রূপকথা' (১৯৬২), 'বিজন বনের রাজকন্যা' (১৯৬১), 'লেজ দিয়ে যায় চেনা' (১৯৬৩), 'গল্পের ফুলঝুরি' (১৯৬২), 'হীরা মতি পান্না' (১৯৬৭), 'মন চলে মোর তেপান্তরে', 'বনমোরগের বাসা' (১৯৭৫); অনুবাদ : 'চীনা প্রেমের গল্প' (১৯৬৩), 'জন কেনেডী' (১৯৬২), 'জীবনের জয়গান' (১৯৬২), 'পাল তুলে দাও' (১৯৬১); সম্পাদনা: 'সপ্তডিঙ্গা' (কিশোর সঙ্কলন ১৯৬২)।

হাবীবুর রহমানের উদ্যোগে 'ঢাকা শিশু নাট্যম' নামে বাংলাদেশে প্রথম শিশু-নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় তিনি নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। রেডিও, টেলিভিশন ও মঞ্চে বহুবার তাঁর গীতিনাট্য ও নাটক অভিনীত হয়েছে।

শিশুসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হাবীবুর রহমান ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ১৭ই জুন তিনি লোকান্তরিত হন।

সুজ. ব.

হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী দ্র

হাম (measles)

হাম এক ধরনের সংক্রামক রোগ। 'মিজেল্‌স্ ভাইরাস' নামক অণুজীবের মাধ্যমে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। হাম সাধারণত শৈশবে দেখা দেয়। তবে ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে এ রোগ তেমন একটা দেখা যায় না।

সর্দি, জ্বর (দ্র), কাশি, ক্ষুধামান্দ্য, ধীরে ধীরে দেহতাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণের মাধ্যমে হাম রোগের সূচনা ঘটে। হামরোগীর মুখমণ্ডলে ঘামাচির মতো ছোট ছোট লাল পীড়কা (eruption) দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। পীড়কা সাধারণত ৪-৫ দিন পর থেকে ক্রমাগত মিলিয়ে যেতে শুরু করে। শরীরে তাপমাত্রাও তখন কমে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। রোগের কোনো জটিলতা দেখা না দিলে প্রায় দু' সপ্তাহের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

'জার্মান হাম' নামক বিশেষ ধরনের হামে শিশুদের মৃত্যুও ঘটতে পারে। এর অপর নাম 'রুবেলা' (Rubella)। রুবেলা এ দেশে বড় একটা দেখা যায় না।

হামে আক্রান্ত রোগীকে আলাদা ঘরে পৃথক করে রাখা উচিত। রোগীকে পর্যাপ্ত পানি (দ্র) খাওয়াতে হবে। এ রোগের প্রত্যক্ষচিকিৎসার কোনো ঔষধ নেই। তবে অন্য কোনো উপসর্গে চিকিৎসকের পরামর্শ দরকার।

হাম জীবনে সাধারণত এক বারই দেখা দেয়। কেউ এক বার হামরোগে আক্রান্ত হলে তার শরীরে এ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে ওঠে। কিছুকাল আগে আবিষ্কৃত (১৯৬৬ সালে) টিকা 'মিজেল্‌স্ ভ্যাকসিন' (measles vaccine) গ্রহণের মাধ্যমে এখন হাম প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সি. না. হ.

হামযা (রা.), হযরত

আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশীয় বীর যোদ্ধা ও সাহসী সেনানায়ক। পিতার নাম আবদুল মুত্তালিব। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর চাচা।

জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ (স.) (দ্র) ইসলাম (দ্র) প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি; যদিও তাঁর দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (স.)-র কোনো প্রকার ক্ষতির বা ইসলাম প্রচারের বাধা প্রদানের ঘটনারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ (স.)-র নবুওয়াত লাভের দুই বছর পর অর্থাৎ ৬১২ খ্রিস্টাব্দে হযরত হামযা (রা.) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

মুসলমান হওয়ার পর তিনি আন্তরিকভাবে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধে (জিহাদে) তিনি অসীম সাহসিকতা, বীরত্বের পরিচয় দেন। এ জন্য তিনি 'আল্লাহ ও রসূলের সিংহ' উপাধিতে ভূষিত হন।

তৃতীয় হিজরি সালে (৬২৫ খ্রি.) সংঘটিত বিখ্যাত উহুদ যুদ্ধের (দ্র) সময় জনৈক নিগ্রো ক্রীতদাসের বর্শার আঘাতের ফলে হযরত হামযা শহীদ হন। তখন তাঁর বয়স ৫৯ বছর।

মু. মা.

শিল্পী হামিদুর রাহমানের নকশায় তৈরি শহীদ মিনার

হামিদুর রাহমান [১৯২৮—১৯৮৭]

হামিদুর রাহমান মূলত এক জন চিত্রশিল্পী। কিন্তু তাঁর যে শিল্পকর্মটি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তায় তাঁর সব কীর্তিকে ছাড়িয়ে গেছে সেটি ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের সমন্বয়ে আবেদনময় এক অপূর্ব শিল্পকর্ম—শহীদ মিনার (দ্র)। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে (দ্র) রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও ভাষা-আন্দোলনকে (দ্র) স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে এই স্মৃতিসৌধ হল শহীদ মিনার। শহীদ মিনার আজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পবিত্রতম স্থান, শপথ নেবার স্থান। শপথ নিয়ে শহীদ মিনার থেকে হয় যাত্রা শুরু। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের পর তৎকালীন পাকিস্তানি কুশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যেসব আন্দোলন হয়েছে—বিশেষত ১৯৬৩ থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ (দ্র) পর্যন্ত এই নয় বছর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ছিল সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃপ্ত শপথকেন্দ্র।

শিল্পী হামিদুর রাহমান শহীদ মিনারের মূল নকশার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হল : "স্তম্ভগুলো যথাক্রমে মাতৃভাষা, মাতৃভূমি তথা মা ও তাঁর শহীদ সন্তানদের প্রতীক। অর্ধবৃত্তাকারে মা তাঁর শহীদ সন্তানদের নিয়ে দণ্ডায়মান, মা অনন্তকাল ধরে সন্তানদের রক্ষা করেছেন, যাঁরা তাঁর মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেদের বিসর্জন দিয়েছেন আর সে জন্য গৌরবান্বিত মা তাঁর সন্তানদের দোয়া করছেন। সন্তানদের আত্মত্যাগের মহিমায় মা ঝুঁকে পড়েছেন একটু স্নেহে আর চারটি সন্তানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর লক্ষ লক্ষ সন্তানকে দেখতে পাচ্ছেন।"

স্মৃতির মিনার বলতে আগে মানুষের মনে যে ধ্যান-ধারণা ছিল সেই গতানুগতিক রূপকে সম্পূর্ণ বর্জন করে এক বলিষ্ঠ ও আধুনিক ভাস্কর্যচিন্তা এই শহীদ মিনার। বস্তুত বাংলাদেশে আধুনিক ভাস্কর্যশিল্পের এটি প্রথম পদক্ষেপ। এই ভাস্কর্যশিল্পচিন্তায় শিল্পী হামিদুর রাহমানকে সহযোগিতা করেছিলেন আরেক জন প্রখ্যাত মহিলা ভাস্কর নভেরা আহমেদ।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে সারা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে হাজার হাজার শহীদ মিনার, যেখানে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ নগ্ন পায়ে প্রভাতফেরী করে, গান গেয়ে, ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে আসে শহীদ মিনারে, দেশকে ভালবাসার শপথ নেয়, ভাষা-সাহিত্য - শিল্প-সংস্কৃতিকে রক্ষা করার ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার শপথ

www.pathagar.com

গ্রহণ করে। বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিমবঙ্গেও গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হামিদুর রাহমানের জন্ম ১৯২৮ সালে পুরানো ঢাকায়। ১৯৪৮ সালে ঢাকা গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের যাত্রাশুরুতে প্রথম ছাত্রদের তিনি অন্যতম। দু' বছর চিত্রকলায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিত্রকলায় শিক্ষালাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি লণ্ডন স্কুল অব আর্ট অ্যাণ্ড ডিজাইন থেকে শিল্পকলায় স্নাতক হন। ইতালির ফ্লোরেন্স একাডেমীর দ্য বেল আর্ট-এ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দেয়ালে শিল্পী হামিদুর রাহমানের ম্যুরালের অংশবিশেষ

ম্যুরালের উপরও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে হামিদুর রাহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) লাইব্রেরির দোতলায় যে প্রদর্শনীটি করেন, তা এ দেশের আধুনিক শিল্পকর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা রাখে। চিত্রকলায় আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিত্রকলাচর্চার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করে তিনি তাঁর প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করেন।

হামিদুর রাহমান তাঁর শিল্পকর্ম প্রদর্শন করেছেন ইউরোপের (দ্র) বিভিন্ন দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), কানাডা, ভারত (দ্র), পাকিস্তান (দ্র) ও দেশের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীতে। এক জন উল্লেখযোগ্য ম্যুরাল শিল্পী হিসাবেও হামিদুর রাহমান খ্যাতি লাভ করেছেন।

দেশে-বিদেশে তিনি যত ম্যুরালচিত্র তৈরি করেছেন, সেগুলোর যোগফল হবে প্রায় ১১,০০০ বর্গফুট। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য ম্যুরাল রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির দেওয়ালে। এগুলোর নাম—বোরাক দুলদুল, জেলেদের গ্রাম, নৌকা ও জীবন ইত্যাদি। ১৯৫৭-৫৮ সালে তিনি এ কাজগুলো করেন। ইংল্যাণ্ডের কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে ৩২ × ১৩ ফুট আকারের একটি ম্যুরালচিত্র রয়েছে। এ ছাড়াও লণ্ডন (দ্র), ব্রাসেল্‌স্ ও কানাডাতেও তিনি বেশ কিছু ম্যুরালচিত্র নির্মাণ করেছেন। এই কৃতী শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মের জন্য দেশে-বিদেশে কয়েক বার পুরস্কৃত হয়েছেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদকে (দ্র) ভূষিত করেন।

১৯৮৭ সালে তিনি কানাডার মণ্ট্রিল শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

হা. খা.

হাম্‌সুন, ক্নুট [১৮৫৯-১৯৫২]

নরওয়ের ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও কবি হাম্‌সুনের আসল নাম ক্নুট পেডের্সেন্ (Knut Pedersen Hamsun)। উত্তর নরওয়ের একটি প্রদেশে জন্ম, স্বচ্ছল জোতদার পরিবারে। ইবসেনের (দ্র) পরে দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো লেখাপড়া শেখেন নি। স্কুল কলেজের কোনো সার্টিফিকেট নেই। খুব অল্প বয়সেই লিখতে শুরু করেছিলেন, বয়স কুড়ি পার না হতেই বেশ কিছু গল্প ছাপা হয়েছিল। ততদিনে জীবনে নানান অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করে ফেলেছেন— গুদামঘরের কেরানি, ফেরিওয়ালা, মুচিগিরি শেখা ইত্যাদি কি না করেছেন। কিছুকাল পরে রাজধানী শহর ওস্‌লো-তে চলে এলেন

www.pathagar.com

লেখাপড়া শেখার ইচ্ছায়, কিন্তু দেখলেন যে পড়াশোনা, সাহিত্যরচনা ও নিজের খরচ চালানোর জন্য টাকা উপার্জন করা—একসঙ্গে তিনটি হওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা আজেবাজে নানান জাতের চাকরি করার পর শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় (দ্র) চলে গেলেন ১৮৮২ সালে। মার্কিন দেশেও কোনো সুস্থির জীবন পান নি, হাজার উটকো কাজকর্মে জীবন নির্বাহ করতে হয়েছে। লেখালেখির কিন্তু বিরাম নেই। মধ্যিখানে দেশে একবার ফিরেও গিয়েছিলেন, কিন্তু চাকরিবাকরি না পেয়ে, পুনরায় ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যা হোক, ১৮৯০ সালে তাঁর উপন্যাস বেরুল 'সুল্ট্' (Sult : ক্ষুধা)। এ বইতেই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছেন। তাঁর অপর দুই বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'লাণ্ডস্ট্রাইকেরে' (Landstrykere : ভবঘুরে) এবং 'মার্কেন্স গ্রোডে' (Markens grode. ইংরেজি অনুবাদে The Growth of the Soil)। দ্বিতীয় বইটি এত বিখ্যাত হল যে বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ বের হল। শেষ পর্যন্ত হাম্‌সুন্ ১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) পেলেন।

পরবর্তী কালে ক্লুট্ হাম্‌সুন্ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, এবং দুঃখের ব্যাপার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বিশ্বযুদ্ধেই (দ্র) তিনি জার্মান পক্ষের সমর্থক হয়ে দাঁড়ান। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে তাঁকে নাৎসি বাহিনীর দালাল হিসাবে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বার্ধক্যের কারণে কারাদণ্ড মওকুফ করে তাঁকে পাগলা গারদে রাখা হয়, এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৫২ সালে

হা. মা.

হায়দার আলী [১৭২১—১৭৮২]

মহীশূরের সুলতান। তিনি মহীশূরের অন্যতম ফৌজদার ফতে মহম্মদের পুত্র এবং টিপু সুলতানের (দ্র) পিতা। তাঁর জন্ম ১৭২১ সালে। তিনি লেখাপড়া জানতেন না, তবে বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন।

হায়দার আলী ১৭৪৯ সালে মহীশূরের সৈন্যবাহিনীতে বিশেষ শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন। তার ফলে তাঁকে 'খান' উপাধি দেওয়া হয়। তরুণ বয়সে অসামান্য সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তিনি ১৭৫৫ সালে দিন্দিগলের ফৌজদার হন। এরপর নিজ দক্ষতায় অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মহীশূরের প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৬৬ সালে ওদেয়ার বংশের হিন্দু মহারাজার মৃত্যু হলে তিনি নিজেকে মহীশূরের সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং শ্রীরঙ্গপত্তমে রাজধানী স্থাপন করে শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন।

১৭৬৭ সালে ইংরেজ ও মারাঠারা হায়দার আলীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং একই সঙ্গে কূটনৈতিক চালে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে মারাঠাদের যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করতে এবং হায়দ্রাবাদের নিজামকে (দ্র) কূটনীতির মাধ্যমে ইংরেজদের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন। এর ফলে ১৭৬৯ সালে ইংরেজেরা পরাজিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংসের (দ্র) নেতৃত্বে ইংরেজেরা ভারতে ক্ষমতা সম্প্রসারণ করতে থাকলে হায়দার আলী ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং ফরাসি ও মারাঠাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। ১৭৮০ সালে তিনি কর্ণাটক আক্রমণ করেন। কিন্তু ফরাসি ও মারাঠা মিত্রবর্গ তাঁর পক্ষ ত্যাগ করায় হেস্টিংসের সেনাধ্যক্ষ স্যার আয়ার কুট (Eyre Coote)-এর নিকট তিনি পোর্টোনোভা নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই সঙ্গে তাঁর মাদ্রাজ অধিকার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ১৭৮২ সালের ডিসেম্বরে ভারতের (দ্র) চিতোরে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র টিপু সুলতান (দ্র) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

সুজ. ব.

হায়ারোগ্লিফ্ চিত্রলিপি দ্র

হারা-কিরি

জাপানে (দ্র) আত্মহত্যার একটি পদ্ধতি। আত্মহত্যাকারী গোপনে বা লুকিয়ে নয়, অনেক লোকজনের সামনেই এক বিশেষ ধরনের ছোরা নিজের পেটে ঢুকিয়ে নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে ফেলে মৃত্যুবরণ করে। এই আত্মহত্যাকে জাপানি সমাজে বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখা হয়। পুরনো আমলে কোনো যোদ্ধা সেনাবাহিনীর কোনো নিয়ম ভঙ্গ করার ফলে যদি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পেত, তা হলে তাকে

www.pathagar.com

জনসমক্ষে 'হারা-কিরি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মহত্যা করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হত। তখন থেকেই এ ধরনের আত্মহত্যাকে ব্যক্তিগত সাহস ও মর্যাদাবোধের সঙ্গে যুক্ত করে জাপানিরা দেখে আসছে।

বহু বিখ্যাত জাপানি ব্যক্তিত্ব হারা-কিরির মাধ্যমে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছেন, যেমন—নোবেল পুরস্কার (দ্র) বিজয়ী কথাশিল্পী কাওয়াবাতা ইয়াসুনারি (দ্র) এবং মিশিমা ইউকিও।

হা. মা.

হারাম

'হারাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ, অবৈধ। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মুসলমানদের জন্য তা গ্রহণ করা অবৈধ বা হারাম।

হারাম বস্তু বা সামগ্রী গ্রহণ বা ভোগ করা থেকে বিরত থাকার জন্য কুরআন শরীফে (দ্র) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এ সকল অবৈধ সামগ্রী মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ক্ষতিকর। যেমন মদ্যপান, মৃত জীব ভক্ষণ, ব্যভিচার, জানা থাকা সত্ত্বেও অপহৃত পশুর মাংস খাওয়া, এমনি বহু বিষয়ে হারামের বিধান আছে, যার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন সূরায় (দ্র) পাওয়া যায়।

মু. মা.

হারিকেন ঝড় দ্র

হারুন-উর রশিদ [আনু. ৭৬৪—৮০৯]

আব্বাসীয় বংশের পঞ্চম খলিফা। তৃতীয় খলিফা আল-মাহ্দীর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি যৌবনে এশিয়া মাইনরে (দ্র) অভিযান পরিচালনা করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর বড় ভাই আল-হাদীর মৃত্যুর পর ২২ বছর বয়সে তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তাঁর গৃহশিক্ষক ইয়াহয়া বিন খালিদ বারমাকিকে তাঁর প্রধান উজির নিযুক্ত করেন। ইয়াহয়া এবং তাঁর পুত্র জাফর ও ফজলের সুশাসনে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে হারুন-উর রশিদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্রাট শার্লামেনের সঙ্গে তাঁর দূত ও উপঢৌকন বিনিময় হয়।

এক বার খলিফা যখন এশিয়া মাইনরে গ্রিকদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন প্রাচ্যদেশে ভীষণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। খলিফা এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে খোরাসানের তুস নগরে ৮০৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে হঠাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

খলিফা হারুন-উর রশিদ কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও আইনবিদদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। পরবর্তী কালে রচিত আরব্য রজনীতে (দ্র) তাঁর সুশাসন ও প্রজারঞ্জনের বহু চমকপ্রদ কাহিনী ও দরবারী গল্প স্থান পেয়েছে।

মো. ই.

হার্কিউলিস্ (Hercules)

বীর হিসাবে পাশ্চাত্য পুরাণের এই চরিত্রটি আমাদের দেশে অত্যন্ত পরিচিত। হার্কিউলিস্ নামটি লাতিন। আসলে কিন্তু নামটি গ্রিক—'হেরাক্লেস্'। গ্রিক থেকেই লাতিন ভাষায় গিয়ে উচ্চারণে সামান্য অদলবদল ঘটে গেছে।

গ্রিক বা রোমান পৌরাণিক কাহিনীতে এই অর্ধেক দেবতা-অর্ধেক মানুষটি যেমন বীর ও সাহসী, তেমনি দয়ালু ও খোশমেজাজি। তাঁকে নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। যেমন—শিশুকালে দোলনায় শোয়া অবস্থাতেই দুটো সাপ গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন। কথিত আছে, দুই অপরূপ সুন্দরীর ছদ্মবেশে আনন্দস্ফূর্তির দেবী এবং গুণের দেবী এসে তাঁকে বলেছিলেন—আমাকে যদি পছন্দ কর সারা জীবন হৈচৈ-আনন্দে ডুবে থাকতে পারবে; গুণের দেবী বলেছিলেন—সারা জীবন দুঃখকষ্টের হবে, কিন্তু তুমি সম্মান ও গৌরব অর্জন করবে। হার্কিউলিস্ দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছিলেন।

বারোটি বিশেষ ধরনের কাজ করার জন্য হার্কিউলিস্ পুরাণের মাধ্যমে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন : (১) নেমিয়ান সিংহদৈত্য হত্যা, (২) হাইড্রা নামে বহুমুখী সাপ (যার যে কোনো মাথা কেটে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে তা গজিয়ে ওঠে) মেরে ফেলা, (৩) এরুমান্থস্ পাহাড়ের মহাশক্তিধর বরাহকে জ্যান্ত ধরে আনা, (৪) সেরিনেইয়ার সোনার শিংওয়ালা হরিণ ধরা, (৫) এলিসের রাজা আউগেইয়াসের আস্তাবলের তিরিশ বছর ধরে জমানো নোংরা ধুয়ে সাফ করা, (৬)

www.pathagar.com

হার্কিউলিস্

নরখাদক পাখি স্তিম্ফিলিয়ুসদের বিনাশ করা, (৭) ক্রিটের ষাঁড়কে পোষ মানানো, (৮) দিওমেদেসের নরখাদক অশ্ববাহিনী ছিল বলে দিওমেদেসকে হত্যা করে ঘোড়াগুলোকে বশে আনা, (৯) বীরাঙ্গনা হিপ্পোলিতার কোমরবন্ধনী নিয়ে আসতে গিয়ে প্রতারণার কারণে রানী হিপ্পোলিতাকে যুদ্ধে হত্যা করা, (১০) গেরিওনের গরুর পাল আনতে গিয়ে বিশাল পাহাড় দু' ফাঁক করে তার ভিতর দিয়ে পথ তৈরি করে সেখান দিয়ে গরুগুলো পার করানো, (১১) দৈত্য বধ করে হেস্পিরিদেস থেকে আপেল নিয়ে আসা, এবং (১২) পাতালে নরকের প্রহরী কের্বেরোস্ নামে একটি কুকুর, যার পঞ্চাশটি মাথা, তাকে বোকা বানিয়ে বেঁধে ফেলা।

এ সবের পরেও হার্কিউলিসের বড় কীর্তি বন্দি প্রমিথেউস (দ্র)-কে মুক্তি দেওয়া।

হা. মা.

হার্ডওয়্যার কম্পিউটার দ্র

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (Hardinge Bridge)

বাংলাদেশের (দ্র) সবচেয়ে দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল রেলসেতু। পাবনা জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ রেলওয়ের পাক্‌শি রেলস্টেশনের দক্ষিণে পদ্মা (দ্র) নদীর উপর এই সেতু নির্মিত। ১৯০৯ থেকে শুরু করে ১৯১৫ সালে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজকে লোকে 'সারা ব্রিজ'ও বলে। এই পুল তৈরি হওয়ার পূর্বে কলিকাতা (দ্র) থেকে আসা রেললাইন পাবনার দিকে যেখানে এসে থেমে যেত, সেই গ্রামের নাম ছিল 'সারা'। সারাঘাটে স্টিমারে চেপে নদী পার হয়ে কুষ্টিয়া জেলায় যেতে হত। বর্তমানে পাবনা জেলার পাক্‌শি রেলস্টেশন ও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা রেলস্টেশনের মধ্যে যোগসূত্র এই সেতু।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১,৭৯৮.৩২ মিটার বা ৫,৯০০ ফুট। এর উপর দু'টি ব্রড-গেজ রেললাইন আছে। সেতুর থামগুলো নদীগর্ভে প্রায় ৪৫·৭২ মিটার বা ১৫০ ফুট গভীরে প্রোথিত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা-যুদ্ধের (দ্র) সময় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে এটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে সেতুটিকে যাতায়াতের উপযোগী করে তোলা হয়।

এককালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দীর্ঘতম ও ব্যয়বহুল রেলসেতুগুলোর মধ্যেও হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নাম উল্লেখযোগ্য।

সুজ. ব.

হার্মনি (harmony)

স্বরসাম্য বা স্বরসঙ্গতি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ব্যবহৃত স্বরসম্মিলন পদ্ধতির নাম। দুই বা ততোধিক স্বরের বিজ্ঞানসম্মত মিলনকেই পাশ্চাত্যে সঙ্গীতের 'হার্মনি' বলা হয়।

পূর্বে সকল সঙ্গীতই ছিল সুর বা মেলোডিপ্রধান। আমাদের সঙ্গীত এখনো মেলোডিপ্রধান। একসঙ্গে একটি স্বর বা টোন ধ্বনিত করে মেলোডি গঠন করা হয়। পাশ্চাত্য উপাসনা-সঙ্গীতও ছিল আদিতে সুরপ্রধান, বলা হত প্লেইন সং। গির্জায় (দ্র) সমবেত গায়কদের পক্ষে একই গান সবাই মিলে গাওয়ার ব্যাপারে অসুবিধে হত কণ্ঠের তারতম্যের জন্য। ফলে গায়কদলকে তিন ভাগে ভাগ করা হত। মধ্যস্থানীয় কণ্ঠস্বরের দলকে করা হত মূল গায়কদল। নিম্নতর ও উচ্চতর কণ্ঠস্বরের দল দু'টি মধ্যস্থানীয় কণ্ঠস্বরের

www.pathagar.com

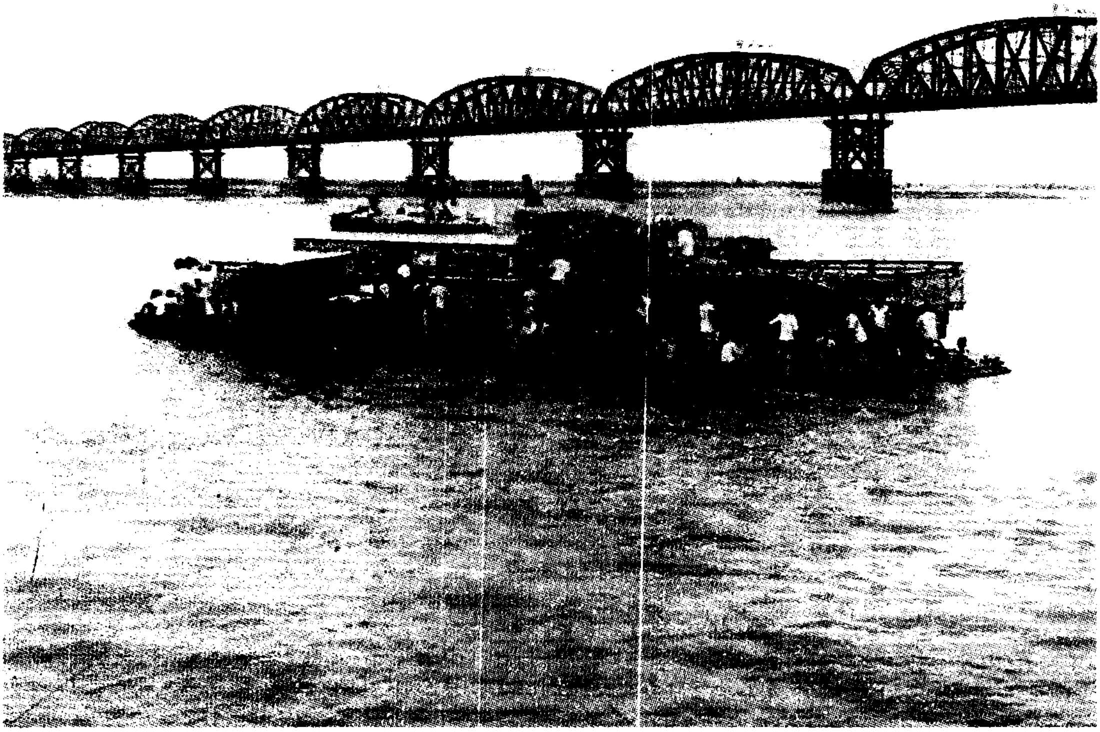

পদ্মা নদীর উপরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ বা সারা ব্রিজ

দলের গায়নকে নিম্নতর ও উচ্চতর মূর্ছনায় জড়িয়ে রাখত। মূল সুরকে ঘিরে সুরের জাল বোনা হতে থাকল যেন। গোটা প্রক্রিয়াটি শুনতে খুব সুন্দর হল। মূল সুরকে উচ্চতর ও নিম্নতর স্থানে ধ্বনিত করার ব্যাপারে কতগুলো স্বরসম্পর্ক উদ্ভাবন করতে হল। পরে কর্ড ব্যবস্থা প্রচলিত হলে এই স্বরসম্পর্কের ব্যাপারটিকে নিয়মবদ্ধ করা হয় এবং কর্ড গঠনের নিয়ম অনুযায়ী টোনসমূহকে ধ্বনিত করা হতে থাকে। কর্ডে মূল স্বরের সংবাদে দুই বা ততোধিক স্বর ধ্বনিত হতে থাকলে সেই সহযোগী ধ্বনিই হয়ে দাঁড়াল হার্মনি রচনার ভিত্তি। দশম শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে হার্মনি পদ্ধতি ব্যবহারের সূত্রপাত। কালক্রমে হার্মনি রচনায় বিপুল পরিবর্তন আসে। বর্তমানে শুধু স্বরসংবাদ নয়, স্বরবিসংবাদ অবলম্বনেও হার্মনি রচিত হয়।

আমাদের সঙ্গীত মেলোডি বা সুর দ্বারা গঠিত। পাশ্চাত্য সঙ্গীত মেলোডি ও হার্মনি উভয় দ্বারা গঠিত। লোকসঙ্গীতের (দ্র) কথা বাদ দিলে সেখানকার প্রায় সকল সঙ্গীতরচনাই হার্মনিপ্রধান। সেখানে একটি মূল সুরের রেখা চলতে থাকলে তাকে ঘিরে মাকড়সার জালের মতো চলতে থাকে হার্মনির সুরজাল। ফলে সঙ্গীত নিঃসঙ্গভাবে চলে না। বিপুল হয়ে ওঠে তার গঠন ও চলার ভঙ্গি।

ক. গো.

হার্মোনিয়াম (harmonium)

এক প্রকার অর্গ্যান (দ্র)। বাক্সের মতো দেখতে এই যন্ত্রে বেলোর সাহায্যে বায়ু চালনা করা হয়। চালিত বায়ু ধাতব রিডে আঘাত করলে তা থেকে ধ্বনি নিঃসৃত হয়। এতে

www.pathagar.com

একটি রিডবোর্ড থাকে। রিডসমূহ সপ্তকের অন্তর্গত স্বরস্থান অনুযায়ী ক্রমোচ্চ রীতিতে সজ্জিত থাকে। রিডসমূহের ওপর থাকে পর্দা। পর্দাগুলো সাদা ও কালো রঙের হয়। স্বাভাবিকভাবে সাদা পর্দায় শুদ্ধ স্বর এবং কালো পর্দায় কোমলস্বর বোঝায়। তবে স্কেল (দ্র) পরিবর্তন করলে সব সময়ই যে এটা বোঝাবে তেমন নয়। ১৮৪২ সালে ফ্রান্সের জনৈক এ. ডোরিয়ান এই যন্ত্র প্রথম নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। একে কেউ কেউ 'ক্যাবিনেট অর্গ্যান'ও বলে থাকেন। ভারতবর্ষে প্রথম হার্মোনিয়াম ব্যবহৃত হয় কলিকাতায় (দ্র) ১৮৬০-এর দশকে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্মসমাজের (দ্র) অনুষ্ঠানে প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে হার্মোনিয়াম-এর ব্যবহার ঘটে। বর্তমান কালে আমাদের সঙ্গীতে, বিশেষত কণ্ঠসঙ্গীতে হার্মোনিয়াম একটি অপরিহার্য অনুগামী যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ক. গো.

হালাল

'হালাল' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিধিসঙ্গত, বিধিসিদ্ধ, আইনসঙ্গত, বৈধ। ইসলামী বিধানমতে যা কুরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক বৈধ, তা-ই হালাল। ইসলামী শরীয়তে মুসলমানদের জন্য বৈধ এবং আইনসিদ্ধ বস্তুসামগ্রীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। বস্তুত হালাল সামগ্রী গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের মনোভাব প্রকাশিত হয়। ইসলামের খাঁটি অনুসারীরা শরীয়ত নির্ধারিত হালাল দ্রব্য গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান থাকেন।

মু. মা.

হালিদা এদিব হানুম [১৮৮৪— ১৯৬৪]

বাংলায় অনেকে এই নামটিকে ভুলবশত খালেদা এদিব খানুম বা খালেদা এদিব হানুম লিখে থাকেন। তাঁর প্রকৃত নাম হালিদা এদিব আদ্‌ভার, আমাদের দেশে তিনি হালিদা এদিব হানুম নামে পরিচিত। 'হানুম' শব্দের অর্থ বেগম বা লেডি। আধুনিক তুরস্কের (দ্র) রাষ্ট্র ও সমাজসংস্কারবাদী নেত্রী। তিনি তুরস্কের বসফরাস প্রণালীতীরবর্তী এক গ্রামে ১৮৮৪ সালে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

কৃতিত্বপূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাজীবন শেষে হালিদা এদিব হানুম ১৮৯৪ সালে কলেজজীবনে প্রবেশ করেন এবং ১৯০১ সালে বি.এ. পাশ করেন।

১৯০৮ সালে তুরস্কে শাসনসংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ক্রমশ তা জোরদার হয়ে ওঠে। এই সময় হালিদা পশ্চাৎপদ তুর্কি নারীসমাজের যুগপ্রাচীন নানাবিধ সমস্যা ও তা সমাধান সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তাঁর এই সব রচনার ফলে তুর্কি নারীসমাজে নবজাগরণের সূচনা হয়। এ জন্য রক্ষণশীল ও গোঁড়াপন্থী মুসলমান সমাজ হালিদার ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। তারা তাঁকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভীতিপ্রদর্শন করতে থাকে, এমনকি তাঁর প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়। ফলে তাঁকে সাময়িকভাবে দেশত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে, পরে মিশরে চলে যেতে হয়।

১৯০৯ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তুরস্কের নবজাগরণে হালিদার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। 'ঐক্য ও উন্নতি আন্দোলনে' বিজয়ের পর তিনি দেশে ফিরে এসে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পার্লামেণ্টারি রাজনীতিতে তুর্কি নারীসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তুরস্কে পুরুষের বহুবিবাহপ্রথা নিষিদ্ধকরণ এবং আইনের বলে সে দেশের নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা অগ্রপথিকের। ১৯১০ সালে তিনি 'তুরস্কের জননী' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯১৫ সালের ১৫ই মার্চ ইংরেজেরা কনস্টান্টিনোপল দখল করলে কামাল আতাতুর্কের (দ্র) নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এই সরকার পরিচালনাপদ্ধতি সম্পর্কে আতাতুর্ক যে অভিভাষণ দেন, সেটি রচনার ক্ষেত্রে হালিদার যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁকে বলা হত 'The woman behind Kamal' অর্থাৎ 'কামালের পেছনে দণ্ডায়মান নারী'। শুধু তাই নয়, ইংরেজ ও গ্রিক অভিযানের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে লড়াইও করেছেন। বিদেশী অধিকার থেকে তুরস্ক মুক্ত হলে হালিদা প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তবে তাঁর সমাজসংস্কারমূলক কাজ থেমে থাকে নি।

হালিদা এদিব হানুমের সাহিত্যকর্মের সংখ্যা নগণ্য নয়। তিনি মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছেন শেক্সপীয়রের(দ্র) বেশ কিছু নাটক। এ ছাড়া তাঁর মৌলিক রচনাকর্মের ভেতরে উল্লেখযোগ্য 'জীবনস্মৃতি', 'তুরস্কের পরীক্ষা' এবং 'তুরস্কের পাশ্চাত্যকরণ' ইত্যাদি।

www.pathagar.com

তিনি ১৯৬৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

হাশর

'হাশর' আরবি শব্দ এবং এর অর্থ সভা বা সম্মেলন। এরই সম্প্রসারিত অর্থ এখন দাঁড়িয়ে গেছে–শেষবিচারের সভা।

বিশ্বের প্রায় সব ধর্মেই (দ্র) শেষবিচারের দিনের ধারণা পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে পার্থিব সব কিছুর অবসান ঘটবে, থাকবে শুধু মহান আল্লাহ্‌র (দ্র) অস্তিত্ব। ইসলামী মতবাদ অনুসারে এমন এক দিন আসবে যেদিন আল্লাহ্ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং উভয়ের মধ্যে যতকিছু আছে সবই ধ্বংস করবেন। সেদিন মানুষকে দেওয়া হবে তার কর্মফল। ফিরিশতা (দ্র) ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন এবং প্রত্যেক জীবের মৃত্যু ঘটবে। এর পর ইসরাফিল (আ.) পুনরায় শিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। তখন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যারা জগতে এসেছে সকলের পুনরুত্থান হবে এবং সকলেই হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। সেদিন মহাবিচারক আল্লাহ্ মানুষদের বিচার করবেন। প্রত্যেক মানুষকে দেওয়া হবে তার আমলনামা বা কৃতকর্মের ফিরিস্তি। এর ভিত্তিতে বিচারে সৎলোকদের স্থান দেওয়া হবে চিরশান্তির স্থল বেহেশ্‌তে (দ্র)। অন্য দিকে অসৎ লোকদের দোজখে (দ্র) নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তারা ভোগ করবে অনন্ত কাল।

কুরআন শরীফ (দ্র) ও হাদিসে (দ্র) হাশরের দিনের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। হাশরের দিনে বিশ্বাস করা ইসলাম ধর্মের (দ্র) মৌলিক শিক্ষার অন্যতম।

মো. ই.

হাসন রাজা [১৮৫৪—১৯২২]

স্বনামধন্য লোকসঙ্গীত (দ্র)-রচয়িতা। বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার লক্ষণশ্রী গ্রামে ১৮৫৪ সালে বিখ্যাত দেওয়ান বংশে জন্ম। পিতা আলী রাজা। হাসন রাজার অপর নাম অহিদুর রাজা। গানে হাসন রাজা নামে ভূমিকা করায় এই নামেই তিনি খ্যাত হন। সঙ্গীতে (দ্র) ও কাব্যে (দ্র) হাসন রাজার স্বভাবসুলভ অধিকার ছিল। গভীর কল্পনাশক্তি ও প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি ছিলেন স্বভাব-দার্শনিক। হাসন রাজার গান গভীর চিত্তাকর্ষক। হাসন রাজা অনেক উৎকৃষ্ট ভাবসঙ্গীত রচনা করেন। বাংলা তত্ত্বসঙ্গীতে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। বাউল (দ্র) কবি লালন সাঁইয়ের (দ্র) পাশেই তাঁর স্থান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) হাসন রাজার গানে প্রকাশিত দর্শনচিন্তার প্রশংসা করেছেন। হাসন রাজার অনেক গানে সিলেট (দ্র) অঞ্চলের ভাটিয়ালি (দ্র) সঙ্গীতের চমৎকার ব্যবহার ঘটেছে। সারি গানের ঢংটিও ভাটিয়ালি গানের সঙ্গে মিশেছে স্থানবিশেষে। ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলের বাউলের ঢংটিও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর অনেক রচনায়। হাসন রাজার রচনা বাংলা লোকসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। ১৯২২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ক. গো.

হাসান জান [১৯২৭—১৯৭৪]

শিশুসাহিত্যিক ও শিশু-সংগঠক। তিনি ১৯২৭ সালের ১লা এপ্রিল কলিকাতায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে কলিকাতা পার্ক সার্কাস মডার্ন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৭ সালে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই. এ. এবং ১৯৫১ সালে সেন্ট্রাল কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি চব্বিশ পরগনা জেলার বাণীপুর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজ থেকে 'ডিপ্লোমা ইন বেসিক এডুকেশন' ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর কিছুকাল ভূগোল বিষয়ে অনার্স কোর্সেও পড়াশোনা করেন। স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি ভবানীপুরের শিশুসংগঠন 'মণিমেলা'র সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তিনি 'নিখিল ভারত মণিমেলা' কেন্দ্রের ক্রীড়া-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই হাসান জানের কর্মজীবন শুরু হয় এবং বেশ কয়েক বার তাঁর পেশাবদল ঘটে। প্রথমে কিছুদিন সাব-রেজিস্ট্রারের কাজ করার পর শিক্ষকতায় যোগ দেন। কিছুদিন পর শিক্ষকতা ছেড়ে ভারতের (দ্র) বিভিন্ন

www.pathagar.com

পত্র-পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার শিশু-কিশোর বিভাগ 'মুকুলের মহফিল'-এর পরিচালক বাগবানের সহকারী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিশোর সংগঠন মণিমেলার মুখপত্র ও সাহিত্যমাসিক 'মণিমুকুর'-এর অন্যতম পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৪ সালে হাসান জান ঢাকায় (দ্র) আসেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। প্রথমে ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯৭৩ সালে তিনি বাংলা একাডেমী (দ্র) থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা 'ধানশালিকের দেশ'-এর সহ-সম্পাদক পদে যোগ দেন।

হাসান জান ছাত্রজীবনেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। আজীবন তিনি শিশুসাহিত্য রচনায় মনোযোগী ছিলেন। কলিকাতা থাকাকালে 'আনন্দমেলা', আজাদ পত্রিকার 'মুকুলের মহফিল', 'শিশু সওগাত', 'কাকলি', 'নন্দিনী', 'সমাজ', 'রামধনু', 'মণিমুকুর', 'কথা-সাহিত্য' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য ছড়া-কবিতা-গল্প প্রকাশিত হয়। ঢাকায় চলে আসার পর তিনি 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর 'কচি-কাঁচার আসর', 'দৈনিক পূর্বদেশ'-এর 'চাঁদের হাট', 'দৈনিক বাংলা'র 'সাত ভাই চম্পা', ''দৈনিক সংবাদ'-এর 'খেলাঘর', 'মাসিক কচি ও কাঁচা', 'টাপুর টুপুর', 'সবুজ পাতা' ইত্যাদি কাগজে নিয়মিত ছড়া, কবিতা, গল্প ও পশু-পাখি বিষয়ক নিবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রকাশিত বই 'নরম গরম' (১৯৭২), 'লাল নীল ছড়া' (১৯৭৪)। তিনি কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার ক্রীড়া বিষয়ক উপদেষ্টা এবং 'কচি ও কাঁচা' মাসিক পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।

হাসান জান ১৯৭৪ সালের ১লা এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

হাসান (রা.), হযরত [৬২৫—৬৭২]

হযরত ইমাম হাসান (রা.) ইসলামের চতুর্থ খলিফা (দ্র) হযরত আলী (রা.) (দ্র)-র জ্যেষ্ঠ পুত্র। হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর মেয়ে ফাতিমা (রা.) (দ্র) হযরত হাসান (রা.)-র মা। ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মদিনায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত আলী (রা.) গুপ্তঘাতকের হাতে শহীদ হওয়ার পর তাঁর স্বপক্ষীয় লোকজন হযরত হাসান (রা.)-কে খলিফা হিসাবে মেনে নেয় ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এদিকে মুসলিম সাম্রাজ্য শাসনের আরেক দাবিদার ছিলেন উমাইয়া বংশের আমির মুয়াবিয়া। মুয়াবিয়া ছিলেন খুবই চতুর, উচ্চাভিলাষী এবং শক্তিমান। অন্য দিকে ইমাম হাসান (রা.) ছিলেন সরল ও শান্তিপ্রিয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং কলহ-বিবাদকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। হাসান (রা.)-এর এই নরম স্বভাবের জন্য আস্তে আস্তে লোকজন তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে মুয়াবিয়ার দলে ভিড়তে থাকে।

আমির মুয়াবিয়ার সঙ্গে খিলাফতের দাবিতে সংঘর্ষ ও রক্তপাত অনিবার্য মনে করে হযরত হাসান (রা.) ৭ মাস ২৬ দিন ক্ষমতাসীন থাকার পর স্বেচ্ছায় খিলাফতের দাবি ত্যাগ করেন এবং মুয়াবিয়ার আনুগত্য মেনে নেন।

হাসান (রা.) ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

হাসান হাফিজুর রহমান [১৯৩২—১৯৮৩]

কবি, গল্পকার, অধ্যাপক ও সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৩২ সালের ১৪ই জুন জামালপুর শহরে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৯৪৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। ১৯৫১ সালে বি. এ. পাশ করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতি ও '৫২-র ভাষা-আন্দোলনে (দ্র) গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ১৯৫৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় একুশের সঙ্কলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী' প্রকাশিত হয়। এই সঙ্কলন গ্রন্থের জন্য এখনো তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৫৫

www.pathagar.com

সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সাপ্তাহিক 'বেগম' ও মাসিক 'সওগাত' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকুরি নেন। এ সময় তিনি প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের (দ্র) সংস্পর্শে আসেন। তিনি 'সওগাত সাহিত্য মজলিসে' উদ্যোগী হয়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত প্রায় চার বছর তিনি 'সওগাত'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন এবং এখানে ১৯৫৭ পর্যন্ত কাজ করেন। এরপর তিনি ঐ বছরই ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। স্পষ্টভাষী ও অন্যায়ের প্রতিবাদকারী হওয়ায় তিনি এ কলেজের কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। ১৯৬৪-র গোড়ার দিকে তাঁকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। পরে অবশ্য তিনি চাকুরি ফিরে পান। কিন্তু তিনি ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারি 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। বাংলাদেশের (দ্র) স্বাধীনতার পর তিনি এ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেস কাউন্সিলর ছিলেন। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে তাঁকে ঢাকায় (দ্র) ডেকে আনা হয় এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ও. এস. ডি. করে রাখা হয়। এ সময় তিনি মাসিক 'সমকাল' পত্রিকায় কাজ করতে থাকেন। ১৯৭৪ সালে তাঁকে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র' নামে মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) ইতিহাস রচনা প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমান এ সময় গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে অত্যন্ত যত্ন, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ১৪ খণ্ড পর্যন্ত তিনি সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেন। ১৯৮৩ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

হাসান হাফিজুর রহমান শুধু এক জন কবি, সাংবাদিক বা অধ্যাপক ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক জন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, প্রগতিশীল সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের প্রাণবন্ত প্রাণপুরুষ ও সংগঠক।

গুরুতর অসুস্থ হাসান হাফিজুর রহমানকে চিকিৎসার জন্য ১৯৮৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি মস্কো পাঠানো হয়। মস্কো সেন্ট্রাল ক্লিনিকে ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হাসান হাফিজুর রহমানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল : কাব্যগ্রন্থ— 'বিমুখ প্রান্তর' (১৯৬৩), 'আর্ত শব্দাবলী' (১৯৬৮), 'অন্তিম শরের মতো' (১৯৬৮), 'যখন উদ্যত সঙীন' (১৯৭২), 'বজ্রচেরা আঁধার আমার' (১৯৭৬), 'শোকার্ত তরবারী' (১৯৮২) গল্পগ্রন্থ — 'আরও দুটি মৃত্যু' (১৯৭০); প্রবন্ধ ও গবেষণা— 'আধুনিক কবি ও কবিতা' (১৯৬৫); সম্পাদনা— 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩), 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র' (১৪ খণ্ড)।

শ. আ.

হিউএন্-ৎসাঙ [৬০২—৬৬৪]

ভারত (দ্র) পর্যটনকারী প্রাচীন চীন দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিত। তিনি চীনের (দ্র) বর্তমান হো-নান প্রদেশের অন্তর্গত কু-শিহ্ নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছেন-পাও-কু নামক গ্রামের এক অভিজাত পরিবারে ৬০২ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। হিউএন্-ৎসাঙ (ভিন্ন উচ্চারণে ইউয়ান-চুয়াঙ) তাঁর ধর্মীয় নাম। পারিবারিক নাম ছিল ছেন-ই। পিতা ছেন-হুই ছিলেন কনফুসিয়াসের (দ্র) মতবাদে বিশ্বাসী।

পিতা-মাতার চার পুত্রের মধ্যে হিউএন্-ৎসাঙ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। পারিবারিক নিয়ম অনুসারে অন্যান্য ভাইদের মতো তিনিও বাল্যকালে কনফুসীয় শাস্ত্র, চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু তাঁর বড় এক ভাই বৌদ্ধধর্ম (দ্র) গ্রহণ করলে তাঁর প্রভাবে তিনিও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশ বছর বয়সে সেই বড় ভাইয়ের কাছেই তিনি বৌদ্ধধর্মে (দ্র) দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে গবেষণার আগ্রহ থেকে তাঁর ভারত ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগে। তিনি ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে গোপনে মধ্য-এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের দুর্গম পথ পেরিয়ে উত্তর ভারতে প্রবেশ করেন।

ভারতে এসে হিউএন্-ৎসাঙ গান্ধার, শালাতুর, উড্ডিয়ান, তক্ষশীলা, কাশ্মীর, জালন্ধর, শতদ্রু, মথুরা,

www.pathagar.com

স্থানেশ্বর, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, প্রয়াগ (দ্র), কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, কপিলবাস্তু, লুম্বিনী, কুশীনগর, বারাসি, বৈশালী, বৃজি, নেপাল (দ্র), মগধ, পাটলীপুত্র(দ্র), গয়া, রাজগৃহ, নালন্দা (দ্র), চম্পা, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, ওড্র, কলিঙ্গ, কোশল, অন্ধ্র, চোল, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মালব, সুরাষ্ট্র, গুর্জর প্রভৃতি বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চাকেন্দ্র ও বুদ্ধের স্মৃতি-বিজড়িত তীর্থস্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি নালন্দা (দ্র) বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাধ্যক্ষ শীলভদ্রের (দ্র) নিকট বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন মহাযানপন্থী। বৌদ্ধশাস্ত্রে, বিশেষত মহাযান (দ্র) মত বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তির জন্য তিনি তৎকালীন ভারতীয় পণ্ডিত সমাজে 'মোক্ষাচার্য' ও 'মহাযানদেব' নামে অভিহিত হতেন।

দীর্ঘ ১৬ বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে হিউএন্-ৎসাঙ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারত থেকে তিনি বুদ্ধদেবের (দ্র) পবিত্র দেহাবশেষ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও চন্দনকাষ্ঠের নির্মিত কিছুসংখ্যক বুদ্ধমূর্তি এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি দেশে নিয়ে যান। এসব পাণ্ডুলিপি তিনি পরে সম্রাটের অনুরোধে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি সর্বমোট ৭৬টি গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে তাঁর ভারতভ্রমণবৃত্তান্ত 'সি-য়ু-কি'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বর্ণনা অনুসরণ করে আধুনিক কালে অনেক বৌদ্ধ বিহার ও তীর্থাদির অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। সেই সময়ের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্যও তাঁর রচনা থেকে পাওয়া যায়। কারণ তিনি রাজাদের সান্নিধ্য লাভেও সক্ষম হয়েছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন (দ্র) ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। হিউএন্-ৎসাঙ ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে পরিণত বয়সে চীনে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

হিউমাস মাটি দ্র

হিউম্, ডেভিড্ [১৭১১—১৭৭৬]

ইংরেজ দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ হিউম্ (David Hume)। ১৭১১ সালে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায় (Edinburgh) জন্মগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য জগতে তাঁর দর্শন সংশয়বাদ নামে পরিচিত। তিনি দার্শনিক লক (Locke) ও বার্ক্‌লে (Berkeley) প্রবর্তিত 'জ্ঞানের মূল হচ্ছে ভাব'—এই তত্ত্ব বিশ্লেষণে সন্দেহবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন।

হিউমের মতে, মানুষের জ্ঞান দিয়ে প্রকৃতির রহস্যভেদ করা সম্ভব নয়। জগতের কোনো কিছু সম্পর্কেই মানুষ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। জাগতিক জ্ঞানের মূল ভিত্তি হল কার্যকারণ-সম্বন্ধ। কোনো ঘটনাকে কোনো ঘটনার কারণ বা ফল বলে মানুষ চিহ্নিত করতে পারে মাত্র। কিন্তু তা থেকে কার্যকারণ-সম্পর্ক খুঁজে বের করে সেই অনুযায়ী কোনো ভবিষ্যদ্বাণী মানুষ করতে পারে না। তবে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ অনুমান করতে পারে যে অতীতে যা ঘটেছে তা ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে। কিন্তু এভাবে একেবারে অনিবার্য পুনরাবৃত্তির নিয়ম মানুষ আবিষ্কার করতে পারে না। তিনি ব্যক্তির সময়বোধের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

হিউমের রচনাকর্মের মধ্যে 'পলিটিক্যাল ডিসকোর্সেস' (১৭৫১), 'হিস্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড' (১৭৫৪-৫৬), 'ন্যাচার‍্যাল হিস্ট্রি অব রিলিজন' (১৭৫৭) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

রুসো (দ্র) ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিত থাকাকালে হিউম্ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে আবার তাঁরা দু' জন পরস্পর তীব্র কলহে লিপ্ত হন। ১৭৭৬ সালে হিউম্ মারা যান।

সুজ. ব.

হিজরত

হিজরত ইসলামের (দ্র) ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আরবি 'হিজরা' ক্রিয়াপদ থেকে এর উদ্ভব। শাব্দিকভাবে এর অর্থ দেশত্যাগ। ইংরেজি 'migration' শব্দটি এর সমার্থবোধক।

কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে 'হিজরত' শব্দটি ভিন্ন ব্যঞ্জনা ও বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর জন্মভূমি মক্কা (দ্র) ছেড়ে মদিনায় (দ্র) গমনের ঘটনাটিই হিজরত নামে খ্যাত।

রসূলুল্লাহ্ (স.) (দ্র) মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করলে কুরাইশ গোত্রপতিরা তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের ওপর নানা অত্যাচার-নিপীড়ন চালাতে থাকে। ক্রমে ইসলাম-

www.pathagar.com

অনুসারীদের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি বাড়তে থাকে অত্যাচারের মাত্রাও। শেষে নিরাপদ পরিবেশে ইসলাম প্রচার এবং নবদীক্ষিতদের জান-মালের নিরাপত্তার স্বার্থে রসূলুল্লাহ্ (স.) মদিনায় চলে যান অর্থাৎ হিজরত করেন। অন্যান্য নবদীক্ষিত মুসলমানেরাও মদিনায় গমন করেন।

এই হিজরত বা দেশত্যাগ সংঘটিত হয়েছিল ৮ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) (দ্র)-এর শাসনামলে হিজরতের দিনটিকে হিজরি সাল গণনার প্রারম্ভ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।

মু. মা.

হিজরি অব্দ দ্র

হিজরি মাস মাস দ্র

হিজলি বন্দিশিবির

বাংলার ইংরেজবিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অন্তরীণ করে রাখার জন্য অত্যল্পকালের মধ্যে যেসব বন্দিশিবির কুখ্যাতি অর্জন করে, তাদের মধ্যে অবিভক্ত বঙ্গে মেদিনীপুরের হিজলি বন্দিশিবির অন্যতম। এটি গড়ে তোলা হয় ১৯৩১ সালের মার্চ মাস নাগাদ।

খড়গপুর রেলস্টেশন থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে এই বন্দিশিবির এলাকা। এর অভ্যন্তরভাগের চত্বর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ১৪০ ও ৪০ গজ আয়তনবিশিষ্ট। প্রহরা-ব্যবস্থা ছিল খুবই কঠোর।

১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর এই জেলের প্রহরীরা প্রতিহিংসাবশত নির্বিচারে গুলি চালালে বেশ কয়েক জন রাজবন্দি হতাহত হন। এই খবর জেলের বাইরে পৌঁছুলে সারা দেশে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে কলিকাতা ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে যে বিশাল জনসভা হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র)। আর বিরাট এক মিছিলে নেতৃত্ব দেন সুভাষচন্দ্র বসু (দ্র)। রবীন্দ্রনাথ এই নির্মম হত্যাকাণ্ড স্মরণে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'প্রশ্ন'।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে যাঁরা হিজলি জেল পরিদর্শনে আসেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন (দ্র), অর্থসচিব নলিনীরঞ্জন সরকার, ডা. বিধানচন্দ্র রায়, সরোজিনী নাইডু (দ্র) ও কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ। গান্ধীও (দ্র) এ উপলক্ষে দু'বার এই জেল পরিদর্শনে আসেন। ফলে রাজবন্দিরা কিছু পরিমাণ সুযোগসুবিধা লাভ করেন।

১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড স্মরণে ১৯৫১ সালে হিজলি জেল এলাকাতেই দু'টি স্মারকস্তম্ভ স্থাপন করা হয় এবং এর নিকটবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় আই. টি. টি. নামের একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান।

আ. হু.

হিটলার, আডোল্‌ফ্ [১৮৮৯—১৯৪৫]

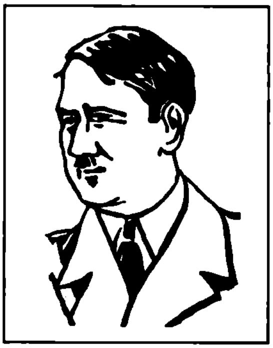

জার্মানির একনায়ক। ইহুদিবিদ্বেষী ও মার্ক্সবাদ (দ্র)-বিদ্বেষী রাজনীতিক এবং জার্মানিতে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের (ন্যাশনাল সোশ্যালিজ্‌ম্) প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা।

উত্তর অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ শহরে ১৮৮৯ সালে হিটলার (Adolf Hitler) জন্মগ্রহণ করেন। আঠারো বছর বয়সে একাডেমী অব আর্টস্-এ শিল্পকলা শেখার জন্য ভিয়েনায় যান। এই সময় উগ্র জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রের (দ্র) প্রতি অনীহা এবং ইহুদিদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ গড়ে ওঠে তাঁর মনে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় তিনি যুদ্ধে যোগ দেন এবং অচিরেই কর্পোরাল পদে উন্নীত হন। ১৯১৯ সালে যোগ দেন জার্মান ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টিতে। ১৯৩০ সালের মধ্যে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি (দ্র) দল একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়। ১৯৩২ সালে হিটলারের দল ২৩০টি আসন পায় এবং দেশের একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। ১৯৩৩ সালে হিটলারকে চান্সেলর এবং ফন্ পাপেন্‌কে ভাইস-চান্সেলর করে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ মৃত্যুবরণ করলে হিটলার এই পদটি দখল করে নেন এবং নিজেকে 'ফ্যুরের'

www.pathagar.com

(নেতা) ঘোষণা করেন।

আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে তিনি ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া, ১৯৩৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ড দখল করে নেন। রাশিয়া (দ্র) আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেন নি তিনি।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, হিটলারের নীতিহীন আগ্রাসী মনোভাবের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) ত্বরান্বিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে একের পর এক রণাঙ্গনে পরাজিত হতে থাকেন হিটলার। প্রচণ্ড হতাশায় ১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল নিজেরই পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

টি. কি.

হিতোপদেশ

পঞ্চতন্ত্রের (দ্র) কোনো একটি অধুনালুপ্ত গ্রন্থ-রূপ থেকে হিতোপদেশের উৎপত্তি। পঞ্চতন্ত্রের একমাত্র হিতোপদেশ রূপটিই বাংলাদেশে প্রচলিত। পঞ্চতন্ত্রে পাঁচটি প্রসঙ্গ আছে। হিতোপদেশে আছে ৪টি প্রসঙ্গ, যথা—মিত্রলাভ, মিত্রভেদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি। হিতোপদেশ গদ্যে-পদ্যে রচিত। গল্প লিখিত হয়েছে গদ্যে, কিন্তু নীতিকথা লিখিত হয়েছে শ্লোকে। হিতোপদেশের ভাষা সহজ-সরল। শ্লোকগুলোর ভাব হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থের প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এর উদ্দেশ্য ভাষা ও নীতি শিক্ষা দেওয়া। এ ছাড়া এও বলা হয়েছে যে এই গ্রন্থের উপজীব্য 'পঞ্চতন্ত্র' ও অপর একটি গ্রন্থ। সেই অপর একটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয় নি। হিতোপদেশে অনেক নতুন গল্পও আছে। পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি গল্প হিতোপদেশে বাদ দেওয়া হয়েছে বা পরিবর্তিত রূপে বর্ণিত হয়েছে।

১৮০১ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (দ্র) বাংলার প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের একটি অনুবাদ ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে এই অনুবাদ করেন। তার আগে ঐ কলেজের পণ্ডিত গোলকনাথ শর্মা ১৮০২ সালে 'হিতোপদেশ' অনুবাদ করেন। দু'টির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনুবাদটিই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হয়।

বি. ব.

হিন্দু কলেজ

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতায় (দ্র), ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে। এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন ডেভিড হেয়ার (দ্র) এবং পরোক্ষভাবে ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (দ্র)। এর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এ দেশীয় লোকদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।

এই প্রতিষ্ঠানের মোট দু'টি বিভাগ ছিল— পাঠশালা বা স্কুল বিভাগ এবং একাডেমী বা উচ্চতর পঠনপাঠনের বিভাগ। বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের (ইউরোপীয় ও এ দেশীয় উভয়ই) অর্থানুকূল্যে চালু হলেও পরে টাকার অভাবে নানান সঙ্কট দেখা দেয় এবং তখন (১৮২৪) সরকার অর্থ মঞ্জুর করেন।

এ দেশের শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে হিন্দু কলেজের অবদান ও সামাজিক প্রভাব অপরিসীম। ডিরোজিও (দ্র) ও রিচার্ডসনের ন্যায় শিক্ষক তরুণ ছাত্রদের মনে যে ভাববিপ্লবের বীজ বপন করে দেন, তার ফলেই 'ইয়ং বেঙ্গল' (দ্র) দল আবির্ভূত হয় এখান থেকে।

১৮৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল কলেজটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দু'মাস পরে ১৫ই জুন 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' নামে পুনরায় চালু করা হয়।

হা. মা.

হিন্দু মহাসভা

ভারতের (দ্র) হিন্দু জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন। ১৯১০ সালে এলাহাবাদে এক সম্মেলনের ভিতর দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এর জন্ম। পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, স্যার সাদিলাল, ভাই পরমানন্দ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সর্বভারতীয় এই সংগঠনটির নেতৃত্বে ছিলেন।

১৯২৪ সালে অবিভক্ত বঙ্গদেশে প্রথম হিন্দু মহাসভা গঠিত হয়। ১৯৩৭ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকর এতে যোগ দিলে এর কর্মকাণ্ডে গতির সঞ্চার হয়। ১৯৩৯ সালে কলিকাতায় (দ্র) সংগঠনটির এক বার্ষিক অধিবেশনে অনুষ্ঠানের পূর্বে এতে যোগ দেন এন. সি. চাটার্জি, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (দ্র) ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সর্বধর্ম-

www.pathagar.com

সমন্বয়বাদী ভূমিকার বিপক্ষে ছিল হিন্দু মহাসভার অবস্থান এবং সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিই ছিল এর কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলটি বিজয় লাভে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

আ. হু.

হিন্দু মেলা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্র

হিন্দুধর্ম

হিন্দুদের ধর্ম এই অর্থে হিন্দুধর্ম কথাটির ব্যবহার। প্রাচীন ভারতে এই ধর্ম প্রচলিত হয়। তবে আদিতে জাতি বা ধর্ম বোঝাতে হিন্দু নামের প্রচলন ভারতবর্ষে ছিল না। পূর্বে পারস্যবাসীরা সিন্ধু নদের তীরে বসবাসকারী ভারতীয়দের হিন্দু নামে অভিহিত করত। সিন্ধু থেকে হিন্দু কথাটির উৎপত্তি হয়েছিল। ক্রমে সকল ভারতবাসীই তাদের কাছে হিন্দু নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। ভারতে (দ্র) মুসলমান বিজয়ের পর জাতি ও ধর্মবাচক হিন্দু নামের ব্যবহার প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সে সময় হিন্দুধর্ম কথাটি যে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হত ক্রমে তাতেও পরিবর্তন আসে।

হিন্দুধর্ম বলতে বৈদিক ধর্ম বোঝায়। যে ধর্ম বেদোক্ত এবং বেদ-অনুসারী তারই নাম হিন্দুধর্ম। ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের উপাসনা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, মানুষের অস্তিত্ব, পরিণাম ও মুক্তি, পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে বোধ, জীবন যাপনের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে পবিত্র বেদ ও বেদানুসারী পবিত্র গ্রন্থসমূহে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তারই মিলিত পরিচয় হিন্দুধর্ম হিসাবে।

ঋগ্বেদ (দ্র), যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ হচ্ছে চার বেদ। ঋগ্বেদ সবচেয়ে প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের দিকে ঋগ্বেদের উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়। তবে অনেকে ঋগ্বেদকে আরো প্রাচীন বলে মনে করেন। বেদের ভাষা সংস্কৃত (দ্র)। হিন্দুধর্মের অন্যান্য পবিত্রগ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বেদের চারটি বিভাগ : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ঈশ্বর সম্পর্কে বৈদিক ধারণা, তিনি এক। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবনামের উল্লেখ আছে। এঁরা এক ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ বিভূতির প্রকাশমাত্র। ঈশ্বরস্তুতি ও প্রার্থনা এই দু'টি বিষয় বেদমন্ত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে। বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানে যজ্ঞকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্রমে একটি সুসংহত পূজাপদ্ধতি গড়ে ওঠে। বেদ ও বেদানুসারী ভাবনাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে ছয়টি দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। এদের ষড়দর্শন বলা হয়। এই ছয়টি দর্শনের নাম : বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা।

ক. গো.

হিপোক্রেটিস [আনু. খ্রি. পূ. ৪৬০—৩৭৭]

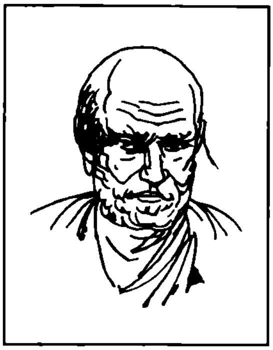

হিপোক্রেটিস (Hippocrates) আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার (দ্র) জনক হিসাবে পরিচিত। তাঁর জন্ম গ্রিসের কস্ দ্বীপে। তিনিই প্রথম চিকিৎসাবিদ্যাকে যুক্তি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নীতির উপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। রোগের ইতিহাস ও লক্ষণাদি লিপিবদ্ধ করে তুলনামূলক মূল্যায়নের পদ্ধতি তাঁরই অবদান।

হিপোক্রেটিসের মতে, মানুষের শরীরের প্রকৃতিগত কারণে রোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং রোগের চিকিৎসার জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। তাঁর বিচারে প্রকৃতিই হচ্ছে আমাদের চিকিৎসক। তিনি উপযুক্ত খাবার, নির্মল বাতাস (দ্র), আবহাওয়া (দ্র) পরিবর্তন, অভ্যাস ও জীবনযাপনপ্রণালীর প্রতি গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা করতেন। তিনি উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া ঔষধ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তেমনি ছিলেন অপ্রয়োজনীয়, অনির্দিষ্ট ঔষধ ব্যবহারের বিরোধী। তিনি অস্থিচ্যুতি এবং অস্থিভঙ্গের চিকিৎসাসহ শল্যবিদ্যারও (দ্র) প্রচলন করেন।

হিপোক্রেটিসের চিকিৎসাবিষয়ক তথ্য ও তত্ত্বগুলো 'করপুস হিপোক্রেটিকুম' (Corpus Hippocraticum) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ গ্রন্থে চিকিৎসাবিষয়ক ৭০টি নিবন্ধ ও গবেষণাপত্র রয়েছে। হিপোক্রেটিসের মতে,

www.pathagar.com

রোগীর সেবা এবং রোগ নিরাময় চিকিৎসকের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। চিকিৎসাক্ষেত্রে মানবসেবার বোধ জাগ্রত করার জন্য চিকিৎসকগণ যে শপথবাণী পাঠ করেন তা হিপোক্রেটিসের নামানুসারে 'হিপোক্রেটিসের শপথ' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

হিপোক্রেটিসের জন্ম ও মৃত্যুসাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয়, তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭৭ খ্রিস্টাপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

সি. না. হ.

হিব্রু সভ্যতা

হিব্রু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নাম ইহুদি। হিব্রুভাষী মানুষ আধুনিক ইসরায়েল অঞ্চলে একদা বসবাস করত। আব্রাহাম (আরবি ভাষায় ইব্রাহিম) ছিলেন এদের নেতা। তিনি মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে পশুচারণ করতেন। ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি সেখান থেকে কেনান নামক অঞ্চলে দলবলসহ চলে আসেন। কেনান হল আধুনিক প্যালেস্টাইন।

কেনানে এক সময় দুর্ভিক্ষ শুরু হলে হিব্রুভাষীরা মিশরে চলে যায়। পরবর্তী কালে মিশররাজ (ফারাও)-এর বিরাগভাজন হয়ে তারা বন্দি হয়। বন্দিদশা থেকে দ্বাদশ শতকে তাদের উদ্ধার করেন সুবিখ্যাত নেতা মুসা (আ.) (দ্র)। তারা কেনানে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু সেখানে তত দিনে বসবাসরত কেনানি, ফিলিস্তিনি (যাদের থেকে পরে এই স্থানের নাম হয় প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিন) এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অবশেষে ১০২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারা ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ধনে-জনে-বলে রাষ্ট্রটি শীঘ্রই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সে-অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

ইসরায়েলের সুবিখ্যাত রাজা সুলাইমান (আ.) (দ্র)-এর মৃত্যুর পর রাজ্যটি দু' অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তরাংশ ইসরায়েল নামেই পরিচিত থাকে, দক্ষিণাংশ নাম নেয় জুদা। রাজ্য দু'টি হলেও ইব্রাহিমের (আ.) (দ্র) বংশধর এবং মুসা (আ.)-এর অনুসারী হিসাবে ধর্মের দিক থেকে এরা একই থাকে। পরবর্তী কয়েক শতকে তাদের ভেতর বহু পয়গম্বর আবির্ভূত হন। এঁদের কাহিনী এবং চিন্তাধারা 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' নামক ইহুদি ধর্মের (দ্র) গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। বাইবেলেও (দ্র) এসব কাহিনী আছে।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে আসিরীয় নামক জনগোষ্ঠী ইসরায়েল দখল করে। এই রাষ্ট্রের ইসরায়েলিরাও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মাঝে বিলীন হয়ে যায়। অপরপক্ষে, ৫৮৭ কি ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়গণ জুদা দখল করে বহু ইহুদিকে বন্দি করে নিয়ে যায়। এরা নিজস্ব ধর্ম এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের চেষ্টা করে। ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যরাজ সাইরাস ব্যাবিলন দখল করেন। তিনি ইহুদিদের 'জুদা'য় প্রত্যাবর্তন এবং ধর্মকর্ম করার অনুমতি দেন। তবে বিদেশী শাসন তাদের ওপর চেপেই থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এরা গ্রিস, মিশর, সিরিয়া দ্বারা শাসিত হয়। ১৬৮ বা ১৬৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিরিয়ারাজ চতুর্থ এণ্টিওক তাদের ধর্মকর্মে বাধা দিলে ইহুদিরা বিদ্রোহ করে প্রায় শতবর্ষ স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু ৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমানেরা জুদা দখল করে এবং ইহুদিরা আবার বিদেশীদের শাসনভুক্ত হয়। অতঃপর আরবগণ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করলে ইহুদিরা তাদেরও অধীনে আসে।

এদিকে ইউরোপে (দ্র) খ্রিস্টধর্মের (দ্র) প্রসার ঘটলে সেখানকার বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সংখ্যালঘু ইহুদিদের বিতাড়ন শুরু হয়। কোথাও কোথাও শহরের দেয়ালবেষ্টিত স্থানে এদের বসবাসে বাধ্য করা হয়। বেষ্টিত স্থান 'গেত্তো' (ghetto) নামে পরিচিতি লাভ করে। তাদের যাতে চেনা যায় সে জন্য তাদের বিশেষ ধরনের কাপড় বা ব্যাজ পরতে বাধ্য করা হত। তারা জমি ক্রয় কিংবা কারখানায় কাজ করতে পারত না। জীবিকার্জনের জন্য তাই তারা ব্যবসায়ী এবং সুদের কারবারি হয়ে ওঠে। নানা স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহুদিগণ তুরস্ক (দ্র), পোল্যাণ্ড, রাশিয়া (দ্র) এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) চলে যায়। এভাবে তারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তবুও তারা প্যালেস্টাইনকেই তাদের আত্মিক শক্তির উৎসভূমি বলে মনে করে। কেউ কেউ সেখানে ফের একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা করতে থাকে। কালক্রমে তাদের মধ্যে এ জন্য আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এই আন্দোলন 'জিওনিজম্' (Zionism) নামে

www.pathagar.com

দু'টি বৃহৎ হিমবাহের মিলিত স্রোতধারা

পরিচিত।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশেরা তুরস্কের কাছ থেকে প্যালেস্টাইন অধিকার করে নেয়। তারা 'বেলফোর ঘোষণা'র মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। আরবেরা তাতে বাধা দিলে বিষয়টি জাতিসংঘে (দ্র) উত্থাপিত হয়। জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনকে একটি আরব এবং একটি ইহুদি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দু'টি রাষ্ট্র স্থাপনের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করে। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) ইহুদিনির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সৈ. আ. ই.

হিমবাহ (glacier)

উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে তীব্র শৈত্যে যে সীমারেখার ঊর্ধ্বে সারা বছর তুষার জমে থাকে এবং যার নিচে তুষার উত্তাপে গলে যায়, সেই সীমারেখাকে হিমরেখা বলে। হিমরেখা পৃথিবীর তাপমণ্ডল, উচ্চতা ও জলবায়ুজনিত কারণের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। হিমরেখার উপরিভাগে তুষার স্তরে স্তরে সঞ্চিত হতে থাকে। ফলে উপরের তুষারস্তূপের চাপে নিম্নস্তরের তুষার জমে বরফে পরিণত হয়। ক্রমান্বয়ে উপরের প্রবল চাপে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এই জমাট-বাঁধা বরফ অত্যন্ত ধীরগতিতে পর্বতের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে। এই তুষারপ্রবাহ বা বরফের নদীকে হিমবাহ বলে। হিমবাহের গতি এত মন্থর যে চোখে ধরা পড়ে না। আল্পস্ পর্বতের হিমবাহ বছরে ০·৩ মিটারের বেশি অগ্রসর হয় না।

অবস্থানের তারতম্য ও প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য হিমবাহকে সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য বা উপত্যকা হিমবাহ, সুমেরু ও কুমেরুর চির তুষারাবৃত অঞ্চলে অবস্থিত মহাদেশীয় হিমবাহ এবং পর্বতের নিম্নদেশে অবস্থিত পাদদেশীয় হিমবাহ।

নদীর মতো হিমবাহ ক্ষয়সাধন, বহন, অবক্ষেপণ—এই তিনটি কাজের মাধ্যমে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধন করে নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। হিমবাহের প্রবল চাপে ও ঘর্ষণে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হিমবাহ উপত্যকার সৃষ্টি করে।

সুমেরু (দ্র) ও কুমেরু (দ্র) সন্নিহিত মহাদেশীয় হিমবাহ বরফযুগের অধিক শৈত্যে বৃদ্ধি পেয়ে উত্তর আমেরিকা (দ্র), ইউরোপ (দ্র) ও এশিয়া (দ্র) মহাদেশের উত্তর দিকের

www.pathagar.com

এক বিশাল অংশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী কালে এগুলো উত্তাপে সঙ্কুচিত হয়ে পূর্বের স্থানে ফিরে গেলেও এদের ক্ষয় বহন ও অবক্ষেপণের ফলে সৃষ্ট বিশাল হ্রদ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমান্তবর্তী পাঁচটি হ্রদ) ঐ সমস্ত মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো ছড়িয়ে আছে।

মু. এ.

হিমাংশুকুমার দত্ত [১৯০৮—১৯৪৪]

বিখ্যাত সুরকার। কুমিল্লায় জন্ম। শৈশবেই তাঁর গায়ন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমে সুর রচনায়ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিক এবং ১৯২৮ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে বি.এ.পরীক্ষা দিয়ে সুর রচনায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং দ্রুত বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। সে ছিল বাংলা গানের এক স্বর্ণযুগ। দিক্‌পাল সব সুরকার তখন কাজ করে চলেছেন। কিন্তু হিমাংশু ছিলেন পৃথক একটি ধারার স্রষ্টা। সুবোধ পুরকায়স্থের বাণী ও হিমাংশুকুমারের সুর দুয়ে মিলে বাংলা গানের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিল। ঢাকার (দ্র) সারস্বত সমাজ তাঁকে 'সুরসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

বাংলা আধুনিক গানের জগতে হিমাংশু দত্ত কিংবদন্তীয় পুরুষ ছিলেন। তিনি মারা গেছেন পঞ্চাশ বছর আগে, কিন্তু এখনো বহু প্রখ্যাত শিল্পী তাঁর গান গেয়ে সঙ্গীতরসপিপাসুকে তৃপ্তি দান করে থাকেন।

ক. গো.

হিমায়ক রিফ্রিজারেটর / হিমায়ক দ্র

হিমালয় পর্বতমালা

পৃথিবীর (দ্র) সর্বোচ্চ পর্বতমালা। হিমালয় শব্দটি সংস্কৃত ভাষা (দ্র) থেকে এসেছে, যার অর্থ 'বরফের ঘর'। হিমালয় কয়েকটি পর্বতশ্রেণী নিয়ে গঠিত। হিমালয় পর্বতের দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৫০০ মাইল (২,৪১০ কিমি)। এটি দক্ষিণ এশিয়ার পামির গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে পশ্চিমে নাগা পর্বত থেকে পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের (দ্র) বড় বাঁক পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-দক্ষিণে এর প্রস্থ গড়ে প্রায় ৩২০ কিমি। পৃথিবীর নবীনতম ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর মধ্যে হিমালয় অন্যতম। এই পর্বতমালা ভারতকে (দ্র) তিব্বত (দ্র) ও চীন (দ্র) থেকে পৃথক করেছে। হিমালয় পর্বতমালা আরো কয়েকটি পর্বতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কারাকোরাম পর্বতও হিমালয়ের উত্তর দিকের বর্ধিত অংশ।

হিমালয় উত্তর ভারতীয় অঞ্চল থেকে ধাপে ধাপে উপর দিকে উঠেছে। তিব্বত ও নেপালের (দ্র) মধ্যে অবস্থিত এভারেস্ট (দ্র) গিরিশৃঙ্গ (উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট বা ৮,৮৪৮ মিটার) পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। কারাকোরাম পর্বতে অবস্থিত গডউইন অস্টিন (উচ্চতা ২৮,২৫০ ফুট বা ৮,৬১১ মিটার) দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। তিব্বতে অবস্থিত হিমালয়ের অন্য একটি বিখ্যাত শৃঙ্গের নাম 'কৈলাস', যা হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। মধ্য-এশিয়া ও ভারতের বহু তীর্থযাত্রী এই পর্বতে পায়ে হেঁটে আরোহণ করেন। মাউন্ট এভারেস্টের পাশেই কাঞ্চনজঙ্ঘা (উচ্চতা ২৮,২০৮ ফুট বা ৮,৫৯৮ মিটার) তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ।

হিমালয় পর্বতের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি গিরিপথ চলে গেছে। সেগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪,৫৭০ মিটার উপরে অবস্থিত।

হিমালয় বৃহৎ পর্বত বলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়। যদিও বেশির ভাগ সময় হিমালয় পর্বতমালা বরফে আবৃত থাকে, হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন ঢালে নানারকম উদ্ভিদ দেখা যায়। দক্ষিণ দিকের ৯১০ মিটার উঁচু ঢালে ডুমুর ও পাম গাছ দেখা যায়। ২,১০০ মিটার উঁচু ঢালে ওক, বাদাম, চিরসবুজ লতা জাতীয় গাছ জন্মে। ১,৫০০ মি. উঁচুতে চা (দ্র) চাষ করা হয়। দক্ষিণ দিকের ঢালে ধান (দ্র), ভুট্টা (দ্র), গম (দ্র) ও বার্লি জন্মে।

হিমালয় অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাণী দেখা যায়। তাদের মধ্যে বাঘ (দ্র), চিতাবাঘ (দ্র), হাতি (দ্র), গণ্ডার (দ্র), বানর (দ্র) প্রভৃতি প্রধান।

www.pathagar.com

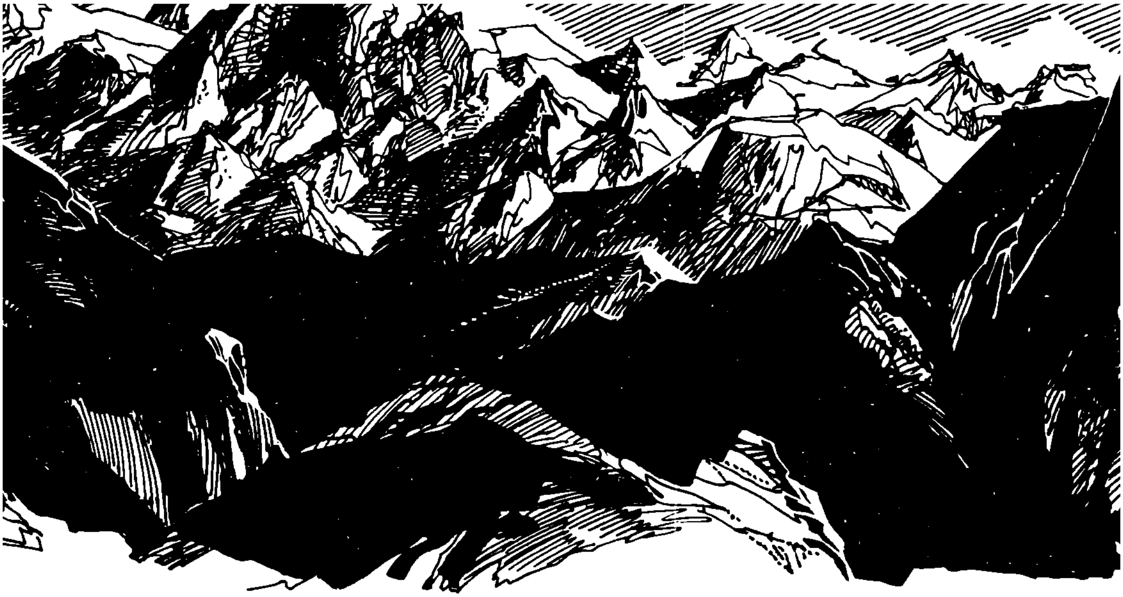

হিমালয় পর্বতমালা আমাদেরকে শীতকালে সাইবেরিয়া অঞ্চলের প্রচণ্ড শীত থেকে রক্ষা করে।

মু. এ.

হিমেনেথ্, হুয়ান্ রামোন্ [১৮৮১—১৯৫৮]

স্পেনের অন্যতম সর্বাগ্রগণ্য কবি। স্প্যানিশ ভাষায় (দ্র) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) বহু রচনা অনুবাদ করার জন্যও তিনি সবিশেষ খ্যাত।

১৮১৮ সালে হিমেনেথ্ (Juan Ramón Jiménez) আন্দালুসিয়ার মগুয়েরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯১৭ সালের পর তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের কবি-জীবনের সৃষ্ট কাব্যফসল আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত। মোট ৩০টি কাব্যগ্রন্থের জনক তিনি।

তাঁর বহু কবিতা ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় বেশ ক'জন সার্থকনামা অনুবাদকের দ্বারা সুচারুরূপে অনূদিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের বাংলা নাম 'শিকড়ের ডানা', 'প্লাতেরো আর আমি' ইত্যাদি।

হিমেনেথ্ ১৯৫৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন পুয়ের্তো রিকোয় ১৯৫৮ সালে।

আ. হু.

হিমোগ্লোবিন · অক্সিজেন দ্র

হিরোশিমা

হিরোশিমা জাপানের (দ্র) হোন্‌শু দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে উপসাগরের তীরবর্তী ব-দ্বীপ আকৃতির একটি শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় এখানে প্রথম পরমাণু-বোমা (দ্র) ফেলা হয়। হিরোশিমার আয়তন ২৫৩ বর্গমাইল বা ৬৫৬ বর্গকিলোমিটার। ওসাকা থেকে এটি ১৭৫ মাইল বা ২৮০ কিমি পশ্চিমে অবস্থিত। এর দক্ষিণ-পূর্বদিকে রয়েছে জাপানের অন্যতম সুন্দর প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় কুরে।

হিরোশিমা ১৬শ শতকের শেষভাগে দুর্গ-শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৮ সালে মেইজি রাজতন্ত্রের উত্থান ঘটলে হিরোশিমাকে জাপানের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হিরোশিমা তা-ই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিনাশর্তে জাপানকে আত্মসমর্পণ

www.pathagar.com

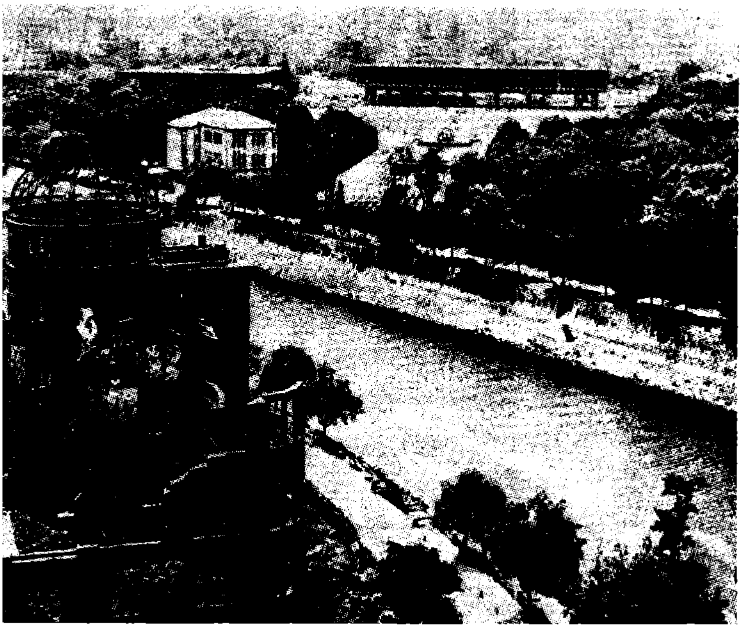

আণবিক বোমায় পুরো হিরোশিমা শহর ধুলিসাৎ হয়ে গেলেও কঙ্কালসম এই ভবনটি কোনোমতে টিকে গিয়েছিল। যা ধ্বংসলীলার স্মৃতি হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে

করানোর জন্য ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) হিরোশিমায় পরমাণু-বোমা নিক্ষেপ করে। এতে শহরের ৬০ ভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ৭৫ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং এর দ্বিগুণ লোক আহত হয়। নিহতদের কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ এখানকার মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এই নজিরবিহীন মানবতাবিরোধী ঘটনা স্মরণে এখানে একটি পীস মেমোরিয়াল পার্ক নির্মিত হয়েছে। প্রথম পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণের করুণ পরিণতির জন্য হিরোশিমা বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ক্রমে পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৫৫ সাল থেকে এখানে পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী একটি বার্ষিক বিশ্বসম্মেলন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১৯৫০ সাল থেকে বিধ্বস্ত হিরোশিমাকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়। হিরোশিমা এখন জাপানের অন্যতম প্রধান আধুনিক শিল্পকেন্দ্র। যাবতীয় ভারি লৌহ (দ্র) ও ইস্পাত (দ্র) সামগ্রীসহ এখানে প্রচুর বস্ত্র ও রাবারজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

সুজ. ব.

হিল, রোল্যাণ্ড ডাকটিকিট দ্র

হিলারি, স্যার এড্‌মাণ্ড [১৯১৯—]

এড্‌মাণ্ড হিলারি (Edmund Hillary) ১৯১৯ সালে নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর দ্বীপে (অকল্যাণ্ড শহরের কাছে) এক মৌমাছির খামারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার মৌমাছি পালনের খামার ছিল। শহরের অকল্যাণ্ড গ্রামার স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। পরিণত বয়সে হিলারি বিশ্বের এক জন শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং শেরপা তেন্‌জিং (১৯১৪-১৯৮৬) -এর সঙ্গে তিনি হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (দ্র) জয় করেছিলেন। তাঁর আরেকটি দুঃসাহসিক কাজ হল, তিনি সর্বপ্রথম অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) মহাদেশের উত্তর-দক্ষিণ মাথা থেকে শুরু করে মেরুবিন্দু পার হয়ে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

হিলারি ১৯৩৫ সালে অর্থাৎ ১৬ বছর বয়সে প্রথম পর্বত দেখেন এবং ৯,০০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মাউন্ট রাও পেহোতে স্কি খেলায় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে ১২,০০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কুক পর্বতে আরোহণ করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে তিনি ব্রিটিশ বিমানবাহিনীতে যোগ দেন। বিমানঘাঁটির কাছেই মাউন্ট ইগ্‌মন্ট্‌ পর্বতে প্রতিদিন প্রশিক্ষণ নিতেন পর্বতারোহণের।

তার পর ১৯৫০ সালে হিলারি ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন এবং পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। পরে তিনি অতি সহজেই আল্‌প্‌স্‌ পর্বতের ১২,০০০ ফুট উঁচুতে আরোহণ করতে সক্ষম হন।

১৯২২, ১৯২৪, ১৯৩৩, ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালে পাঁচ বার ব্রিটিশ দল এভারেস্ট বিজয়ে আসে; তাঁরা ২৮,০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর পর ১৯৫১ সালে আবার নতুন করে দল গঠিত হয়েছিল মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ের জন্য। তাতে হিলারি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৯৫৩ সালে তাঁদের অভিযান শুরু হয়েছিল। এই অভিযানে পাঁচ জন ব্রিটিশ পর্বতারোহী ও হিলারি ছাড়াও কয়েক জন

www.pathagar.com

তেনজিং ও হিলারি

বিজ্ঞানী, ডাক্তার, অক্সিজেন (দ্র) বিশেষজ্ঞ, শেরপা এবং কুলি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এড্‌মাণ্ড হিলারি ও নেপালের অধিবাসী শেরপা তেন্‌জিং নোর্‌গে (দ্র) এ বছরের ২৯শে মে সর্বপ্রথম আরোহণ করলেন হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (৮,৮৪৮ মি.) মাউণ্ট এভারেস্টে। বিজিত হয় এভারেস্ট শৃঙ্গ।

আর্থিক লাভের আশায় নয়, শুধু মনের সাহসের পরিচয় দেওয়ার জন্যই স্যার এড্‌মাণ্ড হিলারি ও শেরপা তেন্‌জিং আরোহণ করেছিলেন বিশ্বের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ এভারেস্টে। হিলারি কিছুদিন বাংলাদেশে নিউজিল্যাণ্ডের হাইকমিশনারও ছিলেন।

মু. এ.

হিলিয়াম (helium)

মৌলিক গ্যাস। রাসায়নিক সঙ্কেতচিহ্ন He। পারমাণবিক ওজন 4 ; পারমাণবিক সংখ্যা ২। হিলিয়াম একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস (দ্র)। বায়ুমণ্ডলে (দ্র) এর পরিমাণ অতি সামান্য, প্রায় দুই লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। বায়ুমণ্ডল ছাড়াও পৃথিবীতে (দ্র) ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক গ্যাসের (দ্র) সঙ্গে এবং তেজস্ক্রিয় খনিজের সঙ্গে হিলিয়াম পাওয়া যায়। হিলিয়াম অদাহ্য এবং বায়ু অপেক্ষা হালকা। সে জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত বেলুনে হিলিয়াম ভর্তি করা হয়। হিলিয়াম তরলীভূত হয় ২৬৮·৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়।

হিলিয়ামের আবিষ্কার নিয়ে একটি কাহিনী আছে। সেটি বেশ মজার। ১৮৬৮ সালে ফরাসি জ্যোতির্বিদ জুল্ জসঁ (Jules Janssen) এবং ইংরেজ জ্যোতির্বিদ নর্ম্যান লকিয়ার (Sir Joseph Norman Lockyer) সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় তাঁরা সৌরবস্তুর প্রচণ্ড উৎক্ষেপণ লক্ষ করেন। এই উৎক্ষেপণের বর্ণালি নিয়ে গবেষণা করে তিনি প্যারিস একাডেমী অব সায়েন্সেস-এর নিকট একটি চিঠি লেখেন। তাঁর মতে যে সৌরবস্তুর প্রচণ্ড উৎক্ষেপণ ঘটেছিল তা গ্যাসীয় প্রকৃতির। আর বর্ণালির রেখাগুলি বিশেষ ধরনের। ইংরেজ জ্যোতির্বিদ লকিয়ারও বিশেষভাবে নির্মিত বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালির রেখাগুলির অবস্থান নির্ণয় করেন। তিনি প্যারিসের একাডেমী অব সায়েন্সেস-এর কাছে একটি চিঠি পাঠান। ইতালির বিজ্ঞানী রেখাটি স্পষ্টভাবে লক্ষ করেন। রেখাটিকে d_3 দ্বারা সূচিত করা হয়।

পরে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম র‍্যামজে (Sir William Ramsay) ১৮৯৫ সালে ইউরেনিয়াম খনিজ ক্লেভাইট (clevite) থেকে হিলিয়াম গ্যাস প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। এর বর্ণালিরেখা d_3-এর সঙ্গে মিলে যায় অর্থাৎ উভয়টির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল অভিন্ন, ৫৮৭·৪৯।

সু. ব.

হীনযান

এই মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের (দ্র) পরিনির্বাণ (দ্র) বা মৃত্যুর অনেক পরে। হীনযানের উদ্ভব স্থবিরবাদ (দ্র) থেকে। মহাযান (দ্র)-পন্থীরা নিজেদের পথকে মহত্তর পথ আর হীনযানকে নিম্নপথগামী মনে করেন।

হীনযান মতে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও তপস্যার দ্বারা মুক্তি বা নির্বাণ লাভের অধিকারী হওয়া যায়। পক্ষান্তরে মহাযানীরা নির্বাণের প্রত্যাশী নন, তাঁরা গৌতম বুদ্ধের ন্যায় বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যাশী। গৌতম বুদ্ধ 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' প্রবর্তন করে সর্বপ্রথম যে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন তাতেই হীনযানীরা সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছে। বুদ্ধের উপদেশমালাকে বলে 'আর্য অষ্ঠাঙ্গিক মার্গ' (দ্র)। এই আটটি মার্গ বা শীল হল সঠিক বাক্য, সঠিক কর্ম, সঠিক জীবিকা, সঠিক দৃষ্টি, সঠিক সঙ্কল্প, সঠিক প্রচেষ্টা, সঠিক স্মৃতি, সঠিক সমাধি। এই আটটি পথ অনুসরণ করলে দুঃখ থেকে মুক্তি সম্ভব। বৌদ্ধধর্মের (দ্র) মত অনুযায়ী নশ্বর শরীরে নিত্য আত্মার কল্পনা যুক্তিসঙ্গত নয়। মানুষ কে, কি,

www.pathagar.com

কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে—এসব প্রশ্ন অবান্তর। তার চেয়ে আত্মবিশ্বাসই শ্রেয়, এতে সুফল মিলবে। হীনযানীরা এই পথের অনুসারী। শ্রীলঙ্কা (দ্র), মায়ানমার (দ্র), বাংলাদেশ (দ্র), ভারত (দ্র) ও থাইল্যাণ্ডের (দ্র) বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই পথের অনুসারী।

বি. ব.

হীরক / হীরা (diamond)

কার্বন (দ্র) একটি বহুরূপী মৌলিক পদার্থ। বস্তুত কার্বনের মতো বিচিত্র পদার্থ আর একটিও নেই। একে কেলাসিত বা দানাবাঁধা এবং অকেলাসিত বা দানাহীন উভয় অবস্থাতেই পাওয়া যায়। হীরক ও গ্রাফাইট (দ্র) কার্বনের কেলাসিত রূপ। কিন্তু কয়লার (দ্র) ভিতরে কার্বনের পরমাণুগুলো এলোপাতাড়ি সাজানো থাকে বলে একে অকেলাসিত বা দানাহীন কার্বন বলে।

গ্রাফাইট ও হীরক পাওয়া যায় খনিতে। ভূগর্ভের অত্যধিক তাপ ও চাপের প্রভাবে কার্বন কেলাসিত হয়ে গ্রাফাইট ও হীরকে পরিণত হয়। হীরা পৃথিবীর মধ্যে কঠিনতম বস্তু। পৃথিবীর বেশির ভাগ হীরা দক্ষিণ আফ্রিকার খনি থেকে তোলা হয়। আজকাল বিশেষ ধরনের যন্ত্রে প্রচণ্ড তাপ ও চাপের সাহায্যে কৃত্রিম হীরক তৈরি করা হয়। হীরক কেলাসিত বা দানাবাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ হীরা স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। হীরার ভিতর দিয়ে আলো নানাভাবে বেঁকে যায় বলে একে চকচকে দেখায়। হীরা কেটে তার তল বা পিঠের সংখ্যা বাড়ালে উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়। সামান্য পরিমাণে অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলে অধিকাংশ হীরকই কিছুটা বর্ণযুক্ত। যে হীরা যত উজ্জ্বল, তার দাম তত বেশি। হীরাকে সুন্দর দেখায় আলোর মধ্যে, অন্ধকারে নয়।

হীরা তাপ (দ্র) ও বিদ্যুৎ (দ্র) অপরিবাহী। রঞ্জনরশ্মির (দ্র) সাহায্যে আসল ও নকল হীরা চিনতে পারা যায়। আসল হীরার মধ্য দিয়ে এ রশ্মি যেতে পারে; কিন্তু নকল হীরা বা কাচের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। কারণ, নকল হীরা রঞ্জনরশ্মি শোষণ করে নেয়।

দামি অলঙ্কারে রত্ন হিসাবে হীরা ব্যবহৃত হয়। অবিশুদ্ধ কালো ও অনুজ্জ্বল হীরা কাচ (দ্র) কাটার যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইস্পাতের (দ্র) মতো কঠিন বস্তু কাটতে ও পালিশ করতে অবিশুদ্ধ হীরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

মু. এ.

হীরালাল সেন [১৮৮৬—১৯১৭]

বাংলা চলচ্চিত্রের (দ্র) জনক হিসাবে খ্যাত। কোনো কোনো গবেষক অবশ্য তাঁকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক হিসাবে সাম্প্রতিককালে অভিহিত করতে শুরু করেছেন।

হীরালাল সেন ১৮৮৬ সালে মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় (দ্র) যখন তিনি আই. এ. ক্লাসের ছাত্র, সেই সময় 'স্টার থিয়েটার' আয়োজিত এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখে তিনি এই শিল্পমাধ্যমের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং শিক্ষাজীবনের পুরোপুরি ইতি ঘটিয়ে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হন।

১৮৯৮ সালে হীরালাল সেন চলচ্চিত্র নির্মাণ সহায়ক সাজসরঞ্জাম ক্রয় করে কলিকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে এবং সে বছরই বরিশাল জেলাধীন ভোলার এস. ডি. ও.-র ডাকবাংলোয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এর পর তিনি তাঁর ছোট ভাই মতিলাল সেনকে নিয়ে 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯০০ সালে বিদেশ থেকে ক্যামেরা (দ্র) ও চলচ্চিত্র নির্মাণের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানিপূর্বক ইংল্যাণ্ডের পার্থে কোম্পানি প্রেরিত এক জন চলচ্চিত্র ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে তিনি হাতেকলমে তা চালানোর কলাকৌশল আয়ত্ত করেন। এরপর বিভিন্ন বহির্দৃশ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির বিচিত্র গতিশীল দৃশ্যের চিত্রগ্রহণসহ বেশ কিছু জনপ্রিয় বাংলা নাটকের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত করেন এবং ১৯০১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি সেগুলো কলিকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে প্রদর্শন করেন।

১৯০০ সালে হীরালাল সেন বেশ কিছু বিজ্ঞাপনচিত্রও নির্মাণ করেন। ১৯০০ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তাঁর নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সংখ্যা প্রায় ৪০টি।

www.pathagar.com

হীরালাল সেন বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে প্রধান পথিকৃতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তিনি ১৯১৭ সালে কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

হুইট্‌ম্যান, ওয়ল্ট্ [১৮১৯—১৮৯২]

আমেরিকার প্রখ্যাত কবি হুইটম্যান (Walt Whitman) -এর জন্ম লং আইল্যাণ্ডে ১৮১৯ সালে। শিক্ষাজীবন ব্রুকলিনের পাবলিক স্কুলে। সতেরো বছর বয়স থেকে সংবাদপত্র (দ্র) ও বিভিন্ন সাময়িকীতে লেখালেখি শুরু করেন এবং বিশ বছর বয়সে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হন।

জীবনকালে এমন কোনো পেশা নেই যা তিনি গ্রহণ করেন নি। এমন কোনো জাতির কোনো লোক নেই যাদের সঙ্গে মেশেন নি। ব্যাপকভাবে সফরও করেছেন। তাঁর জীবনের এই সব অভিজ্ঞতারই ফসল তাঁর কবিতা-সঙ্কলন 'লিভ্‌স্ অব গ্রাস' (Leaves of Grass)। এই কাব্যগ্রন্থই তাঁকে দেশ-বিদেশের পাঠকদের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলে।

মানবতা, গণতন্ত্র (দ্র) এবং আমাদের গ্রহের প্রতিটি মানুষের জীবনের জয়গানে মুখরিত তাঁর কবিতা। তিনি ১৮৯২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

হুক্‌ওয়ার্ম কৃমিরোগ দ্র

হুগো, ভিক্টর উগো, ভিক্তর্ মারি দ্র

হুডিনি, হ্যারি [১৮৭৪—১৯২৬]

বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর হুডিনি (Harry Houdini) ১৮৭৪ সালের ২৪শে মার্চ হাঙ্গেরির বুদাপেস্ত্ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সামুয়েল ভাইস্ ছিলেন এক জন ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত হিব্রুভাষার পণ্ডিত ব্যক্তি। জন্মের সময় তাঁর নাম রাখা হয় এরিখ্ ভাইস্ (Erich Weiss)।

এরিখের জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁদের পুরো পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) নিউইয়র্ক (দ্র) নগরীতে ভাগ্যান্বেষণে চলে আসেন। সেখানে সুবিধা করতে না পেরে অল্পকালের মধ্যে তাঁদের চলে আসতে হয় উইস্‌কন্সিন-এর অ্যাপ্‌ল্‌টন নগরীতে। এখানেই ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে দারিদ্র্যের মোকাবিলায় এরিখ্ এক নেকটাই তৈরির কারখানায় চাকুরি নেন। এখানে চাকুরি করার সময়েই তিনি ম্যাজিকের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন এবং ম্যাজিশিয়ান বা জাদুকর হবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এ ব্যাপারে এরিখের সহযোগী হন জ্যাকভ হাইমান নামের তাঁর এক জন সহকারি মজুর। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁরা কাজ শুরু করেন এবং বিখ্যাত ফরাসি জাদুকর জাঁ ইউর্জি রবার্তো হুডিনির নামানুসারে এরিখ্ নিজের নাম রাখেন হুডিনি। এরিখ ও জ্যাকভ হাইমান জুটির নাম হল শেষ পর্যন্ত 'হুডিনি ব্রাদার্স'। অবশ্য জ্যাকভ শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকেন নি। এরপর হুডিনিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। একের

জাদুকর হুডিনি ও তাঁর পোষা বাজপাখি

পর এক আশ্চর্য সব জাদুর কলাকৌশল দেখিয়ে তিনি দর্শকচিত্ত জয় করে চললেন। অচিরকালের মধ্যে সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের (দ্র) দেশে দেশে তাঁর নামডাক ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৯৩ সালে হুডিনি 'ওয়াণ্ডার্স্ কলম্বিয়ান

www.pathagar.com

হুডিনির একটি জনপ্রিয় ম্যাজিক: মই ও দড়ির বাঁধন; মুহূর্তেই তিনি এই দড়ির বাঁধন খুলে দর্শকের সামনে হাজির হন

এক্সপোজিশন'-এ জাদু দেখান। এরপর তিনি ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া ও নিজের জন্মভূমি হাঙ্গেরিতে যান। অচিরেই তাঁকে আখ্যায়িত করা হয় 'হাতকড়ার রাজা' নামে। তাঁর বিখ্যাত খেলাগুলোর মধ্যে 'রূপান্তর' সিরিজই তাঁকে সমধিক জনপ্রিয় এবং কিংবদন্তির নায়কে পরিণত করে।

১৯১৩ সালে মায়ের মৃত্যুতে হুডিনি অপরিসীম মনোকষ্টের শিকার হন। কেননা, মাকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন।

হুডিনি তাঁর নতুন নতুন উদ্ভাবনী মেধাবলে জাদুশিল্পকে এক নতুন ব্যাপ্তি দেন এবং তাকে এক মাত্রায় উন্নীত করেন। জাদুশিল্পের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে।

১৯২৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবনীভিত্তিক গ্রন্থ রেমণ্ড ফিট্জ্সিমন্স রচিত 'মৃত্যু ও জাদুকর : হুডিনির রহস্য' একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীও (দ্র) তাঁর জীবনীভিত্তিক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। 'যাদুর রাজা হুডিনি' নামের এই বই লিখেছেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী।

আ. হু.

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হুদাইবিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে সঙ্গীসাথীসহ মক্কায় (দ্র) উমরা হজ্ব পালনের জন্য যাত্রা করেন। তাঁদের সঙ্গে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তবুও মক্কার অবিশ্বাসীগণ তাঁদের পথরোধ করতে মনস্থ করে। খবর পেয়ে রসূলুল্লাহ (স.) (দ্র) দেড় হাজার সঙ্গীসাথীসহ মক্কার সীমান্তবর্তী হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁবু ফেলেন।

মক্কাবাসীগণ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁদের অবরোধ করে রাখে। এ সময় সংঘর্ষ এড়াবার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে মক্কার অবিশ্বাসীদের যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়, তারই নাম হুদাইবিয়ার সন্ধি। এই সন্ধির ধারাগুলো হল : (১) মুসলমানেরা এ বছর হজ্ব (দ্র) করতে পারবেন না; (২) আগামী বছর তাঁরা হজ্ব করতে পারবেন, কিন্তু তিন দিনের বেশি মক্কায় থাকতে পারবেন না; (৩) সে সময় কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া তাঁরা আর কোনো অস্ত্র বহন করতে পারবেন না; (৪) যে কেউ স্বেচ্ছায় মুহম্মদ (স.)-এর দলে অথবা কুরাইশদের দলে যোগ দিতে পারবে; (৫) কোনো মক্কাবাসী তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মুসলমানদের দলে যোগদান করলে তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত দিতে হবে, কিন্তু মুহম্মদ (স.)-এর অনুসারী কোনো ব্যক্তি কুরাইশদের নিকট ফিরে এলে তাকে প্রত্যর্পণ করা হবে না; (৬) দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখতে হবে, যাতে জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

www.pathagar.com

হুদাইবিয়ার সন্ধির কোনো কোনো ধারা মুসলামানদের জন্য দৃশ্যত কিছুটা ক্ষতিকর প্রতীয়মান হলেও পরে তা সুদূরপ্রসারী সুফল বয়ে এনেছিল।

মু. মা.

হুন / হূণ (the Huns)

মধ্য-এশিয়ার মোঙ্গল জাতির মধ্যে অত্যন্ত দুর্দান্ত ও যুদ্ধবাজ একটি জনগোষ্ঠী। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মরুচারী, যাযাবর ও নৃশংস যুদ্ধজয়ী জাতি হিসাবে এরা ক্রমশ পরিচিতি লাভ করে। ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এদের জয়যাত্রা ও সাম্রাজ্যবিস্তার অব্যাহত থাকে। মধ্য-এশিয়ায় তারা একটি সাম্রাজ্য পত্তন করেছিল।

হুনদের আক্রমণে এশিয়া (দ্র) ও ইউরোপের (দ্র) বহু দেশ পর্যুদস্ত হয়েছিল। পঞ্চম শতকে তাদের একটি বাহিনী পারস্য ও ভারত (দ্র) অভিমুখে এবং আরেকটি বাহিনী রোম সাম্রাজ্যের দিকে ধাবিত হয়। ভারতে তখন গুপ্ত-বংশের (দ্র) শাসনকাল চলছে। এর পরে আরো দু'বার তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। অনুরূপভাবে তারা রোম সাম্রাজ্যের উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কয়েক বার, এবং ঐ সাম্রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি তাদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনে জর্জরিত হয়েছিল।

হুনদের ভিতরে সর্বাধিক পরাক্রমশালী নেতা ছিলেন আত্তিলা (Attila)। তিনি ৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বাহিনীর উপরে আধিপত্য বিস্তার করে মৃত্যুকাল (৪৫৩ খ্রি.) পর্যন্ত তা বজায় রাখেন। আত্তিলার সময়েই হুন জাতি সবচেয়ে পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রমশ তারা হীনবল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতি ও জনগোষ্ঠীর ভিতরে মিশে যাওয়ায় তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

হা. মা.

হুমায়ুন [১৫০৯—১৫৫৬]

ভারতের (দ্র) দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুন ১৫০৯ সালে কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর (দ্র)। বিশ বছর বয়সে হুমায়ুন বাদাখ্‌শানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। হুমায়ুনের প্রকৃত নাম নাসিরউদ্দিন মুহম্মদ।

১৫৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর হুমায়ুন দিল্লির (দ্র) সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দিল্লির সিংহাসনের জন্য তাঁর নিকট-আত্মীয়গণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। গুজরাটের বিদ্রোহী শাসনকর্তা বাহাদুর শাহকে পরাজিত করে বিদ্রোহী আফগানদের দমন করার জন্য তিনি গৌড় (দ্র) অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তিনি চুনার দুর্গ অধিকার করেন। আফগান বীর শের খান ওরফে শেরশাহকে (দ্র) পরাজিত করে তিনি গৌড় পুনরুদ্ধার করেন। গৌড় ছিল বঙ্গদেশের রাজধানী। ১৫৩৯ সালে বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে শের খানের সঙ্গে হুমায়ুনের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হন। তাঁর অনেক সৈন্য গঙ্গায় (দ্র) ডুবে মারা যায়। হুমায়ুন অতি কষ্টে এক ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে গঙ্গা পার হয়ে প্রাণরক্ষা করেন।

১৫৪০ সালে কনৌজের অনতিদূরে বিল্বগ্রাম নামক স্থানে হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ হয়। হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে শেরশাহ্ দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন। কনৌজের যুদ্ধে পরাজয়ের পর সাহায্য লাভের জন্য হুমায়ুন পারস্য অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি দীর্ঘ পনেরো বছর পলাতক জীবন যাপনের পর পারসিক সৈন্যদের সাহায্যে ১৫৫৫ সালে দিল্লি ও আগ্রা জয় করে পুনরায় সিংহাসনে বসেন।

ভাগ্যবিড়ম্বিত হুমায়ুন নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিনয়ী, দয়ালু ও উদার শাসক ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যা (দ্র), গণিত (দ্র) ও কাব্যের (দ্র) প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি সুন্দর কবিতা রচনা করতেন।

সিংহাসন উদ্ধারের কয়েক মাস পর ১৫৫৬ সালে এক দিন হঠাৎ পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

খু. জা.

হুমায়ুন কবির [১৯০৬—১৯৬৯]

কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ।

www.pathagar.com

প্রকৃত নাম হুমায়ুন জহিরুদ্দিন আমির-ই-কবির। তিনি ১৯০৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কবিরউদ্দিন আহমদ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

হুমায়ুন কবির ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৯২২ সালে রাজশাহী নওগাঁ কে. ডি. স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে আই.এ. পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ১৯২৬ সালে ইংরেজিতে অনার্স এবং ১৯২৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাশ করেন। এরপর তিনি বঙ্গীয় সরকারের স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে যান। ১৯৩১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস, অর্থনীতি ও দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি 'অক্সফোর্ড ইউনিয়ন'-এর সম্পাদক ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

শিক্ষাজীবনশেষে ভারতে ফিরে হুমায়ুন কবির ১৯৩২ সালে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা পেশায় যোগ দেন। এরপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রে এবং ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। এ সময় তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

হুমায়ুন কবির কৃষক-প্রজা পার্টি (দ্র) গঠনে এ. কে. ফজলুল হকের (দ্র) সহযোগী হিসাবে কাজ করেন এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এই দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে (দ্র) যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদের (দ্র) একান্ত সচিব ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতারূপে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক যুগ্ম শিক্ষা-উপদেষ্টা ও শিক্ষাসচিব এবং ১৯৫৫ সালে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্স্ কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হলে ১৯৫৮ সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯৬৩ সালে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেস দল গঠন করেন এবং এই দল থেকে তিনি ভারতীয় পার্লামেণ্ট লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হার্ভাড স্পেনসার লেকচারার' হন।

১৯৩৯ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি নিয়মিত 'চতুরঙ্গ' নামে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকা বাংলা সাহিত্যচর্চাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে সুধীসমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ইমানুয়েল কাণ্ট' (১৯৩৬), 'মার্কসবাদ' (১৯৪৮), 'নদী ও নারী' (উপন্যাস), 'বাঙলার কাব্য' (১৯৫৪) এবং 'Kant on Philosophy in General' (১৯৩৫), 'Poetry Monads and Society' (১৯৪১), 'Rabindranath Tagore' (১৯৬২) 'The Bengali Novel' (১৯৬৮) ইত্যাদি। এসব রচনায় তাঁর মেধা ও মননের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'নদী ও নারী' উপন্যাসটি বাংলাদেশে (দ্র) চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য হুমায়ুন কবিরকে ১৯৫৮ সালে আলীগড়, ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজের আন্নামালাই এবং ১৯৬১ সালে মধ্যপ্রদেশের খয়রাগড়, বিশ্বভারতী, মহীশূর ও এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ১৯৬৯ সালের ১৮ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

হল্লোড় শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

হুসাইন (রা.), হযরত ইমাম [৬২৬-৬৮০]

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) ছিলেন হযরত আলী (রা.) (দ্র) ও হযরত ফাতিমা (রা.) (দ্র)-এর দ্বিতীয় পুত্র এবং হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর দৌহিত্র ও হযরত হাসান (রা.) (দ্র)-এর ছোটভাই। ৬২৬ মতান্তরে ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় (দ্র)

www.pathagar.com

তাঁর জন্ম।

উমাইয়া শাসক মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইয়াজিদ মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা লাভ করেন। অধিকাংশ লোকজন তাঁর আনুগত্য মেনে নিলেও হযরত হুসাইন (রা.) ইয়াজিদের আনুগত্য মেনে নেন নি। কারণ, ইয়াজিদ বিলাসপ্রিয় ও অধার্মিক, এবং সে কারণে ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হবার পক্ষে অযোগ্য।

এর ফলে ইয়াজিদের সঙ্গে হযরত হুসাইন (রা.)-এর বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এমন সময় একদা হুসাইন (রা.)-কে ইরাকের অন্তর্গত কুফার অধিবাসীরা জানায় যে তারা ইয়াজিদের পরিবর্তে তাঁকেই খলিফা (দ্র) হিসাবে দেখতে চায়, তিনি যেন সত্বর কুফায় চলে আসেন।

ইমাম হুসাইন (রা.) তখন কিছু বিশ্বস্ত অনুচর ও পরিজনসহ কুফার পথে রওনা হন। ইতিমধ্যে এই খবর ইয়াজিদের কুফায় নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসক উবাইদুল্লাহ্র নিকট পৌঁছে যায় এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী ইমামের গতিরোধ করতে অগ্রসর হয়।

অবশেষে ইমাম হুসাইন (রা.) ও তাঁর অনুচরবর্গ ইউফ্রেতিস নদীর তীরে কারবালা নামক স্থানে উবাইদুল্লাহ্র সৈন্যদের সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে শহীদ হন। দিনটি ছিল ১০ই মুহর্‌রম (দ্র) ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ।

সেই মর্মন্তুদ ঘটনা স্মরণে আজও পৃথিবীর শিয়া সম্প্রদায় (দ্র) ১০ই মুহর্‌রমকে শোকদিবস হিসাবে পালন করে থাকেন; সুন্নি (দ্র) মুসলমানেরাও রোজা (দ্র) ও অন্যান্য ইবাদতের (দ্র) মাধ্যমে এ দিনটি পালন করেন।

মু. মা.

হৃৎপিণ্ড রক্তসংবহন -তন্ত্র দ্র

হৃদ্‌রোগ

হৃদ্‌যন্ত্রে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার রোগকে হৃদ্‌রোগ বলা হয়। উল্লেখযোগ্য হৃদ্‌রোগের মধ্যে রয়েছে—করোনারি হৃদ্‌রোগ, অ্যান্‌জাইনা পেক্টোরিস, বাতজ্বর(দ্র)-ঘটিত হৃদ্‌রোগ, জন্মগত হৃদ্‌রোগ, জীবাণুঘটিত প্রদাহ ইত্যাদি।

করোনারি হৃদরোগ (coronary heart disease) : রক্তবাহী ধমনীতে (দ্র) চর্বি (দ্র) জাতীয় পদার্থ ও ক্যালসিয়াম (দ্র) জমে গিয়ে ধীরে ধীরে ধমনীর অভ্যন্তরভাগ সরু ও অসমৃণ হয়ে যায় এবং ধমনী শক্ত হয়ে পড়ে। হৃৎপিণ্ডে (দ্র) রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনীতে এই পরিবর্তন ঘটলে করোনারি হৃদ্‌রোগ দেখা দিতে পারে। এতে হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত সরবরাহ হ্রাস পায়। ফলে রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করে। গুরুতর ক্ষেত্রে এ রোগে করোনারি ধমনী বন্ধ হয়ে আকস্মিক হৃদ্‌রোগের আক্রমণ বা 'হার্ট অ্যাটাক' ঘটাতে পারে। এ হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা দীর্ঘস্থায়ী এবং সম্পূর্ণ নিরাময় সহজে ঘটে না।

অ্যান্‌জাইনা পেক্টোরিস (angina pectoris) : হৃৎপিণ্ডের পেশিতে অপ্রতুল রক্ত সরবরাহ, করোনারি ধমনীতে ত্রুটি ইত্যাদি কারণে এ জাতীয় হৃদ্‌রোগ দেখা দেয়। এ রোগে বুকে হঠাৎ ব্যথা ও চাপ অনুভূত হয়। কাঁধ, বাহু, বিশেষ করে বাম বাহুতে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। বাহুর কনুই, কব্জি এবং আঙুলেও ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে পারে। সাধারণত মধ্যবয়সী পুরুষেরা এ রোগে আক্রান্ত হয়।

বাতজ্বর-ঘটিত হৃদ্‌রোগ (rheumatic heart disease) : স্ট্রেপ্টোকক্কাস জাতীয় জীবাণু সংক্রমণে সৃষ্ট বাতজ্বরের যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা (ভাল্‌ভ্‌) পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে বাতজ্বর-ঘটিত হৃদ্‌রোগ সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় যথাযথ চিকিৎসার।

জন্মগত হৃদ্‌রোগ (congenital heart disease) : কোনো শিশুর হৃদ্‌যন্ত্রের এক বা একাধিক অংশ জন্মগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ হলে হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এ রোগকে জন্মগত হৃদ্‌রোগ বলা হয়। এ রোগের চিকিৎসা সন্তোষজনক নয়।

জীবাণুঘটিত প্রদাহ (bacterial endocarditis) : জীবাণু (দ্র) সংক্রমণের ফলে হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লিতে প্রদাহ দেখা দিলে এ জাতীয় হৃদ্‌রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগের চিকিৎসায় প্রধানত এণ্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

সি. না. হ.

হেগ সম্মেলন (Hague Conference)

রাশিয়ার (দ্র) প্রস্তাবক্রমে ১৮৯৯ সালে ও ১৯০৭ সালে দু'বার দক্ষিণ হল্যাণ্ড প্রদেশের পৌর রাজধানী হেগ (The Hague) নগরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনই 'হেগ

www.pathagar.com

সম্মেলন' নামে পরিচিত।

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমরোপকরণ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে রুশ সম্রাট দ্বিতীয় নিকলাসের প্রচেষ্টায় ১৮৯৯ সালের মে থেকে জুলাই পর্যন্ত তিন মাসব্যাপী হেগ নগরে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অস্ত্র হ্রাসের প্রশ্নে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও যুদ্ধ পরিচালনায় অনুসৃত কয়েকটি কার্যক্রম সংশোধনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রথম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিচার ও সালিসের জন্য হেগ নগরে ১৮৯৯ সালে 'হেগ আদালত' নামে একটি স্থায়ী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় হেগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৭ সালের জুন মাসে। এই সম্মেলনে গেরিলা যুদ্ধের (দ্র) রীতি এবং নৌযুদ্ধের ক্ষেত্রে জেনেভা সম্মেলনের নীতি প্রয়োগের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বেলুন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ, শ্বাসরোধকারী গ্যাস নিক্ষেপ প্রভৃতি বন্ধ করার জন্যও এতে কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে হেগ সম্মেলনের প্রস্তাবাবলি যে কার্যকর হয়েছিল তা নয়। তবে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসব নীতি ও প্রস্তাবের গুরুত্ব রয়েছে।

সুজ. ব.

হেগেল্, গেওর্গ্ ভিল্‌হেল্‌ম্ ফ্রিড়্রিশ্ [১৭৭০—১৮৩১]

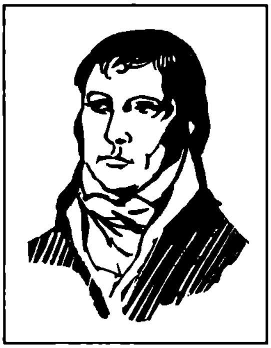

ভাববাদী জার্মান দার্শনিক। ১৭৭০ সালে স্টুট্‌গার্টে জন্ম। হেগেল্ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)–এর দার্শনিক মত গত প্রায় দু' শ' বছর ধরে মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। পূর্ববর্তী দার্শনিক ইমানুয়েল্ কান্টের (দ্র) দর্শনের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে।

নীতিশাস্ত্র, ধর্ম (দ্র), ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব (দ্র) ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হেগেল্ মনে করতেন, ভাব বা অস্তিত্বের মধ্যে অনন্তকাল ধরে হাঁ এবং না-এর দ্বন্দ্ব চলছে। তাঁর এই চিন্তা থেকেই আধুনিক কালের দু'টি দার্শনিক চিন্তার শুরু। চিন্তা দু'টি একে অপরের প্রবল বিরোধী। একটি হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্ক্সবাদ (দ্র)। অন্যটি নবভাববাদ বা স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতবাদ।

১৮৩১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. মা

হেপাটাইটিস জণ্ডিস ও যকৃৎ দ্র

হেবার, ফ্রিৎস্ অ্যামোনিয়া দ্র

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৩৮—১৯০৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে (দ্র) মহাকাব্যের (দ্র) ধারায় তিনটি নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হত : মধু হেম নবীন, অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (দ্র), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন (দ্র)।

হেমচন্দ্রের জন্ম হুগলি জেলায়। পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে ১৮৫৯ সালে বি.এ.ও ১৮৬১ সালে এল.এল. ডিগ্রি লাভের পর হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এং ১৮৬২-সালে মুন্সেফ পদ লাভ করেন। ১৮৯০ সালে তিনি সরকারি উকিল নিযুক্ত হন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবদ্দশায় দেশপ্রেমিক স্বাধীনচেতা কবি হিসাবে যেমন বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন, তেমনই পরাধীন দেশের শাসক ইংরেজ সরকারের রাজরোষেও পড়েন। তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ দু'খণ্ডে সমাপ্ত 'বৃত্রসংহার' কাব্য। 'ভারতসঙ্গীত', 'ভারতবিলাপ', 'ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' প্রভৃতি তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা।

শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

হা. মা.

www.pathagar.com

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় [১৯২০—১৯৮৯]

জনপ্রিয় বাঙালি গায়ক ও সঙ্গীতপরিচালক। জন্ম ১৯২০ সালের ১৬ই জুন ভারতের (দ্র) কাশী (দ্র)-তে। কলিকাতার (দ্র) মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করার পর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। শিক্ষাজীবন চলাকালেই ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর গাওয়া আধুনিক গানের প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর গায়কজীবনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেওয়ার পর। প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরীর (দ্র) কথা ও সুরে বেশ কিছু আধুনিক গান ও গণসঙ্গীতে (দ্র) কণ্ঠ দেওয়া ও সেগুলো গ্রামোফোন (দ্র) রেকর্ডে ধারণ করার সুবাদে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

বেশ কিছু বাংলা ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা ও নেপথ্য কণ্ঠদানশেষে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে তিনি স্থায়ীভাবে থাকার জন্য বোম্বাই চলে যান। সেখানেও তিনি বহু হিন্দি ও উর্দু ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করে ও গান গেয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তাধন্য হন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অগণিত সঙ্গীতপিপাসুর হৃদয় জয় করেন।

হেমন্ত বেশ কিছু ছবিও প্রযোজনা করেন। তাঁর নিজের গাওয়া গানের রেকর্ডের সংখ্যা ৪ হাজারেরও বেশি।

সঙ্গীতজগতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলাউদ্দিন পুরস্কার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি ও বাংলাদেশের (দ্র) একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রদত্ত মধুসূদন পুরস্কার ইত্যাদি। দু'বার তিনি ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে (দ্র) হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অবদান অসামান্য। এই সময় তাঁর গাওয়া বেশ কয়েকটি গান স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র (দ্র) থেকে প্রচারিত হত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করত।

দীর্ঘ ৫০ বছরের সঙ্গীতজীবনে তিনি শুধু নিজেই গান গান নি, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের বহু শিল্পীকেও তাঁর সুরারোপিত গান গাইয়ে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করেছেন। এক জন রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী হিসাবেও তিনি সবিশেষ খ্যাত ছিলেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ১৯৮৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

গান রেকর্ডিংয়ের সময় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

হেমাঙ্গ বিশ্বাস [১৯১২—১৯৮৭]

বিখ্যাত গণসঙ্গীত (দ্র) রচয়িতা, গণসঙ্গীত সংগঠক ও গায়ক। হবিগঞ্জ জেলার মিরাশি গ্রামে জন্ম। পিতা হরকুমার বিশ্বাস। শৈশব থেকেই গানের দিকে ঝোঁক ছিল। সিলেট (দ্র) ও আসামের লোকসঙ্গীত (দ্র) তাঁকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। স্কুলজীবন উত্তীর্ণ হয়ে সিলেটে মুরারিচাঁদ কলেজে ভর্তি হন ও ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে কলেজ থেকে বিতাড়িত ও কারারুদ্ধ হন। আড়াই বছর কারাবাসের পর সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে চাষীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং সমাজের দরিদ্র, শোষিত জনগণকে জাগিয়ে তোলার

www.pathagar.com

ও ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে গান রচনা ও প্রচার করতে থাকেন। ১৯৪৩ সাল থেকে গণনাট্য ও গণসঙ্গীত আন্দোলন শুরু হলে হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাতে অংশগ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নির্মাতা হয়ে দাঁড়ান। সিলেট ও আসাম অঞ্চলে গণ-আন্দোলনে ও গণসঙ্গীত সংগঠনে তাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

আত্মজীবনীসহ সঙ্গীত বিষয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস একাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৮৩ সালে তিনি কলিকাতা (দ্র) থেকে সদলবলে ঢাকা (দ্র) ভ্রমণে আসেন ও এখানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বাংলা উদ্দীপনামূলক গানের একটি নতুন ধারা নির্মাণ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অন্যতম কীর্তি।

ক. গো.

হেমিংওয়ে, আর্নেস্ট্ [১৮৯৯—১৯৬১]

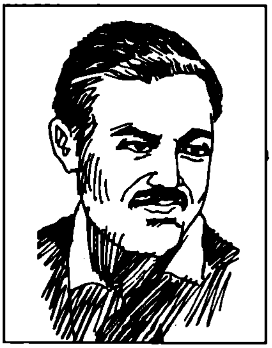

জীবনবাদী কথা-সাহিত্যিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ইলিনয়ের ওক পার্কে হেমিংওয়ে (Ernest Hemingway) ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শহরের এক পাবলিক স্কুলে লেখাপড়াশেষে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ক্যানসাস 'সিটি স্টার' পত্রিকার সাংবাদিক হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে তিনি ইতালিয়ান বাহিনী ভুক্ত হয়ে অ্যাম্বুলেন্সচালক এবং পদাতিক সৈন্য হিসাবে তাতে যোগ দেন। যুদ্ধশেষে তিনি প্যারিসে (দ্র) বসবাস করতে শুরু করেন। এখানে বসবাস করার সময়ে তিনি 'টরেন্টো স্টার' পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গভীরভাবে সাহিত্যকর্ম রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হলে হেমিংওয়ে তাতে যুদ্ধসংবাদদাতা হিসাবে যোগ দেন। এই সময় তিনি যেসব সংবাদভাষ্য রচনা করেন, সেসবেরও সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। এ রকমই একটি সংবাদভাষ্যের শিরোনাম 'স্পেনে নিহত আমেরিকানদের প্রসঙ্গে'। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও (দ্র) যুদ্ধসংবাদদাতা হিসাবে যোগ দেন।

১৯৫৪ সালে আর্নেস্ট্ হেমিংওয়ে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। তাঁর সাহিত্যাদর্শের মূল লক্ষ্য মানুষ ও তার জীবনের অপরাজেয়তার জয়গান করা। অনাড়ম্বর ভাষায় মানবজীবনের গভীর সত্যকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর প্রতিটি রচনাকর্মে। হেমিংওয়ের সাহিত্যকর্ম তাই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত।

তাঁর রচনাকর্মের মধ্যে উপন্যাস 'দ্য সান অলসো রাইজেস্', 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্', 'ফর হুম্ দ্য বেল টোল্স্' এবং 'দ্য ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি' বিশিষ্টতার দাবিদার। নকশা জাতীয় রচনা 'ইন আওয়ার টাইম্স্' এবং নাটক 'দ্য ফিফ্‌থ কলাম্'সহ বেশ কিছু ছোটগল্পেরও (দ্র) রচয়িতা তিনি।

আর্নেস্ট্ হেমিংওয়ে ১৯৬১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

হেমেন্দ্রকুমার রায় [১৮৮৮—১৯৬৩]

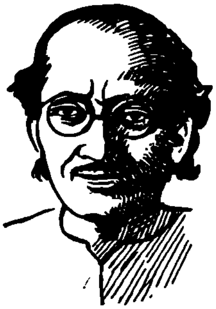

জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক, গীতিকার ও সম্পাদক। ১৮৮৮ সালে কলিকাতায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাধিকাপ্রসাদ রায়। তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

হেমেন্দ্রকুমার রায় শৈশবে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯০৩ সালে 'বসুধা' পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রথম ছোটগল্প (দ্র) 'আমার কাহিনী' প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। সাপ্তাহিক 'নাচঘর' পত্রিকা ও ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'রংমশাল' সম্পাদনা ছাড়াও তিনি কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রধানত শিশুসাহিত্য রচনায় প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তাঁর পদচারণা ছিল উজ্জ্বল। বড়দের জন্য উপন্যাস ছোটগল্প (দ্র), প্রবন্ধ (দ্র), কবিতা (দ্র), গান ইত্যাদি রচনায়ও তিনি বিশেষ

www.pathagar.com

পারদর্শী ছিলেন। ছোটদের জন্য তিনি ৮০টিরও বেশি বই লিখেছেন। তার মধ্যে রহস্যগল্প, গোয়েন্দাগল্প (দ্র), ভূতপ্রেত ও ইতিহাস-আশ্রিত বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে। 'যখের ধন', 'আবার যখের ধন', 'জয়ন্তের কীর্তি', 'মানুষ পিশাচ', 'দেড়শো খোকার কাণ্ড', 'কিংকং', 'ভারতের দ্বিতীয় প্রভাত', 'পঞ্চনদের তীরে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কিশোরপাঠ্য গ্রন্থ। বিমলকুমার, জয়ন্ত মাণিক, পুলিশ ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবু ইত্যাদি চরিত্র বাংলা কিশোরসাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বড়দের জন্য লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'ভোরের পূরবী'(১৩২৮), 'মালাচন্দন' (১৩২৯), 'মায়াকানন' (১৩৩৬ ব), 'জলের আলপনা', 'বেনোজল', 'পদ্মকাঁটা', 'ঝড়ের যাত্রী', 'যাঁদের দেখেছি' (২ খণ্ড ১৩৫৯ ব.), 'বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার', 'ওমর খৈয়ামের রুবায়ত' ইত্যাদি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর 'সিঁদুর চুপড়ি' গল্পটি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

গীতরচয়িতা হিসাবেও হেমেন্দ্রকুমার রায় খ্যাতি অর্জন করেন। সে সময়ের বাংলা থিয়েটার ও গ্রামোফোনে (দ্র) গাওয়া প্রচলিত গানের রীতি ও রুচির মানোন্নয়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বহু গান এক সময় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর (দ্র) 'সীতা' নাটকের নৃত্যপরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন। ছবি আঁকাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ১৯৬৩ সালের ১৮ই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

হেয়ার, ডেভিড ডেভিড হেয়ার দ্র

হেরা গুহা

হেরা গুহা মক্কার (দ্র) নিকটবর্তী আল-নূর নামক পর্বতের একটি গুহা। এখানেই মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) সর্বপ্রথম ঐশীবাণী লাভ করেন, লাভ করেন নবী হিসাবে স্বীকৃতি, যার নাম নবুওয়ত।

মানুষকে সত্যের পথে, কল্যাণের পথে চালনার উদ্দেশ্যে ভাবুক হযরত মুহম্মদ (স.) এই হেরা গুহার নির্জনতায় ধ্যানে নিমগ্ন হতেন সত্যের আলোকশিখা পাওয়ার জন্য। এ কারণেই হেরা গুহা ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, রসূলুল্লাহ্ (স.)(দ্র) -এর নবুওয়ত লাভের স্থান তথা প্রথম কুরআন শরীফ (দ্র) নাজিলের স্থান হিসাবে হেরা গুহা বিশ্বমুসলিমের কাছে বিশেষভাবে সম্মানিত।

মু. মা.

হেরাক্লিটাস [খ্রি. পূ. ৫০০]

গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস (Heraclitus) ছিলেন সক্রেটিস (দ্র), প্লেটো (দ্র) ও আরিস্টোটল (দ্র) -এর পূর্বসূরি। তাঁর জীবন সম্পর্কে শুধু এটুকু জানা যায় যে তিনি অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন এবং তাঁর বাসস্থানের নাম এফেসুস্।

তিনি মনে করতেন, পৃথিবী নিত্য পরিবর্তনশীল এবং জগৎসংসারে স্থায়ী বলে কোনো কিছুই নেই, অথচ সমস্ত কিছুর ভিতরে অদৃশ্যভাবে কোনো সঙ্গতি রয়ে গেছে।

তাঁর দর্শনচিন্তার প্রভাব পরবর্তী তিন দার্শনিকের উপরেও পড়েছিল।

হা. মা.

হেরোইন (heroin)

পপিফুলের বীজাধার থেকে নিঃসৃত এক ধরনের সাদা আঠা জাতীয় উপাদানের নাম আফিম (দ্র) বা ওপিয়াম। আফিম থেকে মরফিন (morphine) নামে যে উপাদান পাওয়া যায়, সেই মরফিন থেকেই তৈরি করা হয় হেরোইন। মরফিনের মতোই হেরোইন বেদনানাশক ও নিদ্রা-উৎপাদক। কিন্তু হেরোইনের কার্যকারিতা মরফিনের চেয়ে বেশি এবং হেরোইন গ্রহণের আসক্তি অধিক বলে চিকিৎসাক্ষেত্রে হেরোইন ব্যবহৃত হয় না।

হেরোইন সেবনে এক ধরনের শারীরিক ও মানসিক সুখানুভূতি বোধ হয়। বার বার হেরোইন সেবনে এর প্রতি নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। ফলে অভ্যস্তদের হেরোইন সেবন বন্ধ করে দিলে বিভিন্ন শারীরিক অসুবিধা, যেমন—শরীর ব্যথা, মাংসপেশির খিঁচুনি, ডায়রিয়া (দ্র), বমি ইত্যাদি দেখা দেয়। নিয়মিত হেরোইন সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। একে মাদক দ্রব্য (দ্র) হিসাবে গণ্য করা হয়।

হেরোইনসেবীরা এর তীব্র আসক্তির কারণে যে কোনো উপায়ে এটি সংগ্রহের চেষ্টা করে। ফলে এরা বিভিন্ন প্রকার

www.pathagar.com

অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। হেরোইনের বিরূপ ক্রিয়া ও মাদকাসক্তির (দ্র) কারণে পৃথিবীর সর্বত্র হেরোইন প্রস্তুত, বহন, পাচার এবং সেবন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হেরোইনসেবীসহ অন্যান্য মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন দেশে নিরাময়কেন্দ্র রয়েছে।

সি. না. হ.

হেরোদোতাস্ [আনু.৪৮০–আনু.৪২০ খ্রি. পূ.]

সুবিখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক। হেরোদোতাস্ (Herodotus) বা হেরোদোতুস্ 'ইতিহাসের জনক' নামে খ্যাত। বাংলায় সাধারণত 'হেরোডোটাস্' লেখা হয়। তাঁকে ইউরোপে (দ্র) গদ্যেরও জনক বলা হয়।

হেরোদোতাস্ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনরের (দ্র) কারিয়া নগরীর হালিকারনুসাসে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যখন তরুণ বয়স, তখন নগরীর শাসক ছিলেন লাইগ্‌ডামিস। তিনি প্রজাপীড়নকারী নিষ্ঠুর শাসক ছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটন ও তাঁকে উৎখাতের প্রস্তুতি চলতে থাকে। হেরোদোতাসের পিতৃব্য কবি পানইয়াসিসের নেতৃত্বে গঠিত হয় একটি বিপ্লবী দল। হেরোদোতাস্ এই বিপ্লবী দলে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর পিতৃব্য পানইয়াসিস শাসক লাইগ্‌ডামিসের লোকজন কর্তৃক ধৃত হন এবং কালবিলম্ব না করে তাঁকে হত্যা করা হয়। হেরোদোতাস্ আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন এবং পালিয়ে যান সামোস্ নামক একটি স্থানে। এই সামোসেই ৭ থেকে ৮ বছর অবস্থানকালে হেরোদোতাস্ আইওনিক ভাষা আয়ত্ত করেন। তাঁর যাবতীয় ঐতিহাসিক বিবরণ বা গ্রন্থ এই ভাষাতেই লিখিত।

কিছু কালের মধ্যে শাসক লাইগ্‌ডামিস ক্ষমতাচ্যুত হলে হেরোদোতাস্ হালিকারনুসাসে ফিরে আসেন। কিন্তু নতুন শাসকগোষ্ঠী তাঁর প্রতি বৈরী আচরণ করায় তিনি চিরকালের জন্য জন্মস্থান ত্যাগ করে পরিব্রাজকের জীবন বেছে নেন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৪ থেকে ৪৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন।

এথেন্স নগরী ছিল এই সময় শিক্ষা ও সংস্কৃতির শীর্ষতম পীঠস্থান। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৭ সালে তিনি এখানে আসেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে নাট্যকার সোফোক্লেস্(দ্র) ও পেরিক্লিসের মতো মহান ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং গভীর বন্ধুত্ব হয়। এইসব ব্যক্তিত্ব যেমন তাঁর মননকে আলোকিত করে, তেমনি হেরোদোতাসের ঐতিহাসিক-বিবরণীও ঐসব ব্যক্তিত্বসহ এথেন্সবাসীকেও সমভাবে মুগ্ধ করে। ফলে এথেন্সবাসীর তরফ থেকে তাঁকে কিছু অর্থ পুরস্কারও দেওয়া হয়। এথেন্স হয়ে ওঠে তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি।

হেরোদোতাস্ এই পর্যায়ে বছর কয়েক এথেন্সে অবস্থান করার পর ইতালি গমন করেন। সেখানেও তিনি কিছু কাল বসবাস করেন। তিনি যেসব এলাকা ব্যাপকভাবে সফর করেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, কৃষ্ণ উপসাগরীয় উপকূলভূমি এবং বলকান (দ্র) উপদ্বীপ।

পৃথিবীর (দ্র) ইতিহাসে এবং সাহিত্য-জগতে হেরোদোতাসের দান অসামান্য। তাঁর রচিত 'ইতিহাস' শুধু প্রাচীন জগতের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ হিসাবেই অমূল্য নয়, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন গদ্যরচনারও এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত। তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থের প্রথম অংশ সম্পূর্ণভাবে গ্রিস ও পারস্য সাম্রাজ্যের ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে লেখা। দ্বিতীয় অংশে গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ বা ইতিহাস লিপিবদ্ধ। হেরোদোতাস্ অবশ্য তাঁর রচিত গ্রন্থকে 'ইতিহাস' আখ্যা দিতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর অভিমত ছিল, এর নাম হওয়া উচিত 'হেরোদোতাসের প্রশ্নাবলি'।

তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলির একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে স্থানীয় কিংবদন্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখেছেন 'যতদূর শুনেছি', 'শোনা কথা' অথবা 'তিনি বা তাঁরা বলেছেন' জাতীয় কথা। তাঁর রচিত ইতিহাসের বিবরণীতে ভুলভ্রান্তি আছে সন্দেহ নেই, তারপরও প্রাচীন যুগের ইতিহাসের আকর-গ্রন্থ হিসাবে তা অপরিসীম মূল্যবান।

হেরোদোতাস্ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪২০ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

www.pathagar.com

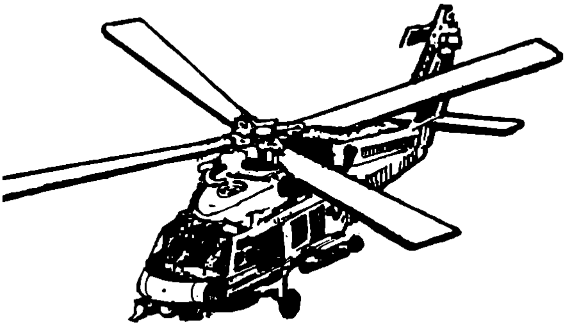

হেলিকপ্টার (helicopter)

বিশেষ ধরনের এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌, বায়ুযান। অনুভূমিক তলে ঘূর্ণায়মান এক বা একাধিক পাখার মাধ্যমে হেলিকপ্টার উড়তে পারে। উড়োজাহাজের সঙ্গে হেলিকপ্টারের প্রধান পার্থক্য হল, হেলিকপ্টারের পাখা অনুভূমিক তলে ঘোরে আর বিমানের পাখা (প্রপেলার) ঘোরে উলম্ব বা খাড়া তলে।

মধ্যযুগে (দ্র) চীনা ও ইউরোপীয়রা খেলনা হেলিকপ্টার তৈরি করত বলে জানা গেছে। 'মোনা লিসা' (দ্র) নামের ছবির জন্য বিখ্যাত শিল্পী লেওনার্দো দা ভিঞ্চির (দ্র) আঁকার খাতায় হেলিকপ্টারের নকশা পাওয়া গেছে। তবে ১৯০৯ সালে রুশ বিজ্ঞানী ইগর্‌ সিকোর্স্কি প্রথম পাইলটবিহীন হেলিকপ্টার তৈরি করেন। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর ৪০ দশকের শেষদিকে আধুনিক হেলিকপ্টারের উদ্ভব ঘটে।

হেলিকপ্টারের বৈশিষ্ট্য হল, এটি যে কোনো স্থান থেকে খাড়াভাবে শূন্যে উঠে যেতে পারে, উড়োজাহাজের মতো দীর্ঘ রানওয়ের প্রয়োজন পড়ে না। শূন্যে একই স্থানে স্থির থাকা এবং খুব ধীরগতিতে যে কোনো দিকে চলাচল হল হেলিকপ্টারের বাড়তি সুবিধা।

সামরিক কাজে হেলিকপ্টার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হলেও দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, দুর্গত এলাকার লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজে ইদানীং হেলিকপ্টারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, স্বল্পদূরত্বে যাত্রী পরিবহণ প্রভৃতি কাজেও এর ব্যবহার দেখা যায়।

মু. হা.

হেলেন অব ট্রয় (Helen of Troy)

ট্রয় প্রাচীন কালের একটি রাজ্যের নাম। ট্রয়ের যুদ্ধ (দ্র) নিয়ে গ্রিক মহাকবি হোমার (দ্র) তাঁর (দ্র) 'ইলিয়াদ' (দ্র) মহাকাব্য (দ্র) রচনা করেছিলেন। এই যুদ্ধ যে কারণে সংঘটিত হয়েছিল তা হল স্পার্টার রাণী হেলেন। ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের (Paris) সঙ্গে হেলেন তাঁর স্বামী রাজা মেনেলাউসকে ত্যাগ করে ট্রয় চলে যান। হেলেনকে উদ্ধার করার জন্যই ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল।

হেলেন ছিলেন দেবরাজ জেউস ও অপ্সরা লেদা-র কন্যা। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসাবে হেলেন মানুষের মনে, শিল্পে ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

হা. মা.

হেলেন কেলার কেলার, হেলেন দ্র

হেস্টিংস্‌, ওয়ারেন্‌ [১৭৩২—১৮১৮]

ওয়ারেন্‌ হেস্টিংস্‌ (Warren Hastings) ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল (১৭৭৪-১৭৮৫) ছিলেন। চাতুর্য, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে হেস্টিংস্‌ ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজের আধিপত্য ও শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখেন।

১৭৩২ সালে ইংল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। মাত্র ১৮ বছর বয়সে হেস্টিংস্‌ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরানির চাকুরি (১৭৫০) নিয়ে কলিকাতায় (দ্র) আসেন। ১৭৫৭ সালে এ দেশে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দেয়, তা নিরসনের উদ্দেশ্যে ১৭৭২ সালে তাঁকে বঙ্গদেশের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি বিশেষ করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সমগ্র বঙ্গদেশকে তিনি কতকগুলো জেলায় বিভক্ত করে প্রত্যেক জেলায় একটি করে দেওয়ানি ও ফৌজদারি

www.pathagar.com

আদালত স্থাপন করে সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন।

তিনি আর্থিক ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে দেশীয় কর-কর্মচারীদের বরখাস্ত করে ব্রিটিশ কর্মচারী নিয়োগ করেন। এ ছাড়া তিনি স্থানীয় জমিদার, নওয়াব প্রভৃতির নিকট থেকে প্রশাসনিক ও বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা কেড়ে নেন।

ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ ১৭৭৪ সালে সমগ্র ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। কিন্তু পদোন্নতি হলেও তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় নি। কারণ, চার সদস্যের একটি পরিষদ নিযুক্ত হয় তাঁকে সহায়তার জন্য। এঁদের মধ্যে তাঁর স্বদেশীয় তিন জন সদস্যের বিরোধিতার কারণে তিনি পদে পদে লাঞ্ছিত হতে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে স্বৈরাচার ও দুর্নীতির অভিযোগও ওঠে। অবশ্য এই মামলায় তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের কারণে ষড়্যন্ত্রমূলকভাবে মহারাজা নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৭৮৫ সালে তিনি পদত্যাগ করে স্বদেশে চলে যান। ১৮১৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মু. মা.

হো চি মিন [১৮৯০—১৯৬৯]

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোচীন (দ্র) তথা ভিয়েৎনামের মুক্তি-সংগ্রামের শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট (১৯৪৫—১৯৬৯)।

হো চি মিন (Ho Chi Minh) তাঁর ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম ন্‌গুয়েন্ থাট্ থান্ (Nguyen That Thanh)। জন্ম ১৮৯০ সালের ১৯শে মে সাবেক ফরাসি আশ্রিত রাজ্য আন্নামের ন্‌গেয়ান প্রদেশের হোয়াংট্রু গ্রামে।

ছাত্র হিসাবে মেধাবী হলেও তাঁর শিক্ষাজীবন বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। অল্প কিছুকাল শিক্ষকতার পর ১৯১১ সালে জাহাজে পাচকের কাজ নিয়ে ইউরোপে (দ্র) পাড়ি

হো চি মিন—একদল হাসি-খুশি শিশুর সঙ্গে

জমান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শেষ হলে তিনি ফ্রান্সে আসেন এবং ফরাসি সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। হো ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯২২ সালে তিনি বিপ্লবী কর্মকৌশল শিখতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে (দ্র) যান। এই সময় তাঁর সঙ্গে লেনিন (দ্র), স্তালিন (দ্র) ও মানবেন্দ্রনাথ রায়েরও (দ্র) সাক্ষাৎ ঘটে। কমিন্টার্নের সদস্য হিসাবে তাঁকে পূর্ব-এশিয়ায় কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরই উদ্যোগে ইন্দোচীন (দ্র) কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে (১৯৩০)।

১৯২৪ সালে হো চি মিন মস্কো (দ্র) থেকে পিকিং অর্থাৎ বেইজিং (দ্র)-এ ফিরে সেখানকার সামরিক বিদ্যালয়ে বহু ভিয়েৎনামি যুবকের সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। পরে এদের নিয়েই গড়ে তোলা হয় ভিয়েৎ মিন্ (দ্র) মুক্তিবাহিনী। এই সময় তাঁর জন্মস্থান ন্‌গুয়েনে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিলে ফরাসি কর্তৃপক্ষ তা কঠোর হস্তে দমন করে এবং বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী অনেককে গ্রেফতার ও হত্যা করা হয়। পিকিং-এ অবস্থানরত হো-কে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। ব্রিটিশ অধিকৃত হংকং-এর পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেফতার করে। ফরাসি সরকার তাঁকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি

www.pathagar.com

জানায়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও খ্যাতনামা রাজনীতিবিদের হস্তক্ষেপে তিনি এই বিপদ থেকে রক্ষা পান। চলে যান আবার মস্কোয়। ১৯৩৮ সালে ফিরে আসেন চীনের একটি মুক্তাঞ্চলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে হিটলারের (দ্র) বাহিনী ফ্রান্স দখল করে নেয়। এ সময় ভিয়েৎনামের টনকিনে মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠলে হো চি মিন সেখানে চলে আসেন এবং ইন্দোচীন বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৪০ সালে জার্মান বাহিনীর হাতে ফ্রান্সের পতন ঘটলে জাপান (দ্র) এই অঞ্চলে তার আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা চালায়। হো-র নেতৃত্বাধীন বাহিনী ফরাসি ও জাপানি সেনাদলের বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই শুরু করে। এ সময়ই তিনি গঠন করেন 'ভিয়েৎনাম লীগ' বা 'ভিয়েৎ মিন্'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর ১৯৪৫ সালের ১৬ই আগস্ট হো চি মিন ভিয়েৎনামকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করেন এবং প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হন। কিন্তু ফরাসি সরকার তা মানতে অস্বীকৃত হলে তাঁর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সঙ্গে ফরাসি বাহিনীর সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৯৫৪ সালের ২৪শে জুলাই জেনেভায় অনুষ্ঠিত ১৪-জাতি বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভিয়েৎনাম একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পেলেও দেশটিকে উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

হো চি মিন খণ্ডিত ভিয়েৎনাম অর্থাৎ উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হন। উক্ত সম্মেলনে আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের (দ্র) তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ গণভোটের মাধ্যমে দুই ভিয়েৎনাম পুনরায় একত্র হবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঐ সিদ্ধান্ত অকার্যকর করে তুলতে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। তাই প্রতিশ্রুত গণভোটের দাবিতে ভিয়েৎনামী জনগণ অচিরেই শুরু করে আন্দোলন। গঠিত হয় 'ভিয়েৎনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট'। ১৯৫৫ সালে সাম্রাজ্যবাদের একান্ত অনুগত ন্গো দিন্ দিয়েম (Ngo Dinh Diem)-এর সরকারকে রক্ষার অজুহাতে মার্কিন সেনাবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অবতরণ করে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধে ভিয়েৎনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের বিজয়ের মুখে মার্কিন বাহিনী যখন বিধ্বস্ত, দুই ভিয়েৎনামের পুনরেকত্রীকরণ যখন আসন্ন, হো চি মিন ঠিক সেই সময় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৬৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর।

১৯৭৩ সালে মার্কিন বাহিনীর সার্বিক পরাজয়ের ভেতর দিয়ে দুই ভিয়েৎনাম একত্রিত হয় এবং সফল হয় হো চি মিনের দীর্ঘলালিত স্বপ্ন।

আ. হু.

হোজ্জা, নাসিরুদ্দিন নাসিরুদ্দিন হোজ্জা দ্র

হোভার্‌ক্রাফ্‌ট্ (hovercraft)

জলে ও স্থলে চলতে পারে এরূপ উভচর যান। হোভার্‌ক্রাফ্‌ট্-এ ভূমি ও যানের তলদেশের মাঝখানে বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে বেশি বায়ুচাপ সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ ভূমির ওপরে একটি বায়ুর কুশনের মতো করে তার ওপরে যানটি বসানো হয়। কুশনের ভেতরকার বায়ুর চাপ বায়ুমণ্ডলের (দ্র) চাপ অপেক্ষা বেশি হয়।

বায়ুর কুশনের কারণে হোভার্‌ক্রাফ্‌ট্‌কে বায়ুকুশন যানও (Air Cushion Vehicle = ACV) বলা হয়ে থাকে।

১৮৭০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের (দ্র) স্যার জন থর্নিক্রফ্‌ট্ প্রথম হোভার্‌ক্রাফ্‌টের ধারণা প্রকাশ করেন। ১৯৫০ সালে ব্রিটেনেরই ক্রিস্টোফার কক্‌রেল (Sir Christopher Cockerell) তা বাস্তবায়ন করেন। তবে ১৯৫৯ সালে প্রথম উভচর যানটিকে রাস্তায় নামানো হয়।

বানাতে গিয়ে দেখা গেল, বায়ুর কুশনকে সচল রাখার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। ফলে হোভার্‌ক্রাফ্‌টের নকশা প্রণয়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

যানটির কুশনে বাতাস ঢোকানো এবং যানটিকে সচল রাখার জন্য একটি গ্যাস টার্বাইন (দ্র) ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ হোভার্‌ক্রাফ্‌টের ইঞ্জিন হল একটি গ্যাস টার্বাইন। স্বভাবতই অন্য যে কোনো যানের তুলনায় এটির জ্বালানি-খরচও বেশি।

জল, স্থল, এমনকি শক্ত মাটি ছাড়াও কাদা, বালি প্রভৃতির ওপর দিয়ে চলতে পারে বলে হোভার্‌ক্রাফ্‌টের

www.pathagar.com

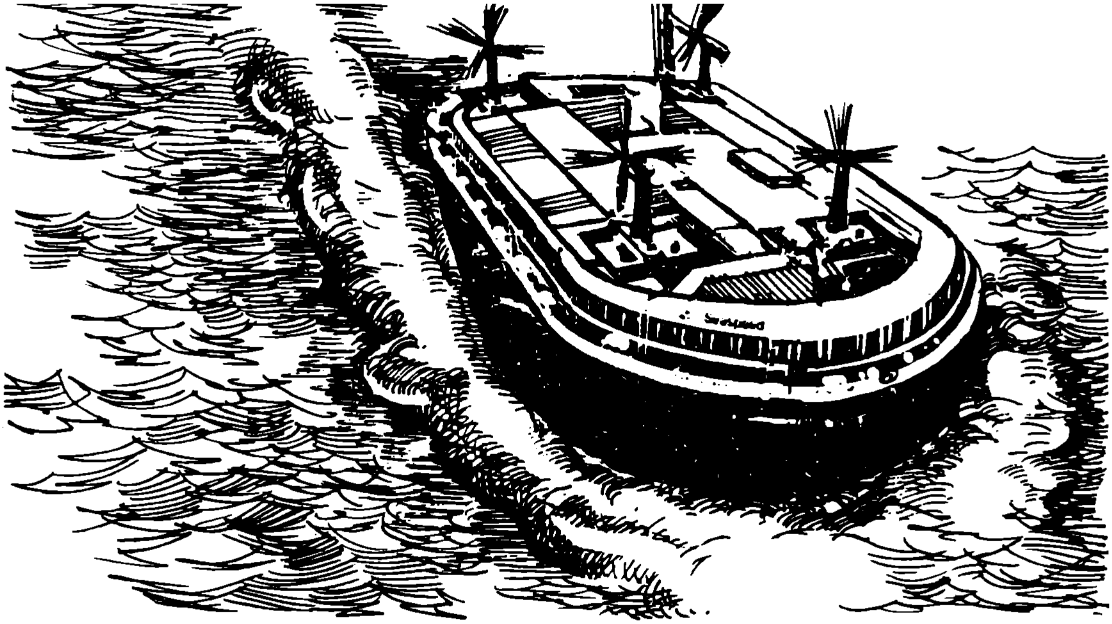

হোভার্‌ক্রাফ্‌ট্‌

বিশেষ ধরনের কিছু ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সামরিক যান হিসাবে হোভার্‌ক্রাফ্‌টের ব্যবহার সর্বোচ্চ। তবে, দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী ও ত্রাণকর্মীদের বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে হোভার্‌ক্রাফ্‌ট্‌ প্রয়োজনীয়।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের (দ্র) উপকূল এলাকায় এক ঘূর্ণিঝড় (দ্র) ও জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সময় দুর্গত এলাকায় ত্রাণকাজে সহায়তা করার জন্য একটি মার্কিন সেনাদল বাংলাদেশে এসেছিল। ঐ সেনাদলটি ত্রাণকার্যে কয়েকটি হোভার্‌ক্রাফ্‌ট্‌ ব্যবহার করেছিল।

জ্বালানিখরচ ও ডিজাইন-জটিলতার কারণে হোভার্‌ক্রাফ্‌টের বাণিজ্যিক ব্যবহার কম। ব্রিটেনের ইংলিশ চ্যানেলে ফেরি পারাপারের কাজে হোভার্‌ক্রাফ্‌টের একমাত্র বাণিজ্যিক কার্যক্রম রয়েছে। এগুলো ৪২০ জন যাত্রী ও ৬০টি যানসহ ৬০ নট (naut) গতিবেগে চলতে পারে।

মু. হা.

হোমার [আনু. খ্রি. পূ. ১২—৯ শতক]

প্রাচীন গ্রিক কবি এবং ইউরোপের (দ্র) আদি কবি রূপে খ্যাত। গ্রিক ভাষায় তাঁর নাম 'ওমেরোস্‌' হলেও আমাদের নিকট তিনি 'হোমার' (Homer) নামেই পরিচিত। বিশ্বসাহিত্যের সেরা সম্পদ 'ইলিয়াদ'(দ্র) ও 'ওদিসি' (দ্র) মহাকাব্য (দ্র) দু'টি তাঁর রচনা।

প্রাচীন যুগে গ্রিসে অনেক চারণকবি ছিলেন। তাঁরা শহরে ঘুরে ঘুরে রাজা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন রোমাঞ্চকর ঘটনা ও বীরদের কীর্তিগাথা তাদের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আবৃত্তি করে শোনাতেন। তাঁদের এমন একটি প্রিয় বিষয় ছিল ট্রয়ের যুদ্ধ (দ্র)। গ্রিকদের ট্রয় অভিযান নিয়ে বহু কাব্যগীত সে সময় রচিত হয়েছিল। তখন গ্রিসে সম্ভবত লিখনপদ্ধতির চল হয় নি। কবিরা একে অপরের কাছ থেকে এসব কাব্যগীত শুনে মুখস্থ করে

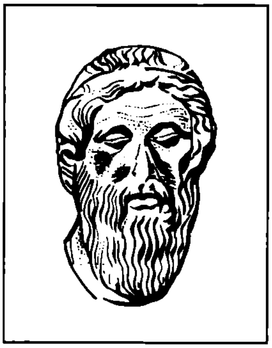

www.pathagar.com

অন্যদের শোনাতেন। এভাবে পরবর্তী কালে আবৃত্তি করার সময় প্রত্যেক কবিই তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা, মেধা ও কল্পনার স্পর্শ যোগ করে দিতেন।

হোমার ছিলেন এই কবিদের এক জন। কিন্তু কবিপ্রতিভা, কল্পনাশক্তি ও মননশীলতায় তিনি এত উজ্জ্বল ছিলেন যে অন্য কোনো কবির কীর্তিই তাঁকে আড়াল করতে পারে নি। তিনি ট্রয়ের যুদ্ধের প্রচলিত পৌরাণিক উপাখ্যান ও গাথাগুলোর পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে গভীর ভাবব্যঞ্জক, সমৃদ্ধ ও সুমধুর কাব্যভাষায় সুসংবদ্ধ রূপ দিয়ে 'ইলিয়াদ' এবং পরে 'ওদিসি' রচনা করেন।

হোমারের জীবন, জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে হোমার নামে আসলে কেউই ছিলেন না। আধুনিক গবেষকেরা অবশ্য হোমার এবং হোমারের সৃষ্টিকর্মকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অনেকের মতে হোমারের জীবনকাল খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দের আগে বিস্তৃত ছিল। গ্রিসের প্রথম ঐতিহাসিক হেরোদোতাস্ (দ্র) হোমারকে খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর মানুষ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এশিয়া মাইনরের (দ্র) উপকূলবর্তী কোনো নগরে হয়তো তাঁর জন্ম। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে এথেন্স, আর্গোস, কাইঅস, কলোফন, রোড্স্, সালামিস ও স্মার্না—এই ৭টি নগরের অধিবাসীরা নিজ নিজ নগরকে হোমারের জন্মস্থান বলে দাবি করে থাকে। কাইঅস বা স্মার্নাকে তাঁর সম্ভাব্য জন্মস্থান মনে করা হয়।

হোমার অন্ধ ছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে। কিন্তু তাঁর কাব্যে পৃথিবীর রূপ-রস ও সৌন্দর্যানুভূতির এমন আশ্চর্য সজীব প্রকাশ ঘটেছে যে গবেষকেরা মনে করেন, হোমার শেষ বয়সে দৃষ্টি হারিয়ে থাকতেও পারেন, তবে জন্মান্ধ ছিলেন না নিশ্চয়ই।

হোমারের মহাকাব্য দু'টি পরবর্তী কালে প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে ঐতিহাসিকেরা ট্রয় নগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। এই মহাকাব্য দু'টি থেকে প্রাচীন গ্রিকদের দৈনন্দিন কর্মজীবন, ঘরবাড়ি, শ্রম-হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র ও সামাজিক লোকাচার ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। গ্রিসের ইতিহাসে হোমারের মহাকাব্য দু'টি এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে যে খ্রিস্টপূর্ব ১১শ–৯ম শতককে 'হোমারীয় যুগ' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে হোমারের এ দুই মহাকাব্যই ছিল পরবর্তী কালের সকল মহাকাব্যের আদর্শ।

'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' ছাড়াও চৌত্রিশটি স্তোত্র সংবলিত স্তোত্রমালা, ছোট ছোট ষোলটি কবিতা সংবলিত 'এপিগ্রামাতা' নামে আরো দু'টি গ্রন্থ হোমারের রচনা হিসাবে পরিচিত। অবশ্য অনেক পণ্ডিত এগুলো হোমারের রচনা বলে স্বীকার করে নেন নি।

প্রাচীন গ্রিসে হোমার জাতীয় কবির মর্যাদা পেয়েছিলেন। প্লেটো (দ্র) ও আরিস্টোটল (দ্র) উভয়েই তাঁদের রচনায় বারংবার হোমারের কাব্যরীতির উল্লেখ করেছেন।

সুজ. ব.

হোমিওপ্যাথি (homoeopathy)

নামটি গ্রিক শব্দ থেকে গৃহীত। অর্থ—অনুরূপ যাতনা বা রোগ। হোমিওপ্যাথি এক ধরনের চিকিৎসাবিধান, যার মূলকথা হল রোগের নিরাময়ে এমন উপাদান ('রেমেডি') ব্যবহার করা যা সুস্থদেহে ঐ রোগের অনুরূপ লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। অনেকটা বিষে বিষক্ষয়মূলক তত্ত্বের উপর হোমিওপ্যাথির চিকিৎসাবিধান প্রতিষ্ঠিত।

হিপোক্রেটিস (দ্র) ও প্যারাসেলসাসের রচনায় এ ধরনের চিন্তার আভাস মেলে। তবে আসলে হোমিওপ্যাথির জনক হলেন জার্মান চিকিৎসক সামুয়েল্ হানেমান্ (দ্র)। তিনি বিভিন্ন ধরনের ঔষধের ক্রিয়া ও কার্যকারিতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে অবশেষে রোগসৃষ্টিকর উপাদানের সাহায্যে রোগ-চিকিৎসার তত্ত্বে পৌঁছান। তবে সেই ঔষধের মাত্রা অতি অল্প, এবং মাত্রা যত হ্রাস পাবে ঔষধের কার্যকারিতা তত বৃদ্ধি পাবে।

হোমিওপ্যাথি মতবাদে রোগের লক্ষণাদি আসলে দেহের প্রতিক্রিয়া এবং দেহ-প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কার্যকর প্রতিফলন। হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত ঔষধ সেই প্রতিক্রিয়া উদ্দীপ্ত করে রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

হানেমান্ ১৭৯৬ সালে এই নতুন চিকিৎসাব্যবস্থা প্রর্বতন করেন। হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে তাঁর প্রথম প্রবন্ধও ঐ একই বছরে প্রকাশিত হয়। পরে ১৮১০ সালে এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'Organon or the Rational Art of Healing' প্রকাশিত হয়।

হোমিওপ্যাথি এক সময় ইউরোপ (দ্র) ও আমেরিকায় (দ্র) যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল, ক্রমে সেই প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে এই মতবাদ সম্পর্কে বিতর্কও কম নয়। তবে আমাদের দেশে এর প্রভাব এখনো ব্যাপক। কারণ এই চিকিৎসায় খরচ কম পড়ে।

আ. র.

হোমিনিড (hominid)

'হোমিনিড' শব্দটি বোঝায় মানবসদৃশ অর্থাৎ দেখতে মানুষের মতো কোনো জীব। 'এপ' (দ্র) এবং মানুষের মতো বানর (দ্র) থেকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য হোমিনিড শব্দ ব্যবহৃত হয়। হোমিনিড মানবসদৃশ হলেও এটি ঠিক 'এপ'কে বোঝায় না। হোমিনিড হল সত্যিকার মানব কিংবা মানুষের মতো প্রাণী, যার সঙ্গে মানুষের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের জীব থেকেই মানুষের উদ্ভব।

সৈ. আ. ই.

হোমো ইরেক্টুস্ / খাড়া মানুষ

লাতিন শব্দ 'হোমো'-র অর্থ মানুষ এবং 'ইরেক্টুস্' অর্থ ঋজু বা খাড়া। অর্থাৎ যে মানুষ সোজা বা খাড়া হয়ে হাঁটতে পারে সেই হল *হোমো ইরেক্টুস্ (Homo erectus)*। এক কথায় বলা যায় 'ঋজু মানুষ'। এরা সোজা হয়ে হাঁটতে পারত। এ জন্য এই নাম।

হোমো ইরেক্টুস্ আধুনিক মানুষের আদিম সংস্করণ বলে অনেক পণ্ডিত ধারণা করেন। এরা তিন থেকে পনেরো লক্ষ বছর আগে জীবিত ছিল বলে মনে করা হয়। আধুনিক মানুষের চেয়ে এদের মস্তিষ্ক ছিল কিছুটা ছোট আর দাঁত ছিল সামান্য লম্বা। সাধারণত এদের উচ্চতা পাঁচ ফুট বা ১৫০ সেন্টিমিটার হত।

কুড়াল সহ পাথরের বিভিন্ন রকম হাতিয়ার হোমো ইরেক্টুসেরা তৈরি করতে জানত। সম্ভবত এরাই প্রথম আগুন ব্যবহার করতে শেখে।

হোমো ইরেক্টুসের আদি বাস আফ্রিকা (দ্র), পরে উত্তর এশিয়া এবং ইউরোপ (দ্র) অঞ্চলে। ১৮৯১ সালে ইন্দোনেশিয়ার (দ্র) জাভা অঞ্চলে এদের প্রথম ফসিল পাওয়া যায়। ইউজ্যান্ ডুবোয়া (Eugène Dubois) নামক এক ওলন্দাজ চিকিৎসক এটি উদ্ধার করেন। পরে পিকিং (চীন), হাইডেল্‌বার্গ্ (জার্মানি), কেনিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলেও এদের ফসিল পাওয়া যায়।

অনেক নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন যে হোমো হাবিলিস্ (দ্র) থেকে ক্রমবিকাশের ধারায় উদ্ভূত হয়েছে এই হোমো ইরেক্টুস্। হোমো ইরেক্টুসের পরের ধাপ হোমো সেপিয়ান্স্ (দ্র) বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

সৈ. আ. ই.

হোমো সেপিয়ান্স্ / বুদ্ধিমান মানব

'হোমো সেপিয়ান্স্' *(Homo sapiens)* শব্দের অর্থ 'বুদ্ধিমান মানুষ'। সেপিয়ান্ শব্দটির অর্থ 'বুদ্ধি' আর হোমো হল 'মানুষ'। পাঁচ-ছয় লক্ষ বছর আগে এদের আবির্ভাব।

অন্যান্য মানবসদৃশ জীব থেকে হোমো সেপিয়ান্স্‌দের যে পার্থক্য দেখা যায় তা হল চরিত্র এবং ব্যবহারগত, যেমন দু' পায়ে দাঁড়াবার ও হাঁটার অভ্যাস, মস্তিষ্কের আয়তন (যার গড় হল ১,৩৫০ ঘন সেন্টিমিটার), চওড়া কপাল, ছোট দাঁত ও চোয়াল, সুস্পষ্ট চিবুক, হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহারে দক্ষতা এবং বিভিন্ন রকমের প্রতীক (যথা ভাষা বা লেখা) উদ্ভাবনের ক্ষমতা। এরকম কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হোমো ইরেক্টুসের রয়েছে। এ জন্য হোমো ইরেক্টুসের (দ্র) ক্রমবিকশিত রূপ হিসাবে হোমো সেপিয়ান্স্‌দের ধরা হয়।

বস্তুত ক্রমবিবর্তনের ধারায়ই হোমো সেপিয়ান্স্ প্রজাতির উদ্ভব। এক থেকে আড়াই কিংবা সাড়ে তিন লক্ষ বছরের মধ্যে ধীরে—অতি ধীরে এদের ক্রমবিকাশ ঘটে বলে মনে করা হয়।

সৈ. আ. ই.

হোমো হাবিলিস্ / দক্ষ মানব

লাতিন ভাষায় 'হোমো' শব্দের অর্থ মানব আর 'হাবিলিস্'

www.pathagar.com

অর্থ দক্ষ। তাই এদের বলা যায় *হোমো হাবিলিস্ (Homo habilis)* বা 'দক্ষ মানব'। এদের ফসিলের সঙ্গে পাওয়া গেছে সবচেয়ে প্রাচীন হাতিয়ার। মনে হয় এরাই এসব হাতিয়ার প্রস্তুত করেছে এবং ব্যবহার করেছে। নৃবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই হোমো হাবিলিস্‌কে মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন।

হোমো হাবিলিসের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ১৯৬০ সালে আফ্রিকার (দ্র) তানজানিয়া অঞ্চলে। নৃবিজ্ঞানী লুই লিকির পত্নী মেরি লিকি এই ফসিল আবিষ্কার করেন। কেনিয়াসহ পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এদের ফসিল পাওয়া গেছে।

সবচেয়ে প্রাচীন যে হোমো হাবিলিস্ পাওয়া গেছে তা অন্তত পক্ষে উনিশ লক্ষ বছর আগের বলে অনুমিত।

বেশ কিছুটা মানুষের মতো দেখতে অস্ট্রালোপিথেকাস (দ্র) নামক প্রজাতি থেকে হোমো হাবিলিসের উদ্ভব বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। হোমো হাবিলিসের মস্তিষ্ক অস্ট্রালোপিথেকাসের চেয়ে কিছুটা বড়, আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি। হোমো হাবিলিস্‌ই কালক্রমে 'হোমো ইরেক্টুস্'-এ রূপান্তরিত হয় বলে অনেক পণ্ডিতের ধারণা।

সৈ. আ. ই.

হোমস্, শার্লক্ শার্লক্ হোমস্ দ্র

হোয়েল্ডার্লিন্, ফ্রিড্‌রিশ্ [১৭৭০—১৮৪৩]

দক্ষিণ জার্মানিতে সোয়াবিয়া অঞ্চলের লাউফেন্ নামে জায়গায় জার্মান কবি ফ্রিড্‌রিশ্ হোয়েল্ডার্লিন্ (Friedrich Hölderlin) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র দু' বছর বয়সে পিতৃহীন হন। মায়ের কড়া শাসন ও কঠোর নৈতিকতার ভিতরে শৈশব-কৈশোর কেটেছে। মায়ের ইচ্ছা ছিল, পুত্র ধর্মযাজক হবে; এবং শিক্ষালাভের শুরুও হয় সেভাবে। ট্যুবিঙ্গেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র হয়ে পড়তে এসে গভীর বন্ধুত্ব হয় দুই কাব্যরসিক দার্শনিকের সঙ্গে, তাঁদের নাম হেগেল্ (দ্র) ও শেলিং (দ্র)। অচিরেই ধর্মতত্ত্ব পাঠ থেকে মন উঠে গেল হোয়েল্ডার্লিনের। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ, সেই যে কবিতা (দ্র) লেখা শুরু করলেন জীবনব্যাপী তার চর্চা করেছেন।

সারা জীবনই গরিবি হালে দিন কাটিয়েছেন। তাঁর কবিখ্যাতির জন্য ধনাঢ্য বন্ধুবান্ধব ছিল কিছু, কখনো তাঁদের বাড়িতে গৃহশিক্ষকের চাকুরি করেছেন। ১৮০২ সালে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং বাকি চল্লিশ বৎসর তিনি বিষণ্ন, শান্ত প্রকৃতির উন্মাদ হিসাবে বেঁচে ছিলেন।

হোয়েল্ডার্লিন্ ছিলেন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক কবি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মান গীতিকবি। অজস্র গীতিকবিতা ছাড়াও তিনি একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন 'হাইপেরিওন' (Hyperion) নামে এবং 'এম্পেডোক্লেস্' (Empedokles) নামে একটি নাটক শুরু করলেও শেষ করে যেতে পারেন নি।

তিনি চিরকুমার থেকেই মারা যান ট্যুবিঙ্গেনে।

হা. মা.

হোলি দোল দ্র

হোসেন ইমাম হুসাইন (রা), হযরত ইমাম দ্র

হোসেনি দালান ইমামবারা / ইমামবাড়ি দ্র

হ্যাণ্ডবল (handball)

হ্যাণ্ডবল খেলাটির উৎপত্তি হয়েছে ডেনমার্কে। এই খেলাটি ১৮৯৫ সালে দলগতভাবে প্রথম খেলা হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রসার লাভ করে। এই খেলাটি ফুটবল (দ্র) ও বাস্কেট বল (দ্র) খেলার সংমিশ্রণে একটি নতুন খেলা। প্রথম প্রথম অভ্যন্তরীণ খেলা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও পরে বাইরে মাঠের খেলা হিসাবে পরিগণিত হয়। এই খেলার বলটি গোলপোস্টের ক্রসবার অতিক্রম করলেই একটি গোল হয়ে থাকে। বলটিকে বাস্কেট বলের মতো মাটিতে ড্রপ দেওয়া যায়, তবে কখনই লাথি মারা যায় না, হাতে ছুঁড়ে গোল দিতে হয়।

১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে খেলাটির অন্তর্ভুক্তি ঘটে প্রতি দলে ১১ জন খেলোয়াড় নিয়ে। পরে ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে এটিকে একটি অভ্যন্তরীণ খেলা হিসাবে গণ্য করা হয়। তখন থেকে ৭ জনের দল নিয়ে এবং ৫ জন রিজার্ভে অতিরিক্ত খেলোয়াড় নিয়ে মোট ১২ জনের দলগত খেলা হিসাবে এটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক হ্যাণ্ডবল ফেডারেশন

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ৭৫টি জাতি এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই খেলায় পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলি অলিম্পিকে ভাল ফল দেখিয়েছে। ১৯৮২ সালে এশিয়ান গেম্‌সে এই খেলা যুক্ত হয়। এখন বিশ্বব্যাপী পুরুষ ও মহিলাদের হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। গত এক দশকের উপর বাংলাদেশে (দ্র) পুরুষ ও মহিলাদের হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কম খরচে, কম জায়গায় এই খেলাটি বাংলাদেশের জন্য একটি বিনোদনমূলক উপযুক্ত কার্যকরী খেলা।

কা. আ. আ.

হ্যানিম্যান্‌ হানেমান্‌, ক্রিস্টিয়ান্‌ ফ্রিড্‌রিশ্‌ সামুয়েল্‌ দ্র

হ্যামলেট

ইংরেজ নাট্যকার ইউলিয়াম শেক্সপীয়রের (দ্র) বিশ্ববিখ্যাত ট্রাজেডি। প্রথমে আংশিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৬০৩ সালে, পরবর্তী বৎসরে অবশ্য সম্পূর্ণ নাটকটিই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এ সবেরই পূর্বে প্রথমে মঞ্চস্থ হয়েছিল এই নাটক। নাটকের সম্পূর্ণ নাম 'The Tragical History of Hamlet Prince of Denmark.'

কাহিনী অত্যন্ত করুণ ও বিয়োগান্ত। ডেনমার্কের এক রাজা মারা যান। তাঁর এক পুত্র, তাঁরই নাম হ্যামলেট। রাজার মৃত্যুর কিছুকাল পরে রানী গার্ট্রুডকে বিবাহ করে মৃত রাজার ভাই ক্লডিয়াস রাজা হলেন। পরবর্তী রাজা হ্যামলেটই হবেন—এই ঘোষণার পরেও হ্যামলেটের পিতৃশোক প্রশমিত হয় না এবং পিতৃব্যকে মায়ের বিবাহ করার বিষয়টি তাকে চিন্তামুক্ত হতে দেয় না। এমন অবস্থায় এক রাত্রে মৃত রাজার প্রেতাত্মা পুত্র হ্যামলেটকে দর্শন দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে তাঁর মৃত্যু বস্তুতপক্ষে হত্যা এবং ভ্রাতা ক্লডিয়াসই সেই হত্যাকারী। পিতার প্রেতাত্মা পুত্র হ্যামলেটকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে বলেন। ভয়াবহ এই ঘটনায় যুবরাজ হ্যামলেট মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং জগৎসংসার সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস চলে যায়। তাঁর আচরণে রাজার মনে নানা সন্দেহ জাগে এবং তিনি হ্যামলেটের ব্যবহারের পিছনে কারণ খুঁজতে তৎপর হয়ে ওঠেন। বাহ্যত একটা কারণ জানা যায়, তা হল সর্বজ্যেষ্ঠ রাজঅমাত্য পোলোনিয়াসের কন্যা ওফেলিয়া ও

মৃত রাজার প্রেতাত্মা হ্যামলেটকে বলেন—তাঁর মৃত্যুর কারণ হত্যার ষড়যন্ত্র এবং সেই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি পুত্রকে নির্দেশ দেন

হ্যামলেটের প্রেমের বিচ্ছেদ। হ্যামলেট কিন্তু প্রেতাত্মার বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই করে পিতার হত্যার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েই কেবল প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করতে চান। হ্যামলেট রাজদরবারে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে রাজার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইলেন। নাটকে পূর্ববর্তী রাজা অর্থাৎ হ্যামলেটের পিতার যে ভাবে মৃত্যুবরণের কথা প্রেতাত্মা বলেছিল সেভাবে হত্যার একটি দৃশ্য ছিল। রাজা ক্লডিয়াস ঐ দৃশ্য দেখে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেন, হ্যামলেট বুঝতে পারেন যে তাঁর পিতার হত্যাকারী আসলেই রাজা ক্লডিয়াস, এবং রাজাও নিশ্চিত হন যে হ্যামলেট ঘটনাটি জেনে গেছেন। ওদিকে রানী গার্ট্রুডের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার সময়ে হ্যামলেট পর্দার আড়ালে কেউ লুকিয়ে কথা শুনছে বুঝতে পেয়ে সোজা তরবারি চালিয়ে দেন। তাঁর

www.pathagar.com

ধারণা ছিল আড়ি পেতে রাজা কথা শুনছিলেন। আসলে সেখানে ছিলেন ওফেলিয়ার পিতা পোলোনিয়াস এবং তিনিই ভুলক্রমে মারা গেলেন।

এখন থেকে রাজার উদ্দেশ্য হল হ্যামলেটের মৃত্যু ঘটানো। তিনি অতঃপর একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে হ্যামলেটকে ইংল্যাণ্ড প্রেরণ করেন, কিন্তু সেখানে যাতে তাঁকে মেরে ফেলা হয় তার ব্যবস্থাও তিনি করে রাখেন। যুবরাজ কিন্তু ইংল্যাণ্ড পৌঁছতে পারেন না। পথিমধ্যে জলদস্যুদের হাতে ধরা পড়ে পুনরায় তিনি ডেনমার্কে ফিরে আসেন। এসে দেখেন ওফেলিয়া জলে ডুবে মারা গেছে। ওফেলিয়ার ভাই লেয়ার্টেস সরাসরি পিতৃহত্যা ও পরোক্ষে ভগ্নীহত্যার জন্য হ্যামলেটকে দায়ী করে। রাজা তখন উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন করেন। গোপনে লেয়ার্টেসের তরবারিতে বিষ মাখিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন যাতে সামান্য আঘাত পেলেও বিষক্রিয়ায় হ্যামলেট মৃত্যুমুখে ঢলে পড়েন। কিন্তু দৈববশে কোনো আঘাত না পেয়ে যদি হ্যামলেট জয়ী হন তা হলেও অসিযুদ্ধে বিজয়ী হ্যামলেটকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য যে পানাহারের আয়োজন থাকবে সেখানে পানপাত্রে বিষ মিশিয়ে রাখলেন রাজা। দ্বন্দ্বযুদ্ধে হ্যামলেট ও লেয়ার্টেস উভয়েই পরস্পরকে আঘাত করে, লেয়ার্টেস আঘাতের কারণেই ক্রমশ মৃত্যুর দিকে যেতে থাকে, হ্যামলেটের আঘাত বেশি না হলেও বিষক্রিয়ায় তাঁর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ওদিকে রাণী তাঁর সন্তান হ্যামলেটের জন্য পানপাত্রে মেশানো বিষের কথা জানতে পেরে সেই পানীয় নিজেই সবটুকু পান করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। হ্যামলেট তখন প্রবল বিক্রমে রাজাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। এইভাবে কেউই আর শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকে না।

বাংলাসহ পৃথিবীর সকল বিখ্যাত ভাষাতেই হ্যামলেটের অনুবাদ আছে। প্রায় সব দেশেই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। চলচ্চিত্রও তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দেশে।

হা. মা.

হ্যারিকেন হারিকেন দ্র

হ্যালহেড্, ন্যাথানিয়াল ব্র্যাসি [১৭৫১—১৮৩০]

প্রাচ্যবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক ও বাংলা ব্যাকরণ-প্রণেতা হ্যালহেড্ (Nathaniel Brassey Halhed) জন্মেছিলেন লণ্ডনে (দ্র) ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে। পিতা উইলিয়াম হ্যালহেড্ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন। পিতা-মাতা উভয় দিক থেকেই হ্যালহেড্ অভিজাত ও উচ্চবংশীয় ছিলেন।

বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ হ্যালহেড্ অক্সফোর্ডের হ্যারো ও ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে ধ্রুপদী শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে রাইটার হিসাবে বাংলাদেশে আসেন ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। এখানে এসে তিনি বাংলা শেখেন। ছাত্রাবস্থায় অক্সফোর্ডে উইলিয়াম জোন্সের (দ্র) সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এবং তাঁর পরামর্শে আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত হয়েছিলেন।

এ দেশে এসে বড়লাট ওয়ারেন্ হেস্টিংসের (দ্র) নির্দেশে ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে 'এ কোড অব জেণ্টু লজ' (A Code of Gentoo Laws) নামে হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন। পরে ১৭৭৮ সালে 'A Grammar of the Bengal Language' প্রকাশ করেন ইংরেজি ভাষায়। এই ব্যাকরণেই সর্বপ্রথম বাংলা হরফ মুদ্রিত হয়েছিল, ছাপা হয়েছিল হুগলিতে।

১৭৮৫ সালে তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন। ৭৮ বৎসর বয়সে ১৮৩০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে তিনি পরলোক গমন করেন।

হা. মা.

হ্যালি, এড্মণ্ড ধূমকেতু দ্র

হ্রদ

প্রাকৃতিক কারণে যেমন, ভূপৃষ্ঠের স্বাভাবিক অসমতা, ভূ-আন্দোলন, ভূমিকম্প (দ্র), নদীর পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া, হিমবাহের (দ্র) প্রবাহ, আগ্নেয়গিরির (দ্র) অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি কারণে পৃথিবীর স্থলভাগের কোনো অংশ নিচু হয়ে ছোট-বড় নানা ধরনের গর্তের সৃষ্টি হয়। পানিতে (দ্র) পূর্ণ এই সব নিচু অংশ বা গর্তকে হ্রদ বলা হয়। হ্রদসমূহকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—সুপেয় বা মিঠা পানির হ্রদ ও লবণাক্ত পানির হ্রদ। লবণাক্ত পানির হ্রদ সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত বেশি। বরফাচ্ছন্ন উচ্চ পর্বত বা শীতপ্রধান দেশে হ্রদের মধ্য দিয়ে বহু নদী প্রবাহিত অঞ্চলের এবং অত্যধিক বৃষ্টিযুক্ত

www.pathagar.com

বিষুব অঞ্চলে মিঠা পানির হ্রদ দেখা যায়। সুস্বাদু পানির হ্রদগুলোর মধ্যে সাইবেরিয়ার বৈকাল, তিব্বতের (দ্র) মানস সরোবর (দ্র), কাশ্মীরের উলার, উত্তর আমেরিকার (দ্র) সুপিরিয়র, সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

উষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত স্থানগুলোতে, পূর্বে সমুদ্রের অংশ ছিল এমন জায়গায় (যেমন কাস্পিয়ান সাগর) সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল এমন স্থানে (যেমন চিল্কা হ্রদ), এবং যেসব স্থানে নদী (দ্র) এসে পতিত হয় কিন্তু বের হতে পারে না (যেমন আরল সাগর) সেসব স্থানে লবণাক্ত পানির হ্রদ দেখা যায়।

আয়তন হিসাবে কাস্পিয়ান সাগর পৃথিবীর বৃহত্তম লবণাক্ত পানির হ্রদ। উত্তর আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদ পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাদু পানির হ্রদ। সাইবেরিয়ায় অবস্থিত বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ (গভীরতা প্রায় ১,৬০০ মিটার)। দক্ষিণ আমেরিকার টি টি কাকা হ্রদ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে (প্রায় ৪,৩০০ মিটার উচ্চতায়) অবস্থিত হ্রদ। ইসরায়েল ও জর্দানের মধ্যবর্তী মরুসাগর পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ৪৩৫ মিটার নিচে অবস্থিত হ্রদ।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য হ্রদের মধ্যে কাস্পিয়ান সাগর আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম, বাংলাদেশের (দ্র) প্রায় তিন গুণ বড়। এরপর আয়তনের ক্রম অনুসারে সুপিরিয়র (উত্তর আমেরিকা), ভিক্টোরিয়া (আফ্রিকা), আরল (এশিয়া), হিউরন ও মিশিগান (উত্তর আমেরিকা), নিয়াসা (আফ্রিকা), টাঙ্গানিকা (আফ্রিকা), বৈকাল (এশিয়া), গ্রেট বিয়ার (উত্তর আমেরিকা) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট হ্রদ।

মু. এ.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

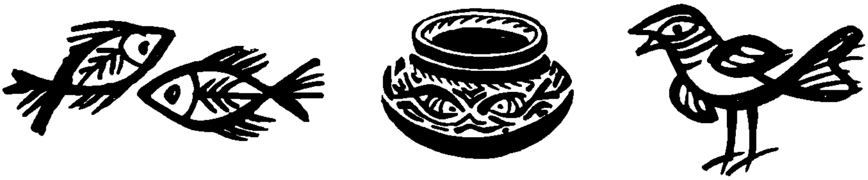

অজিতকুমার গুহ [১৯১৪—১৯৬৯]

বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও লেখক। জন্ম সুপারি-বাগান, কুমিল্লা শহর, ১৫ই এপ্রিল ১৯১৪ সাল। কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা থেকে ১৯৩০ সালে ম্যাট্রিক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৩২ সালে আই.এ. ও ১৯৩৪ সালে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) ভর্তি ও ১৯৩৯ সালে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি লাভ। এর পর বি.টি. অধ্যয়ন ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪০-'৪২ সালে শান্তিনিকেতনে (দ্র) বাস ও রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৯৪২ সাল থেকে ঢাকার প্রিয়নাথ হাইস্কুলে প্রায় ৬ বৎসর শিক্ষকতা করেন। এর পর ১৯৪৮ সালে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। সুবক্তা ও আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার ফলে ১৯৫৭-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) বাংলা বিভাগে তাঁকে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ দান করা হয়। জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানরূপে ১৯৬৮ সালের ৩১শে জুলাই অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দায়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারিতে তিনি গ্রেফতার হন। প্রায় দেড় বছর কারাভোগের পর মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৪ সালে ৩০শে মে ৯২-ক ধারা জারি হলে পুনরায় গ্রেফতার হন এবং এক বছর কারা নির্যাতন ভোগ করেন। অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিচর্চার ধারা নির্মিতিতে তাঁর অবদান ও সাফল্য অপরিসীম। রবীন্দ্রসাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। রবীন্দ্রসাহিত্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতিবিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এসব রচনায় তাঁর প্রজ্ঞা ও মননশীলতার পরিচয় মেলে।

www.pathagar.com

মূল্যবান ভূমিকাসহ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। 'মেঘদূত', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'গল্পগুচ্ছ', সোনার তরী' ও 'গীতাঞ্জলি' তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ। মার্জিত ও পরিশীলিত রুচি, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শ শিক্ষক ও দেশপ্রেমে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে তিনি সমকালে অর্জন করেছিলেন অজস্র মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। ১৯৬৯ সালের ১২ই নভেম্বর কুমিল্লার সুপারি বাগানে তাঁর মৃত্যু হয়।

বি. ব.

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ [১৯১১—১৯৮৬]

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। ১৯১১ সালের ৮ই মে তারিখে ফরিদপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবু নয়ীম মুহম্মদ বজলুর রশীদ। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে তিনি ১৯২৮ সালে ম্যাট্রিক, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে আই.এ. এবং ১৯৩৩ সালে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বি.টি. পাশ করেন। ১৯৫৪ সালে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৮—১৯৫৯ সালে আমেরিকার নিউ জার্সি স্টেটের বার্গাস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।

১৯৩৪ সালে ঢাকার মুসলিম গভর্নমেন্ট স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এই স্কুলে ছয় বছর শিক্ষকতার পর জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে দুই বছর (১৯৩৯—১৯৪২) ও ঢাকার আরমানিটোলা গভর্নমেন্ট স্কুলে বারো বছর (১৯৪২-১৯৫৫) শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের লেকচারার পদে যোগ দেন। ১৯৬৪ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৭২ সালে এখান থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ধ্বনি-বিজ্ঞানের খণ্ডকালীন অধ্যাপক ও ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ধ্বনিবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন।

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শ-অনুসারী ছিলেন। কর্মজীবনে শিক্ষকতার পাশাপাশি আ.ন.ম. বজলুর রশীদ আজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। কবিতা (দ্র), নাটক (দ্র), উপন্যাস (দ্র), প্রবন্ধ (দ্র), ও গান সবক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ লক্ষণীয়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলি হল—কাব্য: 'পান্থবীণা' (১৯৪৭), 'মরুসূর্য' (১৯৬০), 'শীতে বসন্তে' (১৯৬৭), 'রঙ ও রেখা' (১৯৬৯), 'এক ঝাঁক পাখি' (১৯৬৯), 'মৌসুমী মন' (১৯৭০), 'মেঘ বেহাগ' (১৯৭১), 'রক্তকমল' (১৯৭২); নাটক: 'ঝড়ের পাখি' (১৯৫৯), 'যা হতে পারে' (১৯৬২), 'উত্তরফাল্গুনী' (১৯৬৪), 'সংযুক্তা' (১৯৬৫), 'ত্রিমাত্রিক' (১৯৬৬), 'শিলা ও শৈলী' (১৯৬৭), 'সুর ও ছন্দ' (১৯৬৭), 'উত্তরণ' (১৯৬৯), 'রূপান্তর' (১৯৭০), 'একে একে এক' (১৯৭৬), 'ধানকমল' (১৯৭৬); উপন্যাস : 'পথের ডাল' (১৯৪৯), 'অন্তরাল (১৯৫৮), 'মনে মনান্তরে' (১৯৬২), 'নীলদিগন্ত' (১৯৬৭); ভ্রমণকাহিনী : 'দ্বিতীয় পৃথিবীতে' (১৯৬০), 'পথ বেঁধে দিল' (১৯৬০), 'দুই সাগরের দেশে' (১৯৬৭), 'পথ ও পৃথিবী' (১৯৬৭), প্রবন্ধ : 'আমাদের নবী' (১৯৪৬), 'আমাদের কবি' (১৯৫১); 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১), 'জীবন বিচিত্রা' (১৯৬২), 'পাকিস্তানের সুফী সাধক' (১৯৬৫), 'স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষণ' (১৯৬৯), 'ইসলামের ইতিবৃত্ত' (১৯৭২), 'জীবনবাদী রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭২)। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যাপক হিসাবে তিনি শিক্ষকদের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানোর প্রতি আগ্রহী ছিলেন, তিনি একটি উচ্চারণ অভিধানও প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি নাট্যসাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

১৯৮৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস [১৯৪৩—১৯৯৭]

কথাসাহিত্যিক। ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারিতে মাতুলালয় গাইবান্ধার গোটিয়াগ্রামে জন্ম। পৈতৃক নিবাস বগুড়া শহরে। পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার চন্দনবাইশা গ্রামে। পিতা মুসলিম লীগ দলীয় সাবেক পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য (১৯৪৭-১৯৫৩ খ্রি.) বদিউজ্জামান, মাতা মরিয়ম। বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৫৮) ও ঢাকা কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৬০) পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বাংলায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে বি.এ. অনার্স (১৯৬৩) ও একই বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ. (১৯৬৪) ডিগ্রি লাভ। ১৯৬৫ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাংলার লেকচারার হিসাবে শিক্ষকতা শুরু করেন। তারপর যথাক্রমে জগন্নাথ কলেজ, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ঢাকা কলেজে চাকুরিরত ছিলেন।

সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস-সচেতন এক জন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক। সমাজে অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ হল— গল্প : 'অন্যঘরে অন্যস্বর' (১৯৭৬), 'খোঁয়ারি' (১৯৮২), 'দুধভাতে উৎপাত' (১৯৮৫), 'দোজখের ওম' (১৯৮৯); উপন্যাস : 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭), ও 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬)। 'খোয়াবনামা' তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হিসাবে বিবেচিত। এই মহৎ উপন্যাসে গ্রাম- বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান উপস্থাপিত হয়েছে। সাহিত্যকৃতির জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন ১৯৮২ সালে। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের জন্য তিনি প্রফুল্লকুমার সরকার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার ১৪০৩ বঙ্গাব্দ লাভ করেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসাবে তিনি ১৯৯৫ সালে সাদত আলী আকন্দ পুরস্কার লাভ করেন। প্রগতিশীল শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন ছিল। তিনি লেখক শিবিরের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে জড়িত ছিলেন।

দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে তাঁর জীবনাবসান হয়। ১৯৯৬ সালের ২০শে মার্চ কলিকাতা— যোধপুর পার্কের এক ক্লিনিকে তার ডান পা কেটে বাদ দেওয়া হয়। ১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি সকাল ৬.৩০ মিনিটে মালীবাগস্থ ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বি. ব.

আজিজুর রহমান মল্লিক [১৯১৮—১৯৯৭]

ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক ও গবেষক। এ. আর. মল্লিক নামে সমধিক পরিচিত। জন্ম ঢাকার অদূরে ধামরাই অঞ্চলে রাজাপুর গ্রামে, ১৯১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে। পিতার নাম ইসমাইল মল্লিক, ভারতীয় শুল্ক বিভাগে রেঙ্গুনস্থ অফিসের কর্মচারী ছিলেন। মায়ের নাম সাজেদা খাতুন।

শিক্ষাজীবনের শুরু গ্রামে। মানিকগঞ্জ মডেল স্কুল থেকে ১৯৩৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন ও পরে ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ. ১৯৩৬ সালে। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ইতিহাসে বি.এ. অনার্স পাশ করেন ১৯৩৯ সালে এবং ১৯৪০ সালে একই বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। চাকুরি জীবনে শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেন। ১৯৪১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে যোগ দেন, কিন্তু পরে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে রাজশাহী সরকারি কলেজে ইতিহাসের প্রভাষক পদে যোগ দেন। ১৯৫১ সালে

www.pathagar.com

গবেষণা করার লক্ষ্যে বিলেত যান এবং 'The Development of the Muslims of Bengal and Bihar (1813-1856) with special reference to their Education' (অর্থাৎ ১৮১৩-'৫৬ সময়পরিধিতে বঙ্গদেশ ও বিহারে মুসলমানদের বিকাশ, বিশেষত শিক্ষার ক্ষেত্রে) নামে গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনা করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৩ সালে। দেশে ফিরে এসে ১৯৫৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ অবধি নির্মীয়মান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) প্রকল্প পরিচালক ছিলেন, পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হন ১৯৬৮ সালে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) পূর্বে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দেশে গণহত্যা শুরু করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ও সঙ্গীসাথীদের নিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন (এপ্রিল ১৯৭১) এবং সেখানে 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব ইন্টেলিজেন্‌শিয়া' গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন; তিনি এর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য, বিবৃতি ও আলোচনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত হন। পরে ভারতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবেও দায়িত্ব পারন করেন। ১৯৭৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবেও নিয়োগ লাভ করেন। ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদের আমলেও অর্থমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) অধ্যাপক পদে যোগ দেন ১৯৭৬ সালে এবং অবসরগ্রহণের পর প্রফেসর এমিরেটাস (১৯৮৩) পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।

তিনি দেশের সারস্বত সমাজের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (দ্র)-এর সভাপতি (১৯৮৩-'৮৬), বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির সভাপতি, জাতীয় যাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, বাংলা একাডেমীর (দ্র) ফেলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্ষদের সদস্য, ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান (১৯৮৩-'৯৩)।

তাঁর প্রধান গবেষণামূলক গ্রন্থ 'British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ: 'আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম' (১৯৯৫)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের ইতিহাস বিষয়ক অনেক অজানা তথ্য তাঁর এই আত্মজীবনীমূলক রচনায় স্থান পেয়েছে।

১৯৯৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি হৃদ্‌রোগে (দ্র) আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

হা. মা.

আবদুর রব সেরনিয়াবাত [১৯২১—১৯৭৫]

রাজনীতিবিদ। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৭শে চৈত্র বরিশালের গৌরনদী থানার সরাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভোলা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে এল.এল. বি. পাশ করেন।

ছাত্রজীবন থেকে তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে তিনি গণতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সালের ১২ই মার্চ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে (এন.ডি.এফ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

আবদুর রব সেরনিয়াবাত ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বরিশাল-১

www.pathagar.com

আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালে সূচিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালের ১২ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) নেতৃত্বাধীন সরকারের ভূমি- প্রশাসন, ভূমি-সংস্কার ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭৩ সালের মার্চের নির্বাচনে পুনরায় বরিশাল-১ আসন থেকে জাতীয় সংসদে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালের ৮ই জুলাই থেকে ১৯৭৫ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানিসম্পদ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ৬ই জুন বাকশাল (দ্র) গঠিত হলে তিনি তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে তিনি নিহত হন।

সুজ. ব.

আবু তাহের, কর্নেল [১৯৩৮—১৯৭৬]

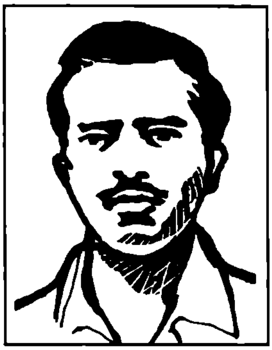

বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ও প্রগতিশীল রাজনীতিক। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য 'বীর উত্তম' খেতাব প্রাপ্ত।

তাঁর পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। জন্মেছিলেন চট্টগ্রামে ১৯৩৮ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখে। ১৯৫৯ সালে সিলেট এম. সি. কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) ভর্তি হয়ে এম.এ. ক্লাসে প্রথম পর্বে এক বৎসর পড়াশোনা করেছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ায় (১৯৬০) অধ্যয়নে ছেদ পড়ে। সেনাবাহিনীতে প্রথমাবধি তিনি যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৬১ সালে কমিশন পদে উন্নীত হন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্পেশাল সার্ভিসে কমাণ্ডো গ্রুপে যোগ দেন। এ সময় পাক-ভারত যুদ্ধে (দ্র) প্রথমে কাশ্মীর ও পরে শিয়ালকোট রণাঙ্গনে বীরত্বের পুরস্কার হিসাবে খেতাব পান। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম সেনানিবাসে দ্বিতীয় কমাণ্ডো ব্যাটেলিয়নে কর্মরত থাকার সময়ে রাজনৈতিক-সামরিক (Politico-Military) প্রশিক্ষণ দানে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৬৯ সালে আমেরিকার (দ্র) ফোর্ট ব্রাগ ও ফোর্ট বেনিং থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উচ্চতর সমরবিদ্যায় অনার্স গ্র্যাজুয়েশন লাভ করেন। ১৯৭০ সালে কোয়েটাতে স্টাফ কলেজে যোগদান ও সিনিয়র টেকনিক্যাল কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিচালিত বাংলাদেশে (তখনকার পূর্ব-পাকিস্তান) নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদে স্টাফ কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং তার ফলে তাঁকে বন্দি হতে হয়। তিন মাস পরে ২৫শে জুলাই অ্যাবোটাবাদ থেকে পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে (দ্র) অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭১-এর ১৪ই নভেম্বর কামালপুর শত্রুঘাঁটিতে আক্রমণ পরিচালনা করার সময় গোলার আঘাতে হাঁটুর উপর থেকে বাম পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হলে বিদেশে চিকিৎসা শেষে (এপ্রিল ১৯৭২) দেশে ফিরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল পদে যোগ দেন। ১৯৭২ সালের জুন মাসে ৪৪তম ব্রিগেডের অধিনায়ক হিসাবে কুমিল্লা সেনানিবাসের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে 'পিপল্‌স্ আর্মি' (People's Army) গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। সরকারের সঙ্গে নীতির প্রশ্নে মতানৈক্য হওয়ায় সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৭২ সালেই। অতঃপর রাজনৈতিক সংগঠন 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে গণবাহিনী গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ড্রেজার সংস্থার পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে ৭ই নভেম্বর 'সিপাহি গণ-অভ্যুত্থান' সংগঠিত করেন ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে তার নেতৃত্ব দান করেন। ঐ মাসেই ২৪শে নভেম্বর তারিখে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন। ১৯৭৬ সালের ১৭ই জুন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁর গোপন বিচার শুরু হয় এবং এক মাস পরেই ১৭ই জুলাই তাঁকে

www.pathagar.com

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে তা কার্যকর করা হয়।

ক্ষুরধার মেধার অধিকারী বিপ্লবী সংগঠক ও অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা রূপে তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

হা. মা.

আবু হেনা মোস্তফা কামাল [১৯৩৬—১৯৮৯]

কবি, গীতিকার, সঙ্গীতত্ত্ব, গবেষক ও শিক্ষাবিদ। জন্ম সিরাজগঞ্জ জেলার গোবিন্দ গ্রামে।

পাবনা জেলা স্কুল থেকে ১৯৫২ সালে ম্যাট্রিক ও ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৪ সালে আই.এ. পাশ করেন। কৈশোর থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন : ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ত্রয়োদশ স্থান ও আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) বাংলা বিভাগে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫৮ সালে বি.এ. অনার্স ও ১৯৫৯ সালে এম.এ. পরীক্ষায়, উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবনে শিক্ষকতাকেই তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ কলেজ ও রাজশাহী সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ পরিদপ্তরে সহকারী পরিচালক হিসাবে প্রায় এক বৎসর কর্মরত ছিলেন। পরে ১৯৬৩ সালে ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে 'Bengali Press and Literary Writings : 1818-1831' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) বাংলা বিভাগে প্রফেসর পদে যোগ দেন এবং ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে চলে আসেন। এই সময় তিনি হাজী মুহম্মদ মহসীন হলের প্রভোস্টের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর (দ্র) মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। প্রায় দেড় বৎসর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮৬ সালের ১১ই মার্চ বাংলা একাডেমীর (দ্র)মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। এখানে কর্মরত অবস্থাতেই হৃদ্‌রোগে (দ্র) আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করেন, ১৯৮৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

জীবদ্দশায় তিনি সুবক্তা, অতুলনীয় বাক্‌কুশলী ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে (দ্র) উপস্থাপক ও আলোচক রূপে তিনি যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলি— কাব্য : 'আপন যৌবন' (১৯৭৪), 'যেহেতু জন্মান্ধ' (১৯৮৪), 'আক্রান্ত গজল' (১৯৮৮); প্রবন্ধ-গবেষণা : 'শিল্পীর রূপান্তর' (১৯৭৫), 'The Bengali Press and Literary Writings' (১৯৭৭), 'কথা ও কবিতা' (১৯৮১)। দেশের সারস্বত সমাজ থেকে প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ বহু সম্মাননা পেয়েছিলেন: আলাওল পুরস্কার (১৯৭৫), সুহৃদ সাহিত্য স্বর্ণপদক (১৯৮৬), একুশের পদক (১৯৮৭), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্বর্ণপদক (১৯৮৯), সাদত আলী আকন্দ স্মৃতিপুরস্কার (১৯৯১)।

হা. মা.

আবুল কাশেম, প্রিন্সিপাল [১৯২০—১৯৯১]

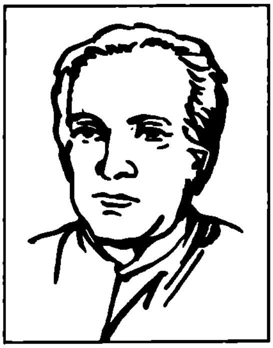

ভাষা-আন্দোলনে (দ্র) তাঁর স্মরণীয় অবদানের জন্য 'ভাষা-সৈনিক' হিসাবে খ্যাত, এ ছাড়া তিনি প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম নামেও পরিচিত। ১৯২০ সালে ২৮শে জুন ছেদণ্ডী গ্রাম, চন্দনাইশ থানা, চট্টগ্রামে জন্ম। স্থানীয়

www.pathagar.com

বরমা হাই স্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক ও ১৯৪১ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এসসি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ১৯৪৪ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বি.এসসি. (অনার্স) ও একই বিষয়ে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪৫-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ঐ বছর ১৪ই নভেম্বর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সৈনিক' প্রকাশ ও পরিচালনা করেন। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ (৩০শে জানুয়ারি ১৯৫২)-এর অন্যতম সদস্য হিসাবে বাহান্নর ফেব্রুয়ারির ভাষা- আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষাকে কেন রাষ্ট্র ভাষা করতে হবে এ সংক্রান্ত তাঁর রচনা বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'খেলাফতে রাব্বানী পার্টি'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫৪ সালের মার্চে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া-বোয়ালখালী নির্বাচনী এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ছিল আন্তরিক ও কর্মনিষ্ঠ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে ঢাকার মীরপুরে 'বাংলা কলেজ' প্রতিষ্ঠা ও এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রিন্সিপাল (১৯৬২-১৯৮১ খ্রি.) হন। 'আমাদের বাংলা প্রেস' তাঁরই আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী জীবনব্যবস্থার উপর বহু গ্রন্থের প্রণেতা। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (১৯৪৭), 'একমাত্র পথ' (১৯৪৯), 'মুক্তি কোন পথে'(১৯৫২), 'ঘোষণা' (১৯৫২), 'ইসলাম কি দিয়েছে এবং কি দিতে পারে' (১৯৫২), 'বিবর্তনবাদ' (১৯৫২), 'শ্রেণীসংগ্রাম' (১৯৫৩), 'দু'টি প্রশ্ন' (১৯৫৫), 'শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি' (১৯৫৫), 'একুশ দফার রূপায়ণ' (১৯৫৫), 'আধুনিক চিন্তাধারা' (১৯৬৪), 'সংগঠন' (১৯৬৪) ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি।

১৯৯১ সালের ১১ই মার্চ ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বি. ব.

এফ. আর. খান, ডক্টর [১৯২৯—১৯৮২]

বিশ্বখ্যাত বাঙালি স্থপতি। পুরো নাম ফজলুর রহমান খান। তিনি ১৯২৯ সালের ৩রা এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার শিবচর থানার ভাণ্ডারিকান্দিগ্রামে। পিতা শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান। তিনি ১৯৪৪ সালে আরমানিটোলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৬ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে দাঙ্গার কারণে বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকার তৎকালীন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা BUET) পরীক্ষা দিয়ে পুরকৌশলে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এসসি. (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লেকচারার হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

দু'বছর পর ১৯৫৩ সালে এফ. আর. খান ফুলব্রাইট স্কলার রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (Illinois Institute of Technology) -তে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং (Structural Engineering) বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯৫৫ সালে তিনি Theoretical and Applied Mechanics বিষয়ে এম.এস. করেন।

অধ্যয়ন শেষে ১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত

www.pathagar.com

প্রকৌশলী সংস্থা Skidmore Owings and Merill (সংক্ষেপে SOM)-এ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগদান করেন। এই পদে দায়িত্ব পালনকালে ১৯৫৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রাকপীড়নকৃত (Pre-stressed) কংক্রিটের রেলসেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি দেশে ফিরে Karachi Development Authority-তে কিছুদিন চাকুরি করে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান এবং পূর্বতন SOM প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে তাঁর পদোন্নতি হতে হতে ১৯৭০ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানে অংশীদার পদে অধিষ্ঠিত হন। এখানে কর্মরত অবস্থায় ১৯৬০ সালে তিনি Illnois Institute of Technology-তে Adjunct Professor of Architecture পদে নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ পদে নিয়োজিত ছিলেন।

এফ. আর. খান বিশ্বের উচ্চতম ভবনের ডিজাইনার হিসাবে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর উদ্ভাবিত নির্মাণ-পদ্ধতি Tubular System বা নলাকৃতি বিন্যাস নামে খ্যাত।

এফ. আর. খান বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং আমেরিকার সর্বোচ্চ ভবন শিকাগো শহরে অবস্থিত সিয়ার্স টাওয়ার (Sears Tower)-এর নকশা প্রণেতা। ১৯৯৬ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ৪৫০ মিটার উঁচু পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার উদ্বোধন হওয়ার আগে পর্যন্ত সিয়ার্স টাওয়ারই ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন। এর মোট উচ্চতা ৪৪৩ মিটার বা ১৪৫৪ ফুট। তাঁর অন্যান্য স্থাপত্য অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— জন হ্যানকক সেন্টার (১০০ তলা), জেদ্দা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, হজ্ব টার্মিনালের পঞ্চাশ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট বৃহত্তম ছাদ কাঠামো এবং মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য মডেল প্রণয়ন। জেদ্দা বিমানবন্দরের ডিজাইনের জন্য তিনি আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার লাভ করেন।

এফ. আর. খান ১৯৭২ সালে 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ রেকর্ড'-এ তিনি কনস্ট্রাকশান ম্যান অব দ্য ইয়ার বলে আখ্যায়িত। মোট ৪ বার তিনি এই গৌরব লাভ করেন। নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, লি হাই বিশ্ববিদ্যালয় ও সুইস ফেডারেল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে তিনি ১৯৭৩ সালে ও ১৯৮০ সালে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক গগনচুম্বী ভবন ও নগরায়ণ পরিষদের চেয়ারম্যান এবং Studies in Islamic Architecture- এর উপদেষ্টা ছিলেন। মুসলিম স্থাপত্য নিয়ে তিনি নানা ধরনের গবেষণা করেছেন। উঁচু ভবনের ডিজাইন সম্পর্কে International Council of Tall Building and Urban Habitat পাঁচ খণ্ডে যে Monograph প্রকাশ করেছে তার অন্যতম প্রধান সম্পাদক ছিলেন তিনি।

এফ. আর. খান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮২ সালের ২৬শে মার্চ তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

সুজ. ব.

খালেদ মোশাররফ [১৯৩৮—১৯৭৫]

বীর মুক্তিযোদ্ধা, 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত খালেদ মোশাররফের জন্ম জামালপুরের ওসমানপুর থানার অন্তর্গত মোশাররফগঞ্জ গ্রামে, ১৯৩৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে। তাঁর পিতার নাম মোজাম্মেল হোসেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) ইতিহাসে বীরত্ব ও মেধার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৯৫৩ সালে কক্সবাজার থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৫ সালে আই.এ. পাশ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কাকুল মিলিটারি একাডেমীতে চলে যান। ১৯৫৭ সালে কমিশন র‍্যাঙ্ক প্রাপ্ত হন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে (দ্র) ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে রংপুর, মোগলহাট, লালমনিরহাট ও হিলিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর কাকুল মিলিটারি একাডেমীতে ইন্সট্রাক্টর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নাজমা জেসমিন চৌধুরী [১৯৪০—১৯৮৯]

অধ্যাপক, গবেষক, নাট্যকার ও শিশু-সাহিত্যিক। জন্ম কলিকাতা, ১লা ডিসেম্বর ১৯৪০। পৈতৃক নিবাস টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। পিতা গোলাম সারোয়ার গোয়েন্দা পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। মাতা সুলতানা রাজিয়া বেগম। রাজশাহী পি.এন. বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক (১৯৫৫), রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে আই.এ.(১৯৫৭), ঢাকা সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৫৯) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. (১৯৬১) উত্তীর্ণ হন। ঢাকা সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে ১৯৬১-১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলা বিভাগে লেকচারার ছিলেন। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৭৫ সালে চাকুরি ত্যাগ করে বাংলা একাডেমীর বৃত্তিধারী গবেষক হিসাবে 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই অভিসন্দর্ভের জন্য ১৯৭৯ সালে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের বাংলার লেকচারার নিযুক্ত হন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানে কর্তব্যরত ছিলেন।

ঢাকা শিশু-কিশোর নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তিনি 'ঢাকা লিটল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন (১৯৭৮)। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় তাঁর লেখা সমৃদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি : গবেষণা–প্রবন্ধ : 'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি' (১৯৮০), 'সাহিত্যের সামাজিকতা' (১৯৮৫); উপন্যাস : 'সামনে সময়' (১৯৮১), 'ঘরের ছায়া' (১৯৮৪); গল্পগ্রন্থ : 'অন্য নায়ক' (১৯৮৫), 'মেঘ কেটে গেলে' (১৩৮১ ব.)। শিশু-কিশোর রচনা— নাটক : 'ঘুম নেই' (১৯৭৯), 'অন্য রকম অভিযান' (১৯৮১), 'ওরা ছিল বাগানে' (১৯৮৯), 'যেমন খুশি সাজো' (১৯৮৯); উপন্যাস: 'কিশোর সংসপ্তক' (শহীদুল্লা কায়সার রচিত 'সংসপ্তক' বইয়ের কিশোর সংস্করণ) (১৯৮৬); শিশু-কিশোর গল্প : 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৮৭)। এ ছাড়া বেতার, টিভি-তে প্রচারিত এবং অপ্রকাশিত শিশু-কিশোর নাটক ও গল্প আছে ১৩টি। আধুনিক ইনস্টিটিউটে তিনি ছিলেন বাংলা ভাষার শিক্ষক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীদের তিনি বাংলাভাষা শিক্ষাদান করেছেন অত্যন্ত যত্ন সহকারে। বিশ্বে বাংলা ভাষার প্রসারে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৮৭ সালে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ঢাকা ও আমেরিকায় চিকিৎসা হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুর, ১১.৩৫ মিনিটে বিচারপতি লতিফুর রহমানের মিন্টো রোডস্থ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অর্জিত অর্থ ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে 'নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা' নামে একটি বক্তৃতা প্রতি বছর তাঁর স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশের প্রখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তি এতে অংশগ্রহণ করেন।

বি. ব.

নাট্যচর্চা, বাংলাদেশের

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর কলিকাতায় গেরাসিম্ লিয়েবেদেফের (দ্র) প্রযোজনায় বাংলায় রূপান্তরিত 'দ্য ডিজগাইজ' বা 'ছদ্মবেশ' নাটকের অভিনয় হয়। তার ১৫৮ বছর পর ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি মুনীর চৌধুরী (দ্র) হ্যারিকেনের আলোয় নিজের লেখা নাটকের মঞ্চায়ন করেন।

বাংলাদেশের আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সূচনা সেদিন থেকেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীন বাংলার বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির উদ্বোধন হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) পথ ধরে। এ জন্য বাংলাদেশের নাট্যচর্চার উদ্বোধন 'কবর' নাটকের পথ ধরে এগিয়ে গেছে বলা হয়। এর পর ১৯৬২ সালে প্রকাশিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (দ্র) 'তরঙ্গভঙ্গ'কে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি শক্তিশালী পালাবদলকারী রচনা হিসাবে গণ্য করা হয়।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) বাংলা নাট্য-আন্দোলনের নতুন দিক উন্মোচন করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (দ্র)-কে ঘিরে ৩৬ জন নাট্যকারের ৪৯টি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব নাটক '৭১ থেকে '৭৩ সালে রচিত। এসব নাটকের মধ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদের 'নিঃশব্দ যাত্রা' ও নীলিমা ইব্রাহিমের 'যে অরণ্যে আলো নেই' যথার্থ ব্যতিক্রমী নাটক বলে গণ্য করা হয়। এরপর ১৯৭৪ সাল থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে। বাংলাদেশে নাট্যচর্চার পিছনে রাজধানী ঢাকার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের নাট্যকর্মীবৃন্দ খোলা ট্রাকে, খোলা মঞ্চে, বিশাল জনতার উপস্থিতিতে গণ-নাট্যের অভিনয় প্রদর্শন করেন। ১৯৭৩ সালে নিয়মিত দর্শনীর বিনিময়ে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন শুরু করে। বর্তমানে ঢাকায় দু'টি মঞ্চে দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ হয়। মঞ্চ দু'টি— মহিলা সমিতি মঞ্চ ও গাইড হাউস মঞ্চ। চট্টগ্রামে এখন নিয়মিত অভিনয় যে দু'টি হলে হয় তার নাম— স্টুডিও থিয়েটার ও শিল্পকলা একাডেমী।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ৩৮১ জন নাট্যকারের ৬৫৩টি নাটকের হিসাব পাওয়া যায়। এই সময় শিশু-কিশোরদের জন্য নাটক রচিত হয় ৬২টি এবং নাট্যকার হলেন ৩৭ জন।

১৩৮৬ বঙ্গাব্দ থেকে অগ্রণী ব্যাংক প্রবর্তন করে 'অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য ও শিশুনাট্য প্রতিযোগিতা' (দ্র)পুরস্কার। প্রযোজনা (১ম, ২য় ও ৩য়), অভিনয় (১ম, ২য় ও ৩য়), শ্রেষ্ঠ আবহসঙ্গীত, শ্রেষ্ঠ মঞ্চ, শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত ও শ্রেষ্ঠ সাজসজ্জা বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। ফলে ঢাকার শিশু-সংগঠনগুলো এই প্রতিযোগিতায় নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে। এ ছাড়া শিশু নাট্য-সংগঠনগুলো হল— ঢাকা লিটল থিয়েটার, সুবাচন নাট্যগোষ্ঠী, তির্যক লিটল থিয়েটার, ঢাকা শিশু নাট্যম, ঘরে বাইরে নাট্যগোষ্ঠী, কিশোর থিয়েটার, পদাতিক, সমাজ নাট্য ও সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ঢাকার বাইরের শিশু সংগঠনগুলো নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে।

ঢাকা শহরে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনভুক্ত বিভিন্ন

পথ নাটক : 'অচেনা আপন'-এ মমতাজউদদীন আহমদ ও বিপাশা হায়াত। নিচে: অগ্রণী ব্যাংক শিশুনাট্য পুরস্কার, প্রতিযোগিতায় লিটল থিয়েটারের নাটকের একটি দৃশ্য

আন্তিগোনে নাটকের একটি দৃশ্যে খায়রুল আলম সবুজ ও ত্রপা মজুমদার

www.pathagar.com

মামুনুর রশীদ রচিত ও নির্দেশিত নাটকে মামুনুর রশীদ ও মোমেনা চৌধুরী

অগ্রণী ব্যাংক শিশুনাট্য পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রি-ক্যাডেট ইনস্টিটিউটের নাটকের একটি দৃশ্য

নাট্যদলের নামগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলগুলো হল—নাগরিক, থিয়েটার, আরণ্যক, ঢাকা থিয়েটার, পদাতিক, ঢাকা পদাতিক, সময়, মহাকাল, বৈশাখী, দৃষ্টিপাত, ঢাকা নাট্যম, ঢাকা বিবর্তন, ঢাকা নান্দনিক, পাঠশালা নাট্যচক্র, মতিঝিল থিয়েটার, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, দেশ নাটক। থিয়েটার নামে আরো একটি নাট্য দল ঢাকায় আছে।

প্রধান কয়েকটি নাট্যদল-ব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম এখানে উল্লেখ করা হল। নাগরিক— আলী যাকের, আতাউর রহমান, আবুল হায়াত, আসাদুজ্জামান নূর, খালেদ খান, সারা যাকের, নিমা রহমান, বিপাশা হায়াত, আফসানা মিমি প্রমুখ। থিয়েটার (বেইলী রোড)— কবীর চৌধুরী, রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার, আবদুল্লাহ আল মামুন, আবদুল কাদের, ত্রপা মজুমদার প্রমুখ। থিয়েটার (আরামবাগ:ফেডারেশন ভুক্ত নয়)—মমতাজউদদীন আহমদ, কে. এস. ফিরোজ, কেরামত মওলা, আফরোজা বানু, নরেশ ভুঁইয়া, শিল্পী সরকার অপু প্রমুখ। আরণ্যক—মামুনুর রশীদ, নাজমা জামান, মান্নান হীরা, আজিজুল হাকিম, আজাদ আবুল কালাম প্রমুখ। নাট্যচক্র— ম. হামিদ, ফাল্গুনী হামিদ, রেখা আহমেদ, দেবপ্রসাদ দেবনাথ, সাজ্জাদ মাহমুদ প্রমুখ। ঢাকা থিয়েটার— নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, সেলিম আল দীন, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আফজাল হোসেন, সুবর্ণা মোস্তফা, হুমায়ুন ফরিদী, রাইসুল ইসলাম আসাদ, শমী কায়সার, জহির উদ্দীন পিয়ার, শহীদুজ্জামান সেলিম প্রমুখ। ঢাকা পদাতিক— গোলাম কুদ্দুস, জামিল আহমেদ, নাদের চৌধুরী, মৌসুমী, টিসা প্রমুখ। নাট্যকেন্দ্র— তারিক আনাম, তৌকির আহমদ, ঝুনা চৌধুরী প্রমুখ। থিয়েটার (তোপখানা) — খায়রুল আলম সবুজ, আসিফ মুনির, শিরীন বকুল প্রমুখ। ঢাকা নান্দনিক— মাহমেলা হাবীব, অজিত চট্টোপাধ্যায় (সদ্য প্রয়াত), সৈয়দ মহিদুর রহমান, রফিকউল্লাহ সেলিম, লুনা জাবীন, রাইসুল আলম লোটাস প্রমুখ। দেশ নাটক—সালাউদ্দিন লাভলু, শামসুল আলম বকুল, নিশাত প্রমুখ। লোক নাট্যদল (ফেডারেশন ভুক্ত নয়)— লিয়াকত আলী লাকী, সাবরীনা বারী লাকী প্রমুখ। নাগরিক নাট্যদল

www.pathagar.com

(ফেডারেশনভুক্ত নয়) — ড. ইনামুল হক, লাকী ইনাম, জামালউদ্দিন হোসেন, রওশন আরা হোসেন, মাহমুদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ।

১৯৮৮-১৯৮৯ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রদর্শনী সংক্রান্ত তথ্যে সারা দেশে ৪০টি দলের নাম পাওয়া যায়। ঢাকার বাইরে যেসব নাট্যদলের নাম পাওয়া যায় সেগুলো হল— কল্লোল : নরসিংদী; মফঃস্বল নাট্য সম্প্রদায় : টাঙ্গাইল; বৈশাখী : ফরিদপুর; সিরাজউদ্দৌলা : নারায়ণগঞ্জ; অরিন্দম: চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম থিয়েটার : চট্টগ্রাম; সুরমা : সিলেট; দর্পণ: সিলেট; কথাকলি : সিলেট; লক্ষ্মীপুর থিয়েটার : লক্ষ্মীপুর; সংলাপ : ফেনী; সুবচন : ফেনী; তরুণ সম্প্রদায় : সিরাজগঞ্জ, দুর্বার : সিরাজগঞ্জ; বগুড়া থিয়েটার : বগুড়া; বোধন থিয়েটার : কুষ্টিয়া; অনন্যা : কুষ্টিয়া; অনুশীলন : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; মেঘদূত : গাইবান্ধা; রংপুর পদাতিক: রংপুর; কাহালু থিয়েটার: বগুড়া; রূপকার : যশোর; খেয়ালী: বরিশাল; বরিশাল থিয়েটার : বরিশাল।

ঢাকার পরে চট্টগ্রামে গ্রুপ থিয়েটার সমন্বয় পরিষদ সদস্যভুক্ত ২২টি দলের নাম জানা যায়। সেগুলো হল— থিয়েটার '৭৩, তির্যক নাট্যগোষ্ঠী, তির্যক নাট্যদল, গণায়ন, অরিন্দম, অঙ্গন থিয়েটার ইউনিট, প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম থিয়েটার, নান্দীকার, কালপুরুষ, কথক, চট্টল থিয়েটার, প্রতিভাস, মঞ্চমুকুট প্রভৃতি।

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের অষ্টম জাতীয় সম্মেলন হয় ২৩শে জুন ১৯৮৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন স্যুভেনিরে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনভুক্ত ১৩৪টি দলের তালিকা পাওয়া যায়।

মঞ্চ নাটকের পাশাপাশি টেলিভিশন নাটকও বর্তমানে একটি শক্তিশালী শাখা। বাংলাদেশের অভ্যুদয় থেকে টেলিভিশনে অজস্র নাটক অভিনীত হয়েছে। তবে মঞ্চ নাটক ও টেলিভিশন নাটক সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্পমাধ্যম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয় অবলম্বনে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য পথিকৃৎ হয়ে আছে। তাঁর 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের উপর এ যাবৎ রচিত সার্থক নাট্যকর্ম হিসাবে স্বীকৃত।

আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটকের উপজীব্য বিষয় মুক্তিযুদ্ধোত্তর হতাশা, মূল্যবোধের অবক্ষয়। 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়', 'এবার ধরা দাও', 'সেনাপতি', 'এখনো ক্রীতদাস', 'তোমরাই', 'দ্যাশের মানুষ', 'কোকিলারা' ও 'মেরাজ ফকিরের মা' তাঁর বিখ্যাত নাটক।

মামুনুর রশীদ সমাজ সচেতন নাট্যকার। 'ওরা কদম আলী', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'গিনিপিগ', মানুষ', 'পাথর', 'লেবেদেফ', 'জয়জয়ন্তী' তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত নাটক।

সেলিম আল দীন নিরীক্ষাধর্মী নাটক রচনা করে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'সংবাদ কার্টুন', 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি'', 'শকুন্তলা', 'কীত্তনখোলা', 'কেরামত মঙ্গল', 'হাত হদাই', 'চাকা', 'যৈবতী কন্যার মন' তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত নাটক।

মমতাজউদদীন আহমদ হাসি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সংলাপ রচনায়, একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ এবং রূপান্তর নাটক রচনায় বাংলাদেশের এক জন বিশিষ্ট নাট্যকার। তাঁর নাটক 'সাত ঘাটের কানাকড়ি', 'রাক্ষুসী' ইত্যাদি।

স্বাধীনতা উত্তর নাট্যকারদের মধ্যে মান্নান হীরা, এস. এম. সোলায়মান, নাজমুল আহসান, মিলন চৌধুরী, কাজী জাকির হাসান, নিরঞ্জন অধিকারী, আল মনসুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রবীণ নাট্যকারদের মধ্যে সাঈদ আহমদ, আনিস চৌধুরী, জিয়া হায়দার, আবদুল মতিন খান, শেখ আকরাম আলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের মঞ্চ নাটক রচনা, নির্দেশনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে যুগপৎ সাফল্য অর্জন করেছেন মমতাজউদদীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, আলী যাকের।

এ সময়ের কয়েকটি মঞ্চসফল নাটক হল মমতাজউদদীন আহমদের 'সাত ঘাটের কানাকড়ি' ও 'রাক্ষুসী', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' ও 'নূরলদীনের সারা জীবন', 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ', 'ম্যাকবেথ', আবদুল্লাহ আল মামুনের 'তোমরাই', এস. এম. সোলায়মানের 'এদেশে এবেশে', মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী' ও 'জয়জয়ন্তী', নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর 'একাত্তরের

www.pathagar.com

পালা', সেলিম আল দীনের 'কীত্তনখোলা' ও 'কেরামত মঙ্গল', বিপ্লব বালার 'বিষাদ-সিন্ধু' উল্লেখযোগ্য।

বাংলা নাট্যপ্রকাশনার জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৭২ সালে নাট্যসংগঠক ও অভিনেতা রামেন্দু মজুমদারের সম্পাদনায় 'থিয়েটার' পত্রিকা প্রকাশ। পত্রিকাটির প্রকাশনা এখনো অব্যাহত আছে। এ ছাড়া ১৯৭৩ সাল থেকে নিয়মিত দর্শনীর বিনিময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের ধারাও সক্রিয় রয়েছে।

বি. ব.

মমতাজুর রহমান তরফদার [১৯২৮—১৯৯৭]

শিক্ষাবিদ ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। জন্ম বগুড়া জেলার মেঘাগাছা গ্রামে, ১৯২৮ সালের ১ লা আগস্ট তারিখে। পিতার নাম এমাজউদ্দিন তরফদার, মায়ের নাম আকলিমা খাতুন।

১৯৪৫ সালে বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৯৪৭ সালে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। কৃতী ছাত্র ছিলেন, উভয় পরীক্ষাতেই ডিস্টিঙ্কশনসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৪৯ সালে একই কলেজ থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে বি.এ. সম্মান পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯৫১ সালে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

পেশা হিসাবে জীবনে অধ্যাপনাকে বেছে নিয়েছিলেন। শিক্ষকতার শুরু মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে ১৯৫১-'৫৩ সালে, পরে ১৯৫৩ সাল থেকে অবশিষ্ট জীবন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে গেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (দ্র) তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬১ সালে।

শিক্ষকতাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। গবেষণায়ও তাঁর সুনাম ছিল। কৃতি গবেষক হিসাবে তিনি দেশের অভ্যন্তরে প্রশংসিত হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ 'Husain Shahi Bengal : A Socio-Political Study' (১৯৬৫) এবং 'বাংলা রোম্যান্টিক ক্যাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি' (১৯৭১)। এতদ্ব্যতীত তিনি যেসব গ্রন্থে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও গবেষণাপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন সেগুলি হল: 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক' (১৯৮১), 'মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজবিবর্তন' (১৯৯৩), 'Trade, Technology and Society in Medieval Bengal' (১৯৯৫)। সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) পান ১৯৭৭ সালে। তা ছাড়া আমেরিকা (দ্র), ফ্রান্স, কানাডা, জার্মানি, ভারত (দ্র) প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে অধ্যাপনা ও বক্তৃতা দানের জন্য বিভিন্ন সময়ে সাদরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আবদুর রহমানের 'সন্দেশ রাসক'-এর বাংলা রূপান্তর করে তিনি রাসক কাব্যের ঐতিহ্যকে বাংলার পাঠকের কাছে উন্মোচিত করেছেন।

ইতিহাসবিদ হিসাবে দেশে ও বিদেশে প্রভূত সম্মান অর্জন করলেও তাঁর আগ্রহ ছিল কাব্যচর্চার প্রতি। তিনি অবসর সময়ে কবিতা লিখতেন। 'চতুষ্ক' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ আছে তাঁর।

'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ' প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তিনি ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেও সুনাম অর্জন করেছেন। এ পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চা প্রসার লাভ করে। বাংলাদেশে ইতিহাসচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহর একান্ত নিষ্ঠাবান ছাত্র এই বিদগ্ধ পণ্ডিত ১৯৯৭ সালের ৩০শে জুলাই রাত্রে আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন।

হা. মা.

মাহমুদুন্নবী [১৯৪০—১৯৯০]

সঙ্গীতশিল্পী। ১৯৪০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বর্ধমানের কেতু

www.pathagar.com

গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পিতার সঙ্গে পূর্ববঙ্গে আসেন। পিতার কর্মস্থল ফরিদপুরেই তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে গোপনে চট্টগ্রাম চলে যান। কিছুকাল পর ঢাকা এসে ইসলামপুরে জনৈক ওস্তাদের নিকট সঙ্গীতে তালিম গ্রহণ করেন। তারপর করাচি চলে যান।

করাচি বেতার কেন্দ্র থেকে আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা 'পথে যেতে দেখি আমি যারে' গানটি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মাহমুদুন্নবী কণ্ঠশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর নিয়মিত গান পরিবেশন করে তিনি পরিচিতি অর্জন করেন। করাচি থেকে ৮টি গান সংবলিত তাঁর একটি লং প্লে রেকর্ড প্রকাশিত হয়।

১৯৬৩ সালে মাহমুদুন্নবী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকা বেতারের নিয়মিত শিল্পী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। 'প্রেমের নাম বেদনা', 'আমি ছন্দহারা এক নদীর মতো ছুটে যাই', 'তুমি যে আমার কবিতা', 'গানের খাতায় স্বরলিপি', 'আমি সাত সাগর পাড়ি দিয়ে', 'তুমি কখন এসে দাঁড়িয়েছ', 'সালাম পৃথিবী সালাম', 'ও মেয়ের নাম দেব কি ভাবি শুধু তাই' ইত্যাদি গানে কণ্ঠ দিয়ে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বেতারের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের গানেও তিনি কণ্ঠ দিয়ে থাকতেন। তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনায় নির্মিত উল্লেখযোগ্য ছায়াছবিগুলো হল —'জংলী ফুল', 'কাগজের নৌকা', 'আলো তুমি আলেয়া', 'হীরামন', 'বেহুলা', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'চাওয়া পাওয়া', 'সমাপ্তি', 'স্বরলিপি', 'আবির্ভাব', 'নীল আকাশের নীচে', 'নাচের পুতুল', 'দর্পচূর্ণ', 'ছন্দ হারিয়ে গেল' ইত্যাদি।

মাহমুদুন্নবী ষাটের দশকে পূর্ব-বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে 'এই পথ, এই কালো পথ' ইত্যাদি দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি মুক্তিকামী মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। তরুণ প্রজন্মের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সামিনা চৌধুরী ও ফাহমিদা চৌধুরী তাঁর কন্যা। ১৯৯০ সালের ২০শে ডিসেম্বর তিনি ঢাকার সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

রণেশ দাশগুপ্ত [১৯১২—১৯৯৭]

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মী ও দেশের স্মরণীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। জন্ম ১৫ই জানুয়ারি ১৯১২ সাল। পিতা অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছিলেন। কাকা নিবারণ দাশগুপ্ত ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ও পেশায় শিক্ষক। আরেক কাকা ছিলেন গান্ধীবাদী স্বদেশী। পারিবারিক পরিমণ্ডল এমন হওয়ার ফলে ছোটবেলা থেকেই দেশ, পরাধীনতা, ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতি ইত্যাদির সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল এবং পরবর্তী জীবনে এই রাজনৈতিক সচেতনতা তাঁকে চালনা করেছিল। ১৯২৯ সালের রাঁচির (বিহার) স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বাঁকুড়ার কলেজে ভর্তি হন। এ সময়ে অনুশীলন দলের (দ্র) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে ও তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বাঁকুড়া কলেজ থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হলে তিনি কলিকাতায় (দ্র) এসে সিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পুলিশের উৎপাতে লেখাপড়ায় বিঘ্ন হওয়ায় বরিশালে এসে ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন। থাকতেন তাঁর মাতুল সত্যানন্দ দাশের বাড়িতে, ইনি কবি জীবনানন্দ দাশের (দ্র) পিতা। ১৯৩৪ সালে তাঁর পিতা অবসর গ্রহণ করলে মুন্সীগঞ্জের লৌহজঙ্গে গাউরদিয়া গ্রামে পৈতৃক বাড়িতে সকলে বসবাস করতে শুরু করেন, পরে ঐ গ্রাম পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তখন সকলে ঢাকা শহরে চলে আসেন এবং সংসার চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে রণেশ দাশগুপ্তকে সাংবাদিকতার চাকুরি নিতে হয়। তখনকার

www.pathagar.com

বিখ্যাত পত্রিকা 'সোনার বাংলা'য় সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে তাঁর লেখক-জীবনও শুরু হয়। সেকালের ঢাকা সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ (দ্র), অচ্যুত গোস্বামী, কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখের বন্ধুত্ব লাভ করেন ও নানা রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত হন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর রাজনৈতিক কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। গোটা পাকিস্তানি আমলে তিনি বহুবার কারাবাস করেছেন। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) সময়ে তিনি জেলে ছিলেন এবং সেখানেই তিনি নাট্যকার মুনীর চৌধুরীকে (দ্র) 'কবর' নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, 'কবর' নাটকটি তাঁদের চেষ্টায় কারাগারে মঞ্চস্থ হতে পেরেছিল।

কারামুক্তির পর ১৯৫৫ সালে তিনি 'সংবাদ' পত্রিকায় সাংবাদিকতার চাকুরি গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাকে ব্যাপক অর্থে প্রগতির মুখপত্র করে তুলতে তাঁর অবদান ছিল বিরাট। তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ঘটে এ সময়েই, 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' (১৯৫৯) নামে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ রচনার জন্য। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালনের সময়ে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়, ১৯৬২ সালে ছাড়া পান, আবার কারারুদ্ধ করা হয় ১৯৬৫ সালে, ছাড়া পান '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের (দ্র) সুবাদে। মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন, দেশ স্বাধীন হলে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৫ সালের ১লা নভেম্বর কলিকাতায় একটি সভায় যোগ দিতে গিয়ে সেখানে থেকে যেতে বাধ্য হন, কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে (দ্র) সপরিবারে হত্যার পর দেশে সামরিক শাসন চালু হয়েছিল। তারপর বাংলাদেশ নানা বিপর্যয় ও উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। তিনি আর ফিরে আসেন নি, স্বেচ্ছানির্বাসিতের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। অবশেষে পরিণত বয়সে ১৯৯৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর কলিকাতার পি.জি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অকৃতদার ছিলেন তিনি। নিরভিমান ও ঋষিতুল্য উদার স্বভাবের এই মানুষটির মরদেহ সকলের ইচ্ছায় ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে পোস্তগোলা শ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

তিনি বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজি ও উর্দু ভাষা (দ্র) উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের অধিকাংশই মননশীল প্রবন্ধ ও অনুবাদের। প্রবন্ধগ্রন্থ : 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' (১৩৬৬), 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' (১৩৭৩), 'ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম' (১৯৭২ খ্রি.), 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা '(১৯৭০), 'আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ' ইত্যাদি। অনুবাদ : 'ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা' (১৯৬৯)। সম্পাদনা : জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র'।

হা. মা.

শেখ ফজলুল হক মণি [১৯৩৯— ১৯৭৫]

রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। ১৯৩৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা নবকুমার ইনস্টিটিউট থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫৮ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ., ১৯৬০ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ও আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত শেখ মণি ১৯৬০-'৬৩ অবধি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনসহ বিভিন্ন ছাত্র-আন্দোলন, শিক্ষা-আন্দোলন ও উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে (দ্র) বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭০ সালের ১১ই জানুয়ারি তাঁর উদ্যোগে সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) অন্যতম সংগঠক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স

www.pathagar.com

(বি.এল.এফ.) বা 'মুজিব বাহিনী'গঠিত হয়। তিনি ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত মুজিববাহিনীর পূর্বাঞ্চল সেক্টরের কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী' পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ই নভেম্বর তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি এর প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালের ৭ই জুন তাঁর সম্পাদনায় দৈনিক 'বাংলাদেশ টাইমস' প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালে বাকশাল (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেনা বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে তিনি ঢাকায় নিহত হন।

সুজ. ব.

সমরেশ বসু [১৯২৪—১৯৮৮]

সাহিত্যিক। অসংখ্য স্মরণীয় গল্পের স্রষ্টা, বিচিত্র স্বাদের বহু উপন্যাসের (দ্র) জনক। ১৯২৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর, বিক্রমপুরে, রাজানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পুরনো ঢাকার সূত্রাপুরে বাল্যজীবন কাটে। ঢাকার গ্র্যাজুয়েট স্কুলে কয়েক ক্লাস পর্যন্ত পড়েন এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুলে ভর্তি হন। ৮ম শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রমোশন না পেয়ে ১৯৩৯ সালে স্কুল ত্যাগ করেন। এর পর জীবনসংগ্রাম শুরু হয়। পোলট্রি ফার্মের ডিম, মুরগি, সবজি বিক্রি করে, চটকলের বড় কর্তাদের মেমসাহেবদের ছবি এঁকে, বস্তিতে থেকে দিন কাটাতে থাকেন। এ সময় সত্যপ্রসন্ন দাশের (মাস্টার মশাই) সান্নিধ্যে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান এবং চটকল এলাকায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গৌরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে নিজের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে গ্রেফতার ও কারাবরণ করেন। ১৯৫১ সালে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। মুচলেকা দিতে অস্বীকার করায় চাকুরি ফিরে পান নি। এরপর কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সাহিত্যচর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের এক জন বিখ্যাত রূপকার। ছোটগল্প (দ্র) রচনায়ও বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। সাধারণ মানুষের জীবনের নিখুঁত রূপকার হিসাবে খ্যাত। গ্রাম, নগর, কারখানা, তীর্থ, মেলা, নদী ও সমুদ্রের পটভূমিতে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'নয়নপুরের মাটি' ২১ বছর বয়সে লেখা প্রথম উপন্যাস। 'উত্তরঙ্গ' বই আকারে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ. 'আদাব' (১৯৪৬ খ্রি.) পরিচয় পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম গল্প।

তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসে নিঃসঙ্গ মানুষের একক সংগ্রামের আলেখ্য রূপায়িত। মেলার মধ্যেও মানুষ একা—এই উপাখ্যানেই উপস্থাপন করেছেন গ্রাম, নগর, তীর্থ, নদী ও সমুদ্রের পটভূমিতে। 'বিটি রোডের ধারে' (১৯৫৩), 'শ্রীমতী কাফে' (১৯৫৪), 'গঙ্গা (১৯৫৫), 'যুগ যুগ জিয়ে' (১৩৮৮). 'বিবর' (১৯৬৫), 'মানুষ', 'বাঘিনী', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'পুনর্যাত্রা' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মানুষের শাশ্বত বেদনা, গ্লানি, মানুষ হবার দায় এবং সঙ্কল্প তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। প্রজাপতি (১৯৬৭) উপন্যাসে অশ্লীলতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বলে এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। আদালত রায় দিয়েছিল যে বইটিতে অশ্লীল কিছু নেই।

সমরেশ বসু নামটি বন্ধু শ্রীদেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া। আরেকটি ছদ্মনাম 'কালকূট'। এই ছদ্মনামে লেখা তার 'শাম্ব' উপন্যাস এবং সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের জন্য সাহিত্য অকাদমী পুরস্কার (১৯৮০) লাভ করেন। কালকূটের নামে লেখা 'কোথায় পাব তারে' (১৯৬৮), 'তুষার সিংহের পদতলে', 'অমাবস্যার চাঁদের পদতলে', 'অমৃত বিষের পাত্র' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'গঙ্গা' উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার (১৯৫৫) লাভ করেন। মৃত্যু কলিকাতা, ১২ই মার্চ ১৯৮৮।

বি. ব.

www.pathagar.com

সাতই মার্চ

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চে রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের জন্য দিনটি বাংলাদেশের জনগণের কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ (দ্র) বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও তাদের সরকার গঠন করতে দেওয়া হয় নি। ১লা মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খানের ভাষণের প্রতিক্রিয়া হল খুব দ্রুত। ঢাকা পরিণত হল মিছিলের নগরীতে। ঐ দিন পূর্বাণী হোটেলে জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু মঙ্গলবার ঢাকা শহরে হরতাল, বুধবার সারা দেশে হরতাল এবং ৭ই মার্চ রেসকোর্সে (বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) জনসভার কথা ঘোষণা করেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বিকাল ৩.২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের বিশাল জনসমাবেশে এক অসাধারণ ভাষণে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির পথ নির্দেশ করেন। ঐ ভাষণে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন :

[বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ]

"ভাইয়েরা আমার,

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়।

"কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে– আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশ আমরা গড়ে তুলব। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, তেইশ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

"১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল-ল' জারি করে ১০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন— আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হল। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম– ঠিক আছে আমরা এসেমব্লিতে বসব। আমি বললাম— এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করব। এমনকি এ পর্যন্ত বললাম— যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

"জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতাবৃন্দের সঙ্গে আমরা আলাপ করলাম— আপনারা আসুন, বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের

www.pathagar.com

মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে, তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তা হলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে, তারপরে হঠাৎ মার্চের ১লা তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হল।

"ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল। দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হল আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পরে এ দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল।

"আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।

"কী পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে— তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু— আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

"টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম— জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

"আমি তো অনেক আগেই বলেছি— কিসের আর.টি.সি.? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

"ভাইয়েরা আমার,

"২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আর.টি.সি.-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল-ল 'উইথড্র' করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যে ভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারব কি পারব না? এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

"আমি, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট ও সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজ কোর্ট, সেমিগভর্নমেন্ট দপ্তরগুলি, ওয়াপদা- কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়— তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু— আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

"আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই। তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি— তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না।

"আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যাঁরা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে

www.pathagar.com

সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশ মুক্ত না হবে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল। —কেউ দেবেন না। শোনেন— মনে রাখবেন। শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুঠতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

"মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারিরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দু'ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব-বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব-বাংলায় চলবে এবং বিদেশে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।

"কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা।

"রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব— এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ সম্প্রচারের ব্যবস্থা ঢাকা বেতার কেন্দ্র করেছিল। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের দরুন তা বাতিল হয়ে যায়। এতে বেতার কর্মীরা সদলবলে অফিস ছেড়ে চলে এলে পরদিন ৮ই মার্চ বেতারে তা প্রচারিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে এক অসামান্য দলিল।

বি. ব.

সৈয়দ আলতাফ হোসেন [১৯২৩—১৯৯২]

রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক। ১৯২৩ সালের ১৬ই মার্চ কুষ্টিয়ার বিষ্টুদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে কুষ্টিয়ার হরিনারায়ণপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ (১৯৪৪) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বি.এল (১৯৪৬) ও ইতিহাসে এম.এ. (১৯৪৭) পাশ করেন।

১৯৪৪ সালে কলিকাতায় (দ্র) 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকার (দ্র) 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার বার্তা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ঢাকার মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি 'নিউ নেশন' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

সৈয়দ আলতাফ হোসেন ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগে (দ্র) যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের (দ্র) মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (দ্র) নেতৃত্বাধীনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (NAP=ন্যাপ) গঠনে (২৫শে জুলাই, ১৯৫৭) তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৫ সালের ২৬শে জুলাই তিনি ন্যাপের পূর্ব-পাকিস্তান কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। চীন (দ্র) ও রাশিয়ার (দ্র) আদর্শগত দ্বন্দ্বে ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি মস্কোপন্থী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক হন (১৯৬৭-১৯৭২)। আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে (দ্র) বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ৬০টি যুব ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি ১৯৭৫ সালের ২৩শে জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) নেতৃত্বাধীন বাকশাল (দ্র) সরকারের রেলওয়ে প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর তিনি খোন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক গঠিত সরকারের সড়ক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

১৯৭৮ সালে থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি অধুনালুপ্ত জাতীয় একতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। লে. জেনারেল হুসেনই মুহম্মদ এরশাদের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৫ দলীয় জোট গঠন, জোটের ৫ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৫ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসাবে ১৯৮৬ সালের ৭ই মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি কুষ্টিয়া জেলা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বহুবার দলবদল ও কারাবরণ করেছেন।

তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এক জন বিশিষ্ট আইনজীবী ও ঢাকা ল' কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯৯২ সালের ১২ই নভেম্বর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

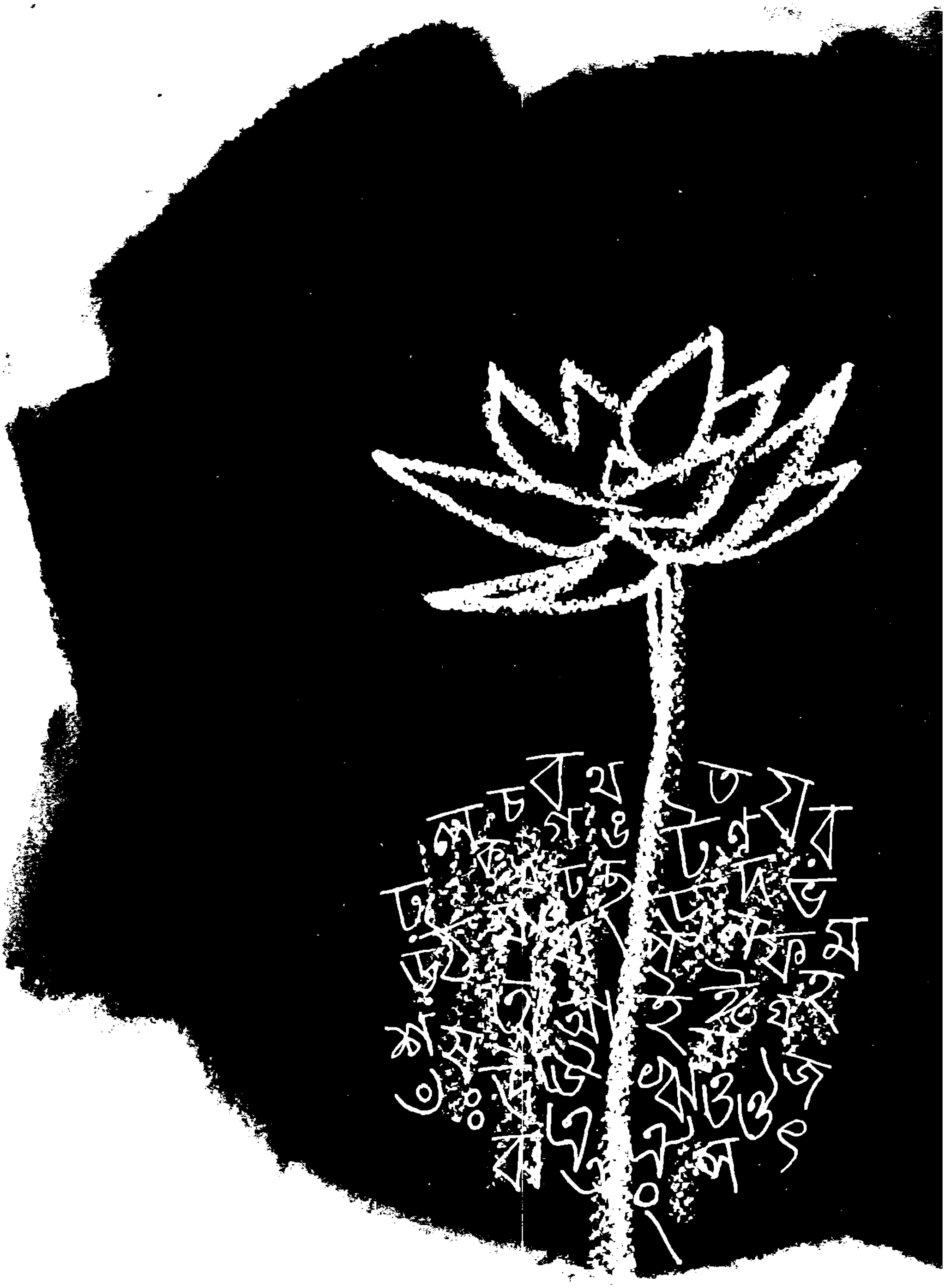

www.pathagar.com

শিশু-বিশ্বকোষ : পঞ্চমখণ্ড

য থেকে হ

'বিশ্ব' বলতে আমরা যা যা বুঝি তার সব কিছু নিয়েই বিশ্বকোষ। আমাদের চেনা-জানা পৃথিবী ও মহাবিশ্বের কাহিনী, ইতিহাস ও পুরাকীর্তি, ভূগোল ও সভ্যতার কথকতা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন, সমাজ ও সংস্কার এবং শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনী ও তাঁদের অবদান—এসব কিছু নিয়ে অসংখ্য তথ্য আর তত্ত্ব এখানে রয়েছে। গাছগাছালি কি পাখপাখালি, তাও বাদ যায় নি। গান-বাজনা আছে, খেলাধুলো আছে, সিনেমা-যাত্রা-থিয়েটার—এসবও আছে। তবে এই বিশ্বকোষের পরিকল্পনা ও প্রণয়ন সবই করা হয়েছে বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের কথা মনে রেখে।

দেশের অর্ধশতাধিক বিদ্বজ্জন প্রভূত পরিশ্রম করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর এই 'শিশু-বিশ্বকোষ' বইয়ের ভুক্তিগুলো রচনা করেছেন।

পাঁচ খণ্ডে প্রণীত এই বিশ্বকোষের ভুক্তিসংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। আর পৃষ্ঠাসংখ্যা সব মিলিয়ে দেড় হাজারের মতো। প্রতিটি খণ্ডে রয়েছে সহস্রাধিক রঙ-বেরঙের ছবি—মানুষজনের, পশুপাখির, যন্ত্রপাতির। তার ওপর এতে আছে দেশ-বিদেশের মানচিত্র, পতাকা ইত্যাদি। এসব চিত্ররচনা এবং এর বিন্যাস ও অলঙ্করণের দায়িত্ব পালন করেছেন দেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীগণ।

বিশ্বকোষ আজীবন সঙ্গী হয় ধীমান শিক্ষিত মানুষের। ভুক্তি নির্বাচন তাই এভাবেই করা হয়েছে—'শিশু-বিশ্বকোষ' যেন শিশু-কিশোরদেরই শুধু নয়, বড়দেরও প্রয়োজন মেটায়।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

ISBN : 984-09-0405-1